

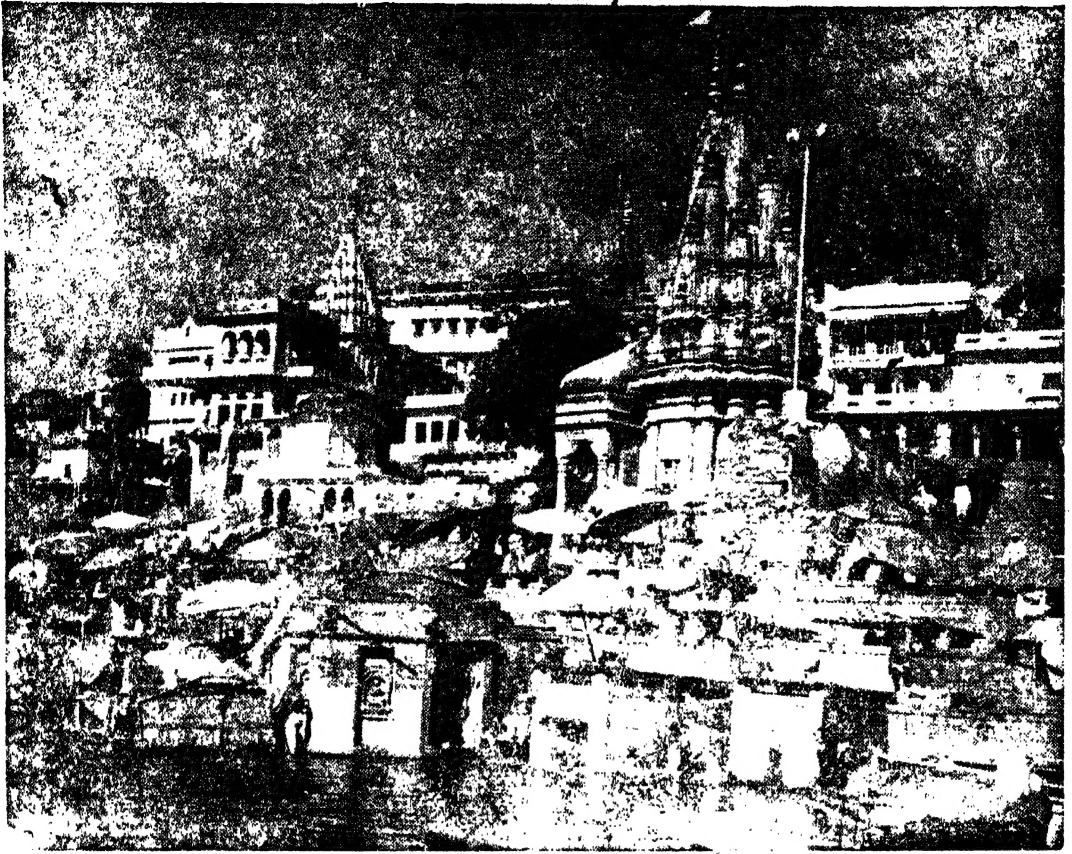
পারিদায়িক আনন্দবাজার প্রতিকা

মহালিঙ্গা



অকাল বোধন

মা আসিতেছেন। বঙ্গের অগনতলে মায়ের বোধন-শব্দ বাজিয়া উঠিয়াছে; বঙ্গব্যাপী অন্ধকারে মঙ্গলদীপের আলো জ্বলিয়াছে। বাঙালীর এ বোধন অকাল-বোধন। বাঙালী মাকে শব্দ সুখের দিনেই চাহে নাই, দুর্দিনে সে দুর্দিনতলনী দুর্গা বলিয়া ডাকিয়াছে। বাঙালী কালের হিসাবে মাকে ভাবে নাই; কালের বিচার বিস্মৃত হইয়া কলা-কাষ্ঠাদিরূপে যিনি পরিণাম প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাকে জননীস্বরূপে বরণ করিয়া নিজের ঘরে আনিয়াছে। দুঃখরূপে দপণে বাঙালী মায়ের ঈশৎ-সহাস ও অমল আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং জননীর খড়াপ্রভাটিকর-বিস্মরণ ও শলাগুপ্তানিবহ আগ্রহভরে নিরীক্ষণ করিয়াছে। সে রূপ দেখিয়া বাঙালী মাতিয়াছে এবং মায়ের চরণে একান্তভাবে আত্মনিবেদনের জন্য অকল হইয়াছে। বাঙালার আজ বড় দুর্দিন; দুঃস্বপ্ন এ অকাল; কিন্তু এ দুর্দিনে অতি ঘোর এই অকালেই বাঙালী মায়ের অকাল-বোধনের প্রয়োজন একান্তভাবে অনুভব করিতেছে; নহিলে বাঙালীর মাতৃপঞ্জার বিশিষ্টতা থাকে না। যে জাতির প্রাণশক্তি আছে, পরিপার্শ্বিক প্রতিফল অবস্থার চাপেও সে তাহার প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা পরিত্যাগ করিতে পারে না; বাস্তব বিচারকে গোণ করিয়া তাহার অন্তঃপ্রকৃতি একান্তভাবে কর্ম-জগতে তাহাকে প্রণোদিত করে। বাঙালীর মাতৃপঞ্জার এই প্রবৃত্তি তাহার অন্তঃপ্রবৃত্তিতে পবিত্রীকৃত এবং সেই অন্তঃপ্রবৃত্তির আকর্ষণে বাঙালীর প্রাণে প্রাণে এই দুর্দিনেও মায়ের অগ্নিময় আহবান বাজিয়া উঠিয়াছে। বাঙালী মাতৃপঞ্জা ছাড়িতে পারিবে না; সে আজ আত্মশক্তিতে দৃঢ় হইয়া দেবীর অকালবোধনে প্রবৃত্ত হইবে। মহাশক্তিস্বরূপী জননীর পেরণায় বর্তমান বিশ্বব্যাপী আনন্দিক অত্যাচার এবং অন্যায়কে প্রতিরোধ করিবার জন্য সে অকতোভয়ে অগ্রসর হইবে। বাঙালার মহামশানেই আজ সে আনন্দময়ী জননীর উদ্বেদন করিবে। শক্তির পথে এ সাধনা, বীর্যের পথে এ সাধনা। এ সাধনা দৃষ্কর, কঠোর এবং নিদারুণ। প্রতিপদে প্রেতের ভীষণীষিকা ইহাতে অন্তরায় সৃষ্টি করিবে; কিন্তু দুর্দিনতলনী দুঃখহারিণী জননীর সন্তানদল মাতৃগঞ্জী সংকল্প হইতে বিচলিত হইবে না। তাহাদের ভৈরব সাধনার দৃষ্ট জ্যোতিতে দিগমন্ডলে পরিব্যাপ্ত দুর্যোগের মেঘজাল খণ্ড খণ্ড হইবে এবং শরতের অরুণ-সেখা আকাশের কোলে দেখা দিবে। সেই শারদ-প্রভাতে বঙ্গের সূর্যকরোজ্জ্বল অগনতলে মা ছুটিয়া আসিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইবেন। মাতৃপঞ্জার শুভলক্ষণ এই আশ্বাসই আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করিতেছে।



সমাজতত্ত্ব ও শাস্ত্র

আধুনিক বিজ্ঞান মানব জাতির সর্বপ্রকার ক্ষুধা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ভারতের অগণিত লোক যে দুর্য্য-দারিদ্র্যের মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছে—তাহা সুস্থপণ্ডিত কিন্তু একমাত্র আধুনিক সুব্যবস্থা দ্বারাই সুখ-শান্তি আনয়ন করা যাইবে না।

আমাদের সুপ্রাচীন বিন্যাপীঠের শাস্ত্রভাণ্ডারে যে জ্ঞান সঞ্চিত রাখিয়াছে, তাহা শত শত বৎসর পূর্বে যে সমস্ত সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার অভিজ্ঞতা হইতে সুচিন্তিত প্রণালীতে সমাধান করিয়া তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত ও বটনে আজ ভারতে চাই আধুনিক বিজ্ঞানের কলা-কৌশলের সুযোগ-সুবিধার সহিত এই জ্ঞানের সংমিশ্রণ।

শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিড়লা ব্রাদার্সের অপূর্ব কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে—এই দুইটির অর্থব্যয় পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল ও ভারতের শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা অপূর্ব সমন্বয় দ্বারা।

বিড়লা ব্রাদার্স লিমিটেড

৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

ম্যানোজিং এজেন্টস্ :—

কেশোরাম কটন মিলস্ লিঃ • জীয়াজীরাও কটন মিলস্ লিঃ • বিড়লা বটন স্পিনিং এন্ড উইভিং মিলস্ লিঃ • সার্ভোলেজ কটন মিলস্ লিঃ • ওরিয়েন্ট পেপার মিলস্ লিঃ • বিড়লা জুট ম্যানফ্যাকচারিং কোং লিঃ • ইন্ডিয়ান শীপিং কোং লিঃ • হিন্দুস্থান মোটরস্ লিঃ • হিন্দু সইকেলস্ লিঃ • টেক্সটাইল মেশিনারী কর্পোরেশন লিঃ • প্রিমিয়ার টেটস্ সাপ্লাইং কোং লিঃ • ইন্ডিয়ান প্লাস্টিকস্ লিঃ • হিন্দু গ্যাস্ কোং লিঃ।

কটন এজেন্টস্ লিঃ—এইগুলির ম্যানোজিং এজেন্টস্ :—

আপার গ্যাজেট্ স্কার মিলস্ লিঃ • ভারত স্কার মিলস্ লিঃ • নিউ ইন্ডিয়া স্কার মিলস্ লিঃ • নিউ স্বদেশী স্কার মিলস্ লিঃ • আউথ স্কার মিলস্ লিঃ • বিড়লা ল্যাবরেটরিজ প্রোপ্রাইটস্—আপার গ্যাজেট্ স্কার মিলস্ লিঃ।

ইন্সুরেন্স—

নিউ এশিয়াটিক ইন্সুরেন্স কোং লিঃ
রুবী জেনারেল ইন্সুরেন্স কোং লিঃ



ধম্মপদ

বুধীভূতান্থ চাঞ্চুর
— কর্তৃক আবৃত্তিত

যমকবগগো

মনোপদুসংগমা ধম্মা মনোসেট্টা মনোময়া।
মনসা চ পদট্টেন ভাসতি বা কয়োতি বা।
ততো ন দুঃখমশ্বেতি চক্কং ব দহতো পদং॥১॥

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে,^১
দুষ্ট মনে যে মানুষ কাজ করে কিম্বা কথা ভনে,
দুঃখ তার পিছে ফিরে চক্ক যথা গোরুর পিছনে।

মনোপদুসংগমা ধম্মা মনোসেট্টা মনোময়া।
মনসা চে পসরেন ভাসতি বা কয়োতি বা।
ততো নঃ সুখমশ্বেতি ছয়া ব অনপায়িনী॥ ২ ॥

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে,
যে জন প্রসন্ন মনে কাজ করে কিম্বা কথা ভনে,
সুখ তার পাছে ফিরে, ছায়া যথা কারার পিছনে।

অক্কোচ্ছি মং অরুপি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে চ তং উপনয়ন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি॥ ৩ ॥

আমারে রুঁধিল, আমারে মারিল,
আমারে জিনিল, আমার কাড়িল,
একথা যে জনে বেঁধে রাখে মনে
বৈর তাহার কেবলি বাড়িল॥

অজ্ঞানি মং অর্থাৎ মং অজ্ঞানি মং অহাসি মং।
যে তৎসং উপবাহন্তি বেরং তৎসংস্মৃতি ॥ ৪ ॥

আমারে রুখিল, আমারে মারিল,
আমারে জ্বিনিল, আমার কাড়িল,
একথা যে জনে নাহি বাঁধে মনে
বৈর তাহারে ছাড়িল ছাড়িল ॥

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীষ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধহেমা সনন্তনো ॥ ৫ ॥

বৈর দিয়ে বৈর কভু শান্ত নাহি হয়
অবৈরে সে শান্তি লভে এই ধর্মে কয়।

পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেশ যমামসে
যে চ তৎ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা ॥ ৬ ॥

হেথা হতে যেতে হবে আছে কার মনে,
বিবাদ মিটিল তার বুদ্ধিল যে জনে।

সুভান্দুপসিং বিহরন্তং ইন্দ্রিয়েসু অসংবৃতং।
ভোজনেম্ হি চ মত্তং প্রঃ কুশীতং হীনবীরিয়ং।
অং বে পসহতী মারো বাতো বুদ্ধং ব দ্বন্দ্বলং ॥ ৭ ॥

শরীরের শোভা খোঁজে, ইন্দ্রিয় যাহার অসংযত
ভোজনে রাখে না মাত্রা, বীর্যহীন, অলস সতত,
ঝড়ে বথা বৃক্ষ হানে, 'মার' তারে মারে সেই মত।

অসুভান্দুপসিং বিহরন্তম্ ইন্দ্রিয়েসু সুসংবৃতং।
ভোজনেম্ হি চ মত্তং প্রঃ সন্ধ্যং আরম্ভবীরিয়ং।
অং বে নপসহতী মারো বাতো সেলং ব পশ্বতং ॥ ৮ ॥

অঙ্গশোভা নাহে খোঁজে, ইন্দ্রিয় যাহার সুসংযত
ভোজনের মাত্রা বোঝে, শ্রদ্ধাবান্ কর্মঠ নিরত
মার তারে নাহি মারে ঝড়ে যেন পর্বতের মত।

অনাক্সাবো কাসাবং যো বখং পরিদহেস্মতি।
অপেতো দমসচেন ন সো কাসাবমরহতি ॥ ৯ ॥

দমহীন সত্যহীন অন্তরে কামনা
গেরুয়া কাপড় তার শূদ্ধ বিড়ম্বনা।

যো চ বস্তক্সাবসু সীলেসু সুসমাহিতো।
উপেতো দমসচেন স বে কাসাবমরহতি ॥ ১০ ॥

নিষ্কাম, সুশীল, দম সত্য যার মাঝে
গেরুয়া কাপড় পরা তাহারেই সাজে।

অসারে সারহতিনো সারে চাসারসু সিনো।
তে সারং নাথিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসঙ্কপ্পগোচরা ॥ ১১ ॥

অসারে যে সার মানে সারে যে অসার
মিথ্যা কল্পনার সার নাহি জোটে তার।

সারং সারতা এত্বা অসারং অসারতো।
তে সারং নাথিগচ্ছন্তি সম্মাসঙ্কপ্পগোচরা ॥ ১২ ॥

সারকে যে সার বোঝে অসারে অসার
সত্য-সঙ্কল্পের কাছে সার মিলে তার।

বখাগরং দুচ্ছয়ং বৃট্টী সমতিবিক্কতি।
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিক্কতি ॥ ১৩ ॥

ভাল ছাওয়া না হইলে বৃষ্টি পড়ে ঘরে
সতর্ক না হলে মন বাসনায় ধরে।

বখাগরং দুচ্ছয়ং বৃট্টী ন সমতিবিক্কতি।
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিক্কতি ॥ ১৪ ॥

ভাল ছাওয়া ঘরে নাহি পড়ে বৃষ্টিকণা
সতর্ক যে মন তারে কি করে বাসনা।

ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উত্তরং সোচতি।
সো সোচতি সো বিহংগতি দিম্বা কম্মিকলিট্টমত্তনো ॥ ১৫ ॥

হেথা মরে শোকে সেথা মরে শোকে
পাপকারী দুখ পায় দুই লোকে
বথা বাজে তার হেরি আপনার
মলিন কর্ম আপনার চোখে।

ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপুংগো উত্তরং মোদতি।
সো মোদতি সো পমোদতি দিম্বা কম্মিবিসুদ্ধি মত্তনো ॥ ১৬ ॥

হেথা সুখ তার সেথা সুখ তার,
দুই লোকে সুখ পুণ্যকর্তার—
সে যে সুখ পায়, বহু সুখ পায়
শুদ্ধকর্ম হেরি আপনার।

ইধ তপ্পতি পেচ্চ তপ্পতি পাপকারী উত্তরং তপ্পতি।
পাপং মে করন্তি তপ্পতি ভীষ্যো তপ্পতি দুগ্গতিং গতো ॥ ১৭ ॥

হেথা পায় তাপ সেথা পায় তাপ,
দুই লোকে দহে যে করেছে পাপ,
“এই মোর পাপ,” এই বলে তাপ—
দুর্গতি পেয়ে সেও পরিতাপ।

ইধ নন্দতি পেচ্চ নন্দতি
কত পুংগো উত্তরং নন্দতি।
পুংগো করন্তি নন্দতি
ভীষ্যো নন্দতি দুগ্গতিং গতো ॥ ১৮ ॥

হেথা আনন্দ সেথা আনন্দ
দুই লোকে সুখী পুণ্যবন্ত!
পুণ্য করেছি বলে আনন্দ,
সুগতি লাভের পরমানন্দ!

বহুপক্ষি চে সহিতঃ ভাসমানো

ন তঙ্করো হোতি নরো পমস্তো।

গোপো ব গাবো গণয়ং পরেসং

ন ভাগবা সামগ্র্যসু হোতি॥১৯॥

যে কহে অনেক শাস্ত্র বচন

কাজে নাহি করে প্রমাদ লাগি

—অপরের গোরু গণিয়া গোয়াল ?

হয় কি সে জন শ্রেয়ের ভাগী ?

অপমিগ চে সহিতঃ ভাসমানো

ধম্মসু হোতি অনুধম্মচারী

নও দোসণ পহায় মোহং

সম্মপজানো সাধুদত্তচিত্তো

অনুপাদিয়ানো ইধ বা হরং বা

ন ভাগবা সামগ্র্যসু হোতি॥২০॥

অল্পই কহে শাস্ত্রবাক্য

ধর্মের পথে করে বিচরণ,

রাগ দোষ মোহ করি পরিহার,

জ্ঞানসমাপ্ত, বিমুক্তমন

বিষয়বিহীন ইহ পরলোকে

কল্যাণভাগী হয় সেইজন।

পদ্যফলগণো

কো ইমং পঠিৎ বিজ্ঞেসুতি যমলোকণ ইমং সদেবকং।

কো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পদ্যফলি পচেসুতি॥১॥

কে এই পৃথিবী করি লবে জয় যমলোক আর দেবনিকेतন
ধর্মের পদ নিপুণ হস্তে কে লবে চুনিয়া ফুলের মতন।

সেখো পঠিৎ বিজ্ঞেসুতি যমলোকণ ইমং সদেবকং

সেখো ধম্মপদং সুদেসিতং কুসলো পদ্যফলি পচেসুতি॥২॥

শিষ্য জিনিয়া লইবে পৃথিবী যমলোক আর দেবনিকेतন
নিপুণ শিষ্য ধর্মের পদ চুনিয়া লইবে ফুলের মতন।

ফেন্দুপমং কারিমং বিদিত্বা মরীচিকামং অভিসম্বধানো।

ছেদান মারসু পদ্যফলানি অদসুনং মচ্ছুরাজসু গচ্ছে ॥ ৩ ॥

ফেনের মতন জানিয়া শরীর মরীচিকাসম বদ্বিয়া তারে
ছিঁড়ি মদনের পদ্যশায়ক মৃত্যুর চোখ এড়ায়ে যা' রে!

পদ্যফলি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।

সুত্তং গামং মহোদোহং মচ্ছুরাদানং গচ্ছতি॥৪॥

সুখের কুঞ্জে তুলিছে পদ্য চিত্ত যাহার বাসনাময়
বন্যায় যেন সদৃশ পল্লী, মৃত্যু তাহারে ভাসিয়ে লয়।

পদ্যফলি হেব পচিনন্তং ব্যাসত্তমনসং নরং।

অতিত্তং য়েব কামেসু অন্তকো কুরুতো বসং॥৫॥

সুখের কুঞ্জে তুলিছে পদ্য চিত্ত যাহার বাসনাময়
না পুরিতে তার তৃষা বাসনার, মরণ তাহারে ছিনিয়া লয়।

যথাপি ভমরো পদ্যফলং বরগন্ধং অহেতয়ং।

পলোতি রসমাদায় এবং গাবে মুনী চরে॥৬॥

বরণ সদ্যসু না করিয়া হানি ভ্রমর যেমন ফুলের টানি,
যায় সে উড়ে,
সেই মত যত জ্ঞানী মুনীজন, সংসার মাঝে করি বিচরণ,
পালান দূরে।

ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকত্তং।

অন্তনোহব অবেক্খিয়া কতানি অকতানি চ॥৭॥

পর কি বলেছে কঠিন বচন পর কি করে বা না করে
তাহে কাজ নাই তুমি আপনার কৃত বা অকৃত দেখ রে!

যথাপি রুচিরং পদ্যফলং বরবত্তং অগন্ধকং।

এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুশ্বতো॥৮॥

যেমন রঙীন সুন্দর ফুলে গন্ধ না যদি জাগে
তেমনি বিফল উত্তম বাণী কাজে যদি নাহি লাগে।

যথাপি রুচিরং পদ্যফলং বরবত্তং সগন্ধকং

এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি কুশ্বতো॥৯॥

যেমন রঙীন সুন্দর ফুলে গন্ধও যদি থাকে
তেমনি সফল উত্তম, বাণী কাজে খাটাইলে তাকে।

যথাপি পদ্যফরাসিমহা করিরা মালাগুণে বহু।

এবং জাতেন মচ্চেন কত্তবং কুসলং বহুং ॥১০॥

ফুলরাশি লয়ে যথা নানা মত মালা গাঁথে মালাকর
তেমনি বিধির কুশলকর্ম রচনা করিবে নয়॥

১ পাঠান্তর—ধর্ম মনঃশ্রুতি, মনোময়

২ পাঠান্তর—কর

৩ পাঠান্তর—নিশ্চয় যে, দর সজ আছে বার সাথে

৪ পাঠান্তর—কে গাঁথিয়া লবে

৫ পাঠান্তর—ধর্মের পদ নিপুণ হস্তে গাঁথিয়া লইবে ফুলের মতন।

৬ পাঠান্তর—বর্ণগন্ধ

৭ পাঠান্তর—সুন্দর

[বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় অনুবাদবিভাগও যে রবীন্দ্রনাথের লেখনী-স্পর্শে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে, একথা সর্বসাধারণের নিকট পরিদ্রষ্ট্য নহে। বৈষ্ণব হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইংরেজ কবির রচনা-নিদর্শন পর্যন্ত তিনি দীর্ঘ সাহিত্যজীবনের বিভিন্ন পর্বে ভাষান্তরিত করিয়া গিয়াছেন—একর সংগৃহীত হইলে তাহাতে একটি বৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে। প্রথম-যৌবনে বিদেশী কবির যে-সকল অনুবাদ তিনি করেন, ‘প্রভাসংগীত’, ‘কড়ি ও কোমল’ প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়াছে; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত নব-রসমালা (১৩১৪) গ্রন্থে রঘুবংশের কিয়দংশ এবং সংস্কৃত কৃতকগুলি প্রচলিত ইত্যাদির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়; গীতাঞ্জলি রচনার সমকালে কৃত বৈষ্ণবানুবাদের সংগ্রহ বিম্বভারতী পত্রিকায় (প্রাচ্য আশ্রম, ১৩৫০) প্রকাশিত হইয়াছে; মেঘদূতের গ্রীষ্মারামোহন মেনন কৃত বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলে উহা পড়িয়া তিনি মেঘদূতের অনুবাদ করিতে উৎসাহ হন এবং উক্ত সংস্করণের একখণ্ড গ্রন্থের মার্জিনে মেঘদূতের কিয়দংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া কোনো নিতরবোধী ব্যক্তির নিকট শূন্যিমাছি; এ পর্যন্ত উহা প্রকাশিত হয় নাই।

গ্রীষ্মচন্দ্র বসু মহাশয় সম্পাদিত ধর্মপদ গ্রন্থের গদ্য বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন (১৩১২) পত্রে উহার প্রশংসিত প্রকাশ করেন ও এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃত ও ইতিহাস সর্বশ্রেষ্ঠ দীর্ঘ আলোচনা করিয়া পরিশেষে বলেন : “যুরোপীয় ইতিহাসের আদর্শে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে, এ-কথা আমাদের কাছে একেবারেই ভুলিয়া যাইতে হইবে। এই ইতিহাসের বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধ-শাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র যুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা তাহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লক্ষ্যের কারণ। দেশের প্রতি আমাদের সমস্ত ভালোবাসাই কেবল গবর্ণমেন্টের দ্বারে ভিক্ষাকর্মের মতোই আবদ্ধ—আর কোনোদিকেই তাহার কোনো গতি নাই? সমস্ত দেশে পাঠজন লোক কি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের দ্রুতস্বরূপে গ্রহণ করতে পারেন না? এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে একথা মনে করিয়াও কি দেশের জনককে তরুণ যুবার উৎসাহ এই পথে ধাবিত হইবে না?”

সম্ভবত এই সময়েই, চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত গ্রন্থের একখণ্ডের মার্জিনে রবীন্দ্রনাথ ধর্মপদের কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছিলেন; এই দীর্ঘকাল ইহা অপ্ৰকাশিত অবস্থায় ছিল। এই অনুবাদের কথা শুনি যাহাদের জ্ঞানিবার সুযোগ হইয়া থাকিবে তাহারা ইতমধ্যে পর-লোকগত, বা এবিষয় সম্ভবত বিস্মৃত হইয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে, ‘ব আশ্রমা বলদ’ বৈদিক মন্ত্রের একটি বিস্মৃত ও একটি অপ্ৰকাশিত অনুবাদ প্রকাশ-প্রসঙ্গে (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৯) শ্রীমতিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এই অনুবাদ বিষয়ে উল্লেখের কথা প্রচার করেন। এই আলোচনা পাঠ করিয়া শ্রীমতিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্র, জয়পুরপ্রবাসী শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার, তাহার পিতা, শ্রীমতিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভূত-পূর্ব অধ্যাপক, অক্ষলপরসে কগত সুবোধচন্দ্র মজুমদারের কাগজপত্রের মধ্য হইতে এই অনুবাদ উদ্ধার করিয়া বিম্বভারতী পত্রিকার সহকর্মী সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বশিক্তে ব্যাংহর করিতে দেন। বিম্বভারতী কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে ইহার একাংশ মুদ্রিত করিতে পারিয়া আমরা বিম্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদারের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি; অবশিষ্টাংশ বিম্বভারতী পত্রিকার আগামী কোনো সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। অনুবাদের সহিত মূল পাঠ্য শ্লোকগুলিও মুদ্রিত হইল।

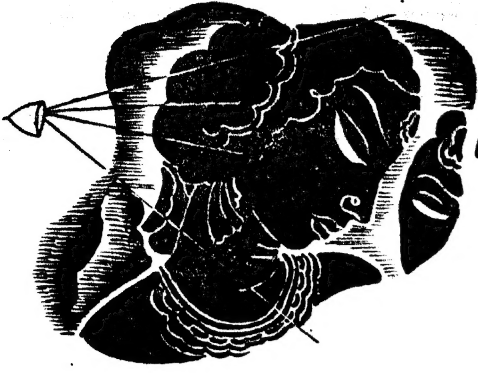
বৌদ্ধশাস্ত্র পাণ্ডিত্য, বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিযমপিটক এই তিন ভাগে বিভক্ত। সূত্রপিটক দীর্ঘ, মধ্যম, অল্পমাত্র, সংযুক্ত ও ধর্মপদ এই পাঁচটি নিকরে বিভক্ত; ধর্মপদ ধর্মদর্শনিকদের অন্তর্গত। “জগতের যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আছে ধর্মপদ তাহার একটি। বৌদ্ধদের মতে এই ধর্মপদ গ্রন্থের সমস্ত কথা স্বয়ং বুদ্ধদেবের উক্তি এবং এগুলি তাহার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই গ্রন্থকারে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই গ্রন্থে যে সকল উপদেশ আছে, তাহা সমস্তই বুদ্ধের নিজের রচনা কি না, তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন, অতএব একথা স্বীকার করিতে হইবে, এই সকল নীতিবাক্য ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময়ে এবং তাহার পূর্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।... এ স্থলে কে কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা লইয়া তর্ক করা নিরর্থক। এই সকল ভাষার দ্বারা ভারতবর্ষে অনেকদিন হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে এমনি করিয়াই চিন্তা করিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধ এই-গুলিকে চতুর্দিক হইতে সহজে অর্জন করা, আপনায় রাখিয়া, সুসংবদ্ধ করিয়া, ইহা দিগকে চিরন্তনরূপে স্থায়িত্ব দিয়া গেছেন—বাহ্যে বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাকে একান্ত্রে গাথিয়া মানবের ব্যবহারযোগ্য করিয়া গেছেন। অতএব ভগবদ্গীতায় ভারতবর্ষে যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেশটা ভারতের চিন্তাকে যেমন এক স্থানে একটি সংহতমূর্তি দান করিয়াছেন, ধর্মপদই গ্রন্থেও ভারতবর্ষের চিন্তার একটি পরিচয় ভেদান বাক্ত হইয়াছে। এইজন্যই কি ধর্মপদে, কি গীতায় এমন অনেক কথাই আছে, ভারতের অন্যান্য নানা গ্রন্থে বাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।”—রবীন্দ্রনাথ

ধর্মপদ পূর্ববর্তী বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, যুগে যুগে অগণিত ধর্মার্থকে পথপ্রদর্শন করিয়াছে। অধ্যাপক আলবট ড্রে এডমন্ডস তাহার কৃত অনুবাদের ভূমিকায় ধর্মপদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

“If ever an immortal classic was produced on the continent of Asia it is this. . . . These old refrains from life beyond time and sense, as it was wrought out by generations of earnest thinkers, have been fire to many a muse. They burned in the brains of the Chinese pilgrims, who braved the blasts of the Mongolian desert, climbed the cliffs of the Himalayas, swung by the rope-bridge across the Indus where it rages through its gloomiest gorge and faced the bandit and the beast to peregrinate the Holy Land of their religion, and tread in the footsteps of the Master. Verses were graven on walls of the august temples at the command of Hindu emperors who abolished capital punishment, mitigated slavery, and established hospitals for men and animals, under the sway of this marvellous cult; and by Ceylon monarchs whose ruined reservoirs, as large as lakes, astonish us among the wonders of antiquity. And to-day after twenty centuries of Roman and Christian culture, they have won the admiration of Europeans and Americans in every seat of learning from Copenhagen to the Cambridges, and from Chicago to St. Petersburg.”

কবিসার্বভৌম-কৃত এই সার্বভৌমপ্রভাব ধর্মসূত্রাবলীর অনুবাদ পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিয়া আমরা আনন্দিত।—সম্পাদক, শারদীয়া আনন্দ বাজার পত্রিকা।]





শিল্প-দৃষ্টি

শ্রীলক্ষ্মী লাল বসু

রিম্মালিটি কী কুমারস্বামী একটি সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করেছেন। যেখানে কোনো অভাববোধ থাকে না। অর্থাৎ, আর্টের ক্ষেত্রে বলা যায়, চিত্রে এবং চিত্রের বিষয়বস্তুতে মিল না থাকলেও যখন অভাববোধ হয় না।

চীনেরাও এই কথাই বলেছেন। পাকা আর্টিস্টের কাজ কেমন? না, আশ্চর্য্যভাবে বস্তু প্রতীতি হয়, অথচ কাছে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়—কালির পেঁচ, ভুলির ছাপ, তা ছাড়া কিছুই নয়।

চীনেরা এইজন্য বলেন, টেকনিক কিছুই নয়। মনই আঁকে। মন যখন যেতে ইচ্ছা করে, তখন টেনে হিঁচড়ে কোথা দিয়ে কোথায় নিয়ে যায় তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। পাকা আর্টিস্টের টেকনিক বা ঠিক টেকনিক হল, তন্ত্রের একটি শেল্যকে যেমন বলেছে, পাখির ওড়ার মতো, এক গাছ থেকে আরেক গাছে বসল, বাতাসে কোনো চিহ্ন রইল না।

কারো কারো এইটি হয়েছে, যে জিনিসই আঁকুন তাকে প্রবেশ করতে পারেন। প্রবেশ করা কি রকম? তোমার হাতটা ধরে এই-খানে এইভাবে রেখে দিলাম, আবার তুলে নিয়ে অন্য স্থানে অন্য ভঙ্গীতে রাখা গেল, তোমার ধরে ওঠালাম বা বসালাম, এই এক। আরেক হল—তোমার ভিতরেই আমি যদি প্রবেশ করতে পারি, তাহলে তোমার হাত নিয়ে পা নিয়ে আমি বা

খুঁশ করতে পারি; উঠতে, বসতে, দৌড়তে, নাচতে কিছুতেই কোনো আয়াস লাগে না, বাধা হয় না—সেটা সহজও হয়, সত্যও হয়।

ছোটো ছেলের আঁকা ছবিও খুব সুন্দর হয়; আশ্চর্য্য ছন্দ, আশ্চর্য্য রঙ তাতে থাকে। তবুও ছোটো ছেলের কাজের নকল করে আর্টিস্ট হওয়া যায় না।

ছোটো ছেলের সাজের গুণ বড়ো আর্টিস্টের কাজে পড়ায় যখন তিনি 'জ্ঞানের চরমে' পৌঁছে যান। কারণ বড়ো মানুষ ছোটো ছেলের অনুকরণ করলে হয় ন্যাকামি, অথচ বিনা আয়াসে বড়ো মানুষও ছোটো ছেলের মতো হয়ে থাকেন জানি—তাকেই আমরা বলি সাধু বা পরমহংস।

এক জাপানি কবিতায় কবি বলছেন, তাঁর চোর ফুল হতে সাধ হয়। মানুষ তো চোর ফুলের চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক মহান, তবে এরকম বিপরীত ইচ্ছা কেন?—তার মানে আছে। মানুষ মানুষ বলেই তার এমন ইচ্ছা হয়েছে, চোর ফুলের ইচ্ছা হয় না মানুষ বা আর কিছু হতে। বিচিত্র পথে বিচিত্র লক্ষ্যে ধী ও অনুভূতি প্রসারিত হয় মানুষের। মানুষের চেতনা জগতের সর্বত্রই প্রবেশ করতে চায়। আরেক অর্থ এই ধরা যেতে পারে যে, মানুষ মানুষই থাকতে চায় অথচ চোর ফুলও হতে চায়; মানবসত্তা যে অনন্ত জটিলতা, অশেষ মিশ্রণ, অপারিসীম ঐশ্বর্য, সবকে জয় করেই হাস্যময় চোর



শ্রীলক্ষ্মী লাল বসু

শ্রীলক্ষ্মী লাল বসু



ফুলের সহজ শোভা নিয়ে সে ফটে উঠতে চায়।

ভারতীয় ভাস্কর্য অনেক বড়ো ধরনের। ওতে যা করেছে আর কোনো দেশে আর কোনো যুগে তা করবার কল্পনাই করে নি। একটা নটরাজমূর্তি, একটা বৃদ্ধমূর্তি বা শিশুমূর্তি যতক্ষণ আছে—ভারত-শিল্প, ভারতসভ্যতা ওরই মধ্যে সম্পূর্ণ আছে। ওতে বিমূর্ত আইডিয়াকে মূর্তি দিয়েছে। স্বভাবের এটা - সেটার নানারকম প্রতিরূপ অনেকে অনেক দিয়েছে। কিন্তু একটা করুণা বা মৈত্রী বা অন্য কোনো আইডিয়ার মূর্তি সমস্ত শিল্পজগতে দুলে। চিহ্ন বা প্রতীক রচনা করে নি, প্রতিমা সৃষ্টি করেছে; অর্থাৎ, আইডিয়ার 'বাচন' বা রূপায়ন ওখানে কন্ট-কৃত কল্পনাকৃত নয়, রসিকের কাছে অর বোধ

ব্যাক্যাসাপেক্ষ নয়। আইডিয়াই জন্ম নিয়েছে, আইডিয়াই হ'য়েছে।

এক সময় রুরোপ স্বভাবের হুবহু নকল করার দিচ্ছিল। সেটা আর্টের ঠিক রাস্তা নয়, তাতে শেষ পর্যন্ত তপ্ত দিতে পারে না। প্রতিভার রশে এখন স্বভাবকে এ ব্যারে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে; সেটাও অস্বাভাবিক, তা কোনো রস নেই। সমস্ত অনুষ্ণ বাদ দিয়ে মানুষ ভাবতে পারে না, দেখতেও পারে না। বিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্বের তথ্য নিকী হবে? সেটাই যে আর্টের সত্য তা নয়। আর্টের বিচার আর্টিস্টের মন যেন বস্তু আর আলো। সূর্যের আট মাটি-পাথরে চুষে নেয়; সেই হল স্বভাবের অনুকরণকারী আর্ট কাঁচে, আয়নায়, জীলে প্রতিফলিত করে; সেই হল ভারতীয় প্রাচ্য শিল্পের জাত। এ আর্ট খুব ক'রে অনুকরণ করতে যনি, খুব বেশি অ্যাবস্ট্রাক্ট বা অনুষ্ণগভীর হবারও তার দরক নেই। এর যা সত্য তা রূপ ও অপরূপ দুই মিলিয়ে, দুইই মাঝামাঝি বিরাজ করছে।

নিসর্গ চিত্রে বা ল্যান্ডস্কেপে যে রস তা নব রচে কোনোটা নয়। বড়োজোর শান্তরস বলতে পার, বা একান্ত রস। চাঁনেরা, মনে হয়, লাওংসের বাণী থেকে তা পেয়েছিল। একটা ভূদৃশ্যের মধ্যে একজন মানুষ—ভূচিত্রটিই বিশেষ ক'রে আঁকবার বিষয় হলে মানুষটি আঁকতে চেষ্টা করা উচিত আর, মানুষটি আঁকাই যদি লক্ষ্য হয় তবে, ভূচিত্রটি একে তুলে যত্ন করা ভালো। ছবির বিষয়কে সামনা-সামনি বা হঠকারিতা সঙ্গে আয়ত্ত করতে গেলে তা এড়িয়ে যায়। প্রেমেরও যেম রীতি, তাতে বাক্য ভগ্নী আছে। যেদিকে যেতে চাও সেদিকে সোজা যাও না, যা বলতে চাও তা সোজাসুজি বল না; যা চাও তা ব্যঞ্জনায় সুন্দর করে প্রকাশ কর—ইংগিতে, ইশারায় তাইতে প্রেমিক আর প্রিয়া দুজনেই খুশি হয়, প্রেম সফল হয় আর্টই বল আর প্রিয়াই বল, তার সম্পর্কে হঠকারিতা ভালো নয়, 'না চাইলে' তাকে পাওয়া যায়।



ভৃদশ্যোর ছবিখানি কেবল গাছপালা, বাগির চর, জলের ধারা একে সম্পূর্ণ মনের মতো হল না—একটা কোথাও একটা ল্যাজঝোলা ফিঙে কি পাটনি-হাতে রাখাল কি উপড় হয়ে একটা বাদির জল খাচ্ছে, এইটে একে দিতে হল; অমনি দেখা যায়, সমস্ত ন'ড়ে চ'ড়ে কথা ক'য়ে উঠল। প্রাণের সঙ্গেই প্রাণের পরিচয়। উদাস বা সুন্দর ভৃদশ্যোর মাঝখানে ঐ ফিঙে পাখীটি, ঐ রাখাল ছেলেটি হল স্বয়ং আর্টিস্ট।

শিল্পে যে সিদ্ধ হয়েছে তার ভুল হয় না। গল্পে শোনা যায়, চীনা শিল্পীর পা লেগে কালির বাটি উলটে গেল হঠাৎ, সে হাত বুলিয়ে একে দিল আশ্চর্য এক ভ্রাগন। আঁকিয়ের মনেতে আঁকবার বিষয়টি ঠিক-ঠিক যখন আছে, তখন মন থেকে তুলে কাগজে রেখে দিলেই যেন হল। কিম্বা পর্দা সরিয়ে দিতেই যেন দেখা গেল কী আছে। এজন্য যে হাত, হাতিয়ার, কাল এবং কলাকৌশলের প্রয়োজন তা থেকেও নেই; কারণ শিল্পীর এবং শিল্পরসিকের তার সম্বন্ধে কোনো হুঁশই নেই যেন। তীরখনদুক নিয়ে অনেক নিশানা ক'রে, অনেক যন্ত্র ক'রে, লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করা যেতে পারে; তাতে লক্ষ্য বিম্ব হতেও পারে, না-হতেও পারে। আরেক, যখন লক্ষ্যই তীরকে আকর্ষণ করে নেয় চুম্বকের মতো—কোনো চেষ্টা নেই ব'লেই প্রান্ত বা চূড়ির কোনো সম্ভাবনা নেই।

কুটুমকাটাম ব'লে একটা কথা অবনীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন। স্বভাবের বস্তু কী, শিল্প কী, কুটুমকাটাম কী, এটা ভাববার বিষয়। কোনো একটি মেয়েকে তিন রকম ক'য়ে পরিচিত করা সম্ভব। প্রথমতঃ, মেয়েটি অম্বকের মেয়ে, অম্বকের স্ত্রী, অম্বকের মা। দ্বিতীয়তঃ, সে হল মা, তার কোলে ছেলে আছে বা এমন কিছ, লক্ষণ আছে যা অতিক্রম করে অন্য কিছ, ভাবা যাচ্ছে না। তৃতীয়তঃ, সে মা নয়, স্ত্রী নয়, মেয়ে নয়, কোনো

সম্বন্ধেই অছেল্যাকাষে বঁধা নয়—সে নারী মাত্র। এর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের পরিচয় হল শিল্পের পরিচয়। একখন্ড পাখরের কথা ধরা যাক। যখন তা এমন যে কারো কাছে জটাই বুড়ি, কারো কাছে গজকচ্ছপ, কারো কাছে শিব, আর-কারো কাছে আর-কিছ, তখন তা কুটুমকাটাম; বহু লোকের সঙ্গে বহু কুটুম্বিতাসেই তার পরিচয়। যখন তা পাখর সে কথা ঢাকা পড়ে গিয়ে দেখছি সেটি একটি নির্দিষ্ট রূপ, নির্দিষ্ট মূর্তি—হোক চাই শিব, হোক চাই পার্বতী, একই জিনিস, দুই বা বহু নয়, তখনই তা একজন শিল্পীর শীলক্ষ্মেহর-করা রচনা; তা সৃষ্টির প্রতিফলিত বা আর্ট। যখন তা পাখর এই পরিচয়ই তার জানিছ বা মানিছ তখন তা স্বাভাবিক সৃষ্টি, স্বভাবের জিনিস।

পূর্বদিকে সবুজ বনের মাথায় কাজলকালো মেঘ আমার এত ভাল লাগছে কেন—মনকে এমন ক'রে নাড়া দিচ্ছে? কাম্ব আর কিছ, নয়, একই সত্তার একই চেতনার এক প্রান্ত হল ঐ মেঘ আর অন্য প্রান্ত হল এই আমি।

এক দিকে মেঘ আরেক দিকে আমি, তাই মেঘের সূখ আমাতে বা আমার দুঃখ মেঘে সঞ্চারিত হচ্ছে। একই সত্তা বিষয় ও বিষয়ী। আমার ইন্দ্রিয়গুলি দরোজা-জানলি মাত্র। সেই পথে, আমি ও আমার বিষয় মিলছে, মিশছে; একই চেতনায় নানারকম দোলা লাগছে, ঢেউ জাগছে।

কুণালজাতকে আছে কামলোকের কথা। তার উপরে রূপলোক, তারও উপরে অরূপলোক। আমি বলি, তারও উপরে আনন্দলোক। কামলোকে আসক্তি, তাই অম্ব-তা। রূপলোকে উঠে রূপ গোচরীভূত হয়েছে। অরূপলোকে উঠে প্রাণে নিখিল-প্রাণের ছন্দস্পন্দ অনুভব করা গেছে। আনন্দলোকে রস। শাস্তেই বলেছে, রসো বৈ সঃ।*

* শিল্পগাঢ় গ্রীন্দ্রনাথ বসু, মহাশয়ের উক্তির সংগ্রহ। সংগ্রাহক গ্রীকানাই সামন্ত।



প্রফুল্লকুমার ও বাঙালা

জীবনোপমা পাথ বন্ধু

স্বগত প্রফুল্লকুমার সরকার সর্বসাধারণের নিকট “আনন্দ-বাজার পত্রিকা”র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক হিসাবে খ্যাতি এবং সম্মান লাভ করিলেও মাতৃভাষার প্রতি একান্ত নিষ্ঠার জন্যই তিনি সাহিত্যিক বন্ধুগণের নিকট সর্বশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যনিষ্ঠা আমাদের সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব সামান্য ছিল না, সেই কৃতিত্বকে স্মরণ করিয়াই “ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবি-সংঘ” তাঁহাকে সভাপতিপদে বরণ করেন। কিন্তু “প্রফুল্লকুমার তাঁহার যথার্থ আত্মপ্রকাশের পথ সংবাদপত্র সেবায় লাভ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। প্রাথমিক তিনি ছিলেন আজীবন সাহিত্যরসিক। নিশ্চয়ই সংবাদপত্র তাঁহার অনেকটা রস শূন্যিয়া লইয়াছিল।” সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের এই সূচিন্তিত অভিমত অন্তরের সহিত সমর্থন করিয়া লইতে আমাদের কোন বাধা নাই।

পঠন্দশাহেই প্রফুল্লকুমার মাতৃ-ভাষার সেবায় বিশেষভাবে আত্ম-নিয়োগ করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি বঙ্গভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ‘বিশ্বকম পদক’ প্রাপ্ত হন। দেশভক্ত তরুণ প্রফুল্লকুমার দেশের বিভিন্ন সমস্যা লইয়াই প্রবন্ধ রচনায় মনো-নিবেশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত “ভাস্কর” পত্রিকায় তাঁহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। নব-পর্যায়ের “বঙ্গদর্শন” এবং সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত্য” পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রফুল্লকুমার ওকালতি ব্যবসায় সন্নিবিষ্ট করেন। কিন্তু ইতিপূর্বে হইতেই তাঁহার জীবনে যে সাহিত্যানুরাগের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। ইহা তাঁহার আইন ব্যবসায়ের অনুকূল ছিল না। প্রফুল্লকুমার অল্প কয়েক বৎসর পরেই উড়িষ্যার একটি দেশীয় রাজ্যে রাজপুত্রের গৃহ-শিক্ষকের কার্য গ্রহণ করেন। প্রবাসে অবস্থান-কালে তিনি ১৩২০ সালের মাঘ মাসের “সাহিত্য” পত্রিকায় “আদ্যমসুহৃদগণের বাঙালার অবস্থা” শীর্ষক এবং ১৩২৩ সালের আশ্বিন মাসের “নারায়ণ” পত্রিকায় “জাতীয় জীবন ধ্বংসের কারণ” শীর্ষক যে দুইটি অতি সুলিখিত ও সূচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা বাঙালার সুধী-সাহিত্যিক ও মনীষীগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ

করিয়াছিল। প্রফুল্লকুমার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত “নারায়ণ” পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখিতেন।

মাতৃভাষার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা লইয়া প্রফুল্লকুমার সংবাদপত্রসেবায় রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার সে সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। আজ “আনন্দবাজার পত্রিকা” সমগ্র ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে অতি উচ্চ-স্থানে অধিষ্ঠিত এবং সমগ্র বাঙালী জাতির ও বাঙালা দেশের অতি গৌরবের সামগ্রী।

সাংবাদিকের জীবন কিন্তু সাহিত্যনিষ্ঠ প্রফুল্লকুমারের জীবনকে একেবারে কবলিত করিতে পারে নাই। স্বল্প-অবসরের মধ্যেও তিনি সাহিত্যসাধনা হইতে বিরত ছিলেন না। তাঁহার প্রণীত ‘অনাগত’, ‘বালির বাঁধ’, ‘লোকারণ্য’, ‘দ্রষ্টলগ্ন’ ও ‘বিদ্যুৎলেখা’—এই কয়খানি উপন্যাসের ভিতর দিয়া প্রফুল্লকুমার বাঙালার সংসার ও সমাজ-জীবনের সমস্যাসমূহের উপর যে আলোকসম্পাত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত জীবনী “শ্রীগোরাঙ্গ” এবং সামাজিক সমস্যা-মূলক গ্রন্থ “ক্ষয়িকু হিন্দু” গ্রন্থকারের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। প্রফুল্লকুমারের তরুণমুখ সাহিত্যনিষ্ঠাই তাঁহাকে ‘বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিল। বহু বৎসর যাবৎ তিনি উহার কার্যনির্বাহক সমিতির একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। সাহিত্যসেবায় মিলন-সভা ‘রাবি-বাসরের প্রতিষ্ঠার প্রথম হইতেই

তিনি উহাতে অতি অন্তরঙ্গভাবে যোগদান করেন। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এবং বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির তিনি একজন উৎসাহদাতা ও সুহৃদ ছিলেন। প্রফুল্লকুমারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার মাতৃভাষা—বাঙালা ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য। তাঁহার এই বিশ্বাস ও আশাকে কার্যে পরিণত করার জন্য তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন।

“রাবি-বাসরের” বৈঠকে সদস্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার ১৩৪৪ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে সর্বপ্রথম “বাঙালা ভাষার ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা” বিষয়ে আলোচনা সূচক করেন। সেই অধিবেশনে সর্বাধিক রায় জলধর সেন বাহাদুর এবং বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। প্রফুল্লকুমার সৌদিন এক ঘণ্টার অধিককাল ধরিয়া নানা যুক্তি সহযোগে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টি সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত



করেন। সেদিন প্রসঙ্গক্রমে, তিনি বলিয়াছিলেন,—“কংগ্রেসে যখন ইংরাজী ভাষার পরিবর্তে কোন ভারতীয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করিবার কথা উঠে, তখন মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব করেন যে, হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত, কংগ্রেসও উহা অনুমোদন করেন। কিন্তু নানাদিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, হিন্দী বা হিন্দুস্থানী অপেক্ষা বাঙালারই রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা অধিক। বাঙালা ভাষা প্রায় আট কোটি লোকের ভাষা; তাহা ছাড়া উড়িয়া ও আসাম প্রদেশের ভাষার সংগে বাঙালা ভাষার খুব বেশী সাদৃশ্য। এই দুই প্রদেশের লোক বাঙালা ভাষারই বড়ো পক্ষান্তরে হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা বাঙালা ভাষাভাষীর চেয়ে বেশী নহে। এগার কোটি লোক হিন্দী বলে, এ দাবী অমূলক। বিহার ও রাজপুতানার হিন্দীতে এত পার্থক্য যে, উহাকে দুইটি পৃথক ভাষা বলা যাইতে পারে। দক্ষিণ ভারতে হিন্দী অপেক্ষা বাঙালা কম সহজবোধ্য নহে। হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর অপেক্ষা সাহিত্য গৌরবে বাঙালা শ্রেষ্ঠ। বাঙালা ভাষা বেশী ভাবপ্রকাশক্ষম; সুতরাং সর্বদিক দিয়াই বাঙালা রাষ্ট্রভাষার দাবী করিতে পারে। সর্ব-ভারতীয় ব্যাপারে বাঙালার স্থান আজ নিম্নে, তাহার Inferiority Complex বা হীনতাবোধই ইহার কারণ। এই হীনতাবোধ ত্যাগ করিয়া যদি বাঙালাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার আন্দোলন করা যায়, তবে সাফল্যলাভ সুনিশ্চিত।”

প্রফুল্লবাবুর বক্তৃতার পর সর্বাধ্যক্ষ মহাশয় নির্দেশ দেন যে, পরবর্তী অধিবেশনেও এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা চলিবে। এই নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী অধিবেশনেও “বাঙালা ভাষার” ভারতে রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা” বিষয় আলোচনা হয়। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বক্তৃতা করেন। তিনি প্রফুল্লবাবুরের যুক্তিরই সমর্থন করেন। তৎপরে বিভিন্ন অধিবেশনে অধ্যাপক অমলাচরণ বিনোদ্যন, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র-কৃষ্ণ লাহা প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়া প্রফুল্লবাবুরের অনুকূলেই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সে সময় রবি-বাসরের সদস্য ছিলেন। তিনি এই সকল আলোচনায় বিশেষ মন্থ হন এবং মন্তব্য করেন যে, রবি-বাসরের এই মূল্যবান আলোচনার বিষয় অন্য প্রদেশবাসীদের গোচর করা একান্ত কর্তব্য। তাহারই নির্দেশমত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন ইংরাজী ১৯৩৮ সালের মে মাসের “মডার্ন রিভিউ” পত্রিকায় “A National Language for India” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধে প্রফুল্লবাবুরের বক্তব্যটিই প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছিল।

“বাঙালা ভাষার রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়ার দাবী” সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ১৯৪৫ সালের ১৯শে মাঘ তারিখে, মনীষী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ভবনে সাহিত্যসেবকগণের যে পরামর্শ সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে প্রফুল্লবাবুর বলেন যে, “হিন্দুস্থানী নতুন হৈয়ারী ভাষা। এইরূপ হৈয়ারী ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না—ইহা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। ভারতের কোন জীবন্ত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে। হিন্দী ও বাঙালা—এই দুইটি সেই দাবী করিতে পারে। এখানে সাহিত্যের সম্পদ দেখিতে হইবে। এই হিসাবে বাঙালার দাবী সর্বাগ্রগণ্য। * * * * * হিন্দী কর্তৃক পরাজিতের মনোভাব লইয়া কাজ করিলে চলিবে না। বাঙালাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা আমাদেরকে করিতে হইবে এবং অনুবাদ দ্বারা উহাকে আরও সম্মানজনী করিতে হইবে। বাঙালা ভাষার যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী এতদিন ধরিয়া আমরা অনবধানভাবে করিয়া আসিতেছিলাম, এখন সজ্ঞানে ও ঐকান্তিকতার সহিত তাহার বিজয় অভিযান করিতে হইবে।”

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রকাশিত “বাঙালা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী” পুস্তিকার প্রফুল্লবাবুর বলিয়াছেন— “ফরমায়ের দিয়া রাষ্ট্রভাষা তৈয়ার হয় না। রাষ্ট্রভাষা হইবে একটা পূর্ণাঙ্গ ভাষা। বাঙালা ও হিন্দী সেই দাবী করিতেছে। হিন্দীর চেয়ে বাঙালার দাবী অনেক বেশী। কেবলমাত্র জনসংখ্যার উপর ইহার যোগ্যতা নির্ভর করে না। কেহ কেহ মনে করেন যে, আমরা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত নই বলিয়াই অন্যান্য ভাষার সম্পদ সম্বন্ধে উদাসীন। ইহা কতক সত্য বটে, কিন্তু বাহারা হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চান, তাহাদের হিন্দী সম্বন্ধে অজ্ঞানতা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য হই। * * * * * আমরা সাহসের সহিত বলিব, বাঙালাই রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত ভাষা—ইহা ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না।”

বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির এক সাধারণ অধিবেশনে, ভবানীপুরে আশুতোষ কলেজ হলে, ১৯শে বৈশাখ, ১৩৪৮ তারিখে, প্রফুল্লবাবুর তাহার বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে বলেন— “কংগ্রেস যাহাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা হিন্দী নহে, হিন্দুস্থানী। হিন্দী ওয়ালা ও উর্দু ওয়ালাদের মধ্যে একটা আপোষ-রফার চেষ্টা হিসাবেই মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে এই প্রস্তাব বাহির হয়। অথচ উক্ত হিন্দুস্থানী নামধের ভাষার না আছে কোন সাহিত্য না আছে কোন শব্দসম্ভার। উহা কোন ভাষাই নহে। সুতরাং সংঘর্ষ হিন্দী ও বাঙালার মধ্যে; হিন্দুস্থানী ও বাঙালা ভাষার মধ্যে। হিন্দী ভাষার দাবী চাপা পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ অবধি হিন্দুস্থানীর পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন। বাঙালাকে বাঙালা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবীতে দৃঢ় সংকল্প হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।”

এই অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং রায় বাহাদুর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাঙালা ভাষার ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী নানা যুক্তি সহকারে বিশেষ-ভাবে সমর্থনপূর্বক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কলিকাতায়, ২০শে বৈশাখ, ১৩৪৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে প্রফুল্লবাবুর সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন। তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল—“বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য ভাবের প্রাচুর্য, শব্দসম্পদ, লেখার বহুলতায়, ভাষাসম্পদে ভারতের অন্যান্য ভাষার মধ্যে বহুতর গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া এই সম্মেলন বঙ্গভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার একমাত্র উপযুক্ত ভাষা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেছে।” সাহিত্য-সেবক সমিতি বঙ্গভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবী লইয়া যে ধারা-বাহিক আলোচনা করেন তাহাতেও প্রফুল্লবাবুর বিশেষভাবে যোগদান করিয়া এই দাবী যুক্তিকর্তৃক সমর্থন করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাহিত্যনিষ্ঠা তাহাকে সাহিত্যসেবকগণের প্রতিও বিশেষ অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল। সাহিত্যিকগণের সামিধ্য তিনি সকল সময়েই কামনা করিতেন। বিগত চতুর্দশ বৎসরকাল ধরিয়া প্রফুল্লবাবুরকে অনিবার্য কারণ ব্যতীত কখনও রবি-বাসরের বৈঠকে অনুপস্থিত হইতে দেখি নাই। তাঁহার অকাল পরলোকগমনে এই সাহিত্য-বৈঠক যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা অপরূপ।

প্রফুল্লবাবুরের সাহিত্যালোচনা শ্রবণে সুদীর্ঘন মাত্রেরই মন্থ হইতেন। তিনি অতি নিষ্ঠুর সাহিত্য তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা করিতেন। বিরূপ সমালোচনা কালেও তাহাকে কখনও উগ্র ভাষা ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই। প্রফুল্লবাবুরের মধুর প্রকৃতিই তাঁহাকে সকলের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার স্মৃতি সহজে ভুলিবার নয়।



বাঁশবাড়ি

আচিন্ত্যকুমার মেনশস্ত

খোঁড়াগাছির মাঠে গাজনের মেলা বসেছে।

এবার লোকজন বিশেষ জমেনি, মাল-পত্রও বিশেষ কিছু নেই। তেলেভাজা দুর্গন্ধ পাঁপের, বিয়ে শানের খই আর শিল-পড়া কতক কাঁচা আম। কাগজের এবার বড় অভাব, ঘুড়ি-ফুরফুরি নেই একখানাও। মাটির পুতুল—কুকুর বেরাল, হাতি-ঘোড়া—সকলের এক রঙ, শুধু চোখ বা নাকের ডগা বা লেজের শেষ বোকাবার জন্যে কালোর দৃষ্টি একটা ফোটা বা আঁচড় কাটা হয়েছে। আছে কিছু চাঁচের ও বাঁশের জিনিস, বড়ি-চ্যাঙারি, খারা-খালুই। আর আছে হাড়িকুড়ি সরি-মালসা, কলকে-ধনুচি। নেই সেই গামছা, নেই বা কাঁচের চুড়ি।

পাকড়া গাছের তলায়ই বেশি ভিড়। আর বেশি গোলমাল। কাছেই কোথায় একটা ট্যামটোম বাজছে।

এগিয়ে গেলাম। শুনতে পেলাম একটা ছোট ছেলের কান্না। “আমি পড়ে যাব, আমি মরে যাব।” আকুল আফুট চোখে কাদছে সেই ছেলেটা। ছ-সাত বছর বয়েস, পেঁকাটির মত হাত-পা, কোমরের নিচে ছেঁড়া টোন আঁটা। বাসা থেকে খসে-পড়া না-ওড়া পাখির বাচ্চার মত অসহায়।

ব্যাপার কি? কাদছে কেন?

সবাই বললে, বাঁশবাড়ি হবে।

প্রথমটা বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম বাঁশ দিয়ে পিটবে

বুঁধি ছেলেটাকে, তাই কাদছে অমন অঝোরে। কিন্তু সবাই বললে, মার নয়, খেলা।

বাঁশবাড়ি করে আদালতে দখল নেয় শুনছি, তখনও নাকি ঢোল বাজে। বাঁশ নিয়ে আর যে কোন খেলা হয় দেখিনি তখনো।

“মাটিতে পড়ে নেবে তো বাঁশটা?” কে একজন জিগ্গেস করলে।

না এ সে মামুলি খেলা নয়। ওয়াকিবহাল কে একজন বললে, ভারি গলায়, “না, বাঁশটা বড়ো পেটের ওপর বসাবে, আর সেই বাঁশ বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে যাবে ছেলেটা, একেবারে ডগার ওপর। সেখানে ও বাঁশের মুখে পেটের ওপর চেপে ধরে মুখ নিচু করে ঝুঁকে পড়বে। আর, বড়োর পেটের ওপর বাঁশ ঘুরবে বন বন করে আর ছেলেটা হাত ছেড়ে দিয়ে চরাকর মত ঘুরপাক খাবে। আমি আগে আরো দেখেছি ওর খেলা।”

‘ঐ বড়ো বুঁধি?’

‘হাঁ, ওই মস্তাজ।’

শনের দাঁড় মত পাকিয়ে গেছে বড়োর শরীর, খুঁতনির উপর



“খেলা শুরু হোলো না—আগেই পরসা”

যারা তবু এসেছে সব যেন কেমন কাহিল চেহারা, ঢলকো, কিম-মারা। যেন কি একটা আতঙ্কের অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসেছে মরতে মরতে। চলায়-বলায় ফুঁত নেই এক রাত। পরনের কাপড় কান হয়ে আসছে দিনে দিনে।

হলবেটে ক’গাছ দাঁড় রয়েছে উঁচিয়ে। বুকটা টিপলে মতন, পেটটা দ পড়া, হাতে পায়ের মাংসগুলো হাড়ের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। বিকেলের রোদে কোঁচকান চোখ দুটো তার চকচক করছে—সেইটুকুই তার যা-কিছু সাহস আর অভিজ্ঞতার চিহ্ন।

গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই। টিনের একটা ফুটো মগ নিয়ে কাজ সবাইর কাছ থেকে পরসা কুড়োচ্ছে।

‘খেলা সদু হ'ল না, আগেই পরসা?’ কে-একজন ধমকে লো।

‘খেলা হয় কি করে? বাশে যে চড়বে সেই তো কে’দে লাভল করছে। ‘পড়ে যাব, মরে যাব’—এ কেমনতর কামা? পড়েই দ যান তব কে আসতে বলিছিল তোদের খেলা দেখাতে?’

ছেলের কান্নাতে মস্তাজের জুকেপ নেই। ‘হবে, হবে, সদু, ছেছে এখনি।’ সবাইকে মাসবাস দিয়ে সে শূন্য মগ দখিয়ে দৌঁধিয়ে ঘূঁবে যায়।

‘খেলা তো আর ওর’ নতুন দেখাচ্ছে না, তবে তব কান্নাচ্ছে কেন ঐ ছেলো?’ জিগগেস করলাম পাশের লোককে।

‘এতদিন ও ছিল না। ও নতুন।’

‘তবে কে ছিল এতদিন?’

‘ওর দাদা—’

‘না, না, ঐ ছেলোটাও দেখিয়েছে দু’-একবার।’

‘কে আর একজন উঠল প্রতিবাদ করে। ‘সরস্বতী’

পঞ্জার সময় তে’তুনের ইস্কুলের মাঠে এই

ছেলোটা’ই উঠা’ছিল বাশ বেয়ে। এখনো তত রসত

হমান-বেয়ে বেয়ে চুড়ায় উঠে আসাটাই সেদিনকে

ওর খেলা ছিল। আসল খেলা দে খি যে ছি ল

আবিশ্যি ওর দাদাই। আর হাই বলুন আসল কসরৎ

যে বাশ বেয়ে উঠে আসে তার নয়, যে বাশটা পেটের

ওপর চেপে ধরে রাখে তার—মস্তাজের।’

‘কই ওর দাদা?’

‘কে জানে!’

টুন করে একটিও

আওয়াজ হল না মস্তাজের মগে। খেলা না দেখে কেউ

পরসা দিতে রাজি নয়।

জনন্যোপায় হয়ে মস্তাজ ছোট ছেলোটার কাছে এগিয়ে

গেল। পিছনে দেয়াল, সামনে বুনো কুকুর তাড়া করেছে এমনি

ভয়ে চর্ণাচর্ণে উঠেছে ছেলোটা। ‘না, না, আমি না। আমি পড়ে যাব, আমি মরে যাব—’

বাপ একবার তার হাত ধরে টান মারলো হেঁচকা। মারবার জন্যে হাত ওঁচালো একবার।

‘হেঁচ, ভয় দেখ না ছেলের। তোরা বাপ কত খেলা দেখিয়ে

এল কত জোয়ান জোয়ান ছেলে নিয়ে, আর তোকে কিনা সামলাতে

পারবে না, পুঁচকে একরসি ছেলে।’ বাপের হয়ে ছেলেকে কেউ

কেউ তিরস্কার করলে।



‘পেটোপটে এক’

মস্তাজ একটু হাসল। অনেক অভিজ্ঞতায় মসৃণ, ধারালো সেই হাসি।

‘পড়েই যদি যাস, বাপ তোকে দু’ হাত বাড়িয়ে লুফে নিতে পারবে না? নে, উঠে আর।’

যে লোকটা ট্যামটোম বাজাচ্ছিল সে আরো জোরে কাঠির বাড়ি মারতে লাগল।

কিন্তু ছেলে কিছুতেই রাজি হয় না। সকল কোলাহল ছাপিয়ে তার কামাই প্রবল হয়ে ওঠে।

খেলা আর জমল না তা হলে। দু’-একজন করে খসে পড়তে লাগল।

মস্তাজ অসহিষ্ণু মত গলা উঠিয়ে তাকালো একবার ভিড়ের বাইরে। কতক্ষণ পরে কে আরেকটা ছেলে দুর্বল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কাছে এসে দাঁড়ালো। হাতে একটা আধ-খাওয়া পিঁপির।

‘ওই ওর দাদা।’ জানা লোকেরা হৈ-হৈ করে উঠল।

বছর দশেকের রোগা-পটকা ছেলে। লিকলিকে হাত-পা। গায়ে একটা ছেঁড়া পাতলা কাঁথা জড়ানো। চৌটে’র চার পাশে, গালে ও বুতী’র নিচে কাটা খা, একটা চুটনে মাছি বারে বারে উড়ে এসে বসছে তার নাকের ডগায়। দুটো ভাসা ভাসা চোখে কেমন একটা শূন্য অর্থহীন চাহনি।

ছোট ভাই’র কাছে এগিয়ে গেল। বললে, ‘তোকে কাদিতে হবে না আবু, আমিই খেলা দেখাব।’

আবু চুপ করল। চোখের জল শুকিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

আরো ঘন হয়ে এল জনতা। ট্যামটোমের বাজনা আরো টাটিয়ে উঠল।

কামর ও হাট’র মাঝে যেটুকু কাপড় ছিল ভুর করে তাই আরো খাটো ও আঁট করে নিল মস্তাজ। বাঁশটাকে বসাল পেটের উপর, নাই-কুন্ডলের গর্তে। কি যেন বলল বিড়বিড় করে। গোধহয় বিসমিল্লার নাম করলে। বাঁশটা একবার কপালে ঠেকাল। গায়ে হাত বলিয়ে মূখের খুব কাছে টেনে এনে কি বললে তাকে।

এমন করতে কেউ তাকে দেখিনি কোনো দিন। এতটা চলবিচল হয়ে যাওয়া।

‘চলে আর, ইন্তাজ।’ ডাক দিল সে বড় ছেলেকে।

ইন্তাজ মুহূর্তে গায়ের কাঁথাটা খুলে ফেলল।

কে যেন হঠাৎ পেটের মধ্যে টেটা ঢুকিয়ে দিল—এমনি

আঁকে উঠলাম। ছেলোটর বকে-পেটে টানা-টানা ঘা, কোথাও দগু, দগু করছে, কোথাও খোসা পড়েছে, কোথাও বা পুঁজ উঠেছে দলা পাকিয়ে। সেই চপ্টনে মাছিটা হঠাৎ আর কটা গুয়ে মাছি ডেকে এনেছে। যখন ঘুরে দাঁড়াল ইন্তাজ, তখন খানিক স্থানিত পেলাম। কেন না পিঠটা ওর মসৃণ, নিদাগ।

‘কেমন করে হল এই ঘা? এতগুলি লা?’ জিগ্গেস করলাম জনতাকে।

কেউ কেউ জানে দেখলাম। দোল পূর্ণিমার দিন চাঁপালর বাবুদের বাড়ীতে খেলা দেখাবার সময় বাঁশের মাথা থেকে পড়ে যায় ইন্তাজ। বড়ো তার কতদিন আগে ম্যালেরিয়া থেকে উঠেছে, আমানি পালাও নাকি জোটাতে পারেনি তারপর, তাই বাঁশটাকে বাগ মানিয়ে রাখতে পারেনি পেটের মধ্যে। যেখানে পড়ল ইন্তাজ সেখানে ছিল খোয়া আর খোলামকুচি, বকে পেট ছড়ে কেটে একাকার হয়ে গেল। সেই থেকেই ছেলোটো একটু কাবু হয়ে পড়েছে।

‘মাতাটা গায়ে জড়িয়ে নিবি না?’ জিগ্গেস করল মন্তাজ।

‘না।’ দু’হাতে ধূলো মেখে ইন্তাজ লাফিয়ে উঠল বাপের

পেটে, বাঁশ ধরে। দীর্ঘ অভ্যাসে মসৃণ, তরতর করে লেয়ে উঠতে লাগল। দু’হাত দিয়ে পেটের উপর বাঁশটা শক্ত করে চেপে ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মন্তাজ।

‘দেখুক, দেখুক এবার আক্সাছ। এত ঘায়ের যন্ত্রণা নিয়েও তার দাদা কেমন রাজি হল খেলতে।’

আক্সাছ বা আকু খাড়ু উঁচু করে চেয়ে আছে দাদার দিকে। এখন আর তার ভয় নেই। সে এখন টামটেটমি বাজাতে পারে। কিংবা মগ নিয়ে ঘুরতে পারে পর-পর।

বাঁশের চড়ার কাছে এসে ইন্তাজ একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল। পেটের কাছে কাপড় জড় করে বাঁশের মুখটা ঠিক করে বসাবার জন্যে। তখন তার ঘা-গুলি আরেকবার স্পষ্ট করে দেখা লাগল। অসহ্য লাগল। ভাললয়, চলে যাই।

কে একজন বাধা দিল। বলল, ‘তার পর যখন ব্যাঙের মত হাত-পা ছড়িয়ে ঘুরতে থাকবে শুনো, তখন ওসব ঘাটা কিছু দেখা যাবে না।’

‘বাঁশটা কি বাপ হাতে করে ঘোরাবে নাকি?’

‘কতক্ষণ হাতে করে ঘুরিয়ে বাঁশটা পেটের উপর রাখবে, তারপর মোড় খেয়ে-খেয়ে আপনিই বাঁশটা ঘুরবে পেটের গর্তের মধ্যে। সেই তো আসল খেলা।’

‘নইলে বাঁশ পুঁতে তার ওপর ডিগ্‌বাজি খাওয়াটা তো সেক্ষেত্রে। তাতে আর বাহাদুরি কি।’ আরেকজন ফোড়ন দিল।

ততক্ষণে বাঁশ ঘুরতে শুরু করেছে মন্তাজের দু’হাতে। চোট খাবার পর ছেলোটো নিশ্চয়ই খুব হালকা হয়ে গেছে, ঘুরছে ক্রমবর্ধিত মত। হাত পা ছড়িয়ে। ঘা তো বোঝাই যাচ্ছে না, বোকা যাচ্ছে না ওটা কোনো মানুষ না বাদড় না চামাচকে!

এতক্ষণ আকাশের দিকে মুখ করে ছিলাম, এবার তাকালাম জন্তাজের দিকে যখন সে হঠাৎ ঘুরল বাঁশের প্রান্তটা পেটের খাঁজের মধ্যে গুঁজে দিলে। তারপর হাত দিল ছেড়ে। ছেলের

পেটের চেয়ে বাপের পেটটাই বেশী দেখবার মত। ছেলের পেটে ঘা, বাপের পেটে প্রকাণ্ড খোদল। বাঁশটা গ্রহণ করবার জন্যে মন্তাজের পেটে এ সাময়িক গর্ত তৈরী হয়নি, যেন অনেক দিন থেকেই এ গভীর গহ্বরটা সেখানে বাসা বেঁধে আছে। সেই গর্তটা ঘটে ঘটে ঘুরছে না জানি কোন জন্মলভ মস্তনদন্ড।

বাঁশের শেষ প্রান্তটা কত দূর পর্যন্ত চেপে, তেলে দিয়েছে পেটটাকে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হাচ্ছিল না। পেটে-পিটে এক, এমনতে দেখেছি অনেক। এখন দেখলাম পেট বলে কিছুই নেই আর মাঝখানে, বাঁশের মুখটা সটান পিঠের উপর বসানো, সামনের দিক থেকে। পেটের সব নাড়িভূঁড়ি শুকিয়ে কুঁকড়ে জ্বাখায় সরে গেছে, মেরুদণ্ডের হাড়ের সংযোগ, তোকর খেতে-খেতে খটাখট শব্দে চলছে বাঁশের ঘুরনি।

প্রতি মূহুর্তে যা ভয় করছিলাম। ইন্তাজ ফসকাল না, মন্তাজই টলে পড়ল। শেষ মূহুর্তে দু’হাত বাড়িয়ে ছেলোটাকে লুফে নেবার চেষ্টা করছিল মন্তাজ, কিন্তু যতই ফুরকুরে



‘তাকিয়ে

আছে শূন্য মগের দিকে’

পাতলা হোক, বাপের দুর্বল বাহু! আশ্রয় দিতে পারল না ইন্তাজকে।

‘অজকাল বারেবারেই বড়োর কেবল ফসকে যাচ্ছে—’ কে একজন আপত্তি করে উঠল।

মন্তাজ দু’হাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে আছে উবু হয়ে। দোড়-খাওয়া পাকভেড়ি ঘোড়ার মত ধুকছে, আর ডাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে শূন্য মগের দিকে।

তারি জন্যে হয়তো খেলা শুরু হবার আগেই মগটা সে ভুলে ধরেছিল সবাইর কাছে। কয়েকটা পরস্যা আগে পেলে সে কিছুটা খেয়ে নিতে পারত, এক-আধখানা পাইপ কি চামড়ার মত শুকনো দু’একটা ফলদ্রুই। পেটে কিছু পড়লে পেট হয়তো এক চোটেই পিঁঠ হয়ে পড়ত না, খুঁচরে বাহু দু’টোতেও একটু জোর আসত। অভ্যাসে সব কিছুই সওয়ানো যায়, শুধু বুঝি

(১৭ পৃষ্ঠায় প্রস্তুত)

দূর দ্রাচ্যে ৭ ভারতীয় শিল্পের প্রভাব ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

খৃষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন ধারা প্রাচ্য এশিয়ার নানা দেশে প্রসার লাভ করে। সমুদ্রপথে ভারতের বণিকসম্প্রদায় বহুপূর্ব থেকেই শ্যাম, ইন্দোচীন যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে বণিজ্যের জন্য যাতায়াত আরম্ভ করে। এ সমস্ত অঞ্চলের সভ্যতা সেকালে অপেক্ষাকৃত অনূন্নত ছিল এবং সেখানে কোন ক্ষমতামালী রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে হয় না। এই কারণেই ভারতীয়গণ অল্পকালের মধ্যেই সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও ইন্দোচীনে উপনিবেশ স্থাপন ও শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য গঠন করতে সমর্থ হন। গুপ্ত যুগের পূর্বেই যে সব হিন্দুরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যে ইন্দোচীনে কম্বুজ ও চম্পা এবং দ্বীপময় অঞ্চলে শ্রীবিজয়রাজ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কম্বুজ রাষ্ট্র বর্তমান কম্বোডিয়া ও শ্যাম নিয়ে গঠিত হয়। চম্পারাজ্য আনাম প্রদেশের দক্ষিণাংশ এবং শ্রীবিজয় সুমাত্রার পালেম্বাং প্রদেশে অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে যবদ্বীপ ও মলয় উপদ্বীপের কতকাংশ শ্রীবিজয়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সমস্ত রাজ্যে হিন্দু সংস্কৃতিই ছিল প্রাচীনকালে স্থানীয় সভ্যতার মূল উপাদান। যতদিন ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ় ছিল, ততদিন ছিল এই সমস্ত রাজ্যের গৌরবময় যুগ। এই যুগের যে সমস্ত শিল্প-নিদর্শন আছে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় শিল্পের ধারা রক্ষা করেছে। চম্পা, কম্বুজ, শ্যাম ও যবদ্বীপের প্রাচীন হিন্দু মন্দির-গুলির মধ্যে শৃংখ, যে হিন্দু ধর্মের প্রভাবেই পাওয়া যায় তা নয়। তাদের উপাদান, গঠন পদ্ধতি, মন্দিরগাঠে প্রস্তরের কারুকার্য, ভাস্কর্য প্রভৃতিতেও সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় শিল্পের ধারাই অনুসৃত হয়েছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র শিথিল হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই শিল্পের অবনতি ঘটে। স্থানীয় সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত না হওয়ায় তা ভারতীয় সভ্যতাকে অঙ্গীভূত করে নিয়ে কোন নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টিও করতে পারে নাই।

কিন্তু মধ্য এশিয়া ও চীন দেশে ভারতীয় কৃষ্টির যেসব ধারা পৌঁছায় তা স্থানীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত হয় এবং নতুন সংস্কৃতির গঠনে সহায়তা করে। তার কারণ চীন দেশের সভ্যতা ছিল অতি উন্নত ধরনের, খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই সে দেশের শিল্প ও সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে দেশের ধর্ম ও দর্শন সমস্ত দেশবাসীর মধ্যে প্রসারলাভ করে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে যখন ভারতবর্ষের সঙ্গে চীন দেশের প্রথম যোগসূত্র স্থাপিত হয়, তখন চীনারা ভারতীয় সভ্যতার সেই সমস্ত ধারাই গ্রহণ করল যা তাদের অতি নতুন ও প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়েছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকে চীন দেশে ভারতীয় সভ্যতার ধারা পৌঁছায় স্থলপথে। এ পথ আফগানিস্তান, বাহ্যক (বাল্খ), মধ্য এশিয়ার নানা জনপদ—কাশগর, খোটাং, কুচী প্রভৃতি হয়ে চীন দেশের উত্তরাংশে শানশি ও হোনাং প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হতে ভারতীয় বণিকসম্প্রদায় খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই মধ্য এশিয়ার নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। পরে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ক্রমশঃ সেসব দেশে যাতায়াত সুরু করেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে বৌদ্ধ ধর্ম চীন দেশে প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও আচার্যদের চেষ্টায়

আফগানিস্তান হতে চীন পর্যন্ত সমস্ত দেশেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গুপ্ত যুগের পূর্বেই এই সমস্ত দেশে একটি বিরাট আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্কৃতির মূল উপাদান ছিল ভারতীয় সভ্যতা। স্থানীয় সভ্যতার ধারাও একে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের ধারাও মধ্য এশিয়ার পথে চীন দেশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। খৃষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকেই বৌদ্ধ ধর্মকে অবলম্বন করে ভারতে একটি উন্নত ধরনের শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। এই শিল্পের দুটি প্রধান অবদান হচ্ছে স্তূপ ও চৈত্যা-বিহার। চৈত্যা-বিহারগুলি গৃহ-মন্দির বললেও ভুল হয় না। কারণ এ শিল্প পর্বত গাঠের প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম গৃহা অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। একটি প্রশস্ত গৃহায় চৈত্যা স্থাপিত হত এবং সেই গৃহায় পরদিনে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সম্মিলিত হতেন। এই চৈত্যা-গৃহায় নিকটে পর্বত-গাঠে আরও অসংখ্য গৃহা নির্মিত হত। সেই গৃহাগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হত। তারা সেখানে নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও অধ্যয়ন কালাতিপাত করতেন। এই ধরনের গৃহা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকেই নির্মিত হতে থাকে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গৃহা দেখতে পাওয়া যায় বিহার প্রদেশে বরাবর পর্বতে। এই গৃহার নাম 'লামাশ ঋষির গৃহা'। এখানেও ভিক্ষুরা বাস করতেন। পরবর্তী যুগে ভাজা, নারিক, খর্ডাগারি প্রভৃতি স্থানেও এই ধরনের গৃহা-মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। এই শিল্পের চরম উন্নতি সাধিত হয় গুপ্ত যুগে—তার প্রধান নিদর্শন পাওয়া যায় অজন্তায়। প্রথম যুগের গৃহাগুলির মধ্যে কোন সঙ্কল্পই বৈশিষ্ট্য না থাকলেও পরবর্তীকালে এইগুলিকে অবলম্বন করে নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টি চলল—গৃহার মধ্যে নানা কারুকার্য, গৃহার গাঠে চিত্রাঙ্কন, প্রস্তরে নানা মূর্তির কল্পনা। এই চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের চরম পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় অজন্তার গৃহায়। বৌদ্ধ শিল্পের এই সমস্ত ধারাই মধ্য এশিয়া ও চীন দেশ পর্যন্ত প্রসারলাভ করে।

মধ্য এশিয়ার পথে হিন্দুকুশ পর্বতের অন্তঃপাতী বামিয়েন নামক স্থানে এই বৌদ্ধ শিল্পের যেসব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা ভারতীয় শিল্পের ধারাই অনুসরণ করে। এই স্থানে প্রাচীন যুগের গৃহা-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। গৃহা-মন্দিরের প্রাচীর চিত্রের কতকাংশ এখনো সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় নাই। সেই চিত্রগুলি অজন্তার প্রাচীর চিত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তার বিষয়বস্তু, পরিকল্পনা ও রচনাভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে অজন্তার অনুরূপ। এই সমস্ত গৃহার নিকটে পর্বতগাঠে কতকগুলি বিরাট বৃক্ষমূর্তি ক্ষোদিত হয়েছিল। এই মূর্তিগুলির মধ্যে কতকগুলির উর্ধ্বতা প্রায় ১০ ফুট। এ ছাড়া আরও অনেক বৃক্ষমূর্তি এ অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। এগুলিতে যে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভাস্কর্যের ধারা অনুসৃত হয়েছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ভারতীয় শিল্পের এই বিশিষ্ট ধারাকে Indo-Greek Art এই আখ্যা দেওয়া হয়। কারণ এর মধ্যে একটি বিশিষ্ট গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পঞ্জাব প্রদেশে যে সমস্ত গ্রীক স্থানীয়ভাবে

বসবাস করত তাদের মধ্যে অনেক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। খুব সম্ভব তাদের হাতেই এই নতুন শিল্প পদ্ধতি গড়ে ওঠে। এই শিল্প পদ্ধতির চরম বিকাশ হয় কুশাণ যুগে—খৃষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকে। এই কারণেই বামিয়ানে এবং মধ্য এশিয়ার নানাস্থানে, এমন কি চীনের হোনান প্রদেশে ভাস্কর্যের এই বিশিষ্ট রচনাশৈলীর নিদর্শনই বেশী পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে, গুপ্ত যুগে গ্রীকপ্রভাবমুক্ত বিশুদ্ধ ভারতীয় ধারাও যে, এই সব অঞ্চলে প্রসারলাভ করেছিল তারও নানা প্রমাণ পাওয়া যায়।

খোটাণ ও কাশগরের নিকটবর্তী নানাস্থানে বৌদ্ধ যুগের ধ্বংসস্তুপ হতে প্রাচীন কালের নানা শিল্প নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। নানা বৌদ্ধমূর্তি, চিত্রিত পট, ভারতীয় লিপিতে লিখিত নানা পুঁথি প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ সংস্কৃতির সাক্ষ্য দেয়। বৌদ্ধ-মূর্তি হতে ভারতীয় ভাস্কর্যের যে বিশিষ্ট ধারার খোঁজ পাওয়া যায় তা ইন্দো-গ্রীক। অনেক স্থলে এরূপ অনুমানও করা হয়েছে যে, অনেক মূর্তির মূল উপাদান তক্ষশীলা হতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খোটাণের নিকটবর্তী দাম্পান উইলিক্ নামক স্থানে প্রাচীন যুগের কতকগুলি বৌদ্ধ গুহা আছে। এই গুহাগুলির প্রাচীর চিত্রের মধ্যে বামিয়ানের প্রাচীর চিত্রের মতই ভারতীয় ধারার খোঁজ পাওয়া যায়। চিত্রের পরিকল্পনায় দুই এক স্থানে পারসিক প্রভাব চোখে পড়লেও মূল ভারতীয় প্রভাব অক্ষর রয়েছে। বিষয়বস্তু ও রচনা নৈপুণ্য হতেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। এই গুহাগুলিও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নীরব সাধনা, অধারন ও অধ্যাপনার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হত। প্রাচীন যুগের চীনা পরিব্রাজকেরা এ অঞ্চলে আরও অনেক গুহা দেখেছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে চীনা পরিব্রাজক, হিউয়ান-সাং খোটাণের পথে স্বদেশে ফিরে যান। তিনি বলেছেন—“ইয়ারকন্দের দক্ষিণে যে উচ্চ পর্বত-শ্রেণী আছে তা ঘন বনানীর দ্বারা আবৃত। এই পর্বতমালা হতে নানা স্রোতস্বতী জল বহন করে আনে। সেই সব পর্বতের ধারে বনানীর অন্তরালে কিংবা স্রোতস্বতীর নিকটবর্তী স্থানে অনেক গুহা আছে, আর সেই সব গুহা হচ্ছে বৌদ্ধ সাধকদের নিজস্ব সাধনার স্থান।” এই সব গুহার সম্ভাবনা এখনো পাওয়া যায়নি। এ সব গুহাও যে মধ্য এশিয়ার অন্যান্য গুহা-মন্দিরের মতই ছিল তাতে সন্দেহ নাই।

খোটাণ হতে যে পথ চীনের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছে এই পথের উপরে দাম্পান-উইলিক্ হতে আরও পূর্বদিকে মিয়ান নামক স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অনেক ধ্বংসস্তুপ আছে। এই সমস্ত স্তুপ হতে প্রাচীন যুগের যে বৌদ্ধশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে তা খোটাণ অঞ্চলের প্রাচীন শিল্পের সঙ্গে তুলনীয়। এই নিদর্শনগুলি দুটি বিশিষ্ট যুগের। কতকগুলি হচ্ছে গুপ্ত যুগের অনাগুলি পরবর্তীকালের, খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকের। প্রথম যুগের নিদর্শনগুলির মধ্যে ইন্দো-গ্রীক এবং বিশুদ্ধ ভারতীয় শিল্পপদ্ধতির প্রভাব বর্তমান। পরবর্তী যুগের শিল্প চীনা ও তিব্বতী প্রভাবেই, অনুপ্রাণিত।

মধ্য এশিয়ার উত্তরাঞ্চলে কুচী প্রদেশেও ভারতীয় শিল্পের প্রভাব দেখা যায়। কুচীর নিকটবর্তী কিজিল নামক স্থানে বৌদ্ধ যুগের অনেক গুহা-মন্দির আছে। এই গুহা-মন্দিরগুলিকে কুচী ভাষায় ‘মিং উই’ বলা হয়। এ কথার অর্থ হচ্ছে ‘হাজার মন্দির’। স্থানে স্থানে এই সব গুহা-মন্দির যে সংখ্যক ঠিক ‘হাজার’ না হলেও অনেক বেশী ছিল তাতে সন্দেহ নাই। কিজিলের গুহা মন্দির প্রাচীরচিত্রের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে নানা দেশের প্রভাব বর্তমান। পারসিক, রোমক ও চীনা প্রভাব তাতে থাকলেও সে শিল্পের প্রধান অনুপ্রেরণা যে ভারতবর্ষ থেকে এসেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এ অঞ্চলে যে ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তা ইন্দো-গ্রীক রীতির অনুবর্তী।

ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা মধ্য এশিয়ার পথ বেয়ে মিলিত হয়েছিল চীনা সীমান্তে তুন-হোয়াং নামক স্থানে।

মধ্য এশিয়া হতে যে সব পথ চীনদেশে গিয়েছে তুন-হোয়াং তার সন্ধিস্থলে অবস্থিত। এ স্থান চীনা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও চীনযাত্রী নানা বিদেশী এখানে বসবাস করত। চীনযাত্রী বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও এখানে সাময়িকভাবে থাকতেন এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলত। এই সব কারণে তুন-হোয়াং-এ নানা বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তুন-হোয়াং পঞ্জীর নিকটে একটি ছোট নদীর ধারে অনুচ্চ পর্বতমালা আছে। এই পর্বতের নানা গুহা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আকৃষ্ট করে। নিভৃত সাধনার এরূপ উপযুক্ত স্থান আর বেশী ছিল না। সেই কারণে গুহাগুলি ক্রমশঃ বৌদ্ধ মন্দিরে পরিণত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকেই এই কাজ আরম্ভ হয় এবং সপ্তম-অষ্টম শতক পর্যন্ত চলে। অসংখ্য গুহা নির্মিত ও সুসজ্জিত হয়। প্রতি গুহা চিত্রে ও ভাস্কর্যে সুশোভিত হয় এবং সবসময়ে এক হাজার বৌদ্ধ মূর্তি নির্মিত হয়। চীনদেশে এ গুহাগুলি ‘হাজার বুদ্ধের গুহা’ (Caves of the thousand Buddhas) নামে পরিচিত। এত বড় বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান মধ্য এশিয়া বা চীনদেশের অন্যর ছিল না।

বৌদ্ধ শিল্পের ইতিহাসে এই গুহাগুলির স্থান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বহু বিভিন্ন ধারার সম্মেলনে যে কি চিত্রাকর্ষক চিত্র-কলা ও ভাস্কর্যের সৃষ্টি হতে পারে তার নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। গুহাগুলির প্রাচীর চিত্রে ভারতীয়, পারসিক, চীনা প্রভৃতি নানা ধারার সমন্বয় ধরা পড়ে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তিগুলির চিত্রার করলে তার মধ্যে বিভিন্ন রচনাশৈলীর প্রভাব দেখা যায়। ইন্দো-গ্রীক ও গুপ্ত যুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে চীনা ও তিব্বতী প্রভাবে রচিত নানা বুদ্ধ মূর্তি ও পটচিত্রও পাওয়া গিয়াছে।

এই বৌদ্ধশিল্পের ধারা উত্তর চীনে শানশি ও হোনান প্রদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। শানশি প্রদেশে ইউন-কাং ও হোনান প্রদেশে লুঙ-মেনে নামক দুটি প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে এ অঞ্চল বিদেশী রাজাদের হস্তগত হয়। তাঁদের প্রথম রাজধানী তা-তং-ফু নামক স্থানের অতি নিকটেই ইউন-কাং অবস্থিত। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নির্দেশমত ইউন-কাংএর পর্বতমালায় এই সময়ে বহু গুহা-মন্দির নির্মিত হয়। ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এ কাজে সহায়তা করেন। পর্বত গাড়ে বিরাট আকারের বুদ্ধ মূর্তি ক্ষোদিত হয়। অনেক মূর্তি প্রায় ৬০ হতে ৭০ ফুট।

লুঙ-মেনে হোনান প্রদেশে চীনের প্রাচীন রাজধানী লো-য়াঙ নগরের নিকটে অবস্থিত। খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে লুঙ-মেনের পর্বতমালায় নানা গুহা-মন্দির নির্মিত হয়। এ গুহাগুলিও ইউন-কাংএর গুহার ধরনের এবং প্রায় এই যুগে নির্মিত। ইউন-কাং ও লুঙ-মেনের ভাস্কর্যে দুটি বিশিষ্ট ভারতীয় ধারার প্রভাব দেখা যায়। একটি ইন্দো-গ্রীক পদ্ধতি, অন্যটি গুপ্ত যুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতি। সুদূর চীন পর্যন্ত পৌঁছেও এই দুই শিল্প তাদের বিশিষ্ট রূপ হারায় নাই। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে, ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তত্ত্বাবধানে এই সব বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছিল। তা ছাড়া খুব সম্ভবতঃ ভারতীয় শিল্পীরা প্রভুত লাভের আশায় এ সব দেশে যাত্রায়াত করত, পরবর্তীকালে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পাল যুগে বঙ্গদেশের অনেক শিল্পী বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের জন্য বিস্তৃত পর্যন্ত যেত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে অনীক নামক একজন বিখ্যাত নেপালী শিল্পী ভিক্ষুতে যান। পরে চীন সাম্রাজ্যের আদেশে তিনি চীনের রাজধানীতে যান এবং সরকারী শিল্প বিভাগের উচ্চতম পদে উন্নীত হন। তাঁর হাতের নানা কাজ চীনা শিল্পীদের চমৎকৃত করেছিল।

ইউন-কাং ও লুঙ-মেনে যে বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শন আছে সে শিল্প চীনারা অতি শীঘ্রই আপন করে নিয়েছিল। যদিও তাদের প্রাচীন জাতীয় শিল্প ছিল, কিন্তু এই নতুন ভারতীয় ধারা নিজস্ব করে নিয়ে তারা সেই শিল্পের পরিপূর্ণ সাধন করে। ফলে পরবর্তীকালের চীনা ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় নতুন নতুন সৃষ্টি সম্ভব (১৭ পৃষ্ঠার প্রস্তাব)



শিল্পাচার্য শ্রীমঙ্গলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত

ঘরাতপা

তপের তড়িৎ-সূত্রে একো গাণিত্য প্রেম আর প্রেম
অমোঘ মৈত্রীর মণ্ডিত চন্ডালেও বক্ষে টানে কে ও!
ধ্যানোন্মীল ধুবনেত্রে জাগে নবযুগের মৈত্রের।
এ ভারতে কার দৃষ্টি নির্নিমিত্ত আজ?

—গান্ধী মহারাজ।

অস্থিশীর্ণ কৃশতনু দুঃদীপ্ত কৃশানুসুন্দর
ত্যাগের সর্বস্ব পণে মহাভিক্ষু গুজ'র-শঙ্কর
কটিবাস মাত্র সাজে ত্রিশকোটি দরিদ্র-নির্ভর।
পরজীবী গৃধ্রদের কে বাঁহছে লাজ?

—গান্ধী মহারাজ।

কৃত্রিম লক্ষহীন লক্ষপ্রাণে ঋতবাক্য যার
তিলে তিলে অলক্ষিতে অশ্লিষ্টে করিছে সঞ্চার,
শৃঙ্খলে সংগীত হানি' বন্দী গাহে কদনা ডাহার।
সুপ্তচিত্তে কার বাণী সমুদাত বাজ?

—গান্ধী মহারাজ।

ক্লোশেরে অক্লোশে জিনি' অপ্রেমের প্রেমের আগ্রহে
আলিঙ্গনে দানিল যে বেদনার সপ্নবিষে দহে,
শক্তি তার অপ্রহত জীবনযন্ত্রে অনন্ত নিগ্ৰহে।
মানব মর্জির এ কী সমুদ্র বিরাজ!

—গান্ধী মহারাজ।

শ্রীমঙ্গলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঁশবাজি

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

ক্ষুধাকেই বাগ মানানো যায় না। বাঁশ, বাহর, ছেলে, ঘা—সব
কিছুরই মূখোমুখি দাঁড়ানো যায় একমাত্র অভ্যাসের সাহসে—
শুধু ক্ষুধাটাই দুর্বিনীত, ক্ষমাহীন।

বাঁশটা ছিটকে পড়েছে দূরে। ইন্তাজ আরো দূরে। উখিত
গোলমালের মাঝে তার গোঙানিটা শুনতে পেলাম না। কেউ বললে,
হয়ে গেছে। কেউ বললে, বৃকের কাছটাতে ধুকধুক করছে এখনো।

কাছেই দাতব্য চিকিৎসালয়। যতদূর সম্ভব ঘায়ের ছোঁয়া
বাঁচিয়ে ইন্তাজকে ধরাধরি করে করা নিয়ে গেল ডাক্তারখানায়।
ঘটনাটা সদা-সদা ঘটেছে বলে দাতব্য চিকিৎসালয় একেবারে
ফিরিয়ে দিতে পারবে না হয়তো। নইলে এমনিতে ঘায়ের ওষুধ
নিতে এলে ফিরিয়ে দিত নিশ্চয়ই। কেননা প্রতিবারের ওষুধ নেবার
সময় একটানা করে পরসা দিতে পারত না মস্তাজ। যদি এক-আধ
আনা পরসা তার হাতে আসে, সে কি তা দিয়ে পেটের উপরের
ঘা শূন্যকাবে, না, পেটের ভিতরের ঘা?

মস্তাজ বসে আছে চুপ করে, গোঁজ হয়ে, কিন্তু ছোট ছেলে
আজ্ঞা কান্দছে একেবারে গলা ফাটিয়ে। ভাবলাম দাদার জন্যেই
দুখি তার কান্না।

কিন্তু মুখে তার সেই এক আতর্জন, এবার আরো
নিঃসহায় কণ্ঠে: 'এবার আমার পাল্লা। এবার আমার পাল্লা। আমি
নিঃশ্বাস পড়ে যাব, মরে যাব আমি—'

মস্তাজ কিছই বলল না। আকুর হাত ধরে চলল
হাসপাতালের দিকে।

'পড়ে যাব, মরে যাব।' কোন অদৃশ্য আজার কাছে শিশু-
কণ্ঠের কমল অঞ্চ কোন প্রতিকারহীন কাকুতি।

মস্তাজ কিছই বলছে না। পাথুরে মুখে নিম্বুর
নিঃশব্দতা। ছেলের কান্নার উত্তরে রেখাহীন কাঠিন্য। উপার কি,
তাকে খেতে হবে টো।

দূরপ্রাচ্যে ভারতীয় শিল্প

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হয়। বৌদ্ধ ধর্মকে চীনারা বিদেশী ধর্ম বলে অগ্রাহ্য মনে করে
নাই। সে ধর্ম হতে বহু প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে চীনা
মনীষীরা অভিনব চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। ভারতীয় শিল্পের
ধারাকেও চীনা শিল্পীরা অগ্রাহ্য মনে করেনি। বরং সে শিল্পের
অনুপ্রেরণা তারা যে নূতন সৃষ্টি করল তা সমস্ত জগতকে আজও
চমৎকৃত করে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে উত্তর চীন হতে ভারতীয় শিল্পের এই ধারা
জাপানে পর্যন্ত পৌঁছায়। ঐ সময়ে কোরিয়া হতে বৌদ্ধ ধর্ম
জাপানে প্রথম প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সঙ্গেই জাপানের
রাজধানী নারার নিকটে প্রথম বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠা হয়। এই
বৌদ্ধ বিহারের নাম হোরিয়ুজী। এই বিহারেই জাপানী চিত্রকলা
ও ভাস্কর্যের সর্বপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। এই মন্দিরে
যে চিত্রকলার নিদর্শন রয়েছে তা অজস্রতার চিত্রকলার অনুরূপ।
এই চিত্রকলার বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট দৃষ্টিতে পাওয়া যায় যে, যে সব
শিল্পীদের হাতে এর সৃষ্টি হয়েছিল তারা নিখুঁত ভারতীয়
চিত্রকলার সঙ্গে পরিচিত ছিল। সেই আদর্শই হোরিয়ুজীর চিত্রে
পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সে চিত্রকলার জাপানী হাতের কোন বিশিষ্ট
ছাপ নাই। চিত্রবিদ্যায় এই প্রথম দীক্ষা লাভ করবার অল্পকাল
পরেই জাপানী শিল্পী চিত্রকলার তার বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যের পরিচয়
দিতে পেরেছিল। বিদেশী শিল্পপদ্ধতি সে নিজস্ব করে নিয়েছিল।

নাটকীয় কথা

সাহিত্যিক জীবন মজুমদার -

নাটক সম্পর্কে আমাদের সাহিত্যে এ পর্যন্ত বিশেষ আলোচনা হয় নাই; বাংলা রঙ্গমঞ্চের আবির্ভাব ও তাহার প্রতিষ্ঠার কাহিনী, এবং প্রথম যুগের নাট্যকারগণের নাট্যরচনা-প্রয়াসের কথা অল্প-বিস্তর লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সে আলোচনার ঐতিহাসিক মূল্যই অধিক; সেই সংগে নাটকীয় প্রতিভার যে বিচার-বিশ্লেষণ থাকে তাহা খোল-করতাল সহযোগে একরূপ কীর্তন বলিলেই হয়। অথচ, বাংলা সাহিত্যে না হউক—বাংলা রঙ্গমঞ্চে নাটকের প্রতিপত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে; নাটকের আকৃতি-প্রকৃতি ও অভিনয়কলায় নবযুগের লক্ষণও দেখা দিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যিক রসসৃষ্টি হিসাবেও নাটকের একটা বড় মূল্য আছে—নাট্যকারের প্রতিভাও একটা বড় কবি-প্রতিভা; এজন্য নাটকের রসবিচার কোন আদর্শে করিতে হইবে সে বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা যে এখনও আমাদের মধ্যে জন্মে নাই, ইহাই আশ্চর্য। আমি এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ নাটকীয় রস-তত্ত্ব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব, এবং প্রসঙ্গতঃ আমাদের নাট্যসাহিত্য সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলিব।

নাটক সম্পর্কে সর্বপ্রথম কথা এই যে, ইহা উপন্যাস বা কাব্যের মত একা একা ঘরে বসিয়া উপভোগ্য করিবার বস্তু নয়; যিনি নাটক রচনা করেন তিনিও, কবি বা উপন্যাসিকের মত, স্বকীয় রূপনা লইয়া সন্মুখত থাকিলে চলবে না; কারণ, নাটকের রস-পরিণাম ঘটাইতে হইলে দর্শকমণ্ডলীর সহযোগিতা চাই; নাট্যকার, অভিনেতা ও দর্শক এই তিনে মিলিয়া নাট্যরস সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং তিনের মধ্যে দর্শক-চিত্তের আকর্ষণ-বিকর্ষণই নাটকের সব চেয়ে বড় নিয়ন্তা। এই-খানেই কবিকেও মনুষ্যসাধারণের সংগে একাত্মনে বসিতে হয়—ব্যক্তি-মানসের উৎকণ্ঠ ভাব, উৎকণ্ঠ চিন্তা বা স্বাধীন-স্বতন্ত্র দিব্যাদৃষ্টির অস্তিত্বমান ত্যাগ করিতে হয়; আর্টের ডিমোক্রেনী যদি কোথাও থাকে তবে সে এইখানে। যে-নাটক রঙ্গালয়ে দৃশ্যরূপে বহুজনের চিত্ত ধরন করিতে পারে না, তাহা নাটকই নয়—কেবল সাহিত্যিক রচনা হিসাবে তাহার যে মূল্যই থাকুক।

আমাদের দেশে প্রবন্ধুলে যে নাটক ছিল, আধুনিক নাটক তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু—আমি সংস্কৃত নাটকের কথা বলিতেছি। সেখানে “অপরিভোজ্যং বিদ্যাং” নাট্যাভিনয় সার্থক বলিয়া নির্দিষ্ট হইত না; যে “সহায় সামাজিকবর্ণ” তাহা উপভোগ্য করিতেন, তাহারা ছিলেন চিত্তপ্রকর্ষবান রসিক-মস্তজী, এবং সমস্ত তৎকালীন নাট্যশিল্পিগণ আধুনিক বঙ্গালয়ের মত সখ্যবর্ণের রঙ্গালয়ে ছিল না; রাজসভাভিত্তিক চিত্রশালাতেই তৎকালীন নাটকের অভিনয় হইত। অতএব সে নাটক ছিল বিশেষভাবে আনন্দোৎসাহিক; প্রাচীন যুরোপীয় নাটকের মত তাহা সর্বজনস্বার্থে ছিল না। ভারতবর্ষে নাটকের যেমন প্রসার ঘটে নাই এবং তাহার ধারাও নিরবচ্ছিন্ন হয় নাই, বোধ হয় এই কারণেই। ইহারও মূলে আছে ভারতীয় সাধনার বিশিষ্ট প্রকৃতি। ভারতীয় আদর্শের কাব্য-নাটক প্রভৃতিতে রসই ছিল মূখ্য, মানুষের জগৎ ছিল গৌণ।

মানুষেরই যে সখ্য-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সর্ব-মানুষের মধ্যে সংস্কাররূপে বিরাজমান—মানুষের সেই জীবনকে, তাহার সেই রক্তমাংসঘটিত হৃদয়সংবেদনাকে গৌণ করিয়া, সে নাটকে একটি নির্বিশেষ রস কল্পিত দৃষ্টি রাখা হইত। যুরোপে তাহা হয় নাই—সেখানকার প্রকৃতি-উপাসক জাতিদের পিপাসা ছিল অনারূপ; তাহারা প্রাকৃত মানবজীবনকেই নাটকের দৃশ্য করিয়াছিল, সুন্দর-বোনের অপরিস্রব সাধনার মনকে বা Intellectকে যতই প্রাধান্য দিক, নাট্যকলার তাহারা মানুষের জীবনের এই রহস্যকেই রসবস্তু করিয়াছিল। তাহার যে রস, সে রসের একমাত্র প্রমাণ এই যে, মানুষ মাতেই তাহাতে সাদ্রা দিবে—অন্ততঃ এক যুগের এক সমাজের সর্বল মানুষই সেই নাটকের অভিনয়দর্শনকালে নিজেরাও অন্তরে অন্তরে সেই অভিনয়ে যোগ দিবে; সেই যোগদানে যদি বাধা ঘটে তবে সেই নাটক যথার্থ নাটক হয় নাই। আধুনিক কালে যুরোপেও নাটকের সে রস-প্রমাণ আর নাই—এখন জীবনে দেহ অপেক্ষা মনই প্রাধান্য লাভ করায়, সে নাটক প্রকৃত জীবন-কলা—অর্থাৎ উৎকণ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত নহে; প্রাচীন রাসিককাল ও পরবর্তীকালের রোমাণ্টিক নাটকের রূপনা-গৌরব তাহাতে আর নাই। তথ্যটি অভিনয়-সাফল্যের প্রয়োজনে তাহাকেও কোন না কোন দিক দিয়া বহুজনাচিত্তের সহিত যোগ রক্ষা করিতে হয়—তাহারই কৌশল যিনি আয়ত্ত করিতে পারেন তিনিই নাটক রচনা করিয়া সাময়িক ব্যাতি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু তেমন নাটক স্থায়ী সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় না।

আমাদের দেশের প্রাচীন নাটকে যে রসকে দৃশ্য-কাব্যের আকারে রূপ দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা প্রাকৃতজনসেবা নয়; পরবর্তীকালে প্রাকৃত সমাজের প্রাকৃত রসপিপাসা মিটাইবার জন্য প্রাকৃত ভাষায় যে ধরনের নাট্য-লীলার প্রচলন হইয়াছিল, তাহা যেমন খণ্ডি নাটক হইতে পারে নাই, তেমনই সেই প্রাচীন দৃশ্যকাব্যের আদর্শে নাট্যভিনয়ও কল্যুপান পূর্বে একরূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তারপর, যখন যুরোপীয় নাটকের অনুকরণে নাটক অভিনয়ের সূত্রপাত হইল, তখন যে বস্তু বিশেষ করিয়া চমক লাগাইয়াছিল, তাহা একটা বহিঃসংঘটিত ব্যাপার। নাটক-রচনার যে আভ্যন্তরীণ প্রেরণা, তাহার নিত্যন্ত অভাব সত্ত্বেও—প্রকৃত নাট্যরস কি, সে বিষয়ে কিছুমাত্র চেষ্টা না জন্মিবার পূর্বেই—রঙ্গমঞ্চ, সাজসজ্জা ও বস্ত্রতাই যে সেকালের নাগরিক বাঙালী সমাজকে উত্তলা করিয়াছিল, তার প্রমাণ—বাংলা নাটকের অভাবে সংস্কৃত নাটকের ইয়াজী অনুবাদ করিয়া তাহারই অভিনয় করিতে আমাদের লোভ নাই। আধুনিক বাংলা নাটকের উৎপত্তিও যেমন তাহার বিকাশের ইতিহাসও তেমনই অনুধাবনযোগ্য। জাতির রস-সংস্কারের অনুকূল নয় বলিয়া, এবং বিলম্বিত ধরনের রঙ্গমঞ্চ স্থাপন আমাদের সামর্থ্যও অর্থনৈতিক জীবনের উপযোগী নয় বলিয়া, এই বিলাতী বহিঃসংকে বজায় রাখিয়া নাটকের উন্নতি সাধন বড়ই বিঘ্নসম্বলিত হইয়াছিল। খনির প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সখের নাট্যাভিনয় একটা প্রমোদ মাত্র—নাটক হিসাবে তাহা প্রাণহীন; কারণ, সে নাটকের অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চপ্রবাহী রসধারা সর্বজনহৃদয়ানুগামী হইবার

উপায়ও ছিল না—অবশ্যকতাও ছিল না; অতএব তাহা জাতির চিত্ত-সাগর-সংগমে মিলিত হইয়া নাটকের রসপ্রেরণাকে সার্থক করিয়া তুলিত না। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ এমনই একটা বিজ্ঞানবিরোধী, একটা ক্ষুদ্র নাগরিক সমাজের বাথ' প্রমোদ পিপাসার নিদর্শন-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ওরিকে তখন গ্রামে গ্রামে বাঙালীর খাঁটি বাঙালী-প্রাণ উন্মুক্ত আকাশতলে শামিয়ানা গাটাইয়া, ইতর-ভ্রমের বিরাট আসর জমাইয়া, সারারাত্রি জাগিয়া কৃষ্ণঘাটা ও নানা পুরাণ-প্রসঙ্গের গীতাভিনয় শুনিতোছে। সহরের বাবুরাও তাহাদের প্রতি কম আসক্ত ছিলেন না; নাটক ছিল তাহাদের একটা পোষাকী আমোদ মাত্র; পোষাকী কথাটা এখানে উভয় অর্থেই সত্য।

এই যে যাত্রাগান, ইহারই রসপিপাসা আমাদের জাতিদেরের বজাগত। এ রস-রসিকতা ঠিক জীবন-রস-রসিকতা নয়—ইহা ভাব-সে, শাস্ত্রবিশিষ্টাভিজ্ঞিত একরূপ আত্মবিভোরতার রস; এই রসই দুর্বলচিত্তের, কর্মবিমূঢ়, অলস, কল্পনাপ্রবণ জাতির জীবনে সর্বকালে নবীপেক্ষা উপায়ে হইয়া আছে; বাংলা সাহিত্যে, অর্থাৎ বাঙালীর মস্তজীবনের ধারাবাহিক কাহিনীতে—সেই আদিতেও যেমন, রাজকার এই অস্তেও তেমনই। এই গীতিরসই আর সকল রসকে পরাভূত করিয়া বাঙালীর চিত্রে অধিপত্য লাভ করিয়াছে। এইজন্য বাঙালী মহাকাব্য লিখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফল হইতে পারে নাই—তাহার মস্তজাগত বৈষ্ণব ভাবাবলুতা মহাভারতের কৃষ্ণজন্ম-নির্যাসকেও অনন্তদীর্ঘ ও তমোত্তীর্ণ নায়ক না করিয়া মহাভারতের চরিত্র করিয়া তুলিয়াছে, সেখানেও সেই যাত্রাগানের গীতিরসবস্তুরূপে পোষাকে—কেবলমাত্র লম্পশাটপটাবৃত হইয়া, মহাকাব্যের মাকর-প্রাংশুতা মাত্র লাভ করিয়াছে।

(২)

উৎকৃষ্ট নাটকের প্রধান লক্ষণ এই যে, নাটকের দৃশ্যবস্তু হইবে মানুষের জীবন; ভাবের বা চিন্তার জীবন নয়—নিয়ত অবর্তমান সৃষ্টিচক্রের ঘণ্টাবিগ-তাড়িত, লেহ-মন-প্রাণের উৎক্ষেপ-আক্ষেপময় গতি-শক্তিমান জীবন; অর্থাৎ সৃষ্টির নিগূঢ় উৎস হইতে যে দূর্ধ্ব প্রাণধারা প্রবাহিত হইয়া বিশ্বকে একটি বিরাট কর্ম-যন্ত্রশালায় পরিণত করিয়াছে—মানুষের মধ্যেও সৃষ্টির সেই প্রাণধারা যে-জীবনকে নিত্য জীভমান ও বেগবান রাখিয়াছে—সেই জীবনের রাগ-বিরাগ, আশা-দুঃখাশা, সুখ-দুঃখ, পাপপণ্যা প্রভৃতির ধন্দ্ব যে অপূর্ব রসরূপে মানুষের হৃদয়গোচর হয়—নিজেরই দেহমন-প্রাণের প্রবল অথচ অরণ্য ঘোরোস্ত্রেতে সে চাবিতে যে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, তাহা ভাব-জীবনে বা মনোজীবনে সম্ভব নয়; তাহা ওই প্রবর্তিময় জীবনেই সম্ভব; নাটকের রস এই রহস্যের রস, তাই নাটক এই জীবনেরই দৃশ্য-স্বরূপ। নাটক মাঝেই অভিনয়াক্ষর এই জন্য যে, উহার কোন অংশই চিত্র নয়, ভাব নয়, স্মৃতি বা ধ্যানের বিষয় নয়; তাহাতে সৃষ্টির সেই যদি গতিধারা; জীবন মূহুর্তে মূহুর্তে ঘটনাময় হইয়া উঠিতেছে, দশে ও কালে বিবর্তিত হইতেছে—একটা পরিণামমুখে দ্রুত ছুটিয়া লিতেছে। এই অর্থে ইহা দৃশ্যমাত্র—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভূতির ধাম। যখন আমরা নাটকভিত্তি দেখি—তখন জীবনের একটা ঘটনাখণ্ড পুণি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; নাটকের যে Illusion তাহা আর কিছুই—অভিনয়ের মধ্যে আমারাও প্রবেশ করি—সেই ঘটনার ধারায় আমরাও যেন 'ঘটিতে' থাকি। ইহাঙ্কেই বলে নাটকীয় বস্তুর 'সাধারণ-গীত'—যাহা অপরের তাহা সকলের হইয়া উঠে, আমার চেতনা মানব-ধারণের চেতনায় এক হইয়া যায়, একযোগে সকলের সঙ্গে এই ও একই প্রকার অনুভূতি, ইহার মূলে আছে বিশুদ্ধ মানবতার প্ররণা; সে প্ররণা কোন বিশেষ আদর্শ, বিশেষ চিন্তা, বিশেষ নৈভাবমূলক নয়; কারণ, তাহাতে মানুষে মানুষে ভেদ আছে—ভিন্ন গীত, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন বিশ্বাস, ভিন্ন সংস্কার ও ভিন্ন মতের বাধা বা আবরণ আছে; সেখানে বিশুদ্ধ জীবন-চেতনা যেমন থাকে না, তেমনই টানাখক জীবনের অবকাশ নাই—ভাবনা আছে, ভাবকতা আছে, বৈকল্প-বিকল্পের বিরোধজনিত নিক্কিয়তা আছে, নিস্তেজ প্রশ-স্তির ব্যাবিভক আছে; তেমন জীবন নাটকোপযোগী, অর্থাৎ 'দৃশ্য'

হইতে পারে না। এইরূপ জীবনের দৃশ্যও আধুনিক রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হইয়া থাকে; কিন্তু সে অভিনয়ের রস দর্শকের সুক্ষাৎ জীবনানুভূতির রস নয়—তাহাতে সে জীবনকে দেখে না, কতকগুলো ভাবনা-ধারণা-চিন্তাকে 'দৃশ্য'রূপে উপভোগ করে; এবং জীবন-চেতনার পরিবর্তে একরূপ মানস উত্তেজনা মাত্র অনুভব করে।

অতএব নাটক সার্থক হইতে হইলে তাহার উপাদান হইবে যে-জীবন—সে-জীবন স্থিতিশীল নয়—গতিমান, ভাবাত্মক নয়—কর্মাত্মক। সৃষ্টির প্রচণ্ড গতি-প্রবাহ—সেই বিরাট ঘণ্টাচক্রের আবর্তন-মুখে মানুষের জীবনও যে গতিবেগ লাভ করিয়াছে এবং ঘটনাস্রোতে তাহার যে অন্তর্ভুক্ত বিকাশ ও পরিণাম—কেবল তাহারই রস প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়গোচর করানোই নাটকের একমাত্র কৃতিত্ব। নাটকের সহিত উপন্যাসের তুলনা করিলেই এই ব্যাপারটি আরও স্পষ্টতরূপে লগ্না যাইবে। উপন্যাসে ঘটনার ধারা নাই, কাহিনীর পূর্ব-পর বিবৃতি আছে। সেখানে প্রত্যাশাও যেমন নিজেই ভাবনা-ধারণা ধ্যান-কল্পনার বলে এবং স্মৃতিগত অভিজ্ঞতা হইতে, জীবনের একটা রূপ গড়িয়া তোলে—তেমনই পাঠকও আপনার মানস-মুকুরে তাহার প্রতিচ্ছায়া ধরিয়া একটা কল্পনা-রস আশ্বাসন করিয়া থাকে—সে আশ্বাদনে জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার অবকাশ নাই—ভাবগত রসোপভোগ আছে, প্রত্যক্ষদর্শনের চিত্তমৎকার নাই। নভেলের জীবন কাহিনীগত জীবন—সে কাহিনী 'লিখিত' হইয়াছে, অর্থাৎ লেখক তাহা বলিয়া যাইতেছেন; তাহা আর ঘটিতেছে না—ঘটিয়া গিয়াছে; এবং লেখক তাহাকে নিজের ভাববৃষ্টির দ্বারা যেমন দেখিয়াছেন, তাহার আদ্যন্তেই যে অর্থ বলাইয়াছেন, সেই মত একটা রূপ তাহাকে দিয়াছেন। আমরাও যখন তাহা পাঠ করি তখন তাহার সেই ভাবনাকেই অনুসরণ করিয়া সেই পদীর ভিতর দিয়া তাহাকে দেখি—সে পদীর সঙ্গে আমাদেরও মনের পদীর নানা রং ও নানা নক্সার বস্তু সাদৃশ্য থাকে ততটাই তাহাকে স্বীকার করি। এই স্বীকার আমরা সেই চেতনা দিয়া করি না—যে চেতনা দিয়া আমরা নাটকের জীবনকে প্রত্যক্ষ অনুভব করি। তাই যখন কোন উপন্যাসকে নাটকের আকারে অভিনয়যোগ্য করিয়া তোলা হয়, তখন প্রায় দেখা যায় যে, উপন্যাসে আমরা যাহা আশ্বাসন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম—নাটকে তাহা আশ্বাসন করিতে বাধা ঘটে, সেখানে জীবনকে যেখানে না দেখিলাম—আমাদের সেই চেতনায় উল্লেখ হয় না, সেখানে দেখিতেছি না; ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, উপন্যাসের সেই জীবন সাক্ষাৎ-দৃশ্য জীবন নয়; তাহাতে যে গতি আছে, তাহা প্রাণের গতি নয়—মনঃকল্পিত গতি; তাহাতে যে তাপ আছে, তাহা ভাবের তাপ—বক্ষরস্তের তাপ নয়; তাহার কাহিনীও ঘটনা নয়—কল্পনা; তাহার রসও স্বতন্ত্র। কিন্তু নাটকে জীবনের যে রূপকে দৃশ্যমান করা হয় তাহা একান্তই ঘটনাখক, তাহার প্রতি মূহুর্তকে এক একটি ঘটনার লগ্ন বলা যাইতে পারে; সেখানে সকল কাজ, সকল কথাই সেই সেই ঘটনার লগ্নে, যেন স্বদলিগের মত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘটনার সেই লগ্নগল্লিই মূখ্য, তাই সেখানে কথাগুলিও বাক্যময় ঘটনামাত্র; উপন্যাসের জীবন-চিত্রে এইরূপ হইবার প্রয়োজন নাই। উপন্যাসে কাহিনীবস্তুর নাম 'প্লট'; নাটকে কোন কাহিনী নাই—আগাগোড়াই 'action' বা ঘটনাবস্তুরূপ। নাটকে জীবনকে এইরূপ একটা actionরূপে দেখাইতে হয়। এ যেন একটা-কিছু আপনাই আপনার অন্তর্নিহিত বৈশেষ বশে, নিজেরই নিয়ন্ত্রিত তড়নায়, কোন-একটা বিশদ হইতে সহসা উদ্ভূত হইয়া, আকাশে, অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টপথে, আগুনের রেখা টানিয়া অশ্বকায় হইতে অশ্বকারে অদৃশ্য হইয়া গেল! তাহারূপে দীপ্তি তাহাও সেই বেগের দীপ্তি; যদি সে বেগ না থাকে তবে দীপ্তিও নাই, এই দীপ্তিই তাহার নাট্যরসরূপ; এজন্য যাহাকে action-রূপে ধরা যায় না, জীবনের সেই রূপ নাটকের উপযোগী নয়।

অতএব নাটকে আমরা জীবনকে, তাহারই নিজস্ব নিয়ন্ত্র-নিয়মে, কেবলমাত্র ঘটনার মধ্য দিয়া একটা পরিণাম লাভ করিতে দেখি; সে পরিণাম আমাদের ইচ্ছানুরূপ নয়, কিন্তু আমাদের

গভীরতর চেতনার অনুমোদিত। নাট্যকার জীবন সম্বন্ধে কোন মত পোষণ করেন না—তিনিও জীবনের ভাবিয়াতা নহেন, দর্শক মাত্র। জীবনের গ্রাহ্যে ও ভিতরে যত সময়া আছে, তাহার জীবনেরই—তাহার মনের নয়; জীবনের মূলে কোনও ধর্ম বা নীতিসম্মত আদর্শ আছে কি না সে জিজ্ঞাসাও তাহার নাই; তিনি কেবল জীবনের সেই গতিরেখাটি আবিষ্কার করিয়াছেন—সৃষ্টির সেই বিরাট গতিবেগের চক্রকূলে রেখায় মানব-জীবন যেভাবে যে মুখে আবির্ভূত বা বিবর্তিত হইতেছে তিনি তাহারই রহস্য কেবল অনুভব করেন; বিচার করেন না, চিন্তা করেন না—অপরোক্ষ করেন। এই যে দর্শন ইহা যত গভীর ও ব্যাপক হয়, ততই নাটকে সেই দৃশ্যরস গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠে। তখন নাটক আর শুধুই দৃশ্যকাব্য নয়—উচ্চতর কাব্যের পদবীতে আরোহণ করে। এইরূপ কাব্যগুণাগ্রাণ্ড নাটক জগতের সাহিত্যে অল্পই আছে, এবং এইজন্য সেক্সপীয়ার আজিও জগতের শ্রেষ্ঠ কবি।

কিন্তু নাট্যকারও এমন কবি হইয়া উঠেন কোন রূপে? এক কথায় বলিতে হইলে—জীবনকে আভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধ ও সংস্কার-মুক্ত দৃষ্টিতে দেখিতে পারার রূপে; সে দেখায় এমন একটা অনুভূতির উদয় হয়—যাহা একাধারে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ রসিকতা। আমাদের দেশের দার্শনিক ভাষায় ইহাকে সংচিত্ত-আনন্দ বলে। জীবনের সেই 'সং' অর্থাৎ তাহার অন্তঃপ্রত্যয়ের সেই খাঁটি 'অস্তিত্ব'-স্বরূপটির অখণ্ড অপরোক্ষ দর্শন যখন হয়, তখন তাহারই সঙ্গে সঙ্গে যে বোধ এবং রসান্বাদ অবশ্যাকারীরূপে উদ্ভূত হয়, তাহার তুল্য অনুভূতি মানুষের চেতনায় আর নাই। ঐ যে খাঁটি দৃশ্যরূপ (দর্শকের ভাব, ভাসনা, চিন্তা প্রভৃতির সর্ব প্রলপ-মূচ্ছ) তাহারই দৃষ্টা বা সাক্ষী মাত্র হইয়া আমরা তখন সে মুক্তি অনুভব করি, তাহা হইতেই পরম রসান্বাদ হইয়া থাকে; কারণ, জীবনকে যত প্রত্যক্ষ ও গভীরভাবে উপলব্ধি করি ততই আত্মচেতন্য প্রদৃশ্য হয়, আবার সেই প্রদৃশ্য চেতনাই জীবনকে একটা লীলারূপে আন্বাদন করে। ইহাই প্রাকৃত রসান্বাদ; এই রসান্বাদের জন্যই নাটকে জীবনকে বাস্তবের ক্ষেত্র হইতে রঙ্গমঞ্চে তুলিয়া তাহাকে একটা আভিনয়িক রূপ দেওয়া হয়। তখন বাস্তব প্রয়োজন বা স্বার্থঘটিত সকল সংস্কার মুক্ত হইয়া আমরা আমাদেরই সহজ ও সুগভীর মানবতার চেতনায়—চিন্তাহীন, তর্কসংশয়হীন অকুপিত অবাধ জীবন-বেগকেই অনুভব করি; যে-সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনা, পাপ-পুণ্যবোধ বাস্তবের অর্থাৎ জাগর-চেতনার কঠিন বন্ধনে আমাদেরকে এত উদ্ভ্রান্ত করিয়া থাকে, তাহারই তখন এমন একটি রূপ পরিগ্রহ করে যে, মনে হয়, আমরা তাহাদের দাস নই, তাহারাই আমাদের দাস। তথ্যটি ইহা বোধাতের স্পর্শশূন্য নয়। ইহার আদিতেও যেমন, অন্তেও তেমনই, জীবনের অনুভূতি আছে—সেই জীবন মানবীয় জীবন;—মানুষের চারিত্র, মানুষের নিয়তিই সেই জীবনের মূল গ্রন্থি। তাই নাট্যকার যখন আমাদের সেই জীবনানুভূতিকে নাটকের সাহায্যে এমন সম্পূর্ণ, এমন অপেক্ষাকৃত করিয়া তোলে, তখন তাহার মত কবি কে? মানুষের জীবনই—তাহার দেহমন-প্রাণের বস্তুত্বের উপরে সৃষ্টির শতদল পরাগ-মধুতে ভরিয়া উঠে; যে পদ্মের চারিপাশে অপর কবিগণ ভ্রমরের মত গীতিগুঞ্জন করিয়া থাকেন, সেই পদ্মই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের প্রতিভায় নাটকরূপে প্রক্ষুদ্রিত হইয়া মধু ও মধুপের, গীতি ও গুণজনের—অচিন্ত্যভেদভেদ একই কালে আমাদের চিত্তগোচর করে; কারণ, তখন আমরাই পদ্ম, আমরাই মধু, আমরাই আবার ভ্রমর হইয়া থাকি; অশেষতর এই শ্বেতবিলাসীই শ্রেষ্ঠ কাব্যরস; একদা এই কথাটাই আমি নিম্নোদ্ধৃত কবিতা-পংক্তিগুলিতে বলিতে চাহিয়াছিলাম—

মধু সৌরভ—সৌরভ-মধু! মধু, আর শুধু মধু!
আপনার প্রাণ দুইখান হয়ে—হল বর, হল বধু!
একখানি তার ফলের মতন ছড়াইল চারিদিকে,
আরখানি তার প্রজাপতি হয়ে বুক দিল ফুলটিকে!
পাশুড়ি কি পাখা—চেনা নাহি যায়, কার মধু, কার মধু!

নাহি গুজন, শব্দ, ভুজন! সুদ্যাপন—শুধু সুখ!

(আধারের লেখা—স্বপন-পসার)

এই প্রসঙ্গে আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিব। জীবনের সম্বন্ধে, সকল বিরোধ, বৈষম্য ও নিষ্ফলতার উপরে মানুষের অন্তরে যে দিব্যদৃষ্টি জন্মি হইয়া থাকে, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন আধুনিক ইংরাজ মনীষী বিলাতী নাটকের শ্রেষ্ঠ রসরূপ—টোলেজিউ' উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

Of all the arts tragedy is the proudest, the most triumphant; for it builds its shining citadel in the very centre of the enemy's country... within its very wall the free life continues while the legions of death and pain and despair, and all the servile captives of tyrant fate afford the burghers of that dauntless city new spectacles of beauty. Happy those sacred ramparts, thrice happy the dwellers on that all-seeing eminence.

(৩)

নাটক সম্বন্ধে এই যাহা বলিলাম, ইহা নিতান্ত তত্ত্বখার মত হইলেও অর্থাৎ নাটক-সৃষ্টি ও নাটক-উপভোগ—নাট্যকার ও দর্শক—এই দুয়ের যে সম্বন্ধ বা সহযোগ, সাক্ষাৎভাবে তাহার বিচার এইরূপ আলোচনার দ্বারা সম্ভব না হইলেও—আমি এই প্রসঙ্গের অবকাশে নাট্যকার তত্ত্বেরও একটু ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করিয়াছি; কারণ, ইহা হইতে নাটকের আদর্শ কি, তাহার প্রেরণা কত গভীর হইতে পারে, এবং তাহার সেই রস-প্রেরণা আমাদের চিত্তের কোন তলদেশে পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে, তাহার একটা ধারণা করা সম্ভব হইবে; এবং সেই ধারণা হইতে নাটকের নূনতম সফল্য কিসের উপর কতটুকু নির্ভর করে তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে। আরও কারণ এই যে, আধুনিককালে নাটকের নানারূপ ও নানা আদর্শ দেখা দিয়াছে—কাব্যে, উপন্যাসে, চিত্রকলায় যেমন, তেমনই নাটকের রসসৃষ্টিতেও এখন ভিন্নতর পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; এজন্য নাটকের সংজ্ঞাও নানা প্রকার হইতে বাধ্য—নাটক নামটি সর্বনামের মত ব্যবহার করাও যেন আর চলে না। অতএব, আমি নাট্যরসের বিচারে একটা মূলতত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছি—যাহাতে রূপভেদ ও সংজ্ঞাভেদ সত্ত্বেও, সর্বত উৎকর্ষের আদি প্রমাণটি হারাইয়া না যায়। তত্ত্ব-আলোচনার আরও প্রয়োজন এই যে, আধুনিক মানুষের রুচি ও রসবোধ—জীবন সম্বন্ধে নূতন বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রভাবে এমনই ভিন্নমুখী হইয়াছে যে, আমি নাটকের যে আদর্শকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি—তাহাকে 'অনেকেই' হয়ত স্বীকার করিবেন না। তা' ছাড়া, আরও বিপদ আছে; একালের 'ইন্টেলেক্টুয়েল'গণ 'ডায়ালেকটিক'-বর্জিত কোন বিচারকে শ্রদ্ধা করেন না; কাব্য, নাটক, উপন্যাসের রসবিচারেও 'ডায়ালেকটিক' মান্য করা চাই—নতুবা, আদিম সংস্কার অথবা ফ্যাসি-মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হইবে। তাহাদের মতে জড়-তত্ত্বই জগতের মূলতত্ত্ব, অধ্যাত্ম বা অধিভূত বলিয়া কিছু নাই; প্রাণ ও মন দুইই জড়তত্ত্বের অধীন; ভাব বলিয়া স্বতন্ত্র স্বাধীন কিছু নাই—বস্তুই প্রভু। এহেন দিব্যদৃষ্টিতে জীবনের যে মূর্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে নাট্যিকত করিলে নাটকের রূপ-রস অবশ্য বিপরীত হইতে বাধ্য। এইজন্য আমি একটা মূল তত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছি; তাহাতে আশা হয়, নাটকের রূপভেদ যেমনই হোক, তাহার কোন রূপটিতে মানবচিত্তের গভীরতম উৎকণ্ঠার তৃপ্তি-সম্ভাবনা আছে—যাহারা কেবলমাত্র মানুষ, কোনরূপ মতবাদের চিন্তা-বশ্ত নয়, তাহারা আশ্চর্য-প্রমাণেই তাহা স্থির করিয়া লইবে।

কিন্তু সে কথা এখন এই পর্যন্ত। উপস্থিত প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য প্রশ্ন ছিল—সাক্ষর-নাটক ভিতরে ও বাহিরে কোনরূপ উপকরণের উপরে নির্ভর করে? ভিতরের কথা বলিতে গিয়া আমি তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করিয়াছিলাম; এক্ষণে তাহার সকল জটিলতা ত্যাগ করিয়া শুধু ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, মানুষের জীবনই হইবে নাটকের আশ্রয়-বস্তু, এবং জীবন বলিতে—মানুষের দেহমন-

প্রাণের সকল
আকৃতি, উৎকর্ষ
ও প্রবৃত্তির
সাক্ষাৎ কার্য-
কারণ ঘটিত যে
নিরন্তর উত্তে-
জনা ও তাহারই
ঘাত প্রতিঘাতে
কর্মরূপে ই
তাহার যে অভি-
বাস্তি—তাহাই
ব্যক্তিগত হইবে;
অর্থাৎ, সেই
জীবন, যাহাতে
তাহার চরিত্র ও
ও সেই চরিত্র-
গত নিয়তিই
মুখ্য। 'চরিত্র'

সত্যদিবসের ব্যর্থ প্রাণের ২৩ ইয়া ২৩ কালী
প্রতি উত্তর দেহ নবীন আশ্বিন আশ্বিন দিবসে প্রকাশিত

শ্রী অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে

৪ অক্টোবর
১৯২৫

শ্রী অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে

হা সোম্বী প ক
তু জু ভা বা
প্রাণী জ ন ক
মহত্ব, আশানু-
রূপ সফলতা
বা হৃদয়বিদারক
নিষ্ফলতা—
পরিণাম যেমনই
হোক, সকলের
মতোই সেই
এক অনুভূতির
বীজ বিদ্যমান—
জীবনের গতি
ও নিয়তির
একটা রহস্য-
বোধ। এই
বোধটি জাগাই-
বার জন্য ই

কথাটি আমরা এক্ষণে যে অর্থে ব্যবহার করি তাহাতেও গোল আছে।
খাটি হিন্দু দর্শনের ভাষায় 'চরিত্রকে সেই মনোদেহ বা সূক্ষ্মশরীর
বলা যাইতে পারে, যাহা জন্মান্তরীয় কর্মের দ্বারা গঠিত হইয়াছে—
যাহা নিজেরই অনুরূপ একটা ভোগাত্মক স্থলদেহ ধারণ করে।
এই চরিত্রই তাহার স্ব-প্রকৃতি-যাহাকে যে লক্ষণ করিতে পারে না,
যাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'Character is Fate' বা
সদৃশ চেষ্টাতে বসমা প্রকৃতিজ্ঞানসান্নিধ্য।
প্রকৃতিগত যান্ত্রিক ভূতানি নিরন্তর কিং করিয়াই।

পাশ্চাত্য মনীষীও এই প্রকৃতিকেই মানুষের জীবনের প্রকৃত
নিয়ন্তা বলিয়া, Reason বা বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিকে তাহার নিম্নে
স্থান দিয়াছেন। আমাদের পক্ষে 'চরিত্র' অর্থে শব্দ এইটুকু মাত্র
ব্যক্তিতেই চলবে যে, মানুষের সকল প্রকৃতির মিলিত একটি যে
ব্যক্তি-সত্তা ভিতরে বিদ্যমান থাকিয়া বাহিরেও একটি অনিবার্য
কর্মধারায় তাহার জীবনরূপে প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে তাহাই
মানুষের চরিত্র। মানুষের এই চরিত্র নির্ণয় করিতে হইলে, তাহার
মস্তিস্কজাত মানসীয় বুদ্ধিরূপী, তাহার আত্মগোপনের যত প্রকার
সামাজিক পোষাকপরিচ্ছদ, অথবা তাহার প্রাণশক্তিহীন মনোবিকারের
যত লক্ষণ—সেগুলিকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হইবে। সে যাহা বলে
তাহা নয়—যাহা করে তাহাই তাহার চরিত্রের পরিচয়। কারণ তাহাই
তাহার সেই চারিত্রিক প্রবৃত্তি; এবং ভাল করিয়া দেখিলে স্পষ্টই
দেখা যাইবে—যে-চিন্তা, যে-নীতি, বা যে-মতবাদের দোহাই সে
দেয়, তাহার মূলে কোন আত্মনিরপেক্ষ সত্যের উপাসনা নাই;
নিজের প্রবৃত্তি অনুসারেই সে একটার পক্ষপাতী ও অপরটার
বিরোধী হয়; অথবা সেই নীতি তাহার একটা মুখোশ মাত্র। তাই
নাটকে এইরূপ মতের মতহিসাবে কোন পৃথক মূল্য নাই; চরিত্রগত
একটা লক্ষণ হিসাবেই তাহা মূল্যবান—সেও তাহার 'প্রকৃতিরই
একটা চেষ্টা'।

অতএব নাটকের বিষয়ীভূত সেই যে জীবন, তাহার গতি-
চক্রে এই চরিত্রই আবর্তিত হইয়া শিখায় ও ক্ষুদ্রলগ্নমালায় মানুষের
নিয়তিক্রমে নিরন্তর দৃষ্টিগোচর করিয়া তোলে! 'নিয়তি' অর্থে
শব্দই ঘটনার শৃঙ্খল নয়; তাহারই মধ্যে যে অনিবার্য পরিণাম-
মুখিতার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, এবং সর্বশেষে একটা কোনরূপ
পরিণাম, অর্থাৎ ঘটনা-পরপরার একটা অর্থ আমাদের চিত্তে প্রকাশ
পায়—তাহাইই মানবজীবনের অন্তরালে একটা অলক্ষ্য বা অদৃষ্ট
শক্তির লীলা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি। সে যে কি, তাহা বাক্যে প্রকাশ
করা যায় না; সে একটা অনুভূতি মাত্র; কিন্তু তাহাই আমাদের কাছে
আশ্বস্ত করে—তাই রসোদ্ভেক হয়। নাটক-বিশেষের পরিণাম যেমনই হোক,

নাটকের ঘটনাবলী একটা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে সমান সুসম্বন্ধ—আদ্যন্ত-
যুক্ত অর্থাৎ সমান্তরালসম্পন্ন হইবে; আরম্ভের মতোই তাহার বীজ
ছিল—যাহা ঘটনাপ্রসঙ্গরূপে অনিবার্যবেগে বিকাশ হইয়া
চলিতেছিল, তাহার সেই বেগ, নিঃশেষ হইবার কালে, আরম্ভ ও
পরিণতিকে যেন একটি মূহুর্তে মিলিয়াই এক করিয়া দিবে।
এজন্য, কেবল কতকগুলি ঘটনার সমাবেশই নাটক নয়; তাহা আমাদের
চিত্তে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সাদা জাগায় মাত্র; তাহাতে জীবনের
সেই অখণ্ড রহস্যের অনুভূতি নাই; তাহাতে জীবনের সঙ্গে
সাঁধীবিশ্বাসের যোগসূত্র দৃষ্টিগোচর হয় না; যে-নিয়তি বা অদৃষ্ট
নাটকেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অদৃষ্টই থাকিয়া যায়।
এই যে আদ্যন্তযুক্ত আরম্ভ-পরিণামী ঘটনার ধারা, ইহাই নাটকের
ঘটনাবলীর সমাঙ্গত action; এই action-এর ছাঁচে ফেলাতে
না পারিলে জীবনকে নাট্যীকৃত করা যায় না।

(৪)

এতক্ষণে বোধ হয় ব্যক্তিগত পার্থক্য—জীবনকে কোন
রূপে দেখানো নাটকেই সম্ভব, এবং দেখাইতে না পারিলে নাটক
সার্থক হয় না। এই যে দেখানো-ইহাই বা অর্থ কি? যাহা
দেখানো হইবে ও যে দেখাবে—দৃশ্য ও শ্রুতি, এই দুইয়ের, অর্থাৎ
সাক্ষ্য ও সাক্ষীর মধ্যে যে সাক্ষাৎকার, তাহা যত অব্যাহত হইবে,
নাটক ততই জীবনায়িত্ব হইয়া উঠিলে। যাহা দেখিতেছি, তাহা
ভাবনা, চিন্তা নয়, তাহা একটা গতিমান বস্তু; যেন বস্তুও নয়—
নিষ্ক গতি; গতিমান বস্তুকে দূর হইতেও দেখা যায়, মনের
দ্বারা তাহার একটা ধারণা করা যায়; কিন্তু যাহা গতিমান—
প্রাণবেগের গতি, তাহাকে দেখার অর্থ তাহার সহিত প্রাণে যুক্ত
হওয়া—সেই গতিতে নিজেও যেন গতিশীল হওয়া। দৃশ্য ও শ্রুতির
মধ্যে এই যে ব্যবধানের লোপ, নাটকীয়তার কালে ইহাই হওয়া চাই
—নতুবা নাটকের নাট্যরূপ সার্থক হইবে না। নাট্যকার 'দেখাইবেন',
দর্শক 'দেখিবে'—উভয়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট সহযোগিতা রহিয়াছে।
এখন সেই—'একাকী গায়কের নহে ত' গান, গাহিতে হবে
দুইজনে।' কিন্তু তাই কি? অর্থাৎ নাটকের সেই সার্থক রসরূপের
জন্য দুই পক্ষই কি সমান দায়ী? এই প্রশ্ন একটি বড় প্রশ্ন,
ইহার ভালরূপ মীমাংসা আবশ্যক। পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতে
একটা কথা সহজেই স্পষ্ট হইয়া উঠে, সে কথা এই যে, নাট্যরস
আস্বাদনের জন্য দর্শকের কোন বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা বা চিত্তপ্রকবেশ
প্রয়োজন নাই; তাহাতে যে কস্তুর সাদা জাগে, তাহা শিক্ষিত-
অশিক্ষিত পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে মানুষমাত্রের অন্তঃকরণে নিহিত
আছে—তাহা মানুষের স্বপ্রকৃতিগত। এজন্য নাটক কোন পণ্ডিত বা
রসিক বা মাজিতরুচি ও সুশিক্ষিত দর্শকের জন্যই নয়—মানুষ-

মাথেরই উপভোগ্য; শুধু তাহাই নয়—পাঁচ-দশ সত্বরেরই একত্রে একযোগে উপভোগ্য; নাটকের সেই দৃশ্যবস্তুর দেখবার জন্য কোন পুষ্টিগত-প্যাণ্ডিত্য অথবা বিশিষ্ট রুচি কিম্বা বিশেষ কোন ভাবুকতা-শক্তির প্রয়োজন হয় না—কোনও মতবাদ বা তত্ত্বমধ্যে দীক্ষিত হইতে হয় না। অতএব, সে পক্ষ নাট্যকার বা অভিনেতার কোন আশংকার কারণ নাই; সেই সাড়া জাগাইতে হইলে তাহার নিজেরই কৃতিত্ব চাই—সেখানে তাহা জাগে না, সেখানে দর্শকমণ্ডলী দারী নয়। কিন্তু মীমাংসা এত সহজ নয়; কারণ, দর্শকমণ্ডলীর চিন্তাহরণ করিতে পারিলেই নাটক যে উৎকৃষ্ট নাটক না হইতেও পারে, তাহাও আমরা জানি; সেখানে নাট্যকার নয়, দর্শকমণ্ডলীর জীবনরসরসিকতার মাত্রাভেদ, অথবা একান্ত অভাবই তাহার কারণ। সেরূপ ক্ষেত্রে অভিনয়-সাফল্য সত্ত্বেও নাটকের উৎকর্ষ ঘটিল না; এবং যেহেতু সাফল্য রসগ্রাহিতার উপরেই নাটকের নাটকীয় নির্ভর করে, অতএব তেমন মনেছ উৎকৃষ্ট নাটক জন্মিতে পারে না; সেজন্য নাট্যকারও দারী নাহে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নাটকের সাফল্য যদিও নির্ভর করে প্রোত্মমণ্ডলীর রসগ্রাহিতার উপরে, সেই রসগ্রাহিতাও নির্ভর করে সুস্থ ও প্রবল জীবনচেতনার উপরে। এই জীবনচেতনার মাত্রাভেদ আছে, জাতি ও সমাজবিশেষে ইহার প্রকৃতিভেদও আছে; যুগও অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারে। এজন্য শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে অল্পসংখ্যক নাটকই উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নাটক-হিসাবে নাটকের একরূপ সাফল্য বা সাধকতার কোন বাধা ঘটিবে না—যদি কোন-না-কোন কারণে তাহা দর্শকমণ্ডলীর সেই 'দেখা'র বস্তু হইয়া উঠিতে পারে। অর্থাৎ এখানেও সেই ষ্টাইলের কথা খাটে। নাটকের বস্তু যেমনই হোক, যদি তাহা 'দৃশ্য' হইয়া থাকে, তবে তাহা 'good style'-এর নাটক বটে—'great style'-এর উৎকৃষ্ট নাটক হয়ত নয়। এইখানেই নাটকের কাব্যগুণের প্রশ্ন উঠে; দর্শকের চিত্রে সাড়া জাগাইলেই হইবে না—তাহা না হইলে সে তা নাটকই নয়, অর্থাৎ good styleও নয়; তাহারও উপরে যে গুণ না থাকিলে তাহাকে উৎকৃষ্ট নাটক বলা যাইবে না—তাহা এই কাব্য-গুণ, অর্থাৎ জীবনের সমগ্র-গভীর দম্ভিত অনুভূতি-উপেক্ষের গুণ। এই গুণের উপরেই নাটকের মহত্ত্ব নির্ভর করে—এই গুণেই তাহা সাহিত্যেও অমরত্ব লাভ করে।

তথ্যাপ খণ্ডি নাটক বলিতে কি বুদ্ধি-সে বিষয়ে কোন গোল থাকিলে চলিবে না। এতক্ষণ সে বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে খণ্ডি নাটক সম্প্রদেয় একটা ধারণা নিশ্চয় হইয়াছে, এবং তাহা এই যে, নাটকে জীবনকেই গতিমান রূপে দেখানো হয়—সে-রূপ 'ঘটনার রূপ'; তাহাতে মানুষের 'চরিত্র' অর্থাৎ স্ব-ব-সংস্কার ও কর্ম-প্রবৃত্তি 'ক্রিয়মান' হইয়া ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করিয়া, জীবনের একটা বিশেষ অনুভূতির উদ্ভব করে। কারণ, সেখানে যাহা কিছু হইতেছে, তাহার প্রত্যেকটিই ঘটনাস্থল; সে সকল ভাব ও ভাবনা, আবেগ ও উদ্দীপনা, হর্ষের উল্লাস ও বিষাদের অবসাদ—ঘটনারই ঘাতপ্রতিঘাতমূলক; অন্তরের ধ্যান, চিন্তা বা কল্পনার বাহ্যিক প্রকাশ বা উজ্জ্বল নয়, বাদ-বিতর্ক নয়, বস্তু বা কবিত্ব নয়। নাটকের সব কিছুই ঘটনামূলক—অর্থাৎ সেই 'ক্রিয়মান' প্রবৃত্তির তৎসংঘাতও অভিব্যক্তি। প্রবৃত্তির এই সাক্ষ্যই ক্রিয়মান অবস্থার বাহিরে আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, ধ্যান করি বা কল্পনা করি, অর্থাৎ যাহা ভাবমাাত্র—জীবনের সেই গতির আবেগের মধ্যে পড়িয়াই আমরা যাহা অনুভব করি না; একটু দার্শনিক ভাষায় বলিতে হইলে, যাহার কোন বিশেষ দেশ কাল নাই, অন্তরে উদ্ভিত হইলেও বাহিরের সহিত যাহার কোন নিয়তি-পাতিত কার্য-কারণ সম্পর্ক নাই—তাহার উপরে নাটকের প্রতিষ্ঠা হয় না। পূর্বে বলিয়াছি, কেবল রসের আশ্বাদনই নাটকের অভিপ্রায় নয়; সেইরূপ আশ্বাদন জীবনকে বিস্মৃত হইবারই একটি উপায়; তাহাতে জীবনেরই কোন রূপ দেখবার প্রয়োজন হয় না; হৃদয়ের কতকগুলি আবেগ ও ভাবকে (emotions) অনুভব

(sentiments) পরিণত করিয়া বেদান্তরস্পর্শন্য একটা মাধুর্যের অনুভূতি হইলেই হইল। ইহাকেই অতি সুস্থ কাব্যরস বলে—ইহা সত্যকার জীবনরসরসিকতার পরিপন্থী। নাটকেও যদি ইহার প্রাধান্য ঘটে, তবে তাহা খণ্ডি নাটক নয়, তাহা কবাই বটে।

আমাদের দেশের প্রাচীন নাটক হইতে আধুনিক নাটক পর্যন্ত এই ভাবরসের উদ্দীপনাকেই মূখ্য করিয়াছে—রুরোপে এইরূপ নাটকের পৃথক জাতি ও পৃথক নাম নির্দিষ্ট আছে। আমাদের আধুনিক নাটকও মানব-চরিত্রের বা নিয়তি-নিয়মের গূঢ়তর রহস্য অনুপ্রাণিত নয়। ইহাও এই দেশেরই জলবায়ুর গুণ; এখানে সকল চেতনাই যেন বাস্তববিমূখ—বাস্তবের সঙ্গে যোগাযোগ বেশী দূর অগ্রসর হইতেই পারে না, মধ্যপথেই ঘুরিয়া ভাবমাাত্র প্রস্থান করে। যাহারা প্রকৃত বৈরসিক তাহারা যোগসনে বসিয়া দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়া পরজ্ঞানের সাধনা করে; রসিক হইলে, ভাবমাাত্রের মিস্টিক সাধনায় জীবনকে ঘাঁকি দিবার উপায় করে। আমি ইহার কোনটাকেই নিশ্চয় করিতেছি না—বরং ভারতীয় প্রতিভা ও মনীষার এই স্বকীয়তাকে গভীর প্রশংসা করি। এখানে আমি এ জাতির পক্ষে নাটকসৃষ্টির যে বাধা আছে, তাহার কারণ নির্ণয় করিতেছি; নাটকের নাটকীয় বিচার করিতেছি; যাহাকে খণ্ডি নাটক বলিয়া বুদ্ধিবিচার, আমাদের জীবনে তাহার অত্যাবশ্যক উপাদান ও উপকরণের অভাবের কথা বলিতেছি।

এই যে ভাব-মাথের কথা আমি উত্থাপন করিয়াছি—ইহার সম্বন্ধেও যেন কোন ভুল ধারণা না ঘটে। আমি কোন ভাব বা emotionকে নাটক হইতে বহিষ্কার করিতেছি না। মূল কথা, সকলই চরিত্রের অর্থাৎ প্রকৃতি-জীবনের ঘটনাত্মক অভিব্যক্তি হওয়া চাই। একথা ত আমরা সকলেই মানি যে, নাটক দর্শককে আমরা অতি গভীর আবেগে অবশ্যে অভিভূত হই। এই যে ভাবের আবেগ, ইহা মানসিক চিন্তাপ্রসূত নয়—ইহা জীবনচেতনার—দেহাধিষ্ঠিত প্রাণমনের—মস্তনজাত আবেগ; ইহাতেই আমরা আমাদের অন্তরের অন্তরতম পরিচয় লাভ করি। কিন্তু যে আবেগ সাক্ষ্য জীবনানুভূতির আবেগ নয়, যাহা ধ্যান-চিন্তা, ভাবনা-কল্পনা, অথবা কোন তত্ত্ব-বিচারের ভাবোদ্দীপনা মাত্র—বাস্তব প্রবৃত্তি বা সুখ-দুঃখের কর্ম-প্রেরণার সঙ্গে যাহার কোন সম্পর্ক নাই, বরং যাহা কর্ম-প্রবৃত্তিকে স্তম্ভিত করিয়া অলস-উপভোগেই পর্ববসিত হয়, তাহার স্থান নাটকে নয়—কাব্যে। কিন্তু এই সকলই যদি সত্যকার জীবনানুভূতির অঙ্গীভূত হইয়া উঠে—মানুষের চরিত্রকে তথা নিয়তিক্রমে আচ্ছন্ন করে, তবে ইহারাও খণ্ডি নাটকেরই উপাদান; বরং সেই নাটকই উৎকৃষ্ট কাব্যের পদবীতে আরোহণ করে।

আমাদের নাটকগুলির সম্বন্ধে এই শেষের কথাগুলি বিশেষ প্রধানযোগ্য। সে নাটকে যে-বস্তুতর অত্যধিক সম্ভাব দেখা যায়, তাহা এরূপ ভাবমাাত্রের উদ্দীপন, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। আমাদের জীবন-সংস্কার বা জীবন-চেতনা খণ্ডি নাটকের অনুকূল নয়। আমরা চরিত্রবান নই, আমরা জীবনের সহিত খুব গভীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সাধনের পক্ষপাতী নই—বাস্তবের আঘাতে আমাদের প্রবৃত্তি কঠিন হইয়া উঠে না; তার কারণ, আমরা বহুকাল হইতেই অহিফেন সেবন করিতেছি—হয়ত, হাওয়াতেও যেমন অহিফেন-বিশ আছে, তেমনই দেহের রক্তেও তাহা পূর্ব হইতেই ছিল, কিম্বা জল-মাটির গুণেই এমন হইয়াছে। আমরা মূলে বস্তুতাত্ত্বিক নই—ভাবতাত্ত্বিক; বস্তু আমাদের সহিত বেশী বাড়াবাড়ি করিতে আরম্ভ করিলেই, আমরা তাহাকে বাষ্পাকারে ভাবলোকে পাঠাইয়া সকল বিশ্ব দূর করি; যত বড় আঘাত হউক, আমরা তাহা মনে মনে এড়াইবার উপায় করিয়াছি—বৈরাগ্য এবং ভক্তি—এই দুই-এর তত্ত্ব আমাদের একরূপ সঙ্স্কারের মত হইয়া গিয়াছে; এজন্য কোন যাক্সাই ভিতরে বেশী দূর পৌঁছিতে পারে না। আমাদের জীবন-চেতনায় 'চরিত্র'বোধ নাই—যে 'নিয়তি' সেই 'চরিত্র' পরিণামরূপে প্রকাশ পায়, তাহার ধারণাও নাই। অদ্ভুতরূপী 'দৈব' আছে, তাহারই মার খাইয়া মানুষ কাঁদে; এবং অতিশয় 'সাদু' ভালমানুষও যখন (৩০৮ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

કાકા ૩
જાકા
શ્રીગંગાધરી



সন্তান জাতির ভবিষ্যৎ



সন্তান-জনন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য
উন্নত মানব। মৌলিগান
আইন আবিষ্কারের পর জনন-
শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আইন
প্রমাণ করেছে যে, পিতামাতার
দোষগুণ সন্তানে দেখা দেয়।

মানুষের চরিত্র নির্ভর করে দুটো জিনিসের উপর: পারিপার্শ্বিক ও জন্মগত উত্তরাধিকার।
জীবনের জন্মে উন্নত ব্যবস্থা করে উপস্থিত জনগণের স্বাস্থ্য ভালো করা যেতে পারে,
শিক্ষার সুব্যবস্থা করে সামর্থ্যের সম্ভাব্যবহার করা যেতে পারে; কিন্তু স্থায়ী উন্নতি সম্ভব
হবে শুধু উপস্থিত বংশের স্বাস্থ্য ভালো হলে। রক্তে যদি দোষ থাকে, তাহলে শুধু
পারিপার্শ্বিকের উন্নতি করে বিশেষ কিছু লাভ নেই। স্বাস্থ্যের অভাব শুধু বিস্তৃত
নয়, ধনীরা ঘরেও রয়েছে। প্রত্যেক নগরবাসীর কর্তব্য হ'ল অসুস্থ, পঙ্গু, প্রাণশক্তি-
হীন সন্তানের জন্ম না দেওয়া।

আপনার রক্ত পরীক্ষা করান সরাসরি ভি, ডি, ক্লিনিক্স-এ

অনুসন্ধানের জন্য:- চিঠিপত্র লিখুন-ডাইরেক্টর, হাইজিন ইনস্টিটিউট, ১১০,
চিকিৎসক এডিনউ, ডাইরেক্টর, ভি ডি ক্লিনিক্স, ৮৮, কলেজ স্ট্রীট। ফোন করুন-বি, বি,
৫৯২১ অথবা পি, কে, ১২০। দেখা করুন। ডাইরেক্টর, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

বিনামূল্যে ও গোপন ব্যবস্থাপ্রদানে চিকিৎসা করা হয়।



পুরুষদের
চিকিৎসাকেন্দ্র

মহিলাদের
চিকিৎসাকেন্দ্র

মেডিকেল কলেজ
কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ
ক্যান্সেল মেডিকেল স্কুল
চিকিৎসক হাসপাতাল
শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল
লেডী ডাক্তার হাসপাতাল
আলীপুর ভলান্টারী ভেনেরিয়াল হাসপাতাল

সমস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র সকালে ও বিকালে খোলে।

তখন আমার সরাসরি যাওয়া উচিত নয়। তবে কান্ট'কবাব' যদি পরামর্শ করবার জন্যে লেজে আমাকে ডাকেন তো আমি যেতে পারি।" বিনয় কাঁচুমাচুমে কহিল, "বেশ! আমি তাই বলব।"

বুড়ী এক কাপ চা আনিয়া হাজির করিল। পরেশের হাতে দিয়া কহিল, "কালও আসবেন কিম্বা?" পরেশ কহিল, "নিশ্চয়! এমন নগদ কী পেলে আবার ডাক্তার না আসে?" বিনয় বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাব কি করছে রে? ডেকে দে তো। আর দেখ, চায়ের জল কি শুধু এক কাপের জন্যেই চড়িয়েছিল? মানে—আমার জন্যে—মানে—" পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "আজ ঠান্ডাটা একটু বেশি পড়েছে না?" সুখদা কহিল, "আবার চা কেন? এই খেলে যে!" বিনয় কাঁচুমাচুমে কহিল, "তা খেলায় বটে, তবে—থাক।" বুড়ী কহিল, "গরম জল এখনও আছে বাবা, আমি চা করে নিয়ে আসছি।" বলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিনয় হাকিম্বা কহিল, "আর তোর দিদিকেও ডেকে আনি।"

হাকিম্বা পরে চায়ের পেয়ালা হস্তে বসির আবির্ভাব ঘটিল। দীর্ঘপদে—নতমুখে বিনয়ের কাছে গিয়া তাহার হাতে পেয়ালাটা দিয়া তাহার অন্য পাদে গিয়া দাঁড়িয়া রহিল। পরেশ চা-পান শেষ করিয়া পেয়ালাটা মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়া বসির দিকে তাকাইয়া কহিল, "এখানে একবার এস দেখি, ওজনটা একবার নিয়ে নিই।" ববি আনতমুখে বাম পায়ের বাঁড়া আঙুল দিয়া একেটা হুটিতে হুটিতে নিন্মকণ্ঠে বিনয়কে কহিল, "কেমন করে ওজন করতে হয় তুমি দেখে নাও বাবা! পরে তোমার কাছে ওজন হবে।" বিনয়া বসির দিকে তাকাইয়া সম্মুখে কহিল, "লজ্জা করছে? পরেশের কাছে লজ্জা কি মা! যা।" ববি আবশ্যের সুরে কহিল, "না বাবা!" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। বিনয় স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া কহিল, "তুমি ওজন হবে নাকি? যাও না।" সুখদা বিনয়ের দিকে সূক্ষ্ম কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "ঐ রকমই বৃদ্ধি কিনা!" তীব্রকণ্ঠে কহিল, "নিজে যাও না।" স্ত্রীর কঠিনবরে ভয়ের আভাস দেখিয়া বিনয় মাঝড়িয়া গিয়া কহিল, "আমি বাব? কি বল হে পরেশ! তাহাট্ট যাই তা হ'লে।" পরেশ বিরমুখে কহিল, "বেশ তো তাই আসুন।"

(৭)

ঘোষালপাড়ার ও চক্রবর্তীপাড়ার মাঝখানে যে পড়ে জমিটা লইয়া দুই পাড়ার মধ্যে অনেক দিন দরিয়া মামলা-মকদ্দমা চলিয়াছিল, কান্ট'ক ডাক্তারের ডিসপেন্সারি সেইখানেই। ঘোষাল ও চক্রবর্তী উভয় পক্ষই কান্ট'ক ডাক্তারকে এই জমিটা রীতিমত দানপত্র লিখিয়া দান করিয়াছে। কান্ট'ক ডাক্তারের বাড়ি এ গ্রামে নয়; দামোদরের তীরে কোন এক পল্লী-গ্রামে। আর জি কর স্কুল হইতে পাস করিয়া সেইখানেই প্র্যাক্টিস শুরুর করিয়াছিলেন। মালেরিয়ায় মহাশয় অস্পন্দনের মধ্যেই বাবসা জমিয়া উঠিল, রোগীর ভিড়ে ডাক্তারের ওয়াশ-খাওয়ার সময় রহিল না; ডাক্তার দুই হাতে পরসা কুড়াইতে লাগিলেন। পৈতৃক মোটে, খোড়া বাড়ির জায়গায় একতলা পাকা বাড়ি উঠিল; জমি-জমা পুকুর-বাগান হইল; ডাক্তার জিহবীর অঙ্গে ও কাসবাজে স্বর্ণালঙ্কার ধারবার স্থান রহিল না; পাশাপাশি দশ বারোটা গ্রামের মধ্যে কান্ট'ক ডাক্তার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশি দিন রহিল না। হঠাৎ দামোদরের গতি ও মতির পরিবর্তন হইল; এতদিন দরিয়া ও-কল ঘেঁষিয়া বহিতোঁছিল, ১৯১১ সালে এ-কলের উপর অনুকূল হইয়া উঠিল। কলরতী গ্রামের লোকেরা কোলাহলসহকারে প্রতিবাদ করিল এবং গ্রাম দেবতার দরবারে নজির ও নজরানাসহ আবেদন করিল। ফলে ১৯১২ সালে দামোদর পটখানা গ্রামের পট শত বিঘা জমি উদরসাৎ করিল। শঙ্কাতুর গ্রামবাসীরা রুট দামোদরকে শান্ত করিবার জন্য পুজার বাক্ষ্য করিল এবং মেজাজ শান্ত হইলে পর বৎসর প্রচুর উপাচারসহ পুজা দিবার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ১৯১৩ সালের বনায় প্রায় দশখানা গ্রাম দামোদরের গর্ভে নিশ্চিহ্নভাবে অন্তর্ধান করিল। কান্ট'ক ডাক্তার স্ত্রী ও সন্তানদের লইয়া একবন্দে গৃহত্যাগ করিয়া এই গ্রামে পিসতুতো ভাই অনুকূল চক্রবর্তীর বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন। গ্রামের সকলে তাহাকে আগ্রহ ও আপ্যায়ন সহকারে গ্রহণ করিল। এ গ্রামে তখন মালেরিয়ায় প্রকোপ দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল, অচল ভাল ডাক্তার ছিল না। চার মাইল দূরে মনিয়াড়া গ্রামে সরকারী হাসপাতালে একজন কাম্যবেল স্কুলে পাস করা ডাক্তার ছিল বটে, কিন্তু তাহার হাকিমী মেজাজের জন্য লোক তাহাকে পছন্দ করিত না। কাজেই সকলে কান্ট'ককে ধরাধরি করিয়া এই গ্রামেই বসাইয়া

দিল। জমি দিল ও সেখানে সকলে চম্বা করিয়া একটি ছোট্ট মেটে বাড়ি তৈয়ারি করিয়া দিল এবং ভবিষ্যতে কিছু ভূসম্পত্তি করিয়া দিবার ভরসা দিল। কান্ট'ক ডাক্তার নতুন করিয়া প্র্যাক্টিস শুরুর করিলেন; কিছু টাকা খরচ করিয়া অনুকূল চক্রবর্তীর বৈঠকখানায় একটি ছোট ডিসপেন্সারি করিলেন। এখানেও নিজের কৃতিত্ব ও হাতখশ এবং গ্রামের লোকদের প্রাণপণ প্রচারকার্যের ফলে অস্পন্দনেই তাহার বেশ পসার হইল। দিন দিন রোগীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; বাবসাক্ষে ক্রমে প্রসারিত হইতে লাগিল; এবং বৎসর দুইয়ের মধ্যেই এমন অবস্থা করিয়া তুলিলেন যে, সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারবাটুটি পর্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া রোগীদের সহিত হাসিয়া কথা বলিতে শুরুর করিলেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই কান্ট'ক ডাক্তারের অবস্থা প্রায় আগের মতই হইয়া উঠিল। গ্রামের লোকদের তৈয়ারী করিয়া দেওয়া ছোট্ট মেটে বাড়িটি ভাঙিয়া টিনের চালওয়ালা পাকা কোটা তুলিলেন; গ্রামের শতানুধ্যায়ীদের সাহায্যে জমিজমা পুকুর-বাগান কিনিলেন; ডিসপেন্সারিটি অনুকূল চক্রবর্তীর বৈঠকখানা হইতে তুলিয়া আনিয়া নিজের বৈঠকখানায় বসাইলেন; ডিসপেন্সারির ঔষধপত্র ও সাব-সরঞ্জাম বাড়াইলেন; গ্রামের একজন বেকার যুবককে কম্পাউন্ডার নিযুক্ত করিলেন এবং "জরুরজরু" নাম দিয়া একটি ম্যালেরিয়া রোগের অমোঘ অথচ অস্প-মল্ল ঔষধ বাহির করিয়া এ তম্বাটের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকদের অশেষ শ্রম ও অনুরক্ত অর্জন করিলেন।

পরেশ কান্ট'ক ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল, সামনে টৌলের উপর কেরোসিনের জালপ জ্বালাইয়া ডাক্তার চেয়ারে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছেন। কান্ট'ক ডাক্তারের পরিধানে লংস্কেচের কামিজের উপর গলাবন্ধ গরম কোট, পাড়হীন শূঁত—কোঁচাটি পাট করিয়া পেটের উপরে গেঁজা, পায়ে আলবাট স্লিপার, বকের উপরে রূপার ঘড়ির চেনটি কলিতেছে। কান্ট'ক ডাক্তারের লম্বা-চওড়া দশলাই চেহারা, বয়স পঞ্চাশের ওপরে; মাঝে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও পরিপুষ্ট পোষ; চুল ও দাড়ি দুইই পাকিয়া প্রায় সাদা হইয়া গিয়াছে; মাথার ঠিক মাঝখানে মেয়েদের সিঁথির মত তেঁড়ি, চোখে কিলের ফ্রেমওয়ালা চশমা। ডাক্তারের সামনে টৌলের উপর সেটোকেপ, প্রেসক্রিপশ্যন লিখিবার কাগজ, দোমাত-কলম, একটি অতি পুরাতন ডাক্তারী জানাল, একটি বাংলা ডাক্তারী বই ইত্যাদি। কান্ট'ক ডাক্তারের পাশে চেয়ারে ঘনশ্যাম বসিয়া আছে, গারে স্মানেরের হাতকটা ফকুরার উপরে পাশেই রক্তের গরম আলোয়ান, পায়ে তাগতলার চটি। ঘরের অন্যদিকে কম্পাউন্ডার জগদীশ চক্রবর্তী রোগীদের ঔষধ দিতে ব্যস্ত। ঔষধ তৈয়ারী করিতে হইতেছে না—আলমারির পাশে একটা প্রকাণ্ড জালায় সকাল হইতেই "জরুরজরু" প্রস্তুত করা আছে। জগদীশ একটা অপরিচ্ছন্ন কলাইকরা মগ ডুবাইয়া ঔষধ বাহির করিয়া শিশি ভরিতেছে, জানাণার সামনে দণ্ডায়মান খরিশদারের হাতে দিতেছে ও পরসা গণিয়া লইতেছে।

পরেশকে দেখিয়া কান্ট'ক ডাক্তার মূখ ও চোখের ইংগিতে আহ্বান করিলেন। ঘনশ্যাম কহিল, "এস বাবাজী! তোমারই কথা হইছিল এতক্ষণ। তা এত দেরি হল যে? বিনয়ের ওখানে গিচ্ছল বুঝি?" পরেশ চেয়ারে বসিয়া গম্ভীর মুখে কহিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" ঘনশ্যাম ক্রমে উৎকণ্ঠার সহিত প্রশ্ন করিল, "বিনয়ের মেয়ের অসুখ এখনও চলছে বুঝি?" পরেশ কহিল, "আজ্ঞে না। অসুখ সেরে গেছে। তবে টাইফয়েডের পর শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা ফিরে আসতে অনেক দেরি হয় কিনা, তাই এখনও ঔষধ চলছে।" কান্ট'ক ডাক্তার তামাক খাইতে খাইতে ঘাড় নাড়িয়া সার দিলেন। ঘনশ্যাম কহিল, "তাই নাকি! তা হলে তো ভারী মুশকিল। বিনয়ের ভাগা ভাল—তুমি গিয়ে বসেছ—একবারে বাড়ির ডাক্তার, হুঁ করতই হাজির হও; কিন্তু তুমি না থাকলে কি হত বল দেখি?" পরেশ গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। কান্ট'ক ডাক্তার নীরবে তামাক টানিতে লাগিলেন। ফকুরার পকেট হইতে নসোর ডিবা বাহির করিয়া একটপ নসা লইয়া ঘনশ্যাম কহিল, "হাতে আরও দুপলী আছে তো? মানে এই হল—কাজের ব্যস। এক জায়গায় বসে সময় নষ্ট না করে হরদম ছুটোছুটি করতে হবে। আমাদের কান্ট'ক দাদা কি রকম খাটতেন চোখে দেখোছ তো! চিবদ শব্দের মধ্যে চোখ পর্যন্ত বজ্রতে চাইতেন না।" পরেশ কহিল, "কাজ থাকলে ছুটোছুটি করতে পারি। কিন্তু কাজ না থাকলেও—" ঘনশ্যাম কথাটা লক্ষিয়া লইয়া কহিল, "ছুটোছুটি করতে হবে, আর তাতেই কাজ হবে। গরলবাহিরে শশী ডাক্তার সকালে বেশ করে এক পেট দুধ-চিড়ে খেয়ে, একটা লোকের মাথার ডাক্তারী ব্যাগ চাপিয়ে, সারানিচ টোটা করে বিশপদ্ম গা ধরে আসত। সেই শশী ডাক্তারের শেষে কি

পশায়। বধবানের কোন এক ডাক্তারের কাছ থেকে নাকি ফিভার-মিক্সচারের প্রেসক্রিপশনটি শিখে এসেছিল; তারই জোরে মরার সময়ে রেখে গেল—
মস্ত ঝুড়িয়ার, বিস্তর টাকাকড়ি, রাজ অট্টালিকার মত পাকা বাড়ি। আরও
কত কি।”

পরেণ মূঢ়াকি হাসিয়া ঘনশ্যামের দিক দ্বিষ্টে মুখ ফিরাইয়া লইল।

কার্তিক ডাক্তার কথাবার্তার মোড় ঘুরাইবার জন্য কহিলেন, “তোমার সেই
বড়জুড়ির কেসটির কি হল? পরেশ কহিল, “আজ সকালে একবার
রেমিশান হয়েছিল। বিকালে ১০০° শব্দ উঠেছে খবর পেলাম। দু’এক
সাতাহের মধ্যে সেৱে উঠবে বোধ হয়।”

“কুইনিন দাও নি?”

“ম্যালেরিয়া নয় বলেই মনে হচ্ছে—পেরোপূর্ণি প্যারা-টাইকয়েড।”

কার্তিক দুই চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, “না। এই যে
জ্বরটুকু রয়েছে, ওটি কুইনিন না দিলে যাবে না। আজ দশ বছর যবে
এখানে প্রাকটিস করে এই আমি বুঝেছি যে, এখানে যে রোগই হোক
না কেন, তার মূলে থাকে ম্যালেরিয়া। কাজেই যাই চিকিৎসা কর,
ম্যালেরিয়ায় চিকিৎসা না করলে রুগী সারবে না।”

পরেণ প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। ঘনশ্যাম কহিল,
“উনি যখন বলছেন, তখন দাগ কয়েক কুইনিন বাইরে দিও বাবা! এ
তরফের লোকদের নাড়ী ঠর হাতে বাধা কিনা, তাই কোথাও একটু
খোঁচ-খাঁচ হলে উনি যতদূর বকছেন, তা তোমরা বুঝবে না।” কার্তিক
ডাক্তার কুণ্ডলীর বদনে বসিয়া রহিলেন, পরেশ ডাক্তারী জানালটো টানিয়া
লইয়া তাহাতে দৃষ্টি সংযোগ করিল। ঘনশ্যাম কহিল, “তা ছাড়া এতবড়
একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার। কাজ না থাকলে, যখন-সেখানে বাজে গল্প না
করে, এখানে এসে ঠর কাছ হাতি বস, ও’র চিকিৎসা প্রশালী চোখে দেখ,
ও’র কাছে-দুটো উপদেশ শোন, তা আঁখের তোমার ভালই হবে। তোমরা
পানই করছে, চিকিৎসা তো কিছই শেষ নি।”

ডাক্তার আসিয়া থপর দিল, “বাড়িতে ডাকছেন।” কার্তিক ডাক্তার
কহিলেন, “হ্যাঁজি, স্বর দেগে। আর গড়গড়াটা নিয়ে যা।” ডাক্তার
গড়গড়াটা লইয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। কার্তিক ডাক্তার
কপাটখানির উদ্দেশে কহিলেন, “সব বুঝি বিদ্যা হল হে জগদীশ?”
জগদীশ টলে বসিয়া, মাথা নীচু করিয়া, হিসাব মিলাইতেছিল, মাথা না
তুলিয়া কহিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ।” ডাক্তার কহিলেন, “আমি বাড়ি যাচ্ছি। তুমি
হিসাব ঠিক করে, দরজা-জানালা বন্ধ করে টাকা আর চালি আমার হাতে
পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাবে।” জগদীশ কহিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ।”

কার্তিক উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, “এস বাবা পরেশ! এস হে
ঘনশ্যাম।”

ডিলেশনসারির পিছনেই কার্তিক ডাক্তারের বাড়ির সদর দরজা।
চুকিতেই বিপ্লবিত উঠান, উঠানে চার পাঁচ ধানের মরাই। তাহাদের মাখ
দিয়া আসিয়া কতকটা আগাইলেই ডান দিকে তরিতরকারীর বাগান,
বামদিকে রাস্তার ও ভাঁড়ার ঘর, সামনে চওড়া বারান্দাবিশিষ্ট তিনের
চালওয়ালা প্রকাণ্ড কোঠা ঘর। নীচে দুইটি কুঠুরী, উপরে দুইটি কুঠুরী,
বারান্দার কোলে একটি পাকা তুলসীমণ্ড, তাহাতে এক একটি সতেজ,
সুন্দর ও লম্বা-প্রশাণা-পত্র-হল তুলসী গাছ; বারান্দার এক পাশে একটি
দড়ির খাটিয়া, তাহার উপরে একটি কালা কবল বিভ্রাণে; নীচের দুইটি
কুঠুরীর মাঝখানে একটি দরজা, তাহা দিয়া সোতলাম যাওয়া যায়। দরজাটির
এক পাশে একটি লঠন জুড়িতেছে।

বারান্দায় পা দিয়াই ডাক্তার হাঁকিলেন, “কোথায় গো?” রাস্তায়
হইতে গৃহিণী সাড়া আসিল, “এই যে হাঁ।” কার্তিক ঘনশ্যাম ও
পরেণকে কহিলেন, “তোমরা বস।” বলিয়া মুখের ইঙ্গিতে খাটেকের
দিকের করিলেন। ঘনশ্যাম—চুটি, পরেশ—জুতা খুলিয়া খাটে বসিল।
ইতিমধ্যে বারান্দার ডাক্তার-গৃহিণীর আবির্ভাব ঘটিল—মোটামোটা চেহে-
রাখব; স্নেহে পায়ের রঙ; হাতের স্বরূপ, অবগুণ্ঠন; হাতে একহাত সোরাগ
চুটি, গলার মোটা হিঙ্গা হাম, নাকে নাকফিরা; পরখানে আধ হাত চওড়া
কালা পাড়ওয়ালা বাড়ি ও সেমিজ। কহে আসিতেই ডাক্তার কহিলেন,
“পরেণ বারান্দা এসেছেন। ঘনশ্যাম ভায়কেও যহ্নে আনলাম। খেতে
কেবারে বাস্খা কর। আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।” ডাক্তার-গৃহিণী
মোটামোটা চুটি, টানিয়া, পরেশের দিকে এক চোখ চাহিয়া লইয়া মৃদু-কণ্ঠে
কহিলেন, “তুমি এস শিখ-গি, রামা-বামা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।” বলিয়া
রাস্তায়ের দিকে চলিয়া গেলেন। ডাক্তার মাঝের দরজা দিয়া লঠন হাতে
উপরে উঠিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার নামিয়া আসিলেন। কামিজ ও কোট খুলিয়া
ফেলিয়াছেন, গারে খুঁড় একটি লম্বাখের ফড়িয়া, পা খালি। রাস্তায়ের
বারান্দার নীচে এক বালতি জল ছিল; সেখানে গিয়া ডাক্তার হাত পা
ধুইলেন। ইতিমধ্যে ডাক্তার একজোড়া খড়ম আনিয়া পাশে নামাইয়া রাখিয়া
গিয়াছিল; খড়ম পায়ে দিয়া খট খট শব্দ করিতে করিতে বারান্দার
আলিয়া ডাক্তার হাঁকিলেন, “কই গো! হল?” গৃহিণী জবাব দিলেন,
“এস সবাইকে নিয়ে।” ডাক্তার কহিলেন, “এস বাবা পরেশ! এস হে
ঘনশ্যাম।”

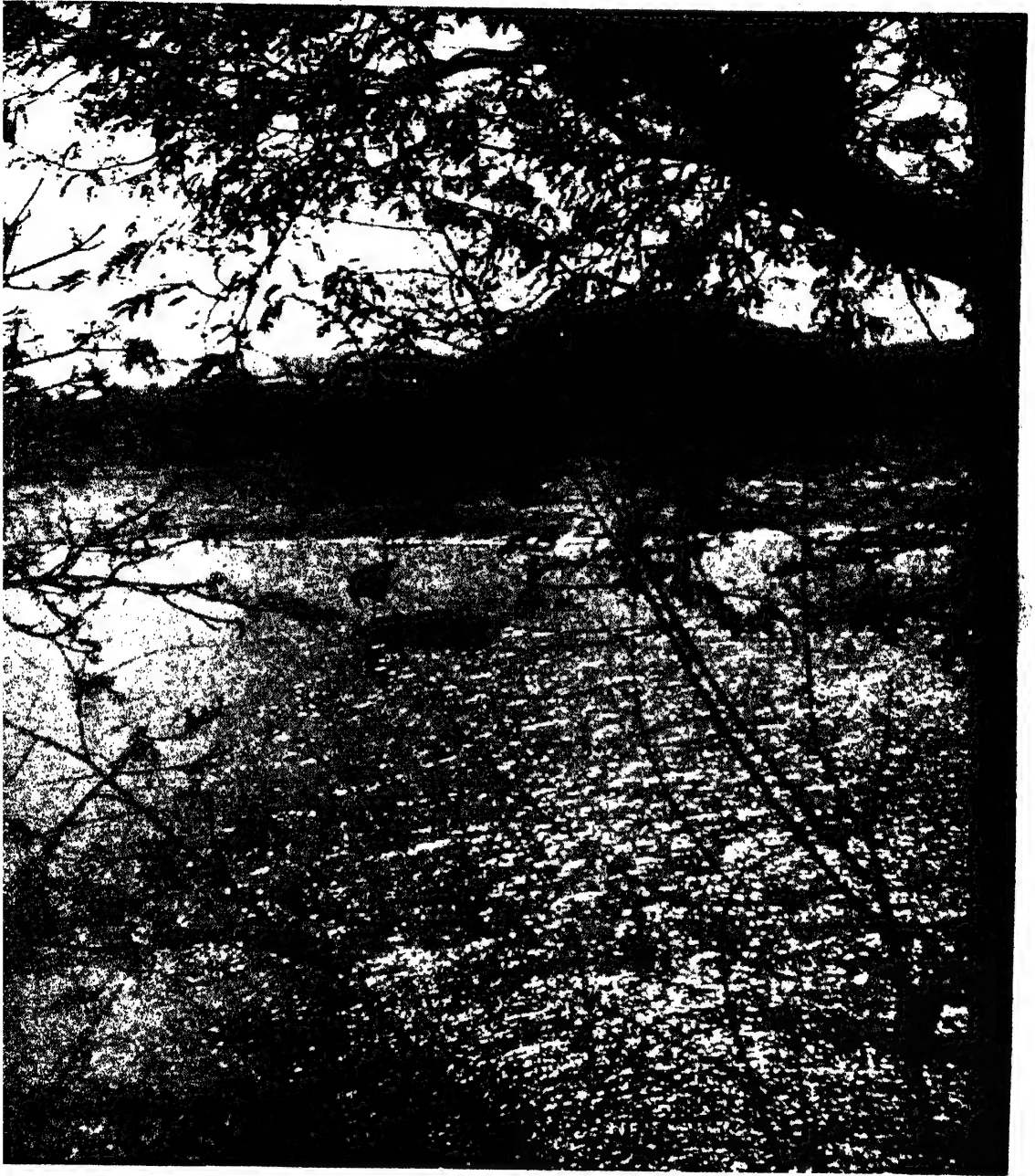
রাস্তায়ের বারান্দার পাশাপাশি জিন্টি পুরো গালিচার আসন পাতা
—প্রত্যেকটির পাশে ঢাকনা দেওয়া মূপার প্লাস। ডাক্তার একপাশের
আসনে দাঁড়াইয়া পরেশকে মাঝের আসনে বসিতে আহ্বান করিলেন,
ঘনশ্যামকে চক্ষের ইঙ্গিতে কহিয়া কহিলেন, “বস হে।” পরেশ ও
ঘনশ্যাম বসিতেই ডাক্তার নিজে বসিয়া হাঁকিলেন, “আন গো।” গৃহিণীর
কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “আলো দিলেন, “যা, দিয়ে আয়—একে একে।”
অনতিবিলম্বে যে থালা হাতে বাহির হইয়া আসিল সে আর কেহ নহে—
ডাক্তারের কনিষ্ঠা কন্যা কমলা, বয়স—পনেরো কি ষোলো, উজ্জ্বল শ্যাম
গায়ের রঙ, লম্বা ছিপছিপে গঠন, লম্বা ধরণের মুখ; চোখ, নাক, চিক
ও অধরোষ্ঠের গঠন ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখিলে হয়তো মুখের গঠন
নিখুঁত নহে, কিন্তু সমগ্র মুখের মধ্যে এমন একটি নবপূজার মত পেলব
ও চিকণ শ্রী আছে, যে একবার দেখিলে আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে।
কমলা বাহির হইয়া আসিতেই ঘনশ্যাম তাহার দিকে চাহিয়া কহিল,
“এই যে মা কমলা স্বয়ং আজ পরিবেশন করছেন।” পরেশ মুখ তুলিয়া
চাহিল; মেয়েটি লজ্জিতমুখে পরেশের দিকে চাহিতেই দইজনে চোখো-
চোখি হইল; পরেশ মুখ ফিরাইয়া লইল; কমলা মুখ নামাইয়া লইয়া
কার্তিকের সামনে নত হইবার উপক্রম করিতেই কার্তিক কহিল, “এখানে
নয় মা, ওখানে দে।” বলিয়া পরেশের সামনের জায়গাটি নির্দেশ করিলেন।
মেয়েটির লজ্জা বিগলন হইয়া উঠিল; একেবারে গলার সহিত মুখ
মিলাইয়া দিয়া, লজ্জা-জড়িত পদে, কম্পিত হস্তে, থালাটা পরেশের সামনে
নামাইয়া দিয়া, দ্রুতপদে রাস্তায়ের পলায়ন করিল।

রাস্তায়ের ভিতর হইতে গৃহিণীর মৃদু তর্জন শোনা গেল, “যা,
সব দিয়ে আয়।” কার্তিক-তনয়ার চাপা প্রতিবাদও শ্রুত হইল, “পারব
না আমি, তুমি দিয়ে এস।” কার্তিক কহিলেন, “তুমিই দিয়ে যাও গো!
কমলাকে বসিয়ে রাখবে।” দুই হাতে দুইটি থালা লইয়া কার্তিক গৃহিণী
বাহির হইয়া আসিলেন, এবং একে একে যথাস্থানে নামাইয়া দিয়া কহিলেন,
“জরী লাঞ্ছ। অচ্চ সব নিজে রান্না করছে, আমাকে কিছটি করত
দেয় নি।” ঘনশ্যাম দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, “বলেন কি ঐতনি।
সব নিজে? মা তো তা হলে সাক্ষ্য অনুপর্ণা দেখছি।” গৃহিণী
ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, “সব শিখেছে যে, আমাকেই হার মানিয়ে দেয়
আজকাল। খেয়ে দেখনা যেমন হয়েছে।” ঘনশ্যাম মাঝের কোল স্নিগ্ধত
এক মূঠা পোলাও মুঠে তুলিয়া পরম আরামে দুই চোখ বুজিয়া কহিল,
“চমৎকার!” স্বয়ং জগদীশ দেবেরও কোনদিন এমন খোটে নি বোধ হয়।
এ মেয়ে যখন ঘরে বাবে তার ঘরে অগ্নিমান্দ্য কোনদিন পা দেবে না—জোর
করে বলতে পারি।” পরেশ হাসিয়া কহিল, “তা হলে তো
ভারী মুশকিলের কথা বললেন। আজকাল এই মণি-গণ্ডার
দিনে রাস্তার পুরে ঘরদুখ লোকের জঠরানল যদি দাউ দাউ
করে জ্বলে ওঠে, তবে তো গৃহস্থকে পথে বসতে হবে।”
কার্তিক-গৃহিণী এই বেকাস কথা বলার জন্য ঘনশ্যামের দিকে তাকাইয়া
বিরক্তচক্রে ভ্র-ভঙ্গী করিলেন। ঘনশ্যাম কহিল, “তেনন গৃহস্থের
বাড়িতে পড়বে কেন বাবাজী! লক্ষ্য মেয়ে লক্ষ্যমত ঘরেই পড়বে।”
জবাবল বদনে, গদগদকণ্ঠে, দুই কুহকৃত চোখের দৃষ্টি ঘন করিয়া,
কহিল, “আহা! মা আমার নামে কমলা, কাজেও কমলা। আমি বটল
খিঁজি কউঠান! যে বাড়িতে এ মেয়ে বাবে, তার ঐশ্বর্য উললে পড়বে।”
কার্তিক ডাক্তার মূঢ়াকি হাসিয়া কহিলেন, “ওহে, বড়ভাড়া করছ যে!
যাও—সব ঠাট্টা হয়ে গেছে।” ঘনশ্যাম দুই চক্ষের দৃষ্টি স্মরণে
জগদীশ হইতে এক হুহুতে মিজের আলার উপরে ফিরাইয়া আসিয়া
ক্লান্তহস্তে বাকি বকেয়া উললে করিতে শুরু করিল।

(৮)

পরদিন পূর্বাহ্ন—বেলা আটটা। পরেশ তাহার বৈঠকখানার
দরজার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ছিল। বড়জুড়ির রোগিনীটির খবর
লইয়া লোক আসিবার কথা আছে, তাহাই প্রতীকার বোধ হয়। সে আজ

সম্ভারাগে শিলিমিলি—



সম্ভারাগে শিলিমিলি—শিলিমিলি

প্রায় সাত মাস এখানে আসিয়াছে, এখনও তাহার রোগীর সংখ্যা কুড়ির কোঠা অতিক্রম করে নাই। গ্রামের সকলেই কার্তিক ডাক্তারকে ডাকে। তবে রাতে কহাঙ্কি রোগের ব্যর্থ হইলে তাহারই ডাক পড়ে। অবশ্য কি ধনী কি দরিদ্র, কেহই ফী দেয় না। যাহারা তাহার অস্বাস্থ্য তাহাদের কাছে সে ফী দাবী করে না, কিন্তু যাহারা অনাস্বাস্থ্য, পিতার মৃত্যুর পর হইতে যাহারা বরাবর তাহাদের বিরুদ্ধতাই করিয়াছে, তাহারাও ফী চাহিলে আঁকড়াইয়া উঠে, দুই চোখ বতদূর সম্ভব চাড়াইয়া বলে, “সে কি বাবা! তোমাকে ফী দিতে হবে? আমাদের মহেশ দাদার ছেলে তুমি! ঘরের ছেলে যে বাবা!” কেহ মুখের সামনে হাত নাড়িয়া বলে, “ও কথা বলো না বাবা! চন্দ্র, সূর্য এখনও উঠছে, ধর্মই সইবে না। মহেশ দাদার অনেক করেছে আমি।” হঠাৎ ফাঁট করিয়া কাদিয়া ফেলিয়া কহে, “কি লোক ছিলেন! তার ছেলে তুমি! আজ থাকলে কত আনন্দ করতেন।” কেহ কেহ রাগিয়া উঠিয়া কড়া গলায় শুনাইয়া দেয়, “তোমাকে আবার ফী দিতে হবে নাকি? তা’ হলে তো হাসপাতালের ডাক্তারকে ডাকতে পারতাম।” কেহ বা শেলবের ধ্বংস কহে, “অগো চিকিৎসে শেখ, বাবা! তারপর ফীরের বান্ধনা করবে। এই যে শেখবার সুযোগ পেয়েছ, তার জন্যে বরং কিছু দিয়ে যাও।”

গ্রামের বাহিরে দুইচারজন যাহারা তাহাকে ডাকিয়াছে, তাহারাও শূন্য যথাসাধ্য ফী দিয়াছে, এবং রোগী আরোগ্য লাভ করিবার পর গ্রামের অধিকাংশ লোকের বিশেষ করিয়া প্রতিবেশীদের মত, কার্তিক ডাক্তারকে দেখাইলে রোগী আরও সহজে ও স্বল্প অরাম হইতে বলিয়া বসিয়া বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া নিন্দা করে নাই।

হঠাৎ পদশব্দ শুনিয়া পরেশ খাড়া হইয়া বসিল। লোকটা আসিচ্ছে বোধ হয়। টেবিলের উপর দেয়াত কলম ও কাগজ ছিল। কলমটা কালিতে ভুবাইয়া, একটি কাগজ টানিয়া লইয়া নতমস্তকে লিখিতে লাগিল। পদশব্দ স্পষ্ট ও স্পষ্টতর সময় ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেই পরেশ মূখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল—কেহ আসে নাই। কলমটা ফেলিয়া দিয়া, কাগজটা সরাইয়া রাখিয়া, পরেশ পূর্ববৎ ঢিলা পোকে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—লোকটা আজ আর আসিবে না বোধ হয়। হয়, রোগী ভাল আছে, কিবা প্রতিবেশীদের পরামর্শে রোগীর অভিজ্ঞাবক কার্তিক ডাক্তারকে অথবা হাসপাতালের ডাক্তারকে ডাকিবার উদ্যোগ করিতেছে। এখানের লোকদের ধরনই এই। একজনকে বাড়িতে অস্বস্থ হইলে গ্রামের সকলে গিয়া জড়ো হয়; কোন সাহায্য না করিলেও অযাচিত অজ্ঞ প্রদেশ দিয়া দিয়া রোগীর আত্মীয়স্বজনদের উদ্ভ্রান্ত করিয়া দেয়। এমনকি ডাক্তারকেও চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ দিতে তাহারাই ইচ্ছাকৃত করে না। বিধি অসুখের সময় গ্রামের লোক বিনয় মাস্টারকে পরামর্শ দিতে কসুর করে নাই—“করছ কি! এতবড় শক্ত রোগী, এ অনাড়ম্বর ডাক্তারের হাতে! এর চেয়ে কার্তিকের কম্পাউন্ডারকে ডাকলে ভাল চিকিৎসে হ’ত যে! কল্লীনি বামনের মেয়ে বলেই পারছ, ছেলে হ’লে কি পারত?” তাহাকেও প্রত্যেক দিন প্রত্যেক জন জিজ্ঞাসা করত, “কেমন মনে হচ্ছে?” দারুণ উৎকর্ষের ভঙ্গীতে বলিত, “আমার তো ভাল মনে হচ্ছে না। একবার কার্তিক ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করলে হ’ত না?” বিনয় মাস্টার কাহারও পরামর্শ শূন্যে নাই, একান্তভাবে তাহারই উপর নির্ভর করিয়াছিল। ববিও তাই। ভগবানের উপরে ভক্তের, যাদের উপরে শিশুর, রেলগাড়ির চালকের উপরে যাত্রীর অসম্বন্ধ বিশ্বাস লইয়া সে নিজেকে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়াছিল। কোনদিন বিধবা করে নাই; কোন দিন কোন কাহার অস্বাস্থ্য হয় নাই; নিদারুণ রোগের যত্নগাওতে কোনদিন বিরক্তি প্রকাশ করে নাই। সারিয়া উঠিবার পরও তাই। সারাদিন বিছানায় শুইয়া বা বাঁশলে ঠেস দিয়া বসিয়া, ক্রান্ত চক্ষুর করণ দৃষ্টি মৌমাছির তাহার প্রতিক্ষায় বসিয়া থাকিত। তাহাকে দেখিবারমত তাহার মুখ ও চোখ পরম সূক্ষ্মতবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

বৈঠকখানা ও অল্পবয়সের মাঝখানের দরজা খুলিয়া একজন বিধবা মহিলা বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। মহিলাটির বয়স চাট্টিশের কাছাকাছি—সেখিতে ফরসা ও কাহিল; মাথার চুল ছোট করিয়া ছুটি, তাহার উপরে স্বল্প অবশ্যুতন। পদশব্দ শুনিয়া পরেশ তাহার দিকে চাহিতেই বিধবা কহিলেন, “কিছু খাবি না?” পরেশ কহিল, “না। কাল রাতের খাওয়া এখনও হজম হয় নি।” একটি ঢেঁকুর তুলিয়া বিকৃতমুখে কহিল, “আজ দিনের বেলায় কিছু খাব কিনা ভাবছি।” বিধবা মৃদু হাসিয়া মিহি গলায় কহিলেন, “কি এমন খেয়েছিস কাল?” দুই চোখ বড় করিয়া পরেশ কহিল, “কিন্তু! ডাক্তার এমনই না পারুক, দিন কতক

খাওয়ালেই না থেকে আমাদের পালাতে হবে।” বিধবা স্থিতমুখে কহিলেন, “তোমার যেমন কথা! যা ভাল বোধিস কর।” বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া অল্পের ঢালিয়া ফেলিলেন।

বিধবা পরেশের মাসীমা। — চাহার মায়ের ছোট বোন। সংসার তাহার একটিমাত্র পুত্র ও একটিমাত্র কন্যা। কন্যাটির বিবাহ দিয়াছেন, জাম চাকুরী করে। কন্যা সংসারে শাশুড়ী, বিধবা নন্দন বা এমনই ধরণের কে অভিজ্ঞাবিকা না থাকায় জামাইয়ের অনুরোধে পত্রটিকে লইয়া এতদিন কন্যা কাছেই ছিলেন। পরেশ প্রাণ্ডিস করিবার জন্য গ্রামে আসিবার সময়ে তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে।

মাসীমা প্রস্থান করিতেই পরেশের মনে হইল, এমন করিয়া বসি থাকিয়া লাভ নাই, একটু ঘুরিয়া আসিলেই হয়; বিনয় মাস্টার বোধ হ এখনও বৈঠকখানায় বসিয়া মেয়েদের পড়াইতেছে, ববিও হয়তো কা বসিয়া পড়িতেছে; সেখানোই একটু আড্ডা দিয়া আসিলে শ্রান্ত হয় না। ববি কথা মনে হইতেই পরেশের দেহে ও মনে উৎসাহের জোয়ার আসিল, চেয়া হইতে তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, একলক্ষে দেওয়ালে টাঙানো কোটী কাছে আসিয়া, টান মারিয়া কোটীকে হুক হইতে খুলিয়া লইয়া, গায়ে দিতে উন্নত হইল। হঠাৎ জুতা ও কাসির শব্দ শোনা গেল। পরেশ ভাবিল লোকটা আসিয়াছে বোধ হয়। অতএব এক মুহূর্তে স্থিরভাবে ধারণ করিল তারপর ধীরেসুস্থে জামাটি গায়ে দিয়া, লোকটিকে ডাক্তারের সময়ে মহাবতী সম্মুখাইয়া দিবার জন্য মুখে কঠোর গাম্ভীর্ণ্যের অবতারণা করিয় পরজার দিকে তাকাইতেই দেখিল—ঘনশ্যাম দাঁড়াইয়া আছে। চোখোচোখি হইতেই ঘনশ্যাম কহিল, “কি বাবা! কোথাও বেরোছ নাকি? কল-টল আছে বুঝি?” পরেশ কহিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ। বসুন।” ঘনশ্যাম মূর্চ্চা হাসিয় কহিল, “বসতে তো বলছ, কোথায় বসি বলতে পার? আসবাবপত্র তো এখনও কিছু কর নি। বসবার ব্যবস্থা তো এই একটি ঠাণ্ডা টিনের চেয়ার, আর এই একটি ভাঙা টুল—”বলিয়া চোখ ও মূর্চ্চের ইঙ্গিতে চেয়ার ও টুলটি নির্দেশ করিল। পরেশ লজ্জায় মূখ রাভা করিয়া কহিল, “এই চেয়ারটাতে বসুন আপনি।”—বলিয়া সারিয়া দাঁড়াইয়া নিজের চেয়ারটা আগাইয়া দিল। ঘনশ্যাম দুই হাত বাড়াইয়া প্রসারিত করল নাড়িয়া কহিল, “থাক, থাক। বসব না। সময় নেই, কল্লের সময় হয়ে এল।”

ঘনশ্যাম কিন্তু নোহাঁ মিথ্যা কথা বলে নাই। ঘরটিতে আসবাবপত্র বোধ কিছু ছিল না। ঘরের এক দিকে একটি টেবিল—তাহার এক পাশে একটি কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ার, আর এক পাশে একটি সবুজ রঙের টিনের চেয়ার। কাঠের চেয়ারটিতে পরেশ স্বয়ং বসে এবং কেহ আসিলে টিনের চেয়ারটি বসিতে করে। ঘরের আর একদিক আর একটি ছোট টেবিল— তাহার উপরে একটি গুজন করিবার নিষ্টি, শাদা পাথরের হামাম-দিস্তা, ছুরি, মেজার প্লাস ইত্যাদি, কতকগুলি ঔষধের শিশি ও একটি বড় বোতলে জল। টেবিলের সামনে একটি টুল। এই টুলটি কম্পাউন্ডারের বসিবার জন্য। অবশ্য পরেশের কম্পাউন্ডার রাখিবার অবস্থা এখনও হয় নাই। ডাক্তার ও কম্পাউন্ডারের কাজ তাহাকে একলাই করিতে হয়।

পরেশ প্রশ্ন করিল, “আপনার কোন দরকার ছিল কি?” ঘনশ্যাম ঔষধের টেবিলটার দিকে তাকাইয়া কহিল, “ডেবেছিলিলাম একটু ওষুধ খাব— সকাল থেকে পেটটা খোঁচাচ্ছে, তা তোমার কি ওষুধপত্র কিছু আছে? টেবিলটাতে তো দেখছি মাত্র কয়েকটা শিশি।” পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বৈকি! বাড়ির ভিতরে আছে—আপনার ওষুধ দিচ্ছি তৈরি করে।” ঘনশ্যাম দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ তাহাকে বসিবার জন্য আর অনুরোধ না করিয়া, ও-দিকের টেবিলটির সামনে গিয়া দাঁড়াইল এবং অনতিবিলম্বে মেজারপ্লাসে ঔষধ তৈয়ারি করিয়া আনিয়া ঘনশ্যামের হাতে দিয়া কহিল, “খেয়ে ফেলুন—” ঘনশ্যাম প্লাসটি লইয়া বারকয়েক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া কহিল, “হজমের ওষুধ দিচ্ছে তো?” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ।” ঘনশ্যাম কহিল, “তবে খেয়ে ফেলি কি বল?” বলিয়া ঢকঢক করিয়া ঔষধটা গিলিয়া ফেলিয়া ঔষধের ঝাজে চোখ-মুখ কুচকাইয়া কহিল, “ভারি ঝাঁজ।” পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “জল খাবেন নাকি?” ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া “হ্যাঁ” জানাইতেই পরেশ টেবিল হইতে জলের বোতলটা আনিয়া প্লাসে ঢালিয়া দিল। ঘনশ্যাম জল গিলিয়া কহিল, “আর একটু যাও বাবা! প্লাসটা এটো হয়ে গেল, ধুয়ে দিই।” পরেশ কহিল, “থাক, আপনাকে খতে হবে না, দিন।”—বলিয়া প্লাস লইয়া নিজেই ধুইয়া টেবিলে রাখিয়া দিল।

ঘনশ্যাম কহিল, “এখনই বেরোছ?” পরেশ কহিল, “না, একটু কাজ আছে—আপনি এখানে।” ঘনশ্যাম কহিল, “খুব কি দৌর হবে? তাহলে

না হয় একটু অপেক্ষাই করি।" পরেশ যথাসম্ভব বিরক্তি চাপিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, "না, বোধক্ৰমে দৌর হবে না। আপনি তাহলে দাঁড়িয়ে না থেকে চোয়ারটোতেই বসুন।" বলিয়া বিনা প্রয়োজনে বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া পরেশ কহিল, "চলুন।" ঘনশ্যাম দাঁড়িয়াছিল, কহিল, "চল বাবা।" বারান্দার খুঁটিতে তৈসানো সাইকেলটা হাতে লইয়া পরেশ কহিল, "আপনি কোথায় যাবেন?" ঘনশ্যাম ভ্রু কুচকিয়া কহিল, "কোথায় আবার? বাড়ি বাবা।" পরেশ কহিল, "তাহলে আপনি যান, আমাকে এই দিকে একটুখানি যেতে হবে।"—বলিয়া সাইকেলের মূখ্য ঘুরাইয়া দাঁড়িতে উদাত হইতেই ঘনশ্যাম কহিল, "বেশ তো! আমিও এই দিকে দিয়েই যাব—একটু ঘোরটু হবে, তা হোক। কথা কইতে কইতে যাওয়া হবে তো।" ঘনশ্যামের ঘনায়মান ঘনিষ্ঠতার ঘাবড়াইয়া গিয়া পরেশ কহিল, "তাহলে আপনার সঙ্গেই যাই—বড়জুড়ি যেতে হবে একবার—এদিকের কাজটা বিফলে সারবন।"

কতকটা দূর গিয়া ঘনশ্যাম হঠাৎ পরেশের কাছে হাত দিয়া চাপ দিয়া কহিল, "দাঁড়াও একটু।" পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কিস্ময়ের স্বরে কহিল, "কি হ'ল?" ঘনশ্যাম কহিল, "কিন্তু না, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।" ঘনশ্যামের মুখোন্মুখ দাঁড়াইয়া পরেশ উৎসুক নয়নে চাহিয়া রহিল। ঘনশ্যাম গলা খাড়িয়া কহিল, "কাল কি রকম দেখলে?" পরেশ বিস্মিত স্বরে কহিল, "কাকে?"

"কেন—কার্তিক ডাক্তারের মেয়ে কমলাকে?" পরেশ ভ্রুকণিত করিয়া কহিল, "দাঁড়াও একটু।" ঘনশ্যাম কহিল, "বলছি। আগে বল—কেন দেখলে!" পরেশ একটু ভাবনার ভান করিয়া কহিল, "মন্দ কি!" ঘনশ্যাম মাথার কাঁকানি দিয়া কহিল, "মন্দ নয়। বেশ! রঙটাই যা একটু নীসেস, না হ'লে এমন মুখ-চোখ তুমি বিনয় মাষ্টারের বাড়ি চষে বেড়াতেও পাবে না।" বিরক্তির সহিত পরেশ কহিল, "তার মানে?" ঘনশ্যাম কহিল, "মানে—বিনয়ের বড় মেয়েও রঙটাই যা ফরসা—কমলার মত মুখ-চোখ নয়।" পরেশ কহিল, "ওদের কথা আপনি মিছেমিছি টানছেন কেন?" ঘনশ্যাম চোখ মটকিয়া কহিল, "টানছি কি সাথে রে বাবা! সবাই মিলে তোমরা টানাচ্ছ যে! এ যে সারাদিন বিনয়ের বাড়িতে বসে আছা দাও, বিনয় বা বিনয়ের স্ত্রী টু শব্দটি পৰ্যন্ত করে না, এর কি ভাবছ কোন উদ্দেশ্য নেই? পড়োগিসের সমাজে বাস করে, পড়শীদের চোখের সামনে, একজন যোয়ান ছেলেকে নিজের বাড়ি মেয়ের সঙ্গে রাতদিন নেশে থাকতে শব্দ শব্দ কেউ দেয়?"

পরেশ তীব্রকণ্ঠে কহিল, "আপনি যা-তা বলতে আরম্ভ করেছেন।" ঘনশ্যাম দাড় নাড়িয়া কহিল, "যা-তা বলি নি বাবা। পাড়াগিয়ে অনেক দিন একটানা বাস কর নি কিনা, তাই এখানকার লোকের স্বভাব জান না। বাইরে মনে হয় বেশ সাদাসিধে, হাবাগোবা মানুষ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একবারে জালিলার পাটা। এ যে বিনয়, হেসে হেসে কথা কয়, সোয়া লোক নাকি? বিশেষ করে ওর স্ত্রীটি—একটু শব্দে গম্ব আছে যে।" পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "ও কথা আমি প্রাণ গেলেও বিশ্বাস করতে পারব না—এতটুকু থেকে ওদের দেখে আসছি; বরাবর আমাকে ও'রা খুব স্নেহ করেন।"

ঘনশ্যাম তাকিলের হাসি হাসিয়া কহিল, "স্নেহ! দু'শানা ম'ণ্ডা, দু' কাপ চা খাইয়ে সবাই স্নেহ করতে পারে।" মুখের কাছে মুখ আনিয়া নাক উড়াইয়া কহিল, "কিন্তু ও তো মূখের স্নেহ, আসল স্নেহ হ'ল ভিতরে।"—বলিয়া নিজের বুক হাত দিয়া কহিল, "বুকের মধ্যে অত্যন্ত গোপনে থাকে, সহজে ভোকা যায় না। যেমন ঘরো—আমার স্নেহ, কোন দিন বুকতে পেরছে? অথচ ভিতরে ফগুধারা বয়ে যাচ্ছে দিনরাত—রাত শব্দেও তোমার কথা ভাবি। শব্দ আমি নয়—তোমার খুঁড়িও।" পরেশ কহিল, "কিন্তু বিনয়কাকা আর কাকিমা মায়ের অসুস্থের সময়ে যা করেছিলেন, তা কোন দিন ভুলব না। তা ছাড়া মায়ের মৃত্যুর পর—পরেশের মুখের কাছে ডানহাতটা আনিয়া ঘনশ্যাম নাড়িয়া ঘনশ্যাম কহিল, "ও কথা যেতে দাও। সব গিয়েই আন দলাদলি থাকে; মানুষ মরলে সব গিয়েই আন একটু চাপ দেয়; কিন্তু হাতে-পায়ে ধরলেই, সমাজের সম্মান করলেই সব মিটে যায়।"

উভয়ে চলিতে শব্দ করিল এবং অচিরে বিনয়ের বৈঠকখানার সামনে আসিয়া হাজির হইল। প্রতিদিনের মত বৈঠকখানায় বসিয়া বিনয় মেয়েদের পড়াইতেন। ঘনশ্যাম হাঁকিয়া কহিল, "কিছে বিনয়বাবু, কি হচ্ছে?" বিনয় মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল, "কোথায় বাওয়া হয়েছিল—পরেশের কাছে নাকি? বাড়িতে অসুখ-বিসুখ বাবু?" বলিয়া উঠিয়া বারান্দার আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশের নাম শুনিয়া ববি মুখ তুলিয়া চাহিয়া পরেশের

সহিত চোখেচোখি হইতেই মুখ নামাইয়া লইল। ঘনশ্যাম কহিল, "বাড়ির অসুখ নয়, নিজের পেটটা সকাল থেকে ভাল নেই! কাল কার্তিক ডাক্তারের বাড়িতে পরেশ বাবাজীর নেয়ত্রস্থ ছিল; ডাক্তার আমাকেও ছাড়ল না, টেনে নিয়ে গেল। ওর বাড়ির খাওয়ার ব্যাপার জান তো, শেষকৃত্যের খরচ টাকা গড়ে খেতে বসতে হয়। থাকে-তাকে পণ্ডরাজন দিয়ে না খাওয়ালে ডাক্তার-গিরাঁর তৃপ্ত হয় না, কাল তো বিশেষ ব্যাপার।" পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, "চল, বাবা! তোমার আবার কোথায় ডাক আছে বলাহলে, মিথো দৌর করে লাভ নেই।" বিনয় চুপচাপ হাসিয়া কহিল, "আপনিও ওর সঙ্গে ডাকে চলেছেন নাকি?" ঘনশ্যাম কহিল, "পাগল নাকি! শব্দ আছে না? এমনই কাকা-ভাইপো গল্প বলতে করতে যাব আর কি।" বলিয়া চলিতে উদাত হইতেই বিনয় কহিল, "পরেশের চা খাওয়া হয়েছে?" ঘনশ্যাম মুখ ফিরাইয়া বাকী হাসি হাসিয়া কহিল, "না—এখনও বাকি আছে—নটা বাজছে কি না।" পরেশ ববির দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া লইয়া নিরুশায়মুখে কহিল, "হ্যাঁ, আচ্ছা, বসুন, আমি—" বলিয়া ঘনশ্যামের অনুগামী হইল। কিছুদূর আসিয়া ঘনশ্যাম মুখ তেঙেচাইয়া কহিল, "চা! এক কাপ করে চা খাইয়েই ভানছে মেয়েটিকে ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে, মৃগদন্ত তো কত। পণ্ডরাজী টাকা মাইনে, জমি-জিরেও এক ছটাক নেই। তার ওপর দুটো মেয়ে।" চোখ দুটো বড় করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "তুমি কারও ধাপ্পায় ভুলা না বাবা! তোমার মাথার উপরে কেউ নেই। শব্দ রূপ দেখলেই তোমার চোখে না; মেয়ের চোখে মেয়ের বাবাটি দেখে তোমাকে বিয়ে করতে হ'ল।" পরেশ হাসিয়া ফেলিয়া আবার গম্ভীর হইয়া কহিল, "কিন্তু শুঁরা তো আমার সঙ্গে বিয়ের কথা কোনদিন বলেন নি। বরং আমাকেই বাবর জন্য এর যোগাড় করতে বলাহেন।" "হেং হেং" করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "ধাপ্পা! স্নেহ ধাপ্পা! বললাম যে, ওরা মুখে এক, মনে আর। মনে মনে তোমাকে গাধার ইচ্ছে বরাবরই, শব্দ টোপ গিলেছ কিনা দেখবার জন্যে, ঘাই মেরে দেখছে।" পরেশ কহিল, "মানে?" ঘনশ্যাম চোখ ঠারিয়া কহিল, "মানে পরে বুকতে পারবে, বাবা! তবে সত্যিকার শাকাক্ষীর একটা কথা শোন—ওদের যদি আর পা দিত না, বড় সাংঘাতিক লোক ওরা।" পরেশ বিরসমুখে বিনা প্রতিবাদে চুপ করিয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "মেয়ের শব্দ রূপ থাকলেই হয় না, ভাগা থাকা চাই। কমলার কোষ্ঠিতে ভাগ্যদানই স্বয়ং বহুসপতি। না হ'লে অত বড়লোকের বাড়িতে জন্ম হয়?" দম লইয়া কহিল, "কার্তিক ডাক্তার নাকি জমি-জায়গা-টাকা-কড়ি সব ছোট মেয়েটিকে দিয়ে যাবে।" পরেশ নীরব। কিছুক্ষণ পরে আবার ঘনশ্যাম কহিল, "ত মেয়ের অবশ্য পাঠের অভাব হবে না। বিয়ে দেব" বলতে না বলতে কত বড় বড় ঘর থেকে ভাল ভাল ছেলে এসে ওকে গাফে নিয়ে যাবে, তবে—" হঠাৎ ধানিয়া, ডাক্তার কাছে মুখ আনিয়া, কতখবর নীচু করিয়া কহিল, "কথাটা কি জান, ডাক্তার-গিরাঁর ভারী ইচ্ছে—তোমাকে জমাই করতে। মনের মত ছেলেও কই, তা ছাড়া মেয়েটি চোখের নামনে থাকবে, কোলের মেয়ে কিনা। ডাক্তার প্রথমে রাজী হয় নি—মস্ত বড় তুলানি কিনা—বরানগরের বাড়িজে—পাকা সোনাতোও খাদ আছে—ওদের কুল একেবারে নিখাদ।" চোক গিলিয়া কহিল, "তবে গিরাঁর জিন্দে শেষে রাজী হয়েছে।" পরেশ গম্ভীরমুখে চুপ করিয়া রহিল। দুইজনে আবার চলিতে শব্দ করিল এবং কিছুক্ষণ পরে যেখানে হাজির হইল, সেখানে হইতে রাস্তাটা দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটি শাখা ঘাটিকা গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে; আর একটি শাখা সোজাসৃজি গিয়া সরকারী পাকা রাস্তার সঙ্গে মিলিয়াছে। ঘনশ্যাম ধানিয়া কহিল, "এখানে বিয়ে করলে তোমার অনেক সুবিধে হবে বাবা! অতবড় একটা ডাক্তার মরুশীল হ'লো। এমন দিনাতেও একটা যোগ্যের মুখ দেখতে পাছ না, কার্তিক ডাক্তার পিছনে থাকলে রোগীদের টানটানিতে নিশ্বাস ফেলতে সময় পাবে না। আচ্ছা, আস তা হ'লে। ভেবে দেখো, যে ঘাই বলুক, আমরা সবাই তোমার মগজাশাক্ষী।" বলিয়া ঘনশ্যাম চলিয়া গেল। পরেশও সাইকেলে উঠিয়া সোজা রাস্তাটা দিয়া বিনা কাজেই ছুটিতে শব্দ করিল।

(৯)

গ্রাম পার হইলে, দুই পাশে বিস্তৃত প্রান্তর; মাটির রঙ লাল; মাঝে মাঝে অ-গভীর খাদ; মাটি খুঁড়িয়া লইয়া গিয়া গ্রামের লোক গরের সৌন্দর্য বধনের জন্য ওপর্যালে সোঁপিয়া থাকে। ডান দিকে হরিরাঙ্গার, নেত্রের ছোট গ্রাম—শব্দ, গয়লাদের বাস। গ্রামের বাইরে গরু ও মহিষের



আপনার
ছানিত দেহিক
ভারতীয় সিল্পে
অপরাধ কার
তুলন

ফোন • বি.বি. ৪১১

ইণ্ডিয়ান সিল্প হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখে জাতির সহানুভূতি!



ফোন :

"ক্যাল ২৭৬৭"

(স্থাপিত-১৯৩৫)

হেড অফিস-৩নং ম্যাগো লেন, কলিকাতা

গ্রাম :

"জনসম্পদ"

শাখাসমূহ

কটিং	ভাগলপুর	ডোমার	খোলপুর
ঢাকা	মৌলভীবাজার	তমলুক	শাকচী
নারায়ণগঞ্জ	আনন্দপুর	বাকুড়া	পূরী
নীলফামারী	কর্ণেলগোলা	চাকুলিয়া	বালেশ্বর
মালদহ	বাগীচক	কুফনগর	কটক
শান্তিপুর	কোলাঘাট	চুয়াডাঙ্গা	টাটনগর
মেহেরপুর	বেলঘা		

কলিকাতা শাখা

বড়বাজার শ্যামবাজার হাওড়া দক্ষিণ কলিকাতা

১৯৪২ সালে শতকরা ৫, টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

১৯৪৩ সালে শতকরা ৬, টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাংক সংক্রান্ত সব প্রকার কার্য করা হয়।

ঋণ ও ওভার ড্রাফট-সুবিধাজনক সত্তে অনুরোধিত সিকিউরিটীর উপর দেওয়া হয়।

এসিস্টেন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

মি: এম. কে. জর্জ ও মি: পি. ঘোষ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

ডাঃ এম. এম. চ্যাটার্জী

শাল দেখা বাইতেরে—রাস্তা ক্রমে উঁচু হইয়া উঠিতেছে। একটু অগ্রসর হইলেই সামনে বেঁড়ে বন—ছোট বড় শাল ও পিয়াল গাছের বিস্তীর্ণ জঙ্গল—গাছের কোলে কোলে হলেসে ফুলওয়ালা কটিগাছের ঘন সমাবেশ। শেষ-শেষ মাসে এই বনে এটেরীফুল ফোটে; গম্ভীর চারিদিক ভরিয়া উঠে; রাস্তা হইতে মোম্যাছদের গন্ধ শোনা যায়। সরস্বতী পুজার সময়ে কাছাকাছি গ্রামের ছেলেরা (অবশ্য বাছাদের যা সরস্বতীর সংগে সম্পর্ক আছে) এই বনে এটেরীফুল তুলিতে আসে। একদিনের জন্য নিজের বনভূমি বলকদের তীক্ষ্ণ ও তরল কণ্ঠের উল্লাসধ্বনিতে ম্খরিত হইয়া উঠে। দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, দিগন্তের কোলে বিরাট নীল হস্তীর মত শূন্যনিয়া পাহাড় দেখা যাইতেছে।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতেই রাস্তাটি সরকারী পাকা রাস্তায় পড়িল। এই রাস্তাটি দক্ষিণ দিকে জেলা শহর হইতে বাহির হইয়া, চক্ষিণ পাশে মাইল ধরিয়া, নানা গ্রাম, বন ও প্রান্তের পার হইয়া, উত্তর দিকে দামোদরের তীর পর্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তা ধরিয়া পশ্চিম উত্তর দিকে চলিল। বাম পাশে রাইল বেঁড়ে বন। দেখিতে দেখিতে বনের সীমা পার হইল; তখন বাম দিকে রাইল—স্বতদূর দৃষ্টি যায় সমাকর্ষিত-শলা মাঠের শ্রেণী; ডান দিকে বিস্তৃত মাঠের পারে ছোট ছোট গ্রাম। আরও কিছুদূর গেলে রাস্তা হইতে একটি ছোট কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়া ডান দিকে বড়জুড়ি পর্যন্ত গিয়াছে। এখানে আসিয়া পরেশ বাইক হইতে নামিল। বিনা আহ্বানে রোগীর বাড়ি মাওয়া উচিত হইবে কি? অবশ্য বলা চলে—এই দিকে কোন কাজে আসিয়াছিলো, এমনই খবর লইতে আসিয়াছি। রোগীর প্রতি ডাক্তারের এই নিষ্পার্থ নিষ্ঠা দেখিয়া রোগীর অস্বাভিম্বজন প্রশংসা করিবে কি? রোগীটি নেহাৎ বালিকা বা বৃদ্ধা হইলে কোন চিন্তার কারণ ছিল না, কিন্তু তরুণী যে! এম্মা ছাড়া রোগীর অভিব্যক্তি যদি আর কাহারও ডাকিতে গিয়া থাকে, তাহা হইলে? পরেশ বাইকের মুখটা খিরাইয়া সোজা করিল ও বাইকে উত্তিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। মাইলখানেক পরে একটা পান্ডা পুল; রাস্তার দুই ধারে বর্ধমান মগু; পরেশ বাইকটা এক পাশের মগুর গায়ে ঠেসাইয়া দিয়া, অন্য পাশের মগুর উপরে ধসিল।

পরেশের মনটা বিষন্ন। শেষ রোগীটিও বোধহয় হাতছাড়া হইয়া গেল। আশু ভবিষ্যতে আর কোন রোগী জুটিবে বলিয়া ভরসা নাই। জুটিলেও কার্থিক ডাক্তারের দামালদনের কৃপায়া বেশ দিন হাতে থাকবে না। তারপর, স্নোতহীন, তরগহীন, বাহিরের বাহু জীবনপ্রবাহের সংগে লেশমাত্র সম্পর্কহীন, পল্লীজীবনের মধ্যে সে কর্মহীন সঙ্গীহীন দিনগুলি কেমন করিয়া কাটাইবে? যাহারা পল্লীগ্রামে আশ্রয় বাস করিয়াছে, তাহারা কাইয়া, ঘুমাইয়া, দান-পান খোলিয়া, পরনিপ্পা ও পরচর্চা করিয়া, একরকম কল্যাণ জীবন কাটাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার মত যাহারা বাহিরের তরগহীন, কোলাহল-মুখর জীবনের অস্বাদ পাইয়াছে, তাহারা এখানে থাকিবে কি লইয়া? বিবর কথা মনে পড়িল। এই বরমাসও তো কোন কাজ ছিল না, তবু এই স্ত্রী, শান্ত, নম্র, স্ববর্ণপাক্ যেরোঁর সাহচর্য দিনগুলি যে কেমন করিয়া কাটিয়া গিয়াছে, সে বস্তুিত পারে নাই। অবশ্য বিবকে সে একলা খুব কর্মদিনই পাইয়াছে। তবু সে বস্তুিতে পারে, যতক্ষণ সে কাছে থাকে, যতক্ষণ কথা বলে, বিব সকলের পিছনে বসিয়া দুই চোখের দৃষ্টি একাগ্র করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, কদাচিৎ চোখোচোখ হইয়া গেলে মুখখানি নামাইয়া লয়। লতাতন্তুর মত একটি সূক্ষ্ম, সুসুমার সূত্র বর হৃদয়ের সহিত যেন তাহার হৃদয়কে যুক্ত করে; সেই যোগসূত্র দিয়া বিবর হৃদয়-স্পন্দন তাহার হৃদয়ে বাহিত হয়, বিবর মনের একান্ত কামনা তাহার মনের মধ্যে প্রবেশিত হয়। কথা আর বলি হইতে চাহে না; কত রকমের কথা, কত আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র অভিব্যক্তি, ভবন জীবনের কত রক্তিন আভাস এই গ্রামে চিরদিন এমনই অবজ্ঞাতভাবে সে পড়িয়া থাকিবে না, তাহার বিদ্যা বৃষ্টি শিক্ষা দীক্ষার মর্মাদা একদিন এ তরায়ের লোকদের দিতে হইবে। তখন কার্থিক ডাক্তার কোথায় যে কেণ্ডাস হইয়া থাকিবে, তাহার পাতা পাওয়া যাইবে না। হাসপাতালের ডাক্তারও তাহার পরামর্শ লইবার জন্য ছাটিয়া আসিবে। হয়তো ভবিষ্যতে এ গ্রাম ছাড়িয়া সে জেলা সহরে বাসনা শূন্য করবে; তখন সারা জেলার লোকের মধ্যে ডাক্তার বলিতে তাহার ছাড়া আর কাহারও নাম শুন্য যাইবে না, ইত্যাদি—ইত্যাদি। শুনতে শুনতে বিবর মুখ ও চোখ জড়ল হইয়া উঠে এবং এমনই আত্মহারা হইয়া যায় যে, চোখোচোখ হইলেও চোখ নামাইতে ফুলিয়া যায়। এই সকল বস্তুতা যে শ্রেণীবৃন্দের মধ্যে বিশেষ করিয়া তাহাই উল্লেখ্য কেমন করিয়া সে মনে বস্তুিত পারে। তাহা ছাড়া তাহার মনের মত হইবার জন্য তাহার কি প্রচেষ্টা? একদিন সে শিষ্টিক্সা মেরেদের

প্রশংসা করিয়াছিল; সেইদিন হইতে বিব লেখাপড়া শিবিবার জন্য উঠিল পড়িয়া লাগিয়াছে এবং অল্প দিনের মধ্যেই অনেক উন্নতি করিয়াছে। বিব কি তাহাকে ভালবাসে? হয়তো তাই। না হইলে কাল, তাহাৎ অন্য বিবাদের চোখ হইতেছে শুনিয়া সে কাঁদিয়াছিল কেন?

কিন্তু সে নিজে কি বিবকে ভালবাসে? ভাল লাগে—এ কথা সে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারে; কিন্তু ভালবাসে এ কথা বলিবে কি করিয়া? হিন্দু সমাজের ছেলে সে, বিশেষ করিয়া পাড়াগায়ের ছেলে; চিরদিন মেরেদের কাছ হইতে দূরে দূরে মানব হইয়াছে। কলেজে দুই-চারি জন মেয়ের সহিত পরিচয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা কোনদিন বন্ধুত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্তরের মধ্যে উত্তীর্ণ হয় নাই। কাজেই ভালবাসার লক্ষণ সে জানিবে কি করিয়া? তবে যদি ধোঁতে ভাল লাগা, কথা কহিতে ভাল লাগা, ভবিতে ভাল লাগা, ভালবাসার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে হয়তো সেও বিবকে ভালবাসে।

কিন্তু, বিবর সহিত বিচ্ছেদও তো আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। গ্রামের শূন্যদের শানিত দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িয়াছে। ইহার সহিত সংযোগসূত্র বজায় রাখিতে হইলে তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও বাধা কম নহে। প্রথমতঃ সামাজিক বাধা; বিবর মা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন কুলীন সন্তান ছাড়া কাহারও হাতে বিবকে দিবেন না। দ্বিতীয়তঃ আর্থিক বাধা, তাহার বর্তমান আর্থিক অবস্থা খেয়প, তাহাতে বিবকে বিবাহ করিয়া এই পল্লীগ্রামে বেকার জীবন মাপন করা উচিত হইবে কি? কার্থিক ডাক্তার বাঁচিয়া থাকিতে তাহার প্রতি-যোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরাস্ত করিয়া এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা কোনদিন সম্ভব হইবে না। কাজেই বিবকে বিবাহ করিতে হইলে তাহার আগে এখানে বাহা কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে সব বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোন ছোট সহরে নতুন করিয়া বাসনা শূন্য করতে হইবে। কিন্তু বিনয় ও তাহার স্ত্রী বিবকে কি ততদমন-জ্ঞান আশীষ বশাইয়া রাখিবেন? বিনয় রাজ্য হইলেও তাহার স্ত্রী কিছুতেই রাজ্য হইবেন না।

অতএব বিবর মগুরের জন্যই বিবর সহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে হইবে। না করিলে, গ্রামের শিক্ষাবৃন্দের মধ্যে যে মন্দ গুণজন শূন্য হইয়াছে, তাহা ক্রমে কণপটহেদী হইয়া উঠিবে। ইহাতে তাহার কেন ক্ষতি হউক আর নাই হউক, বিবর পক্ষে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে—হয়তো তাহার সহজে বিবাহ দেওয়াই দৃষ্ট হইবে। তবু, বিবর সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না, দিনান্তে তাকে একবার দেখিতে পাইবে না, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকুল চোখের সংগে একবার চোখ মিলাইতে পারিবে না এবং অদূরভবিষ্যতে কোনে এক কুলীন-পুণ্ডর চাক-চোল বাজাইয়া আসিয়া দুইটা মগু পড়িয়া জন্মের মত তাহাকে তাহার জীবন হইতে ছিড়িয়া লইয়া যাইবে—ভাবতে তাহার বুকের ভিতরটা টন টন করিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িয়া উঠিল, সূর্য ঠিক মাথার উপর উঠি-উঠি করিতে লাগিল, রৌদ্রের উত্তাপ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, যে পাতলা কুহ-লিকার আবরণ একক্ষ দূরের গ্রামগুলিকে দৃষ্টিপথ হইতে আড়ল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা সরিয়া গেল, শূন্য উত্তর দিকে দিগন্তবর্তী তরুশ্রেণীর মাথার উপর বৃত্তখণ্ডের মত বাক্য কুহলিরেখা অন্তরালবর্তী দামোদরের বিন্দম গতিপথকে নির্দেশ করিতে লাগিল।

পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে তাকাইয়া দূর বনরেখা, প্রসারিত মাঠ, মাঠের মধ্যে গোচারণ ভূমি, তাগগাছেরা দীর্ঘ, কোপ-কোপ ভরা গ্রাম, ইত্যাদি দৃশ্যাবলী দেখিয়া লইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহ দেশের সহিত তাহার জীবনের যেন একটি যোগসূত্র আছে; ছাড়া জীবন অসম মায়াহু ও বিনষ্ট রজনীত বর্ণনায়ের তুলি দিয়া যে বিচিত্র বর্ণন ভবনতের ছবি সে আঁকিত, ইহারা তাহার অজ্ঞাতসরে সেই ছবির পটভূমিকায় স্থান অধিকার করিত। অথচ বাস্তব জীবনে ইহাদের সহিত হয়তো তাহার কোন সম্পর্কই থাকিবে না।

বাইকে উঠিয়া পরেশ বাড়ির দিকে ছুটিতে শূন্য করিল। রাস্তা ক্রমে উঁচু হইয়া গিয়াছে, কাজেই স্বতদূর সম্ভব জোনের সহিত চালাইতে হইল। রাস্তার ডান পাশে কতগুলো শালিখ পাখী জড় হইয়া কদরক রতাইছিল। কলরবের কারণ দুইটি শালিখের কলহ; লাফাইয়া লাফাইয়া তাহারা পরস্পরকে নখ ও চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিয়াছিল; থাক শালিখ-গুল্য দুইদলে বিভক্ত হইয়া নিজের নিজের গোম্বাকে উপাধিত করিতে উল। যুগমান পাখী দুইটির সহিত নিজের ও কার্থিকের তুলনা করা পরেশের ওঠে হাস ফুটিয়া উঠিল। এখানে জোর করিয়া থাকিতে হইলে বা তকের সহিত হয়তো একদিন এমনই হাতাহাতি করিতে হইবে; গ্রামের লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া দুইজনের পিছনে দাঁড়াইয়া এমনই দূরো দলে

ফোন :- কাল : ১৪৬৪ ও ১৪৬৫

গ্রাম :- "এরিওস্টাস্টস্"

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট

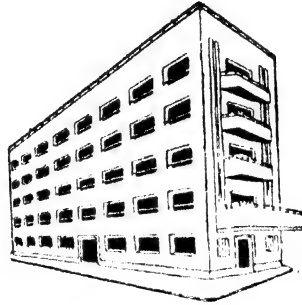
লি মি টে ড্

ষ্টক ও শেয়ার ব্যবসায়
ভারতের বৃহত্তম যৌথ প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস

শাখা ও এজেন্সী :

এলাহাবাদ,
বম্বে, বেনারস,
ভাগলপুর, বাকুড়া,
দিল্লী, ঢাকা,



শাখা ও এজেন্সী :

লক্ষ্মী
মুর্শেদাবাদ, ময়মনসিংহ
পাটনা, রাঁচি।

"শেয়ার ডিলার্স হাউস"

(আমাদের নিজস্ব বাড়ী)

১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

মূলধন

অনুমোদিত	২৫,০০,০০০/-
বিক্রীত	১৮,০০,০০০/-
আদায়ীকৃত	১০,০০,০০০/- টাকার উর্দ্ধে

* আমরা সব রকম শেয়ারের কাজ করিয়া থাকি।

* টাকা খাটাইবার নিরাপদ ও সর্বাপেক্ষা লাভজনক উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়া থাকি।

* ভাল সুদে "স্থায়ী আমানত" গ্রহণ করিয়া থাকি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের "মাসিক শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট" নিয়মিত পাঠ করুন।

বিনামূল্যে নমুনাসংখ্যা পাওয়া যায়।

থাকিবে। অথবা ঘনশ্যাম যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাই সেবন করিতে হইবে। ঔষধটির চেহার মনে পড়িল—রঙ কালা হইলেও দেখিতে মন্দ নয়; লম্কার বাহুল্য আছে বটে, শুষ্কও কম নহে; একটু স্বেদ্য পাইয়াই তাহার উপর একটি দৃষ্টিবাণ হানিয়াছিল, অবশ্য ধরা পড়িয়া লম্কার আরও জড়োসড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু জীবন-সংশ্লিষ্ট প্রতিমূর্তি হিসাবে যে মানসপ্রতিমাকে সে দিনে দিনে তিল তিল করিয়া রচনা করিয়াছে, তাহার সহিত বাবর হয়তো কিছু মিল থাকিতে পারে, কিন্তু এই মেয়েটির কোন মিলই নাই। তবু, চিকিৎসার অসাধ্য রোগী যেমন দৈবঔষধ সেবন করে, বিপর ব্যক্তি যেমন সর্ব-বিপদ-নিবারণী কণ্ঠ ধারণ করে, তাহাকেও তেমনই (ঘনশ্যামের মতে) এই মেয়েটিকে বিবাহ করিতে হইবে। এবং বিবাহ করিলেই তাহার ভাগ্যাকাশে যে নৈরাশ্যের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহা এক মুহূর্তে মিলাইয়া গিয়া সফলতার দীপ্ত যুটীয়া উঠিবে। কান্টিকের কঠোর প্রতিরোধ ফল সন্ন্যাস শাস্ত্রের পরিণত হইবে, ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া চিবাইয়া চিবাইয়া তাহার অযোগ্যতার মিথ্যা কাহিনী প্রচার না করিয়া যোগ্যতার প্রচার করিয়া উঠিবে এবং গ্রামের প্রতিবেশীরা যাহারা পরামর্শক্রমে তাহাদের বিরুদ্ধতা করিয়াছে, তাহারা বাতাবতি মণ্ডলাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিলে। এবং কান্টিকের কঠোরদৃষ্টি ঘাড় করিয়া একদা সে কান্টিকের মতই একহাতে চিন্তা আর একহাতে সুন্দী ও তেজস্বী কারবার করিয়া ঐ তরুণ কান্টিকের পুরষ হইয়া উঠিবে।

চড়াইনি অতিক্রম করিতেই পরেশের চোখে পড়িল, একটা ছুই দেওয়া গরুর গাড়ি আসিবে—সন্মানে দুখটা কাপড় দিয়া ঢাকা। গরুর গাড়ীটা পার হইয়া গড়ন ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিল, গরুর গাড়ির গিছন দিকে তাহার রোগিণীর সীতাবাক বসিয়া আছে। ত্রেক কমিয়া গাড়ি হইতে নামিতেই লোকটি লম্কারমুখে গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল এবং কাছে আসিয়া বিনীতভাবে নামস্বাক করিল। পরেশ বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, “কতখান গিছনে?” লোকটি হাত কচলাইতে, কচলাইতে কহিল, “একবার কান্টিক ডাকারের কাছে গিছলাম।” পরেশ কঠিনমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “ওহ! আপনার মেয়েকে দেখাত নিয়ে গিছলেন ব্যক্তি?” লোকটি বাক্যের মত হাসিয়া কহিল, “ঠিক বলেছেন আপনি—নিয়েই গিছলাম বটে; গায়ের মুরশ্বিয়া সব বললেন, একবার কান্টিক ডাকারকে দেখাতে।” পরেশ প্রশ্ন করিল, “আপনার মেয়ের কি আবার জ্বরটা বেড়েছে?” লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “আজ্ঞে না, কাল আপনারকে যা বলে প্রতিজ্ঞালাম তাই—জ্বরটা বিকেলে ১০০ হইয়াছিল, রাতে আর বাড়ি নি, সকালে আবার মন্দ হইয়াছিল। তবে সবাই বললেন, ঐ তরুণটির রোগ কান্টিক ডাকারকে না দেখালে যেতে চায় না, তাই একবার দেখিয়ে আনলাম। আপনি এবং কাল আবার যাবেন দেখে আসবেন।” পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, “আমার যাবার আর কি দরকার? কান্টিক ডাকারকে যখন দেখিয়েছেন, তখন জ্বর এবার পাগালে নিশ্চয়। আচ্ছা, আপনি আসুন।” বলিয়া নাইকে উঠিয়া প্রত্যবেগে চলাইয়া দিল।

কতকটা দূর গিয়া, গিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল—গরুর গাড়ীটা গড়নের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। একটি ক্ষেতের নিশ্চবাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, “বাবা! কি অশ্ল বিন্যাস! স্বয়ং ধনবন্তীর এলো এদেশে প্র্যাটিস জমতে পারবে না।”

বিনয়ের গাড়ির কাছে আসিয়া পরেশ প্রতিদিনের অভ্যাসমত ঘণ্টা বাজাইল। আজও বিনয়ের বৈঠকখানায় বসিয়া খুঁকী পুতুল খেলিতেছিল এবং বাঁ পাশে বসিয়া খুঁকীর খুঁকীর সজ্জা ও প্রসাধনে সাহায্য করিতেছিল। বাঁ বেধে ঘর ঘটার শব্দের জন্য একদৃষ্ট উৎকণ্ঠ হইয়া দাঁসিয়াছিল, শব্দ শুনিলেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে খুঁকীকে কহিল, “পরেশদাদাকে আজ ডাকবি না?” খুঁকী অনামনস্কভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না—আজ তো আমার খুঁকী ভাল আছে।” ববি কহিল, “কোথায় তোর খুঁকী ভাল আছে? ওই তো মুখ খম খম করছে, জ্বর আছে নিশ্চয়ই।” খুঁকী এবার উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, “সিঁতা জ্বর আছে? ওহা! আমি ভাবছি—ভাল হয়ে গেছে, খেলেছে, দলেছে, ঘরে বেড়াচ্ছে।” ববি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “ভাল নেই। যা তুই পরেশ দাদাকে ডেকে নিয়ে আস।” পরেশ সশব্দে গাড়ি থামাইতেই খুঁকী হাঁকিয়া কহিল, “পরেশদাদা!” পরেশ জবাব দিল, “এই যে।” ববি ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কহিল, “বাইরে যা।” খুঁকী কহিল, “তুমি যাওনা দিদি, দেখছ না খুঁকীটা বসতে চাচ্ছে না।” পরেশ কহিল, “কাউকে আসতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি”—বলিয়া অনতিবিলম্বে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়িল। ববি নতমুখে বসিয়া রহিল। খুঁকী মুখ ক্রিয়ায় কহিল,

“পরেশদাদা! এসেছেন?” পরেশ কহিল, “হুঁ, এসেছি তো। তোমার খুঁকী কেমন আছে বল দেখি?” ববি সন্তুষ্টভাবে খুঁকীর দিকে তাকাইল। খুঁকী কহিল, “ভাল আছে বলে তো আমার মনে হচ্ছিল, দিদি বললে—এখনও জ্বর আছে—একবার দেখুন না।” পরেশ আগাইয়া আসিতেই ববি উঠিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়িল। পরেশ খুঁকীর পাশে উবু হইয়া বসিয়া রোগী দেখিয়া কহিল, “তোমার দিদি ঠিক বলেছে খুঁকী। জ্বর আছেই তো।” খুঁকী বাবর দিকে তাকাইয়া কহিল, “তুমি ঠিক বলেছ দিদি। ভাগ্যে তুমি পরেশদাদাকে ডাকতে বসলে।” পরেশ বাবর দিকে তাকাইয়া কহিল, “তুমিই তা হলে আমাকে ডাকতে পরামর্শ দিয়েছিলে?” ববি এতক্ষণ বিরক্তিসূচক ভ্রুতলী করিয়া খুঁকীর দিকে তাকাইয়াছিল, পরেশের কথা শুনিয়া লজ্জাক্ত মুখে কহিল, “আমি কেন পরামর্শ দিতে যাব?” খুঁকী কহিল, “তাইলে আজও ওখানের বাস্বাধা করে দিন।” পরেশ কহিল, “দেব—তুমি ফায়ের বাস্বাধা কর, চা নয়—সরবত।”

খুঁকী ঘর হইতে বাহির হইয়া মাইতেই পরেশ উঠিয়া, বাবর সামনে দাঁড়াইয়া তাহার অন্ত মূখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, “সাগটা পেড়েছে নিশ্চয়—না হলে কি আমার জন্যে দাঙ্গাল করতে?” মুখ না তুলিয়াই ববি মুদ্রকণ্ঠে কহিল, “পাগণও কর নি, দাঙ্গালও কর নি।” পরেশ কহিল, “রাগের কথা থাক, কিছু দাঙ্গাল যে করেছে, তা তো আমি স্বকর্ণে শুনছি।” হাসির একটি ক্ষীণ আভা বাবর গুণ্ঠণের ক্ষণকের জন্য বিকসিত করিয়াই মিলাইয়া গেল। পরেশ কহিল, “এর জন্যে তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ, তুমি চেষ্টা না করলে এই শেষ রোগীটিও আমার হাতছাড়া হয়ে যেত।” ববি মুখ তুলিয়া কহিল, “কেন, যাকে দেখে এলেন সে তো রয়েছে।” পরেশ দুই করতল চিত্ত করিয়া সজ্জাতে কহিল, “হায়! হায়! সেও শেষ হয়ে গেছে।”

ববি সাক্ষ্যে কহিল, “সে কি মারা গেছে?”

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “একরকম মারা যাওয়াই, অন্ততঃ আমার পক্ষে।” ববি সজ্জাতে কহিল, “সে আবার কি?” পরেশ জবাব দিল, “কান্টিকের কাল কবলে গেছে।” ববি শব্দটির নিশ্চবাস ফেলিয়া কহিল, “ওহ! তাই!” সহানুভূতির সরে কহিল, “আপনার হাতে তো সরে উঠেছিল, আবার হাত বদলাল কেন?” পরেশ কপালে করাঘাত করিয়া শোকাকুলতার ভঙ্গী করিয়া কহিল, “আমার অদেহ।” তারপর সান্ন্যাস কণ্ঠে কহিল, “ববি, একটা কাজ করতে পার?” ববি সোধকণ্ঠে কণ্ঠে কহিল, “কি?” পরেশ কহিল, “কোমর বেধে গিয়ে গিয়ে বলে আসতে পার—দেবীর বরাভদান-ভগ্নাট ডান হাত প্রসারিত করিয়া বস্ত্রভার সুরে) হে জ্বরজর্জর গ্রামসাগণ! তোমরা কান্টিক ডাকারের জ্বর-বস্ত্র খাইয়া নিজদিগকে জ্বরমুক্ত ভাবিতছ—কিন্তু ভুল। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—তোমাদের কাহারও জ্বর ভাল হয় নাই। তোমরা পরেশ ডাক্তারের কাছে সবর আসি। নচেৎ জ্বরজর্জর হইয়া অচিরেই নিজের লোকে প্রস্থান করবে—”

ববি নিশ্চবাসের মত তাকাইয়াছিল, বস্ত্রতা শেষ হইতে কহিল, “সে আবার কি?”

হাত নাড়িয়া পরেশ কহিল, “প্রচার। প্রচার ছাড়া কোন কাজ জগতে হয় নি—হুসে না। যদি হাতে একটা খবরের কাগজ থাকত, আর তুমি হতে তার এডিটর—” ববি ফাল ফাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। পরেশ বিনতে লাগিল, “তা হলে দুদিনে কান্টিক ডাকারকে বেসিটি পরিয়ে, লোটো কবল গিয়ে দেশছাড়া করে দিতাম।”

মুখ টিপিয়া হাসিয়া ববি কহিল, “আজ্ঞা জামাই তো আপনি! শব্দরকে দেশছাড়া করতে চান?” বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া পরেশ কহিল, “তার মানে?” ববি স্মান হাসিয়া কহিল, “তার মানে আর কি। কমলার সঙ্গে আপনার মিলে হবে।”

“কে বললে তোমাকে?”

“কে আবার বলবে? গায়ের সবাই জানে।”

পরেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “এই দেখ—এও এক প্রচারের ফল; দশচক্রে ভগবান জুত—”

গিছন হইতে ডাক আসিল, “এই যে বাবা পরেশ।” ববি ও পরেশ দুইজনেই তাকাইতেই দেখিল—সুখদা প্রবেশ করিতেছে—হাতে একটি কাসার প্লাসে শরবত, সুখদা তাক্সি দৃষ্টিতে বাবর দিকে তাকাইয়া আদেশের সরে কহিল, “খোকা একলা আছে, ঘরে যা।” ববি সলজ্জ-মুখে নতমস্তকে বাহির হইয়া গেল। সুখদা আগাইয়া আসিয়া পরেশের

হাতে 'লাসটি' দিয়া কাঁহিল, "কখন এসেছে?" পরেশ কাঁহিল, "এই মাত্র।" শরৎ চুম্বক দিয়া কাঁহিল, "আপনি যুগ্মে 'নি' আছে?" সুখদা গম্ভীর-মুখে কাঁহিল, "না—না শুনেনি—তারপর দিনে রাতে আমার ঘুম আর আসবে কি না, কে জানে।" পরেশ শরৎকে 'লাস' হইতে মুখ তুলিয়া উৎকণ্ঠার সহিত কাঁহিল, "কি শুনছেন?"

সুখদা কহিল, "তুমি শরৎকে খেয়ে নিয়ে বস—বলছি।" পরেশ শরৎকে চক্চক করিয়া গিয়া 'লাসটি' সুখদার হাতে দিয়া খাটের উপর বসিয়া কাঁহিল, "কি বলুন দেখি?"

সুখদা কাছে সরিয়া আসিয়া কাঁহিল, "তোমাকে আমরা নিজের ছেলে বলেই মনে করি চিরদিন। আমাদের ছেলেমেয়েরাও তোমাকে নিজের বড়দাদার মত মনে করে।" পরেশ সায়া দিয়া কাঁহিল, "আমি তা জানি খুঁড়িমা।" সুখদা কহিতে লাগিল, "তুমি হামেশা আমাদের বাড়িতে আস, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প-গুজব কর, আমোদ-আহ্লাদ কর; এতে আমরা কেউ কোনদিন কিছু মনে করি নি—মনে করবার কোন কারণ আছে বলেও ভাবতে পারি নি।" পরেশ গম্ভীরমুখে সুখদার মুখের দিকে তাকাইয়া কাঁহিল। সুখদা বলিতে লাগিল, "কিন্তু এই নিয়েই গিয়ে নানা কথা উঠেছে—আমরা নাকি তোমাকে তুলিয়ে বহির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি, বহির নাকি তোমাকে—খার কাহা! না হয়ে আর মুখ ফুটে বলতে পারছি না।" বলিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে মুখ লাল করিয়া সুখদা পরেশের দিকে তাকাইল। পরেশ শব্দ-কণ্ঠে কহিল, "কারণ আছে শুনলেন আপনি?" সুখদা ধারালো কণ্ঠে কহিল, "কারণ আছে আমার? শ্রীমতী বামনী ওবেলা উনি শকুলে যাবার পরেই এসেছিল। কখনও আসে না আমাদের বাড়িতে; বোধ হয় এ কথা শোনবার জন্যেই এসেছিল।" পরেশ চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি উঠছি খুঁড়িমা! এমনই যখন তখন আর আসব না; তবে দরকার হলে ডেকে পাঠাতে স্বেচ্ছা করবন না।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুখদা অনুসরণের সহিত কহিল, "আমাদের ওপর রাগ করে না বাবা! জান তো! পাড়াগায়ের সমাজ—পন থেকে চলেই বসলে সব হা হা করে ওঠে—খোঁচি পাকতে বসে।" পরেশ কহিল, "আচ্ছা—চাল আমি"—বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্গত হইয়াই আবার মুগ্ধ দিগ্ভ্রম করিল, "বহিরে ওলট্টা খাওয়াচ্ছেন তো! ওটা নিয়মমত খাওয়াচ্ছেন তার গুজনও নেবেন। যদি উলটি না হয় তো এটো খবর দেবেন দয়া করে"—বলিয়া বহিরের দিকে চলিল। সুখদাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে কহিল, "আমাদের একবারে ভাগ করে না বাবা! মাঝে মাঝে খবর নিখা।" পরেশ কৃত্রিম আগ্রহের সহিত কহিল, "নিখা! নিখা!" সুখদা কহিল, "আর একটি কথা বাবা! তোমাকে যে চিঠি লিখতে বলেছিলাম—লিখছে?" পরেশ ধমকিয়া দাঁড়াইয়া মুখ চিরাইয়া কহিল, "কি চিঠি?" তারপর একটি ভাষিয়া কহিল, "ওহো!" ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না লিখি নি এখনও—লিখব আজ।" সুখদা কণ্ঠ-স্বরে খেদের স্বর মিশাইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল, "লিখো বাবা! জানতো ওকে, কোন চেষ্টা নাই। দিবা খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছেন! আমিও লিখছি আমার বাপের বাড়িতে। সবাই মিলে চেষ্টা করলে হয়তো আসছে মধ্য মাসে মেয়েটিকে পর করতে পারব।" পরেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা—আসি খুঁড়িমা।" সুখদা কহিল, "এস বাবা।" তারপর—পরেশ দাওয়া হইতে রাস্তায় নামিতেই কহিল, "শুনেন খুব সুখী হলাম বাবা! কল্যাণ বেশ মেয়ে! শান্ত, শিষ্ট; রঙটাই বা একটুখানি খোটে। না হলে গরম-পিন্টন ভালই। তা ছাড়া অমন বাপ! ছোট মেয়েকেই নাকি সব লিখে দেবে—শ্রীমতী বসছিল।" পরেশ কিছুই জবাব না দিয়া বহিরে চড়িয়া প্রস্থান করিল।

(১০)

ভাত খাইবার সময়ে ছেলের বাড়িতে প্রকাশ্যে মাছের মূড়া এবং খালার পানের রেকাবিতে ক্ষীর ও মিষ্টান্ন দেখিয়া পরেশ কিস্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, "এসব আবার কোথেকে এল?" পরেশের মাসীমা পাখা হাতে সামনে বসিয়া মাছ তাড়াইতেছিলেন, হঠক হাসিয়া কহিলেন, "কাঁচক ডাঙারের বাড়ি থেকে পাঠিয়েছে।" পরেশ মনে মনে আশ্চর্য্যের আর এই আশ্চর্য্যত আশ্চর্য্যের হেতু ব্যক্তিও পারিল, তবু না ব্যক্তির ভাগ করিয়া কহিল, "ইহার এত ভালবাসা! কল মেয়েকে করে পোলাও-কালিয়া খাওয়াবে, তা' হজম হতে না হতেই মাছ-মিষ্টান্ন সওয়াতে—বাপারটা কি বল দেখি? এতদিন তো গায়ের সেকের সঙ্গে জোট বেঁধে এখান থেকে ভাড়াবার চেষ্টা করছিল।" মাসীমা কহিলেন, "তোরা যেমন কথা!

ডাক্তার ভাড়াবার চেষ্টা করবে কেন? পরের পিছনে লাগা পাড়াগায়ের লোকের অভ্যাস। না হলে ডাক্তারগণী যখনই দেখা হয়েছে, তেঁদের কথা বলেছে, 'তোরা কথা জিজ্ঞাসা করেছে।' গদগদ স্বরে কহিলেন, "গিন্নিটি ভারী ভাল মানুষ; এত বড় লোকের স্ত্রী—অহংকারের নামমাত্র নেই।" "হুঁ" বলিয়া পরেশ খাইতে সুরু করিল। মনে মনে কাঁচকির কূট-কৌশলের তারফ করিতে লাগিল। পুরাপুরি হট্টলারী নীতি অবলম্বন করিয়াছে ডাক্তার—প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছে, ঘষ খাওয়াইয়া পশ্চিম বাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছে, ঘনশ্যামও খুব সম্ভব গ্রামের অন্যান্য পাড়াগায়ের সঙ্গে দল বাঁধিয়াছে, ইহার পর একদিন তাড়াতাড়ি করিয়া তাহাকে লোপাট করিয়া দিবে বোধ হয়। মাসীমা কহিলেন, "শ্রীমতী বামনী এসেছিল আজ।" মুখ তুলিয়া, হুঁ কুচকাইয়া পরেশ কহিল, "কখন?"

"তুই বেরিয়ে যাবার একটু পরেই। যে লোকটা মাছ-মিষ্ট নিয়ে এল, তার সঙ্গে।" পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, "তারপর?" মাসীমা স্মিতমুখে কহিলেন, "বলছি—ডাক্তার-গিন্নীর ভারী ইচ্ছে—তোরা সঙ্গে ওর ছোট মেয়েটির বিয়ে দেয়।" পরেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "তুমি বৃন্দা শুনবামাত্র কাঁধে উঠে বললে—বেশতো! যোগাড়-যত্ন করে রাখবে—এলেই পড়িয়ে দেব এখনই।" মাসীমা আনন্দের স্বরে কহিলেন, "তোরা যেমন কথা! আমার কি ফালনা ছেলে, নাকি। বিয়ে এখন করব না বলছিলা তাই, না হলে হুঁ করবামাত্র কত বড় বড় লোকের জার গোড়ায় এসে পড়িয়ে পড়বে।" পরেশ দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, "তাই নাকি মাসীমা! ভগবান রক্ষা করুন আমাকে—হঠাৎ যেন হুঁ না বলে ফেলি। না হলে বাড়ির সামনে যত সব বড় বড় লোক—বড় বড় জুড়ি নিয়ে দিব্যি কুমড়া-গাজগড় দেবে—বস ভারি গিলী ব্যাপার হবে।" মাসীমা প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "আমি তাই বলছি নাকি! তোরা যেমন কথা! তবে একথা গরব করে বলবে আবার ছেলের মত ছেলে ও তরুণী কম আছে।" বলিয়া সোহে ও গর্বে চোখ ও মুখ বিস্তারিত করিলেন। পরেশ কহিল, "তা হলে তুমি শ্রীমতীকে কি জবাব দিলে?" মাসীমা কহিলেন, "আমি বললাম—ওঁদের ইচ্ছে হলেই চো হতে না, ছেলের ইচ্ছা আনছে দেখতে হবে। আজকালকার ছেলে তো!" পরেশ হাসিয়া কহিল, "তা হলে তুমি দর বাড়িয়েছ বলা।" মাসীমা কণ্ঠের দিয়া কহিলেন, "দর বাড়ানোই আমার কি? আমার ছেলের বা আসল দাম, তা দেবার সাধি এ গিন্নির ব্যরও আছে নাকি?" পরেশ ভরত মুখে হুঁ নাড়িয়া জানাইল, "না।"

মাসীমা কহিলেন, "তবে গিন্নির লোক, মাছেরের মত লোক, পিছনে দাঁড়ালে তোর অনেক সর্বস্বত হবে। তা ছাড়া মেয়েটিও ভাল, চোখ মুখ-নাক চমৎকার। সেদিন ঘাটে নাইতে গিচ্ছ, দেখলাম—এক পিঠি খাণ্ডে কোঁড়া কোঁড়া চুল।"

পরেশ নতমুখে খাইতে লাগিল। মাসীমা বলিতে লাগিলেন, "এ কামাস তো দেখলাম—গায়ে লোক কাঁচকি উত্তরকে কি রকম খাতির করে। ও যদি তোর বংশধর হয়, তা হলে কেউ আর তোর পিছনে লাগতে সাহস করবে না।"

পরেশ মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কাঁচকি ডাক্তার বৃদ্ধি কুলীন নয়?" মাসীমা গালে হাত দিয়া চোখ ডাগর করিয়া কহিলেন, "ওনা। সে কি কথা! বাড়িয়ে কুলীন হইকি?" পরেশ কহিল, "তবে যে আমাদের মত নীচু ধরে যিয়ে দিতে চাইছে?" মাসীমা মুখ নাড়িয়া কহিলেন, "তোরা যেমন কথা! ভাল ছেলে পোলে আজকাল এত কুল-কুলজি কেউ দেখে নাকি?" পরেশ স্থান হসিয়া কহিল, "দেখে বহিকি মাসীমা।" মাসীমা ঠোট কুচকাইয়া কহিলেন, "কই বাবা! আমি তো দেখি নি। আমাদের গায়ের পরেশ চাটুকে নৈকিয়া কুলী—একমাত্র মেয়ের বে দিল এক ভগ্ন কুলীনের ছেলের সঙ্গে।" পরেশ প্রশ্ন করিল, "ছেলেটি বৃদ্ধি খুব ভাল?" মাসীমা মুখ ও চোখের ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "হুঁ। দারোগা! তা আমার ছেলেও কম কিসে? কলকাতায় সাহেবদের কলেজ থেকে পাসকরা ডাক্তার।" কণ্ঠের নীচু করিয়া কহিলেন, "শ্রীমতী বলছিল—ডাক্তার-গিন্নী নাকি বলেছে—কুল নিয়ে কি ধরে খাব। আটটা মেয়ের সাতটাকে পার করে দিচ্ছে; আর ছেলে-পিলে নেই যে বিয়ে ঠৈপতে দিতে হবে।" পরেশ হাসিমুখে কহিল, "এখনও তো হতে পারে।" মাসীমা কহিলেন, "তোরা যেমন কথা! এই বয়সে আবার ছেলে হয়? তা ছাড়া এ হাতীর মত শরীর, তোর কিছু চিন্তা নেই।" পরেশ চিন্তাকুলতার ভাগ করিয়া কহিল, "তুমি তো বলছ চিন্তা নেই; কিন্তু

কার্তিক ভাঙার যদি আবার বিয়ে করে—কুলীন তো! বিশ্বাস নেই।”

মাসীমা হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, “তোমার যেমন কথা! কার্তিক ভাঙারের সান্না আছে আবার বিয়ে করায় না। বাইরে তো অত বড় গণিগ-মান্না লোক, কিন্তু ভিতরে শুনোই একবারে কে’চো—গম্ভীর উঠতে বললে উঠে, বসতে বললে বসে। তা ছাড়া সব সম্পত্তি গম্ভীর নামে, টাকাকড়িও সব গম্ভীর হাতে; কি লোভে লোভে মেয়ে দেবে ঐ বুড়োকে?” পরেশ খাওয়া শেষ করিয়া কহিল, “অত খবর যখন সংগ্রহ করছ, তখন পার্জিতা আনিবে দিন-কণ ঠিক করে ফেল। কার্তিক-কন্যাকে বিয়ে করে তবে অন্য কাজ।” মাসীমা গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “ঠাট্টা নয়, বাছা! শ্রীমতী আমাকে তোমার মত জিজ্ঞাসা করতে বলছে। মেয়ে তো নিজের চোখে দেখেছিস, মেয়ের বাপের অবস্থাও সব জানিস। এ গায়ে বাস করতে হলে, বাবসা করতে হলে, একজন পছন্দ মূর্খশি না দাড়াইলে তুই পরে উঠিস না, তাও বৃথাই পেরোয়ি ঘোষ হয়। তা হলে বন্ধু দেখি তোর ওখানে বিয়ে করা উচিত কি না। আমার কথা যদি জিজ্ঞেস কর বাছা, আমি বলে দিচ্ছি—আমার খুব মত আছে।”

মুখ ধুইতে ধুইতে পরেশ পরিহাসের স্বরে কহিল, “তোমার যখন মত আছে, তখন তো বিয়ে হয়েই গেছে ধর। আমি একটু ঘুমিয়ে চাওয়া হয়ে নি, তুমি ইতিমধ্যে পাটের জোড়, চৌপার আর মালাচন্দন ঠিক করে রাখ; আর ভাঙার-গম্ভীরকেও খবর দাও—মেয়েকে যেন সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখে; আজ রাতেই তাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসবা।” বাছে আসিয়া, মাসীমার সামনে বাসিয়া, মুখের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, “কার্তিক ভাঙারকে কিছু একটা কাজ করতে হলো।” মাসীমা কৌতূহলের সহিত কহিলেন, “কি?” পরেশ কহিল, “সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করতে হলো।” মাসীমা হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, “তোমার যেমন কথা! বনবাসী হবে কিসের দরুণ? ঘর আলো করা উপযুক্ত জন্মই হলে—বন্ধের বল দশগুণ বেড়ে মাঝে যুড়োয়; আরও দশটা হাত বার করে পরসা বুড়োয়।”

পরেশ আশ্চর্য্য উঠিয়া কহিল, “ওরে বাবা! তা হলেই তো হয়েছ।” সান্না দিবার সূত্রে ও ভঙ্গীতে মাসীমা কহিলেন, “সে তো তোদের জন্মই। সব দিয়ে যাবে তোদের দেখাব।” পরেশ করুণ স্বরে কহিল, “তা হে! দেখে, কিন্তু আমার বেকারদুটি তো কাটবে না।” মাসীমা গাম্ভীর অবলম্বন করিয়া কহিলেন, “ঠাট্টা নয় বাছা! সতি বলছি, বড় ভাললোক ওয়া। অনেক দিনের জন্য ঘর। একবার বিয়ে করাই দেন—কত আশ্রয়-ভরসা করবে ওরা। অপর বাসে বাপমা গেছে।” মাসীমা কামার সুর ধরিয়া কহিলেন, “কোন সাধ মেটে নি তোরা। বাপ-মার মতই ওরা তোমার সব সাধ মেটাবে।”

পরেশ বৃকিতে পারিল, মাসীমা পুরাপুরিভাবে পঞ্চম বাহিনীতে যোগ দিয়াছেন। মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, “একটু ভেবে পরে তোমাকে মতামত জানাব।”

(১১)

স্কুল হইতে আসিয়া, হাত পা ধুইয়া বিনয় খায়ার খাইতৌছিল। ববি অদূরে ছোট খোকাবকে কোলে করিয়া বাসিয়া ছিল। সুখদা রামাধর হইতে আসিয়া বিনয়ের সমনে বাসিয়া ববিকে কহিল, “খোকাবকে আমার কৈ দিয়ে সন্ধ্যা দেখাও যা।” ববি প্রত্যাশ করতই সুখদা কহিল, “আজ তুমি স্কুলে যাবার পরেই শ্রীমতী বামনী এসেছিল।” বিনয় জুর্কুটি করিয়া কহিল, “ও মাগী আমাধর বাড়িতে কেন? এমনই কখনও আসে না।” গম্ভীর হইয়া সুখদা কহিল, “কাজ ছিল তাই এসেছিল।”

“কি কাজ?”

“বলছিল, পরেশ রোজ আমাদের বাড়িতে আসে, গল্প করে বলে—গায়ে কথা উঠেছে।” বিনয় প্রশ্ন করিল, “কি কথা?” সুখদা রাগত স্বরে কহিল, “বৃদ্ধকে পারহ না—কি কথা? বাড়িতে যদি শাড়ি মেয়ে থাকে, আর একজন জেয়ান ছেলে দিনরাত আনগোনা করে, তা হলে কি কথা উঠে? ন্যাকা!” বিনয় কড়া সুরে কহিল, “ও রকম কথা কেন উঠবে?” সুখদাও স্বকায় দিয়া কহিল, “তোমার মতে বৃদ্ধি নাই বলে। গায়ের লোকের ভাবছ চোখ নেই? বাড়াবাড়ি হ’লিছ বলছি কথা উঠেছে।” বিনয় চোদা গলায় কহিল, “ঘরের ছেলে ঘরে আসে, তাতে বাড়াবাড়ি কিসের? ঐ মাগীই হত বদমায়েনী—পাখিম্নী মাগী!”

সুখদা ধমকের সুরে কহিল, “এত চেঁচাচ্ছ কেন? মেয়েরা শুনতে পারে যে! ওরা কিছু জানে না।” বিনয় কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ নমাইয়া কহিল, “ঐ মাগীই রটছে—গায়ের লোক কেউ কিছু বল নি। কই,

আমি তো কিছু শুনিনি।” সুখদা স্নেহের সহিত উত্তর দিল, “তোমার কানের পর্দাটা একটু পেরু কিনা, তাই কানের কাছে ঢাক স্ন পিটোলে মাথায় ঢেকে না।” বিনয় তাল ফাল করিয়া তাবকায়া রছিল। সুখদা বলিতে লাগিল, “গায়ের নানা লোক নানা কথা বলছে। আর অনায়াসে তো কিছু বলে নি! অতবড় বিয়ের ব্যুগি মেয়ে, তাকে বাইরের একটা পেড়ে ছেলেমান্না সামনে বাসিয়ে—” বিনয় প্রতিবাদ করিল, “বাইরের মানে? এতটুকু বেলা থেকে ঘরের ছেলের মত—” সুখদা বাধা দিয়া কহিল, “বাইরের বই কি! ওদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?” বিনয় কহিল, “সম্পর্ক” করলেই পার। বলছিলাম তো করত—তোমার যে আবার হত বুদ্ধিবৃত্তি—” সুখদা সন্তোষে কহিল, “চুপ কর! যা তা বল না বলছি। বুদ্ধিবৃত্তি! যেসে ঘরে মেয়ে দিয়ে পথে দাঁড়াই না কি? অন্য তোমার ছেলেরমতো নেই? বিয়েপৈতে আর দিতে হবে না তোমাকে?” বিনয় কিছুমাত্র মুখে চুপ করিয়া রছিল। সুখদা সন্তোষে কহিল, “তা ছাড়া তুমি বললেই বৃদ্ধি ও তোমার মেয়েকে বিয়ে করত।” বিনয় স্বীকৃতিতে কহিল, “তা” চোখ হয় করত।” সুখদা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, “না বরত না। বাড়িতে শাড়ি মেয়ে বাসিয়ে রাখলে, বাইরের ছেলেরা সুবিধে পেয়ে—যখন ঘরের ছেলের মত নাওটা হয়ে ঘুরঘুর করে। কিন্তু বিয়ে করতে বললেই মারে পড়ে।” বিনয় ঘাড় নাড়িয়া নিবেদন করিল, “পরেশ তেমন ছেলে নয়। এখনও বললে—ও বোম্ব হয় বিয়ে করবে।” বিদ্বেষের স্বরে সুখদা কহিল, “যাও না একবার জিজ্ঞাসা করতে, তোমার মেয়েকে বিয়ে করবে কি না।” বিনয় মোসাহে কহিল, “হ্যাঁ, তা যেতে পারি, আর আজ রাতেই সন্ধ্যা পাকপাকি করে আসতে পারি।” সুখদা দুই চোটে চাপিয়া বিনয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাবকায়া থাকিয়া কহিল, “কি যে মানুষ! গায়ে কি কখনও বুলাে নুঁজে বাস কর কিছু শোন নি?” বিনয় জিজ্ঞাসামুখে কহিল, “কি?”

“পরেশের যে সম্পদ হয়ে গেছে।”

বিনয় সন্ধিস্বরে কহিল—“পার সঙ্গে?”

“কার্তিক ভাঙারের মেয়ের সঙ্গে, তবু ভালসা যাচ্ছে—সব প্রায় ঠিক। অত পরসা খাচ্ছ করে কলবাতা থেকে ভাঙার পাশ করে এসে কেউ পঞ্চাশ টাকা মাইনের মাস্তুরের মেয়েকে বিয়ে করে? তোমার মত লোকরাই তা বিশ্বাস করে।” বিনয় নীরবে চোখায়া রছিল। সুখদা কহিল, “আমি দুপুরবেলা পরেশ এসেছিল। আমি একরকম বলেই দিলাম।” হেঁচতাহে চিন্তা কহিল, “কি বললে?” চোখ দুটো ছোট করিয়া, কপালটা বুটকাইয়া সুখদা কহিল, “বললান বাবা। গায়ে নানারকমের কথা উঠেছে—তুমি আর হামোবা আমাদের বাড়ি যাওয়া-আসা করো না।” গভীর লজ্জা ও পরিতাপের সহিত বিনয় কহিল, “ছিঃ ছিঃ!” ধারালো-কণ্ঠে সুখদা কহিল, “ছিঃ ছিঃ কিসের? আমার মেয়ে কি খেলনা? গায়ের মেয়ে বলে রক্তমাংস নেই তার শরীর? ঐ ছেলের সঙ্গে গল্প-সঙ্গ কর, মিলে-মিশে বসে তান মন বিগড়ে যাক, তা হলে সামলাবে কি করে? আমি ঠিক কথাই বলেছি, পরে বুঝতে পারবে।” বিনয় বিহ্বল মননে পতীর মুখের দিকে তাকাইয়া রছিল। সুখদা আদেশের স্বরে কহিল, “খাওয়ার পর এখনই একবার বেরোও। ঐ ওষুধটা আর যতটা পরেশকে দিয়ে এস। যখন তখন আসবার আর যেন কোন ছড়ো না থাকে।” বিনয় অনুযোগের স্বরে কহিল, “পাগল নাকি। ও আমি পারব না। দুর্দিন যাক, তারপর দিয়ে ভালই হবে।”

চোখ ও মুখের ভাব তিন করিয়া তীব্রকণ্ঠে সুখদা কহিল, “তুমি পারবে না, তা আমি আগেই জানতাম।” বিনয় ভরে ভরে কহিল, “পারব না কেন? মাংস—মজা নাই বা হ’ল। গায়ে বাস করতে হলে ওর সঙ্গে সম্পর্ক তো একবারের কাটলে চলবে না, ভাঙার—” সুখদা কঠোরকণ্ঠে কহিল, “সম্পর্ক” কাটতে কে চাচ্ছে? গায়ের ছেলে—গায়ের ভাঙার—আসবে, ঠিককথামাংস বসবে, চা খেতে চায় থাকে, আবার চলে যাবে। তাকে ঘরের মাগি নিয়ে এসে মেয়ের সঙ্গে বাসিয়ে গল্প করতে না দিলেই যে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা হবে না, তা নয়।”

বিনয় কহিল, “তা হ’লেও আজ দুপুরবেলায় ঐ কথার পরে, সন্ধ্যাবেলাতেই সব ফেরত দিতে গেলে কিছু মনে করবে না?”

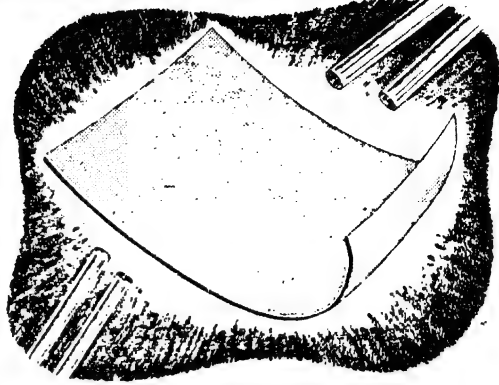
জু-ভঙ্গী করিয়া সুখদা কহিল, “মনে করবে কেন? বুঝিয়ে বলবে—মেয়ের এমনই শরীর সারবে, ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই, ওজন নবোবদ দরকার নেই—” বিনয় এবার বিরক্তির সহিত কহিল, “ও তো আর নিজেকে হত দেয় কি—তুমিই চেঁচোহঁসো। এখন তাকে মিছেবিহি অপমান না করলে বুঝি—” বাধা দিয়া সুখদা কহিল, “অপমান কে

“তাজা চা, তাজা মন”

—“আনন্দের সুধাপাত্র ভরি,
আনন্দ উথলে ওঠে
কাণায় কাণায়”

ডি লুক্স টি কোং

হেড অফিস—
১৭এ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট,
কলিকাতা।



বিখ্যাত জিনিষগুলি

মজা মেটাল রডস্	ব্রাইট এম্. এস্. বারস্
ফস্ ফোর ব্রোজ রডস্	কপার অয়্যার
ব্রাশ রডস্, রাউন্ড (পিতলের বস্)	ব্রাশ অয়্যার
কপার রডস্, রাউন্ড (তামার বস্)	কপার, স্কেয়ার
ব্রাশ রডস্, হেক্সাগন	ব্রাশ, স্কেয়ার
কপার রডস্, হেক্সাগন	কপার টেপ
কপার ব্র্যাট্ বারস্	লেড্ শীটস্
ব্রাশ ব্র্যাট্ বারস্	জিংক শীটস্

এবং আমাদের প্রস্তুত অন্যান্য নন-ফেরাস মেটাল এর জিনিষ কাজে
নির্ভরযোগ্য এবং কার্যগারেতে শ্রেষ্ঠতার জন্য প্রসিদ্ধ।

ইণ্ডিয়া রোলিং মিলস লিমিটেড

লিটফেন হাউস, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।
টেলিফোন : কাল ৫৬১০ টেলিগ্রাম : “INDROLMILS”

পূজার

পপো

১৯৪৪

পাইওনীর রেকর্ড

শ্রীমতী নমিতা সেন

ছটির বাঁশী বাজল : আমি জ্বালব না মোর
(রবীন্দ্র-গীতি—N Q 253)

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

যদি ভুলে যাও : ঘুমিয়ে পড়েছে চাঁদ
(আধুনিক—N Q 256)

অঞ্জলি মুখার্জী

নীলবে ফিরিয়া যাব : ফালগুনে ফুলদল
(আধুনিক—N Q 254)

বেচু দত্ত

হৃদয় কাহ্নে যেন
ছুঁমি যারে চাও
(কাব্য-গীতি—N Q 255)

পাইওনীর রেকর্ড ক্লাব
A man & 99 women
(কবিতা—N Q 257)

ভারত রেকর্ড

কুমারী নীলিমা গুপ্ত
আমার দোসর যে জন
যুঁকি বেলা বয়ে যায়
(রবীন্দ্র-গীতি—S C 58)

কুমারী কমলা সেন
আমার এ পথ
পূর্ণ চাঁদের মায়ার
(রবীন্দ্র-গীতি—S C 59)

খোকা-খুকুর আসর

হুলো আর মেনী
ফড়িংবাবুর পদা লেখা
(N Q 258)

মজার ছড়া আর গানে ভরা

‘শেষ-রক্ষা’ বাণীচিত্র থেকে
কমলমণির গান

পা ই ও নী য়ার রেকর্ডে



কে, সি, দে য়াও সন্ম

১৬১/১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

করছে?" বিনয় কহিল, "অপমান বই কি! একজন একটা জিনিস দিয়ে গেল, কি একটা শূন্যই সেটা ফেরত দিলে অপমান করা হয় না?" শূন্যনা জবাব না দিয়া, কাল কুচকাইয়া উপরের দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁটটাকে চাপিয়া—কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল, "শেষে ওষ্য থাক, যন্ত্রণা দিয়ে এস। বলবে—ছেলোরা নষ্ট করে দেবে—দামাী জিনিষ দরকার হলে নিয়ে যাব এখন।"

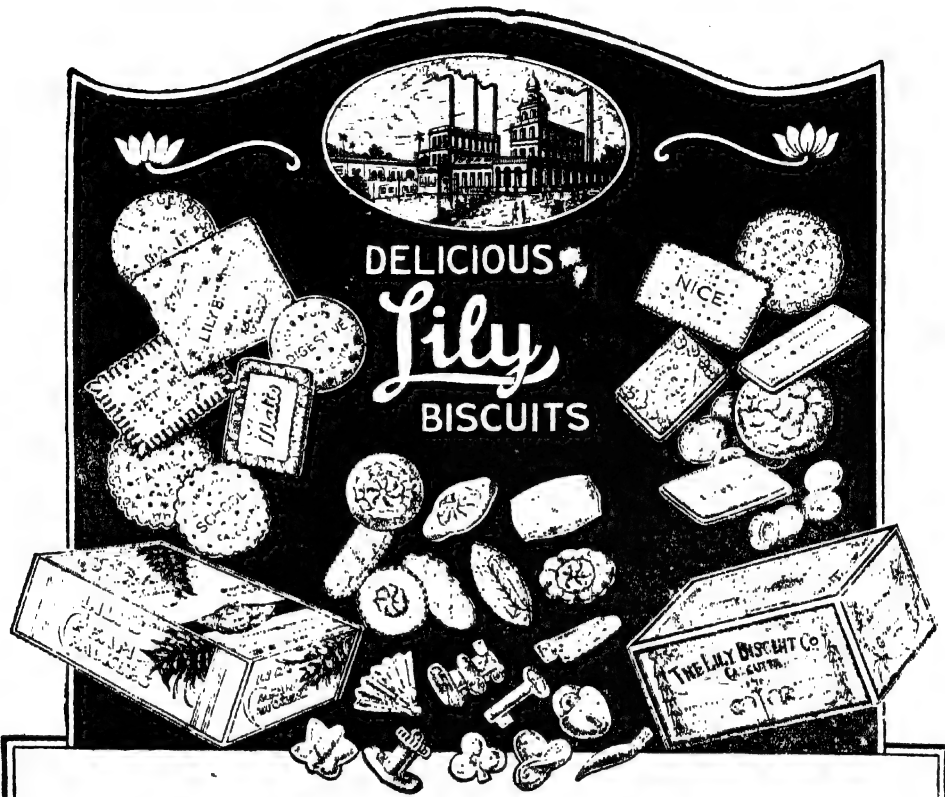
(১২)

সারা বিকালটা পরেশের বড় অস্বস্তিতে কাটিল। কি করবে—সে স্থির করিতে পারিল না। যদি 'হা' বলে, কার্তিকের দল অমনই হেঁচকি করিয়া ছুটিয়া আসিয়া কার্তিক-কন্যার সহিত তাহাকে বিবাহ-বন্ধনে খাটেপুটে বঁধিয়া ফেলিবে। তারপর, আর নির্ভর-চড়্‌বার উপায় থাকিবে না, কোন দিক তাকাইবার ছায়া থাকিবে না, বাড়ি হইতে কার্তিকের অন্দর-মহল পর্যন্ত বাধা-সড়ক ছাড়া কোথাও হাটা চলিবে না এবং মেয়ে যদি মাথের মত পরাক্রমশালিনী হইয়া উঠে তো আমরা কার্তিক-কন্যাগত প্রাণ হুইয়া কাটাতে হইবে। যদি 'না' বলে, তাহা হইলে এই গ্রাম হইতে বিদায় লওয়া ছাড়া গতান্তর থাকিবে না। তাহা ছাড়া বিব। তাহার সহিত সম্পর্ক একেবারে চুকাইয়া দিতে হুইয় অত্যন্ত নারাজ বলিয়া মনে হইতেছে। নেশার মত বিব। তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। একাদিন দেখা না হইলে, কথা না বলিলে, মনটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। কোন কার্যে মনঃসংযোগ করিতে পারে না, নেশাখোরের মত সারা অন্তর যেন ক্রমাগত গ্যামোড়া ভাঙিতে ও হাই তুলিতে থাকে। তাহা ছাড়া বিব। দিকটাও চিন্তা করিবার আছে। মনস্তত্ত্ব-বিদদের মাপকাঠি অনুসারে যাব। মানসিক অবস্থাটিকে ঠিক 'ভালবাসা' না বলা গেলেও, সে যে তাহার প্রতি আকৃষ্ট, তাহা বেশ বুঝা যায়। তাহাকে দেখিতে চায়, তাহার কথা শুনিতে চায়, তাহারক দেখিবামাত্র তাহার মুখে আনন্দের অরুণাভা ফুটিয়া উঠে। আজও তাহারই প্রয়োচনায় শূন্য তাহাকে ডাকিয়াছিল এবং ঘরে ঢুকিবারে স্বাকীর অলঙ্কিতে বিদ্রোচমকের মত সে একটি কটাক্ষ হানিয়াছিল। তাহার সম্পর্ক নিজেই যে দুর্দাম রটিয়াছে, হুতো সে এখনও জানে না; জানিলে নিশ্চয় তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইত না। তবে তাহার সহিত কার্তিক-কন্যার যে বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে, সে শুনিয়াছে। ইহাতে তাহার মনের ভিতর কি হইতেছে, তাহা তাহার মনেন বিশ্বাস মুখের স্থান হাসিচুকতে হয়তো ঘরা পড়িয়াছে। পাড়াগায়ের মেয়ে, শিক্ষার জোন্স, তাহার নাই। আলোকপ্রাপ্ত অসুস্থিকাদের মত স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক্য দাবি করিতে শিখে নাই; তাহার যে একটি পৃথক মন আছে, ইচ্ছা আছে, হুটি আছে, সে কথা মুখে ফুটিয়া প্রকাশ করিবার মত হুইয়ের শক্তি অর্জন করে নাই। কাজেই, যাহারই সহিত বিবাহ-বন্ধনে তাহাকে বাঁধিয়া দেওয়া হউক বিনা বিশ্বাস, বিনা প্রতিবাদে, আমরা তাহারই পাছ পাছ চলিবে। তাহার স্বতন্ত্রের মধ্যে অহরহ যে কটা নির্দিয়া থাকিবে, তাহার নিরুদ্ভাব আভাস তাহার আচার ও আচরণে, বাক্যে ও বাবহারে কোন দিন প্রকাশ পাইবে না। হয়তো ভার্যাজীবনে স্বামী-পুত্র-কন্যা-পরিবৃত সংসারে অপখ্যাত কর্মবাস্তবতার মধ্যে স্বপ্ন অবসরে, কোন কোন দিন কৈশোরের এই দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়া শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের পানে তাকাইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবে, হয়তো বা মুহূর্তের জন্য স্বাণ বিদ্রোচমকের মত স্থানহাসি তাহার অগোচরে ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া যাইবে। আর সে নিজে? নিজের হুইয়ের অবস্থা সে বুঝিতে পারিতেছে না। নারীসংগের ক্ষুধা তাহার বুকের মধ্যে জাগিয়াছে, কিন্তু তাহা যে শূন্যে বাকি পাইলেই শান্ত হইবে, আর কাহাকেও পাইলে হইবে না, এতখানি সাংখ্যাতিক অবস্থা তাহার অদ্যাবধি হয় নাই। তবে বিবকে তাহার ভাল লাগে; ভাল লাগে তাহার সুন্দর তরুণ, ভাল লাগে তাহার শূন্য কোমল দেহাবগা, ভাল লাগে তাহার নম্র সরল সুন্দর বাবহার, ভাল লাগে তাহার নির্বিচার নির্ভরতা। যাহাকে সে বিবাহ করুক, বিবকে সে কোন দিন ছুটিবে না। আজ যদি ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি কার্পণ্য না করিতেন, বিবকে বিবাহ করিতে সে বিন্দুমাত্র বিধা করিত না। সামাজিক বাধা কার্তিক যদি অতিক্রম করিতে পারে, বিনয়ের পক্ষেও তাহা দুরতিক্রম হইত না। বিনয়ের স্ত্রী হয়তো স্ত্রী-সুলভ নির্মমতা ও গোড়ামির জন্য এবং মিথ্যা সামাজিক নিগ্রহের ভয়ে প্রতিরোধ করিত, কিন্তু বিনয় রাজি হইলে এবং ভালম দিয়া তাহার মন ও মস্তকে একটখানি শক্ত করিয়া তুলিতে পারিলে সে প্রতিরোধও দূর হইত। কিন্তু ভাগ্য কি কোন দিন প্রসন্ন হইবে না? ইহার কথাই এত নিরাশ হইবার সময় আসে নাই। পড়ার খরচ চালাইয়াও তাহার যে পৈতৃক সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে, তাহা বিক্রয় করিলে কোন ছোট শহরে ছোট ডিসপেনসারী করিয়া নুতন করিয়া বাসনা শূন্য করিবার মত

মূলধন সংগ্রহ হইতে পারে। তাহার উপরে বিব যদি গৃহলক্ষ্মীদেপে তাহার সুন্দর মুখের অস্থান হাসি, সুকোমল হস্তের সেবা এবং হৃদয়ের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও মঙ্গলকামনা লইয়া তাহার পার্শ্বে থাকে, তাহা হইলে অচিরে হয়তো সে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতাও অর্জন করিতে পারিবে।

পরেশ শূন্য ছিল। উৎসাহে উঠিয়া পলস। স্থির করিল, মাসীমাকে কোন কথা দিবার পূর্বে সে আজই সম্ভার পর একবার বিনয়ের সঙ্গে দেখা করিবে। লজ্জা ও সন্দেহ বিসর্জন দিয়া সে স্পষ্টভাবে তাহাকে লিঙ্গাঙ্গা করিবে, বিবকে তাহার হাতে দিতে তাহার মত আছে কি না। তাহার মত যদি হয়, তাহা হইলে সে বুঝাইয়া শূন্যইয়া বিনয়ের স্ত্রীকে রাজি করিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহা না পারিলে, বিনয়ের মত লইয়া সে যে কোন উপায়ে বিবকে বিবাহ করিবে।

সম্ভার কিছু পূর্বে পরেশ বেড়াইতে বাহির হইল। সকালে যে দিকে গিয়াছিল, তাহার উল্টা দিকে চলিল। গ্রাহনগপাড়া পার হইয়া, তালপুকুরের পাশ দিয়া গাঙ্গুলীদের আমবাগানের ধারে গিয়া পৌঁছিল। বাগানের মধ্য দিয়া একটা পায়ে-চলা পথ। বাগানের এ-ধার হইতে ও-ধার পর্যন্ত গিয়া বিস্তৃত মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। পরেশ রাস্তা হইতে নামিয়া সেই পথ দিয়া বাগান পার হইল। তারপর মাঠের আইল ধরিয়া সামনের দিকে কতকটা অগ্রসর হইয়া ডানদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিতে শুরুর করিল। কতকটা অগ্রসর হইতেই বামপাশে পড়িল একটা ছোট পুকুর—পাড় অত্যন্ত নীচু; চারিদিকের পাড়, জলের কিনারা পর্যন্ত চোরকটির গাছে ভর্তি, লম্বা লম্বা ঘাস ও পানফলের পাতায় সমস্ত জল ঢাকিয়া গিয়াছে, শূন্য মাঝখানে এক টুকরা কালো জল চক্‌চক করিতেছে। পুকুরের একটা কোণে মাঠ হইতে কিনারা পর্যন্ত চড়া ও গভীর নাল। কটা; বর্ষার পর জলের অভাব হইলে এখানে দুর্নী বসাইয়া ক্ষেতের শসারক্ষার ব্যবস্থা হয়। পুকুরটার পাশ দিয়া আরও কতকটা অগ্রাংয়া আবার ডানদিকে মুখ ফিরাইতেই গ্রামের স্কুল চোখে পড়িল। এই স্কুলটির অবস্থা আগে ভাল ছিল না। দুইখানা লম্বা টিনের চালওয়ালা ঘরে স্কুল বসিত; বিদেশী ছেলেরদের থাকিবার জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। পাঠের গ্রামের এক ভুলোক স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন; তিনি স্কুলের পরিচালনা অপেক্ষা ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালনায় এবং নিজের সংসার ও বিষয়-আশয়ের তত্ত্বাবধানে বেশি অবহিত ছিলেন। কাজেই, তাহার কর্তৃত্বধানে স্কুলটি অচিরে আশ্রমে পরিণত হইল। আশ্রম-বালকগুলির অধিকাংশই সকাল স্কুলে ভাত খাইয়া আসিবার দশটা হইতে চারিটা পর্যন্ত স্কুলপুত্রের বস্‌মবাতাসে আব্ধ না থাকিয়া, চারিটার উন্মত্ত মাঠে-মাঠে, বনে-বাদাড়ে টো-টো করিয়া শূন্য স্বয়ং প্রকৃতিদেবীর পর্ববেষ্টিতধানে জ্ঞানলাভ করিত; মাষ্টারদুটিও নিজ নিজ ছাত্র-বিশল ক্রান্তরূমে চেয়ারে টেস দিয়া বসিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া স্পষ্টপাশে গোপাল-মার্ফি সুবোধ ছেলগুলিকে মনে মনে পড়িতে ও অক্ষ কয়তে আদেশ দিয়া দিবানিরা পড়িতে ছেলগুলিকে করতেন। একবার ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেকশনে পরাজিত হইয়া হেডমাস্টার মহাশয় দুখে হাটফেল করিলেন। হেডমাস্টারের জন্য যথোক্ত-বোকা রব পড়িয়া গেল; এ তল্লারের যতগুলি বেকার গ্রাডুয়েট নিজ নিজ গৃণাবলীর ব্যাখ্যা করিয়া দরখাস্ত পাঠাইল, স্কুলের সেক্রেটারি পরাগ গাঙ্গুলীর বাড়িতে হাটাইটি শুরুর করিল, নিজ নিজ গৃহের প্রস্তুত ঘরের ভাঙ ও নিজ নিজ পুকুরপাতিত সঞ্চপালিত বৃহৎ রোহিত মৎস্য সহযোগে স্কুলের প্রেসিডেন্ট এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল। কিন্তু কাহারও কিছুই হইল না। এস ডি ও সাহেব নিজের একজন বেকার ভাইকে আনিয়া হেডমাস্টারের তথ্যে বসাইয়া দিলেন। এ তল্লারের সকলে মনে মনে গর্জিতে লাগিল; কিন্তু মুখে টু শব্দটি করিল না। নুতন হেডমাস্টারটি বয়স যুবক, দেখিতে সুস্ট্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ উপাধিধারী। তাহা ছাড়া কলিকাতা অঙ্গলের লোক, কাজেই কথায়-বাতায় অত্যন্ত জল্পলোক। ফলে, বৎসরখানেকের মধ্যেই সকলের মনোহরণ করিলেন। তাহা ছাড়া, হাকিমদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকার জন্য তাহাদের সাহায্যে সরকার ও স্থানীয় অবস্থাপন লোকদের কাছ হইতে অনেক টাকা আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। ফলে, একটি বৃহৎ একতলা স্কুলগৃহ নির্মিত হইল; বিদেশী ছাত্রদের জন্য টিনের চালওয়ালা প্রান্তর ঘর দুইটি বোডিং-গৃহে পরিণত হইল; ভার্টিস্ট্র বোর্ডের অর্থসাহায্যে স্কুলের সামনে একটি ছোট পুকুর ভরাট করিয়া ছাত্রদের খেলার মাঠ প্রস্তুত হইল, অর্থ আশ্রমটি আবার স্কুলে পরিণত হইল। হেডমাস্টার মহাশয়ের সতর্ক ও কঠোর তত্ত্বাবধানে ছাত্রগুলিকে স্কুলঘরের বস্‌মবাতাসে বসিয়া অধ্যয়ন করিতে হইতে লাগিল এবং মাস্টারদুটিকে দিবানিরা বিসর্জন দিয়া খাড়া চেয়ারে বসিয়া অধ্যাপনা করিতে হইতে লাগিল।



লিলি বিস্কুট

স্বাদে ও গুণে অপূরণীয়

তাজা, মৃচ্ছমৃচ্চে, নোনতা
নবনীত, লোভনীয়

লিলি ব্রাণ্ড বার্লি

ভারতের শ্রেষ্ঠ পথ্য ও পানীয়

প্রাণ্তি ও ক্রান্তি দূর করিতে
অতুলনীয়

LILY BISCUIT CO.
CALCUTTA BOMBAY
MANUFACTURERS OF THE FAMOUS "LILY BRAND" BARLEY



শুলের কাছাকাছি আসিতেই পরেশ দেখিতে পাইল, খেলার মাঠে হেলেরা খেলা করিতেছে ও ধনকয়েক শিক্ষক খেলা দেখিতেছে। এই শিক্ষক-দের সহিত পরেশের বিশেষ পরিচয় নাই। ইহারা বিদেশী লোক, বোর্ডিং-খাচ্ছে। পরেশ আবার ডানদিকে মূখ ফিরাইয়া চলিতে শুরু করিল এবং বোর্ডিংয়ের পিছন দিয়া কতকটা গিয়া গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

প্রথমেই আগরীপাড়া; রাস্তার দুই ধারে সারি সারি উঁচু দাওয়া-ওয়ালা খড়ের ঘর। পূর্বে আগরীপেয় প্রায় প্রত্যেকই বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল। কিন্তু গ্রামের রহস্য ও কারখণ্ডের কূট বৈয়্যিক শৃঙ্খল-সঙ্গে আটিয়া উঠিতে না পারিয়া দুরবস্থায় পড়িয়াছে। পাড়ার মধ্যে শূণ্য, যুগল আগরী বাহারও কাছে হার স্বীকার করে নাই; যতদিন বাঁচিয়া ছিল আঘাতের বদলে আঘাত করিয়া, পাটের বদলে পাচি কাঁচিয়া, বিপক্ষ দলকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। যুগলকাকাকে পরেশের মনে পড়িল; লক্ষ্য-চড়া দেহ, শক্তমান, তেজস্বী ও সাহসী পুরুষ। যুগল-কাকা পিছনে না থাকিলে বাবার মৃত্যুর পর অস্বীয়-স্বজনদের শোভাকাঙ্ক্ষার ধাক্কা সামলাইয়া তাহারা গ্রামে বাস করিতে পারিত না।

একটা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি হুঁকায় তামাক শাইতেছিল। পরেশকে দেখিয়া হুঁকাতা মূখ হইতে সরাইয়া দুই হাতে হুঁকার ডাবটি ধরিয়া, নব্বোটে মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, “পেরনাম ডাক্তারবাবু! কেথায় গেছেলেন।” পরেশ মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, “এই দিকে একটু—” লোকটা প্রশ্ন করিল, “হেঁটে যে?” পরেশ চলিতে চলিতে জবাব দিল, “হ্যাঁ।” কতকগুলি মেয়ে কলস কঁখে করিয়া জল আনিতেছিল—পরেশকে দেখিয়া, যেমটা টানিয়া সমস্তমে পাশ কাটিয়া দাঁড়াইল এবং সে পার হইয়া যাইতেই তারাদের মধ্যে সহসা গজেন শোনা গেল। আরও কতকটা যাইয়া, ডানদিকে ফিরিয়া, ছোট গলি রাস্তা দিয়া গিয়া আর একটি রাস্তায় পড়িল। এই রাস্তাটি গ্রামেরপাড়ার মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই রাস্তায় কতকটা যাইতেই শ্রীমতীর সহিত দেখা হইল; নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা দেখাইতেছিল, পরেশকে দেখিয়াই আপায়ন সহকারে কহিল, “এই যে ভাই! কেথায় গিয়েছেন?” পরেশ হাসিয়া জবাব দিল, “এমনই একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম।”

শ্রীমতীর ঘরস পয়ামের কাছাকাছি, ফরসা রঙ; এককালে যে ছোরা ডালই ছিল, বার্ষিকের ধরসম্পদ দেখিয়াও তাহা আন্দাজ করিতে পারা যায়। শ্রীমতী তুলসীনের কন্যা; রূপ ও যৌবনের দৃড়দৃড় দিয়াও স্বামীকে বহিরা রাহিতে পারে নাই। বিবাহের পর দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই স্বামী আর একটি কুটুম্ব-কন্যার স্বামী হইয়া গেল। শ্রীমতী তারপর আর স্বামীর ঘর কর নাই। ব্যাপার একদম কন্যা; জমি-জায়গা কিছু ছিল। কাজেই মা-বাপের মৃত্যুর পর, সাজ-খাজনা আদায় করিয়া, চাকার সাতো কাটিয়া দৈত্য তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করিয়া, তাহার একটি পেট অন্যায়সে চালাইয়া দিল। স্বামী একবার আসিয়া হাতে-পায়ে ধরিয়া জল জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু শ্রীমতী তাহাকে গালগালাই দিয়া, চোলাকট হাতে তাক করিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর আর শ্রীমতীর জীবনে স্বামী-সম্ভাষণ ঘটে নাই। স্বামীর প্রতি নিন্দাবাদ হইলেও শোনা যায়, শ্রীমতীর হৃদয়ে কবুনা ছিল এবং তাহা সাময়িক দুই-চারজন যুবকের (যাহারা এখন বার্ষিকে পদার্পণ করিয়া লোক-ঘোঁটা কাটিয়া ধর্মদেবী বনিয়াছে) প্রতি বিনামূলোই বিতরিত হইত।

শ্রীমতী কোঁচ-পড়া মধ্যে আরও কতগুলো কোঁচ পড়াইয়া মূঢ়কি হাসিয়া কহিল, “করও সম্পনে ঘরে বেড়াছ নাকি?”

পরেশ বক্তব্য না বহিয়া বোকার মত হাসিল। শ্রীমতী কহিল, “আমি দেখা করিয়ে দিতে পারি কিন্তু—” পরেশ বিস্ময়ের সহিত কহিল, “কর সংগে?” শ্রীমতী কহিল, “যার একটিবার দেখা পাবার জন্যে বেরিয়েছ, তার সংগে—আমাদের কমলার সংগে।” পরেশ গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিল, “থাক, দরকার নেই দিদিমা।” শ্রীমতী কহিল, “পেটে ক্ষিদে মূখে লাজ কেন হে? মূখে বলছ না; কিন্তু তুমোর ঠোঁটের হাসি আর চোখের চাহনি বলছে—হ্যাঁ।” হাসিয়া কহিল, “প্রিয়দর্শন সংগে নাই বা দেখা করলে, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যেতে লোম আছে নাকি?” পরেশ কহিল, “আমার একটা কাজ আছে দিদিমা, চল।” শ্রীমতী অপর্যটনসংযোগ অবজ্ঞাসূচক হুঁদনি করিয়া কহিল, “কাজ! একদিন সব কাজ ছেড়ে এই দিদিমার ভাড়া ঘরে পড়ে থাকবে, আমি বামুনের মেয়ে হয়ে ভরসংযোগ বলে দিচ্ছি।” অন্তের করিয়া কহিল, “চল না ভাই! মূঢ়কি শূঁকিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। একটা মন্ডা দিয়ে একটু জল

খেয়ে যাও, না হলে—” মূঢ়কি হাসিয়া কহিল, “সারারাত শূঁকিয়ে মূখ মনে করে আমার রাতে ঘুম আসবে না।” বলিয়া দরজায় দিক্‌ অগ্রসর হইল। পরেশ অগত্যা তাহার অনুসরণ করিল।

দরজায় ঢুকিতেই সামনে বিস্তৃত উঠান; ডান দিকে খড়ের ঢাল ওয়ালা মটির কোঠা ঘর। পাশাপাশি দুইটি কুঠরী, সামনে প্রস্তুত দাওয়া; দাওয়া বেশ উঁচু; সিঁড়িতে সমেত দিয়া বাধানো। বাম দিকে একটি একতলা ছোট ও প্রাচীন ঠাকুর দালান; প্রবেশ স্বায়ের খাড়া উপরে, সামনের দেওয়ালের মাথার ঠিক মাঝখানে একটি যুগ্মস্ত নাড়ুপোপালের ভগ্নাংগে উপবিষ্ট গরুড়দের প্রতিমূর্তি। নাকট ভাঙিয়া গিয়াছে, মূখও বিধ্বস্তপ্রায়, মাথায় একটি হাত-দুই লম্বা লোহার শিক প্রোথিত। দেবারতনটিকে বস্ত্রপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গরুড়দের এই শাস্তি। এখন অবশ্য দেবমূর্তি নাই; বাবা-মায় মৃত্যুর পর নিত্য-সেবা চালাইতে না পারিয়া শ্রীমতী শালগ্রাম শিলাটিকে গগণগর্ভে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছে এবং দেব-গৃহটিকে ভাঙার-গৃহে পরিবর্তিত করিয়াছে। তথাপি গরুড়-দের শঙ্কমূর্তি ঘটে নাই।

শ্রীমতী আসিয়া ঘরের দাওয়ায় একটি মান্দুর পাতিয়া সাদরে কহিল, “এস ভাই, বস।” তারপর প্রদীপ-হস্তে ঠাকুর দালানের ভিতরে গিয়া দেবীর সামনে একটি পিলসুজের উপর প্রদীপটি রাখিল। এবং শূন্য সিংহাসনের সামনে জানু পাতিয়া প্রণাম করিল। তারপর ঘরের এক কোণ হইতে একটি প্রাচীন লঠন বাহির করিয়া জুলাইয়া, এ ঘরে আনিয়া পরেশের পাশে রাখিয়া কহিল, “চারটি মূখ চিড়ে মেখে দেব?” পরেশ প্রবল আপত্তি সহকারে কহিল, “না, না; এক গেলস জলই দিন না শূন্য।” শ্রীমতী মূখ-চোখ ঘুরাইয়া কহিল, “তা কি হয় ভাই! কত ভাগ্যে কুঞ্জে পদার্পণ করছে—আগে হলে সারারাত ঘরে রাখতাম।” পরেশ মূখ টিপিয়া হাসিল। শ্রীমতী ঠাকুর দালনে চাইয়া গেল।

পরেশ চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বারাম্বার এক পাশে একটি কক্ষের আসন পাতা—তাহার সামনে শ্রীমতীর চরকা, পেঁজা তুলা, নাটাই এবং অন্যান্য সূতা কাটিবার সরঞ্জাম। ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্ন। উঠানের মাঝখানে একটি ইঁটে বিনামূল্যে তুলসী মণ্ড, তাহাতে একটি তুলসীপত্র; উঠানের এক কোণে একটি শাখা প্রশাখারহীন কাগজীশেবর গাছ। শ্রীমতী লেবু, বিক্রয় করিয়াও দুই পরগা রেজার কর করে। উঠানের এক মারে একটি খয়ের চনা, সেখানে একটি চৌকি রাখাছে। শ্রীমতী নিজে শান ভানে না, তবে ভানুদীনের চৌকী ভাড়া দিয়া থাকে।

উঠার তীব্র নারীকণ্ঠের “দিদিমা” ডাক শুনিয়া চমকিয়া সদর দরজার দিকে তাকাইতেই পরেশ দেখিতে পাইল, একটি পনেরো-ষোলো বৎসরের মেয়ে ঘরে ঢুকিতেছে, পরিমানে বাসন্তী রঙের শাড়ি, জুটস কি রঙের টায়ার হইল না, মাথা ও পা খালি, মেয়েটি কতকটা আগাইয়া আসিয়া লঠনের আলোকে পরেশকে দেখিতে পাইয়াই দুই পা পিছাইয়া লজ্জায় জিন-কাটিল, তারপর দ্রুতপদে সদর দরজার দিকে চলিয়া গেল।

পরেশ হাঁকিল, “দিদিমা!”

শ্রীমতী জবাব দিল, “কি ভাই! একলা ভয় করছে? এই সংঘাবেলায় ভয় কি হে?” পরেশ কহিল, “আপনাকে কে ডাকছে দেখুন।” শ্রীমতী ভাড়াভাড়ি বাহির হইয়া আসিল—হাতে একটি রেকাবি, তাহাতে মূড়কি ও মন্ডা; কাছে আসিয়া কহিল, “কি বলছ?”

পরেশ কহিল, “কে ডাকছে আপনাকে।”

শ্রীমতী দরজার দিকে তাকাইয়া কহিল, “কই?” পরেশ মূখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, “বোস হয় দরজার বাইরে দাঁড়িয়া আছে।” শ্রীমতী রেকাবিটা পরেশের সামনে নামাইয়া দিয়া মূঢ়কি হাসিয়া কহিল, “বুকেছি ভাই, আমার নাতনী।” বলিয়া ঘরের রেকাবি যাইতেই পরেশ কহিল, “উনি বাইরে দাঁড়িয়া থাকেন, ডেকে আনুন।” শ্রীমতী ঘরে ঢুকিয়া জল গড়াইতে গড়াইতে কহিল, “অত আশ্চর্য হুই কেন ভাই, ডাকছি। আগে আমার হবু নাড়ুজামাইকে সামলাই, তারপর নাতনীকে ডেকে আনব।” অনতিবিলম্বে এক গ্লাস জল আনিয়া পরেশের রেকাবির পাশে নামাইয়া দিয়া কহিল, “খাব।” নাতনীকে ডেকে আনি—মিটি খেতে খেতে নাতনীর মিষ্টি মূখখানি দেখবে, তাহলে চিরদিন ওকে মিষ্টি লাগবে।” বলিয়া বার্ষক-শিখিল দেখে যতখানি তরগা তোলা সম্ভব তুলিয়া দরজার দিকে প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ পরে একজনের স-তর্জন অনুরোধ ও আর একজনের স-সংকার প্রতিরোধ পরেশের কর্ণগোচর হইল। পরেশ আড়চোখে চাহিয়া দেখিল—মেয়েটিকে শ্রীমতী হাতে ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে। মেয়েটি কৃষ্ণ

টাকা খাটাবার সবচেয়ে নিরাপদ ক্ষেত্র

যুদ্ধের এই অনিশ্চয়তার মধ্যে নিরাপদ অথচ লাভজনকভাবে টাকা খাটাবার ক্ষেত্র পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু যুদ্ধ বা শান্তি যে কোন সময়েই হউক না কেন, জমিতে টাকা নিাবনায় খাটান যেতে পারে,—

কারণ

যেহ নিৰ্মাণোপযোগী অথবা অন্য যে কোন প্রকারের মূল্যবান জমি একটা স্থায়ী সম্মতি ত বটেই, অধিকতর তা থেকে স্থায়ী ভাল আয়েরও ব্যবস্থা হয়।

জমিতে টাকা খাটাতে হলে লিখুন ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

"শেয়ার ডিলার্স হাউস"
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

* আমরা কাশী, কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের মূল্যবান জমি খরিদ করিয়াছি।

* ভারতের প্রতিটি বৃহৎ শিল্পপ্রধান নগরীতে জমি খরিদ করিবার আমাদের যে পরিকল্পনা, তাহা ক্রমশঃ কার্যকরী করা হইতেছে।

* আমরা নিয়মিত উচ্চহারে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছি।

আমরা "স্থায়ী আমানত" গ্রহণ করিয়া থাকি; সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৩ হইতে ৭ পর্য্যন্ত।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিকট লিখুন।

বিবর্তিত সহিত আবগারের সূত্র কহিতেছে, “আঃ, ছাড়ুন না।” শ্রীমতী কহিল, “ছাড়ব কেন লো ছাড়ো? এতদিন জড়িয়েছিল, আজ এত ছাড়বার জন্যে ছটকটান কেন?” মেয়েটি অনুনয়ের সূত্র কহিল, “সত্য, ছেড়ে দিন। বাড়ি যাই।” শ্রীমতী ধমকাইয়া কহিল, “কেক! বাড়ি যাবার জন্যেই যদি এতক্ষণ সড়া না পেয়েও দরজায় দাঁড়িয়েছিল।” পরেশের সামনে টানিয়া কহিল, “ওহে নাগর! শুনো! মশা খাওয়া ছেড়ে একবার মুখ তুলে তাকাও, মস্তার চেয়ে হাজার গুণ মিষ্টি জিনিস এমনিছা।” পরেশ লজ্জায় আরও মুখ নত করিল। শ্রীমতী থিকার দিয়া কহিল, “ছিঃ! মেয়েমানুষেরও অধম নাকি! নাকের সামনে একটা ডব্বা ছুড়ীকে ধরে দিচ্ছে, তাকিয়ে দেখতে পারছ না!” পরেশ মুখ তুলিল না। শ্রীমতী কহিল, “তাকাও, তাকাও বলছি। না তাকালে আমার মাথা খাও।” পরেশ হাসামুখে মুখ তুলিয়া কহিল, “কি বলছেন! এই নিন তাকাছি আপনার দিকে।” বলিয়া শ্রীমতীর মুখের দিকে তাকাইল। কিন্তু এই অবসরেই আড়চোখে লজ্জনামুখী মেয়েটিকে একবার দেখিয়া লইল। শ্রীমতী কহিল, “আমার দিকে নয়।” মুখের ইঙ্গিতে কহিল, “এই দিকে—তাকাও বলছি। না হলে ঘাড় ধরে, চোখ তেড়ে তাকিয়ে দেবা।” পরেশ এবার পুরোপুরিভাবে মেয়েটির দিকে তাকাইল। যে সুকোমল শ্যাম-শ্রী বাঙালী মেয়ের বৈশিষ্ট্য, এ মেয়েটির দেহে তাহার জোয়ার আসিয়াছে। লজ্জা ও কোতূহল মুখখানি বলমূল করিতেছে; দীর্ঘপক্ষর চোখ দুইটি, দুইটি কৃষ্ণ বন্ধিমেরদ্বারা অধনির্মীলিত; পাতলা জু দুইটি যেন চতুর্থীর কালো চাঁদ, জু দুইটির মাঝখানে কচিপাকার টিপটি যেন ক্ষুদ্র সবুজ তারা, কানের লাল পাথরের দুল দুইটি যেন দুইটি গোলাপের কুড়ি।

শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, “কেমন দেখছ হে? পছন্দ হয়?” পরেশ জবাব না দিয়া মূগ্ধ হাসিল।

এই সময় মেয়েটি মুখ কাঁপুণ তুলিয়া আড়চোখে পরেশকে দোঁষবার চেষ্টা করিল। হঠাৎ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া শ্রীমতী সজ্ঞান কহিল, “তুই খবরদার তাকান না পোড়ামুখী! শব্দদর্শিনীর আগে ঘরের দিকে তাকাতো নৈই জানাস না কি?” মেয়েটি গভীরতর লজ্জায় মুখ একেবারে বৃকের কাছে নামাওয়া ফেলিল।

শ্রীমতী কহিল, “চল, বসার চল।” বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। মেয়েটি ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, “না, বাড়ি যাই আমি।” শ্রীমতী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, “বাড়ি যাওয়া কেন? বস। এখনই তুলে নিয়ে পালানো জারিচিস নাকি?” বলিয়া পরেশের কাছ হইতে কতকটা দূরে আসন পাতিয়া মেয়েটিকে বসাইল এবং ঘরের ভিতর হইতে পান সাঁজাবার সরঞ্জাম আনিয়া পরেশ ও মেয়েটির মাঝখানে বসিল।

পরেশ খাওয়া শেষ করিয়া বুঝলে মুখ মাছিতে মাছিতে কহিল, “খাব খাইয়ে দিলেন দিদিমা।” শ্রীমতী কহিল, “তা ভাই, বুড়ী দিদিমার মজা মজুকি ছাড়া খাওয়াবার তো আর কিছুই নেই।” মচকি হাসিয়া কহিল, “তবে ভাল জিনিস খাওয়াবার ব্যবস্থা করি—বগের সুধা তার কাছে হার যেনে যাবে।”—বলিয়া পর পর পরেশ ও মেয়েটির মুখের দিকে তাকাইল। তারপর পান সাঁজা পুরেশের হাতে দিয়া আরও কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, “এবার ভাই, সত্য করে বল নাটনকি আমার পছন্দ হয় কি না?” পরেশ চুপ করিয়া গেল। শ্রীমতী কহিল, “ওহে শূদ্র, সাদা রঙ দেখে ভালো না। আমারও তো সাদা রঙ, কপাল তো দেখেছ—এ জন্মে সোয়ামীর ঘর করতে পেলাম না। রঙ হলেই চলবে না—কপাল চাই। দ্রোণদীর রঙ তো কোনো ছিল—কিন্তু কত ভাগ্যবতী ছিল বল দেখি? পটিজনে পায়ের কাছে পড়ে থেকেও মন পেত না। নাটনীর আমার তেমনই কপাল। ও জন্মবার আগে তো কার্তিক ডাক্তার একরকম ফুটর হয়েই গিয়েছিল; যা কিছু টাকা-কাড়ি ধনদৌলত গয়না-গাটী ছিল, বেয়াই আর বানে মিলে লুটে নিয়োছিল। এখানে যখন এল তখন লক্ষ্মী পাতবার মত এক ছোটক ধান পর্যন্ত ছিল না। ও হবার পর থেকেই আমার শ্রী-বৃদ্ধি শূন্য হ'ল, তাছাড়া নাটনী কি আমার কপাল? ভাল করে চেয়ে দেখ দেখ—কেমন রঙ, নববুর্দিলশ্যাম তো একেই বলে।” মচকি হাসিয়া কহিল, “গায়ের রঙ ফুসো হ'লে গায়ের আর মেজাজের তাপে কাছে যেখানে পারবে না। ঠিক রকম শ্যামবর্ণ হ'লে মেজাজ হবে মিষ্টি, আর গা হবে শীতকালে গরম, গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা।” সূত্র করিয়া কহিল, “আর্য্যমের রজনী যাপিবে হে গুণগণ।” পরেশ মিমতমুখে শুনিতোছিল, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “উঠি দিদিমা।” খপু করিয়া হাত ধরিয়া শ্রীমতী কহিল, “বা রে! পালাচ্ছ যে! কবো দিবে বাও।” মেয়েটির দিকে

তাকাইতেই চোখে চোখ মিলিয়া পরেশের বৃকের জিহবটা কাঁপিয়া উঠিল, শিখিলকণ্ঠে কহিল, “শাসানীর কাছে শুনকেন।” শ্রীমতী কহিল, “যাবার খবর শুনব না তো?” মেয়েটির লজ্জার কপলেকোমল মুখের দিকে তাকাইয়া পরেশ কহিল, “খুব সম্ভব না।” শ্রীমতী হাতে ছাড়িয়া দিল।

পথে নামিয়া পরেশের মনে হইল, কলকাতা ভাল হইল কি? সে যেন একরকম মত দিয়াই আসিল। মেয়েটির সাক্ষাতে না বলিয়া তাহাকে অপমান করিতে তাহার ভরতাজানে বাধিল যোগ হয়। কিন্তু শূদ্র ভরতাজনে অন্যরোধেই নয়; মনের মধ্যে ডুক দিয়া দেখিল, সেই গভীর ভলবেশে একটি নবজাত শৈশাল-শিশুর মত অতি ক্রীণ অতি ক্লুর আকাঙ্ক্ষা জন্মলাভ করিয়াছে, এখনও বর্ষিত হয় নাই, এখনও দলের পর বল হোলিয়া সারা মনকে ছুইয়া ফেলে নাই। সে আকাঙ্ক্ষা—নবোৎপত্তবোনা তন্দ্রা, শ্যামলী মেয়েটির সঙ্গলাভের, যে চোখের চাহনি বৃকের মধ্যে কাঁপন জাগাইয়াছে, সেই চোখের পরে চোখ রাখিয়া তাহার মনের কথা জানিব। পরেশ ভাবিল, কি হইবে এই গ্রাম ছাড়িয়া গিয়া? কি হইবে কোন এক অপরিচিত স্থানে গিয়া নতনভাবে জীবনযাত্রা শুরু করিয়া? এ সূত্রী মেয়েটিকে গ্রহণ করিলেই তো সব আপনা আপনি ধরা দিবে। ধরা দিবে অর্থ ও প্রতিপত্তি সম্মান ও সম্পত্তি, ধরা দিবে প্রতিবেশীদের স্নেহ সহায়তা সহৃদয়তা ও সহানুভূতি। কিন্তু বারি? তাহাকেও যে মন পাইতে চায়? কিন্তু আজ পর্যন্ত মন যাহা চাহিয়াছে, তাহা কি সব পাইয়াছে? এবং তাহা না পাইয়াও যদি তাহার চলিয়া থাকে, বৃকে না পাইলেও তাহার চলিবে বোধ হয়। হয়তো প্রথম-প্রথম মনটা বেতবেতবে করবে, অভিমানে গুম হইয়া থাকবে, তারপর এ মেয়েটির সূত্রের সাহচর্য প্রবোধ মানিবে।

বৃবদের বাড়ির সামনে পৌঁছিতেই পরেশ দেখিল, বৈঠকখানা অন্ধকার। ভাবিল, পূর্বসংকল্পমত বিনয়ের মতামত জিজ্ঞাসা করে। তারপরই ভাবিল, থাক, কি হইবে জিজ্ঞাসা করিয়া? বিনয়ের মত যে আছে, তাহা সে জানে; কিন্তু তাহার শ্রী কল্পিতেই মত হইবে না। তাহার মত করাইবার জন্য অনুরোধ-উপরোধ, অনুনয়-বিনয় করবার আগ্রহ মন হইতে হঠাৎ মগেই বোমালুম কলতর্পণ করিয়াছে।

বৈঠকখানায় পা দিয়াই পরেশ দেখিতে পাইল, বিনয় টিনের চেয়ারটিতে বসিয়া আছে। সামনে টেবিলের উপর একটি লণ্ডন, খুব সম্ভব বিনয়ই সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া পরেশ কহিল, “কাকাবাবু, আপনি? কোন দরকার আছে নাকি?” বিনয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ সরল হাসি হাসিয়া কহিল, “এস বাবা পরেশ! বস। দরকার এমন কিছু নেই। কোথায় গিয়েছিলেন?” পরেশ বসিতে গিয়া টেবিলের উপর ওজন করবার যথটা দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিল, “এটা এখানে? নিয়ে এলেন বৃদ্ধি?” বিনয় কচিমুচ মুখে চোক গিলিয়া কহিল, “হ্যাঁ বাবা! তোমার কাকীমা বললে, ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—কে কখন নষ্ট করে দেবে। দামী জিনিস—” পরেশ মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, “দামী জিনিস বটে, তবে কে নষ্ট করবে? তা বেশ! বৃদ্ধিও যথেষ্টই নিন ককে খাওয়ান। তারপর একটান বলবন, ওজনটা নিয়ে আসব এখন।” বিনয় সাগ্রহে কহিল, “নিশ্চয়—নিশ্চয়, ওষুদ আমি নিজে নিম্নমত খাওয়াব।” এর মধ্যে দাগ দুই খাওয়া হয়ে গেছে বোধ হয়। তা কোথায় গিয়েছিল বাবা?” পরেশ কহিল, “একটু বেড়িয়ে এলাম। হাতে কাক-কর্ম কিছু নেই, একেবারে বেকার, তাই, ভাললাম একটু ঘুরে আসি।”

বিনয় সাহস দিয়া কহিল, “এখনই এত হতাশ হয়ে না বাবা! যাই হোক, বাবসা তো! একবারে জন্মে উঠবে না; ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধবে। দেশের লোক এখন কার্তিককেই জানে, ভাবে কলির ধন্যকর্তার। ক্রমে ক্রমে, দু-একটা কেসে দরজনে বখন তৈরীকর্তীক হবে, তখন লোকে বৃদ্ধি, কার কতটা বিদ্যা। তা সে তো সময় লাগবে বাবা! কার্তিকের কর্তাদিনের কারবার এখানে; তাকে কোণঠাসা করতে হ'লে তোমাকে একটু ধীরভাবে অপেক্ষা করতে হবে। তা ছাড়া কার্তিক ডাক্তার যদি—”

পরেশ এতক্ষণ একমুণ্ডে বিনয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতোছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “আচ্ছা, কাকাবাবু, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনাকে জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত নয়, তবু উপায় নেই। অশা করি আমাকে নিলজ্জ ভাববেন না—” বিনয় বিন্দয়ের সহিত কহিল, “কি বলবে?” পরেশ ইতস্তত করিয়া বলিয়া ফেলিল, “বৃদ্ধি আমার হাতে দিতে আপনার আপত্তি আছে?” বিনয় ক্ষেত্রের হাসি হাসিয়া কহিল, “আমার মত পরিব মাটরনের তোমার মত ছেলের হাতে সে দিতে আপত্তি!” বাড়ি নাড়িয়া কহিল,

গিৰিশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩০

হেড্ অফিস—২১এ, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৪৭৩১, ৩২৭৫

টাকাকড়ি নিরাপদে রাখিবার নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান

এবং শক্তিশালী ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস

চেয়ারম্যান:—রায় জে, এন, মদুখার্জি বাহাদুর, গভর্নমেন্ট স্টাডার ও পাবলিক প্রসিকিউটর, হুগলী।

মিঃ বীরনারায়ণ চাঁদ, জমিদার ও ব্যাংকার, পূর্ণিয়া।

মিঃ অনিলকিশোর রায়, জমিদার ও ব্যাংকার, মহম্মদসিংহ।

মিঃ বি কে নন্দী, মার্চেন্ট, কলিকাতা।

মিঃ দেবপ্রসাদ ঘোষ, জমিদার ও ব্যাংকার, খুলনা।

ঠাকুর কে কে সিংহ, মন্ত্রী, ত্রিপুরা স্টেট।

মিঃ ফকিরচাঁদ ভগত,

মিঃ পঞ্চকজুয়ার গাঙ্গুলী,

মার্চেন্ট ও অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, কোল্লগর, হুগলী।

এডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর, আলিপুর।

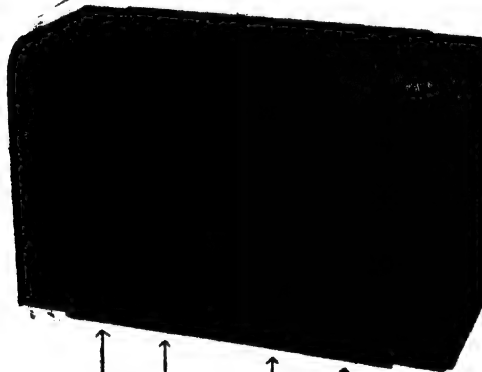
মিঃ আই এন চ্যাটার্জি, মার্চেন্ট, উত্তরপাড়া।

মিঃ হরীকেশ মদুখার্জি, ডাইরেক্টর-ইন্ চার্জ।

সর্বপ্রকার ব্যাংকিং কার্য সুচারুরূপে তৎপরতার সহিত করা হয়।

বিক্রয় এবং মেরামত করা হয়

সু
দ
ক্ষ



ই
ঞ্জি
নী
য়া
র

এইচ, এম, ভি'র,

RADIO CORPORATION OF BENGAL
HOUSE OF RADIO ENGINEERS

১২৪-২-ডি, রসা রোড

(রাসবিহারী এভেনিউ ক্রসিং)

“আমার কোন আপত্তি নেই বাবা!” পরেশ কহিল, “কিন্তু কাকীমার?” বিনয় কুঠার সহিত কহিল, “হ্যাঁ, ওদের হয়তো আপত্তি আছে। কিন্তু বাবা! ওরা তো আমাদের পাড়গেয়ে হিন্দু সংসারের মেয়েমানুষ—লেখাপড়া শেখেনি, বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় করবার সুযোগ কোন দিন পায় নি। মায়ী পৃথিবী জুড়ে কি যে ভাঙা-গড়া চলছে, তার কোন খবর ওরা রাখে না। নিজের ঘেঁষেলেয়ে স্বামী নিয়ে সংসার, তার চেয়ে কিছু বড় নিজেরের ছোট সমাজ—এই সম্পূর্ণ বেড়ের মধ্যে ওরা জন্মায়, বড় হয়, সারা জীবন কাটিয়ে দিয়ে মরে। বেড়ার বাইরে কি আছে, কি ঘটেছে কোন দিন, জানতে পারে না, জানতে চায়ও না। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে, সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধিয়ে, নিজের নিজের সংসারটিকে নিরাপদে চালিয়ে নিয়ে যেতে পরাতেই ওদের সুখ ও শান্তি—”

পরেশ চুপ করিয়া এতক্ষণ বিনয়ের বক্তৃতা শ্রুতিভোক্তা—হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “অর্থাৎ কাকীমা সমাজের বিরুদ্ধে যেতে চাইবেন না।” বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল, “কিন্তু কার্তিক ভক্তারের স্ত্রী খুব সম্ভব মেয়েমানুষই।” বিনয় হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, “মেয়েমানুষ বই কি বাবা!” পরেশ কহিল, “আর পাড়গেয়ে আশীকৃত মেয়েমানুষ, কিন্তু তার তো কোন আপত্তি নেই।” বিনয় গম্ভীর হইয়া কহিল, “কি জান বাবা পরেশ! ওরা বড়লোক, গায়ের লোক সব ওদের হাত-ধরা; ওরা যা করতে চাইবে, তাতেই সমাজের সম্মতি হবে। কিন্তু আমাদের কথা আলাদা। পয়সা নেই, প্রতিপত্তি নেই, আমাদের সামান্য একটু বেচাল দেখলেই সারা সমাজে হৈ-ঠেরের অন্ত থাকবে না।” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “তা ছাড়া, তোমার সঙ্গে কার্তিক ভক্তারের মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছে—গায়ের লোকও এই বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। এ অবস্থায় বিবিক তুমি বিয়ে করলে, আমার আর এ গায়ে বাস করা চলবে না।”

পরেশ কহিল, “যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।” বিনয় মৃদু কণ্ঠে কহিল, “বল।” পরেশ লম্বিত মুখে কহিল, “বাবির যদি আমাকে বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, মানে যদি—” বিনয় হা—হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর উচ্ছ্বাসটা সামলাইয়া লইয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। পরেশ অপ্রতিত মুখে কহিল, “এত হাসছেন কেন?” বিনয়ের চোখে জন আসিয়াছিল, হাত দিয়া মুঁহিতে মুঁহিতে হাসি সামলাইয়া কহিল, “হাসি পাচ্ছে বাবা! হিন্দুধর্মের কুমারী মেয়ের ইচ্ছে? বিশেষ করে আমার মত গরিবের মেয়ের? একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই—ধর তোমার কাকীমা—দেখতে শুনতে মন্দ ছিলেন না, বাবার অসুখও নেহাৎ হানি ছিল না, ছোট-খাটো সহরেও জন্মেছিলেন, এবং সেখানে মনের মত ভাল ছেলের অভাব ছিল না। হয় তো, মনে মনে তাদের কাটকে পছন্দও করেছিলেন। অথচ পছন্দেন তো আমার মত হতভাগা গরিব মানুষের হাতে। কিন্তু তখনও তাঁকে কোন আপত্তি করতে শুনিনি, পরেও কোন দিন অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখিনি। কি জান, বাবা! স্বামীকে ভালবাসা, শ্রদ্ধা করা, হিন্দুধর্মের মেয়েদের আজন্মের সংস্কার, সে স্বামী যেই হোক, যেমনই হোক। না হ’লে—ওনেশে শুনি কথার-বার্তায় একটু মারামোহ ঘটলেই নাকি স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে দেয়; কিন্তু এদেশে স্ত্রীর আমাদের কত চরুটি, কত অপরাধ নীবে সখা করে বল দেখি?” পরেশ চুপ করিয়া রইল। বিনয় বলিতে লাগিল, “বাবির জন্যে তুমি ভেবনা বাবা! তুমি তাকে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছ, সেইজন্যে সে তোমাকে শ্রদ্ধা করে, বড়লোকের মত ভক্তি করে। কিন্তু তোমার স্ত্রী হ’লে—এ দুরাকাঙ্ক্ষা সে কোন দিন করে নি—এ আমি তোমাকে নিচয় ব’লে বলতে পারি।” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “তুমি কার্তিক ভক্তারের মেয়েকেই বিয়ে কর বাবা! এতে তোমার ভাল হবে। আমি আর তোমার কাকীমা এতে বিলম্বের দৃষ্টান্ত করব না।” পরেশ বিনয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া চিন্তিত মুখে বলিয়া রইল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিল, “আমার সম্পর্কে গায়ের লোক বিবিক নিয়ে যে নানা কথা—” কথা শেষ করিতে না করিতে বিনয় কহিল, “শুনেছি বাবা, কিন্তু ও তো মিথ্যে—গায়ের লোক ঈর্ষা করে যা-তা রটাচ্ছে।” পরেশ কহিল, “কিন্তু এর জন্যে যদি বাবির বিয়ে না হয়!” বিনয় চোখ দুইটা কুচকিয়া মাথার ঝাঁকানি দিয়া কহিল, “না, তার জন্যে চিন্তা নেই! কার্তিক ভক্তারের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেলেই গায়ের লোক চুপ করে থাকবে।” মৃদু ও স্থান হাসিয়া

কহিল, “তখন দেখবে, এখন বাবা বিবিক ইচ্ছা করে, তখনই হিন্দুধর্মের নিজের বেকার ও বখাটে আত্মীয়দের সঙ্গে বাবির বিয়ে দিতে চাইবে।”

(১০)

দিন করেক পরে; মেলা প্রায় দুইটা। বিন বৈঠকখানায় জানালার দাঁড়িয়া ছিল। খুকী মেঝেতে বসিয়া শূন্য কৌতুহল ও নিজের মনে বসিতোছিল। মাঝে মাঝে বাবির উপস্থিতি স্নানার্থকর প্রদর্শন করিতোছিল। বাবি কখনও দুই এক কথার প্রশ্নের জবাব দিতোছিল; কখনও বা টুপ করিয়া থাকিয়া জবাব এড়াইয়া বসিতোছিল। “খুকী একবার প্রশ্ন করো, ‘হ্যাঁ দিদি, খুকী তো আমার সেরে উঠেছে, এর পর জে-বিয়ে দেওয়ার উচিত, না?’ বাবি শব্দ জবাব দিল, ‘হ্যাঁ।’ কিছুক্ষণ পরে খুকী কহিল, ‘নান্দিদিদির (পাশের বাড়ির মেয়ে) বরের বড় বড় গৌর, সেইদিন জ্বাখিল, এমন দেখাখিল। হ্যাঁ দিদি, পরেশদাদার গোফ নেই কেন?’ বাবি নিরন্তর রইল। খুকী কহিল, ‘পরেশদাদা গোফ রাখতে চাইলে মানা করে দিও। গুঁফো লোকগুলোকে আমার ভারি ঘেন্না করে।’ বাবি হাসিবার চেষ্টা করিয়া উত্তর দিল, ‘পরেশদাদার গোফের সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক?’ খুকী দুই চোখ বড় করিয়া কহিল, ‘বা রে! সম্পর্ক নেই। আমাদের পরেশ দাদা!’ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খুকী আবার কহিল, হ্যাঁ দিদি, পরেশদাদা কদিন আসেন নি কেন?’ বাবি স্থান কণ্ঠে জবাব দিল, ‘জানি নে।’ আরও কিছুক্ষণ পরে খুকী সম্পূর্ণ নতুন ধরণের প্রশ্ন করিল, ‘দিদি! তুমি মেম সাহেব দেখেছ?’ বাবি জবাব দিল, ‘না।’

খুকী কহিল, “মেম সাহেবদের মোম বাতিল মত সাদা রঙ, রাতদিন জুতো পরে থাকে—খুব নয়ম পা কিনা।” বাবি জবাব দিল না।

কিছুক্ষণ পরে আর এক প্রকারের প্রশ্ন হইল, “ও পাড়ার কমলার পরেশ দাদার সঙ্গে বিয়ে হবে, দিদি, তুমি বিয়ে দেখতে বাবে না?” বাবি জবাব দিল না। খুকী কহিল, “কমলার জারী মজা নৈশু, খুবই তখন বাপের বাড়ি পালিয়ে যাবে।” বাবি কণী হাসিয়া কহিল, “পরেশ দাদা যেতে দেবেন কেন?” খুকী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, “কেন দেবেন না? লোক গায়ে বিয়ে দের কিসের জন্যে, শুনি? আমি যে পালিত্র খোকার সঙ্গে আমার খুকীর বে দেব, যখন ইচ্ছে আনব, দেখব ব’লেই তো।”

বাবি প্রতিবাদ না করিয়া জানালার ভিতর দিয়া পথের দিকে তাকাইয়া রইল।

আজ তিনদিন তাহার পরেশ দাদা আসেন নাই, এ রাত্তা দিয়া পর্যন্ত বাওয়া আসা করেন নাই। কমলাকে বিবাহ করিলে তাহারের বাড়ি আসা বন্ধ করুন, এ রাত্তা দিয়া হাটা পর্যন্ত ছাড়িয়া দিবেন নাকি? পরেশকে একদিন না দেখিলে, একদিন তাহার কথা না শুনিলে, বাবির মনের ভিতরটা কেমন করিতে থাকে। সারাক্ষণ মনে হয়, কি যেন একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ করা হয় নাই। রাতে বিছানায় পোয়া পর্যন্ত সারাক্ষণ একটা ব্যাকুল প্রত্যাশা তাহার অন্তরের অন্তরালে বসিয়া পরেশের পদধ্বনি, পরেশের কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য উদগ্ৰ হইয়া থাকে। বিছানায় পোয়ার পর ঘুম আসিতে চাহে না; সকলে একে একে শুইয়া পড়ে, সে জাগিয়া জাগিয়া পরেশের কথাই ভাবে—কবে সে কেমন করিয়া হাসিয়াছিল, কোন কথা কেমন করিয়া বলিয়াছিল, কেমন করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়াছিল, একে একে মনে পড়ে। এই সব স্মৃতির টুকরাগুলিকে সে ইচ্ছা করিয়া, বন্ধ করিয়া কোথাও সঞ্চিত করিয়া রাখে নাই; তাহার নিজেরাই তাহার অভ্যন্তরে তাহার মনের কোণে আশ্রয় লইয়াছিল; স্বপ্ন, স্বপ্নাংশকারে তাহার নিদ্রাহীন চক্ষের সম্মুখে একে একে রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাহার পার হইয়া যায়। একটা চাপা অভিমানে মনের ভিতর গুমরাইতে থাকে, যেন পরেশ তাহাকে কোন ন্যায় পাওনা হইতে বাঞ্ছিত করিয়াছে। এই সেনা-পাওনার সম্পর্ক যে কোন একটা বিশেষ ক্ষণে, কোন একটা বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া শব্দ হইয়াছে তাহা নহে, তবে এই সাত রাস ঈদরীয়া হিসের পর দিন আলোপ-আলোচন ছাড়া-পরিহাসের মধ্যে কেমন করিয়া তাহার হৃদয় বন্ধিয়া লইয়াছে, পরেশ তাহার একান্ত আপনায় জন। কোন দিন তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইবে, কোন দিন এমন অবস্থা হইবে তাহার সহিত দেখা হওয়া চলিবে না, কথা বলা চলিবে না, পক্ষা নিরাপত্তার মতদেও ইহা সে কেমনদিন ভাবে নাই।

শরৎসময়ে দিনে

দুর্গা পূজা! একটা দিনের মতো দিন! সমস্ত বছর আপনি
এই দিনটিরই প্রতীক্ষা করে থাকেন। এমনি আনন্দময় দিনে
আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আতিথেয়তার মধ্য দিয়ে
আপনার মধুরতর সম্পর্ক গড়ে উঠুক, আর আপনার বাড়িতে
হাস্যকলরবে মুখর নিত্যকার চায়ের মজলিশটি প্রচুর চায়ের
পরিবেশে প্রাণময় হয়ে উঠুক। এরূপ প্রত্যেক স্বরগীয়
দিনেই অভ্যাগতদের চা দিয়ে অভ্যর্থনা করুন।



ভারতীয় চা

উৎসবে



অতুলনীয়

অথচ তাহাই ঘটনা 'গেল'। সেদিন দুপুরবেলা পর্যন্ত তাহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, পরেশদাদা তাহার ছাড়া কাহারও হইবেন না। তিনি অবশ্য মুখে কিছু বলেন নাই, তবু তাহার কথবাহাণী, হাসি ও চাহনি, গভীর স্নেহ ও অকৃত্রিম উৎসাহ প্রকাশ তাহাকে ইহা বঝাইয়া দিয়াছিল। সে জানিত, তাহার বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, পরেশদাদা মত শিক্ষিত, উপার্জনক্ষম ছেলের নায়া দাম নিবারণ ক্ষমতা তাঁহার নাই; সে নিজেও শিক্ষায় দক্ষায়, রূপ ও গুণে পরেশের যোগা নাহে, তবু পরেশদাদা তাহার অন্তরের অকল-আকাঙ্ক্ষার জলে ধরা দিয়াছেন। এই আশ্বাসমণি যে করুণার বশে নয়, ইহার পশ্চাতে ভালবাসা আছে, তাহাও সে বুঝিয়াছিল। তাই সেদিন পরেশের সাহিত কমলার বিবাহের কথা শুনিয়া, ইহার অসম্ভাব্যতার কথা ভাবিয়া সে মনে মনে হাসিয়াছিল। এমন কি এই বিবাহের কথা লইয়া সে সেদিন দুপুরবেলা পরেশকে সহজেই ঠাট্টা করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ব্যাঘাতরাল হইতে যখন শনিত পাইল—পরেশদাদার আসা-যাওয়ার জন্য তাহার নামে গুরুদাস রটিয়াছে এবং সেইজন্যই মা তাকে বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিয়া অপমান করিলেন এবং তারপর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত বিনাইয়া বিনাইয়া তাহারই জন্য পাত্র সংগ্রহের জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন, তখন বাথায়, লজ্জায়, ঘৃণায় ও অশ্রুচোচনায় সে পুনঃ পুনঃ নিজের মন্তব্য কামনা করিয়াছিল। 'ছিঃ ছিঃ, তাহাই জন পরেশদাদার এই অপমান? কি অপরাধ এঁহার? অপরাধ তিন তাহাকে চিকিৎসা করিয়া, সেবা করিয়া মরণের হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন; অপরাধ—পরম আর্থীকিক স্নেহ করিয়াছেন এবং হঠাৎ তাহার মত একটা তুচ্ছ মেয়েকে ভালবাসিয়াছেন। কি অকৃতজ্ঞতা! রোগের সময় সারারাত্ৰি বিছানার পাশে বসিয়া সেবা করতেন, এখন হঠাৎ তাহার হাতে সম্পূর্ণরূপে মেয়েকে ছাড়িয়া দিয়া নির্দোষে ঘূমাইতে! আজ বিপদ কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া গ্রামের লোকের কথা শুনিয়া তাহাকে অপমান করিলেন! পরেশদাদা কি ভাবিতেন? হয়তো ভাবিতেন—বলিকায় কত সুন্দরী শিক্ষিত মেয়ের মায়া-পাশ কাটাইয়া পাড়াগায়ের একটা অশিক্ষিত, অমার্জিত, সামান্য মেয়ের কাছে ধরা দেওয়ার উপায় শাস্ত হইয়াছে। হয়তো মনে মনে নিজেকে নিজের নিম্নোপতার জন্য শিকার দিতেছেন এবং রাগ ও অভিমানের আগুন জ্বালাইয়া এঁহার জন্য হৃদয়ে যতটুকু স্নেহ ও ভালবাসা ছিল, সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতেছেন। সেইদিন সেই নিম্নারণ ক্ষণে তাহার মাত আসি দিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া ঘনীভূত বিশ্বাস দুর্বলস্বরের মেঘের মত নির্মল হইয়া উঠিয়া গেল।

সেইদিন সারা বিকাল ও রাত্রি তাহার যে ক্ষেমন করিয়া কাটিল, তাহা সে জানে, আর তাহার অন্তরায় ছিল না। তাহার পরদিনও তেমনই কাটিল। তার পরের দিন সে ঠিক করিল, পরেশদাদা যখন এই রাস্তা দিয়া পার হইয়া যাইবেন, তখন বাকীকে দিয়া ডাক দেওয়াইবে। পরেশদাদা অভ্যাসমত খাম্বানে নিশ্চয়, না আসন-দাঁড়িয়া খুকীর সাহিত হাসা-পরিহাস করবেন, সে আড়ালে দাঁড়িয়া তাহাকে একবার দেখিয়া লইবে। সম্মুখে সে কিছুতেই যাইবে না। তাহাকে দেখিয়া পরেশদাদা যদি বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরাইয়া লন, তাহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। সেদিন বেলা তিনটা পর্যন্ত জনালয় দাঁড়িয়া থাকিয়াও সে পরেশের দেখা পাইল না। যে পুকুরে তাহার বিকালে গা ধোয়, কাপড় কাচে, পরেশদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়া একটুখানি ঘুর-পথ হইলেও যাওয়া যায়। সে বাকীকে সঙ্গে লইয়া এই পথ দিয়া পুকুরে গেল, আশা—যদি একবার দেখা হইয়া যায়। ভিসপেন্সারীর সামনে গিয়া দাঁড়িল, দরজা বন্ধ; ফিরবার সময়ও তাই। সেইদিন রাতে শূঁইবার পর যখন সকলে একে একে ঘুমাইয়া পড়িল, সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। পাশে বাকী ঘুমাইতেছিল, তাহার গায়ে একবার হাত বুলাইয়া দিল। খুকীর উপর তাহার হিংসা হইতেছিল; পরেশদাদাকে সেও তো ভালবাসে, অথচ পরেশদাদাকে না দেখিয়া বেশ আছে, সারাক্ষণ একবারও নাম করে না, ঘুমেরও একটু বিষয় হয় নাই তাহার। বিনয়ও সারাদিন পরেশদাদার একবার নামও করেন নাই। কেবল সেই একা অশ্রুর হইয়া উঠিয়াছে। কাহাকেও না দেখিলে যে বৃকের ভিতরটা এমন পাকা ফেঁড়ার মত সারাক্ষণ টন টন করিতে থাকে, তাহা সে ইহার পূর্বে কোনদিন জানিত না। বিনয়ও কতবার কচোঁপলকে বিশেষে গিয়াছে, মা-ও একবার তাহাকে বাবার কাছে রাখিয়া এক মাস বাপের বাড়িতে ছিলেন, মন কেমন করিয়াছিল বটে, কিন্তু এমন করিয়া দিন-রাত সে ছটফট করিত না। এ তাহার কি

হইয়াছে? এমন করিলে সে বাঁচিলে কি করিয়া? দুইদিন পরে কমলার সাহিত হয়তো পরেশের বিবাহ হইবে, তখন তাহার কাহারও সহিত সম্পর্ক রাখা না-রাখা, কথা কওয়া না-কওয়া, কোথাও আসা না-আসা—সব কমলার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিবে। আর সে নিজেও তো একদিন চিরজীবনের মত এ গ্রাম ছাড়িয়া, অন্য কোথায় চলিয়া যাইবে। তখনও তাঁর বেদনাবোধের সঙ্গে সে বাকীকে 'পরিণয়, শাশু-মাতাই যেন, সত্য প্রিয়জনকে অভিক্রম করিয়া পরেশ কখন কোন করিলে, জ্বাহার প্রিয়তমের স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাদিকে ছাড়িলে সে বাথা পাইবে বটে, কিন্তু জীবন দুঃখ হইয়া উঠিবে না। কিন্তু পরেশকে ছিরায়া তাহার মন তাহার জগতে এমনইভাবে পাকে-পাকে নিজেই জড়িয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে ছাড়িনো যাইবে না, ছাড়িলেও সে বাঁচিবে না। নিজের এই নিদারণ অবস্থা ভাবিয়া সে ভয়ে শূঁকিয়া উঠিল। ভাবিল, যেন মনের এই নির্বিচার নিবোধ দুঃখাকাংক্ষা? বাথা পাইবার আর আশা নাই, তাহার জন্য কেন এই সোজা? ইহার পর সারাজীবন কাষা ছাড়া আর কোন উপায় থাকিবে না। এই অবোধ, অশ্রুত মন লইয়া কেমন করিয়া সে যে আর একজনের শ্রী হইবে, তাহাকে ভালবাসিবে, ভক্তি করিবে, তাহার সংসার করিবে, ভাবিয়া সে দিশাহারা হইয়া গেল। শেষ রাতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ইঠাৎ ঘুম ভাঙিল মায়ের ডাকে—“বাঁবা! ওলো বাঁবা!” সে সাড়া দিল, “কি, মা?” “কাদিছস কেন?”

সে চোখে হাত দিয়া দেখিল—জল, জল মাছিয়া উত্তর দিল, “কই, না!” মা কহিলেন, “না আমার কি? কাদিছিল দুপুরে ঘুপিয়ে—স্বপ্ন দেখাছিল বুঝি?” সে জবাব দিল, “কি জানি মা, মনে পড়ছে না!” মা কহিলেন, “ওখানে শতে হবেন না, আমার কাছে আয়।” সে মায়ের কোলের কাছে শইল। মেয়ের গায়ে হাত দিয়া মা কহিলেন, “ঘুমো দেখি।” তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। সে তাহার স্বপ্নের কথা ভাবিতে লাগিল।

সে যেন পরেশের সঙ্গে এক গভীর জগলের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। অপ্রশস্ত সূড়ি-পথ—পথের দুই পাশে কাটা গাছের ভিড়। দুই হাতে গাছের ডাল ঠেলিয়া ঠেলিয়া পথ চলিতে হইতেছে; গায়ে ও পায়ে কাটা বিধিতছে, পা দুইটা—জ্ঞানিততে পাখরের মত ভারী হইয়া উঠিয়াছে, তবু পথ চলার শেষ নাই। ইঠাৎ বল শেষ হইয়া তাহারা এক কিছুত প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। দূরে দেখিতে পাইল—একটা প্রকাণ্ড বাড়ি, তাহার মামর বর্মড সে শহর, সেখানে সে যেমন একটি ব্যারেক্সাপের বাড়ি দেখিয়াছিল, ঠিক তেমনই দেখিতে। পরেশ তাহাকে হাতে ধরিয়া সেখানে লইয়া গেল। দরজা খোলা, প্রহরী নাই। ভিতরে ঢুকিতেই দেখিল, একটা নাটমন্দির—মোটো মোটো বড় বড় থাম। চাতালে কমলা বসিয়া আছে আর তাহার পাশে বসিয়া শ্রীমতী বাননী চরকা কাটিতেছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই কমলা চোখ-মুখ কঠিন করিয়া শ্রীমতীকে কি বলিতেই, শ্রীমতী তাহাকে মারবার জন্য নাটাইটা তাহার দিকে ছুঁড়িল। কপলে আঘাত পাইয়া সে 'উঃ' করিয়া বসিয়া পড়িল। চোখ মেলিতেই দেখিল, পরেশ কমলাকে কোলে লইয়া বসিয়া আছে। সে পরেশকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু পরেশ তাহার কথা কাণে না তুলিয়া কমলার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল। রাগে-অভিমানে সে কাদিয়া উঠিতেই শ্রীমতী আসিয়া তাহাকে বাঁহরে লইয়া যাইবার জন্য হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সে হাত ছাড়িয়া লইয়া মাটিতে লটাইয়া পড়িয়া কান্নিতে লাগিল।

পরদিন সকাল হইতেই বাঁবর মন পরেশের জন্য উদ্বেগ হইয়া উঠিল। পরেশ আর আসিবে না, দেখা দিবে না, এ জন্মের মত তাহার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক কাটিয়া গিয়াছে—মনে মনে বাকীকে চুৎক-শলাকার মত তাহার মন পরেশের দিকে একাগ্র হইয়া রহিল। দুপুরবেলার খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া সুখা তাহাকে কহিল, “কাল সারারাত্ৰি তো ঘুমোই নি, চল, আমার সঙ্গে শুব চল।” ববি সানন্দে কহিল, “না মা, ঘুমের বেলায় আমার ঘুম আসবে না, আমি বরং সংসারের পরেই ঘুমোতে যাব।” সুখা সংসারের স্বরে কহিল, “ঘুম আসবে না কেন? চোখ বন্ধে পড়ে থাকলেই ঘুম আসবে, চল।” ববির মুখের দিকে তাকিয়া দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল, “রাত জেগে মুখের কি রকম ছিরি হয়তো, আরনাতে দেখেই দেখি।” অশ্রু মনে কহিল, “সারারাত্ৰি না ঘুমোই হা-তা স্বপ্ন দেখা মেয়েমানুষের ভাল নয়।” হাসিবার চেষ্টা করিয়া ববি কহিল, মা বেশ! না ঘুমোলে আবার স্বপ্ন দেখা যায়?” সুখা ধাক্কের সঙ্গে

সকল, সেনার এবং নিরাপত্তার

বেঙ্গল ইউনিয়ন

ব্যাক লিঃ

স্থাপিত-১৯২৬

রেজিস্টার্ড অফিস : চাঁদপুর

সেন্ট্রাল অফিস : ২৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা

কলিকাতা অফিস : ৫৮নং ক্রাইড স্ট্রীট

অন্যান্য শাখা অফিস :-

পূর্বদুর্গা, প্রিন্সগঞ্জ, লোহাজঙ্গ,

দীঘিরপার, তেজপুত্র ও

সদরঘাট (ঢাকা)

হাটখোলা (২৭৮, আপার চিৎপুর
রোড, কলিকাতা) ও পূর্ণিমা
শাখা খোলা হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :- এম, চক্রবর্তী।

ডাঃ এ, কে, চৌধুরীর
বিশ্রাম

“ক্রিমি-নাশিনী”

সর্বপ্রকার ক্রিমিরোগের একমাত্র মহোষধ।

পৃথক জোলাপ লাগে না।

ইহা প্যাকেটে পাওয়া যায়।

ম্যানুফ্যাকচারার :-

মেসার্স এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স

৪৭, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্বত্র পাওয়া যায়।



কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ : কলিকাতা।



ফটো শিল্পী—জীজনিলা ঘোষ

কহিল, “ওকে আমার ঘুম বলে নাকি? যদি যা-তা দেখতে লাগলাম, কাদলাম-কাটলাম, তা হ’লে ঘুমোবার দরকার ক? আমার কেমন ঘুম বল’ দেখি—এক ঘুমে রাত কাবার। কাল থেকে লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে ‘সোনারে কাজ-কর্ম’ করবি, তা হ’লে কেমন ঘুম হবে দেখবি।”

সুখদা তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া নিজের পাশে শোয়াইল। ববি চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া, মা ঘুমাইয়া পড়িতেই উঠিয়া বৈঠকখানার আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বহিল। অদূরে বসিয়া বুকী পড়েতুল খেলিতে খেলিতে অগোল-তবোল বকিতে লাগিল, কত কি প্রশ্ন করিতে লাগিল; ববি অনমনস্কভাবে কখনও দুই-এক কথায় জবাব দিল, কখনও বা দিল না। আজ কয়দিন ধরিয়া যাহা সে পুনঃ পুনঃ ভাবিয়াছে, এখনও তাহাই সে ভাবিতে লাগিল এবং পথের দিকে দুই চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া থাকিয়া সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিল—পরেশদাদা! যেন আজ একবার এই পথ দিয়া যান।

হঠাৎ কে বলিয়া উঠিল, “কি লো ববি? ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার খেয়ান করছিস লো?” ববি চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, শ্রীমতী বাননী তাহার দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে; হাতে একটা প্রফান্ড থালায় মেঠাই। তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার সাগরেদ—গুণী বাননী—বাল-বিধবা, বয়স বিশের ওপারে; তাহার গালে পান; পানের রসে রাঙা টুকটুকে ঠোট দুইটি চাপিয়া, কুঁচকিয়া পিচ ফেলিয়া কহিল, “বরের জন্য হোখ হয়।” শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, “তা এত ভাবনা কিসের লো! ফল যখন ফটেবে, তখন বর আপনি এসে হাজির হবে। তা তোর মা কোথায় বল’ দেখি?” বলিতে বলিতে শ্রীমতী স-শিষ্যা বৈঠকখানার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। ববি খতমত খাইয়া লঙ্কারক্ত মুখে কহিল, “মেঠাই কিসের দিদিমা?” শ্রীমতী মুখ-চোখ ঘুরাইয়া কহিল, “তোরা জানিস্ না নাকি? আমাদের কমলার যে তোদের পরেশের মণে বিয়ে হবে?” কাল হেলের আশীর্বাদ হয়ে গেছে, আজ মেয়ের আশীর্বাদ হল। তাই গরের লোককে মিষ্টি বিলুদো হচ্ছে। তা তোর মা কি করছে?” ববির বকের ভিতরে দাপাদাপি শব্দ হইয়াছিল, তবু মুখে হাসি টানিয়া বসামস্ত

স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল, “না ঘুমোচ্ছে, আসুন।” ববির পাছ, পাছ ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে শ্রীমতী কহিতে লাগিল, “আসছে মাঘের প্রথমেই বিয়ে; কত ধুম-ধাম হবে, দেখবি। ডাক্তার বলেছে, তিনদিন হাঁড়ি চড়তে দেবে না গায়ে।” ববিকে শোবার ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া কহিল, “তোরা মাকে আর উঠিয়ে কাজ নেই; এমনই দেরি হয়ে গেছে; এখনও সারা গা ঘুরতে হবে আমাদিকে। একটা বাটি-টাটি নিয়ে আয় দেখি।” বাটি আনিতেই গুণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, “হ্যাঁ লা, তোর মুখ অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন বল’ দেখি? অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছে নাকি?” শ্রীমতী বাটিতে মিষ্টি দিতে দিতে গুণীর দিকে তাকাইয়া চোখ মটকাইল। ববি মৃদু ও শূন্যকণ্ঠে জবাব দিল, “মাথা ধরেছে সকাল থেকে।” গুণী কৃত্রিম উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, “মাথা ধরেছে? আহা! তোর পরেশদাকে ডেকে ওষুধ খাস নি?” শ্রীমতী কহিল, “মাথা ধরার আবার ওষুধ খেতে হয় নাকি? কাউকে দিয়ে হাত বুলো গে যা।” গুণী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ঘাড় বাকাইয়া কহিল, “মাথায় হাত বুলোবার লোক কোথায় পাবে? যে ছিল—” বলিতে বলিতে শ্রীমতীর সতক’তা-সূচক স্ফুটন দেখিয়া থামিয়া গেল। শ্রীমতী সাধুনার সুরে কহিল, “মাথায় হাত বুলোবার লোক হবে লো! এত রূপ কি স্বখায় বাবে ভাবিহিস।” আত্মীয়তার সুরে কহিল, “তবে ভাই, আমরা আসি। সারা গা ঘুরতে হবে এখনও। তোর মাকে বলবি—আর একদিন এসে সব পরিচর দিয়ে যাব এখন।”—বলিয়া চালিয়া গেল। চোখের আড়াল হইতেই গুণীর কল-হাস্য ও শ্রীমতীর কৃত্রিম তর্জন-গর্জন কাণে আসিল। ববি বিহবল, বৈদন্যত’ চক্ষু মেলিয়া প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়াইয়া বহিল।

পরক্ষণেই ক্ষতমুখে আয়োজনের মত লজ্জা ও অপমান তাহার সারা মনে বেন আগুন ধর ইয়া দিল। ‘ইহারা মনে করিতেছে কি? পরেশ-দাদাকে সে ফাদ পাতিয়া ধরবার চেষ্টা করিয়াছিল; কোনমতে ফাঁকাটিয়া পরেশদাদা উড়িয়া পলাইয়া কমলার কোঠরে ঢুকিয়াছেন? কিন্তু সত্য কি তাই? তাহাকে ধরবার চেষ্টা সে কোনদিন করে নাই। পরেশদাদা নিজে হইতে ধরা দিয়াছিলেন এবং মা অপমান করিয়া বিদায়

[illegible]

বিষয়টিতেই এই ইতিহাসে উল্লিখিত সূচনা শরনকঙ্কের বাহিরে আসিয়া
জানবার, নিকি বারানসীর মূল কবিতা বলিয়া কি ভাবিতেছে। তাহার দিকে
দৃষ্টিপথ তত্কাইয়া দেখায়ে শেলমাঝড়িত কণ্ঠে কহিল, “আমোস নিঃ” বধি
কথাবাঁছিল না। কণ্ঠের চড়াইয়া সুখসা কহিল, “এই : শুনতে পাচ্ছিস
না?” কনিষ্ঠ কাকাইরা ঊঁটীয়া মায়ের ঘরের দিকে তাকাইয়া কহিল, “কি
স্বপ্ন

“अहं निः”

ਬੀਬੀ ਥਾਪ ਨਾਭਿਯਾ ਆਨਾਇਨ, "ਨਾ।"

“ସନ୍ତୋଷିନୀ ନା କେନ ?”

“কিন্তু এল না কিছুতেই।”

সুখচক্ৰাইয়া, চোখ দুইটা ছোট করিয়া সুখদা কহিল, “তোরা কি
হমেছে বল দেখি?” ববি জবাব দিল, “কই? কিছু না তো।” সুখদা
ভীক্ষকণ্ঠে কহিল, “কিছু না? আমি তোরা মা, আমাকে তুই ঠকাবিস
তোদের মন্থ দেখলে আমি তোদের মনের কথা টের পাই।” ধমকের
কহিল, “বলি বলি ঠিক করে।” ববি হঠাৎ কায়িয়া ফেলিয়া কহিল,
“কিছু হয় নি বলছি, তবু নিজেমিছি ধমক—আমাকে একটুও দেখতে
পায় না তুমি” সুখদা ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, “কি বললাম তোকে?”
ববি জবাব না দিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া ফৌপাইতে লাগিল। সুখদা
কিছুক্ষণ বিশ্রিত চক্ষু মেয়ের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া
কহিল, “কি জানি, বাছা। তোরা কি হয়েছে? এত কদিনব্যয় মত কিছু
বলি নি আমি।” বলিয়া কার্যান্তরে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ববি চুপ করিয়াছে বটে। কিন্তু মুখ এখনও প্রথম করিতেছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কী মিষ্টি দিয়েছে বল দেখি?" ববি অশ্রু-গাত্য কণ্ঠে কহিল, "শ্রীমতী 'দিন্নিয়া'।" সুখদা বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "শ্রীমতী মিষ্টি দিয়ে গেল কেন?" ববি স্বাভাবিক উপাস্যনীর সহিত কহিল, "কার্তিক ডাক্তারের মেয়ে।" কলমার আঙা আশীর্বাদ হইয়াছে, তাই।" সুখদা মুখে শব্দ কহিল, "তাই নাকি?" কিছু মেরের মানসিক দুর্যোগের আসল কারণ তাহার বুদ্ধিতে বাকি রাখিল না এবং বুঝিয়া তাহার চিন্তারও সীমা রাখিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তোমার বাবার আসবার সময় হ'ল; খাবার করা হয় নি, চল দুজনে মিলে করে ফেলিগে।" ববি তাহার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় এমন মায়ের কাছে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাড়াহাড় উঠিয়া ডাড়াইয়া কহিল, "চল মা।"

(58)

বিনয় বাড়ি ফিরতেই সন্দেহ কহিল, “আমি তোমার বাবার মন্থ-হাত ধোবার সব ব্যবস্থা করে দিগে, তুই এই ক’খানা রুটি সে’কে নে।” বলিয়া রাসায়নক হইতে চলিয়া আসিল।

শোবার ঘরে ঢুকিয়া সুখদা দেখিল, বিনয় শুল্কের কাপড়-জামা ছাড়িয়া ঘরে পরিবার কাপড় ও ফতুয়া পরায়ছে। জাড়া কাপড়খরা খলয়া লুটুটাইতেছে, জামাটি আলনার কোণে আটকাইয়া গিয়া বন্ধিহস্তেছে; টানা-টানিতে আলনার ফলনায় আনান্য কাপড়-চোপড়গুলির অবস্থা অতন্ত বিপর্যস্ত। সুখদা ঘরে ঢুকিয়া কাপড়খানা তুলিয়া কোচাইতে কোচাইতে অসুযোগের স্বর কহিল, “এমন করে ধুলের লোটাটা কাপড় আর কদিন জনস্নান থাকে কেন? মাসে মাসে হোমার জনেই শোপাকে এত পর্যা দিতে হচ্ছে।” বিনয় বেগবোয়াভাবে কহিল, “তাই নাকি?” সুখদা অংকার তুলিয়া কহিল, “তা নয় তে কি? আমার আর কখনো কাপড় খোপার বাড়ি যায়?” হোপার আলনার দিকে চািয়া ধমকের সরে কহিল, “অমন লম্বা শুভ শুভ করে দিলে কেন? এই এমন করে গুচ্ছিয়ে দিয়েছে গোলাম।” বিনয় ভরে ভরে কহিল, “ফতুয়া বড়জিলামা যে!” স্বাকার তুলিয়া সুখদা কহিল, “ফতুয়া কি ওখানে থাকে যে বড়জিলামে?” বিনয় কটমুঠ মুখে কহিল, “জল না তো—”

"থাকে না, তা তো জন।"

যাথা চুলকাইয়া বিনয় ক'হিল, "ভুলে গিয়েছিলাম।" বিনয়ের কণ্ঠস্বর নকল করিয়া সুন্দরা ক'হিল, "ভুলে গিয়েছিলাম!" বলিয়া বিশৃঙ্খল কাপড়-চোপড়গুলি গুছাইতে শুরু করিল।

নিজের পরিচয়সের প্রদী বার-বকেক শূন্যপাঠ করিয়া বিনয় ক
“কাপড়টা ছান্নী ময়লা হয়ে গেছে, আর পরিষ্কার কাপড় নেই।” স
কটাকে চাহিয়া কহিল, “কোথার কোন? রাত্রে-দরবারে যাবে, শূ
বিনয় কহিল, “হাব না তো কোথাও, তবে ছেড়াশাক্তার দশারের শ
বেড়াতে আসিবেন বলেছেন তোমার সঙ্গে আলাপ কর্তে।” সুখদা
চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, “তাই নাকি। সেই মাস্তুরাণী—বি-এ পা
বিনয় বাড় নাড়িয়া ‘হা’ জমাইল। সুখদা কহিল, “তা আমাদের স
আলাপ করত আসা কেন? মুখের মেয়েমানুষ ‘শা’ বিনয় ক
“কি জানি? ঢোকে গিলিয়া কহিল, “বোধ হয় শিগগির চলে যা
যাবার আগে সমস্তের সঙ্গে দেখা করে যাবেন।” কুছ, কুচকাইয়া সা
কহিল, “তা তোমার সাজগোজ করতে হবে কেন? তোমার গলায়
আর মালা দিতে আসছে না। বিনয় কহিল, “তাই বলছি নাকি? স
শিক্ষিত মেয়ে, তাদের সামনে এমন ময়লা কাপড় পরে—” বাধা
সুখদা ধমকের সুরে কহিল, “তোমার কাপড় আবার ময়লা কিসের?
আমারাই ময়লা। বদলাতে হ’লে আমাকেই হবে। কখন আ
বলেছে?”

“সম্ভার পরে।”

“তবে আর দৌঁর ক'রো না—মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে না
 ছেলে-মেয়েগলোকও একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে—বিছা
 টিছানাগলোকও একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে রাখতে হবে।” বিনয় কহিল, “যু
 জ্ঞাপন করতে পারবে তো?”

সুখদা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, “পারব না কেন”

“মানে—শিক্ষিত মেয়ে—বি-এ পাস।”

“হ'লই বা—মেয়েমানুষ তো? সে তোমাকে মাথা ঘামাতে হ'ল না—আমি দেখে নেব। তুমি মদ্য-হাত ধরিয়ে নাও দেখি—আমি খাব অনিচ্ছ।”

রাসাঘরে আসিয়া সুখদা দেখিল, ববি বিনয়ের খাবার সাজাইতে। সুখদা জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁ টিপ্পনসে সের্কেইস?” ববি বাড় বাড় “হ্যাঁ” জানাইল। সুখদা কহিল, “হেডমাষ্টারের বাড়ি থেকে বেড়াতে আস এখনই—আমি হোর দাবাকে খাইয়ে সব একটু গুচ্ছিয়ে গ্যাচ্ছিয়ে রাখা। তুই ভাতটা চড়িয়ে দা।”

বিনয় খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিল, “মিটি কোথায় পেল
সুখমা? পণ্ডীতমহাশয় কহিল, “ভাস্করদের বাড়ি থেকে বিলিয়ে গেছে
বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “ওহ! কখনো আমার খাইতে লাগিল। সুখ
কহিল, “পরেশ্বরা আশীর্বাদ করে এল—সেই মাকে একটা যত্ন দিলে না
বিনয় ঘাড় নাড়িল।

“এ পক্ষের হ্রস্ব আশীর্বাদ করলে কে : পরেশের মানসী :”

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না, ঘনশ্যাম।” সুখদা, সবিধা কহিল, “বল কি? এত শব্দে তা করেছ এতদিন!” বিনয় কহিল, “এত ভাব হয়ে গেছে। ঘনশ্যাম এখন কণ্ঠস্বরের পিসে আর বরখবরের মেসে। সুখদা ভাব, কুতকাইয়া কহিল, “পারেশও একটা কথা বলে নি তোমাকে।” বিনয় হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। সুখদা ক্ষোভের সজিত কহিল, “এর ধোকা এ পর হয়ে গেলাম আমরা যে, এত বড় একটা সামাজিক ব্যাপারে একে নোবেল পরিত্যক্ত করলে না?” বিনয় কহিল, “পারেশ ছেলেমানুষ। তেঁা মা করবার ঘনশ্যাম করেছে।” সুখদা কহিল, “তা নয়। পারেশ আমের ওপরে রাগ করেছে।” বিনয় মাথা নাড়িয়া কহিল, “পাগল নাকি! আবার করতে পারে? বিশ্বাসমান ছেলে! সোনিম দৃশ্যবোলা ওক শেনবার পরও রাগে নিজে থেকেই ববির সঙ্গে নিজের বিয়ের কথা পেড়েছিল।” গভীর বিস্ময়ের সজিত সুখদা কহিল, “তাই নাকি! ক. অমাকে তো কিছু বল নি!” বিনয় জবাব দিল না। পরম ঔৎসর্গিক সহিত সুখদা কহিল, “হুঁ! কি জবাব দিলে?” বিনয় কহিল, “আ নিষেধ করলাম। বললাম—ও সব কাজ নেই, তাতে আমাদের কারও ভাব হবে না। তা ছাড়া এ বিষয়ে হলে আমরা সুখী হব জানিয়ে দিলাম। ধারালো স্বরে সুখদা কহিল, “তুমি অত কথা বলতে গেলে কেন?” এবং বিনয়ের বিশ্মিত হওয়ার পালা। সে দৃষ্টে চোখ বড় করিয়া কহিল, “তা মানে? তুমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলে ওর সঙ্গে যোগ্য মেয়েকে বিয়ে দাবো না।”

সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না; তারপর আমরা কি বলা উচিত ছিল।" বলিয়া সুখদার মুখে দিক তাকাইল। সুখদা বিক্ষম গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ ভাবিয়া অদূরে ক্রীড়রতা শ্বকীকে কহিল, "ভোর শিখি কাছে যা।" শ্বকী চলিয়া গেলে ফিসফিস করিয়া কহিল, "কাল ধোঁ

স্বামী বললেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ, তবুও কিছুটা।” একটুখানি চুপ করিয়া বসিয়া কহিল, “অন্ততঃ বড়টা বাড়াবার চেষ্টা করছে, ততটা নয়। সান্নাধ্যায়ে একটুখানি খেতে চলেবেলে জল একটু-আমটু পড়েই থাকে—আর তার জন্যেই পানি পানি জলের ভরসা করবার দরকার হয় না।” চোখ দুইটা বজিয়া, মাথাটা উপরে-নীচে নাড়িয়া কহিল, “শব্দেই যেমন বোধ—বাবা! খই পেতে দেব কি হবে।”

(১৬)

শ্রীমতীর বাড়ির কাছাকাছি বিনয় পরেশের দেখা পাইল। দূরে হইতেই ঠাহর করিয়া হাসিল, “পরেণ নাকি হে?” পরেশ থলকিয়া লাইয়া শিশুর মতো চাহিয়া কহিল, “কে? কাকাবাবু!” বিনয় কাছে আসিয়া কহিল, “তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি বাবা! ভারী বিপদ!” পরেশ উৎকণ্ঠিতভাবে কহিল, “কি হয়েছে?” বিনয় কহিল, “বাবির পা পড়ে গেছে।” পরেশ ভীতকণ্ঠে কহিল, “সে কি! কি করে পড়ে গেল? কতটা পড়েছে? চলুন।” বিনয় চলিতে চলিতে কহিল, “ভাতের ফ্যান গালতে গালতে হাত ফসকে হাঁড়টা পড়ে যায়—পায়ের পাটা দুটো খুঁবে পড়েছে। তোমার কাকিমাকে নারকেল তেল আর চূনের জল মিশিয়ে লাগাতে বলে এসো। কোথায় ছিলে এক্ষণে?” পরেশ ক্রটিম ভাঙিলেবোর সহিত কহিল, “শ্রীমতী দিদিমার বাড়িতে, জল খাবার নেমতস করছিলাম।” বিরক্তির ভান করিয়া কহিল, “এ এক বেশ মশাকল হয়েছে! রোজ দুবেলা নেমতস।”

শ্রীমতী কিন্তু পরেশকে নিজে হইতে নিমন্ত্রণ করে নাই। পরেশটী বাড়িয়া নিমন্ত্রণ লইয়াছিল। কাল বিকালে শ্রীমতী যখন পরেশদের বাড়িতে গিয়াছিল— পরেশ তাহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিল, “ভাল করে দিনে একদিনও দেখা হয় নি দিদিমা! একদিন কিন্তু দেখিয়ে দিতে হবে।” শ্রীমতী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, “শুধু তোমারই এই দশা, তা নয়—আমাদের রাগা তো বলছিল—দেখে সাম মেটে নি দিদিমা! বেশ তো! আজই ওবেলা আমার ওখানে যেও—মুখোমুখি বসে হাত পার প্রাণভরে দেখা দুজন-দুজনকে।”

দেখা আর হইয়াছিল। দুইজনকে বসাইয়া শ্রীমতী বলিয়াছিল, “তোমরা দুজনে বসে বসে গল্প কর ভাই। আমি এক কলসী জল নিয়ে নিয়ে আসি চট করে।” তারপর মূর্চক হাসিয়া চোখের সতকভা-দুচক ভঙ্গী করিয়া কহিয়াছিল, “কিন্তু বিশ্বাস করে দিয়ে যাচ্ছি ভাই। এখনও মনঃপড়া হয় নি—মনে থাকে যেন। আমি বাইরে শেকল-ভাঙ্গা দিয়ে চললাম—কেউ ডাকলে সাড়া দিয়ে বসো না যেন।”—বলিয়া কলস ইয়া বাইরে হইয়া গিয়াছিল। তাহার পাশেই কমলা নতমুখে বসিয়া ছিল—মুখে লজ্জা, হৃৎ, বোধ হল, ভয়ও। তাহার নথের দিকে পরেশ কদমুটে তাকাইয়া ছিল; বকের ভিতর তাহার কাঁপতেছিল—সারা রহের উপর দিয়া একটি কামানর তরণা গড়াইয়া বেড়াইতেছিল। এক সারের মাতঃ বাবামান—তারপর পুটিকসকল সমস্ত পড়িলেই এই দেহের উপর গহার একজের অধিকার। এখন পাশাপাশি বসিয়াও ‘স্পর্শ’ করিবার জো নাই, তখন উহার মাই হইয়াছে মেয়েকে নিজহস্তে সজ্জিত করিয়া নিজে গেল করিয়া তাহার শয়নকক্ষের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া যাইবে। পরেশ ছিল, “তোমার নাম কি?” মেয়েটি মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, “আপনি যেন না নাকি?” পরেশ কহিল, “জানি, তবু তোমার মধ্যে শব্দেতে ছেঁ করছে।” মেয়েটি কহিল, “কমলা!” পরেশ জিজ্ঞাসা কহিল, “আমাকে পছন্দ হয় তোমার?” মেয়েটি মৃদু হাসিয়া মুখ নামাইয়া ডি়র মণ্ডলপ্রান্তে মাঙলে জড়াইতে লাগিল। পরেশ কহিল, “বল না?” মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল। পরেশ কহিল, “বেশ! ঘাড় নেড়ে জানাও।” মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—“হয়—হয়।” পরেশ প্রশ্ন করিল, “আমাকে খুঁজে চলেছিলে তুমি? দিদিমা বলছিল।” মেয়েটি জবাব দিল না। পরেশ কহিল, “জবাব দাও না! লজ্জা কিসের? দুদিন পরে তো কথার ই ফুটবে তোমার?” মেয়েটি মুখ লাল করিয়া কহিল, “আপনিও তো জেঁইছিলেন।” পরেশ কহিল, “তুমি চাও নি?” মেয়েটি নীরব। পরেশ গেল, “আমি সংগ্রহ, গ্রিসম্যা গারল্ডী জপ করি—আমার কাছে কোন ধো লুকোলে পাপ হবে তোমার—আর পাপ হলে তোমার বরের অমঙ্গল হবে।” মেয়েটি আড়চোখে চাহিয়া, চোখ ফিরাইয়াই হাসিয়া ফেলিয়াছিল। পরেশ খেদের সহিত কহিল, “চাও নি তো? বেশ!” বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফলাতেই মেয়েটি কহিল, “জেরেছিলাম, কাউকে বলবো না কিন্তু!” পরেশ গেল, “আমাকে ভাল লাগছে তোমার?” মেয়েটি স্বম্বকার দিয়া কহিল,

“জানি না, বাবু।” পরেশ মেয়েটিকে ‘স্পর্শ’ করিবার লোভ সামলাই পাইল না। কহিল, “তোমার হাতটা দেখি।” মেয়েটি বিশ্বাসের মত কহিল, “কেন?” পরেশ কহিল, “তুমি জান না বোধ হয়—আমি হৃৎ দেখতে জানি, হাত দেখতে তোমার বরের খবর বসে দেব।” মেয়েটি হৃৎ দুইটি কোলের মধ্যে লুকাইল। পরেশ কহিল, “আ রে। হাত লুকে কেন? ওই যে বেল্ট থেকে মোটা-মোটা পৈতের গোছা পড়ে, পাঁজ-প বগলে করে গণগণকার আসে—ভাদের কোনদিন হাত দেখাও নি তুমি আমাকে তাই ভাব না।”

মেয়েটি মূর্চক হাসিল। পরেশ কহিল, “দেখি করো না লক্ষ্যই এখনই দিদিমা এসে পড়বে। আমারও তো জানা দরকার, খবর দ্ব আমার বিয়ে হবে, সে ভাগবতী কিনা।” মেয়েটি ডান হাতটি বাড়াই পরেশ দুই হাতে করতল চাপিয়া ধরিয়া, প্রসারিত করিয়া, করতলে রে গলির উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া রাখিয়া, কোমল-কর-স্পর্শ সমস্ত জ দিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

মেয়েটি ভয়ে-ভয়ে কহিল, “কি দেখছেন?” পরেশ যেন সাঁ পাইয়া কহিল, “ভাল! খুব ভাগবতী তুমি।” হাতটি টিপিয়া কহি “কিন্তু তোমার হাতটি তো ভারী নরম, কমলা।” কমলা হাতটি ছাড়া লইয়া কহিল, “বাবির চেয়েও?” পরেশ কহিল, “শবির হাত তো কোঁ দোঁষ নি, জানব কি করে?” কমলা কহিল, “এতদিন চাকিছে করো হাত দেখেন নি?” পরেশ হাসিয়া কহিল, “চিকিৎসকের মত দেখেছি—গণগণকার মত তো দেখি নি।” মেয়েটি ঠোঁট উল্টাইতেই পরেশ কহি “ও কি হচ্ছে?” মেয়েটি মুখে ফিরাইয়া লইয়া কহিল, “আমি সব জাি পরেশ সাগাহ কহিল, “কি জান?”

মেয়েটি মুখ নামাইয়া কহিল, “পরে বলব।” পরেশ অনুমতি কহিল, “এখনই বল না।”—বলিয়া খপু করিয়া কমলার বাহু-মূল চাপি ধরিল। কমলা চক্ষুর কোণ হইতে বিদ্রূণ হাসিয়া, মৃদু, তরুণের সাঁ কহিল, “ও কি হচ্ছে? ছাড়ুন।”—বলিয়া সরিয়া বসিয়া কহিল, “ও কিছু জানি না।”

এই চকিত চাহান, তীর-জ্বিত কণ্ঠস্বর, সভয়ে সরিয়া বসা, পরো মনে খোঁচা দিয়া তাহান মুখ-চোরা, ভীত পৌরুষকে বেপরোয়া কঁ তুলিল; বকের মধ্যে হৃৎখণ্ডটা লক্ষ্যলক্ষি শব্দ করিয়া দিল, খাম্বা, শিরার মধ্যে উত্তপ্ত বসন্তপ্রাণ উন্মত্তভাবে বাহিতে লাগিল, মাথার ভিত্তি কাঁকা করিতে লাগিল, এককথায় সমস্ত দেহ চাঁৎকর করিয়া নিম অস্তিত্ব প্রচার করিতে লাগিল। কম্পিতবস্তে রহস্যময় স্বরে সে কহি “ভয় কিসের তোমার?” মেয়েটি ভাড়াভাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “ও মাই।” পরেশ কহিল, “দুদিন পরে একই বিদ্বান্য আমার কাছ তে শব্দে প্রস্তাব করবে না তোমার—আজ এত লজ্জা!” মেয়েটি মুখ ক করিয়া উঠানে নামিয়া গেল।

দরজা খোলার শব্দ হইতেই মেয়েটি লেবুগাছের কাছে গিয়া প দাঁড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্রীমতী ঘরে ঢুকিয়া কাছে আসিয়া কহি “কিনো ও কি করছিস? ভাব হয়ে গেছে বাবু? এরপ্পর শরবত খাওয়া যোগাড় করছিস?” মেয়েটি স্বংকার তুলিয়া কহিল, “হ্যাঁ।”

“আজ্ঞা, আসি, দাঁড়া—” বলিয়া পরেশের কাছে আসিয়া বাকাইয়া চাহিয়া শ্রীমতী কহিল, “বেড়ালকে বিশ্বাস করে মাছ গে গিয়েছিলাম, দাঁড়াও বসাও নি তো, হে?” পরেশ হাসিতে লাগিল।

শ্রীমতী ঘরে ঢুকিতেই কমলা হঠাৎ কাছে আসিয়া পরেশের গি তাকাইয়া শ্রীমতীর উদ্দেশ্যে কহিল, “চললাম দিদিমা।” শ্রীমতী কহি “সে কি লো” কি কথাবার্তা হল আগে বল শুন।” মেয়েটি কহিল, “চললাম।”—বলিয়া মন্তরগতিতে বাইরে হইয়া গেল।

পরেশ চিন্তাবিগতভাবে চলিতেছিল, হঠাৎ রিনর কহিল, “বাব কি বাড়ি হয়ে যাবে?” পরেশ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, দুইটি রাস সংযোগ স্থলে তাহার উপস্থিত হইয়াছে—সোজা রাস্তা দিয়া বকবের ব যাত্রা যায়, ডানারকের রাস্তাটা তাহাদের বাড়ির সামনে দিয়া গিয়া পরেশ কহিল, “হ্যাঁ, আপনি চলুন। আমি ওষুধ-পতুর নিয়ে এ য়াচ্ছি।”

(১৭)

বিনয়ের বাড়িতে আসিয়া পরেশ ডাক দিল, “কাকাবাবু।” নি ভাড়াভাড়ি লণ্ঠন লইয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “এস, বাবাজী।” ফিসা করিয়া কহিল, “হেডমাষ্টার মশায়ের শালী বেড়াতে এসেছেন।” পা

মহাশয় দাঁড়াইয়া কহিল, “তাই নাকি! কোথায় রয়েছেন?” বিনয় জবাব দিল, “বাঁধর কাছে।” পরেশ কহিল, “তা হলে সরাসরি যাওয়া কি ঠিক হবে?” বিনয় সাহস দিয়া কহিল, “তাতে কি? শিক্তিতা মেয়ে সকলের সামনেই বেরোন, এস।”

শয়নকক্ষে ঢুকিয়া পরেশ দেখিল, বাঁধর খাটের উপর শুইয়া আছে। মাথার দিকে খাটের পাশে একটা চেয়ারে বসিয়া আছে একজন মহিলা, বরষ বাঁধর দিকে তেঁইশ-বরষ ফসী। পান-পাতার ধরনের মূখের ডোল; চোখ দুইটি বড় না হইলেও বৃদ্ধি ও চাতুর্যে উজ্জ্বল; হ্রু দুইটি সুক্ষ্ম ও কেশবিরল; নাকটি টিকলো না হইলেও সুগঠিত ও সুন্দর; পাতলা রাগা রাগা ঠোঁট (লিপস্টিক লাগাইয়াছে কিনা কে জানে); ঠোঁট ও চিবুকের মাঝখানে একটি বঁকা খাঁজ, মাথায় এলোথোঁপা; কাণ দুইটি চলে ঢাকা, কানের পড়ায় হাঁরা বসানো (নকল নিচয়ই) সোণার ফুল; পাঁচখানে কালোপাড়ওয়াল শাদা শাড়ি, লম্বা হাতা কামিজের মত কলার-ওয়াল বেগুনী রঙের সাজের রাউন্ড; হাতে চারপাছ করিয়া সোনার চুড়ি। মহিলাটি চেয়ারে বসে পায়ের উপর ডান পা চাপাইয়া জানুর উপর খাড়াভাবে স্থাপিত হাতের প্রসারিত করতলে মুখটি রাখিয়া গম্ভীর বসনে বাঁধর বিছানায় উপবিষ্টা সুখদার কথা শুনিতোছে।

পরেশ ঢুকিতেই সুখদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথার ঘোমটা একটু টানিয়া কহিল, “এস, বাবা।” মোটাটো পোজ বদলাইয়া খাড়া হইয়া বসিল। বিনয় বিনীত হাস্য মেসেজিক উপদেশ করিয়া কহিল, “হাঁনি আমাদের—বকেছ বাবা।” পরেশ মুখহস্তে মহিলাটিকে নমস্কার করিতেই মহিলাটি প্রতিদানকর কহিল। বিনয় কহিল, “দাঁড়া বাবা! আর একটা বসবার কিছু আনা।” বলিয়া বাঁহের যাইবার উপক্রম করিতেই মহিলাটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “এইটোতে বসুন না।” পরেশ কহিল, “আপনি বসুন, আমি বসছি এখানে।” বলিয়া বাঁধর বিছানায় তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

বাঁধর চিৎ হইয়া শুইয়া ছিল; পরেশ বসিতেই একটু সরিয়া যাইবার উপক্রম করিল। পরেশ কহিল, “থাক যেমন শুলোছিল তেমনই থাক। দেখ পাটা!” বিনয় লখন লইয়া কাছে আসিল। পায়ের অবস্থা দেখিয়া পরেশ কহিল, “ফেংকা হয়ে গেছে দেখছি। তবে পোড়াটা বিশেষ গভীর নয়—ভয়ের কারণ নেই—” বাঁধর দিকে তাকাইয়া কহিল, “জ্বালা করছে নাকি? বাঁধর পরেশের দিকে তাকাইয়াছিল—চোখে চোখ মিলিতেও চোখ না ফিরাইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, “করছে।” পরেশ বিনয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, “ওষধ দিবে যাঁজি, বাব কয়েক লাগালেই জ্বালাটা কমে আসবে।—বলিয়া আবার বাঁধর দিকে তাকাইতেই আবার চোখে চোখ মিলিল। বাঁধর দৃষ্টি সম্মুখাঙ্গে শূন্যতার মত, স্থির, উজ্জ্বল ও করুণ। সেই দৃষ্টির সিন্ধু ধারায় পরেশের সারা দেহে যে কদমার অগ্নিশিখা এখনও জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল, হৃদয়ের জ্বালা জ্বড়াইয়া গেল, অশান্ত মন শান্ত হইল। বাঁধর বিষয়, সুন্দর মূখের দিকে তাকাইয়া পরেশের মনে হইল, এই মেয়েটি তাহার সিন্ধুখোজের রূপের প্রভাব তাহার হৃদয়কে আলোকিতই করে আলোকিত করে না।

মুখ ফিরাইয়া লইয়া পরেশ মহিলাটির দিকে তাকাইল দেখিল, সে সুখদার সহিত কথা বলিতেছে; আবার মুখ ফিরাইয়া বিনয়ের দিকে তাকাইয়া পরেশ কহিল, “একটা কিছু পাত্র নিয়ে আসুন দেখা।” বলিয়া পকেট হইতে ওষুধ ও তুলার প্যাকট বাঁহের করিল। সুখদা ভাড়াভাড়ি একটা মেয়ে আনিয়া হাজির করিল। তাহাতে গুণ্ধ ঢালিয়া তুলি ভিজাইয়া পরেশ বাঁধর পায়ে লাগাইয়া দিবার উপক্রম করিতেই বাঁধর কহিল, “আপনি পায়ে হাত দেবেন না। মাকে ডাকুন।” পরেশ আদেশের সূরে কহিল, “পা নেড়োনা ফেংকা গলে গেলে যা হয়ে যাবে।” কামল সূরে কহিল, “অসুখে দোষ নেই, এরপর না হয় একটা প্রণাম করে নিও।” বলিয়া মুখ তুলিয়া চাইতেই মহিলাটির সহিত দৃষ্টিসংযোগ ঘটিল। মহিলাটি মৃদু হাসিয়া কহিল, “আজ আর উঠে প্রণাম করে কাজ নেই। মনে মনেই প্রণাম কর।” পায়ে ওষুধ লাগাইতে লাগাইতে পরেশ কহিল, “ঠিক বলেছেন—আজ আর ওটা চলবে না; একটা ঘরের ওষুধ দিয়ে যাঁজি—থেকে নাও এখনই।” বলিয়া সুখদাকে কহিল, “এক গ্লাস জল আনুন দেখা কাকীমা।”

সুখদা জল আনিত করে। পরেশ বাম হাতে পকেট হইতে একটা ঔষধের বড়ি বাঁহর করিয়া বিনয়ের হাতে দিল। মহিলাটি কহিল, “ফোংকাটা গলে দিয়ে একটা ব্যাডেজ করে দিন না। রাত্রে যদি গলে যায় তো, যা-তা লেগে বিষিয়ে উঠতে পারে।” পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, “না গলাই ভাল, যদি গলে যায় তো তাই কবতে হবে। তবে খুব সাবধান।”

দেখাই তো।” বাঁধর উপদেশ করিল, “দেখি, পাটা ফাটলো, কালো পুঁজ ফোংকাটা গলে গেলে যা হয়ে যাবে, অনেক দিন ভুগতে হবে তা হলে বাঁধর যা-তা নাড়িয়া আদেশ পালন করিবার প্রতিশ্রুতি দিল, কিন্তু হঠাৎ মনে মনে বলিল, “ভাগ্যেত হইলেই তো ভাল—ভতখিন আপনায় জখা পাওক বাইবে। সরিয়া উঠিলে আপনিও তো সরিয়া যাইবেন, আর মাথা ঠুকিলেও দেখা দিবেন না।”

সুখদা এক গ্লাস জল আনিয়া ঔষধ খাওয়াইতে আসিতেই পরেশ একটু সরিয়া বসিয়া কহিল, “খাইয়ে দিন।” সুখদা কাছে যাইতেই বাঁধর উঠিয়া বসিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, “পরেদাদাকে প্রশাষ করব, পরে হাত দিয়েছেন।” সুখদা মৃদুস্বরে, অবশ্য সকলকে শুনাইয়া কহিল, “থেকে নাও, তারপর করবে।” পরেশ কহিল, “বহালাম বে কাল করবে, আজ নড়া-চড়া না করাই ভাল।” সুখদা কহিল, “সেই ভাল—কালই করো মা!” বাঁধর মায়ের মূখের দিকে তাকাইয়া খাড়া দাঁড়িল।

বাঁধর শুইয়া পড়িল বিনয় সুখদাকে কহিল, “তুমিই বরং ওষুধটা লাগিয়ে দাও। পরেশ বাবাঝী মিস্ট্রি মিস্ট্রের সঙ্গে একটু গল্প-সম্পর্ক কন্নাক।” পরেশকে কহিল, “তুমি উঠে এস বাবা।” ইতিমধ্যে খুকী একটা চেয়ার আনিয়াছিল, পরেশ আসিয়া তাহাতে বসিল; বিনয়ও লখনটা মেঝেতে নামাইয়া তাহার কাছে আসিবার উপক্রম করিতেই সুখদা মৃদু কণ্ঠে কহিল, “তুমিই লাগিয়ে দাও, আমাকে একবার ওদিকে যেতে হবে।”

সুখদা ঘর হইতে বাঁধর হইবার উপক্রম করিতেই মহিলাটি কহিল, “আমার জন্যে হাঙ্গামা করবেন না কিছু।” পরেশ কহিল, “আমার জন্যে একটু করুন শ্রম একটু চা।” বিনয় কহিল, “হাঙ্গামা আবার কিসের! দয়া করে একদিন বাড়িতে পায়ের ধুলা দিলেন।” মহিলাটি হাসিয়া কহিল, “পানা দিতে দিতেই এই বিপত্তি—আর কোথাও যাব না ভাবছি; যা পয়সমত মেয়ে আমি।” বিনয় অপ্রতিভভাবে কহিল, “সে কি কথা! কত সৌভাগ্য আমাদের না কিছু।” পরেশ হাসিয়া ফেলিয়াছিল, হাসি চাপিয়া কহিল, “সাঁভা।” মহিলাটিও হাসি চাপিয়া বিনয়ের উপদেশে কহিল, “আপনাদের ডাক্তারাবাদ, কিন্তু আপনায় কথা সমর্থন করেন না।” বিনয় প্রতিবাদ করিল, “না না, তা আবার হয়। ভারী ভাল ছেলে আমাদের পরেশ।” পরেশ গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিল, “আপনার দর্শন পাওয়া সত্যই আমাদের সৌভাগ্য।” মহিলাটি হ্রু দুইটি ঈষৎ কুণ্ঠিত করিয়া, দৃষ্টি ঈষৎ ত্রিবাক করিয়া কহিল, “সত্য নাকি!” বলিয়া মুখ তিপিয়া হাসিল। পরেশ লক্ষিতমুখে বসিয়া রহিল। বিনয় কহিল, “ওর দেহ নেই—মানে কতিকবাবু আপনাকে দেখছেন কিনা।” সুখদা আসিয়া কহিল, “আপনাকে একবার একটু উঠতে হবে।” পরেশের দিকে চাইয়া কহিল, “তোমাকেও বাবা।” মহিলাটি কহিল, “আমাকে বাদ দিন, আমার শো শরীর এমনই ভাল নয়।” সুখদা কহিল, “এমন কিছু নয়, একটু চা আর—” মহিলাটি কহিল, “আর-আর না, শ্রম চা একটু—এইখানেই দিন দয়া করে।” বিনয় বলিয়া উঠিল, “সেই ভাল। এখানে একটা টুলের ওপর—।” সুখদা স্বামীর দিকে বীর্যসূচক কটাক্ষেপ করিয়া ধারালো সূরে কহিল, “হাত গোবেন না—” মহিলাটিকে সর্বিনয়ে কহিল, “তা কি হয়! আপনি একটু উঠে আসুন দয়া করে।” পরেশকে কহিল, “তুমিও হাতটা ধুয়ে ফেল বাবা।” পরেশ হাত ধুইতে গেল; মহিলাটিও অত্যন্ত অনিচ্ছায় সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “আচ্ছা, চলুন। কিন্তু ভারী লক্ষিত হচ্ছি আমি। বাড়িতে এই বিপদ, তার ওপর এসে আপনাদের ব্যস্ত করলাম।” সুখদা কহিল, “ভাগ্যে আপনি এসেছিলেন।” উনি তো পালিয়ে গিয়ে দূরে খালস হয়ে। একা আমি যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। আপনি আসতে তবু সাহস পেলাম।”

বাঁহের বারান্দায় আসন পড়িয়া খাবার বাবস্থা করা হইয়াছিল। পরেশ ঘরের ভিতরে আসিয়া কহিল, “আমারটা এখানে আনুন কাকীমা।” সুখদা কহিল, “তা কি হয় বাবা! উনি একা একা থাকেন।” পরেশ কহিল, “বাব! উনি হচ্ছেন আপনাদের মানা অতিথি—ওর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? তা ছাড়া আমার পাড়াগোঁয়ে মানব—সভা-ভবা হয়ে খাওয়া আমাদের পোষায় না।”

খাওয়ার পরে মেয়েটি ঘরে আসিয়া বসিল। পরেশ চা খাইতেছিল। সুখদা আসিয়া সাক্ষাতে কহিল, “কিছু খেলেন না, সব পড়ে রইল।” মেয়েটি কহিল, “রাত্রে কিছু খাই নে আমি। আপনি মেহাৎ অনুরোধ করলেন তাই।” পরেশ কহিল, “আমার দিকে তাকিয়ে মনোবেদনা দূর করুন।” কামল দুঃখের সহিত কহিল, “শ্রম ল্পেটটা আর পেয়ে উঠি নি।” মেয়েটি মৃদু হাসিয়া কহিল, “আপনার স্বাস্থ্য ভাল, লেট খেলেও হাতো হজম হয়ে যাবে। কিন্তু আমার তো জা নয়।”



মাথ ঠাণ্ডা রাখিও ও কেশ কান্ধে কান্ধিও

আর, মিত্রের
চতুর চাকরী
নারিকেল তৈল
তিল তৈল
ব্যবহার করুন

এজেন্ট
ডি. এন. ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স লি:
৩১ ও ৩৩, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা
সর্বস্ব পাণ্ডুয়া স্যার



শারদীয় উৎসবের দিনে—

বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্প তাঁতের
শাড়ী আপনার ছন্দিত দেহকে
অপরূপ রূপমাধুর্যে লীলায়িত
ক'রে তুলুক।

ত নতু শিল্পা লয়ে র বিপদ
আয়োজন আপনার রুচি
অনুযায়ী শাড়ী নির্বাচনে
সাহায্য করবে।



১৯৪১

৮৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
(চিত্রা সিনেমার একই পাশেই)
ফোন-বি.বি. ৪৩০২

বিনয় কহিল, “আপনার স্বস্থেস্থান কিছই উন্নতি হইনি এখানে?”
মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না। ভাল লাগছে না আর, চলে
যাব শিগগির।”

বিনয় কহিল, “আরও দিন কয়েক দেখুন না, ভাল হওয়ার ফল
ফলতেও সময় লাগে, তা ছাড়া—”

“তা-ছাড়া কি?”

“ডাক্তার বদলাতে হবে। আমি তো বলছি মাসটার মশায়কে—”

“আর ভাল ডাক্তার কই এখানে?”

বিনয় পরেশের দিকে তাকিয়া কহিল, “কেন? আমাদের পরেশ?”

মেয়েটি আঙুলে পরেশকে একবার দেখিয়া লইয়া কহিল, “তা”

উনি তো যাবেন না।” বলিয়া টোঁটের দূই প্রান্ত একটু কুচকিল।

বিনয় কহিল, “শুদ্ধ বাবা পরেশ, কি বলছেন?” পরেশ চা খাইতে
খাইতে কিসের চিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল বোধ হয়—বিনয়ের ডাক
শুনিয়া যেন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, “কি বলছেন?” বিনয় কহিল, “তুমি
ওংক দেখতে যাও নি বলে উনি রাগ করছেন।”

পরেশ কণ্ঠস্বরে অনুশোচনার আমেজ লাগিয়া কহিল, “দেখুন—
আমি সত্যি ভাবী লজ্জিত। কিন্তু যেখানে একজন ডাক্তার দেখছেন, সেখানে
তার অনুরোধ ছাড়া আর কারও ডাকে আমাদের যাওয়া চলে না।” মেয়েটি
কহিল, “সে ডাক্তার যদি আপনাকে ডাকতে না চান, আর, অন্য কারও ডাকে
যদি আপনি যেতে না চান, তা হলে রেণী কি করে বলুন তো?” বলিয়া
দুই উজ্জ্বল চোখ মেসিয়া পরেশের দিকে তাকাইল। পরেশ চোখে চোখ
মিলিতেই মুখ নমাইয়া গেল। মেয়েটি কহিল, “জবাব দিন।” বিনয়
কহিল, “তুমি কেন ইস্তমত করছ বাবা। একদিন গিয়ে দেখে এস না।
এখন তো কার্তিক ডাক্তার কিছই মনে করবে না—নিজের শব্দর যখন—”

মেয়েটি বিস্ময়ের স্বরে কহিল, “মানে?”

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “মানে খুব সৌজা—কার্তিক ডাক্তারের
মেয়ের সঙ্গে পরেশের বিয়ে হ'লে আসছে মাঘ মাসে—সব ঠিক হয়ে
গেছে।” মেয়েটি মুচকি হাসিয়া পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, “তাই
নাকি!” পরেশ গম্ভীর বদনে বসিয়া রহিল।

সুখদা আসিয়া কহিল, “আপনাকে নিয়ে যেতে লোক এসেছে।”
মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “তা হ'লে আমি আসি।” বিনয়কে কহিল,
“আপনার মেয়ের জন্যে ভারী চিন্তিত থাকব—কাল দয়া করে খবর দেবেন।”
বিনয়ও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কহিল, “নিশ্চয়! খবর দেব বই কি।”
সুখদা স্বামীর দিকে কটাকট হাসিয়া কহিল, “ভর তো সবই মনে থাকবে।
নিজের চোখেই তো দেখলেন কেমন মানস।” আমিই বিকেল দিয়ে খবর
পাঠিয়ে দেব কাল।” বিনয় কিছুমাত্র মুখে কহিল, “মনে থাকবে বইকি!
পবেশ বাবাজী তো বড়িতে ছিল না—খুঁজে নিয়ে আসতে হ'ল,
না হ'লে—” মেয়েটি ওৎসুকতার স্বরে কহিল, “কোথায় ছিলেন—শব্দর-
বাড়িতে বন্ধ?” বিনয় কহিল, “ঠিক শব্দরবাড়িতে না, ঘরে-পাশেই।”
মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিয়া পরেশের দিকে তাকাইল; পরেশ লজ্জিতমুখে
দাঁড়াইয়া রহিল।

মেয়েটি কহিল, “আচ্ছা, নমস্কার।” সুখদাকে কহিল, “নমস্কার
দিদি। বিপদের দিনে এসে বিরক্ত করে গেলাম।” সুখদা কহিল, “ছি ছি,
সে কি কথা।” মেয়েটি কহিল, “চলি তবে, কাল একটা খবর দেবেন।”—
বলিয়া যাইতে উদ্ভাত হইতেই বিনয় পরেশকে কহিল, “তোমারও তো এক
রাত—ওর সঙ্গেই চলে যাব।” মেয়েটি বাকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “তাই
নাকি! আসুন না।” পরেশ কহিল, “আচ্ছা, চলুন।” বিনয়কে কহিল,
“বাব বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরুথের শিশুটা খুব সাবধানে রাখবেন—
বিষ; আর ওই পেলট্টাও ভাল করে খোবার ব্যবস্থা করবেন। কাল সকালে
এসে দেখে যাব।”

রাস্তার চলিতে চলিতে হঠাৎ গিল্লেন তাকাইয়া মেয়েটি ধর্মকিয়া
দাঁড়াইয়া কহিল, “আপনি এত পিছিয়ে পড়ছেন কেন? আসুন না। এখনই
ধরে নিয়ে যাব না—ভয় নেই।” পরেশ কাছে আসিয়া লজ্জিতমুখে কহিল,
“ধরে নিয়ে যেতে হবে কেন? আদেশ করেন তো কালই যাব।” মেয়েটি
স্ব-ভঙ্গী করিয়া কহিল, “আদেশ! আমার আদেশ করবার অধিকার কি
পরেশবাবু? কিছই মনে করবেন না—নাম ধরেই ডাকলাম। আমার নাম
আরতি, ইচ্ছে হ'লে আপনিও ওই নামে আমাকে ডাকতে পারেন।” দুই-
জনে পাশাপাশি চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আরতি পরেশের মুখের
দিকে তাকাইয়া কহিল, “কি ভাবলেন বলুন তো?” পরেশ কহিল, “কিছই
না।” আরতি কহিল, “আমি লোকের মনের কথা-বলতে দিতে পারি,—

বলব—কি ভাবছেন?” পরেশ কিছু না বলিয়া শব্দ হারিল। আরতি
কহিল, “আপনি বিনয়বাবুর মেয়েকে মনে মনে গালাগালি দিয়েছেন।” পরেশ
বিস্ময়ের স্বরে কহিল, “হেতু?” মেয়েটি হাস্য-তরল কণ্ঠে কহিল, “আপনি
হয়তো খুব একটা ইন্টারেস্টে ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, মেয়েটি হঠাৎ একটা
ফ্যাসাদ বাঁধতে ততো বাদ সাধল।”

স্বপ্ন পারচয়ে মেয়েটির এই গায়ে-পড়া ধনিততার পরেশের মনটা
সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল; নীরসকণ্ঠে কহিল, “কি এমন ব্যাপার! তা
ছাড়া বাবকে আমি নিজের ছোটবোনের মত স্নেহ করি।” আরতি
অপ্রতিভমুখে কহিল, “সত্যি। নিজের চোখেই তো দেখলাম।” গম্ভীর
হইয়া কহিল, “আমার কথায় রাগ করলেন নাকি?” পরেশ কহিল, “রাগ
কিসের?” আরতি কহিল, “ভাবলেন, আচ্ছা অভদ্র মেয়ে তো! এক ঘণ্টার
আলাপেই লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে অনধিকারচা। শব্দর ক'রে
দিয়েছে।”

পরেশ অবশ্য হুইই ভাবিতেছিল ও মনে মনে বিরক্তিবোধ
করিতেছিল, কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, “না না, তা ভাবব কেন?”
আরতি কহিল, “আমার এই রকমই স্বভাব। সবাই কত বকাঝকা করে,
শোখরাতে পারি না কিছইতেই।” পরেশ চুপ করিয়া রহিল। আরতি বলিতে
লাগিল, “দুর্মানিটের আলপেই বন্ধুত্ব পাতিয়ে বাস—এলেই হয় না মন্তন
আলাপ; যাদও বুঝতে পার সবাই পছন্দ করে না।” পরেশ কহিল,
“আমাকে দয়া করে সবাইয়ের দলে ফেলবেন না। আপনার বন্ধুত্ব পেলে
নিজেকে ধনাই মনে করব।” আরতি ধর্মকিয়া দাঁড়াইয়া পরেশের মুখের
দিকে তাকাইয়া কহিল, “সত্যি?” পরেশ কহিল, “সত্যি তো।” আরতি
চোখ ও মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, “বেশ! কাল তা হ'লে বন্ধুর বাড়িতে
আপনার নেমন্তন্ন—ঠিক বেলা চারটার সময়ে গিয়ে হাজির হবেন।” পরেশ
কহিল, “যাব, নিশ্চয়।”

বাড়ির সামনে আসিয়া থামিতেই মেয়েটিও থামিয়া কহিল, “থামলেন
যে!” পরেশ কহিল, “এই আমাদের বাড়ি।” মেয়েটি কহিল, “তাই নাকি।
একদিন আসব আপনার বাড়ি। আপনি তো আর নেমন্তন্ন করেন না,
নিজে হতেই আসব।” পরেশ কহিল, “নেমন্তন্ন করব না জানলেন কি
করে?” মুখ টিপিয়া হাসিয়া মেয়েটি কহিল, “জানি।” একটু চুপ করিয়া
থাকিয়া কহিল, “গামাইবাড়ী এতবর ক'রে যেতে বললেন—একদিনও
গেলেন না।”—বলিয়া মুখটি স্থান করিয়া তুলিল।

পরেশ কহিল, “দেখুন, ও-কথা তুলে আর লজ্জা দেবেন না।
আপনাকে বললাম যে, অন্য ডাক্তারের রোগীকে তার বিনা অনুরোধে
দেখতে যেতে আমাদের ডাক্তার এটিকেও বাধে।” মেয়েটি কহিল, “বেশ
কাল যাবেন তো?”

“নিশ্চয়। কাল তো আর ডাক্তার হিসেবে যাব না, বন্ধু হিসেবে যাব।”
জোখ দুইটি বড় করিয়া মাথাটি হেলাইয়া মেয়েটি কহিল, “কিন্তু আপনার
ভাবী শ্রামতী আমাদের বন্ধুত্ব পছন্দ করবেন তো?” পরেশ মৃদু হাসিয়া
কহিল, “কি করে জানব?”

“কাল সকালে বরং একবার জিজ্ঞাসা করবেন।”

“দেখা না হ'লে জিজ্ঞাসা করব কি করে?”

“দেখা হয় না? একবারও না?”

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া জনাইল, “না। মাথার ঝাঁকানি দিয়া
মেয়েটি আশ্বাসের সুরে কহিল, “এক গায়ের ছেলে-মেয়ে, দেখা হয় না,
বিশ্বাস করব না।”

পরেশ আরতির দিকে তাকাইয়া রহিল। উহার সহজ, সরল ও
সংকটহীন ব্যবহার তাহাকে মৃদু করিল। যে নিম্নপ্রণয়ী মেয়েমানুষটি
হাতে লগ্গন লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আঁতেঁতেছিল, সে অদূরে হাঁ করিয়া ইহাদের
দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কহিল, “মাসীয়া! রাত হ'লে যাচ্ছে।”
আরতি একমুহূর্তে গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিল, “সত্যি! নমস্কার।
চললাম। কাল যাবেন কিন্তু অপেক্ষা করে থাকব।”—বলিয়া চলিয়া গেল।

পরেশও নমস্কার করিয়া অনেকক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকাইয়া
দাঁড়াইয়া রহিল।

(১৮)

পরদিন সকাল আটটার সময়ে ঘনশ্যাম আসিয়া হাজির হইল। গায়ে
ফ্রান্সেলের কুত্তা ও পশমী আলোয়ান, পায়ে চটি জুতা। বিনয় বৈঠকখানার
বারান্দায় বসিয়া পরেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাত্রি ফোঁকা গলিয়া
গিরিছে। সকালেই বিনয় পরেশকে খবর দিতে গিয়াছিল। পরেশ এখনই
আসিবে বলিয়াছে।

বেঙ্গল স্ট্রীট ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৮৬নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

টেলি : ক্রেডিট

স্থাপিত — ১৯১৮

ফোন : কলিকাতা ৭০০

(৩টি লাইন)

অনুমোদিত মূলধন	...	১,০০,০০,০০০	টাকা
বিক্রীত	...	৫০,০০,০০০	টাকা
আদায়ীকৃত	...	৩৯,০০,০০০	টাকা
মজুত তহবিল	...	৬,০০,০০০	টাকা

— শাখা —

কলিকাতায়	বাংলায়	বিহারে
টাওয়ার রক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট	রংপুর	হাজারিবাগ
১২৮/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট	পাবনা	রাঁচী
২৭, বিবেকানন্দ রোড	বগুড়া	কোদরমা
২০৬, বিবেকানন্দ রোড	ঢাকা	গিরিডিহ
২১১/১এ, বোবাজার স্ট্রীট	নারায়ণগঞ্জ	
১৫৫, রসা রোড	কুমিল্লাগর	
১৬, জি টি রোড, হাওড়া	নবম্বাঁপ	
১৯, হরগঞ্জ রোড, সালকিয়া	বহরমপুর	
	বাঁকুড়া	

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ জে, সি, দাশ

কস্তুরবা গান্ধী জাতীয় স্মৃতি ফণ্ডে যে কোনপ্রকার দানই এই ব্যাঙ্কের
হেড অফিসে এবং সকল শাখা অফিসেই সাদরে গৃহীত হইবে।

ঘনশ্যাম আসিয়া বারকয়েক কাঁসিয়া গলটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, “কি হে, কেমন আছে তোমার মেয়ে? পরেশকে পেয়েছিলে কাল?” বিনয় কহিল, “পেয়েছিলাম। বসবেন, আসুন।” ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “আর বসব না। কাল রাতে যে রকম ছুটোছুটি করিছলে দেখেছিলাম—ততো কালই খবর নিয়ে যাব ভেবেছিলাম; কিন্তু অনেকটা রাত হয়ে গেল—তা কেমন আছে মেয়ে?” বিনয় বিষমমুখে কহিল, “কাল তো পরেশ বাবাজী লাগাবার ও খাবার দুই ওষুধই ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিল; রাতে ঘুমিয়েওছিল। সকালে দেখছি, ফোস্কা গলে গেছে, তা ছাড়া জ্বরও হয়েছে মনে হচ্ছে।” ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, “ওতে ভয়ের কোন কারণ নেই। তাদুসে একটু জরুর হয়েছে। কাল অত ছুটোছুটি না করে, সঙ্গে সঙ্গে একটু পোড়া তেল লাগিয়ে দিতে তো কিছু হ’ত না;—তোমার আবার সবই বাড়বাড়ি কিনা।” বিনয় কহিল, “ওষুধ তো লাগানো হয়েছিল—নারকেল তেল আর চণের জল, কিন্তু—” ঘনশ্যাম কহিল, “আর, রেখে দাও তোমার নারকেল তেল আর চণের জল।” প্রসারিত করতল ত্যাগকভাবে নাড়িয়া কহিল, “স্নেহ পোড়া তেল! এমন ওষুধ আর নেই।” দ্রুতগামী করিয়া কহিল, “এখনও তাই করলে যাও—ভাঙার-বাঁধ ডাকতে হবে না।”—বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্ভাত হইতেই বিনয় কহিল, “কোথায় চলেছেন?” ঘনশ্যাম হাসিয়া কহিল, “বেয়ানের কাছে।” বিনয় ওৎসুকীর স্বরে কহিল, “আপনার আবার বেয়ান কে?” ঘনশ্যাম হুঁ নাচাইয়া কহিল, “কেন? আমাদের পরেশের মাসী হে! আমাদের সব বেয়ান হচ্ছে না? নতুন বেয়ান—।” বিনয় কহিল, “সকালবেলায়?”

“জরুরী দরকার—বিয়ের সব ফর্দ হচ্ছে কিনা? কাল এদিকের সব হয়ে গেছে। এখন গয়নার আর বস্ত্রভরণের ফর্দটি তো ওদের মত নিয়ে করতে হবে? সময় তো আর নেই—মাকে একটা মাস; তা পৌষ মাসে তো ও শ্রুতকর্মের কিছু করা চলবে না। যা করতে হবে এই মাসেই।” বলিয়া চলিবার উপক্রম করিয়াই আবার থামিয়া কহিল, “তা ভাঙার যা খরচ করব বলছে, তাতো বিয়ের মত একটা বিয়ে হবে বুটে! বামুনদের ঘর-ঘর এক-একটা করে গামড়া আর একখানা করে গামছা, গা স্বেচ্ছ লোকের তিনদিন ভোজ, শহর থেকে ইংরেজি বাজনা। এমন-জামাইকেও সেবে খুব—মেয়ের গা-ভাঁট গয়না, বেনারসী বেল, জমাইক হালের হাংটি, বুপোর দান, ঘড়ি, ঘড়ির চেন। তা ছাড়া, যা সব দেবার—” চক্ষে ইংগিতময় ভঙ্গী করিয়া কহিল, “তা তো উল্টেই, অস্বাভাবিক পুর। আচ্ছা, চল। সময় বড় সংকল্প। অথচ অত লড় একটা ব্যাপারে ভার আমাদের কজনের ঘড়ে।” গা কয়েক গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ঘনশ্যাম অস্বীয়তার সুরে কহিল, “তোমার মেয়ে কে আবার এ সময় ফাসাদ করে বসল, না হ’লে এই লগ্নেই গিয়ে ঠিক করে ফেললেই হ’ত। বয়স হয়েছে চের, আর বসিয়ে রাখা ঠিক নয়।” বিনয় কহিল, “পাত কই?” ঘনশ্যাম কহিল, “পাতের অভাব কি? বেশী ঘাড় না উঠি’লে সমান-সমান ঘরে খেঁজে দেখ, পাবে। আচ্ছা, চল।” বলিয়া ঘনশ্যাম চলিয়া গেল।

বিনয় ঘরে ফিরিতেই সুখদা কহিল, “কি বলিছল?” বিনয় কহিল, “পারেশের বিয়ের ন্যাক ফর্দ হচ্ছে, খুব ধুমধাম করে বিয়ে হবে—অনেক টাকা খরচ করবে ভাঙার।” সুখদা নীরবকণ্ঠে কহিল, “আছে তাই খরচ করবে, আমাদের মত তো নয়।” বিনয় কহিল, “তা পরেশের মত ছেলে, খরচ না করলে চলবে কেন? পাড়াগায়ের ছেলে তাই, না হ’লে শহরে ও ছেলের দাম দশ হাজার টাকা।” সুখদা মুখে গম্ভীর করিয়া কহিল, “কেন না বলছে।” ডা. কুঁচকাইয়া কহিল, “পাতের কথা কি বলিছল না?” বিনয় তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, “হ্যাঁ। বলিছল বিবির জন্যে পাত খুঁজতে বেরতো।” সুখদা দুই চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, “খুব অন্যায় কথা বলিছল কি?” বিনয় চুপ করিয়া রহিল। সুখদা কহিল, “সত্যি। মেয়েও এবার, এই তো এক বিপদ হয়েছে; পায়ো পোড়া দাগ হয়ে যাবে, এর জন্যে যে কত ভোগান্তি হবে তার ঠিক নেই।” বিনয় কহিল, “এমন কি পুড়েছে যে দাগ হয়ে যাবে? হ’লেও ওষুধের গুণে দাগ মিলিয়ে যাবে।” সুখদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “মিলিয়ে গেলেই ভাল।” কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “পারেশ তো এখনও এল না।” অবিশ্বাসের সুরে কহিল, “সত্যি গিছেলে তো?” বিনয় হোজোর সহিত কহিল, “যা রে। গিছলাম বই কি! পারেশ বললে এখনই যাচ্ছি। বোধ হয় ঘনশ্যাম আটকে দিয়েছে।”

“ও বুড়ি পরেশের কাছেই গেল?”

“ঠিক পরেশের কাছে নয়, ওর মাসীর কাছে; গয়নার ফর্দ করতে; খুব ফপদালালি করছে ঘনশ্যাম, যেন ওরই মেয়ের বিয়ে।”

পরেশের ডাক শোনা গেল, “কাকাবাব!” বিনয় সাগ্রহে লাড়া দিল, “এস বাবাজী!” বৈঠকখানায় পা দিতেই পরেশের আবির্ভাব ঘটিল—মালকোচা মারিয়া কাপড় পরা, গায়ে শাট ও কোট, পায়ে জুতা; কহিল, “চলুন, দেখিগে। বাব কোথায়?”

পরেশ মূর্খের হাঁপাতে জানাইল, “ওই যে ওখানে বসে আছে।”

উঠানের মাঝখানে বেশ রোদ আসিয়া পড়িয়াছিল; দেখানে মাদুর পাতিয়া খুঁকী পড়িতেছিল; ববি তাহার পাশে শূন্যস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

জুতার শব্দ শুনিয়া ববি মূখ্য নামাইল; খুঁকী বই ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া লক্ষাইয়া উঠিয়া সোজাসে বসিয়া উঠিল, “এই যে পরেশদাদা এসেছেন।” পরেশ কাছে আসিয়া ববিকে জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন আছ?” ববি জবাব দিল না। সুখদা একটা মোড়া আনিয়া দিতেই পরেশ বসিয়া কহিল, “গরম জল কতটা করুন দেখ; আর পক্ষিকার ছেড়া কাপড় থাকে তো বার করুন; তেলের পাত্রেটটা কাল রেখে গেছি, সেটাও আনুন।” সুখদা ও বিনয় দুইজনেই চলিয়া গেল।

উঠানের এক পাশে কতকটা জমি বেড়া দিয়া ঘেরিয়া সমস্তীর বাগান করা হইয়াছে। লাউগাছপাশি লতাইয়া লতাইয়া মাচায় উঠিয়াছে—মাচা হইতে দুই চারিটা বড় বড় লাউ ঝুলিতেছে। বেগুনগাছপাশিতে ফুল আসিয়াছে—কচি কচি বেগুনও ধরিয়াছে। শাকের ক্ষেত ডিরায় অল্পসল্প সবুজ ও সতেজ পুতুকা শাকের চারা। বেড়ার ধারে ধারে সারিবদ্ধ চন্দ্রমল্লিকা ও গাড়া গাছপাশিতে বিস্তার ফুল ফুটিয়াছে। সেই দিকে তাকাইয়া পরেশ কহিল, “ও, খুব ফুল ফুটেছে তো!” খুঁকী কহিল, “খুঁকী! তুমি আমাকে একটা গায়া ফুলের মালা করে দাও দেখা।” খুঁকী ববির দিকে তাকাইয়া কহিল, “যাব দিদি?” পরেশ কহিল, “আবার অনুমতি চাই নাকি?” খুঁকী কহিল, “যা রে! দিদির গাছ, কাউকে ফুল তুলতে দেয় না—” পরেশ ক্রটিম অভিমানের সহিত কহিল, “থাকগে খুঁকী, কাজ নেই।” ববি খুঁকীর দিকে তাকাইয়া কহিল, “তুই গারবি না, আমি মালা গেঁথে দেব এখন।” বিনয় তুলার প্যাকেট লইয়া আসিল। পরেশ কহিল, “ফোস্কাটা যে রকম গলেছে ওটাকে বাগেজ করা দরকার।” ববির দিকে চাইয়া কহিল, “কাল এত করে বলে গেলাম একটু সাবধান হ’তে—” ববি লজ্জতমুখে বসিয়া রহিল। বিনয় কহিল, “তা ও কি করবে? ঘুমের ওষুধ দিয়ে গিয়েছিলে, খুব ঘুমিয়েছে। ঘুমের ঘোরে কি কিছু খেয়াল থাকে?”

সুখদা গরম জল লইয়া আসিয়া বিনয়কে কহিল, “দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভ করতে পেলে আর কিছু খেয়াল থাকে না, একটা শোয়া পরোনো কাপড় আনতে হবে না?” বিনয় কহিল, “কি করে আনব! তোমার কাছেই তো চাবি।” ঝংকার দিয়া সুখদা কহিল, “আমি কি চাবি নিয়ে দেশান্তর হইয়াছি নাকি! চেয়ে নিতে পার না?” চাবি লইয়া বিনয় কাপড় আনিতে গেল।

পাতের ব্যবস্থা করিতে বসিয়া পরেশ খুঁকীকে কহিল, “তুমি মিটেমিটে দাঁড়িয়ে না থেকো আমার জন্যে এক কাপ চা করে আন দেখা।” সুখদা কহিল, “ও থাক বাবা! আমিই যাচ্ছি। কাল একজন এক কাপড় করেছেন, আজ আবার উনি কি করে বসবেন, দেখছ তো! কাজকর্ম বদলে গেল, কারও কিছু করে কাজ নেই।” রাগাধরে যাইতে যাইতে কহিল, “কেমন অদেটে!” যেমন স্বামী, তেমনই ছেলে-মেয়ে, ম’লেই, হাড় জড়োর আমার।”

কাঁচি দিয়া ফোস্কার নরম চামড়া কাটিতে কাটিতে পরেশ খুঁকীকে কহিল, “তা হ’লে তুমি নেহাৎ বেকার দাঁড়িয়ে থাকবে খুঁকী। তোমার, চা না করতে পার, পানি সাজতে পারতো, তাই সেজে রাখগে বুটো আমার জন্যে। কাকাঁমা কি রকম রেগে গেছেন, দেখছ তো! কাজকর্ম বদলে যাও।” খুঁকী চলিয়া যাইতেই পরেশ মূর্খকণ্ঠে কহিল, “হাত ফস্কে হাড়ি পড়ে গেল—কি ভাবিছলে?” ববি জবাব দিল না। পরেশ কহিল, “কি, বল না?” ববি মূর্খ বিষমকণ্ঠে কহিল, “কি আবার ভাবব?” পরেশ ক্ষণকালের জন্য মূখ্য তুলিয়া নরম মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, “এমনই কি কারও হাত ফস্কে? বিম্ভর কিছু ভাবিছলে?” তারপর আবার মূখ্য নীচু করিয়া নিজের কাঁজ করিতে করিতে পলিতে লাগিল, “বোধ হয় বিয়ের কথা ভাবিছলে, নয়? কত আলো হবে! কত বাজনা বাজবে। পাঙ্কী চড়ে ‘হিজোর-হিজোর’ শব্দ করতে করতে বর এসে হাজির হবে—ইয়া লম্বা-চওড়া শরীর, বড় বড় গোঁফ। কোলে করে নামবে কে?”

খুব ঠিকিয়াছেন কি ?

এখনও সময় আছে সাবধান।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের উন্নতি এবং সন্মান দেখিয়া হিংস্কেরা আমাদের নাম জাল করিতেছে। অবশ্য ইহার প্রতিকার করা হইবে। আপনারা যদি আপনারদের রেডিওর প্রকৃত ফ্রি সার্ভিস পাইতে চাহেন, তাহা হইলে আমাদের সহিত সাফাফ করুন বা পি কে ১৫৩২ নং ফোন করুন, আমাদের ফ্রি সার্ভিসের আরও অনেক সুবিধা আছে যাহা আমাদের সদস্যগণ পচি বৎসর যাবৎ পাইয়া আসিতেছেন।

পুরাতন ও রেজিস্টারীকৃত
আদি প্রতিষ্ঠান

রেডিও এসোসিয়েশন
অফ বেঙ্গল।

৮৭নং চৌরঙ্গী রোড,
কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আমরা এইচ, এম,
ভির ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডিলার। আমাদের
অন্য কোনও শাখা নাই।

সাবধানের



মার নেই

RC/FS-6

চিঠিপত্র সীলমোহর করে পাঠালে ভেতরের কিছু খোয়া যাওয়ার ভয় থাকে না। ইনসিওর বা পার্শেলের ক্ষেত্রে তো সীলমোহর না থাকলে পোস্টপিসই তা বাতিল করে দেবে। নিজ নামের সীলমোহর হলে একটি নুতন স্বপ্ন হয় এবং চিঠিখানিও নিৰ্বিকল্পে পৌছিতে পারে। আমাদের ই, পি, এন, এল, সীল এ-কাজের শকে সম্পূর্ণ উপযোগী। স্বকথকে চেইন ও রিং-এ ফিট করা এখনকার সীলমোহর আমবাঁই প্রথম প্রস্তুত করি। নাম খোলাই করার ক্ষমতি সমস্ত অতোকটির দাম মাত্র ৫ টাকা।

বয়কো এনগ্রেডাম
১৩এ বিডন রো : কলিকাতা

=দেশের সেবায় নিয়োজিত একমাত্র উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান=

কুকের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩ ও ৪, হেয়ার স্ট্রিট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

কলিকাতা	ঢাকা	ঝাড়গ্রাম	দার্জিলিং
বড়বাজার	শান্তিপুর	ভদ্রক	রাজশাহী
শ্যামবাজার	ভারকেশ্বর	সুতাগড়	পগড়া
দক্ষিণ কলিকাতা	রাণাঘাট	বাগেরহাট	শিলিগুড়ি
হাওড়া	কুসনগর	বাঁকুড়া	কালিঙ্গপাং
	বেঙ্গলু	গিড়নী	বালেশ্বর
	বাসী		চন্দনবাজার

অনুমোদিত জামিন রাখিয়া ঋণ ও ওভার ড্রাফট, ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া হয়।

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ফোনঃ
ক্যাল-৬১১

ম্যানেজিং ডিরেক্টরঃ

মিঃ এম, কে, চক্রবর্তী

সরকা কা তো ভরে এতটুকু। তখন কনের পরেশদাদা নাক কোঁড়ে করে সরে নিয়ে আসবেন।" সহৃদয় মৃগ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল ববির দুই চোখ হইতে অশ্রুরা নামিয়েছে। বিস্ময়ের স্বরে পরেশ কহিল, "ওঁকি! দিছ কেন? লাগছে নাকি?" ববি নতমুখে ঠোঁট ঠোঁট গুটিয়া, ঘড়ি দড়িয়া 'না' জানাইল। পরেশ প্রশ্ন করিল, "তবে?"

বিনয় আসিয়া উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, "হ্যাঁ মা, জগছে?" ববি দাড়ি নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ। বাকিয়া দাড়িহীয়া বিনয় কহিল, "হয়ে গেছে, মা! অর দেরি নেই, এখনই ভাল হয়ে যাবে।"

পরেশ নীরবে ক্ষতস্থান ধুইয়া ঔষধ লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে বাহিরের দরজায় নারীকণ্ঠ শ্রুত হইল—“বউ রমণীস নাকি গো?” বিনয় পিছন ফিরিয়া তাকাইল। পরেশ প্রশ্ন করিল, “কে?” বিনয় কহিল, “শ্রীমতী বাননী।” পরেশ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া কহিল, “ভাই বাকি?” শ্রীমতী ঘরে ঢুকিতেই বিনয় কহিল, “এস পিসী।” শ্রীমতী হুজুে আসিয়া দুই চোখ কপালে তুলিয়া ভীতবরে কহিল, “হয়েছে কি?” বিনয় কহিল, “এই দেখ না পিসী শূকনো বিপদ—কাল রাতে ভাতের হাড়ি বমাতো গিয়ে পা পড়িয়েছে।” সূখদাও আসিয়া দাড়িহীয়া ছিল, তাহার দিক তাকাইয়া শ্রীমতী কহিল, “এত বড় মেয়ে—ভাতের হাড়ি নমাতো পারে না! মেয়েকে কিছু শেখানো নি নাকি বউ। দুদিন পরে শরশর হাড়ি ফেঁট হবো।” সূখদা কহিল, “সেই বরাত পারে তো, কাল কি রকম হয়ে গেছে।” কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “বিপদ যখন আসে, পিসীনা! তখন কি আনাড়ী-বুড়ী বাড়ে।” শ্রীমতী ঘাড় নতুনিয়া কহিল, “তা বটে।” একটুখানি হাসি হাসি হাসিয়া কহে পাশ দিয়া, চিনাইয়া চিবাইয়া কহিল, “তবে কি জানিস বউ, কাল যখন বিকেলে এলাম, যখন দেখি তোমার মেয়ে ধানো বাসে আছে, সাতবার ডাক দিইও সাড়া মিলে না। আমাদের গাঙ্গী সন্ধ্যা ছিল, জিজ্ঞাসা করে দেখিস ত কে, এমন কথা বিশ্বাস না কর তো—” মাঝে দাড়িহীয়া চোখ ঘুটাইয়া কহিল, “এই বসে, এমন সব সমস্যা যখন ফুটিতে থাকবে। তা না থেকে, এত ভাবনা পাতাল ভাবনা কি সরে ওর পলু দেখি? কিছু মান করিস না বউ! আমাদের ভাবনা সত্যে বসাই।” সূখদা মুখ কালি করিয়া শূককণ্ঠে কহিল, “আমি তেমন তো কিছু দেখি নি, পিসীমা! তবে কি জ্ঞানেন, ভাব ওর অভ্যাস—সবইটা পড়ে কিনা—একটু সময় পেলেই পড়ার কথা ভবে।” মাঝে টিপিয়া হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, “পড়াশনা করে যদি পড়ে মরতে হয় তো সে সব পড়া কব করা বউ! আমাদের গরিব ভেরেখের মধ্যে অত সব দরকার কি?” বিনয় হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “সত্যকাল যে দরকার হচ্ছে পিসি! পড়াশনা জানা মনে না হলে ছেলেরা বিস্মে করতে চাচ্ছে না।” অপর ও তেঁত সহযোগে অব্যাস্তক দুদিন করিয়া শ্রীমতী কহিল, “পছন্দ করছ না! এই যে আমাদের কমলা, বউ পাশ করেছে শুনি? পেরগার ভগও সবটা পড়ে নি বেদে হয়।” চোখের ইশারাও করিয়া কহিল, “তা তাকে পছন্দ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করনা তোমাদের এই ভাস্করবাটিকে।”

পরেশের কাজ সারা হইয়া গেল। উঠিয়া দাড়িহীয়া কহিল, “সামান আর জল আনুন কাকিমা, হাতটা ধুতে হবে।” পরেশ শ্রীমতীর দিকে তাকিয়া কহিল, “কি খবর দিদিমা! আজ সকালবেলাতেই এ পাড়ায় শাভাগমন।” শ্রীমতী মচকি হাসিয়া কহিল, “শাভাগমন কি সাথে হয় ভাই। গরজ বড় বলাই, তোমার সঙ্গে একটি কথা আছে।” পরেশ কহিল, “একটু দাঁজন, হাতটা ধুয়ে এক কাটা খেয়ে নিই।” শ্রীমতী গম্ভীর হইয়া কহিল, “নফ-ভাই, এত দেরি করা চলবে না। তোমার বোধ হয় দেরি হবে। একটি কথা—একবার এদিকে এসে শুনো বাও।” পরেশ শ্রীমতীর পাছ পাছ বাড়ির বাহরে আসিয়া রক্তার দাড়িহীল। শ্রীমতী কহিল, “পরের মেয়ের পদসেবা করছে—ও-দিকে আমাদের রাধা বে ছটফট করছে।” পরেশ কহিল, “মানে?” শ্রীমতী কহিল, “মানে আর কি? কাল তুমি চলে আসবার পরই ও আবার ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করলাম—কি লো, আবার এলি যে। তখন গরব করে চলে গেল। শ্যাম আমাদের রাগ করে চলে গেল, আর আসবে না বলেছে। তা শুনো কি ভয়, ভাই! মৃগখানি শাকিয়ে গেল। তা ভাই অজ বেরো, মাথার দিয়া দিগে বলে বাঁছ।” মৃগ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, “আর দেখ, মেয়েদের পা টিপতে যদি ভালই লাগে, তো পরের মেয়ের পা টেপবার দরকার নেই। এক বাটি তেল গরম করে রাখব, বতকশ প্রাণ চার আমাদের কমলার পা টিপনা বলে বলে।” বাইতে বাইতে মৃগ কানাইয়া কহিল, “মেয়ে কিম্বদ, লা গেলে মার করা কব না এ ছিটকো।”

ফিরিয়া আসিতেই বিনয় কহিল, “শুক বলছিল শ্রীমতী?” পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, “এমনই একটি কথা।” বিনয় চোখ পাকাইয়া কহিল, “ভারি শয়তান মাগা! পরের ছিট খোজাই কাজ ওর।” হাতে ধুইয়া চা খাইতে খাইতে পরেশ কহিল, “আজ আর বাকি তো খেতে দেবন না। একটি জ্বর হয়েছ—মনে হচ্ছে।” সূখদা শূকমুখে দাড়িহীয়াছিল, ঘাড় নাড়িয়া ‘হ্যাঁ’ জানাইল। কিছুক্ষণ পরে সূখদা কহিল, “কি সব যা-তা বলে গেল বান! আমরা ভয় হচ্ছে—এর পর বোধ হয় সারা গায়ে মেয়ের কুৎসা রটাবে। যা ভয় করি তাই হয় বাকি-বা; মেয়ের বিয়ে দেওয়া দৃষ্টেই হবে আমরা।” বলিতে বলিতে সূখদার কণ্ঠস্বর অশ্রুধন হইয়া আসিল। বিনয় সাহস দিয়া কহিল, “এত ভয় কিসের? মিথো কুৎসা রটালেই সবাই ওর কথা বিশ্বাস করবে কিনা।” সূখদা খুঁখুনে গলায় কহিল, “করবে না কেন শুনি? কেউ তোমাকে তোর কা করে? তুমি হালকা লোক বলেই তো সবাই যা-তা বলেতে সাহস করে তোমার মেয়ের নামে।” আরে আরও মেয়ের নামে বলুক দেখি? এই যে এত কথা মূখের সামনে বলে গেল, মুখ ফুটে কিছু বলতে পরলে তুমি?” পরেশ নীরবে চা খাইতে লাগিল; ববি নতমুখে বসিয়া মাদুরের উপর আঙুল ঘষিতে লাগিল।

ববির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া সূখদা কহিল, “ওই মেয়ের জন্যে আমাকে গরুর দড়ি দিতে হবে বোধ হয়।” ববির উদ্দেশ্যে কহিল, “কাল কি অত তুই ভাবাছিল লা? কিসের তোর জ্ঞান?” পরেশ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, “আপনার জ্ঞান, বাকিমা! কে কি বলে গেল, আর তা শিখাস করে আপনি তাকে দমকতে শব্দ করে দিলেন।” সূখদা কহিল, “না না না পরশ! এই পামাী আর মেয়েদের নিয়ে আর আমি শরাজ না। এদের কারও বৃদ্ধি নেই, বিবেচনা নেই, নিজেদের ওজন বুঝে চলা নেই। একা আমি কত সামলাই বল তো? তার উপর, এই রকম গায়ের লোক,—একটু ভাল কথা বললে যদি উপকার হয়, মরে গেলেও কেউ তা বলবে না; কিন্তু নিম্দের একটি নিম্নাতি পেল না।” বিনয় দিয়ে দিয়ে অনিন্দিত করে তুলিল। এত বড় মেয়ের যদি দুর্নীতি রটো তো এর কি বিয়ে হবে কেহে? দুর্নীতির ভয়ে তোমার মত ছেলেকে পর্যন্ত যখন-তখন বাড়িতে আসবে মানা করাওঁলাম, তুমি তো জানো না।” পরেশ নীরবে বসিয়া কহিল, বিনয় দাড়িহীয়া দাড়িহীয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সূখদা বিনয়কে কহিল, “শুভ!। কালই আমি মেয়েকে নিয়ে বাগের বাড়ি চালে যাই। পোষ পড়ল আর যাবো হবে না—মেয়ের বিয়ে দিতে পারি তো গায়ে ফিরব, না হলে আর ফিরবই না।”

(১১)

সেদিন সন্ধ্যার দ্বিতীয় প্রহর আকাশে পুরোশর যমক দুই দিক হইতে টানিত লাগিল। একদিক কমলার ঘোঁষা মণ্ডিত কমল মণ্ডল দেহের কণক পশপালাভের আবেশা, আর একদিক এক সম্বরী, শিকতা, আনন্দিকভাষাপা তরুণীর সহযোগিতার আকাশনা। দুই দিকেই টান সমান; কেহ ক হারও চেয়ে একটি নদ কম নয়। একবার মনে হইল, কমলার কাছে বাওয়াই ভাল। শ্রীমতী সকালে কথায়-বাড়ায়, হাসিতে ও চহনিতো যাহা জানাইয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, কমলা হয়তো আজ ঘরা দিবে; শ্রীমতী হয়তো আজও অব্যাস্ত যোগ দিবার জন্য জল আনিবার জলে বাহির হইয়া যাইবে, তখন সেই নিম্নদ ঘরে আস্তরকার সকল অস্ত সংবরণ করিয়া কমলা হয়তো তাহার বাহ্যবশেষের মাথায় সমর্পণ করিবে। বিবাহের পূর্বে ভাবী বধুর সহিত এই নিম্নদ সহযোগিতায় পাড়াগায়ে হিন্দু-ছেলের পক্ষে এমন একটি অভূতপূর্বে সৌভাগ্য লাভ যে, ভাবিতেও পরেশের সারাশেহে বিস্ময়প্রসূ হইতে লাগিল ও বৃকের রক্ত মলের মত ফেনিল হইয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ আগে মনে হইল কাজ নাই। কমলার সহিত তো এক মাস পরেই বিবাহ হইবে, তখন তো তাহাকে পরিপূর্ণভাবেই পাওনা গাইব। এত তাড়াতাড়ি তাহার কুমারী-সুলভ তিস্ত-মধুর প্রতিরোধ-প্রণয়ভাটিকে নিমন্ত করিয়া লাভ কি? সম্প্রতি বৈদ্যোদয়ী, নব-পরিচিতি, সঙ্গী মেয়েটির সংগচ্চা করাই স্বস্তিসংগত। মেয়েটি দুই দিন পরেই এখানে হইতে চলিয়া বাইবে বলিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহার সহিত আর হয়তো কখনও দেখা হইবে না। অথচ মেয়েটির কথার বাড়ায় দুখা গিয়াছে যে, সে তাহার বিরুদ্ধে একটি অসন্তোষের ভাব মনে মনে পেয়ে কঁকিয়েছে; সন্তোষের স্বারা সেই অসন্তোষের ভাবটিও



ডি-ডি মলম

কাপড়ে দাগ লাগেনা এবং স্নিগ্ধকর
খোস পাঁচড়া, ঢুলকানী,
দাদ, হাজা ও একজিমার
অব্যর্থ।

মূল্য প্রতি কোটা ১০০
—সোল এজেন্ট—

মহাত্মা এণ্ড কোং

জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
ফোনঃ—বি বি ৪১০১

জীবন বীমাপত্র

বর্তমান যুদ্ধসঙ্কট ও আর্থিক বিপর্যয়ের দিনে ভবিষ্যতের জন্য সাধামত সঞ্চয় করা সকলেরই কর্তব্য। একটী জীবন বীমাপত্র দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক আর তেমনই লাভজনক। 'ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স'কে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দিয়া আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন।

মিঃ জে সি দাশ, বি, এস্‌সি (ইউ, এস, এ), আর এ,
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান।

ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিমিটেড

হেড অফিস : ১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

হিন্দু ফ্যামিলি এন্ড ইট'স ফাণ্ড লিঃ

(প্রাচীনতমরূপী 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কর্তৃক ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত)

সঞ্চিত ধন—৩৪,৭৭,০০০। এ পর্য্যন্ত বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে—২২,০০,০০০।

এক্ষণে প্রতি বৎসর দেওয়া হইতেছে—১,০০,০০০।

এই ফাণ্ডে বৃন্দাবস্থায় নিজের এবং মৃত্যুর পর নিজ স্ত্রী ও আত্মীয় পোষ্যগণের ভরণপোষণের জন্য মাসিক বৃত্তির; শিশুগণের শিক্ষার বৃত্তির এবং বালিকাগণের বিবাহের ব্যবস্থা আছে, একফালীন থোক টাকা জমা দিয়া পরের মাস হইতে আত্মীয় পেন্সন পাইবার ব্যবস্থা আছে।

মহামাতা ভারত গবর্ণমেন্ট এই ফাণ্ডের যাবতীয় অর্থাদি রক্ষা করেন এবং ইহাকে কয়েকটি সুবিধা দেন। হিন্দু ফ্যামিলি ফাণ্ডের ভিত্তি এক্ষণে অতি দৃঢ়। ফলতঃ এই ফাণ্ডে যোগদান করা ও নিজ পরিবারের সাহায্যের ভবিষ্যৎ সুবন্দোবস্ত করা একই কথা।

ফাণ্ডের সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন—৫, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

নান্দহাভায়ে মুন্সি ফেলিয়ার জন্য তাহার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তাহা ছাড়া কাল স্পন্দ-পর্যটনের মধ্যেই মেয়েটির আলাপ ও আলোচনায় এমন একটি সরস অন্তরঙ্গতা ও তাহার আহ্বানের মধ্যে এমন একটি সহজ আন্তরিকতার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার সপলাভের জন্য মন ভিতরে-ভিতরে লোভাভুর ও হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর, তাহার কতবা-মুখি তাহাকে তাগিদ দিতে লাগিল। সে আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে মুশিক্ষিত; কেহ যদি কাণ্ডকের প্রয়াসে, মরিচাধারা চিকিৎসা-প্রণালীতে লুপ্ত না হইয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে সে অস্বীকার করিবে কেন? অবশ্য গ্রাম ও গ্রামান্তরের অনেক লোক এই কারণেই তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে (অবশ্য বিনা পারিশ্রমিকে), কিন্তু তাহাতে সে স্বেচ্ছাকৃত হইয়া উঠে না। কিন্তু এই সুন্দরী মেয়েটি তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, ইহা প্রার্থনা প্রণয়ন করিবার জন্য তাহার সারা অন্তর মুখ্যে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা নয়, বরং তাহার মনে হইতেছে, যি সে তাহার চিকিৎসা-বিদ্যা এই মেয়েটির উপর প্রয়োগ করিতে না পারে, তাহা হইলে সে বিদ্যা নিরর্থক। ইহা ছাড়া, আজ সকালে বহির অশ্রুশিখর বৃথাখান দেখিয়া অবাধি তাহার মনের মধ্যে একটি চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। রুক্ষমিনী সাংসারিক সুখ-সুবিধা বিবেচনা করিয়া সে তাহার মনকে মুখাইয়া জোর করিয়া কমলার দিকে একাগ্র করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু যখন হইতে তাহারই জন্য বহির হৃদয়ের নিগূঢ় বেদনা উপলব্ধি করিয়াছে, তখন হইতে তাহার মন লাভ ও ক্ষতির ন্যূনতন করিয়া হিসাব করিতে শুরু করিয়াছে। কাজেই যাহাদের লইয়া তাহার এই অন্তঃসন্দেহ, তাহাদের সাহচর্য অপেক্ষা যে নারীর স্বেচ্ছা তাহার জীবনে কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহার সাহচর্যই স্পৃহনীয় মনে হইল।

চারিটা বজিতে না বাজিতে পরেশ দাড়ি কমানাইতে বসিল। কাল সামাইয়াছে, আজ কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু গালে হাত দিয়াই মনটা চুড়ু, করিয়া উঠিল। সেবা বা কমালা জীবনে কেবল তাহারই সংগে থাকে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছে; তাহা ছাড়া তাহার পঞ্জীগ্রামের নান্য যাক হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাহার শিক্ষা ও দীক্ষায় এমনই মুখ্য যে, তাহা চাহার বা পোষাকের দ্রুতি তাহাদের লক্ষ্যই হয় না। কিন্তু এ সম্রাটী আজ্ঞাম শহরে বাস করিয়াছে, শিক্ষালাভ করিয়াছে, কত শিক্ষিত সীখন ও স্ত্রী যুবকের সহিত মিশিয়াছে। কাজেই তাহার নসিকা-গুণ এড়াইতে হইলে ফিটফিট হইয়া তাহার সম্মুখে হাজির হইতে হইবে। দাড়ি কমানিয়া, সাবান দিয়া হাতমুখ ধুইয়া, ধোপদস্ত কপড় ও রক্তের পাঞ্জাবি পরিয়া শাল গয়ে দিয়া সে যখন বাহির হইতে উদাত, মন সময়ে মাসীমা কহিলেন, “শ্রীমতী কিজন্যে ডেকে গেছে। তাছাড়া চেষ্টে ডাক্তারের বাড়িতে নমস্তর করে গেছে।” অনানন্দকভাবে পরেশ হিল, “আচ্ছা।” মাসীমা কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকিয়া থাকিয়া হিলেন, “কোথায় চলেছিস এখন?” পরেশ কহিল, “একটু কাজ আছে।” মাসীমা কহিলেন, “সাবি ঠিক মনে করে, ভুলিস না।” পরেশ জবাব না দিয়া বাহির হইয়া গেল।

স্কুলের সম্মুখ দিয়া যে পাকা রাস্তাটি পূর্বদিকে বরাবর চলিয়া গাছে, সেই রাস্তা দিয়া স্কুল পার হইয়াও মাইলখানেক গেলে, রাস্তার মদিকে একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ির সদর-দুজা রাস্তার উপর নহে। পাকা রাস্তা হইতে একটি অপ্রশস্ত কাঁচা রাস্তা বহির হইয়া বাড়িটির দেওয়ালের পাশ দিয়া গিয়াছে; এই রাস্তা দিয়া কয়েক মিনিটেই প্রথমে পাড় বাড়িটির সদর-দুজা, তারপর দর ও কতকটা গেলেই বাড়িটির গায়েই একটি ছোট একতলা বাড়ি। বাড়ি দুইটির ভূতপূর্ব লিখ—এ তরোটার একজন মনী বসি ছিলেন। বৎসর পনেরো পূর্ব-মি গতস্ হইয়াছেন। তাহার সন্তান বল্লভ মাত্র একটি কন্যা ছিল; বার কলিকাতায় কোন এক মনী পরিবারে বিবাহ হইয়াছে। স্বামী ও মেয়েদের পাড়াগাঁয়ে পদার্পণ করা পণ্ডিত করে না বলিয়া মেয়েটি এখানে বসিতে পারে না। স্থানীয় একজন লোকের উপরে বাড়ি ও জমিদারির মতো পারে না। একতলা বাড়িতে হেডমাস্টার মহাশয় নমস্তর ভাড়া বাস করেন। বাড়িটির সম্মুখে বিস্তৃত ধানের জা, পিছন দিকে এক ঘর চাষী কৈবর্ত ও বউরী-বাগদীর বাস। ইহারা সকলেই এই পরিবার প্রজা।

পরেশ বাইকে চড়িয়া জড়িয়ে হেডমাস্টারের বাড়ির সামনে সিয়া উপস্থিত হইল। বারকয়েক ঘণ্টা বাজাইতেই একটি বৎসর ছয়ের ছেলে দমজার আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমি বাবা বাড়িতে আছেন, খোঁজা?” ছেলেটি বড় বড় চোখ মেলিয়া

চাহিয়া থাকিয়া নীরবে মাড় নাড়িল। পরেশ মুখকিলে পড়িল। “মা আছেন?” বা “মাসী আছেন?”—প্রশ্ন করা যুক্তিবদ্ধ হইবে কি না ভাবিতে লাগিল। ছেলেটি কাছে আসিয়া কহিল, “আমাকে আপনার গাড়িতে একবার চড়িয়ে দিন না।” পরেশ কহিল, “উহু—গাড়ি চড়ানো চলবে না—তোমার মাসীমা বকবেন।” ছেলেটি চোখমুখ ঘুরাইয়া কহিল, “মাসীমা জানবেন কি করে? তিনি তো বাড়ির ভিতরে।” পরেশ কহিল, “জানতে পারলে বকবেন; তুমি তার মত জিজ্ঞেস করে এস।” ছেলেটি কহিল, “কি বলব?”

“বলবে ডাক্তারবাবুর গাড়িতে চড়ু?” ছেলেটি অবিশ্বাসের সুরে কহিল, “আপনি কিসের ডাক্তারবাবু—আপনার দাড়ি নেই।” পরেশ কহিল, “আছে হুকিয়ে রেখেছি। পরে পরব, দেখবে। তুমি যাও না।” ছেলেটি চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মাসী বাহির হইয়া আসিল। পরেশকে দেখিয়াই তাহার চোখ ও মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; নমস্কার করিয়া কহিল, “এসেছেন? আমি বিশ্বাস করতে পারি নি আসবেন বলে। আসুন আসুন।” সাইকেলটা দেওয়ালে ঠেসাইয়া রাখিয়া পরেশ লাক্ষিতমুখে কহিল, “আপনি নিমন্ত্রণ করেছেন, আসব না? আমাকে ভাবেন কি?” মৃদু হাসিয়া আরতি কহিল, “কি ভাবি, পরে বলব।” বৈঠকখানায় পরেশকে বসাইয়া আরতি কহিল, “বসুন, আসি।”

আরতি আজ আসমানী রঙের ঢাকাই শাড়ি পরিয়াছে; রূপালি সজ্জা দিয়া আধ-ফোটা পদ্ম ফল তোলা পাড়; গায়ে ফিকে নীল রঙের ব্লাউস; পায়ে চটি; মাথায় লম্বা বেণী দুলিতেছে। কাল লঠনের আলোতে বেশ ঠাণ্ডা হয় নাই, আজ দেখিল, বেশ ফর্সা রং, নেহাৎ ছিপছিপে নয়—বেশ কোমল, (অবশ্য আন্দাজে) মংসল দেহ।

কিছুক্ষণ পরে আরতি ফিরিয়া আসিল; সঙ্গে আর একটি মহিলা—ফর্সা রং, ছিপছিপে গঠন, মুখের চেহারা মাঝামাঝি, বলস টিপের কাছাকাছি। তাহারের আসিতে দেখিয়া পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। আরতি কহিল, “আমার দিদি—শ্রীমতী সুনীতি দেখা।” পরেশ নমস্কার করিল। মহিলাটিও নমস্কার করিয়া কহিল, “দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।” পরেশ বসিতেই সুনীতি ও আরতি বসিল। সুনীতি আরতিকে কহিল, “তোমার জামাইবাবুকে ডক্টরে পাঠিয়ে দে।” আরতি চলিয়া গেলে সুনীতি কহিল, “উনি কিদিন থেকেই আপনার সংগে দেখা করবেন ভাবছেন, সন্মত করতে পারেন নি। কাল যখন ভাগ্যে আরতির সংগে আপনার দেখা হয়ে গেছে।” পরেশ চুপ করিয়া রহিল। সুনীতি কহিতে লাগিল, “আরতি কামাস ধরেই ভুগছে, যেখানে ছিল সেখানের ডাক্তারদের দেখিয়েছিল—কোন ফল হয় নি। তাই এখানে চলে আসে। এখনে কার্তিক ডাক্তার এতদিন দেখাছিলেন; বিশেষ কিছু ফল হয়েছে বলে মনে হয় না। বিনয়বাবুর কাছে আপনার প্রশংসা শুনে আরতির খুব ইচ্ছে আপনাকে নিয়ে চিকিৎসা করাতে। তাছাড়া কাল আপনাকে দেখে ওর নাকি বিশ্বাস হয়েছে আপনার হাতে ও সেরে উঠবে। আপনি যদি দয়া করে—” পরেশ প্রশ্ন করিল, “কি হয় ওর?”

সুনীতি জবাব দিল, “বুক ধড়ফড় করে, মনের মধ্যে কি রকম বে হয় বুঝতে পারে না, কখনও চেষ্টায় কাঁদতে ইচ্ছে করে—কোন কোন দিন সারাদিন গুম্ হয়ে থাকে, কারও সংগে কথা বলে না, সেইদিন মুচ্ছা হয়।” ঢোক গিলিয়া কহিল, “আমি সব হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারলাম না, আপনি একবার নিজে জিজ্ঞাসা করবেন।” পরেশ প্রশ্ন করিল, “জীবনে কি কোন আঘাত পেয়েছেন?” সুনীতি কহিল, “আঘাত,” ঘাড় নাড়িয়া বিষয় কণ্ঠে কহিল, “তা অবশ্য পেয়েছে। অতি অল্প ধরনে মা মারা যান। ওর বাবা আবার বিয়ে করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই দ্বিতীয়পক্ষের দরগ সংসার নিয়ে এমনই জড়িয়ে পড়েন যে, ওর গৌরব-বহর করতে অবসর পাননি। ওর মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই ও ওর মাসীমা অর্থাৎ আমার মায়ের কাছে মান্য হতে থাকে, লেখাপড়া শেখে। ও যে বৎসর বি-এ পাস করে, সে বৎসর আমার মা মারা যান, তাতে আমাদের চরেও ও বেশি আঘাত পায়। কিন্তু ভারী শত্রু মের ও; কোন আঘাতই বেশি দিন ওকে কবু করে রাখতে পারে না। ও বি-ট পড়তে সুরু করে এবং পাস করে এক মহৎস্বল শহরের স্কুলে চাকুরী পেয়ে কলকাতা থেকে চলে আসে। ও যে স্কুলে চাকরি করে, সেটি নতুন স্কুল, মেয়েদের বেড়িং নেই। স্কুলের কাছে একটা বাড়িতে শিক্ষয়িত্রীরা এক সংগে থাকে। ওর সংগে একঘরে আর একটি মেয়ে থাকত, ওরই নীচে কাল কলস। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ও দেখে মেয়েটি গলায় দড়ি বিরে আত্মহত্যা

করেছে। সেই দেখেই ও মুর্ছিত হয়ে পড়ে, তারপর থেকেই এই রোগের লুপ্তপাত।”

অরতি আসিয়া কহিল, “পাঠিয়ে দিলাম দুখের মাকে।”

“মুশ কতক ভস বস্তু আমি আস একটু” বলিয়া সুনীতি উঠিয়া চলিয়া গেল।

দুইজন দুপ করিয়া বসিয়া কহিল। থোকা আসিয়া কহিল, “আরও একটু পানি পান করুন। আমার কাপড়ের কাছে টাণিয়া আসিয়া কহিল, “আরও পানি, সম্প্রতি আমার কোলে ঢেঁ দেব।” বলিয়া ওরও কোলের দিক দিয়া গিয়া কহিল। অরতি গম্ভীর মুখে কহিল, “আরও পানি পান করুন। কাপড় নত হয়ে যাবে।” পরেশ মনে মনে চমকিয়া উঠিল, “তবু মুখে কহিল “মাক না।” অরতি থোকের দিকে তাকিয়া কহিল, “আরও পানি পান করুন। আমি খোকা” থোকা, আনিয়া সবেও না। মনে কহিল, “আরও পানি পান করুন।” থোকা ভয়ে ভয়ে কহিল, “আমাকে কেমন হো পরেশ।” পরেশ কহিল, “হ্যাঁ নিশ্চয়।” থোকা চলিয়া গেল। পরেশ কহিল, “কেন শব্দ শব্দ হোটা হোটা?” অরতি হাসিয়া কহিল, “হ্যাঁ বেশ শব্দ শব্দ হোটা হোটা।” চোখ ও মুখের অপরূপ সন্দের ভঙ্গী করিয়া কহিল, “ভারী দুটো। জামাইবাবুকে পয়সে ভর করে না, শুধু আমাকে ভর করে।” পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, “তাই হো সখসখ—এটা কিন্তু একটুখানি ব্যতিক্রম।” ভুরু কুচকাইয়া অরতি কহিল, “কেন?” পরেশ কহিল, “হেলেয়া সাধারণতঃ মায়ের চেয়ে মাসীর কাছে বেশি মায়ের পায়; জামেন না, কথায় আছে—মায়ের কাছে কিসাভু—মাসীর কাছে বাস। আদর।”

ক্ষণ ক্ষণের সাহিত অরতি কহিল, “তাই নাকি! জানতুম না।” অপ্রতিভতার হাসি হাসিয়া কহিল, “হেলেমেয়েয়া আমাকে একটু ভয় করে—মাসীর কাছ কি না।” একটু দুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “আপনি মাসীর আপনাকে মাসীর ভয় করে না।” পরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল, “আমার তো মা নেই—”

“বাবা?”

“তিনি তো মা! আগেই মায়া গেছেন।”

অরতি মৃদু বিষম হাসি হাসিয়া কহিল, “আমারও মা মারা গেছেন, বাবা থেকেও নেই, মাসীমারা বাড়িতে মানুষ হয়েছিলুম আমি মাসীমাও বৎসর দুই হ'ল চলে গেছেন।” কথাবাতীর বিষয়বস্তু বদলাইয়া দিবর জন্য পরেশ কহিল, “কতদিন ঢাকার করছেন?” অরতি জবাব দিল, “এক বৎসরের চেয়ে কিছু বেশি।”

“ছাউ নিয়েছেন বাব?”

“হ্যাঁ, শরীরটা খুব খারাপ হতে লাগল। সেক্রেটারী মশায় বললেন—ছাউ নিয়ে শরীরেরে আসুন। কোথায় আর যাব? মাসীমা নেই—মোশামশায়ের বাড়িতে তো এখন বউদিদিদের সাক্ষর—কাজেই দিদির কাছে এলাম।”

এমন সময়ে হেডমাস্টার মহাশয় আসিয়া হাজির হইলেন। পরেশকে দেখিয়া পরন আপনমনে সাহিত কহিলেন, “এই যে ডাক্তার আচার্য। এসেছেন দয়া করে! নমস্কার।”

পরেশও নমস্কার করিল। অরতি উঠিয়া দাঁড়াইতেই হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, “তুমি উঠলে কেন? বস, আমি কাপড় ছেড়ে আসি।” অরতি বিনীতভাবে পরেশকে কহিলেন, “একটুখানি আস ছা।”

অরতি কহিল, “আমিও বাসিছ একটু, ডাক্তার আচার্য।” বলিয়া চলিয়া গেল। কিংবদন্ত পূরে হেডমাস্টার মহাশয় আসিলেন; বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ, গম্ভীর উজ্জ্বল-শরীর, দীর্ঘ দেহাঙ্গ গঠন; মথার মাঝখানে টাক পাড়িতে শব্দ, করিয়াছে, কিন্তু সামনের চুল পিছন দিকে উল্টাইয়া দিয়া টাক পাড়িতে চোটা করিয়াছেন। পরিমানে দুই, ত্র্যানলের সার্ট, পায়ে চোটা। মুখের চেহারা ভারিই ধরণের, কিন্তু প্রয়োজনমত গুরু, গাম্ভীৰ্য বা হালকা হাসি দুই ফটাইতে পারেন। বাসিয়া কহিলেন, “প্রায়ই ভাবি আপনার সঙ্গে হালকা করে আসব, কিন্তু এমনই কক্ষে ভিত্তি যে, সময় কখন উঠতে পার না। কাল অরতি এসে বললে—আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে দিনকানুই বাড়িতে। আপনাকে নেমস্তন করে এসেছে। বিনয়বাবুর মেসেজটি কেমন আছে?” পরেশ কহিল “ভালই।”

“বিনয়বাবু তাই বলছিলেন—খুব প্রশংসা করছিলেন আপনার।”

পরেশ কহিল, “আমাকে বরাবরই খুব স্নেহ করেন।”

“শুধু স্নেহ নয়—প্রশংসাও, মহাভক্ত একজন আপনার। মাকে মাকে এই নিয়ে খনখানাবাবুর সঙ্গে হাতাহাতি করে যায়।” বলিয়া হেডমাস্টার

মহাশয় হাসিতে লাগিলেন। পরেশও মৃদু, মৃদু হাসিতে লাগিল। হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, “আরতির কাছে ওর রোগের কথা শুনেছেন?” পরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল, “মিসেস বেস বলছিলেন।” হেডমাস্টার চিন্তিতমুখে কহিলেন, “একটা কি শক পেয়ে ওর ওই রোগ আরম্ভ হয়েছে। চিকিৎসেও অনেক হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সেরে উঠছে না। ওর ইচ্ছে আপনার চিকিৎসায় চিকিৎসা দেন করুক খে—”

অরতি দুই হাতে দুই খাবারের থালা লইয়া হাজির হইল। একটা থালা ঢাকার আনন্দ দুইটা কাচের প্লাসে করিয়া জল। টোবলে নামাইতেই পরেশ কহিল, “ওরে বাবা। এ কি কাড় করেছেন।” অরতি আড়চোখে চাহিয়া মূর্তাক হইয়া কহিল, “এমন কিছু সাংঘাতিক নয়—কাল তো লেট না খেতে পেতে দুঃখ করছিলেন।” পরেশ হাসিতে লাগিল। ঢাকার হাত ধুইবার জল আনিয়া হাজির হইল। অরতি কহিল, “উঠুন হাত ধুয়ে আসুন। জামাইবাবুর ক্ষিপেয়ে পেট চোঁচো করছে—লক্ষ্যের মুখ ঘুটে বলতে পারছেন না।” পরেশ চট করিয়া ভাতিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “তাই নাকি? ভারী দুঃখিত।” বলিয়া হাত ধুইতে গেল। হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, “আপন বাস্তব হবেন না। ধীরেস্থ হাত ধোনা। অরতি হাল্কাভাবে কহিল, “বাবো। আপনার ক্ষিপে পায়নি ওর ঘনঘন চোক গিলছেন তো।” হেডমাস্টার মূর্তাক হাসিয়া কহিলেন, “আমিও পেয়েছি, চোকও গিলছি, তবে সেটা লোক নয়—মানসিক—সামনের খাবা খুব লোকনীয় কি না।” বলিয়া অখ সূচক চাক্ষের ইঙ্গিত করিতেই লক্ষিত মুখে তজ্জন করিয়া অরতি কহিল, “ইয়ারাক হচ্ছে বাবো! দেব দাঁদিরকে বলে—”

ভোয়ালে দিয়া মুখ দুই হাতে মুর্ছিতে আড়চোখে ইহাদের দিকে তাকাইয়া পরেশের মনে হেডমাস্টারের প্রাতি স্বর্বাধিত হইল।

পরেশ আসিয়া বসিতেই অরতি কহিল, “এর খেতে আরম্ভ করুন। হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, “আর আমি?”

“বাবো আপনারকে আবার বলতে হবে নাকি?” অরতি করুণাক্ষে তাকাইয়া হেডমাস্টার মহাশয় কহিলেন, “বলতে হবে না? পূরনো বলে এমনই ফালনা হয়ে গেছে? বেশ, নিজে হতেই খাচ্ছে।” বলিয়া খাড় গুঁজিয়া খাইতে সুরু করিলেন। অরতি একটা চোয়ারে বসিল। সুনীতি আসিয়া হাজির হইল, দুই হাতে দুই পেয়লা চা। পেয়লা দুইটা টোবলে নামাইয়া দিয়া কিছক্ষণ স্বামীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, “ওকি হচ্ছে। একেবারে ঘাড় গুঁজে ঘরে চলেছ যে। পরেশবাবুর সঙ্গে কথাবাতী বও।” অরতি হাসিয়া কহিল, “রাগ হয়েছে।” সুনীতি ছু কুচকাইয়া কহিল, “কেন?”

“আমি ওকে খেতে বলি নি, অখ পরেশবাবুকে বলিছি।” সুনীতি কহিল, “ওহ! তাই! ওই হচ্ছে আর কি বড়োবয়সে।” হেডমাস্টার কাটতে ঘাড় তুলিয়া প্রতিবাদ করিলেন, “কে বড়ো।” সুনীতি কহিল, “তুমি, আর কে?” বলিয়া মুখে টাণিয়া হাসিতে লাগিল। হেডমাস্টার ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, “বড়ো বই কি। পরেশবাবুকে জিজ্ঞেস কর দেখি, আমাকে বড়ো বলেন কি না।” পরেশের উদ্দেশে কহিলেন, “হ্যাঁ মহাশয়, বলুন না।” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, “না। হেডমাস্টার চোখ ঠারিয়া কহিলেন, “দেখছ।” বলিয়া টেট দুইটা চাণিয়া এক দুটে পত্রীর দিকে তাকিয়া রহিলেন।

অরতি কহিল, “আপনার সাক্ষীকে আগনি জ্বেস দিয়েছেন। আমি বরাহি—আপনি বড়ো হয়েছেন, আপনার চুলের শতকরা পঞ্চাশটিতে পাক ধরেছে—আমি তো কাল আপনাকে দেখিয়ে দিলাম।” হেডমাস্টার মহাশয় পরেশেরাভ বেস কহিলেন, “ধরুক, চুল পাক ধরলেই বয়স হয় না—আমার মনে একেবারে বাচা চেস্টেস—”

খাওয়া শেষ হইতেই অরতি কহিল, “হাত ধোবেন নাকি?” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া ‘হ্যাঁ’ জানাইল।

“চলুন”—বলিয়া সঙ্গ গিয়া অরতি পরেশের হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল।

অরতির মুখ পরেশের মুখের পাশেই। তাহার চুল হইতে একটু মৃদু স্বেদন নাকে আসিতে লাগিল। তাহার চিঞ্চ ও মসৃণ গাল, ঘাড়ের পাশটা ও ব্র উসের সীমান্তের উপরে বুকের কতকটা বর্জস্বিত দেখা বাইতে লাগিল। তাহার পূর্ণবিকশিত নারীদেহের মাদুরতামর সান্নিধ্য পরেশের মনের মধ্যে একটা লোশা সত্তার করিতে লাগিল।

হাত ধোয়া হইলে অরতি তাহার বামবাহু হইতে বলালো তোরলেস

আগাইয়া দিল। পরেশ সন্তপণে তোলোটা তুলিয়া লইল; তারপর মূখ মুছিয়া তোলোটা ফিরিয়া দিবার সময় অধির হাতে তাহার হাত ঠেকিল এবং সেই মুহূর্তেই আরাতির হস্তোৎসর্গ চোখের সাহিত তাহার চোখ মিলিল।

ফিরিয়া আসিয়া চেয়ে বসিয়া চা খাইতে খাইতে পরেশ সুনীতিক কহিল, “আমাদের তো খুব খাওয়াছেন; নিজেরা তো কিছু খেলেন না।” সুনীতি মৃদু হাসিয়া কহিল, “আমরা খাব এখন।”

হেডমাস্টার মশায় আহার সমাপনান্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আরতির দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আমার হাতে জল ঢেলে দেবে না?” আরাতি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না, আপনি নিজে খেন গিয়ে।” স্বরীর দিকে তাকাইয়া হেডমাস্টার কহিলেন, “দেখ গো! কি রকম একত্রেখাম, এতে রাগ হয় না। তুমিই বল না।” সুনীতি কহিল, “নিজেই খাও না বাপু!” হেডমাস্টার কহিলেন, “বেশ। নিজেই খুঁজি। কিন্তু হাত থেকে ঘটি পড়ে গিয়ে যদি পা ছোঁত যায় তো, চুন-হলুদ লাগিয়ে দিতে হবে আরতিকে।” আরতি শিখাশিখা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “দায় পড়েছে।” জনস্রবণ বজ্রমার মত কলকঠের হাসি শুনিয়া পরেশের মুখটা শিরশিধ করিয়া উঠিল।

সুনীতি স্বামীকে কহিল, “তোমার চা রইল—আমি আসছি।” আরতিও বাহ্যিক উপদ্রব করিবেই হেডমাস্টার কহিলেন, “চলে যাচ্ছ যে!” আরাতি খমকিয়া দাঁড়াইয়া একতরঙ্গী সহকার কহিল, “কি করতে হবে?” হেডমাস্টার কহিলেন, “কিছু না, চা খব, বসে খাস একটু, দেখবে না।”

“দায় পড়েছে” বলিয়া মুখের অপরূপ ভঙ্গী করিয়া আরাতি চলিয়া গেল।

হেডমাস্টার মশায় চা খাইতে খাইতে কহিলেন, “ছেলেমানুষি দেখে কিছু মনে করবেন না। এককম করলে ওর মনটা ভাল থাকে। না হলে গুম হয়ে বসে থাকে কি ভাবে।” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “কাজ যেন অনেকটাই হালকা ভাল দেখাইছে।”

পরেশ কহিল, “সেজ্ঞাতে নিয়ে যান না কেন?”

“আমার তো সময় হয় না, আমার স্বরীরও ভাই। তবে যোকাকে নিয়ে ও কাছাকাছি মাঠে একটু ঘোরাফেরা করে।”

“আমার মনে হয় কেউলে হঠাৎ উপকার হতে পারে।”

হেডমাস্টার চিন্তিতমুখে কহিলেন, “সেখি, কাজের ভিত্তিতে কেটে যাক—বড়দিনের ছুটিতে নিজেই চেষ্টা করব।”

থোকা আসিয়া হাজির হইল। বাবার কানে কানে বলিল অশ্রু পরেশও শ্রুতিতে পাইল। “মা বদলেন, বেড়াতে যাবেনা?” থোকায় বাবা কহিলেন, “ডাক্তারবাড়ি রসেলেন, ওকে ফেলে?” পরেশ কহিল, “তাতে কি আর হয়েছে। আমার মিস মিটার সম্বন্ধে যা যা জানা দরকার জেনে নিয়াছি—একটু ভেবেচিন্তে শুধরে রাখা করে দেব। কাজেই আমি এখন বাড়ি চলে।” বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই হেডমাস্টার মশায় কহিলেন, “আপনার কি বাড়িতে বিশেষ কাজ আছে?” পরেশ আমতা আমতা করিয়া কহিল, “না, কাজ আর কি—”

“তা হলে চলুন না—একটু ঘুরে আসা যাক।”

“বেশ, চলুন।” বলিয়া পরেশ বসিল।

হেডমাস্টার মশায় থোকাকে কহিলেন, “যাও, বাড়িতে বলগে—উঠার পাও যাবেন।”

আরাতি ও সুনীতি বাহির হইয়া আসিল—কেশ-বেশ প্রায় পূর্ববৎ; বাড়তি—গায়ের রঙিন স্কার্ফ ও পায়ে হিল-তোলা জুতা, সকলে বাড়ির বাহির হইল—থোকাকে লইয়া মেসোরা আগে, পরেশ ও হেডমাস্টার পিছনে। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়া মেসো চলিল। কিছুদূরে গিয়া রাস্তা আরও অপারদূর হইয়া আসিল, ডানদিকে সারি-সারি বাঁশের বাড়ি, বামদিকে গভীর ক্ষেত। আরও কিছুদূরে গিয়া তাহার মাঠের মধ্যে পড়িল; সরু আইলের পথে দুইজন পশাপাশি যাওয়া যায় না। তাহার লম্বা সারি বাঁশিয়া চলিতে লাগিল। তাহার ডান ও বাম দুইদিকেই সব, গম ও সারিবার বিস্তৃত ক্ষেত—সব ও গমের গাছ শিশু আসিয়াছে, সারিবার ক্ষেতে অজস্র সরিয়া-ফলে ফুটিয়াছে; এক-একটা দাঁড়বার ক্ষেত যেন এক-একটা হরিদ্রাবর্ণের বিস্তৃত কোম্পট। মাঠ পার হইয়া তাহারা একটা আম-কাঠালের বাগানে গিয়া পৌঁছিল; গাছে-গাছে কুলায়-প্রতাগত পখীসর কলরবে সারা বাগান মধুরিত। বাগানের একধারে একটা পুকুর, চারি পাড়ে বাবলা গাছের জঙ্গল। পুকুরটার পাশেই একটা চালাঘর; জৈষ্ঠ, অশ্বি মাসে যখন আম-কাঠালের গাছে ফল ধরে, মালী মাস তিন-চার ধরিয়া ঐ ঘরটিতে বাস করে।

যমুনের বাঘ দিয়া একটি সরু, পারে-চল্ল পথ বাগান পার হইয়া

ওপারের মাঠে গিয়া পড়িয়াছে। সেই পথ দ্বারা সকলে চলেতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সঙ্গী বদল হইয়াছিল—হেডমাস্টারকে থোকা টানিয়া লইয়া গিয়া মাসের সাহিত মিলিয়া দিয়াছিল, আরাতি পিছনে পড়িয়া পরেশের পশ্চাৎবাহত নী হইয়াছিল।

আরাতি বোধ হয় পাড়াগাঁ অনেকদিন দেখে নাই; অবদারের সুরে হরেক রকমের প্রশ্ন করিতে লাগিল—ও গাটো কি? ও ফুলটা ভারী সুন্দর তো! কি ওর নাম? কেমন চমৎকার একটা পাখী উড়ে গেল দেখলেন! কি নাম বলুন দেখি ওর? ইত্যাদি ইত্যাদি। পরেশ যথার্থ্য প্রশ্নের উত্তর দিতোহল। এই সুন্দরী মেয়েটির সাহচর্য বিস্ম, বিস্ম, রসকরণ করিয়া তাহার হৃদয়-পার ভরয়া দিতেছিল।

পশ্চম দিগন্তে সূর্য অস্ত যাহেতেছে; সারা আকাশটা আবারের মত রাতা; পূর্ব দিগন্তে ঘন কুহেলিকায় অস্পষ্ট; ভিজা মাটির সম্পর্ক হওয়া কখনো তাড়া হইয়া উঠিয়াছে। আরাতি সবুজ রঙের স্কার্ফটি ঘনতর করার জড়াইয়া কহিল, “শীত করছে।” হেডমাস্টার ও সুনীতি অনেকটা দূরে আগিয়া গিয়াছিল। আরাতি পরেশকে কহিল, “জামাইবাৎকে ডাকুন না।” পরেশ কহিল, “ওর পুরা নাম তো জানি না।” বিশ্ময়ে দুই চোখ বড় করিয়া আরাতি কহিল, “আজ্ঞা মানুষ তো আপনি! এতকণ আপন করছেন, ডাক করে নাম জিজ্ঞাসা করেন নাই?” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া “না” জানাইল।

“এর আগে ব্যক্তি আলাপ ছিল না?”

পরেশ লাজতমুখে কহিল—না—

“কিন্তু ডান তো আপনার সব জানেন।”

“তাই তো দেখাচ্ছে।” চোক গিলিয়া কহিল, “ওর পুরা নাম কি?”

আরাতি গম্ভীরমুখে কহিল, “হাবলবান্দু বোস—ডাকুন ওই নাম ধরে।” পরেশ হাঁকিল—“হাবলবান্দু!” হেডমাস্টার মশায় সাজা দিলেন না। পরেশ কহিল, “সাজা দিচ্ছেন না তো?” আরাতি ভ্রূ দুটি কিঞ্চে তুলিয়া কহিল, “আপনি ডাকতে পারছেন না—বেশ কালই দিয়ে ডাকুন দেখা।”

পরেশ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, “সে আবার কি?” আরাতি হাস চাপিয়া কহিল, “জানেন না—ডাকার মত ডাকলে সুরে ভগবান পথ্যত সাজা দেন—আমদের হাবলবান্দু তো যামান মানাযা। আর একবার উকুন দেখ বেশ করে।”

পরেশ ভতকতে ডাক দিল, “হাবলবান্দু—উ—উ—” কোন সাজা মালিল না। আরাতি ডাকিল, “দাদা!” সুনীতি কহিল, “বাল্যা দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইল—

হেডমাস্টারও দাঁড়াইলেন। আরাতি কহিল, “পরেশবাৎ, যে জামাইবাৎকে ডাকছেন, শুনতে পাচ্ছে না?” দুইজনে কঁকরল। কাছ আসিতেই আরাতি কহিল, “কত-নিগম্বীর কি এমন আলাপ হাঁকিল শুন, যে একজন ভরলোক ডাক দিলেও শুনতে পান না।”

হেডমাস্টার মশায় লাজতমুখে পরেশকে কহিলেন, “ডাকছিলেন নাকি! শুনতে পাই নি—মাাপ করবেন।”

পরেশ কহিল, “তাতে আর কি। চলুন এর পর ফেরা যাক।”

আরাতি কহিল, “না না, এখনই না—চলুন ওই পুকুরটা দেখিগে।”

হেডমাস্টার কহিলেন, “না না, এখন আর পুকুর দেখতে হবে না—এখকার হচ্ছে—একি চল।” আরাতি চৌতি ফুলাইয়া কহিল, “বেশ চলুন।” পরেশ কহিল, “তাই একবার চলুন না, হাবলবান্দু! যখন দেখতেই চাচ্ছেন।”

হেডমাস্টার বিনীত হসো কহিলেন, “দেখুন আমার নাম হাবলবান্দু নয়, এখন আপনার যদি ওই নামই আমাকে ডাকতে ভাল লাগে তো ডাকতে পারেন।” ঘাবড়াইয়া গিয়া পরেশ কহিল, “তাই নাকি! তবে যে উনি

বলেছেন—” হেডমাস্টার ব্যাপারটা ব্যাঙতে পরিয়া কহিলেন, “ও ঠিকই বলেছে; ওর নিজের নাম ‘হাবলী’ কিনা—সে দিক দিয়ে আমাকে হাবল বলে ডাকাই উচিত, তবে আমার পিতৃদেও নাম—সত্যোদ্র, পদ্মবা যোস।”

আরাতি স্কার্ফ দিয়া কহিল, “বা রে! আমার সঙ্গ কি? আমি তো ওকে ঠিক নামই বলেছিলাম। উনি বললেন, ওর চেহারা দেখে অত বড় নাম বলে মনে হচ্ছে না—ওর নাম নিশ্চয় হাবলবান্দু।”

পরেশ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, “কই, আমি তো তা বলি নি।”

সুনীতি কহিল, “ওর কথা ছেড়ে দিন পরেশবাৎ! ওই রকম।” আরাতি অভ্যাসের সুরে কহিল, “বেশ। আমারই সা দেখা।” বলিয়া গতি গতি করিয়া পুকুরটার দিকে চলিল। সুনীতি কহিল, “কোথায় যাচ্ছে?”

আরাতি নীরস কণ্ঠে জাব দিল, “দেখতেই তো পাচ্ছ পুকুরে।” সুনীতি কহিল, “না না, আজ আর না।” আরাতি চলিতে লাগিল, বাধা হইয়া সকলে তাহর অনুসরণ করিল। সত্যেনবাবু কহিলেন, “রোহিণীর মত জলেই ডুববে নাকি? অবশ্য গোবিন্দলাল কাছেই হাজির—ফাস্ট—এজের

শারদীয় উৎসবে

রূপ-সাধনার

প্রধান অর্ঘ্য



শ্রীকল্যাণ

মহাসুগন্ধি কেশ তৈল

ডেম কেমিক্যাল : কলিকাতা

ফান হুট হবে না।" বমাকিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় ফিরাইয়া আরতি তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "কি বললেন?" ডাঙা বাঁ দিয়ার সহিত ডাঙারকে যত করিয়া জ্ঞানত বহুবার অন্য রকম অর্থ করিয়াছে বমাকিয়া সত্যেন্দ্র ভাড়াডাড়ি কহিলেন, "বলছি রোহিণীর চেতনা সত্যের জন্য গোবিন্দলল যা যা প্রতীক্ষা করেছিল—সব ঠিক ঠিক করবার জন্য আম প্রস্তুত।" আরতি মুখ ফিরাইয়া বাড়ির দিকে চলিল।

কৃষ্ণত নীল আকাশ হইতে তরল অন্ধকার করিয়া করিয়া পৃথিবীর বুকে জমিতে শব্দ করিয়াছে। দূরে মাঠের মধ্যে কতগুলো শৃগল ঢাকিয়া উঠিল, পুকুর হইতে কয়েকটা বক সোঁ সোঁ শব্দে উড়িয়া আসিয়া একটা গাছের তলে বসিল; 'কি'র পোকার একটানা একতান কানের মধ্যে সূতের মত বিধিত লাগিল।

বাড়ির সামনে আসিয়া পরেশ কহিল, "আমি এবার চলি, নমস্কার।"

সত্যেন্দ্র কহিলেন, "তা কি হয়! এক কাপ চা খেয়ে যান।" পরেশ কহিল, "থাকগে।" আরতি কহিল, "আসুন না।" পরেশ কহিল, "অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম আপনাদের।" সত্যেন্দ্র কহিলেন, "চলুন এখন, কোন দরকারী কাজ নেই তো।"

চা খাইয়া আরতির গান শুনিয়া পরেশ যখন বাড়ি ফিরবার জন্য উঠিল, তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্র কহিলেন, "মাঝে মাঝে আসবেন দয়া করে।" সুনীতি কহিল, "মাঝে মাঝে নয়—কাল নিশ্চয় আসবেন।" পরেশ সাড়াহু কহিল, "নিশ্চয় আসব—বলতে হবে না।"

আরতি মুখে কিছুই বলিল না, কিন্তু তাহার অমত চোখের হিংস্রতায় দৃষ্টি নীরব আমন্ত্রণ জানাইল।

(২০)

পরেশ বাইকে উঠিল; পরিচিত পথিক বিরল পথে আলোর প্রয়োজন হইল না। কৃষ্ণপক্ষের ঐ রাত্রি; আকাশে চাঁদ নাই, কিন্তু অজস্র তারা জ্বল জ্বল করিতেছে, তাহাদের সমবেত ক্ষীণ আলোতে কালো ঘন অন্ধকার একটু ফিলা ও তরল হইয়া উঠিয়াছে। বাম দিকে দিগন্ত বিস্তারিত ঘনের মাঠ; মাঠের উপর পাতলা ধোঁয়ার মত কুয়াসা জমিয়া উঠিয়া দৃষ্টি-থেকে ঘোষ করিতেছে। বাতাসে তীক্ষ্ণ শীতলতা। দূর মাঠের মধ্যে আলোয়া দৃষ্টিতে ও নির্বিকারে। পিছন দিকে বাড়ির পাড়া হইতে একটা বুকুর মাগত চাঁৎকার করিয়া চলিয়াছে। রাস্তার ধরেই একটা শব্দপ্রায় ছোট পুকুর হইতে পচা ঘাস ও পাতার কাঁচালো গন্ধ অনেক দূর পর্যন্ত আসিতে ঘন করিয়া তুলিয়াছে।

পরেশের বাহা-হাঁদ্রিগণের সঙ্গে কিন্তু বোধশক্তির যোগাযোগ স্প্রতি স্থিত হইয়াছিল। কারণ তাহার মন একান্তভাবে আরতির চিত্তায় গন হইয়া গিয়াছিল। কেমন করিয়া সে হাসিয়াছিল, কেমন করিয়া কথা গিয়াছিল, কেমন করিয়া চল করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, কেমন করিয়া সুনীতি ও সত্যেন্দ্রকে এড়াইয়া তাহাকেই সঙ্গদান করিয়াছিল, ত্যাদি আরতির ক্রিয়াকলাপ স্মরণ করিয়া সে তাহাদের তাৎপৰ্য বৃদ্ধিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার সহিত আরতির মত কয়েক ঘণ্টার পরিচয়, তবু হার মধ্যেই আরতির ব্যবহারে প্রিয়-বান্ধবীর সুর লাগিয়াছে। আরতি গিয়াছে, দেখা হইবামাত্র যাহার-তাহার সহিত যাচিয়া বন্ধুত্ব করা যাহার স্বভাব এবং সেই বন্ধুত্ব যদি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এতখানি রসিয়া গেল, তাহা হইলে আরতির বন্ধুত্ব একতর প্রথম বন্ধুর সংখ্যা গণনা করার জন্য নীতিমত 'আদর্শম্যমার'এর ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য যাহার সহিত আরতির ব্যবহার তাহার পাইকারী ব্যবহার হইতে পৃথক ওরই সম্ভব। কারণ আরতি তাহার চিকিৎসাধীন থাকিতে চায় এবং চিকিৎসকের প্রতি যোগিনীদের ব্যবহারে ক্রিষ্ট পক্ষপাত্ত থাকেই। নিজের হৃদয়ে নিরাবরণ করিয়া যাহার চক্ষের সামনে ধরিয়া দিতে হয়, তাহার হিত ব্যবহারে চুল-চেরা কায়দা-কানুন বজায় রাখা নেহাৎ গম্ভীর প্রকৃতির হয়েদের পক্ষেই সম্ভব হয় না। আরতিসহ মত 'খালা মেজাজের মেয়ের' জ কথাই নাই।

অবশ্য আরতির এখনও সে চিকিৎসা করে নাই। তবু ইহার মধ্যেই যাহার আচার ও আচরণে যে নান্দ্যের আবেশ দেখা দিয়াছে, সুনীতিও চিকিৎসা করার পর তাহা যে কত গড় হইয়া উঠিবে ভাবিয়া পরেশের মন লোকেত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ 'জড়' করিয়া 'শব্দ' হইল, হৃদয়ের জন্য পরেশ সঙ্কট মছিল। চেতনা পাইয়া বসিল যে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। ভাড়াডাড়ি উঠিয়া

দাঁড়াইয়া গায়ের ধলা কাড়িতে কাড়িতে কতকটা অগ্রসর হইতেই দৌল, দুইটা বাইক জড়াজড়ি করিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে এবং ঠিক ওপাশেই আর এক কাড়ি তাহরই দ্বার গায়ের ধলা কাড়িতেছে। পরেশ কহিল, "মশায়ের কি খবর পেয়েছে?"

উত্তর হইল, "আজ্ঞে না। আপনার?"

"আমারও না। মশায়ের নাম?" লে.কটি দুই হাত কচলাইয়া কহিল, "আমি জগদীশ—কর্তৃক ডাক্তারের কম্পাউন্ডার।" পরেশ মনোনিবেশনার সহিত কহিল, "ও এত অন্ধকার রাত্রে একটা আলো আন নি কেন?" সাইকেল দুইটার হাতল ছাড়াইতে ছাড়াইতে জগদীশ কহিল, "আপনিও তো নেন নি।" পরেশ অপ্রতিভভাবে কহিল, "তা বটে। তবে আমি বিকেলে বোরয়ছিলাম কিনা, এত রাত্রি হবে জানতাম না।" নিজের গাড়ীটি তুলিয়া লইয়া পরেশ কহিল, "কোথায় চলেছ?" জগদীশ কহিল, "আপনার কাছেই। সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন।" পরেশ লজ্জিতভাবে কহিল, "এই দেখ, একবারে ভুলে গেছি। আজ তোমাদের ওখানে নৈমন্ত্য ছিল, না?" জগদীশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু তাই বলছিলেন—বোধ হয় ভুলে গেছে। তা' এত রাত্রি পর্যন্ত ওখানে?" পরেশ অগ্রাহ্যের সুরে কহিল, "এমনই। হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম—আগে তো আলাপ ছিল না, আজই হ'ল। বেশ লোক—।" জগদীশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তা বটে। গিয়াঁমা কিন্তু সেই সম্ভা থেকে ছটফট করছেন—কতবার যে লোক পাঠালেন আপনাদের ওখানে। আজ ওর মা এসেছেন কিনা—ক'নাক দেখতে চাচ্ছেন। আপনি যে কোথায় গেছেন, তা তো আপনার মাসীমা বলতে পারেন নি। বললেন শব্দ, সেজেগুজে কোথায় বোরয় গেছে। শেষে আমাদের কাল ঘনু বললে যে, আপানি হয়তো হেডমাস্টার মশায়ের ওখানে গ'ছেন। তখন ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন, জগদীশ! দেখতো বাবা, একবার। আমিও বললাম এক লাফে—" পরেশ বাধা দিয়া কহিল, "তোমারও নৈমন্ত্য অছে বৃদ্ধি?" জগদীশ কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়িতে খাওয়ানো দাওয়াতো হ'লে অ'মার একপাত বাধা—"

"তোমার খবর কিদে পেয়েছে বৃদ্ধি?"

জগদীশ দাঁত বাঁহর করিয়া হাসিল, অন্ধকারের একটানা কালো পর্দার উপর যেন একটি হৃৎস্পন্দ-বিদ্যারণ্য দেখা গেল। কহিল, "খা বলেছেন। কোন দুপুরবেলা খেয়েছি। তারপর বিকেলে এক কাপ চা ছাড়া তো আর কিছু পেটস্থ হয় নি।"

সম্ভবত সূরে পরেশ কহিল, "তোমাকে মিছেমিছি কণ্ট দিলাম। পাড়গায়তে তো কথা বলবার মত লোক পাওয়া যায় না। একজন মনের মত লোক পেলাম, গল্প করতে করতে এত দেরি হয়ে গেল।" জগদীশ কহিল, "তা হোক, তা হোক। আমাদের ডাক্তারদের কি এত খাই-খাই করলে চলে? কত দিন যে খাড়া উপোস করে কটাতে হয়। এই দেখুন না সেদিন—"

পরেশ বাধা দিয়া কহিল, "আমি বে হেডমাস্টারের কাছে গিরে-ছিলাম—ঘনশ্যাম ককা জানলেন কি করে?" জগদীশ কহিল, "ও সব জানতে পারে। ওই যে দেখেন ঘাড়টি বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে চলে, ওর পেটে অনেক বিদ্যা।"

ডাক্তারের বাড়ির সামনে হাজির হইতেই জগদীশ কহিল, "আপনি ডিসপেন্সারিতে যান, আমি বাড়িতে থবর দিগে।"

ডিসপেন্সারিতে কর্তৃক ও ঘনশ্যাম বসিয়াছিল। পরেশকে দেখিয়া ঘনশ্যাম কহিল, "এই যে বাবাজি! কোথায় ছিলে এতক্ষণ? জগদীশের সঙ্গে দেখা হল?" পরেশ বসিতে বসিতে কহিল, "দেখা হ'লো।" ঘনশ্যাম ভুরু নাড়িয়া কহিল, "কোথায় ছিলে বল দেখি?" পরেশ কহিল, "হেডমাস্টার মশায়ের ওখানে।" ঘনশ্যাম আঁকুইয়া উঠিয়া কহিল, "এঁা!" বলিয়া মিনিট কয়েক চোখ দুইটা স্থির করিয়া দিয়া মুখটা আধ-হাঁ করিয়া রাহিল। তারপর কহিল, "ওর সঙ্গে আলাপ আছে নাকি?" পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "আগে ছিল না, আজ হ'ল।"

"কি করে?"

"উনি নৈমন্ত্য করেছিলেন।"

বিশ্বাসচক্রেণে ঘনশ্যাম কহিল, "নৈমন্ত্য! কেমন?" পরেশ জবাব এড়াইয়া বাঁহবার ভঙ্গিতে কহিল, "কি জানি।" ঠোঁট দুইটা চাঁপা ঘনশ্যাম উপরে ও নীচে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "শ্যামকে দেখান নাকি?"

"তার নাম?"

রূপনারায়ণপুর ম্যানাটোরিয়ামে

নিজস্ব একখানি বাড়ী

রূপনারায়ণপুর (ই আই আর)
স্টেশন সংলগ্ন জমিতে কোম্পানী
কর্তৃক নামমাত্র ব্যয়ে টিমারী
করাইয়া বাংলা দেশের সুবিধা ও
সাঁওতাল পরগণার স্বাস্থ্যপ্রদ
আবহাওয়া উপভোগ করুন।

মোট জমির আয়তন প্রায় হাজার
বিঘা—প্রতি বিঘার মূল্য ৩২৫,
হইতে ৬০০ টাকা পর্যন্ত।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :
মণিময় প্রামাণিক

ইউনিয়ন ইনভেস্টমেন্ট
লিমিটেড

৫নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস
১০২, ক্রাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : কাল ৫৭৭৮



সুবারবন ব্যাক্স লিমিটেড

হেড অফিস---২২নং ষ্ট্রাও রোড, কলিকাতা।

শাখা অফিস

ঢালা, দম্দ্ম, বরানগর, আলমবাজার ও দেওঘর।

ফোন :—

কাল : ৪৮৬১



ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :

মিঃ বি, সি, দাস, এম, এ; বি, এল।

“মানে—ঐর শালীরা কি যে আজগবী রোগ হয়েছে শুনি।”
পরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল, “না।”

চাকর হরি আসিয়া খবর দিল, জামাইবাবুকে বাড়িতে ডাকছেন।
ঘনশ্যাম কহিল, “হাও, বাবা, হাও।” চাকরের পিছনে পিছনে পরেশ
বাড়ির ভিতরে আসিয়া হাজির হইল।

বারান্দার বসিয়াছিলেন একজন বিধবা; কার্তিক ডাক্তারের শাশুড়ী;
বয়স ষাটের উপর, রং ফসাঁ, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছুটি,
মাথায় স্বল্প অবগঠন, আসনশাড়ি হইয়া বসিয়া আছেন;
হাতে হারিনামের ঝুলি, ঠোঁট দুইটি নড়িতেছে। তাঁহার
সামনে খুঁটি ঠেস দিয়া পা মেলিয়া বসিয়া আছে শ্রীমতী। কমলাও
বসিয়াছিল, পরেশকে দেখিবামাত্র দড়দড় করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গাশের
ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

পরেশকে দেখিয়া শ্রীমতী গালে হাত দিয়া ঘাড় বাঁকিয়া কহিল,
“খনি ছেলে ভূমি ভাই! কেথায় গিছলে বল দেখি বৃন্দাবন আঁহার
করে? আমাদের রাইখনি যে ভেবে ভেবে সারা হ'ল।” পরেশ
লজিত মুখে হাসিতে লাগিল। শ্রীমতী কহিল, “জতো খলে প্রণাম কর
ক—তোমার দিদিমা।” পরেশ জুতা খুলিয়া প্রণাম করিতেই বৃন্দা
হারিনামের ঝুলি তাঁহার মাথায় ঠেকাইয়া দিয়া কহিলেন, “বোঁচো থাক
ভাই! আমাদের কমলাকে নিয়ে তুমি জন্ম রাজত্ব কর—বস ভাই।”
পরেশ অদূরে ঘাটের উপর বাঁসতে বাইহেই শ্রীমতী কহিল, “না হে,
কহেই বস। দজনে আলাপ হোক।” হাকিল, “এই কমলা! একটা
মাদার পেতে দিয়ে যা না তোরা বরক।” কমলা দরজার পাশেই দাঁড়াইয়া
ছিল—মৃদু, তরুণীর সহিত কহিল, “পারব না।” পরক্ষণেই মৃদুর
হাতে নতমুখে আসিয়া নতমুখেই মাদার পাতিয়া দিয়া নতমুখেই চলিয়া
গিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

কমলা আর নীলাম্বরী শাড়ি পারিয়াছে—রূপালী পাড়, লঠনের
অঙ্গিকে কমলায় করিতেছে। কালো চুলে পরিপাটি করিয়া কবরী
রচনা করিয়াছে। রূপালী কটিপোকার টিপ পরিয়াছে। কাছে আসিতেই
কণের নীচ ও ঘাড়ের পাশটা দেখা গেল; চুল হইতে একটি মিষ্টগন্ধ
নাকে আসিল। আকর্ষণ কথা মনে পড়িল পরেশের।

শ্রীমতী গম্ভীর কমলার দিকে কিঙ্করপ তাকাইয়া থাকিয়া পরেশের
দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, “অভিমান হয়েছে।” পরেশ মৃদুভাবে কহিল,
“তাই নাকি?” শ্রীমতী চোখ মুখ ঘুরাইয়া কহিল, “হাঁ হে, তাই।
বলেছে—কলো রূপ আর দেখব না, কালো বসন পরব না, কালিন্দীর
কালো জলে আর নাইবা না—” দিদিমা হাসিয়া কহিলেন, “নাভজামাই
কি আমার কালো, যে ও কথা বলেছে? সোনার গোরাক্ষের মত রূপ—
ওর কোলে কমলা—যেন চাদে কলক।” শ্রীমতী পরেশের পানে কটাক্ষ
হানিয়া মুখ নাড়িয়া কহিল, “আর বলো না দিদি! এমনই মন পাওয়া
যায় না, ওই সব কথা শুনলে তো অহংকার আর পা পড়ব না।” পরেশ
কহিল, “সে কি দিদিমা।” শ্রীমতী ধারালো স্বরে কহিল, “হাঁ ভাই,
মিডা কথা! তোমার মত লোকের মন পাওয়া আমাদের মত পাড়গোঁয়ে
মুখ্য মেয়ের কর্ম নয়। যারা ন্যাকাপড়া জানে, ফেরতা দিয়ে কাপড়
পরে, নাচ গান জমেন, মালা গেঁথে বস্তু, প্রাণেশ্বর বলে গলায় পরিয়ে
দিতে পারে, তাদেরই তোমাদের ভাল লাগে।” পরেশ সন্দেহের স্বরে
কহিল, “কি ব্যাপার বলুন দেখি?”

কঙ্কর দিয়া শ্রীমতী কহিল, “সে অনেক কথা, ভাই! তীক্ষ্ণ-
দৃষ্টিতে পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, “কোথায় গিছলে বল
দেখি?” পরেশ কহিল, “একটু বেড়াতে গিয়াছিলাম—”

“কোথায়?”

পরেশ বিরক্তি চাপিয়া কহিল, “স্কুলের দিকে, হেডমাষ্টার মশায়ের
সঙ্গে আলাপ হ'ল, উনি টেনে বাড়ি নিয়ে গেলেন।” মুখ টিপিয়া হাসিয়া
শ্রীমতী কহিল, “টেনে নিয়ে গেলেন বলে কি রাত দশটা পর্যন্ত টেনে
রাখলেন?” পরেশ জবাব দিল না। শ্রীমতী কহিল, “হেডমাষ্টারের
শুনিয়ে একটা ছুঁড়ি শালী আছে, তার সঙ্গে দেখা হ'ল নাকি?” পরেশ
নিরসকণ্ঠে কহিল, “হ'ল বই কি।” মুখ টিপিয়া হাসিয়া শ্রীমতী কহিল,
“খুব ভাল লাগল বুঝি?” দিদিমা কহিলেন, “তুই ঝগড়া করছিস কেন
ভাই? দু'দিন পরে যার হবে, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে দে। ওলো,
ও কমলা, আর না এখন; এখন থেকে অত লজ্জা করতে হবে না।”

ডাক্তারগৃহিণী আসিয়া হাজির হইলেন। পরেশকে দেখিয়া গম্ভীর
হইয়া কহিলেন, “এই যে বাবা! এসেছে? এত রাত হ'ল? তোমাকে

দেখবার জন্যে মা কতক্ষণ থেকে ছুঁফুঁ করছেন। কোথায় ছিলে
এতক্ষণ?”

পরেশ কহিল, “হেড মাষ্টার মশায়ের ওখানে।”

ডাক্তারগৃহিণী হু হু চুচকাইয়া কহিলেন, “ওঃ!” শ্রীমতীর
দিকে তাকাইয়া কহিলেন, “মাসী! কমলা কোথায় গেল?” শ্রীমতী মুখ
ও চোখের ইংগিত করিয়া কহিল, “ওই যে ওখানে।” মেরেকে লেখাপড়া
শেখাতনি, টং-টাংও শেখাতনি যে, দেখবামাত্র পুরুষের গায়ে ঢলে পড়বে।
দেখ গিয়ে ঘরের কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।”

মাসী-বোনকে চোখে চোখে বাতী বিনিময় হইল। বোনকে হাকিল,
“ও কমলা! এদিকে আয় দেখি, খাবার সাজাগে যা, আমি কিছু করতে
পারব না বলেছিলাম।” চাকরের উদ্দেশ্যে কহিলেন, “ওরে, কোথায়
গেলি? এখনও এলো না যে! ডেকে নিয়ে আয় গো।” শ্রীমতী
কহিল, “মা বেটীতে কি হ'ল আজ?” কার্তিকগৃহিণী কহিলেন, “আমাকে
আজ কিছু করতে দেবে না বলেছে, রামা-বামা, খাওয়ানো-দাওয়ানো সব
নিজে করবে। একটু দেখিয়ে দিতে গেলাম তো বললে, না মা, ভূমি
ছিছুটি বলতে পারো না। সব নিজে রেখেছে আজ, তা পরিবেষণও
নিজেই করুক—আমি কেন করতে যাব?”

কমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।
বৃন্দা কহিলেন, “তোকে কেন করতে হবে? ওই করুক—
আশীর্বাদ করি, জন্ম জন্ম করুক।” ঝুলি নাচাইয়া কহিলেন, “সেদে-
মন, মের তো ওই হ'ল আসল কাজ—স্বামী-পুত্রকে, আখীরবন্দনকে
নিজের হাতে রেখে খাওয়ানো—নেকাপড়া লিখে শামলা পরে কাছারি
যাওয়া তো নয়? আমাদের সময়ে ওসব কোন দিন শুনিনি, আজকালই
হয়েছে—”

শ্রীমতী কহিল, “শুধু লেখাপড়া নয়, পাশ করছে, চাকরী করছে।
আমাদের গায়ের হেডমাষ্টারের একটা শালী এসেছে—ছুঁড়ি নাকি বি এ
পাশ, জুতো পরে গটগট করে হাঁটে, ফরফর করে ইবারিজ বলে, আর
পুরুষ দেখলে জোকের মত কানড়ে ধরে।” পরেশের দিকে কটাক্ষ নিষ্কপ
করিয়া ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “কিন্তু আক্ষকালকার ছেলেদের
ওই রকমই পছন্দ! শান্তিশিষ্ট লক্ষ্মী মেয়েকে যেন ধরে না তাদের।”
কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ করিয়া কহিল, “কত লোকের মাথা খেয়ে যে জিবে ওদের
চড়া পাড়ে গেছে খবর নিলেই চিত চমকবার হয়ে যাবে। তখন বুঝবে
মজাটা!” বলিয়া চোখের কোণে বিদ্রূপ হানিয়া সবগে মৃদুতা ফিরাইয়া
লইল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে শ্রীমতী পরেশকে কহিল, “আমাকে ফেলে রেখে
না হে! সঙ্গে করে নিয়ে যেও, বুনলে?”

ঘনশ্যাম ও জগদীশ চলিয়া গেল। পরেশ কার্তিক-ডাক্তারের
সহিত গম্ভীর করিতে লাগিল।

কার্তিক কহিলেন, “হেড মাষ্টার মশায় শালীর সম্বন্ধে কিছু
বললেন নাকি?”

পরেশ কহিল, “অসুখের কথা বলছিলেন।”

“পরীক্ষা করে দেখলে নাকি?”

“না।”

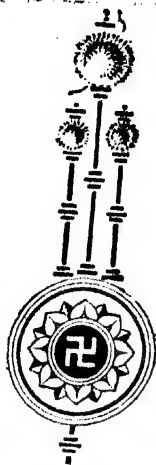
কার্তিক কিঙ্করপ ভাবিয়া কহিল, “আমার মনে হয়, শরীরের চেয়ে
ও মেমোরি মনের রোগই বেশি। এত বয়স হয়েছে অথচ বিয়ে হয়নি,
দেহের একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চাহিদা ওস মিটেছে না, তারই এটা
স্বাভাবিক প্রতিফল।”

পরেশ চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, “আমাদের সময়ে ব্রাহ্ম খৃষ্টানদের মেয়েরা
অনেক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা থেকে লেখাপড়া করত, হিন্দুদের মধ্যে
এ রোগাজ ছিল না। আজকাল শূন্য, হিন্দু মেয়েরাও অনেক বয়স
পর্যন্ত অবিবাহিতা থেকে লেখাপড়া করছে।” পরেশ কহিল, “বিশেষ
করে পূর্ববঙ্গের মেয়েরা, শিক্ষার দিক দিয়ে ওরা খুব উন্নত করেছে।
শুধু বি এ, এম এ পাশ করে মাষ্টার আর প্রফেসারি করছে না—অনেকে
মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে ডাক্তার হচ্ছে। আমাদের সঙ্গেই একটি
মেয়ে পাশ করেছিল—সে এখন কলকাতার কোন একটা হাসপাতালে যত
চাকরী করছে।”

“বিয়ে হয়েছে মেরেটির?”

“জানি না।”



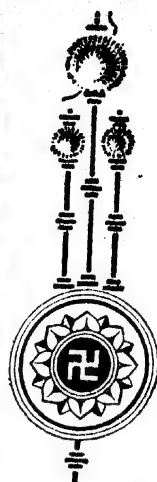
"সুপ্রা"

ফাউণ্টেন পেনের
কালী
অতিশয় রাসায়নিক
দ্বারা প্রস্তুত

সর্বপ্রথম ভারতীয় কালি

- ১. সুপ্রা কালি যে কোনও কালি অপেক্ষা কলম দ্বিগুণে দ্রুত প্রবাহিত হয়।
- ২. কলম বা নিবের কোনরূপ অশুদ্ধি কবে না। এই কালিতে কলম পরিষ্কার থাকে।
- ৩. ইহাতে তলানি (SEDIMENT) পড় না। এজন্য নিবের মুখে কখনও কালি জমায়া বন্ধ হয় না।
- ৪. সুপ্রা কালি লিখবার সময় পাতলা থাকে। এজন্য দ্রুত লেখা হয়। লিখবার কিছু পরে লেখা গাঢ় কাল হয়। এবং জলে ডিজাইন রাখিলেও মুছিয়া যায় না।

এ.বোস, এস.এস.সি. (ফিলিত রসায়ন) ১৯৩২
সুপ্রার টয়লেট এণ্ড কেমিক্যাল কোং
২ নং আহিরীটোলা ফার্স্ট লেন — কলিকাতা



সুপ্রা

প্রসাধন নিয়মিত ব্যবহারে আপনার
খুশি ও লাভের সঙ্গে সঙ্গে মনের
আনন্দও অনেক বাড়িয়ে দেবে।
আধুনিক উন্নত ধরনের
বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রস্তুত এবং
সম্পূর্ণ নির্ভর যোগ্য



সুপ্রার টয়লেট এণ্ড কেমিক্যাল কোং
২ নং আহিরী টোলা ফার্স্ট লেন, কলিকাতা
প্রোগ্রাম - এ. বোস, এস.এস.সি. (ফিলিত রসায়ন) ১৯৩২

কাতিক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “এটা কি ভাল হচ্ছে? কে জানে?” আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “কি জান বাবা! আমরা পুরনো আমলের লোক, দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সেকেন্দ্রে; মেয়েরা পুরুষদের কাঁধে ভর করে চলবে, আজন্ম দেখে আসছি—দেখতে ভাল লাগে। মেয়েদের গটগট করে মাথা উঁচু করে হাটা আমরা বরাবর করতে পারিলাম। তবে যুগ তো বদলাচ্ছে! নতুন নতুন রীতিনীতি কায়দা-কানূনের আমদানী হবেই, আমাদের ভাল-লাগা না-লাগার উপর কিছু নিভর করবে না।” দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, “তবে এ তুমি তিক জেনো—মেয়েরা যত লেখাপড়া শিখবে, আর বেশী ব্যয় পর্যন্ত আইবড়ো থাকবে, তত দেখবে হিস্টরীর গ্রন্থ মেয়েমানুষ আর মন্দা মেয়েমানুষের সংখ্যা সমাজে বেড়ে যাবে। আর খুব সম্ভব তাতে কি সংসার, কি সমাজ—কারও পক্ষে মঙ্গল হবে না।”

শ্রীমতী আসিয়া কহিল, “চল হে।” “চলুন” বলিয়া পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাহির দরজার কাছে আসিতেই মৃদুকণ্ঠের ‘দিদিমা’ ডাক শুনিয়া পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইল। পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল—একটা মরাইয়ের পাশে দাঁড়াইয়া কমলা—হাতে দুইটি পান। তাহার সহিত চোখা-চোখি হইতেই কমলা মুখ নামাইল। অভিমানে কালো ছায়া মুখ হইতে এখনও সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায় নাই। ক্রান্ত বর্ষা মেঘের মত টুকরা টুকরাভাবে দুই চোখের কালো তারায়, কুণ্ঠিত ছদ্ম দুইটিতে, ঈষৎ স্ফূর্তিত অধরে লাগিয়া আছে।

শ্রীমতী কমলাকে কহিল, “নিজে দে না তোর বরকে।” পরেশকে কহিল, “নাও না হে।” পরেশ হাত বাড়াইল। তাহার হাতে পান দিয়াই পিছন ফিরিয়া কমলা পলাইতে উদ্যত হইতেই শ্রীমতী কহিল, “ওলো, চুম দিল না?” কমলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া, ঘাড় বাকিয়া তাপা তর্জনি করল, “যা-তা বলছে।” শ্রীমতী হাসিয়া কহিল, “ভুল করে বলে ফেলেছি লো! চুম দে, চুম তো গিলের পর নিজেই দিবি, তখন কি আমার বলবার অপেক্ষা রাখিবি?” কমলা আসিয়া ডান হাতেব তর্জনীটি বাড়িয়া দিল। তর্জনির মাথায় চণ লগানো ছিল, পরেশ নিজের তর্জনী দিয়া ধীর-সুস্থে চুম লইতে লাগিল। শ্রীমতী কহিল, “ভাল করে হাটো জপটে ধর না, লক্ষ্য কিসের?” কমলা হাটো সরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে মরাইয়ের আড়ালে চলিয়া গেল।

পথে ঘাইতে ঘাইতে শ্রীমতী কহিল, “আজ তোমার উপর আমার ভারী রাগ করছি।”

পরেশ কহিল, “আমরা—কে কে?”

“আম আর কমলা। আজ এলে না কেন?”

“আসিছিলাম। বেরিয়েছি, এমন সময় হেডমাষ্টার মশায়ের নিমন্ত্রণ চিঠি পেলাম।”

শ্রীমতী কহিল, “নৈমন্ত্রণ তো আমিও করে এসেছিলাম হে। নিজে গিয়ে হাতে খরে মাথার দিবা দিয়ে বলে এসেছিলাম।”

“তা এসেছিলেন—কিন্তু ভুললো—”

ব্যগের সুরে শ্রীমতী কহিল, “ওঃ! আমরা বৃদ্ধি অভয়?” পরেশ কহিল, “তা কি আমি বলছি। আপনারা আপনার লোক—আপনাদের কাছে ট্রেট হলেও আপনারা ক্ষমা করবেন, কিন্তু উনি হাসলেন অপ রচিত—পর।” শ্রীমতী কহিল, “তা হলেও তোমার একবার দেখা করে যাওয়া উচিত ছিল। একটু দেরি হলে হেডমাষ্টারের শালী উড়ে পালিয়ে যেত না।”

পরেশ কহিল, “ওর শালীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?”

“ওই তো গাড়ির গাছ হে! ওর লোভেই তো গিচ্ছলে? মুখ্য হলেও সব বৃদ্ধি।” একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “বমলা আজ কে’ছেছে জান?”

পরেশ কহিল, “কান্না কেন?”

শ্রীমতী খন্ খন্ করিয়া কহিল, “কান্না নো? একজনকে মনপ্রাণ সাঁপে বসেছে, আর সে যদি অন্যের জন্যে ছুটোছুটি করে, তাকে যদি অন্য মেয়ে মালা গোঁবে পাঠিয়ে দেয়—” পরেশ সন্দেহের সুরে কহিল, “মালা আবার কে পাঠিয়েছে? শ্রীমতী কহিল, “কেন তোমার ববি? গৃপী ধরেছে।” বিস্ময়ের স্বরে পরেশ কহিল, “মানে?”

“মানে—আজ বিকেল বেলায় তোমাকে ডেকে জানাবার জন্যে গৃপীকে পাঠিয়েছিলাম। গৃপী রাস্তার যেতে যেতে শেষে—বিনয়ের ছোট মেয়ে খুঁকী তোমাদের বাড়ি বসে—হাতে একটা গালা ফুলের মালা—জিজ্ঞাসা করতই খুঁকী বললে—পরেম দাদার জন্যে দিদি পাঠিয়ে দিয়েছে। গৃপী

এসে আমাকে বলল—ওই কথা। কমলা বসেছিল কাছে, সেও শুনল। গৃপী যতক্ষণ ছিল কিছ, বলল না, ও যেতেই আমার কোলে মাথা দিয়ে কি কথা।”

পরেশ চুপ করিয়া রহিল। শ্রীমতীর বাড়ির কাছে আসিতেই, শ্রীমতী খুপ করিয়া পরেশের হাত ধরিয়া বলিল, “ভাই, তোমাকে হাতে ধরে মিনতি করে বলছি—এখানে সেখানে আনাগোনা ছুড়। কমলা তোমাকে মনপ্রাণে স্বামী বলে জেনেছে—এর পর যদি ও তোমাকে না পায় তো প্রাণে বাঁচবে না।”

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া পরেশ দেখিল, শয়নকক্ষে টেবিলের উপর একটি গালা ফুলের মালা। মালাটি প্রসারিত দুই করতলে তুলিয়া লইয়া সে তাহার উপরে মুখ রাখিল। মালার সিন্দ-কোমল স্পর্শ, মৃদু সুগন্ধ মল্য-রচায়ত্রীর কথা স্মরণ করাইয়া দিল। হঠাৎ টেবিলের একধারে রঙিন কাগজের বাস্ত্র মোড়ো ঔষধের শিশির দিকে নজর পড়িল, যে ঔষধের শিশিটি সে বাবির ব্যবহারের জন্য দিয়াছিল। শিশিটা তুলিয়া লইয়া দেখিল—মোড়ক খোলা পর্যন্ত হয় নাই। হাঁকিয়া মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এই ঔষধের শিশিটা কে দিয়ে গেল?”

মাসীমা কহিলেন, “বিনয় মাপ্তার—”

“কখন?”

“সন্ধ্যার পর।”

“কিছু বলেন নি?”

“বললেন—কাল নাকি ও’র স্ত্রী বাস্ত্রের বাড়ি বাসেন—উনি শৌঁছে দিতে যাবেন—ঔষধটার আর দরকার নেই না।”

পরেশ শিশিটা ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিল। কিছুক্ষণ শিশিটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়া গভীর ধীর-নিশ্বাস ফেলিল। তখন মনে হইল, তাহার জীবনের আকস্মিক একটি ক্ষুদ্র তরকার উদয় হইয়াছিল; স্পন্দ-বালের জন্য সিন্দ দীর্ঘত বিবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বোধ করি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া গেল।

(২১)

সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সুখদা রাস্তাঘরে ব্যাক করিতেছিল।

শোবার ঘরের বারান্দায় বাসমা ববি খুঁকীর জন্য “খুঁকি” পজার আরোজন করিয়া দির্ভোঁছিল। একটা মাটর চেট ভোলা কানোওয়লা খোলা জুখ দিয়া কানায় কানায় ভর্তি করিয়া তাহার উপরে গালা ফুল থরে থরে সাজাইতেছিল। খুঁকী উবু হইয়া বাসমা উৎসুক ও উৎসবল চোখে দিগ্বির সাজানো দেখিতেছিল। খুঁকী কহিল, “দিদি, আরও ফুল জানব?” ববি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না, এতেই হবে।” খুঁকী কহিল, “মন্তা দিদি পরেশদাদার নামে একটা গান বেধেছে, দিদি।” ববি খুঁকীর মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, “কি গান?” খুঁকী সুর করিয়া কহিল, “কিবা বৈদ্যে গাছে গাছে, পরেশ ডাক্তার বিয়ে করছে—তিড়ং তিড়ং নাচে। তিড়ং তিড়ং নাচুক, আমরা তাকেও বর পাই—ঐ যে অহংকারে পা পড়েন—ঐ জ্বালাতেই মরি—বল ভাই হরি ভাড়রী—” ববি স্কান হাসি হাসিয়া কহিল, “তুইও ওই গান গাইবি? পরেশদাদা তোর দাদা হন না?” খুঁকী কহিল, “গাইব না কেন? পরেশ দাদার নামে তো আর গান নয়—ও’র বউয়ের নামে।”

শ্রীমতী বাড়ি ঢুকিয়া হাক দিল, “বউ রইছিল নাকি গো?” সুখদা কহিল, “আজ্ঞা, আসুন।” শ্রীমতী ববি ও খুঁকীর দিকে তাকাইয়া কহিল, “কি লো তেদের কি হচ্ছে?” থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “ববি বৃদ্ধি খেলা করছিস? তোর পয় কেমন আছে?” ববি কহিল, “ভাল আছে।” শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে কহিল, “ভাল থাকবে বই কি?” ডাক্তারের চাকিরে।” বলিয়া মূঢ়াক হাসিয়া রাস্তাঘরে চলিল।

রাস্তাঘরে ঢাকাতেই সুখদা কহিল, “বসুন ওই আসন”

শ্রীমতী গম্ভীর মুখে কহিল, “বসবনা—তোকে একটা কথা বল তোদের ভালবাসি, তাই গোপনে বলে যাচ্ছি। আর চার ক সুখদা বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের সহিত কহিল, “কি”—শ্রীমতী অর কেও জানে না—সুখদা আমি আর গৃপী—তা আমাদের? গেলেও কথা বেরবে না, তুইও কাউকে বলিস না।”

রহস্য করিয়া কহিল, “বলব না, আর্পনি বলনে।” শ্রীমতী কহিল, “বলছি—কিন্তু বলবার আগে তাকে একটা কথা বিনয় না হয় কাছাকাছি মানুষ, কিন্তু তুইও কি : দিয়ে খোঁপো—সেরে কি করে, কোন দোষখবর রাখিস

চর্মরোগের বিশেষজ্ঞ ডাঃ জে, পি, রায় এইচ-এম-বি

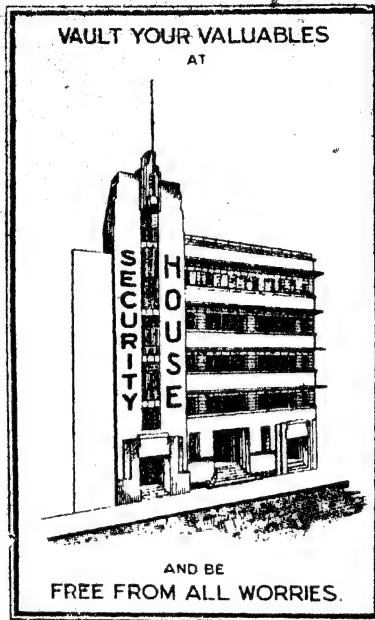
বিনা অস্ত্র যাবতীয় চর্মরোগ,
আংগুলাহাড়া, স্তন পাকা, রক্তদুর্গিট
এবং দূরারোগ্য কৃত অতি অল্প
সময়ের মধ্যে আরোগ্য করিয়া
থাকেন।

হতাশ রোগীরা কনসাল্টেশন করুন
গ্যারান্টি দিয়া চিকিৎসা করা হয়।
সান্ফ্রান্সিস্কো ফার্মেসী
২৪৯নং চিত্তরজন এভিনিউ (নর্থ),
কলিকাতা।

ফোন বি. বি. ২৭২০

সময়—

প্রাতে ৮টা হইতে ১১টা, বৈকাল ৫টা হইতে ৯টা



অখণ্ডনীয়

ভল্ট

আপনার মূল্যবান
গোপনীয় ধনসম্পত্তি
ও দলিলপত্রাদির
একমাত্র গোপনীয়
স্থান।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য

ফোন করুন—
কলিকাতা ৬৪৭৭



কলিকাতা সেফ ডিপোজিট কোম্পানী লিমিটেড
১০২এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

Post Box—549

Tele } Gram : Bankenen
Phone : Cal. 1587

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—১৪নং হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ—বিহারশরীফ, রাঁচী, লোহারডাঙ্গা, ডিগবয় ও পুুলিয়া

হুদের হার

চলতি হিসাব	...	২%	প্রতি বৎসর
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	...	২%	" "
—স্থায়ী আমানত—			
এক বৎসরের জন্য	...	৩%	" "
দুই বৎসরের জন্য	...	৪%	" "

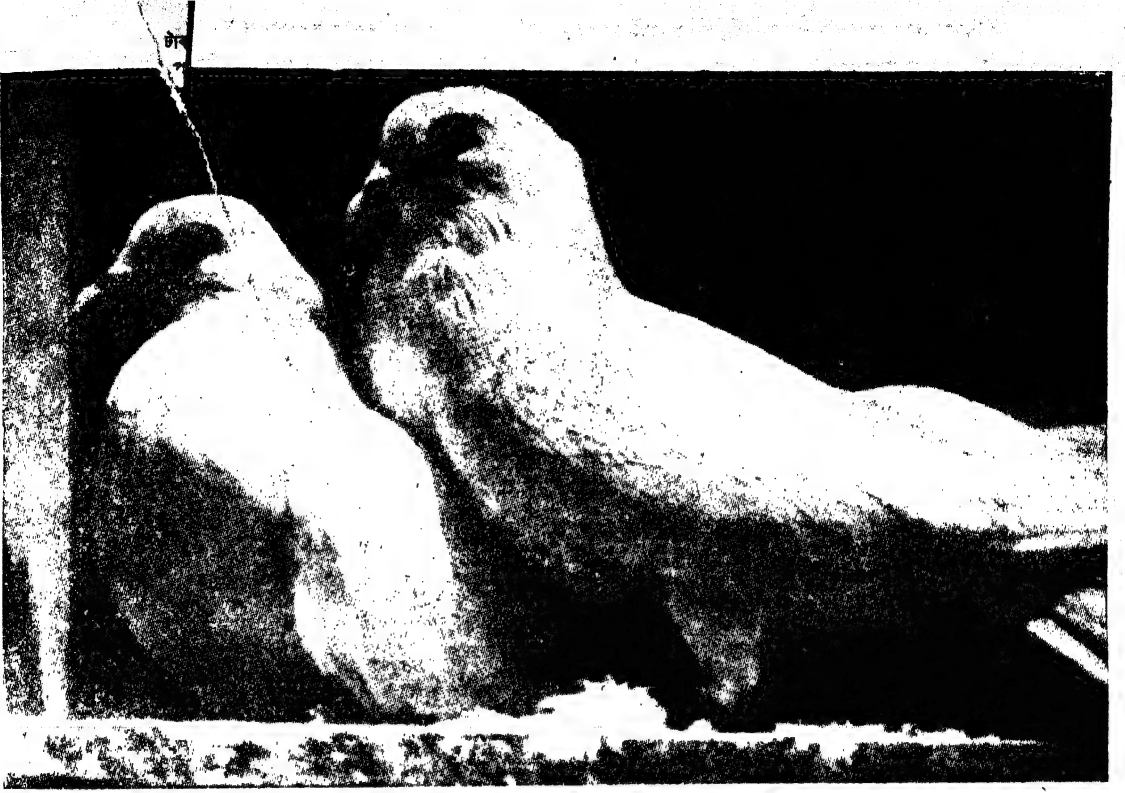
তিন বৎসর মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেট
ক্রয় করুন।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা যায়

—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

সি, গুহ

মিঃ বি, কে, রায়



“কপোত-কপোতী যথা—”

ফোটোশিল্পী—শ্রীশঙ্করদাস চট্টোপাধ্যায়

বর ঘরে, তার তো এমন অসাবধান হওয়া ভাল নয় বউ।” সুখদা দারণ উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, “বাবির কথা বলছেন? কি করেছে সে?” শ্রীমতী ক্রুর হাসি হাসিয়া কহিল, “কি করেছে শুনাবি? বিনোয়সুন্দরের বিন্যাসেও তার মানিয়েছে তোর মেয়ে—নিজে হাতে মালা গেঁথে পরেশকে পাঠিয়েছে।” ভয়ে সুখদার মুখ ফ্যকসে হইয়া গেল, শব্দকণ্ঠে কহিল, “সত্যি!” শ্রীমতী কহিল, “মিথো না সত্যি, তোর খুকীকে জিজ্ঞেস কর দেখ—ওর হাতেই পাঠিয়েছে।” সুখদা ডাকিল, “খুকী!” খুকী সাজা দিল, “কি মা!”

“এখানে শূনে যা তো।” খুকী আসিতেই সুখদা চাপা স্বরে প্রশ্ন করিল, “পরেশকে মালা দিয়ে এসেছিস?” খুকী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “এসেছি তো!”

“কে দিল দিতে—?”

“কেন, দিদি। পরেশদাদা সকালে চেয়েছিলেন—” সুখদা শ্রীমতীর দিকে চাহিয়া কহিল, “এই শুনুন পিসিমা! পরেশ নিজে থেকে চেয়েছিল; দাদার মত ভালবাসে, চাইলে—” শ্রীমতী বাধা দিয়া ধারালো কণ্ঠে কহিল, “যা-তা বোঝস নে বউ! একজন সোমও বয়সের ছেলে মালা চাইলেই এত বড় শাড়ী মেয়ে তাকে মালা গেঁথে পাঠাবে? তোদের শহরের নিয়ম-কানুন জানিনে, বউ, কিন্তু আমাদের পাড়াগেঁয়ে এসব অসৈরন চলে না। তোদের ভালর জন্যেই বলছি বউ, এখনও মেয়েকে সামলা, না হলে পরে পশ্চাৎবি।” সুখদা মুখ কাঁদো করিয়া কহিল, “সত্যি!” উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “আপনি আমার সঙ্গে আসুন পিসিমা—আপনার চোখের সামনে ওই মেয়েকে কি শাসিত দি, দেখুন।” বলিয়া একটা ঢেলাকাঠ হাতে করিয়া বাইতে উদ্গত হইতেই শ্রীমতী খপু করিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, “পাগল হয়েছিস নাকি বউ? অত বড় মেয়েকে মারধর করে? শেষে কি ফাসাদ করবি? আজকালকার মেয়েদের বিশ্বাস নেই, বিষ্-টিষ খেয়ে বসবে, তার চেয়ে এক কাজ করিস তো সবচেয়ে ভাল হয়। মেয়েকে নিয়ে ভাইয়ের কাছে চলে যা। তাকে দিয়ে একটি পাঠ খুঁজিয়ে মেয়ের বিয়ে

দিগে যা। বিনয়ের উপর ভর করে থাকলে মেয়ের তেরা বিয়ে হবে না।” সুখদা কাঠটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, “তাই করব পিসীমা।” শ্রীমতী কহিল, “আজা চল বউ! কিছু মনে করিস না। তোদের ভালবাসি, তাই তোদের খায়াপ কিছু শুনলে মনটা করকর করে—তোদের না জানিয়ে থাকতে পারি নে—তোদের পর বলে ভাবলে কি আর আসতাম? গয়ের লোকের মত চুপ করে বসে বসে মজা দেখতাম।” শ্রীমতী চলিয়া গেল। সুখদা প্রচুরমতির মত উনানের জলন্ত আগুনের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনয় আসিতেই সুখদা তাহাকে ডাকিয়া কহিল, “শোন।” বিনয় কাছে আসিতেই সুখদা জলদগম্ভীর স্বরে কহিল, “তোমার মেয়ে আজ কি করেছে জান?” বিনয় ভয়ে ভয়ে কহিল, “কি?”

“পরেশকে মালা গেঁথে পাঠিয়েছে?”

বিনয় বিস্ময়ের স্রোত কহিল, “কেন?” সুখদা কহিল, “পরেশ নাকি সকালে চেয়েছিল।” বিনয় নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, “ওঃ! তাই! তাতে আর দোষ কি হয়েছে।” স্বামীর মুখের পানে জলপল্ট-চক্রে চাহিয়া সুখদা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, “দোষ হয় নি? কে কোথায় মালা চাইল বলে—অত বড় মেয়ে দিন-দুপুরে মজা গেঁথে পাঠাবে? পরেশ নাড়িতে এসে দিতে পারত।” বিনয় কহিল, “তা বটে।” সুখদা কহিল, “আমি কিছু জানতাম না, শ্রীমতী এসে বলে গেল।” ক্ষোভের সহিত কহিল, “মেয়ে তোমার বড় হয়েছে কিনা—আজকাল আমার কাছে সব গোপন করে।” বিনয় কহিল, “শ্রীমতী জানল কি করে?” সুখদা কহিল, “খুকী নিয়ে যাচ্ছিল—গুণী বমনী দেখেছে—ও গিয়ে আবার শ্রীমতীকে বলেছে—শ্রীমতী বলল বটে—কেউ আর জানে না, আর কাউকে ওরা বগবে না। কিন্তু ও মিছে কথা—ওরা এতক্ষণ সারা গায়ে রটিয়ে দিয়েছে বোথ হয়, কাল থেকে আর গায়ে মুখ দেখানো যাবে না। আর তোমার ওই মেয়ে খুবজোড় থাকবে, কেউ ওকে নেবে না—” বিনয় চুপ করিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল। সুখদা

কহিল, “আমি ছেলেরা নিয়ে দাদার কাছে যাব—তুমি কিন্নরকে ছুটি নিয়ে আমাকে রেখে আসতে পারবে না?” বিনয় ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, “পারবে।” সুখা কহিল, “বেশ, খেয়ে-দেয়ে এখনই সেক্টোরীর কাছে যাব। ছুটির ব্যবস্থা করে এস গিয়ে। কলই আমি যাব।” বিনয় কহিল, “এত ভড়াভাড়ি—” সুখা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, “হ্যাঁ, কাল আর আমি গিয়ে মুখ দেখাতে পারব না—খামি বলে দিচ্ছি তোমাকে—”

(২২)

পরের দিন দশ-বারো মাইল দূরের এক গ্রাম হইতে পরেশের ডাক আসিয়াছিল। বেলা দশটার সময়ে স্নানাহার করিয়া পরেশ বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে হেডমাস্টার মহাশয়ের কি—দুখের মা—একটা চিঠি আনিয়া হাতে দিল। হেডমাস্টার মহাশয় লিখিয়াছেন—“ডাক্তারবাবু—আজ দয়া করে একবার এসে আর্জিকে দেখে একটি ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবেন।” পরেশ দুখের মাকে কহিল, “আজ্ঞা, তুমি যাও। ওই রাস্তা দিয়েই এখনই আমাকে যেতে হবে, যাবার সময় দেখা করে যাব।”

রাস্তার হেডমাস্টারের সাহিত দেখা হইল—খড়া-চুড়া আঁটিয়া স্কুলে ঘাইতেছেন। পরেশকে দেখিবামাত্র একগাল হাসিয়া কহিলেন, “টলেছেন। আমি আর অপেক্ষা করতে পারলাম না, স্কুলের সময় হয়ে গেছে, আপনি যান তা হলে—”

বাড়ির দরজায় পৌঁছিয়া ঘণ্টা বাজাইতেই থোকা ছুটিয়া আসিল। পিছনে-পিছনে আসিল আরতি। থোকা আসিয়া একেবারে সাইকেলের হ্যাণ্ডল্‌ ধরিয়া কহিল, “চড়িয়ে দিন না একবার।” পরেশ তাহাকে সিতে চড়াইয়া দিল। থোকা আদেশ দিল, “চালান এবার।” আরতি আসিয়া কড়া গলর কহিল, “থোকা নামো।” থোকা মাসারি কথায় কান না দিয়া কহিল, “চালিয়ে দিন না।” পরেশ চালাইতে শুরু করিল। আরতি কহিল, “ওকে আদর দেবেন না—ভারী দুষ্ট ছেলে, মাথায় চড়ে বসবে।” পরেশ থমাকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “তাই নাকি, থেকা! এর পর মাথায় চড়বে? তা হলে তো মশাকল।” থোকা সাহস দিয়া কহিল, “কখনও না, আপনি চাটিয়ে দেখুন।” পরেশ কহিল, “বেশ তোমার কথাই বিশ্বাস করা যাক—” বলিয়া এক পাক ঘুরাইয়া আনিয়া কহিল, “এর পর নামো দেখি।” থোকা প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, “না, আর একবার।” আরতি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল, “দেখলেন তো—আমার কথা বিশ্বাস না করার ফল। এর পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা যোজন ওকে এই রোদে, ও কি সহজে নামবে ভেবেছেন।” পরেশ কহিল, “থোকা, তোমার মাসীমা কি বলছেন শুনছে?” থোকা কথায় কান না দিয়া বাইকেরে ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল। আরতি কহিল, “দেখছেন মজা! কে যেন কাকে বলছে! জোর করে নামিয়ে দিন ওকে।” থোকায় উদ্দেশ্যে কহিল, “থেকা, নামো বলছি, নামবে না তো! ডাক্তারবাবু! আপনার সেই ছুটিটা দিয়ে হাত দুটো ওর কেটে দিন তো।” থোকা ভয়ে চোখ বড় করিয়া কহিল, “আমাকে নামিয়ে দিন—” বলিয়াই নামিবার জন্য চেষ্টা শুরু করিল। পরেশ তাহাকে নামাইয়া দিতেই সে ছুটিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

আরতি কহিল, “একেবারে নেয়ে-খেয়ে এসেছেন দেখছি।”

পরেশ কহিল, “একটা বলে যাচ্ছি—এখান থেকে দশ-বারো মাইল রাস্তা, কখন ফিরব তার ঠিক নেই।” চোখে ও মুখে বিস্ময়ের ভঙ্গী করিয়া আরতি কহিল, “এই রোদে এতখানি রাস্তা যাবেন?”

পরেশ কহিল, “শীতকালের রোদ তো, কিছু কষ্ট হবে না। তা ছাড়া ডাক্তারদের কি অত রোদ-জল বাছতে গেলে চলে? যখনই রোগী ডাকে, তখনই যেতে হবে।” আরতি মৃচাকি হাসিয়া কহিল, “সব রোগীর বেলা নয়, আমার তো বাল্য রোগই ডেকে রেখেছিল। সকালে বোধ হয় জ্বলই গিরোঁদিলেন, চিঠি লিখে মনে না করিয়ে লেলে বোধ হয় আসতেন না।” পরেশ কহিল, “নিশ্চয় আসতাম।” দুই চোখ পরেশের মূখের উপর স্থির করিয়া আরতি কহিল, “সত্যি!” পরেশ কহিল, “হ্যাঁ।”

বৈঠকখানায় বসিয়া পরেশ কহিল, “আপনাকে দেখবার কিছু নেই।” আরতি হাসিয়া কহিল, “একদিন দেখাতেই ফিরিয়ে গেলুম, বলেন কি?” অপ্রতিভভাবে পরেশ কহিল, “না, তা বলি নি। বজ্রি, আপনার অগাধিক মানে—খাস্তিক কোন রোগ আছে বলে মনে হয় না।” আরতি কহিল, “বলেন কি? বকের অবস্থা তো ভাল নয়।” পরেশ কহিল, “সে আমি পরে দেখব। তবে মিসেস বোসের কাছে যা শুনছি, তাতে মনে হয় ডক্তরের কারন কিছু নেই, দুদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি অবশ্য এখনই আপনাকে কেনে ওখুঁধ খেতে দেব না—আগে দুদিন আপনাকে ওরাক করব, যাকে—দেখব।”

“বেশ তো দেখুন না হত হচ্ছে।” আরতি ফিক করিয়া হাসিয়া ফোলেই পরেশ লজ্জিতমুখে কহিল, “খামি তাই বলছি নাকি আমি বলছি, মানে—” আরতি কহিল, “খামি কি কলছেন—” বাসর উঠিয়া দাঁড়াইতেই পরেশ কহিল, “কোথায় যাচ্ছেন? আরতি কহিল, “বোধ হয় তেঁও পেয়েছে আপনার, জল নির্যাস।” বলিয়া ময়লাধি মত হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল। ফিরিল একটা কাচের প্লাসে জল লইয়া। পরেশের হাতে দিয়া কহিল, “খামি।” টকটক করিয়া সব জলটা গিলিয়া পরেশ কহিল, “সত্যি, ভারী তেঁও পেয়েছিল, কিন্তু কি করে জানলেন আপনি?” আরতি কহিল, “আপনার মুখ দেখে।” প্লাসটা নামাইতে বাইতেই আরতি হাত বাড়াইয়া ধরিয়া লইল। পরেশ সর্বোচ্চ সাহিত কহিল, “আমার খাওয়া প্লাসটা—” আরতি কহিল, “তাও ছোঁবার যোগ্য নই নাকি।” পরেশ কহিল, “আপনি সব কথা ভারী বাক্যেই দেখেন।” আরতি কহিল, “আমার বাক্য চোখ দে, সোজা দেখব কি করে?” পরেশ কহিল, “এই দেখুন রাগ করলেন আবার।” আরতি চোখ ভাগর করিয়া কহিল, “রাগ? আপনার ওপর? দয়া করে দেখতে এসেছেন—এই কত ভাগ্য আমার।” সন্ধানীত আসিয়া হাজির হইল, হাতে লেটে করিয়া পান। লেটেটা পরেশের সামনে নামাইয়া আরতিকে কহিল, “সব বলছিছ—ওকে?” আরতি কহিল, “উনি তো আমাকে দেখতে আসেন, কোথায় কলে যাচ্ছেন, এমনই—” পরেশ বাধা দিয়া কহিল, “মিথ্যে কথা।” দুই চোখে ঝালক হাসিয়া আরতি কহিল, “মিথ্যে কথা?” পরেশ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, “না না, তা নয়, মানে—কলে অবশ্য যাচ্ছি, তবে দেখতেও এসছি।” সন্ধানীত কহিল, “কি ব্যবস্থা করছেন?” পরেশ কহিল, “এখন কিছু করব না। ফিরাত পথে দেখা করে সব বলে দিয়ে যাব।” সন্ধানীত কহিল, “কখন ফিরবেন?” পরেশ কহিল, “যুব সম্ভব সন্ধ্যার আগে।”

পরেশ যখন ফিরল, তখন সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে; পশ্চিম আকাশে নির্বাপিতপূর্ণ আনন্দের আভার মত ক্ষীণ গোলাপী আভা লাগিয়া আছে। পূর্বকশে গাড় বেগুনি রঙের অশ্বকার ঘনাইয়া আসিতেছে। রাস্তার ধারে গাছগালাতে নাড়-প্রভাগত পাখাদের কলরব শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের কাছে আসিতেই পরেশ দূর হইতে দৌঁতে পাইল, আরতি থোকায় হাত ধরিয়া রাস্তার ধারে ধারে ধীরে ধীরে আসিতেছে। থোকায় সাহিত আলোপে সে এমনই মন হইয়া গিয়াছে যে, পরেশ কাছে আসিতেও সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। পরেশ ঘণ্টা বাজিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিল, ফলে আরতি থোকাকে লইয়া রাস্তার ধারের ঠিকে আরও একটু সরিয়া গেল; কিন্তু আলোপের স্রু অক্ষুর রহল। শব্দে ভাৱ গুপ্তে একটা আত মৃদু হাস যেন ফুটিয়া উঠিল। সামনে আসিয়া সশব্দে নামিয়া পরেশ কহিল, “কোথায় চলেছেন?” আরতি চমকিয়া চাইয়া কহিল, “ও! আপনি! আমি বাল—কে?” হাস চাটিয়া কহিল, “আপন। যে এ-রাস্তায় গেছেন, সন্ধ্যার আগে ফিরবেন, একেবারে কুলে গিয়াছিলুম।” পরেশ আত কহিল, “আমার কথা মনে রাখবেন—এমন সৌভাগ্য আমার নয়, তবু সে কথা নাই বা জানলেন।” আরতি হাসিয়া কহিল, “রোগীদের সব সময় আপনাকে মনে গেঁথে রাখতে হবে নাকি?” পরেশও হাসিয়া কহিল, “রোগীদের নয়—রোগিনীদের।” আরতি মুখ লাল করিয়া চোখের কোণে বিদ্যুৎ হাসিয়া কহিল, “তাই নাকি।”

তিনজনে গ্রামের দিকে পথ চলিতে লাগিল। পরেশ একেবারে রাস্তার ডান পাশ ঘেরিয়া—তাহার ডান হাতে সাইকেল; আরতি ও থোকা রাস্তার মাঝে। আরতি কহিল, “রাস্তার অত ধারে যাচ্ছেন কেন? যে বড় বড় ঘাস—সাপ থাকতে পারে।” পরেশ অগ্রাহ্যের সুরে কহিল, “শীত-কালে সাপ ফোলা?” আরতি কহিল, “আপন। তো সবই জানেন। সেদিন দেখেছি একটা সাপ এই রাস্তাতেই—রাস্তার এ পাশ থেকে ওপাশে চলে যাচ্ছিল।” আশ্চর্যের সুরে কহিল, “আপনি এদিকে সরে আসুন।” পরেশ আশ্চর্য পালন করল।

আরতি কহিল, “যাকে দেখতে গিরোঁদিলেন, পুতু, না মেরে?”

“পুতু, না।”

“কি হয়েছিল?”

“টাইফয়েড।”

আরতি সজরে কহিল, “ওরে বাবা! পাড়াগারেও ওসব রোগ আছে নাকি?” পরেশ হাসিয়া কহিল, “আছে বই কি! না হলে আমাদের চলবে কেন?” আরতি কহিল, “আপনার মত ডাক্তারের কিন্তু পাড়াগারে পড়ে থাকা ঠিক নয়। কি আর হবে এখন, লোকে জে

হেতে পার না শুন, টাকা মেবে কে? শহরের যে কোন ডাক্তার হাজার কা রোগাগার করে—” পরেশ কহিল, “সবাই করে না, দাঁটারজন করে।” রাত উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, “আপনি যে সেই দু চারজনের একজন? ন না, তা কে বলবে? বিদ্যে-বুদ্ধি-জ্ঞান আপনার তাহের চেয়ে এক রকম কম নয়।” পরেশ চুপ করিয়া রহিল। আরতি কহিতে লাগিল, গাড়াগারে প্রাক্টিকটনের কত অব্যবহিত দেখুন; ইচ্ছা ও সংগতি থাকিলেও রাত কিনতে পড়েন না। একটা দুয়ের কল থাকিলে সারা দিনটাই ট। তা ছাড়া ভবিষ্যৎও একেবারে সমীপস্থ; নতুন নতুন লোকের সা-যাওয়া নেই, লোকের আর্থিক উন্নতিরও কোন সম্ভাবনা নেই। কাজেই এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে একই অবস্থার আপনাকে চিরদিন কাটিয়ে তে হবে।” পরেশ কহিল, “সত্যি।”

ইতিমধ্যে থোকা পিছনে পড়িয়াছিল, আরতি আরও কাছে ঘেষিয়া সিয়াছিল, পরেশ সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়া আরতির সমিধা অনুভব করিতেছিল, রাতের সংপরামর্শে তাহার মন ছিল না। হঠাৎ আরতির হাতে হাত লাগিতেই পরেশ যেন বিদ্যুতের শক্ খাইয়া সরিয়া গেল, রাতও ধর্মকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “থোকা কোথায় গেলো?” থোকা উঠা আসিয়া সঙ্গ লইল।

হেডমাস্টার মহাশয়ের বাড়ির কাছে আসিয়া পরেশ কহিল, “আজ : হয়ে গেল, বাড়ি যাই। কাল এসে আপনার ব্যবস্থা করে দেব।” কিয়া দাঁড়াইয়া আরতি পরেশের মথের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চাইয়া রহিল; তারপর প্র দুইটি ষষে কুণ্ডিত করিয়া কহিল, “এইজন্যে ক এতটা রাস্তা এগিয়ে গিয়ে আপনাকে ধরে নিয়ে এলাম।” পরেশ হাসিয়া লয়া কহিল, “তবে যে তখন বললেন, আমার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।” টিপিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া আবদারের সুরে আরতি কহিল, “গিচ্ছলুমই।” কিন্তু দুই দৈর্ঘ ভেলেনি। সারা বিকাল বসে আপনাকে রাগে প্রাণার আয়োজন করচো।” পরেশ বিস্ময়ের স্বরে কহিল, “তাই ক?” ভারী অনায়া! মিথোমিথি আমার জন্যে—” আরতি কহিল, “আমাকে বলে কি হবে? আমি কিছু জানি না। যা যা বলবার কৈ গিয়ে বলবেন।” পরেশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আরতি লে, “দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, চলুন—কতটা রাস্তা হটিলুম বলুন ও আপনার জন্যে?” পরেশ কহিল, “সত্যি।” কক্ষার দিয়া আরতি ল, “সত্যি তো দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন কেন?”

এই তরল অঙ্গকারে আরতির দেহের অতি সান্নিকট তাহল সহিত মৌখী দাঁড়াইয়া থাকতে পরেশের ভাল লাগিতেছিল; এত শরীর চাল-লাগা ভাবটিকে হারাতে তাহার মন চাহিতেছিল না। আরতি মান খন স্বরে কহিল, “যাবেন না তো!” পরেশ কহিল, “চলুন।”— যা আরতির সঙ্গে চলিল।

সেদিন রাতি এগারোটার সময়ে পরেশ বাড়ি ফিরিল। মাসীমা ইয়া পড়িয়াছিলেন; হকিডক করিয়া তাহাকে ডুলিতে হইল। মা নিম্নাভিজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এত রাত হাল?” পরেশ ল, “রোগের ভারী বাড়াবাড়ি হইয়াছিল—রোগী ভাল না সামলায়ে ত ছাড়তে চাইল না তারা—”

(২৩)

কয়েক দিন পরে। পরেশ সকালে ডিসপেন্সারিতে বসিয়াছিল। কাজ-হাতে কিছু ছিল না। কমলা ও আরতির কথা ভাবিতেছিল। এ নের মধ্যে কমলার সহিত কতকবারই দেখা হইয়াছে, জীমতীর খন্ডা কথাবার্তাও হইয়াছে। কিন্তু কমলার উপর ইহার মশাই নিন স্বব্ববোধ জন্মিয়াছে যে, তাহাকে দোখার, তাহাকে জানিবার : ও ভেৎসকা অনেকটা স্টিমিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই মন কমলার আরতির চিন্তায় বেশি ব্যাপ্ত থাকিতেছে। এ কয়দিন সে নিয়ামত-সম্মা হইতে রাতি দশটা পর্যন্ত আরতিদের ওখানে কাটাইয়াছে; তদের সঙ্গে বেড়াইয়াছে; আরতিগ না শুনিয়াছে; আরতির সহিত করিয়ছে ও নানা বিষয়ে আলোচ করিয়াছে। তাহার কাছে এই দ্রাবনের স্বকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করিয়া বাহিরের বিকৃত কর্মক্ষেত্রে করিয়া কর্মজীবন শুরুর কারার প্রেরণা পাইয়াছে, তাহার শিক্ষিত মার্জিত মনের সৌন্দর্য, মধুর ও উজ্জ্বলো মৃদু হইয়াছে। সে ত পারিতেছে, তাহার হৃদয় আরতির প্রতি একটি আকর্ষণ অনুভব তছে। সে অকর্ষণ প্রতিদিন প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। তাহার দন একটি ময়ের সঙ্গে বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ব্যতির পক্ষে

ইহা যে অন্যায়, তাহা সে বলে। প্রতিদিন সম্পদ করে—চিকিৎসা সম্ভার্য আমন্ত্রণ রক্ষা ছাড়া আর কোন করণে আরতিদের বাড়ি যাইবে না। তবু সম্মা হইলেই পুত্র রাত্র বিদ্যা মূহুর্তে আরতির মৃদু ও চোখের আমন্ত্রণ মনে পড়ে—কাল আসবেন তো! আর স্থির থাকা যায় না—যথাসময়ে গিয়া হাজির হয়। এ কয়দিনে আরতি আরও নিকট-বর্তী হইয়াছে। তাহার ব্যবহারে সৌজন্যের চেয়ে সৌহার্দ্যের মাত্রা বাড়িয়াছে। প্রিয়বান্ধবীর সুরে প্রিয় আশীষার সুর মিশিয়াছে। কাল রাতির কথা মনে পড়িল—বড় আসিবার সময়ে আরতি ও সতেনবাবু তাহার সঙ্গে কতকটা রাস্তা আসিয়াছিলেন। ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল— তাহর গায়ে চাদর ছিল না। আরতি তাহার নিজের গায়ের শাল তাহাকে দিয়াছিল। সে লইতে চাহে নাই—আরতি জোর করিয়া তাহার গায়ে ঢাপাইয়া দিয়ছিল। সেই শাল গায়ে লড়াইয়া আরতির দেহের উষ্ণতা ও সুরতি সর্বাঙ্গ দিয়া পান করিয়া পরেশের যেন নেশা লাগিয়া গিয়াছিল। জগদীশ কম্পাউন্ডার আসিয়া কহিল, “ডাক্তারবাবু ডাকছেন আপনাকে।” পরেশ কহিল, “কেন হে?” জগদীশ কহিল, “জানি না। আপনি আসুন।” পরেশ কহিল, “চল, হাচ্ছি এখনই।”

ডিসপেন্সারিতে গিয়া পরেশ দেখিল, কার্তিক ডাক্তার অত্যন্ত ব্যস্ত। চারিদিকে ভাড় করিয়া রোগী ও রোগীদের আত্মীয়স্বজনের দল — কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বেগিতে বা মটিতে বসিয়া। পরেশ গিয়া বসিতেই কার্তিক মৃদু ভুলিয়া চাইয়া কহিলেন, “এসেছ? বস।” কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, “সেদিনকার সেই রোগীর বাড়িতে এবার ডেকে পাঠিয়েছে।” পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন হচ্ছে সে?” কার্তিক কহিলেন, “ভালই আছে; তবু আর একবার দেখাতে চায়।”

একজন ভিল গ্রামের লোক—বাসাস প্রোট, অত্যন্ত বিনয় সহকারে প্রশ্ন করিল, “হীন কে?” জবাব দিল আর একজন লোক—এ্যাংগা, কহিল—কার্তিক-ডাক্তারের একজন দালাল, “আমাদের জামাইবাবু হচ্ছেন হীন, আসছে মাসে বিয়ে হবে—মাটকল কলেজের পাশকরা ডাক্তার।”

প্রোট ব্যক্তিটি বিস্ময়ে ও লক্ষ্য অতিভূতপ্রায় হইয়া কহিল, “সত্যি! তা হলে তো আর আমাদের সহরে যেতে হবে না।” চোখ দুইটা বজ্রা মাথার কাঁকানি দিয়া দালাল কহিল, “না, তাদের চেয়ে কিসে কম আমাদের জামাইবাবুজী! একই কলেজে একই মাস্টারের কাছে একই বেগিতে বসে পড়া একই বিদ্যে—এই তো সেদিন শালডাংগায় টাইফট রোগী দেখে এসেন, ছোয়া মাত্র রোগী আপশেক আর ম হয়ে গেছে বসে গেল এইমাত্র।”

পরেশ জানে, এই লোকটাই এতদিন তাহার বিরুদ্ধে যা-তা কথা বলিয়া গ্রামে নিন্দা প্রচার করিয়া তাহার অনেক রোগী ভাঙাইয়াছে। কার্তিক-ডাক্তারের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা হওয়া মাত্র ইহাকেই তাহার প্রশংসায় পূর্ণমুখে হইতে দেখিয়া সে মনে মনে হাসিল। কে একজন লোক কহিল, “জামাইবাবুকে একটা হাওয়াগাড়ি কিনে দেন ডাক্তারবাবু। আর কোট প্যান্ট করিয়ে দেন, তা হলেই তো সহরের ডাক্তার।” দালাল কহিল, “হবে হে, হবে। সব হবে, তোমরা তোমাদের গায়ের রসতাগালো লাগাও গে দেখি—একবারে ঘুঘুঘু করে ঘরের দরজা পর্যন্ত গাড়ি চলে যাবে।”

কার্তিক কহিলেন, “এখনই যেতে হবে। পারবে তো?” পরেশ কহিল, “হ্যাঁ, যচ্ছি, এখনই” বলিয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল।

কার্তিক ডাক্তারের বাড়ির পাশ দিয়া একটা সরু গলি আছে, এই গলি দিয়া গেলে নতুন পুকুরের পাশ দিয়া পরেশদের বাড়ি অথপ সময়েই যাওয়া যায়। এই নতুন পুকুরে এ-পাড়ার মেয়েরা স্নান করে। তাহা হইলেও পরেশ এই রাস্তা দিয়া চলিল। মন চিন্তিত—আরতিদের ওখানে শালটি ফিরাইয়া দিবার জন্য যাইতে হইবে; কখন যাইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়। এখন গেলে বেশীকণ বস যাইবে না। তা ছাড়া সতেনবাবু থাকিবেন, সময়ে অধিকাল তিনিই দখল করিবেন। তাহার চেয়ে ফিরিবার সময়ে যাওয়াই ভাল। সন্ধ্যতির বিবেচনা আছে, আরতি আলোচ করিতে আসিলে তিনি ভাগ বসন না।

হঠাৎ ভিজা কাপড়ের লক্ষ কানে আসিতেই পরেশ দেখিল, “কমলা অদূরে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে—মৃদু লক্ষ্য আরম্ভ। কাজ যাইতেই কমলা একটু পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। পরেশ ধর্মকিয়া দাঁড়াইয়া কমলাকে আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া লইল—ভিজা চুলের রাশ পিঠের উপর লুটাইতেছে, অকিবাকা চুলের গছে গাঢ় কৃষ্ণ সর্পিংশুর রঙ কান ও গালের উপর লতাইয়া রহিয়াছে, নাসিকা ও চিবুকপ্রান্তে জলবিন্দু টলটল কহিতেছে, ভিজা কাপড় দেখে আঁচিয়া বসিয়া পরিপূর্ণ বৌদনকে প্রতিভাত

মহাযুদ্ধের প্রধান
অস্ত্র—
“লোন্স”
আর
জীবনযুদ্ধের প্রধান
অস্ত্র
“লীন্স”

প্যালোডিয়াম
এস ও রেন্স
কোং লিঃ

—হেড অফিস—
১১ ভ্যান্স্টাট রো,
কলিকাতা
ফোন—কলিঃ ৯৭২

SWASTI & CO.
ENGINEERS &
SPRING Manufacturers



SPECIALISTS IN
MANUFACTURING: SPRINGS
& SPRING WASHERS
OF EVERY VARIETY

38, STRAND ROAD :: CALCUTTA

PHONE CAL. 1035.

সকল প্রকার স্প্রিং ও স্প্রিং ওয়াশারের একমাত্র বিশ্বস্ত ও
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। খরিসন্দারগণের অভাব ও অসুবিধা
নিরাকরণই আমাদের বিশেষত্ব।

SWASTI & CO.



SWASTI THE BEST

SPRING MANUFACTURERS. 38, STRAND ROAD CAL.

কলিকাতা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ

৩১, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

টেলিফোন :—খড়বাজার ১৩১৭ অফিস
১৫৯২ ক রথানা
৪৬২৭ রেসিং

টেলিগ্রাম :—“চীনমার্টী”

সোপাষ্টোন পাউডার, সিলিকেট সোডা, কষ্টিক সোডা নারিকেল তৈল,
মহুয়া তৈল, রজন, সিট্রোনেলা-অয়েল, রঙ, হাইড্রোমিটার ও
সাবান প্রস্তুতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

নিম্নলিখিত জিনিষগুলিও সরবরাহ প্রস্তুত থাকে :—

টালু পাউডার, ফ্রেঞ্চ চক, চীনা মাটি, ফায়ার ব্রিক, ফায়ার ব্লক, প্লাস্টার অফ প্যারিস,
ম্যাসানীজ ডাই-অক্সাইড, গ্লাস পাউডার, গ্রাফাইট পাউডার, গেক ও এলামাটি,
সিলিকা বালি, এসবেজটস কন্সট্রাক্শন ইত্যাদি বহুবিধ খনিজ পদার্থ এবং
নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্যাদি।

দর ও বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

করিতেছে। "পরেণ কহিল, "আর একটু সরে দাঁড়াও, না হ'লে ঘরে ঠেকাঠেকা হয়ে গেলে আবার স্নান করতে হবে।" কমলা আরও একটু ফিরিয়া দাঁড়াইল, মুখটি আরও নমাইল। পরেশ দেখতে পাইল—বুড়ের বসন দলিতেছে, নাকের ডগা ও চোখের সিক্ত পাতা দুইটি কাঁপিতেছে, অধরের প্রান্ত দুইটি ঈষৎ কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। পরেশ কহিল, "ভয় কিসের? গায়ে হাত দেখ না, পেরিয়ে যাও।" কমলা মৃদু কম্পিত-কণ্ঠ কহিল, "আপনি যান, শ্রীমতী দিদিমা ঘাটে রয়েছেন।" এখনি এসে পড়বে, দেখলে কত ঠাট্টা করবে এখন।"

"তাই নাকি! আজ যাব শ্রীমতী দিদির বাড়ি বিকেলে। যেও। যাবে তো?" কমলা ঘাড় নাড়িয়া 'হ্যাঁ' জানাইল। পরেশ পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিল। কিছু দূরে আসিয়া পরেশ মুখ ফিরাইল—দেখিল, কমলাও মুখ ফিরাইয়াছে—যরা পড়িয়া বীটীত মুখ ফিরাইয়া কমলা দ্রুতপদে গলি হইতে নিষ্কান্ত হইয়া গেল।

নতুন পড়কের ঘাটের সামনেই শ্রীমতীর সংগে দেখা হইল। হাসিয়া কহিল, "দেখা হ'ল নাকি?" পরেশ হাসিয়া কহিল, "হ'ল।"

"কথাবার্তা হ'ল নাকি?"

পরেশ কহিল, "না, যা লাজুক আপনার নাতনীটি। দেখবামাত্র দেওয়ারল সংগে নেকটে গেল।"

শ্রীমতী কহিল, "এ কি তোমাদের লেখাপড়া জানা সহরে মেয়ে ভাই যে, দেখবামাত্র গায়ে কাঁপিয়ে পড়বে? পাড়াগায়ের লাজুক মেয়ে আমাদের, অদর করে আশ্বাস দিয়ে ভয় ভাঙতে হবে।" হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, "আজকাল নাকি রাত দুপুরের আগে বাড়ি ফের না—কোথায় থাক বল দেখি?"

পরেশ কহিল, "কে বলছিল আপনাকে?"

"তোমার মাসীমা।"

পরেশ কহিল, "হেডমাষ্টার মশায়ের বাড়ি যাই। বন্ধুর মত ভাল-বাসেন আমাকে।" মৃচ্ছিক হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, "আর কেউ ভাল-বাসছে না তো?" পরেশ না বোঝার ভান করিয়া কহিল, "কে আর ভালবাসবে?"

"কেন, হেডমাষ্টারের শালী?" পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, "সহরের শিক্ষিত মেয়েরা এত সস্তা ভেবেছেন নাকি?" শ্রীমতী জবাব না দিয়া কহিল, "আচ্ছা চলি ভাই, রাতবারা করতে হবে।" যাইতে যাইতে আবার ঘামিয়া কহিল, "আজ বিকেলে যেও না — অনেক কথা গাছে তোমার সংগে।"

(২৪)

পরেশ যখন গ্রামে ফিরিল, তখন বেলা এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। হেডমাষ্টারের বাড়ির কাছে কমলা একপ অসময়ে বাড়িতে যাওয়া উচিত হইবে কিনা, এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া এবং কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বেপরোয়াভাবে বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িয়া বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "থেকো!" কোন সাড়া মিলিল না, কণ্ঠস্বর উচ্চতর করিয়া ডাকিল, "থেকো!" মেয়েলি কণ্ঠের সাড়া আসিল, "কে?" আরও কিছুক্ষণ পরে বৈঠকখানার জানালা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া উপরীক মারিয়া দেখিয়া আরতি কহিল, "ওমা! আপনি! দাঁড়ান দরজা খুলে দি।" দরজা খুলিয়া আরতি কহিল, "এত বেলায়? কোথাও কল ছিল নাকি?" পরেশ কহিল, "হ্যাঁ।" গা হইতে শালটা খুলিয়া কহিল, "আপনার শালটা।" আরতি শালটা লইয়া বাগের স্বরে কহিল, "কনবরত হ'ল ফোটাচ্ছল বুঝি।" তাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।" পরেশ অপ্রতিভ মুখে কহিল, "না, না, সে কি, মানে—এই রাস্তা দিয়ে যখন যেতেই হ'ল, ফিরিয়ে দিয়ে গেলো।" নমস্কার করিয়া কহিল, "আচ্ছা, আসি তা হলে।" আরতি বিস্ময়ের স্বরে কহিল, "সে কি! এই রোদে রোদে এলেন, এখনই রোদে রোদে ফিরে যাবেন!" পরেশ কহিল, "তা হোক, রোদে আমাদের কষ্ট হয় না।" বলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই আরতি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "যাবেন না, বসুন।" পরেশ সগিনয়ে কহিল, "দেখুন, এখন বাই, পরে আসব এখন। আপনারদের এখনও খাওয়া হয়নি বোধ হয়, এমনই দৌর করিয়ে দিলাম—"

আরতি কহিল, "তা হোক। আপনি বসুন। আপনারও তো এখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি।" চেয়ারে বসিয়া পরেশ কহিল, "আমরা পাড়াগায়ে মাদু—এত সকাল খাওয়া অভ্যাস নেই। আচ্ছা, আমি বসিছি—আপনি খেয়ে নিনে।"

১১

"বেশ! পালিয়ে যাবেন না যেন।" বলিয়া ছত্র হাঁপাতে 'সতর্ক' করিয়া দিয়া আরতি চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে আরতি আসিল—হাতে একটা থালায় যানকয়েক লুচি ও তরকারি, বাম হাতে জলের প্লাস। দেখবামাত্র পরেশ কহিল, "এসব কি করেছেন! নিজের না খেয়ে—" আরতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "এমন কিছু করিনি—সব তৈরি ছিল, গাছিয়ে নিয়ে এলাম মাত্র।" থালাটা পরেশের সামনে নামাইয়া দিয়া আরতি কহিল, "এই দেখুন। হাত ধোবার জল আনলাম না—আপনি প্লাসের জলেই হাত ধুয়ে আসুন।" পরেশ হাত ধুইয়া আসিয়া বসিল। আরতি কহিল, "খান, আমি জল নিয়ে আসি।" কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জলের প্লাসটি পরেশের টেবিলে রাখিয়া কহিল, "তরকারিটা খেতে কেমন লাগল? আমি নিজের হাতে রান্না করেছি।" পরেশ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "সত্যি?" উচ্ছ্বাসিতকণ্ঠে কহিল, "চমৎকার হয়েছে।" আরতি মুচকি হাসিয়া কহিল, "বুঝিই, মন রেখে বলছেন।" প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না না, কিছুতেই না—সত্যি বলছি, খুব ভাল হয়েছে। দেহাৎ আপনার ক্রম কম পড়ি যাবে, না হ'লে আরও একটু—" আরতি কহিল, "সত্যি নেবেন?" পরেশ লজ্জিত হইয়া কহিল, "ধাকগে।" আরতি কহিল, "ধাকগে কেন, নিয়ে আসছি।" বলিয়া পরেশকে আর আপত্তি কববার অবসর না দিয়া চলিয়া গেল এবং অবিলম্বে একটা প্লেটে করিয়া কতকটা তরকারি লইয়া ফিরিয়া আসিল। পরেশ কহিল, "একটুখানি দিন।"

খাইতে খাইতে পরেশ কহিল, "দেখুন আপনার ভাগ সাবাড় করে দিলাম না তো?" আরতি কহিল, "না, আর দিলেও মেয়েরা তাতে ভয় করে নাকি? নিজেরা না খেয়ে আশ্রয়-স্বজন-বন্দু-বান্ধবদের খাওয়ানোতেই তো তাদের আনন্দ।"

ইহাদের মধ্যে নিজে কোন দলে পড়িল তাহা ঠিক করিবার জন্য আরতির মুখের পানে তাকাইতেই পরেশ দেখিল, আরতির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে—দেখিয়া পরেশ প্লামিত হইল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে পরেশ কহিল, "আপনি সঙ্গসতী দেখাওকেও, হার মানিয়েছেন। সঙ্গসতী লেখাপড়া গানবাজনার ওস্তাদ ছিলেন শূনি—কিন্তু রান্না-বাগা জনতেন কিনা শাস্ত্রে তার কোন উল্লেখ নেই; কিন্তু আপনি সব বিন্দ্যতেই সমান নিপুণ।" আরতি আনন্দোচ্ছ্বাসমুখে কহিল, "মন খেয়েই গুণ গঠতে শুরূ করলেন যে! কিন্তু নুন তো আমার নয়, যার নুন—" পরেশ কহিল, "সত্যি! মিসেস বোসকে দেখছি না!" আরতি গম্ভীর হইয়া কহিল, "সকাল থেকেই দিদির শরীরা খারাপ হয়েছে, শুরূ আছে—" উৎকণ্ঠার সহিত পরেশ কহিল, "তাই নাকি? কি হয়েছে?" আরতি কহিল, "ফিৎ হয়েছে কি করে বলব বলুন! আসছে এখনই, জিজ্ঞাসা করবেন।"

সুনীতি আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখখানি শূন্য, মাথার চুল বিশৃঙ্খল, কুচা চুলগুলি কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। নমস্কার করিয়া বসিয়া ডান হাতে কপালের চুলগুলি সরাইতে লাগিল। আরতি পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ কহিল, "কি হয়েছে আপনার?" সুনীতি ক্রান্তকণ্ঠে কহিল, "ভারী মাথা ধরছে—গা-হাত-পাশে বেদনা।" পরেশ কহিল, "জিবটা বার করুন দেখি।" আরতি ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "করো না দিদি! বলবামাত্র মা কালীর মত জিব বের করতে হবে—ডাক্তারদের যত সব জুড়ুমে!" পরেশ কহিল, "আপনার উপর তো কোন জুড়ুম করিনি।" আরতি কহিল, "কোনোনা আবার কি! দিগ্গী ওখুধ দিয়েছেন, গিলতে হচ্ছে তো আমাকে।" সুনীতি হঠাৎমধ্যে জিব বাইর করিয়াছিল; দেখিয়া পরেশ কহিল, "একটা পার্শ্বোটিত নেওয়া দরকার; তৈরি করে রেখে দেব; ঝিক পাঠিয়ে দেবেন, নিয়ে আসবে।" আরতি পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "আপনি তো সন্ধ্যার সময় আসবেন—তখন নিয়ে আসবেন।" পরেশ তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই দুইজনে চোখাচোখি হইল—আরতি মুহূর্ত কয়েক স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল। পরেশ কহিল, "তার আগেই খাওয়া দরকার।"

সুনীতি কহিল, "উনি আজ বলাইছেন—পরেশবাবু এতদিন ধরে আরতিকে দেখছেন—ওর ফাঁটা পেঁচা হয় নি। আপনার—" পরেশ বাধা দিয়া কহিল, "ফাঁ তো দিয়েছেন।" সুনীতি আরতির দিকে তাকাইয়া বিশ্বাসের স্বরে কহিল, "তুই কি দিয়েছিল নাকি?" আরতি লজ্জাক্ত মুখে কহিল, "দিদির যেমন কথা। আমি দিলে তেমনা জানবে না?"

নিতান্ত
প্রয়োজন
না হইলে

ভ্রমণ
করিবেন না

রেলওয়ের

যাত্রী ও মাল বহনের
ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং
উহাও যুদ্ধজনিত
অত্যাবশ্যক প্রয়ো-
জনীয় কার্যে নিযুক্ত।

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে

ইণ্ডিয়া সাইকেলের ব্যবহার

ব্যবহার কারিগর
বাস্তানীর গৌরব
অক্ষুণ্ণ রাখুন



দি ইণ্ডিয়া সাইকেল
ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ
কলিকাতা

পরে শ্রীমতীকে দুই বোনে দিকে তাকাইয়া ছিল, কহিল, “আপনারা সবাই মিলেই দিয়েছেন, স্নেহ—প্রাণা” সুনীতি কহিল, “ওঃ! এই! কিন্তু শূন্য স্নেহ আর প্রাণা নিয়ে তো ডাক্তার করা চলে না পরেশবাবু, তা ছাড়া ওষুধ দিয়েছেন, তার দাম তো তিতে হবে।” পরেশ কহিল, “না না, ও কথা বলবেন না। আমার নিজের লোকদের অসুখ হলে কি আমি ফাঁ নিই, না ওষুধের দাম নিই—আপনারদের আমি তাইই ভাবি।”

অরতি পরেশের মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া ছিল, পরেশ তহার দিকে মৃৎ ফিরাইতেই মৃৎ নামাইয়া লইল।

(২৫)

সৌদন বিকালে পরেশ শ্রীমতীর বাড়িতে গিয়াছিল। শ্রীমতী বলিয়া বলিয়া চরকা কাটিতেছিল, পরেশকে দেখিয়া বলিয়াছিল, “কহে। গন্ধ পেয়েছিলে নাকি?” পরেশ ভাল মানুষের জান করিয়া কহিল, “কার?” শ্রীমতী চোখ মৃৎ ঘুড়াইয়া কহিল, “ন্যাকামি করো না। কেন, কমলার?” পরেশ নিরীহের মত কহিল, “এসেছে নাকি?” হাসিয়া শ্রীমতী কহিল, “না হে। মিছে করে বলছিলাম। তা কি জন্য এসেছে বল দেখি?” পরেশ ক্ষুর স্বরে কহিল, “সে কি দিদিমা—আসতে বলেছিলেন যে।” কৃত্রিম গান্ধীরের সহিত শ্রীমতী কহিল, “বলেছিলাম নাকি। ভুলে গেছি, তা বাস ভাই।” বলিয়া চরকা ঘুড়াইতে লাগিল। পরেশ কহিল, “থাকগে আর বসব না। আপনি কাজ করছেন, চলি তা হলে।” বলিয়া চলিয়া আসিতে উদাত হইলেই শ্রীমতী কহিল, “চলে যাচ্ছে কেন হে। এস না—কমলার নাই বা থাকল, আমার সঙ্গেই না হয় একটু গল্প কর। চরকা আমি বন্ধ করছি।” পরেশ কহিল, “না থাক।” বলিয়া কতকটা চলিয়া আসিতেই শ্রীমতী কহিল, “যাও তো মাথা খাও আমার, শুনো যাও, কথা আছে।” পরেশ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “কি কথা?” শ্রীমতী কহিল, “মোড়ার জিন দিয়ে থাকলে কি কথা বলা যায়? বাস শ্রীর হয়ে।” পরেশ একটা আদন টানিয়া বলিয়া পড়িল। শ্রীমতী চরকা ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সরাইয়া রাখিয়া পরেশের কাছে আসিয়া বলিয়া কহিল, “কমলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে?” পরেশ জবাব না দিয়া মৃৎকি হাসিল। শ্রীমতী কহিল, “আমি এখনই ডেকে এনে দেখা করিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। আমি কুলীন বাবুদের মেয়ে—আজম ব্রহ্মচারিণী (পরেশ মনে মনে হাসিল), তা ছাড়া তোমার গদ্যবুদ্ধি, আমার পা ছুঁয়ে তোমাকে বলতে হবে যে, এক মাসের মধ্যে তুমি কমলা ছাড়া আর কোন ছুঁড়ীর সঙ্গে মিশবে না।” পরেশ হাসিয়া কহিল, “তা হলে তো মাসখানেক আমাকে ডাক্তারি বন্ধ করে বাড়িতে বসে থাকতে হবে।” শ্রীমতী ব্রীক্ষস্বরে কহিল, “কেন! ছুঁড়ীদের চিকিৎসা না করলে বন্ধি ডাক্তার করা যায় না?” পরেশ গান্ধীরমুখে কহিল, “ডাক্তারি করতে গেলে অত বড়ী ছুঁড়ী বাছলে চলে না। যে ডাকবে তরাই কাছে যেতে হবে।” শ্রীমতী কহিল, “বেশ, তা ষেও। কিন্তু রাত দুপুরে পর্যন্ত আড্ডা দিও না।” পরেশ বিশ্বাসের ভান করিয়া কহিল, “রাত দুপুরে পর্যন্ত কার কাছে আড্ডা দিই আমি? শ্রীমতী কহিল, “কেন, ঐ শহুরে ছুঁড়ীটার কাছে, দাও না?” পরেশ কহিল, “কে বললে আপনাকে?”

“দুঃখের মা। তোমাদের বাড়ি থেকে ওষুধ নিয়ে বাচ্ছল সৌদন—ডকে জিজ্ঞাসা করতেই সব বলে গেল।”

“তা ভুললোক নেমন্তর করে পাঠালে তো না গিয়ে পারি না।” দিদিমা শ্রীমতী কহিল, “কিন্তু ঐ ছুঁড়ীটার চাল-চলন ভাল নয়, নেনি—হয়তো এমন গুণে করবে যে, শেষে বাবুদের কুসুর হয়ে কয়েতের ভীতে মৃৎ দিয়ে বসবে।” পরেশ ধারালো স্বরে কহিল, “পাগল হয়েছেন কি?” উপরে ও নীচে মাথা নাড়িয়া শ্রীমতী কহিল, “হ্যাঁ। পাগলই তো।” বলিয়া দুই ঠোঁট চাপিয়া ভীক্ষু দৃষ্টিতে পরেশের মুখের পানে তাকাইয়া ছিল। হঠাৎ ‘খুৎ’ করিয়া কাসির শব্দ হইতেই পরেশ উৎকর্ণ হইয়া ঠিল, শ্রীমতী রাগত স্বরে কহিল, “ছুঁড়ীর আর তর সইছে না।” প্রহরে স্বরে পরেশ কহিল, “কমলা রয়েছে বন্ধি?”

“হ্যাঁ হে আছে। তাজিরে দিরেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই গেল না। যে করেছ ওকে!” হাঁকিয়া কমলার, “ওলো! এখানে আর বেশি, বলবার আছে বল।” কমলা আসিল না। শ্রীমতী কহিল, “না হয় মই চলছে। এস দেখি।” বলিয়া পরেশের হাত ধরিয়া টানিয়া ইয়া গেল। দরজার পাশে দেওয়াল ঘেঁষিয়া কমলা দাঁড়াইয়া ছিল—বঁধনে কালাপাড় শান্তিপুত্রী শাড়ি ও সোঁজ, বাঁধার একটা খোঁপা,

নতমস্তকে ডান পার্শ্ব বড়ী আঙ্গুল দিয়া মাটি খুঁড়িতেছিল। তাহার সামনে পরেশকে দাঁড় করাইয়া দিয়া শ্রীমতী কহিল, “আমার গর ছুঁতে তো ইচ্ছে হ'ল না। বেশ, কমলার গা ছুঁয়েই প্রতিজ্ঞা কর।” পরেশ বগ করিয়া কমলার বাম বাহু চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “কি বলতে হবে বলুন।” শ্রীমতী কহিল, “বল তোমাকে ছাড়া কউকে ভালবাসব না, যদি বাস, যাকে বাসব তার মাথা খাব।” পরেশ হাসিয়া কহিল, “আচ্ছা বলছি—তোমাকে ছাড়া কউকে ভালবাসব না, হ'লতো?” শ্রীমতী কহিল, “বাকীটুকু বল।” কমলা ধর ধর করিয়া কাঁপিতেছিল, এই শীতের দিনেও তাহার কপালে মৃত্যুবিশ্বর মত শ্বেদ বিস্মৃৎ ফুটিয়া উঠিল। পরেশ কোমল নারী দেখে চাপ দিয়া কহিল, “বাকীটুকু যত্নে আসবে না—মনে মনে বলছি।” শ্রীমতী কমলাকে কহিল, “ওলো, তোর কি বলবার আছে বল দেখি।” কমলা শ্রীমতীর দিকে কটাক্ষ করিয়া মৃৎ নামাইল। শ্রীমতী কহিল, “বেশ। লক্ষ্য করিস তো আমি না হয় চলে যাই।” বলিয়া দরজা ভেঙাইয়া দিয়া কহিল, “তোমরা বোঝাপড়া কর ভাই, আমি একটু আসছি।”

পরেশ প্রতিজ্ঞা-ভাষণ শেষ হইলেও কমলার হাত ছাড়ে নাই। কমলা ফিস ফিস করিয়া কহিল, “হাতটা ছাড়ুন।” পরেশ কহিল, “আর কি কি প্রতিজ্ঞা করতে হবে বলে ফেল—একেবারে সেরে নিই।” জোর করিয়া হাতটা ছাড়িয়া লইয়া কমলা কহিল, “কিছু প্রতিজ্ঞা করতে হবে না আপনাকে।” ঢোক গিলিয়া গাড় কঠে কহিল, “আমাকে ভাল লাগে না আপনার—” পরেশ কহিল, “ভাল লাগবে না কেন?”

“আমি কালো, মূখ্য, তাই—”

পরেশ চুপ করিয়া চাহিয়া রাইল। কমলা ধরা গলায় কহিল, “আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে না হয়, বাবাকে বলে দিন না কেন। মিথো কেন আশা দিচ্ছেন?” বলিয়া পরেশের মুখের দিকে একবার চোখ তুলিয়া আবার নামাইয়া লইল। পরেশ কহিল, “তোমাকে আমার ভাল লাগে না—তোমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই—এ সব কথা জানলে কি করে?” কমলা জবাব না দিয়া পরেশের দিকে পিছন ফিরিয়া দেওয়ালে আগলে দাঁড়িতে লাগিল। পরেশ কৃত্রিম উদ্বেগের সহিত কহিল, “কি এমন করেছি আমি যে, দিদিমা যা-তা বললেন, তুমি রাগ করেছ?” কমলা অশ্রুধন কঠে কহিল, “পাড়গেয়ে কালো কুৎসিত মেয়ের আবার রাগ-অভিমান করতে আছে নাকি? আর করলেও কার কি আসে যায়।” এই কিশোরী মেয়েটির অভিমান কাচামিঠে আমের মত পরেশের ভাল লাগিতেছিল, ইহাকে চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করবার জন্য পরেশ কহিল, “তোমাকে যারা ভালবাসে তাদের আসে যায় বই কি?” কমলা কহিল, “তা হয়তো যায়, কিন্তু আপনার?”

“আমারও আসে যায়, তোমার সঙ্গে যখন দুর্দিন পরে বিয়ে হবে আমার।” তবু চাপা স্বরে কমলা কহিল, “আর বিয়ে হয়ে কাজ নেই, যাকে ভাল লাগে না, তাকে বিয়ে করে সারা জীবন নিজের জ্বলবেন, আর তাকেও জ্বলাবেন।”

পরেশ কহিল, “বেশ, আমি তা হলে যাই।” মেয়েটি চিকিতে মৃৎ ফিরাইয়া অশ্রুসজল কঠে কহিল, “চলে গেলেই তো বচেন আপনি।” পরেশ কহিল, “তা কি করব? তুমি মিছেমিছে রাগ করছ, যা তা বলছ।” কমলা কহিল, “কি যা তা বললাম আমি?” পরেশ আত্ম ম্বরে কহিল, “যা তা বলনি? আমাকে যে তোমার বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই, সে আমাকে বলে লাভ কি? তোমার মা বাবাকে বলে কিংবা শ্রীমতী দিদিমাকে দিয়ে বলিও।” কমলা মৃৎ ফিরায়া দাঁড়াইয়া কহিল, “কখন আমি ও-কথা বললাম?”

“তা বললে বরঞ্চ! আমাকে বিয়ে করে সারা জীবন জ্বলবে—বল নি তুমি?” কণ্ঠস্বর গাড় করিয়া পরেশ কহিল, “বেশ, আমি চিঠি লিখে তোমার বাবাকে সব জানিয়ে দিয়ে ভেঙে দিতে বলব।” বলিয়া দরজার দিকে চলিল। কমলা আগাইয়া আসিয়া কহিল, “দেখুন, মিথো যা তা লিখবেন না। আমি যে আপনাকে একথা বলতে পারি, বাবা বিশ্বাস করবেন না। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে যে আমার এমনই দেখা হয়, মা ছাড়া আর কেউ জানে না।”

পরেশ কহিল, “শ্রীমতী দিদিমাকে সাক্ষী মানব।” কমলা কহিল, “শ্রীমতী দিদিমা সাক্ষী বলেন না।”

“বেশ বাঁ হাতে তোমার নাম দিয়ে চিঠি লিখব।” কমলা ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল, “আমি তো চিঠি লিখতে জানি না।” পরেশ

আপনার আজকের
“সেনকো”

আপনার ভবিষ্যতের সহায়।

দুঃখ, দৈন্য ও দুর্দশার
মাঝেও কিছদ কিছদ সঞ্চার
করিতে চেষ্টা করুন।

ইউনাইটেড

ব্যাকিং কর্পোরেশন লিঃ

—হেড অফিস—

২০।১সি, লালবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

—শাখাসমূহ—

ভাঙ্গা ও গোপালগঞ্জ
খাগ ও ওড়ারডালদুর্গ সদ্যবিধানক
সত্তে’ অনুমোদিত সিনিকউরিটির উপর
দেওয়া হয়।

সর্বপ্রকার ব্যাকিং কার্য
করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর্স—

মিঃ এন. এল. মুনোজ, বি-এ

মিঃ এস. কে. ভট্টাচার্য, বি-এল

“সেনকো”
ব্যাটারি



মটর গাড়ী
রেডিওতে

ব্যবহার করুন।

ম্যানুঃ ইলেকট্রিক্যাল স্টোরেজ কোং,
পোস্ট বক্স ৬৮৭ টেলি “সেনকোব্যাট”,
কলিকাতা।

—হাওড়া—
কুষ্ঠ-কুটার

অর্ধ শতাব্দিক বৎসর
যাবত

কুষ্ঠ-ব্যাধির
আদি চিকিৎসাকেন্দ্র

কুষ্ঠ, ধবলাদি

লিখিলেই বিচ্ছিন্ন
বিবরণাদি সম্বলিত
পুস্তিকা ও অন্যান্য
জ্ঞাতব্যাদি পাঠান হয়।

চর্মরোগ

চিকিৎসায় এই প্রতিষ্ঠানের সুযশ সর্বজনবিদিত। ধবল বা শ্বেতি, অসাড় ও গলিত
কুষ্ঠ, গায়ে শিথিল বর্ণের দাগ, অংগাদি ফোলা, আংগুলাদির বক্রতা, বাতরক্ত, একজিমা,
সোরাইসিস্ প্রভৃতি নানাপ্রকার চর্মরোগাদি ও দূষিত ক্ষতাদি নিদোষ নিরাময়ের
ইহাই আপনার নিতরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ঠিকানাঃ—হাওড়া কুষ্ঠ-কুটার
প্রতিষ্ঠান—লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ কুষ্ঠ চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ

১নং মাধব ঘোষ লেন, খরুট, হাওড়া। (ফোন—হাওড়া ৩৫৯)

শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কহিল, “না-ই বা জানলে, পাড়ার কোন মেয়েকে দিয়েও তো লেখাতে পারি!”

কমলা কহিল, “আমাদের বাড়ির বা পাড়ার কোন মেয়ে লিখতে জানে না।” অসহায়ভাবে পরেশ কহিল, “তা হলে কি করব, বল? আমাকে বিয়েও করবে না, অথচ এমনই করে ধমকাবে!”

কমলা কহিল, “আপনাকে ধমকলাম নাকি?”

“ধমকালেই তো! একটীবার ছুঁয়েছিলাম তো এমনই জ্বোরে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে যে হাত এখনও বাথা করছে।” বলিয়া বাম হাতটি ডান হাতে ব্লাইতে লাগিল। কমলা কাছে আসিয়া কহিল, “কই দেখি আপনার হাত — আমি হাত বলিয়ে দিচ্ছি।” বলিয়া হাত বাড়াইতেই সরিয়া দাঁড়াইয়া পরেশ কহিল, “থাক, থাক, আমাকে ছুঁলে তোমার জাড ধরে, আমি হাড়ি-ডাম—” কমলা হাসিয়া ফেলিয়া থপ করিয়া পরেশের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “এই দেখুন ছুঁয়েছি—হাল তো! দেব বলিয়ে হাত?”

পরেশ গাড়কণ্ঠে কহিল, “দাও, কিন্তু আরও একটু কাছে সরে এস না।” ঘাড় নাড়িয়া আবদারের সুরে কমলা কহিল, “না—পরকণ্ঠেই কহিল, কেন?” পরেশ ঝট করিয়া হাত বাড়াইয়া কমলাকে জড়াইয়া ধরিয়া বৃক্কের কাছে সজ্ঞারের টানিয়া আনিতে উদাত হইল। কমলা দুই হাত পরেশের বৃক্ক দিয়া টেঁলেতে টেঁলেতে প্রস্তম্বের কহিল, “এখন না, বিয়ের পর। তখন কিছু মানা করব না।” তাহার ভীতা হরিণার মত ভয়ান্ত দৃষ্টি, মুখের বিবর্ণ ব্যাকুলতা, কণ্ঠের কণ্ণ কাকুতি পরেশের মুহূর্তের আত্মবিশ্মিতিকে তীব্র কশাঘাতে নিরস্ত করিল। ছাড়িয়া দিয়া দস্তাভাঙ্গ মুখে কহিল, “কিছু মনে করো না কমলা, মাগ কর আমাকে।” বলিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইতে উদাত হইতেই কমলা সান্দ্রনয়ন কণ্ঠে কহিল, “আপনিও কিছু মনে করবেন না—বিয়ের আগে ও-সব ভাল নয়, ওতে অমঙ্গল হয়।” পরেশ বাহিরে পা দিতেই কমলা কহিল, “কোথায় যাচ্ছেন? পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, “বাড়ি যাচ্ছি।” কমলা কহিল, “বসুন না—নির্দিষ্টমতে ডেকে আনি, গল্প করুন।”

“আর তুমি?”

“আমি একধারে বসে বসে শুনব।”

“তাতে তোমার লাভ?”

“আমার ভাল লাগে আপনার কথা শুনতে—” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “আমার ওপর রাগ করেন নি তো?” পরেশ কহিল, “তুমিও করে না?”

সম্ভার অশ্রুকারে বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে পরেশ আজ বিকালের ঘণ্টা মনে মনে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। আজ সে স্ত্রীমতীর বাড়ি গিয়াছিল, শূন্য কমলার দর্শনলাভের জন্য নহে। সে আশা করিয়াছিল, কমলা হয়তো আজ কিঞ্চিৎ কোমল হইয়া উঠিবে এবং ভাবী বিবাহ বন্ধনের হৃদীর বদলে তাহার কাছ হইতে পরিপূর্ণ মূল্য না হোক, বাটা বদ দিয়া আংশিক মূল্য আদায় হইবে। নিজের কক্ষ স্ত্রীমতী যখন তাহাকে কমলার সামনে দাঁড় করাইয়া দিয়া চলিয়া গেল এবং অশ্রুস্রবী কমলা অভ্যন্তর বাক্যের দ্বারা তাহার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন তাহার মনের মধ্যে ক্ষুধাতুর কামনা নিশ্চিত থাকে। আশায় লোভাতুর হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর কমলা যখন স্বেচ্ছায় তাহাকে স্পর্শ করিয়া প্রসন্ন দিল, চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে আত্মসমর্পণের আভাস ফুটাইয়া তুলিল, তখন দূরন্ত কামনা দর্শনবার লোভে কাপাইয়া পড়িল। যদি কমলা তাহাকে বাধা না দিত, যদি তাহার ভদ্রতা, শিক্ষা-দীক্ষার উপর ভিত্তি করিয়া নিজেই ছাড়িয়া দিত, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত সে কি করিয়া বসিত বলা যায় না। নিজ হৃদয়ের মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া সে দেখিল, তখনও পর্যন্ত সেখানে তাহার ক্ষুধাতুর কামনা পিজরাবস্থ বাস্তব ন্যায় জ্বলন্ত অগ্ন্যারের মত চোখ লইয়া লালসিত জিহ্বা বাহির করিয়া লোভে ও লালসায় এক কোণ—ও কোণ করিতেছে।

(২৬)

পরদিন দুই-তিনটা দূর গ্রামের ডাক ছিল। কাজকর্ম সারিয়া বাড়ি ফিরিতে পরেশের তিনটা বাক্সা গেল। স্নানাহার সারিয়া একটু-খানি বিশ্রাম করিতে যাঁহাতেছে — এমন সময়ে স্কুলের চাকর আসিয়া একখানি চিঠি দিল। হেডমাস্টার চিঠি লিখিয়াছেন—“বাড়ি হইতে বের পাইলাম, আমার স্ত্রীর জ্বরটা একটু বাড়িয়াছে। স্কুলে নানা কাজে এমনই বাস্তব আছি যে, বাড়ি যাঁহা বের লইতে পারি নাই এবং রাতি

অটটার আগে পাঠের বলিয়া মনে হয় না। আপনি দয়া করিয়া একবার দেখিয়া যাইবেন।”

সম্ভার কিছু পূর্বে পরেশ হেডমাস্টার মহাশয়ের বাড়িতে হাজির হইল এবং সন্ধান বৈঠকখানার মধ্যে গিয়া বসিয়া হাঁকিল, “থাকা!” আরতি আসিল ও মুখখানি চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়া কহিল, “দিদির জ্বরটা বেশ হয়েছে এবেলা।” পরেশ প্রশ্ন করিল, “টেনপারেচার কত?”

“১০২°র উপর।”

“চলুন দেখি।” বলিয়া আরতির পিছনে পিছনে সুনীতির শয়নকক্ষে হাজির হইল। একটা বিস্তৃত খাটে সুনীতি শইয়াছিল—আপাদ-বস্ত্র লেপে ঢাকা। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন আছেন?” সুনীতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, “ভাল না। ভাগ্যে আরতি এসেছিল, না হলে কী যে হত!” পরেশ কহিল, “কিছু ভয় নেই—মালেরিয়া জ্বর এবং একটা রোগী দেখিয়া পরেশ বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল এবং একটা প্রেসক্রিপশন লিখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “আমি চলি, ওষুধটা তৈরি করে রাখগে, আপনারের ঝিক এখনই পাঠিয়ে দিন ওষুধটা আনতে।” আরতি অনুন্দের সুরে কহিল, “জমাইবাব, যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ থাকুন আপনি—আমার ভয় করছে।” কি বরং প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও থেকে ওষুধ আনুক।” পরেশ একটু চিন্তা করিয়া কহিল, “বেশ, আমি বসছি। ওকে কার্তিক ডাক্তারের ডাক্তারখানা থেকে ওষুধটা আনতে বলে দিন।” আরতি প্রেসক্রিপশনটা লইয়া চলিয়া গেল। মিনিট কুড়ি পরে—ডান হাতে এক কাপ দুমায়িত চা। পরেশ অনামনকভাবে দরমুখে বসিয়াছিল, আরতি কাছে আসিতেই মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল, “ও আবার কি?” আরতি কহিল, “কিছু না, এক কাপ চা শুধু।”

চা খাইতে খাইতে পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “কি কে পাঠিয়ে দিলেন?” আরতি ঘাড় নাড়িয়া ‘হা’ জানাইল। পরেশ কহিল, “আজই অন্ততঃ দু’ ডোজ খাইয়া দেবেন।” আরতি ঘাড় নাড়িয়া স্বীকৃতি জানাইল। তারপর—দুইজনই কিছুক্ষণ চুপচাপ। পরেশ চা খাইতে লাগিল, আরতি বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ আরতি প্রশ্ন করিল, “কার্তিক-ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গেই আপনার বে হবে, না?” পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, “কে বললে আপনাকে?”

“কি বলছিল—আমাকে মাসে নিয়ে হবে।”

পরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, “তাই তো শুনছি।” মুখ টিপিয়া হাসিয়া আরতি কহিল, “নিজে বুঝি জানেন না! এদিকে মনে মনে দিন গনছেন সারাক্ষণ।” পরেশ জবাব দিল না।

চা খাওয়া শেষ হইলে আরতি কাপ লইয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল, হাতে প্লেটে করিয়া পান।

পরেশ কহিল, “আপনি দেখিছ আত্মবেগতায় হুটুপি রাখবেন না। নিজে সজ্ঞেন নাকি?”

আরতি তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, “সাজতে জানি নে নাকি ভাবছেন? ও-বেলা কার হাতের পান খেয়েছিলেন?” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া অর্থহীনভাবে চক্ষে স্পর্শ করিল, “ওঃ! তাই!” আরতি ওৎসুকীর সহিত কহিল, “কি?” ও-বেলা পান খাইয়া পরেশের জিব পুড়িয়াছিল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত জিবটা নাড়িতে পারে নাই—দিনের বেলায় খাওয়ার সময়ে পর্যন্ত কণ্ঠ হইয়াছিল; কহিল, “তাই এত ভাল লেগেছিল—গ্রাজুয়েটের হাতের পান।” আরতি বাকা হাসি হাসিয়া কহিল, “ঠাট্টা করছেন বুঝি?” পরেশ কহিল, “না, ঠাট্টা নয়, প্রশংসা করছি। আপনি আমাকে অশ্চর্য করে দিয়েছেন। কলেজে পড়া মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে দিয়েছেন।” প্রশংসা হাসি হাসিয়া আরতি কহিল—“কি ধারণা ছিল আপনার?” পরেশ কহিল, “ধারণা ছিল, কলেজে পড়া মেয়েরা সেক্সপীয়র—রবীন্দ্রনাথ পড়ে বুঝতে পারে, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে শক্ত শক্ত প্রবন্ধ লিখতে পারে, সভা-সমিতিতে গরম গরম বক্তৃতা দিতে পারে, কমুনিজম বলি আওড়তে পারে; কর্মরতদের মাস্তানবী হয়ে দেশোদ্ধারের প্রেরণা ও উদ্দামনা জোগাতে পারে; কিন্তু তারা যে আবার উন্মূহ হয়ে বসে ভাত-ডাল সেশ করতে পারে, হাচি বেলেতে পারে, পা মেলে বসে পান সাজতে পারে—” আরতি বাধা দিয়া কহিল, “বুঝিছ আপনার ধারণা কলেজে-পড়া মেয়েরা কিন্তু তাকমাকার জীব, তাদের নিয়ে সংসার করা চলে না।” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। আরতি ক্ষুধার হাসি হাসিয়া কহিল, “কিন্তু জানেন পরেশবাবু তারা বিয়েও করে এবং আপনাদের পাড়গিরির অবলা-সরলাদের চেয়েও স্ত্রীমতীর সুখী করে। রঙিন পাখা মেলে তারা উড়তেও জানে, আবার পাখা গুটিয়ে বাসতে বসে সংসারধর্ম পালন

নিরাপদ x উত্তম
লেন্থির জন্ম

স্বায়া আমানতে
বিনিয়োগ করিতে হইলে
ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল

প্রপার্টিজ লিঃ'এ

টাকা রাখুন।

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :-

বি, রায় এণ্ড কোং
৩ ও ৪নং হেয়ার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

ফোন-কাল ৩৮৩৮

পরিবর্তিত সুদের হার

১ বৎসরের জন্য	৫%
২ বৎসরের জন্য	৫½%
৩ বৎসরের জন্য	৬%
৪ বৎসরের জন্য	৬½%
৫ বৎসরের জন্য	৭%

বিশেষ আমানত সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণাদি
জানিতে হইলে উক্ত ঠিকানায় আবেদন
করুন।

শারদোৎসবে

প্রিয়জনের রূপ-সজায়

মৌলানার

প্রীতিপ্রদ ডিজাইনের সাড়ী

আধুনিক তরুণী ও মহিলাগণের মনোরঞ্জে সমর্থ।

—আমাদের দোকানে—

বেনারসী, জর্জেট, মুর্শিদাবাদ, ঢাকাই, টাঙ্গাইল,
শান্তিপুরী, ছাপান সাড়ী, ধূতি ও সাজসজ্জার
সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে।

মৌলানা দি রু সপ

মৌলানা ষ্টোরস্

৫নং ধর্মতলা স্ট্রীট

১৩৬, ৩৮নং লোয়ার চিংপদুর রোড

(প্রবেশপথ মতি শীল স্ট্রীট)।

(ফোন-বি বি ৩২৮৬)

মৌলানা ফ্যাশি হাউস, ১৩১নং লোয়ার চিংপদুর রোড, কলিকাতা।

মুদার
মুরতি ও আয়ুর্বেদজ্ঞ
ত্রেমকান্তি
কেশ তৈল
ইণ্ডিয়ান পারফিউম প্রোডাক্টস
১৩৬-৪. অ পার সার কু লার রোড, কলিকাতা

করতেও জানে।" পরেশ চুপ করিয়া রহিল। আরতি কহিল, "আপনার হৃদয় গির্মাটি লেখাপড়া জানেন?" পরেশ কহিল, "কিছু জানেন বললেই ধারণা ছিল এতদিন, কাল শুনলাম—অক্ষর-পরিচয়ও নেই।"

"গান-বাজনা?"

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইল।

"রান্নাঘর জানেন নিশ্চয়।"

পরেশ জবাব দিল, "তা জানেন।"

"পান-সেজা খান?"

পরেশ কহিল, "খান।" আরতি হাসিয়া কহিল, "তা হলে তো আপনার আদর্শ গৃহিণী; ভাগ্যে শহর থেকে পালিয়ে এসেছেন, না হ'লে এতদিনে কেউ ঘাড়ে চেপে বসলে এমন রক্তাক্ত আর হয়ে উঠত না।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনি বসুন একটু, দাঁড়ি একবার দেখে আসি।"

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দাঁড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে।" পরেশ কহিল, "ঠিক ঘরে কেউ আছে তো?" আরতি কহিল, "আছে বই কি! থোকা খুন্সের সঙ্গে খেলা করছে।"

চেয়ারে বসিয়া আরতি কহিল, "দাঁড়ির জ্বরটা কি সত্যি ম্যালেরিয়া?" পরেশ কহিল, "আমার তো তাই মনে হচ্ছে।" আরতি কহিল, "শীতকালেও ম্যালেরিয়া হয় নাকি?" পরেশ কহিল, "নতুন করে না হতে পারে, কিন্তু উনি তো বরাবরই এখানে থাকেন।" আরতি কহিল, "আমারও হবে নাকি?" পরেশ কহিল, "না হতেও পারে।" পরেশের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া আরতি কহিল, "অর্থাৎ হতেও পারে। তা হলে ভারী দুশ্চিন্তা হবে কিন্তু, আমার এমনই ছুটি কুরিয়ে এসেছে।"

পরেশ উদ্দেশ্যে যথাসাম্য চাপা দিয়া কহিল, "আর কতদিন বাকি আছে ছুটির?" ঘাড় নাড়িয়া আরতি কহিল, "বোঁদারিন না।" মুখখানি স্থান করিয়া তুলিয়া কহিল, "অথচ সম্পূর্ণ সেরে উঠতে পারলাম না। আপনি দেখছেন না প্রথম থেকে, ভেবেছিলেন, লেখাপড়া জানা সাংঘাতিক মেয়েমানুষ একটা মুখেই মগল।" পরেশ লজ্জিত মুখে কহিল, "ছি! একথা বলবেন না।" তীক্ষ্ণকণ্ঠে আরতি কহিল, "কেন বলব না? আপনার তো আমাদের মত মেয়েদের ওপর এই ধরনেরই মনোভাব।" পরেশ কহিল, "আমি তো বললাম আপনাকে, আগে ছিল, আপনি বদলে দিয়েছেন।" আরতি কহিল, "আমাকে আপনি 'আপনি' করেন কেন? 'তুমি' বলতে পারেন না?" পরেশ আমতা আমতা করিয়া কহিল, "মানে আপনার সঙ্গে বেশি দিনের আলাপ নয় তো, মনে—" আরতি কহিল, "নেই বা হ'ল। মানুষের মধ্যে মানুষের সম্পর্কের নির্বিড়তা কি পরচয়ের দীর্ঘতার উপর নির্ভর করে? এক মুহূর্তের পরিচয় একজন অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, আবার সারাজীবন পাশাপাশি থেকেও একজন অন্তরের অন্তরালেই থেকে যায়।" বলিয়া দুই চক্ষের দৃষ্টি ঘন করিয়া পরেশের মুখের পানে তাকাইল। সেই চোখের সহিত চোখ মিলিতেই পরেশের বকের ভিতরটা দুইলিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া পরেশ কহিল, "সত্যানবাব, এখনও এলেন না।" আরতি কহিল, "আসতে দেরি হবে, স্কুল কামিটির মিটিং আছে।" মুঠকি হাসিয়া কহিল, "আপনি এত ছটকি করছেন কেন? শব্দে বাড়াতে নেমন্তন্ন আছে বুঝি?" পরেশ কহিল, "না।" মুখ গম্ভীর করিয়া আরতি কহিল, "তা হলে আমার সঙ্গ বুঝি আপনার ভাল লাগছে না? বেশ, আমি না হয় চলেই যাইছি।" বলিয়া উত্তীর্ণের উপক্রম করিতেই পরেশ সাবধানে কহিল, "পাগল হলেন নাকি! উঠবেন না, বসুন।" সঙ্কোচে কহিল, "আপনার সঙ্গ আমার ভাল লাগে না—এই বুঝি এতদিন পরে আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা হ'ল! আপনাকে যদি—" আরতি বসিয়া বাধা দিয়া কহিল, "আবার 'আপনাকে'?" পরেশ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "তোমাকে বলতে বাধ-বাধ ঠেকছে।"

আরতি কহিল, "বাধা রেখেছেন বললে বাধ-বাধ ঠেকছে, আপনার বলে মনে করতে পারছেন না কিছুতেই। কিন্তু আমি আপনাকে অতি সহজেই 'তুমি' বলতে পারি।" পরেশ কহিল, "তাই বলুন আগে, তা হলে সহস্র হবে আমার।"

আরতি মুঠকি হাসিয়া শাণিত ইঙ্গিতের মত চকচকে চোখে চাহিয়া কহিল, "শুনলে আপনার হৃদয় গির্মা! কিন্তু কুরুরের বাঁধিয়ে দেবেন। ভাববেন, কোথাকার কে তাঁর জিনিসে ভাগ বসাতে এসেছে।" পরেশ কহিল, "মানুষ কি কারও একবার জিনিস হতে পারে? সারাজীবন ধরে যত লোকের সম্পর্কে আসে, সকলের মধ্যে নিজেকে তিল তিল করে ভাগ করে দেয়।" আরতি কহিল, "বিশেষে দেয় তার বাঁধনকে; কিন্তু বাঁধন নিয়ে তো স্বাধীন কোন প্রয়োজন নেই। সে চার বাঁধনটিকে এবং পুরোপুরি-

ভাবে, ডাতে কাউকে কণামাত্র ভাগ বসাতে দিতে চান না" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া কহিল, "অন্তত আমার মত মেয়ে হ'লে—" পরেশ কৃত্রিম ভয়ের সহিত কহিল, "আপনিও ওই দলের নাকি?" আরতি ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "নিশ্চয়। কিন্তু আপনি আবার 'আপনি' বলছেন?" পরেশ অপ্রতিভভাবে কহিল, "না না, তুমি।" বিমল হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া আরতি কহিল, "গুড্ বয়। কথা শুনলে এত ভাল লাগে। আমার যে ছাত্রীরা আমার খুব কথা শোনে, তাদের আমি খুব ভালবাসি।" বলিয়া হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুইটি পরেশের মুখের উপর নাস্ত করিল। পরেশ সাহসী হইয়া উঠিয়া কহিল, "সাঁজ নাকি! আমিও তো তোমার অন্তত আজাবহ হয়ে উঠেছি।" মুখ লাল করিয়া আরতি কহিল, "যান—আপনি ভারী দুশ্চী!" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া চট্টল কণ্ঠে কহিল, "আপনারও ভালবাসা চাই নাকি?"

বধিকে পরেশের মনে পড়িল—শান্ত, নম্র, ধীর, গ্রী ও হুঁ-মতী মেয়েটি, ভালবাসার কল্পদ্বারা বন্ধে লইয়া তাহার জীবন হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। কমসার মিনতিপূর্ণ প্রার্থনা মনে পড়িল, 'বসুন না, গল্প করুন, কথা শুনতে ভাল লাগে আপনার—' কমলাও ভালবাসে তাহাকে।

পরেশ কহিল, "চাই বই কি! বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালবাসা, আমার সঙ্গের যে বন্ধু, পাতিয়েছিল, ভুলে গেছে নাকি?" আরতির মুখের রসভা মুহূর্ত মধ্যে মিলাইয়া গেল, শব্দকণ্ঠে কহিল, "ভুলি নি।" আবার দুইজনে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। আরতি মুদ্র বিস্ময় কণ্ঠে কহিল, "সারা-দিন আমার শরীরটাও ভাল ঠেকছে না—হাতটা একবার দেখুন না দয়া করে।" পরেশ অত্যন্ত করুণকণ্ঠে কহিল, "বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্বীকার করে 'দেখুন' 'দয়া করে' এই সব কথা?"

আরতি ক্ষণ হাসিয়া কহিল, "কি বলতে হবে?"

পরেশ কহিল, "বন্ধু বা বন্ধকে বলে।"

আরতি কহিল, "পরে বলব" বলিয়া ডান হাতটি বাড়াইয়া দিল।

পরেশ ডান হাত দিয়া আরতির মনিবন্ধটি চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়ে 'পরে বলব'?"

আরতির নবনীত কোমল শব্দ স্মৃতিতে বাহুটির দিকে তাকাইয়া এই বাহুমাল্য একদা যে ভাগ্যবানের কণ্ঠে বিলম্বিত হইবে, তাহার প্রতি পরেশ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

নাড়ী দোঁখিয়া পরেশ কহিল, "কিছু হয়নি তোমার।"

অভিমানের সুরে আরতি কহিল, "আপনার তো ওই কথা কিছু হয়নি।" বলিয়া ঠোঁট ফুলাইল। পরেশ হাসিয়া কহিল, "কিছু না হলেও হয়েছে বলতে হবে।"

পরেশের মুখের পানে একবার বিধর ন্যানে তাকাইয়া মুখ নত করিয়া আরতি কহিল, "আমার ভাল লাগছে না এখানে, দাঁদি একটু, সেরে উঠলেই চলে যাব।"

"কোথায় যাবেন?"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে আরতি কহিল, "কোন চুলো আমার আছে বলুন যে, যাব সেখানে।" ফিরে যাব আমার স্মৃতির চাকরিতে।" বলিয়া ডান হাতের তর্জন দিয়া টেবিলের উপর কি লিখিতে লাগিল।

পরেশ কহিল, "আমার কবুড়টা আরও দিন কতক টালায় দেওয়া উচিত।"

আরতি কহিল, "ধাকপে, কি হবে ভাল হয়ে পরেশবাব! এই তো জীবন! না নেই, বাবা থেকেও নেই, সত্যিকার আপনার জন বলতে কেউ নেই। শেওলার মত ভেসে ভেসে বেড়াই, এ ঘাটে ও ঘাটে, দাসীবাঁধি করে জীবিকা অর্জন করি পরের মন জুগিয়ে। জীবনে মুখ নেই, আনন্দ নেই, ক্রয়ও কাছে কোন মূল্য নেই।" বলিয়া উঠিয়া বাঁহরে অন্ধকার বারান্দায় গিয়া দাঁড়িল। পরেশও এখনি পিছনে গিয়া কাছে দাঁড়াইল। আরতি তন্দ্রান-জড়িত কণ্ঠে কহিল, "এখন যাবেন না।" পরেশ সর্বস্বয় কহিল, "তুমি কাদছ নাকি?" ধরা গলায় আরতি কহিল, "না।"

পরেশের কি জানি কেন মতিভ্রম ঘটিল—চট্ করিয়া আরতির গালে হাত দিয়া কহিল, "এই যে কাদছ।" সরিয়া দাঁড়াইয়া আরতি কহিল, "ক'য়া পেলে কাদব না? এও কি আপনার ডাক্তারী শাস্ত্র নিষেধ নাকি?"

পরেশ নিজের হঠকারিতার জন্য লজ্জিত হইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, কমলায় মতই আরতি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিহরিয়া উঠবে, দৃষ্টি তাকে চাহিয়া, তীরকণ্ঠে ভবসনা করিবে। কিন্তু তাহার কিছই হইল না। তীক্ষ্ণা-বন্দিত নিম্বেশ ফেলিয়া কহিল, "আজ্ঞে বইকি! কাদলে শরীর আরও খারাপ হবে।" সামনে অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া আরতি কহিল, "হোক বাধাপ, আমার মরণই ভাল।"

বেনারসীর

জন্য

মোহিনীমোহন কাঞ্জীলাল

পূজার রকমারী তাঁতের
ও ফ্যান্সি সাদী আমাদের
নীচের শো-রুমে
দেখুন।

কলেজ স্ট্রীট-হারিসন রোড
জংসন
ফোন-বি. বি. ৪৫২০

আপনার আজকের

“সমস্যা”

আপনার বার্ষিকের এবং পরিজনবর্গের ভবিষ্যতের সহায়।

প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন

≡ এসিওরেন্স লিমিটেড ≡

হেড অফিস-দিল্লী।

সেন্ট্রাল অফিস-৩নং ম্যাগো লেন, কলিকাতা।

ব্যাংক অব ক্যালকাটা প্রিমিসেস্

উপযুক্ত বেতন ও কমিশনে সর্বত্র
এজেন্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক।

ফোন-ক্যাল্ঃ ২৭৬৭

গ্রাম-“জনসম্পদ”



Have a Tenor

টেনর সিগারেট লউন

যদি আসল ভার্জিনিয়া তামাক পছন্দ করেন তাঁদের জন্য; এই চড়া দামের দিনেও আপনি ডি ক্লাস টেনর সিগারেটের মিশ্র মধুর শ্বাসপান করিয়া দশ মিনিটকাল বেশ আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। ভার্জিনিয়া তামাকের বাছাইকরা পাতা হইতে এই টেনর সিগারেট প্রস্তুত করা হয়, এই সিগারেটের সুমধুর গন্ধই আজ পৃথিবীর সর্বত্র সৌখীন সমাজে সমাদৃত। আমাদের ব্রেণ্ডই সৌখীন শ্বাসপায়ীদের নতুন ঘটান্ডাত্ হিসাবে-এমনকি যাহাদের কণ্ঠনালী সহজেই রোগাক্রান্ত হয়, তাঁরাও উহাকেই অত্যুৎকৃষ্ট জিনিষ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

Tenor

..is truly
a de Luxe
Cigarette



JAMES CARLTON LTD. LONDON. EASTERN LICENCEES. POST BOX NO. 470 CALCUTTA

“ছিঃ! ওকথা বলো না।”

“আমার মরণ হলেও রোগীর অভাব আপনায় হবে না।”

“আমি কি তোমাকে রোগীর মত দেখি?”

“তা ছাড়া আবার কি?”

“কেন! বশুর মত—”

বাক্যের দিয়া আরতি কহিল, “চাইনে আপনার বশুদ্বা!” পরম বিস্ময়ের স্বরে পরেশ কহিল, “তবে কি চাই?” আরতি তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, “তা আপনার জেনে কি হবে? সে জিনিস দেবার সাধ আপনার নেই।” বলিয়া নীলাভ কুক্ক আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল।

আরতির অন্তরের এই অকস্মিক আত্মপ্রকাশ তাঁর বিদগ্ধ বিকাশের মত তাহার হৃদয় ও মনকে বিভ্রান্ত করিয়া দিল। বিহবলের মত সে আরতির মূর্তির অর্ধ স্থির দেহের পানে তাকাইয়া রহিল।

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আরতি কহিল, “জামাইবাবু আসা না প্রবৃত্ত দয়া করে অপেক্ষা করুন, আমি দিদির কাছে যাচ্ছি।” বলিয়া ধীরপদে বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে পরেশ সূর্যোদয়কে দেখিতে গেল। সত্যেনবাবু চিন্তিত মুখে বসিয়া ছিলেন। পরেশকে দেখিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, “আসুন।” কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তার কলো মেঘ সে হাসিটুকু গ্রাস করিয়া লইল। পরেশ কহিল, “কেনমন আছেন?” সত্যেন কহিল, “ভাল নয়, সকলেই টেপারের ১০২০।” পরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল, “রঙটা পরীক্ষা করতে পারলে হত, কিন্তু এখানে কোন উপায় নেই, তা’ হলেও আমি একবার কুইনিন দিয়ে দেখব, যদি রেস্পনড করে ভাল, না হয় তো অনাচারে চিকিৎসা করতে হবে।” সত্যেনবাবু শব্দকম্পে কহিলেন, “তা হলে তো টাইফয়েড—”

সাহস দিয়া পরেশ কহিল, “পেরোপুরি টাইফয়েড নাও হতে পারে, পায়রা টাইফয়েড—”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সত্যেনবাবু কহিলেন, “সে তো একই।”

সূর্যোদয় শয্যাপার্শ্বে আরতির দেখা মিলিল, বাসি পশ্চাত্ত্বলের মত শ্লান বিষয় মুখ। আরতি সূর্যোদয়ের শিরায় বসিয়া কপালে হাত বুলাইতেছিল, পরেশকে দেখিয়া বিচানা হইতে নামিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “খবর মাথার বেদনা নাকি?” আরতি জবাব না দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। সূর্যোদয় ঘাড় নাড়িয়া ‘হী’ জানাইল।

“কাল রাতে ঘমা হয়েছিল?”

সত্যেনবাবু জবাব দিলেন, “ভাল হয় না।”

রোগীকে পরীক্ষা করিয়া পরেশ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আরতি পাশ দিয়া রামাঘরের দিকে বাইতেছিল, পরেশ তাহাকে কহিল, “একটু হাত ধরে জল দিতে পার?”

আরতি গম্ভীর বদনে কহিল, “দাঁড়ি পাঠিয়ে।”

বৈঠকখানায় আসিয়া প্রেসক্রিপশান করিয়া দিয়া পরেশ কহিল, “আপনি ওষুধটা কার্তিক-ডাক্তারের ডাক্তারখানা থেকে আনিয়া নেন। আমি এখন আসি। ও বেলা এসে দেখে যাব।” বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সত্যেন কহিলেন, “বসুন একটু, আরতি বোধ হয় চা করতে গেছে।” পরেশ বসিয়া কহিল, “আবার ওসব হাস্যাত্মক কেন? একে বাড়িতে আসুন, তার ওপর ও’র একলার উপরেই তো সব ঝুঁকি।” সত্যেন কহিলেন, “হ্যাঁ, ভাগ্যে ও এসেছিল, না হলে উপোস দিতে হ’ত আমাদের। আমি তো ওসব বিষয়ে একবারে অনাড়ম্বর কিনা।” পরেশ হাসিয়া কহিল, “আমিও তাই। মাসীমা দয়া করে না এলে ভারী বিপদে পড়তে হ’ত। কিন্তু এতে আমাদের কোন লজ্জা নেই। ইংরেজরা যেমন আমাদের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে আমাদের রণ-বিমুখ করে রেখেছে, মেয়েরাও তেমনই আমাদের হাতা-বেড়ী কেড়ে নিয়ে রামা-বিমুখ করে রেখেছে। হাতিয়ার আর হাতা হাতে গেলে—” সত্যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল, বলিয়া উঠিল, “আজ্ঞা, পরেশবাবু, যদি টাইফয়েড বলেই সাব্যস্ত হয়, তা হলে এখানে রাখা ঠিক হবে তো?” পরেশ বৃষ্টিল তাহার বস্তুতা মাঠে মারা গিয়াছে; কহিল, “কেন?”

“ওষুধপত্র পথ্য এখানে পাওয়া যাবে তো?”

“যাবে না কেন? এদেশে কি কারও টাইফয়েড হয় না? না, টাইফয়েড হলে সারে না?” সত্যেনবাবু চিন্তাকুলমুখে কহিলেন, “তা বটে। তবে এখানে আত্মসম্মানজনক কেউ নেই, আমি তো স্কুলের কাজেই সারাদিন ব্যস্ত, আরতির শরীরও ভাল নেই—সেবা করবে কে, সংসারই বা দেখবে কে?”

পরেশ কহিল, “জ্ঞাপনি কি এখানে থেকে নিয়ে যেতে চান?” সত্যেন কহিল, “হ্যাঁ সেখানে সবাই স্বপ্ন রয়েছেন—” পরেশ কহিল, “বেশ, আরও একদিন দেখি, যদি সুবিধে না হয় তাই করবেন।”

করুণ কণ্ঠে সত্যেন কহিলেন, “তখন উপায় থাকবে তো?”

পরেশ কহিল, “তা থাকবে।”

আরতি আসিল না, দুখের মা দুই কাপ চা লইয়া আসিল। সত্যেন কহিল, “তোমার মাসীমা কি করছেন?” দুখের মার বসস চার্লস পার হইয়া গেলেও ভারী লজ্জাবতী, লজ্জায় থুসুথুসে হইয়া গিয়া ফিস ফিস করিয়া কহিল, “মাসীমা ছ্যান করতে গেয়েছেন। এখন আসতে পারবেন নিকো।” বলিয়া ঘোমটার আড়াল হইতে পরেশের দিকে এক চোখ চাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যার পরও পরেশ আসিল। সত্যেনবাবু বাড়িতেই ছিলেন, আরতি রামাঘরে ছিল। রোগী দেখিয়া গল্প করিয়া চলিয়া আসিল। আরতি একবারও দেখা দিল না।

রাতে খাওয়ার পরে ডাক্তারী বই সামনে লইয়া পরেশ আরতির চিন্তা করিতে লাগিল। একটা দিনের মধ্যেই আরতি যেন আবার অপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছে। কাছে আসে নাই, কাছে গেলে দূরে সরিয়া গিয়াছে। কথা কহে নাই, কথা কহিতে গেলে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। কি তাহার অপরাধ? বশুদ্বা আরতির বশুদ্বা হইয়াছে, বশুদ্বাের চেয়ে বড় কিছু তাহার কাছে চায়। তাহা যে কি সে আন্দাজ করিয়াছে। কিন্তু ইহাই আশা করিয়া কি আরতি আহাৰ সহিত আলাপ করিয়াছিল! তাহারাই হিম, সমাজের ছেলেমেয়ে; তাহাদের জাতি ভিন্ন; এক্ষেত্রে সামাজিকভাবে তাহাদের মিলন যে অসম্ভব, তাহা তো আরতি বুকে। তাহা ছাড়া তাহার নিজের অবস্থাও অত্যন্ত জটিল। কমলার সহিত তাহার বিবাহ স্থির এবং যতদূর বুঝা গিয়াছে কমলা এখন হইতেই মনেপ্রাণে পরীক্ষার স্বাভাবিক করিয়া বসিয়াছে। এখানে বাস করিতে হইলে কমলাকে বিবাহ করিয়া কার্তিকের স্নেহছায়ায় আশ্রয় লওয়াই যে লাভ ও লোভনীয় তাহা এ কয় দিনেই প্র্যাক্টিসের সূত্রহাতে বুঝা গিয়াছে। আরতিকে বিবাহ করিয়া অকালে তরী ভাঙাইবার যদি তাহার শক্তি ও সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে তো সে বাকিকেই বিবাহ করিতে পারিত। বাকিকে মনে পড়িল পরেশের মনে পড়িল সেদিনের তাহার সেই অশ্রুসিক্ত মুখখান। বাকি বিবাহ লইয়া গিয়াছে; ভবিষ্যতে যদি কোন দিন সে গ্রামে আসে, আর সে এখানে থাকে, হয়তো তাহার সহিত দেখা হইবে। কিন্তু সেদিন তাহার সীমন্তে থাকিবে পর্যাধিকারের রক্তপাতাকা, প্রকণ্ঠে লৌহ নিগড়। সেদিন তাহার দুখের দিকে তাকানো পর্যন্ত চলিবে না, অনাচারের অবগুণ্ঠন দৃষ্টিপথ রোধ করিবে এবং যে ভালবাসা দেহে রক্তপ্রবাহের মত নিঃশব্দ-গতিতে তাহার মনের শিরা উপশিরায়া একদা প্রবাহিত হইত, তাহা ততদিনে হয়তো জমাট বাঁধিয়া উঠিবে। কিন্তু গ্রামান্তের ক্ষুদ্র নদীটি হঠাৎ শুষ্ক হইয়া গেলে বা গতিপথ পরিবর্তিত করিলে যেমন মন ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু তাঁর বেদনায় আর্ত হইয়া উঠে না, বাকি হারাইয়াও পরেশের মনে তেমনই কণিক ক্ষোভ জন্মিয়াছে, কিন্তু জীবনে অপূরণীয় ক্ষতির তাঁর বেদনাবোধ জন্মে নাই। কারণ, বাকির ভালবাসা তাহাকে আত্মতৃপ্তি দিয়াছে, কিন্তু আত্মার ক্ষধা মিটার নাই। যে বস্তু তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা অহরহ রক্ষা করিতেছে, তাহা বাকির ছিল না, কমলারও নাই, তাহা হয়তো আরতির কাছে ছিলিতে পারে। অথচ আরতিকে পাওয়ার পথে কত যে অন্তরাত্ম, তাহা তাহার নিজের বা আরতির কাহারও অবদিত নয়। তবু আরতি যে দিন দিন দূরে সরিয়া বাইবে এবং আঁচরে দৃষ্টিপথী অতিভ্রম করিয়া চিরদিনের মত হারাইয়া বাইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মন বাথার নীল হইয়া উঠিল।

(২৮)

দুই দিন পরে। সকাল আটটার দূরের একটা ডাকে হাইবার পথে পরেশ সূর্যোদয়কে দেখিবার জন্য হেডমাষ্টারের বাড়িতে গিয়া হাজির হইল। বৈঠকখানা দুখের মা কাঁটি দিতেছিল। পরেশকে দেখিয়া কাঁটি ফেলিয়া ঘোমটা টানিয়া ললম্ব হইয়া উঠিল। পরেশ কহিল, “এরা সব কোথায়?” দুখের মা মিহি গলার কহিল, “মাসীমা শব্দুদ্বা, নাত জেগেছেন কি না!” পরেশ কহিল, “হাবু?” দুখের মা কহিল, “বসুন, জেগে দাঁড়ি।” সত্যেন আসিয়া কহিলেন, “ওই যে ডাক্তারবাবু।” বসিয়া কহিলেন, “কাল সন্ধ্যায় ভারী হটফট করছে—ভোরের বেলা শব্দুদ্বা পড়ে, এখনও শব্দুদ্বা।” পরেশ কহিল, “জাহলে জাগাবার দরকার নেই, ওষুধ বা

ফু টি ব ল — D. G. B. — ফু টি ব ল

ব্রাডার সহ	৫নং	৪নং	৩নং
স্পেশাল ইংলিশ T.	২২।০	১৮.	১৪.
ইম প্রভুড ইংলিশ T.	২০.	১৬।০	১৩।০
বেস্ট ইংলিশ T.	১৮।০	১৫।০	১২.
নিউ স্পেশাল T.	১৭।০	১৫.	১১.
ইম প্রভুড D.G.B. T.	১৫.	১৩.	১০।০
1944 I. F. A. T.	১৩।০	১১।০	৯.
নিউ ক্রিস্টল T. 44	১২.	১০।০	৮.
বেস্ট স্ট্রুভেট T.	১০.	৮.	৭.
স্পেশাল সার্ভিস	১৬।০	১৩।০	১১.
স্পেশাল ফ্লাব	১৪।০	১২।০	১০।০
স্পেশাল ম্যাচ	১৩।০	১২.	৯.
স্কুল ম্যাচ	১০।০	৮.	৭.
বেস্ট স্কোরার	৯।০	৮.	৬।০

২নং ৪, ১নং ৩, ভলি বল—১০.
ফুটবল বট উৎকৃষ্ট ১৬।০, মধ্যম ১৩।০

ব্রাডার—১নং ১৮।০, ২নং ১৬।০, ৩নং ১১।০,
৪নং ১১।০, ৫নং ১১।০। মশদলাদি ৮.

ইনফ্রাটর—১নং ১৮.০, ২নং ১৬.০, ৩নং ১১.০,
৪নং ৫.০, ৭।০

ফুটবল মোকা—ফুট লেস উৎকৃষ্ট ৫।০, সাধারণ
২৮.০, ফুটসহ উৎকৃষ্ট ৭.০, সাধারণ ৩।০।

বার্ডমিণ্টন ব্যাট—প্রত্যেকটি ১নং ১০.০, ২নং ৭।০,
৩নং ৫।০, ৪নং ৪।০, ৫নং ৩।০, ৬নং ২।০,
৭নং ১।০, ৮নং ১।০



পালকের বল কম্পিটিন—প্রতি ডজন ১নং ১৮.
২নং ১৫, ৩নং ১২। প্রাক্টিশ সুপিরিয়র
১নং ১০.০, ২নং ৮.০, ৩নং ৬.০।
জুমিয়র সুপিরিয়র ১নং ৫.০, ২নং ৪.০, ৩নং ৩।০।
ডজন। চিপ কোয়ালিটি ২।০ ডজন। পালকের
বল ও ব্যাটের অর্ডার দিবার সময় অন্ততঃ
১, অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

বার্ডমিণ্টন নেট অর্ডিনারী ছোট ৮.০, মাঝারী ১৮.০,
বড় ৮.০। প্রাক্টিস ১নং ১১.০, ২নং ৩.০, ৪।০।
কম্পিটিন ১নং ৫।০, ২নং ৭।০, ৩নং ১০।০।

ভলিনেট ১নং ৩।০, ২নং ৩।০, ৩নং ৫।০।
কম্পিটিন ১০.০ ও ১৫.০।

কাপ—৩" ১৮.০, ৪" ২১।০, ৫" ৩।০, ৬" ৪।০,
৮" ৬.০, ১০" ৮.০, ১২" ১২.০, ১৫" ২০.০।

মেডেল অর্ডিনারী ৮.০, উত্তম ১নং ১০.
২নং ১৮.০, ৩নং ২।০।

ছিপ, ব'ড়শী, সূতা, হুইল, ফাতনা
ফোল্ডিং ছিপ তিন ভাগ ৮।০।

পিতল হুইল অর্ডিনারী ১।০ ১।০, ২" ২.
২।০ ২।০, ৩" ৩.০। মধ্যম ২" ৩.০, ২।০ ৩৮.০,
৩" ৪।০।

উৎকৃষ্ট এলুমিনিয়াম পারফরেটেড ২" ৪.
২।০ ৫.০, ৩" ৬.০, ৩।০ ৮৮.০, ৪" ১০.
৪।০ ১১।০, ৫" ১২।০।

মৃগা সূতা—নকল ১.০, আসল ২.০, ঐ উত্তম ২।০।
হাতে পাকান একপ্তা স্পেশাল ৪।০ প্রতি ভরি।

ব'ড়শী—বর্ধমান ও ধনেখালী বড় ১০. মাঝারী ৮.০,
ছোট ৮.০, জোড়া খটান মজুরী ৮.০ প্রতি জোড়া।

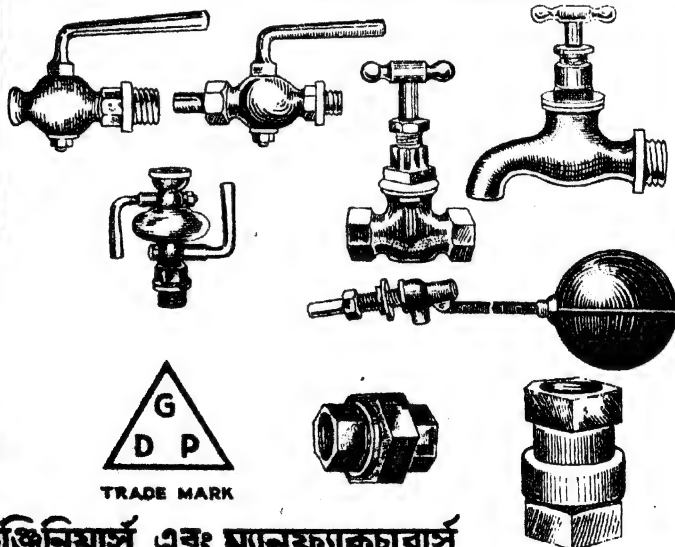
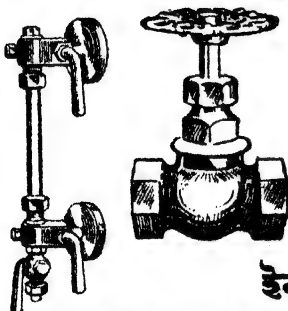
ডি, জি, বি গোল ব'ড়শী ৮.০ জোড়া। বিলাতী
খাচের বা কাতলা ব'ড়শী ১।০ জোড়া,
ঐ দেশী ৮.০ আনা। দেশী লিম রীক হুক (টেম-
সনের নায়) (১—২০) ২০. হাজার। ফাতনা
প্রত্যেকটি ৮.০, চার ১।০ কোটা।

দাশ গুপ্ত বাদাস এণ্ড কোং

১৩৯বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ—৭৭।১, হ্যারিসন রোড।

ফোন বি বি ৬৭৪৫

ডালের কল
সংক্রান্ত
যাবতীয় সরঞ্জাম
প্রস্তুত কারক



ইনজিনিয়ার্স এবং ম্যানুফ্যাকচারার্স

গোবরধন দাস পি, এ,

২৮নং ক্রাইস্ট স্ট্রীট, কলিকাতা

দেওয়া আছে, তাই খাওয়ারান, আমি ফিরতি-পথে দেখে যাব।" সত্যেন কহিল, "কখন ফিরবেন?" পরেশ কহিল, "ডেলিভারী কেস্, দেরি হবে সম্ভবতঃ; যখনই ফির দেখে যাব নিশ্চয়ই।"

ফিরতি-পথে পরেশ সত্যেনের বাড়িতে নামিল। বেলা প্রায় দুইটা। দরজায় থাক্স দিতেই আরতি দরজা খুলিয়া দিল। পরেশের মূখের দিকে একবার তাকাইয়াই মূখ নামাইয়া লইয়া ফিরিয়া যাইতে উদাত হইতেই পরেশ কহিল, "আপনার দিদি কেমন আছেন?" আরতি জু দুইটিতে ক্রীণ কুণ্ডনের আভাস জগাইয়া কহিল, "ভাল নয়, বসুন।" বলিয়া চলিয়া গেল।

থোকা আসিয়া কহিল, "ডাক্তারবাবু আসুন।" থোকায় সঙ্গে সঙ্গে রোগীর শয়নকক্ষে ঢুকিয়া দেখিল, আরতি নাই। খাটের পাশে চেয়ারে বসিয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন আছেন?" সুনীতি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "ভাল না।" পরেশ কহিল, "দেখ একবার হাতটা?" সুনীতি হাত বাড়াইল। জরতপ্ত হাতখানি নিজের হাতে লইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মূখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "সত্যেনবাবু! কুলু?" সুনীতি ঘাড় নাড়িয়া 'হা' জানাইল। অদূরে একটি টেবিলের উপর একটা কাগজে জরুরের তাপ-মাত্রা-ভালিকা লেখা ছিল। কাগজটি দেখিয়া পরেশ কপাল কঁচকহিল তারপর থোকাকে কহিল, "চল থোকা, বাইরে যাই।" এমন সময়ে আরতি আসিয়া সুনীতির কানে কানে কি বলিতেই সুনীতি ক্রীণকণ্ঠে কহিল, "আরতি আপনাকে নেয়ে খেয়ে যেতে বলছে।" পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কিছ দরকার নেই, আমি বাড়িতে গিয়েই খাব এখন। একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছ, এখনই যেন আনিয়ে নেওয়া হয়।" বলিয়া যাইতে উদ্রুত হইতেই সুনীতি কহিল, "বেলা অনেক হয়ে গেছে, খেয়েই যান।" পরেশ কহিল, "তা হোক, তা হোক, ব্যস্ত হবেন না, তা ছাড়া বাড়িতে মাসীমা অপেক্ষা করে বসে আছেন।" বলিয়া আরতির দিকে চাহিতেই একটি সূতাঙ্ক কটাক্ষঘাত লাভ করিল। সামলাইয়া লইয়া পরেশ কহিল, "নন্দকার, চল।" বলিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় বাসিল। একটা কাগজ টানিয়া লইয়া প্রেসক্রিপশন লিখিয়া থোকায় হাতে দিয়া কহিল, "তোমার মাসীমাকে দাওগে।" তারপর বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া সদর দরজায় পৌঁছিতেই পিছন হইতে আরতির তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ডাক শুনিয়া থোকায় দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল, আরতি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, টক্‌টকে রাজমুখ, শাণিত ছত্রির ফলার মত চোখ, কম্পমান ওষ্ঠাধর—

আরতি মূহূর্তকাল একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া চাপাকণ্ঠে কহিল, "আসুন।" পরেশ কাছে আসিয়া কহিল, "মাসীমা অপেক্ষা করছেন যে।" আরতি অশ্রুঘনকণ্ঠে কহিল, "আমিও অপেক্ষা করে আছি, এখনও খাইনি আমি।" পরেশ কহিল, "তাই না??" সেদৃশ দেখি কি অন্যায়—বাড়িতে অসুখ।" আরতি জবাব না দিয়া চলিয়া গেল, পরেশ আসিয়া চেয়ারে বসিল।

শয়ন সারিয়া থাইতে বসিয়া পরেশ কহিল, "আপনিও বসে গেলেন না কেন?" আরতি একটা পাখা হাতে সামনে বসিয়াছিল, জবাব দিল না। ভাতে হাত দিয়া পরেশ আরতির মূখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "এখনও গরম রয়েছে।" আরতির মূখে একটি অতি ক্রীণ আভা ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। পরেশ কহিল, "বসে রইলেন কেন? যান, খেয়ে নিন গে।" আরতি মৃদুস্বরে জবাব দিল, "পরে খাব এখন।"

পরেশ কহিল, "ডাক্তার হিসাবে আমার কথা আপনার শোনা উচিত। এক রোগী নিয়েই সব অস্ত্রের, তার ওপর আপনি পড়ে গেলে সত্যেনবাবুর হাতে লাগা উঠবে যে।" আরতি গম্ভীর মূখে জবাব দিল, "আপনি খেতে দেরি না করলেই আমার দেরি হবে না।"

পরেশ কহিল, "তা বটে। আমার কথা যখন আপনি শুনবেনই না, তখন তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলে আপনাকে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত।" বলিয়া থাইতে সুরু করিল। আরতি কহিল, "আপনি আমার আমাকে 'আপনি' 'আপনি' করছেন।" পরেশ মূখ তুলিয়া কহিল, "তা কি করব? যা সব সময় হেডমাস্টারের মত গোমড়া মূখ করে দেখেছেন, 'তুমি' বলতে সাহস হচ্ছে না।" আরতি ঝিকা হাসি হাসিয়া কহিল, "হেডমাস্টারী ছে। আপনার কমলরাণী কমলের মত মৃদুই বা কোথায় পর্ব; আর তেমন হাসিই বা কোথায় পাবে?"

পরেশ আমতা অমতা করিয়া কহিল, "তা কি আসিৎ বলিবে? দুপুরের কথার কথার ভারী মাল করছেন।"

থাইতে থাইতে হঠাৎ মৃদু ক্রীণায় পরেশ কহিল, "আরতি! ডাক্তার—"

দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া অসিৎ। চোখে চোখে মিলিতেই আরতি কহিল, "ওকি খামলেন যে।" পরেশ কহিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, রাগ করবেন না?" আরতি কহিল, "কি?"

"আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট করিতে গেলেন কেন?"

আরতি জবাব দিল, "আপনি আমাদের জন্যে এত করছেন, তার বদলে এটুকুও করব না?"

পরেশ কহিল, "আর কোন কারণ নেই তো?"

আরতি কহিল, "না।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ইবৎ ধারালো স্বরে কহিল, "থাকলেও আপনাকে জানিয়ে লাভ নেই।"

পরেশ নতমুখে থাইতে প্রবৃত্ত হইল।

সেদিনের আরতির আশ্চর্যকালের পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত পরেশ আরতির প্রতি তাহার আকর্ষণকে একতরফা বলিয়া জানিত ও জাতিত, ইহা একজন যুবতী নারীর সাহচর্যে যুক মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। ইহার আশ্রয়, আরতি যতদিন চোখের সম্মুখে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত, আরতি অন্তর্মিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরাগের মত উহা মিলাইয়া যাইবে। কিন্তু আরতিও যে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, তাহা আশা করিবার মত অস্বাভিমান তাহার ছিল না। তাহা ছাড়া তাহার সামাজিক সংস্কার, সাংসারিক বৃদ্ধি, বিশেষ করিয়া কমলার সহিত তাহার অবশ্যস্বাভাবী বিবাহ-যোগ্য অবিরত স্ন-সংকেত করিয়া তাহার মনকে নিরস্ত করিত। কিন্তু যখন আরতি তাহার কাছ হইতে ঠুনকো বস্তুটির বদলে মল্লবত কিছু চাহিয়া তাহার প্রতি নিজের আলাপের আভাস দিল এবং তাহার অপারগতার অভিমানে প্রতি মূহূর্তে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, তখন হইতে পরেশ নিজের মনকে নবলম্ব জ্ঞানের আলোকে নতুন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। দেখিল, আরতির প্রতি তাহার যে আকর্ষণকে সে নেহাৎ বাহ্যিক ব্যাপার বলিয়া অবহেলা করিয়াছে, তাহা তাহার অজ্ঞাতে তাহার জীবনের গভীর ভিত্তিমূলে নড়া দিয়াছে। সমাজ, সংসার, আত্মীয়স্বজনের প্রীতি, আর্থিক উন্নতির প্রীতি লোভ, কমলার প্রীতি মোহ ও কৃতব্যবৃদ্ধি, যাহা তাহার মনকে চারিদিক দিয়া এতদিন টানিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা যেন ক্ষয় শিথিল ও শিথিল হইয়া পড়িতেছে। এমন কি, আরতি যদি মৃদুস্বরে সভা ভলবাসার জোরে একবার টান দেয়, তাহা হইলে সে এক মূহূর্তে টুকরো টুকরো হইয়া ছিঁড়িয়া যাইবে এ সম্বন্ধেও সে কিছু নিশ্চিন্দ হইয়া উঠিল। আজ তাহার জন্য আরতির প্রীতিপ্রসঙ্গাদিত উবেগ, তাহার কণ্ঠস্বরের জন্য ক্রেশ স্বাক্ষর ও তাহাকে চালিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার অশান্তগঞ্জিত প্রিয়জনসুলভ রোষ, তাহাকে নিঃসন্দেহভাবে বুকাইয়া দিল যে, আরতি তাহাকে ভালবাসে। যে ছেলে বরাবর টানাটানি করিয়া পাস করিয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে সবপ্রথম হইয়া পাস করার মত তাহার সাধারণ জীবনে ইহা এত অসম্ভব, অসাধারণ ও অতুতপূর্ব ঘটনা যে, তাহার মন বিস্ময়ে ও পূন্যকে আশ্চর্য হইয়া উঠিল।

আরতি কহিল, "কি এত ভাবছেন?" পরেশ অনমনসকভাবে কহিল, "কিছ না।"

আরতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "ভাবছেন বইকি। না হ'লে খেতে ভুলে যাচ্ছেন কেন?" পরেশ কহিল, "কই না।" আরতি চক্কর ইঙ্গিতে দুইটা তরকারির বাটী দেখাইয়া কহিল, "ও দুটোতে হাত পর্যন্ত দেন নি। অথচ আপনার জন্যই রান্না করা হয়েছে।" পরেশ লাল্জাতমুখে কহিল, "ওঃ! তাই নাকি।" বলিয়া সেই তরকারিগুলি অত্যন্ত নিষ্ঠুর সহিত থাইতে সুরু করিল।

খাওয়ার পরে পরেশ বৈঠকখানায় বসিয়া ছিল, ঘণ্টাব্যবধি পরে আরতি আসিল। পরেশ কহিল, "খাওয়া হ'ল?" আরতি জবাব না দিয়া কহিল, "দুখের মাকে পাঠিয়ে দিলুম ওষুধ আনতে; আপনার মাসীমাকে খবর পাঠিয়ে দিলুম।" কিছুক্ষণ পরে আরতি কহিল, "জমাইবাবু আজ বধমানে চিঠি লিখে দিয়েছেন—ওঁর দাদা আছেন সেখানে।" পরেশ কহিল, "কেন?"

"দাদিকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে।"

পরেশ বিস্ময়ের সহিত কহিল, "তাই নাকি?"

আরতি কহিল, "আমি বললুম লিখতে; ভাল লাগছে না আমার আর এখানে; রঙীটো জীবর আসির মত ব্যাপার হচ্ছে।" পরেশ সৌম্যবেগে কহিল, "সেই নাকি? ওরই তো আর খাটকাল রা?" আরতি ঘাড় নাড়িয়া দৌটি ফুটাইল।

বিশ্বপদ
নিউরোগ



ওয়েলথ
প্রতিষ্ঠান

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট,
কলিকাতা।

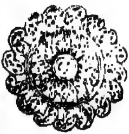


দেশের সেবায়

দেশের সেবা নানান দিক থেকে সম্ভব—এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই। রাজনৈতিক, দেশসেবক, কবি—সকলেই তাঁদের নিজেদের পাথে দেশ-সেবায় নিযুক্ত। কিন্তু এ কথা অতি-স্পষ্ট যে দেশের শিল্পোন্নতি না হলে সত্যিকারের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। আর শিল্পোন্নতির জন্যে অনিবার্য প্রয়োজন ছাঁচ-এর। এ কথা যে কোন শিল্পের পক্ষেই প্রযোজ্য। এস ডি গুপ্ত এবং কোং জাতীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে ছাঁচ প্রস্তুত করার কাজে আত্মোৎসর্গ করেছে।

ডি, এন, রায় এণ্ড ব্রাদার্স

১৫৩।৫ বহুবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

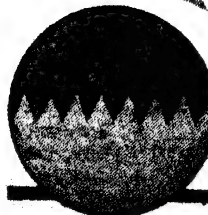


কল্যাণময়ী নারীর রমণীয় দেহশ্রীতে শোভা ও সূক্ষ্ম ফাঁটির তুলতে পারে ডি. এন. রায় এণ্ড ব্রাদার্সের সূর্যচন্দ্রমণ্ডল অলংকার। খাঁটি সোনার ও জড়োয়ার গহনা প্রস্তুত এঁদের ৫০ বৎসরের অভিজ্ঞতাই কারুকার্যের অভিনবত্ব এঁদের করেছে অশ্বিতীয়। সহরে ও মফস্বলে এঁদের ডিজাইন্স সর্বজনপ্রিয়।



ডি. এন. রায় এণ্ড ব্রাদার্স,
১৫৩।৫ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

এই চিহ্নে ধনে রাখবেন



এস.ডি.ও.ও. কোং

আশোক পার্ক, বাঁশখালী রোড, কলিকাতা - টালীগঞ্জ

“এমনই। ওষুধ আর খাব না। যা হবার হোক গো।” শেষ দিকটার দৃষ্টান্তের আদ্র হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন আপন মনে কহিল, “কাল যদি চিঠি পৌঁছায় পরশু নিশ্চয় লোক আসবে, তারপর দিনই আমরা চলে যাব।” পরশ চিঠিতত্ত্বের নীরবে বসিয়া রহিল। আরতি স্থান হাসিয়া কহিল, “দিনকয়েক আপনাকে খুব বিরক্ত করে গেলুম। যাক, এরপর হাফ ছেড়ে বাঁচবেন।” ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “জীবনে কোনদিন আপনাকে বিরক্ত করতে আসব না আর।”

পরশ এতক্ষণ নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করিতেছিল, কহিল, “আরতি, তুমি কি আমার ওপর রাগ করছে?” জু দুইটি কিণ্ঠ তুলিয়া আরতি কহিল, “রাগ কিসের? কি করছেন আপনি?” পরশ কহিল, “অভিমান?” আরতির অধরেষ্ঠে একটি মৃদু হাসির ক্ষীণ আভাস চাপিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল, কহিল, “আপনার ওপর অভিমান করবার আমার কি অধিকার? আমি কি কমলা?”

পরশ বসিয়া ফেলিল, “তুমি কমলার চেয়ে বেশি।”

আরতি চোখ বড় করিয়া নিদ্রাপের স্বরে কহিল, “বলেন কি? সত্যি!” পরশ কহিল, “সত্যি! আমি এতদিন কলবার মত, মনের জোর পাইনি, আজ তোমার কচু থেকেই জোর পেয়েছি। তা ছাড়া নিজের মনের কথা জানতে পেরেছি আজ—তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না।” আরতি হাসিল, আগের দিনের মত উজ্জ্বল, মধুর ও মদির হাসি—সারাদিন মেঘলার পরে যেন সূর্যের হাসি—পরশের হৃদয় উল্লসিত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আশ্রিত কহিল, “কমলাকে এই সব কথা বলে পাঠাচ্ছি, মজা টের পাবেন এখন।” পরশ কহিল, “আরতি, তুমি যদি আমার ওপর প্রসন্ন হইলে, তবে কমলার চেয়ে আমার ভয় নেই।” আরতি কহিল, “কি বল চাই আপনার?” পরশ গাঢ়কণ্ঠে কহিল, “তোমাকে চাই।” আরতি পরিত্যক্ত কণ্ঠে কহিল, “কমলার রাগিনী হিসাবে বহি? আমার হাতের রায়্য খুব ভাল লেগেছে আপনার?” পরশ সঙ্কোচে কহিল, “আরতি, তুমি এখনও ঠাট্টা করছ।” আরতি মুহূর্তে গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিল, “ওঃ! ঠাট্টা নিষেধ! বেশ গম্ভীর হচ্ছি।” পরশ কহিল, “আমার কথার জবাব দাও।” আরতি কহিল, “আপনি বলতে চান কমলাকে নিয়ে আপনি যে সংসার পাতবেন, সেই সংসারে আমারও—” পরশ বাধা দিয়া কহিল, “কমলাকে নিয়ে সংসার কোন দিন পাতল না, আরতি। যদি কোন দিন পাতি, তোমাকে নিজেই পাতব, তুমিই হবে আমার সংসারের লক্ষ্মী।”

কটাক্ষ পরশের দিকে চাহিয়া আরতি কহিল, “কমলার কি হবে?”

পরশ কহিল, “কমলার জন্য তোমার ভাবনা নেই। তার কথা তার শূন্যস্থানায়ী ভাববে, তুমি তোমার কথা বল আমাকে।” আরতি মুখ নামাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, “কি বলতে হবে?”

আরতির ডান হাতটি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিয়া আরতি মূর্খের দিকে দুই চক্ষের বাকুল দৃষ্টি একত্র করিয়া, হৃদয়ের মূক প্রার্থনাকে কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য মধুর করিয়া, পরশ কহিল, “আরতি, তুমি কি আমাকে চাও?”

চাপা হাসিতে মুখোচ্চ উজ্জ্বল করিয়া আরতি পরশের মূর্খের দিকে তাকাইয়া রহস্যময় কণ্ঠে কহিল, “নাভী দেখে বুঝুন না।”

রাতি আটটার বাড়ি ফিরিতেই মাসীমা কহিলেন, “হ্যারে, এতক্ষণ কি করছিল ওখানে? বেলা তিনটে পর্যন্ত ও বেলা তোর জন্যে ভাত নিয়ে বসে রইলাম। ভালোম—এই আসে—এই আসে, শেষে হেডমাষ্টারের কি এসে জানিয়ে গেল, ভুই খেয়েছিস ওখানে। হ্যাঁরে, ওদের বাড়িতে বাসুন আছে তো, না ওদের হাতেই খাস?” পরশ জবাব না দিয়া কহিল, “আমার মরপাতিগুলো লোকটা দিয়ে গেছে তো?” মাসীমা কহিলেন, “সেগুলো তো কখন দিয়ে গেছে। আমি ছুইনি বাপু। উঠেনেই পড়ে ছিল। বউমা সব গুছিয়ে রেখে গেছে।”

পরশ কোতুরারের সাহিত কহিল, “তার মানে?” মাসীমা মূর্খক হাসিয়া কহিলেন, “তার মানে আবার কি? কেলে পিঠে করেছিলাম—বউমাটি পালেই রয়ছে, খাবে না? তাই তাকে পাঠিয়েছিলাম। বয়ানটি আমার লোক ভাল, ডাকবামাত্র পাঠিয়ে দিল। সারা বিকালটা বউমা ঘর ছুঁর করে ঘুরল আমার সঙ্গে সঙ্গে, কত কাজ করে দিল আমার।”

পরশ জবাব না দিয়া শয়নকক্ষে ঢুকিল। মাসীমা বস্ত্রিত লাগিলেন, “ভারী লক্ষ্মীমত মেয়ে। ওর থেকে ওর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ হয়েছে, সেই দিন থেকেই তোর রোজগার বেড়েছে।”

শয়নকক্ষে ঢুকিয়া পরশ দেখিল, টেবিলের উপর ছড়ানো বইগুলো সারিবদ্ধ করিয়া সাজানো হইয়াছে; আলোয় কাপড়গুলি গুছানো

হইয়াছে; বিছানাটি পরিপাটী করিয়া পাতা হইয়াছে; এবং মশারিটি চারিদিকে সমস্ত করিয়া টাঙানো হইয়াছে। মেঝেতে ও ঘরের কোণে যে থালা ও অর্ধজিনা অনেক দিন ধরিয়া নিবিবাদে জমায়া উঠিয়াছিল, তাহাদের নির্বাসন-দশা ঘটিয়াছে। তাহার মা ও বাবার ফোটো দুইটি থালা ও বাল মাটির অঙ্গুষ্ঠপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, সেগুলি পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; তাহার নিজের ফোটোটি এতদিন একটা ট্রাকের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া ছিল, সেটি দেওয়ালে উঠিয়াছে। কয়েক লোডা জুতা খাটের নীচে জুড়া হইয়াছিল, সেগুলিকে পাটি মিলাইয়া সারিবদ্ধ করিয়া সাজানো হইয়াছে।

মাসীমা ঘরে ঢুকিয়াই দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া কহিলেন, “কেমন গুছিয়েছে বল দেখি! যেখানে যেটি সেখানে।” তা ছাড়া এখন কৈকে কত দরদ, কত মমতা, যেন কতদিন ঘর করেছে।” ফাটি করিয়া কান্দিয়া ফেলিয়া কহিলেন, “দিদি যাদ দেখে যেত।” অশ্রু দিয়া নাক ও চোখ মুছিয়া কহিলেন, “অনেক ভাগে এমন বৌ মেলে, বাছা! ও এলে এ বাড়ির চেহারা বদলে যাবে, আমি বলে দিচ্ছি।”

পরশ জবাব না দিয়া জামা কাপড় বদলাইয়া চেয়ারে বসিয়া একটা বই টানিয়া গম্ভীর মুখে পড়িতে শুরু করিয়া দিল। মাসীমা কহিলেন, “খেতে দেব?” পরশ কহিল, “নাও।”

খাইতে বসিয়া পরশ দেখিল, থালায় ও থালার পাশে নানা প্রকারের পিঠে, পায়স, তিল ও নারিকেলের মিঠি। মাসীমা কহিলেন, “মিষ্টিগুলো তোর শব্দরবাড়ি থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে।” পায়সা খাইয়া পরশ তারিফ করিতেই মাসীমা কহিলেন, “বউমা নিজের হাতে করেছে।” ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, “অনেক কাজ জানে বাছা। মা শূদ্র আদরই দেয়নি, সব শিখিয়েছে। একাই একটা সংসার সামলাবার ক্ষমতা আছে ওর।” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “কতদিন ভেবেছি যে, অগোছালো মেলে আমার, একটি বেশ ঢালক-চতুর, গোছালো বউ হয় তো ওকে সামলাতে পারবে। তা ভগবান আমার মনের কথা শুনছেন, ওর হাতে সংসার সঁপে দিয়ে আমি ছুটি নিতে পারব।”

পরশ কহিল, “তোমার এত ছুটি নেবার ভাড়া কেন?”

মাসীমা কহিলেন, “কি করব বাছা! জুমাউটির চাকরি লান্স ভো, মাসের মধ্যে পাঁচশ দিন বাইরে কাটাতে হয়—মেয়েটার একটা দোস্ত নেই।” রাতে কমলার রচিত শয্যায় শইয়া পরশ আরতির চিন্তায় ডুবি গেল।

আজ সন্ধ্যার পূর্বে সূর্যোদিত আরতিতে জাকিয়া বালিয়াছিল, “স। দিনটি খারিছস, যা না ভাক্তারবারের সঙ্গে একটু ঘুরে আস, দুখের মা তো রয়ছে।”

দুইজনে বেড়াইতে গিয়াছিল। আরতি সাজগোজ কিছুই করে নাই, পরে ছিল কাপো পাজ সাদা সাধারণ শাড়ি, সাদাসিধে স্কাউজ, গায়ে একখানা রঙিন শাল, পায়ে স্যান্ডাল। বাগানের পাশের সেই পুকুরটির জলের ঘাটে বড় বড় ঘাসের উপর তাহার বসিয়াছিল। গল্প করিতে করিতে সে ঘাসের উপর হাতে মাথা দিয়া শইয়া পড়িতেই আরতি নিজের কোলের উপর তাহার মাথা টানিয়া লইয়াছিল। আরতির দেহের স্পর্শে ও গন্ধে তাহার সারা দেহে সম্যক্সাত বহিয়াছিল। সন্ধ্যা বিশাল ডানা মেলিয়া ঘনাইয়া আসিল, কালো আকাশের ছায়া বৃক্সে লইয়া পুকুরের জল কালো হইয়া উঠিল, জলচর পাখীর দল একে একে বাসায় ফিরিয়া গেল—তাহারা দুইজন দুইজনের চোখের পানে তাকাইয়া হাতে হাত রাখিয়া কিয়ৎকালের জন্য বাস্তব জগৎকে ভুলিয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আকাশে তারা ফুটিল, বাতাস কনকনে ঠান্ডা হইয়া উঠিল। আরতি কহিল, “চল বাড়ি বাই।” সে কহিল, “আরতি, আজ এমন কিছু দাও, যেন আজকার দিনটিকে চিরদিন আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করতে পারি।” আরতি হাসিয়া কহিল, “কি?” সে মুখে জবাব না দিয়া চোখের চাহনিতে মনের কথা প্রকাশ করিল। আরতি সন্দের মাখশারি আনত করিয়া তাহার ওষ্ঠে একটি দীর্ঘ ও তত চূষন মৃদুত করিল।

(২১)

পরদিন বেলা আটটার সতেনের বাড়ি গিয়া পরশ দেখিল, ঘনশায় করিয়া আছে। পরশকে দেখিয়া ঘনশায় কহিল, “এই যে বাবাজী, এস।” পরশ কহিল, “কখন এলেন?” ঘনশায় কহিল, “এসেছি অনেকক্ষণ।” তা তোমার এত দেরি হল?” পরশ জবাব না দিয়া সত্যনকে কহিল,



এবার পূজায় বাজে খরচ করিবেন না

পূজা যখন আসে তখন মধ্যবিত্তও নিজেকে লাখপতি মনে করেন। কারণ, যে সব উৎসব বাংলার ঘরে দেখা দেয় তার মধ্যে দুর্গা পূজাই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড়। এই সময় মানুষ সারা বছরের সঞ্চয় খরচ করে। কিন্তু এ বছরটা বিশেষ করে খারাপ সময় : দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক অসময়, যুদ্ধ আর মহামারী—এ বছরের দুর্ঘটনার যেন শেষ নাই। পূজায় আনন্দ করুন কিন্তু বাজে খরচ করবেন না। যতটুকু পারেন সঞ্চয় করুন—আগামীকাল কপালে কি আছে তাও আপনি জানেন না। দুর্ঘটনার জন্য সঞ্চয় প্রয়োজন। সুদিনকে ঘনিয়ে আনতে

আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করব, তখন বাজে খরচ করা হয়ত সম্ভব হবে। সুদিন আসবে জাতীয় শিল্প-উন্নতির মধ্যে দিয়ে। জাতীয় শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। জাতীয় শিল্প গড়ে তোলবার জন্যে যতটা পারেন সঞ্চয় করুন।

সঞ্চয় এবং জাতীয় শিল্প গড়ে তোলা, উভয় কাজেই সিভিল্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। উভয় উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করবার জন্যে শ্রীযুত এস্ আর রাহা, বি এল, এর নেতৃত্বে একদল সুযোগ্য কর্মী মেতে উঠেছেন। সুদিন দুর্দিন — সব সময়ই এঁরা আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

ফোন : কলি : ৩২৭৬
গ্রাম : ধলাগার

এ, কে, বোম,
ম্যানেজার

এম, কে, সেন,
অর্গানাইজিং অফিসার

সিভিল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লি:

৩, ম্যাপ্পো লেন - কলিকাতা

“কি ধবর বলুন!” সত্যেন কহিলেন, “আজ সকালেই ১০০°, বরষা বোধ হয় আজ ১০৪° ছাড়িয়ে যাবে।” পরেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “চলুন দেখিগে।” সত্যেনের পিছদ পিছদ পরেশ বাড়ির মাঝে প্রবেশ করিল।

বারান্দার উপর প্রাপ্তে আরতি দাঁড়াইয়াছিল। চোখে চোখ মিলিতেই তাহার মুখে একটি মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

যোগী দেখিবার সময়ে আরতি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কাল রাত্রে ঘুম হয়নি তো?” আরতি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না, ভোরের দিকে একটু উন্মার মত হয়েছিল।” যোগীর ঘর হইতে বাইর হইয়া পরেশ বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যেন বৈঠকখানায় চলিয়া গেল।

আরতি আসিয়া হাতে জল ঢালিয়া দিতে দিতে কহিল, “এখনই যেও না, চা খেয়ে যেও।” এই অতি-আপনারজননের মত একান্তে আরতিও অনুরোধ পরেশের কর্ণে মন্দর্ষণ করিল। মনে মনে কহিল, “তুমি আমেশ দিলে এখন কেন, কখনও যাইব না।” তবু ধমক বাইবার সোভে কহিল, “ধাকগে, চা খেয়ে এসেছি। ভারী জম্বুরী ডাক আছে একটা।” আরতি কালো চোখে কালিক হানিয়া কহিল, “তা হোক, এখন যেতে পারবে না। একটু দেরি হলে যোগী পালিয়ে যাবে না তোমার। আর শোন, বিকেল একবার এসো আজ, দরকারী কথা আছে।”

বৈঠকখানায় আসিতেই পরেশ দেখিল, ঘনশ্যাম টেবিলের উপর দুই কন্দি রাখিয়া উজ্জিত হাতের উপর মুখ রাখিয়া সত্যেনের চেয়েও চিন্তা-কুল হইয়া উঠিয়াছে। পরেশকে দেখিয়াই ঘনশ্যাম কহিল, “কেমন দেখলে বাবাজী, যা শুনছি, ব্যাপার তো শক্ত মনে হচ্ছে। একা সামলাতে পারবে, না যত্নেতক ও একবার ডাকবে ভাবছি।”

পরেশ গম্ভীর মুখে প্রেসক্রিপশন লিখিতে লিখিতে কহিল, “প্যারা-টাইফয়েড বলেই মনে হচ্ছে। তা একবার ডাকলেও হয়।”

সত্যেন কহিলেন, “আপনি যদি প্রয়োজন মনে না করেন তো দরকার কি? ঘনশ্যাম পোজ বদলাইয়া মুরুম্বিয়ানা সূরে কহিল, “পরেশ বাবাজী একা পারবে না, তা তো বলছি। তবে বড়ো জীবনে অনেকবার বানচাল নৌকা সামলেছে তো, একবার ডেকে পরামর্শ নেওয়া আর কি।”

পরেশ জবাব দিল না। ঘনশ্যাম সত্যেনকে কহিল, “বাড়িতে তো লোকজন আপনার নেই। সেবা-যত্ন রায়াবামা কে করছে?” সত্যেন কহিলেন, “আরতিই সব করছে।” ঘনশ্যাম প্রথমটা যেন বুদ্ধিতেই পারিল না—এমনই ভাব করিয়া ছু দুইটি কুণ্ডিত করিল, তারপর কপালটা কুচকাইয়া মাঝটা উপরে ও নীচে নাড়িয়া কহিল, “ওঃ! বর্কেছি, আপনার শালী তো! তা ভারিও তো শরীর খারাপ—”

সত্যেন কহিলেন, “তা তো খারাপ, পরেশবাবুর চিকিৎসায় ভাল আছে একটু; তবে বেশ দিন হলে পারবে না। তা ছাড়া ওর ছুটিও ফুরিয়ে আসছে।”

ঘনশ্যাম কপাল কুচকাইয়া ঠেঠের প্রান্ত দুইটা বুলোইয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “তা হলে তো মর্শকল মশায়! টাইফয়েড রোগ, দু চারদিনের মাঝা তা নয়—হয়তো এক মাস লেগে যাবে।” সত্যেন চিন্তিত মুখে কহিলেন, “সেই তো।” ঘনশ্যাম কহিল, “আপনার দাদা তো কাছেই আছেন, সেখানে পাঠায় ব্যবস্থা করলে হয় না? পরেশ বাবাজী কি বল?” পরেশ কহিল, “বেশ তো! সত্যেনবাবুর যদি তাই ভাল মনে হয়, আমার আপত্তি কি?”

ঘনশ্যাম সাল্ফনার সূরে পরেশকে কহিল, “এ ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি নে, বাবা। আরতি দেবী যদি এখানে থাকতে পারতেন তো কথা ছিল না; কিন্তু তাঁন যে চলে যাচ্ছেন, সেই তো হয়েছে মর্শকল।” —বলিয়া বিপর্য ও বিষমমুখে পরেশের দিকে তাকাইয়া রহিল।

দুখের মার দুখে দুই কাপ চা আনিয়া হাজির করিল। তাহাকে দেখিয়া ঘনশ্যাম কহিল, “তুই এখানে চাকরি করিস নাকি?” দুখে এক গাল হাসিয়া কহিল, “আমি কেন করব? মা করে। মা বললেই কারো চোক্ত বসে আছে, আমি বাব না, তুই দিয়ে আসলে বা, তাই তো লিয়ে এসম।” সত্যেন ও পরেশ ওশেই ফুটিয়া-উঠা হাসিকে সবলে চাপিতে লাগিল। ঘনশ্যাম জের করিয়া হাসিয়া কহিল, “বেশ করেছিস, তা তুইও বুদ্ধি জোর মায়ের সঙ্গে রোজ আসিস এখানে?” চাকের কাপ দুইটি নামাইয়া দিতে দিতে দুখে ঘাড় নাড়িয়া হাঁ জানাইল। সত্যেন কহিলেন, “থোককে নিয়ে থাকে, আর কোন সঙ্গী সেই তো।” ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “বেশ, বেশ।” দুখের উপরে কহিল, “ভালভাবে

থাকবি, কিছু নিরে-টিরে পালাস না বেন।” দুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না।” বলিয়া চলিয়া গেল। সত্যেন সম্ভ্রান্তভাবে কহিলেন, “ওসব অভ্যাস আছে না কি?” ঘনশ্যাম মুখ কুচকাইয়া চোখ দুইটি অর্ধমুদ্রিত করিয়া ঘাড়টি নাড়িয়া কহিল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ছোটলোকদেরই ওই অভ্যাস। কি ছেলে, কি বড়ো—ভাল জিনিস সেখলে আর লোভ সামলাতে পারে না।”

সত্যেন কহিলেন, “ঘনশ্যামবাবু, চা খান।” ঘনশ্যাম দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, “মাপ করুন, সকালে পুজো-আহিক না করে ও-সব থাই না।” পরেশ চা খাইতে শব্দ করিয়া দিলেছিল; ঘনশ্যাম জ্বার দিকে তাকাইয়া কহিল, “যে খাবার সে খেতে শব্দ করে দিলেছে, বলতেও হয় নি।” হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “জাচ্ছা, আমি আসি। ওই ব্যবস্থাই করুন—যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।” হাইতে উদ্যত হইয়া আবার ধমকিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া সত্যেনকে কহিল, “কাতিক ডাক্তারকে বলব নাকি?” সত্যেন কহিলেন, “আপনাকে বলতে হবে না। দরকার হলে আমিই চিঠি লিখব।”

ঘনশ্যাম হাইতেই সত্যেন কহিলেন, “রোগের বেশ রকম গতি দেখছি, সারতে অনেক দিন লাগবে। আমার এখানে রাখতে সাহস হচ্ছে না—কাল দালকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছি।” পরেশ কহিল, “শুনেছি, আরতি দেবী বলছিলেন।”

সত্যেন কহিলেন, “ওরই পরামর্শে লিখলাম—ও আর সাহস করছে না। তা ছাড়া ছুটিও ফুরিয়ে এসেছে ওর।” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “দাদা যদি একজন কাউকে পাঠিয়ে দেন, তা সে আর আরতি দুজনে মিলে ওকে নিয়ে যেতে পারবে না?” পরেশ গম্ভীরমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “তা পারবেন না কেন?” এই সময়ে দুখে চায়ের কাপ লইতে আসিল, সত্যেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোরা দিদিমা কি করছে?” দুখে কহিল, “ছ্যান করছে।”

“বলগে, স্নান করা হলে এখন যেন একবার আসে, পরেশবাবু ডাকছেন।”

কিছুক্ষণ পরে আরতি আসিয়া পরেশকে কহিল, “কি বলছেন?” পরেশ তাহার সদ্যস্নাত, সুপরিচ্ছন্ন, সুন্দর মুখের পানে তাকাইয়া মুখ হইয়া গেল। ভিজা চুল পিঠে লাটাইতেছে; সামনের চুলে ঘরিত-হস্তে প্রসাধনের চিহ্ন, কপালের মাঝখানে বড় সিন্দূরের ফোঁটা, পরলে একটি লাল পাড় সামা শাড়ি, সোমিঙ্গ ও ব্লাউস, পা খালি।

সত্যেন কহিলেন, “ছোট গিন্নী এসেছে?” আরতি কঠিন ভোখে ভ্রুজ্ঞগী করিতেই সত্যেন কহিলেন, “রোগ কিসের?” গিন্নী তো তোমাকেই বদলি দিয়ে ছুটি নিয়েছেন।” পরেশ হাসিতেই আরতি কহিল, “দায় পড়েছে আমার আপনার গায়ীর বদলি হতে।” পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, “কি জন্যে ডাকছেন?” সত্যেন গম্ভীর হইয়া উঠিল, “উনি ডাকেন নি, আমি ডাকছিলাম। বস দেখি, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।” আরতি বসিয়া কহিল, “কি পরামর্শ বলুন। আমার অনেক কাজ।”

সত্যেন কহিলেন, “তোমার গিদির বোধ হয় টাইফয়েড—অনেক দিন ছুগতে হবে; তোমার আর বেশি দিন ছুটি নেই বলছি, কাজেই বধমানে রেখেই আসতে হবে। ডাক্তারবাবুরও তাতে অমত নেই বলছেন। কাল যদি দাদা কোন লোক পাঠিয়ে দেন, তা হলে সে আর তুমি কি তোমায় দিদিকে নিয়ে যেতে পারবে?” আরতি চিন্তিতমুখে বসিয়া রহিল। সত্যেন বলিতে লাগিলেন, “আমার তো দেখে—বড়দিনের ছুটির আগে কোথাও যাবার উপায় নেই।” আরতি কহিল, “হাতে তো দুদিন এখনও আছে; অবস্থা কি রকম দাঁড়ায় দেখা যাক। অর যদি তেমনই হয়—” পরেশের দিকে তাকাইয়া “ডাক্তারবাবু একদিনের জন্যে সন্ধ্যা যেতে পারবেন না?” পরেশ সোৎসাহে কহিল, “খুব পারবে।” সত্যেন কৃতজ্ঞতার বিগলিতপ্রায় হইয়া কহিলেন, “পারবেন পরেশবাবু! আপনার কাজের কোন ক্ষতি হবে না?” পরেশ কহিল, “কি আবার ক্ষতি হবে? এক দিনের মাঝা বই তো নয়।” সত্যেন কহিলেন, “আপনার এই উপকার আমি কোন দিন ভুলব না পরেশবাবু।” পরেশ কহিল, “উপকার বলবেন না, ডাক্তার জনের প্রতি কৃতজ্ঞ হবেন। সুন্দরীত দেবীকে আমি আমার গিদির মত মনে করি।” লক্ষ্যভ্রমে সত্যেন কহিলেন, “তা আমি জানি—পরেশবাবু! কিন্তু আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার কল দিন দিন ভারী হয়ে উঠছে।” পরেশ কহিল, “আপনার কল ভারী হয় নি—আমারই আপনারের কাছে কৃতজ্ঞতার কল দিন দিন শোথ হচ্ছে।”

আধুনিক ডিজাইনের জড়ায়।
গহনার অভিন্ন সমাবেশ!



ইহাই একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
বাস্তব প্রতিষ্ঠান

নভেলটি জুয়েলারী

১৬০/১, বহুবাজার স্ট্রীট

কলিকাতা: ফোন:বি:বি: ১২৫৩

আরতি হাসিয়া কহিল, “আপনারা দুজন দুজনের পিঠ ধাবড়তে থাকুন, আমি চললাম রামধরে।” পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিল, “আবার না খেয়েই চলে যাবেন না যেন, আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

(৩০)

বাড়িতে ফিরিতে বেলা বায়েটা বাজিয়া গেল। মাসীমা কহিলেন, “তোরা শগুনবাড়িতে নৈমন্ত্যন আছে।” পরেশ বিরক্তির সহিত কহিল, “আবার এখন এতখানি ছুটেতে হবে? মুশকিল করেছে দেখছি।” মাসীমা কহিলেন, “সকল থেকে দুপুর পর্যন্ত হিজ্জী-দিব্বী করে আসতে পারিলি, আর এইটুকু যেতেই তোরা মুশকিল হ’ল? ধনী ছেলে বাছা।”

পরেশ কহিল, “রাতিতে নৈমন্ত্যন করলেই পারে, সারাদিনটা নষ্ট।” মাসীমা কহিলেন, “আজ বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা যে; সারা পোষ মাস প্রতি দুঃসপতাবারে বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা হয়; তা না হলে লক্ষ্মীর এত দয়া!” পরেশ জবাব না দিয়া বিরসমুখে শয়নরক্ষে চলিয়া গেল।

কাতিক ভাস্করের বাড়ি গিয়া পরেশ দেখিল, ভাস্কর বারান্দায় দাঁড়াইয়া গমছারা হাতদুখ মুছিতেছেন। পরিধানে পটবস্ত্র, গা খালি; শূদ্র উপবীত চওড়া লোমহবল বকের উপর আড়াআড়িভাবে ঝুলিতেছে; মাথার ঠিক মাঝখানে নাতিদীর্ঘ শিখাগছে, বাহা সাধারণতঃ চুলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকে, সম্প্রতি খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখিয়া ব্যাথা বাইতেছে—ভাস্কর এইমাত্র পূজা সমাপন করিয়া উঠিয়াছেন।

পরেশকে দেখিয়া ভাস্কর মুখ ও চোখে ইগিত আহবান করিলেন। রামাঘরের বারান্দায় কমলা ও তাহার দুই চারিজন বন্ধু এবং শ্রীমতী গমপ করিতেছিলেন। পরেশকে দেখিয়া তাহাদের গম্ভীরতা রুদ্ধ হইয়া গেল। কাতিক কহিলেন, “বস বাবাঙ্কি, আমি আসছি।” বলিয়া উপর কোঠার চলিয়া যাইতেই মেয়েদের মধ্যে মৃদুগঞ্জন ও চাপা হাসি শ্রুত হইল। পরেশ খাটিয়ার উপরে গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল।

শ্রীমতী কাছে আসিয়া কহিল, “কিহে, কার কথা ভাবছ?” পরেশ জবাব দিল, “কারও না।”

“তবু পাঁচার মত মুখ করে কি ভাবছ বল দেখি?”

পরেশ হাসিমর চোটা করিয়া কহিল, “তাও আপনাকে বলতে হবে।” শ্রীমতী চোখমুখে ঘুরাইয়া কহিল, “হবে না? তোমার মন এখন আমাদের কমলীর লাখেরাজ সম্পত্তি, তার খোজখবর করবার ভার আমার উপরে।” বলিয়া ঠোঁট দুইটি চাপিয়া চোখের ইগিতকে নিজেকে নিদ্রেশ করিল। পরেশ শব্দক হাসি হাসিয়া কহিল, “এর মধ্যেই।” শ্রীমতী কহিল, “তা নর তো কি? নরদম চুককে, ব্রাহ্মণপুত্র হ’লে গেছে, এখন তো কেবল দাঁলে লেখাপড়া মাত্র বাকি।” পরেশ হাসিয়া কহিল, “তবু বাকি তো।” কাতিকের বড়মের শব্দ শোনা গেল—নামিয়া আসিতেছেন; শ্রীমতী রম্মাঘরে চলিয়া গেল।

শোবার ঘরের বারান্দায় খাইতে দেওয়া হইল। খাইতে বসিয়া কাতিক কহিলেন, “হেডমাস্টারের স্ত্রী কেনন আসছেন?” পরেশ কহিল, “টাইফয়েড বলেই মনে হচ্ছে।”

পরেশ খাইতে খাইতে একবার মাথা তুলিয়া রামাঘরের বারান্দার দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইল, কয়েক জোড়া কালো চোখের দৃষ্টি তাহার উপর একাগ্র হইয়া আছে; একজোড়া কমলার, বাকিগুলি তাহার বন্ধুদের। কমলার বন্ধুগুলি পাড়রই মেয়ে; কাজেই, পরেশের সহিত চোখোচোখি হইতেই লজ্জারত্ত মুখে তাহারা চোখ ফিরাইয়া লইল। কমলা কিন্তু খিঙ্কখিঙ্কিত তাকাইয়া থাকিয়া মৃদু হাসিল। পরেশ হাসির জবাব না দিয়া মুখে নামাইয়া লইল। কমলার মুখখানায় যে সিদ্ধান্তপ্রবাহিমন্ত বিজলময়িতার তারের মত সঞ্চিত দেখিতে নিশ্চিন্ত ও বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহা তাহার চোখে পড়িল না; ভরপর আবার যখন সে মুখ তুলিল, দেখিল, কমলা ও তাহার সঙ্গিনীরা চলিয়া গিয়াছে।

কমলার জন্য পরেশের মনে করুণমিশ্রিত বেদনা জাগিল। বেচারা এখনও তাহার উপর দৃঢ়বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া আছে। সে জানে না, পদ্মার প্রস্রাবের মত ভাগ্যহাত তলকো তাহা আর আশ্রয়ভূমিকে শিখিল ও শূন্যগর্ভ করিয়া আনিতেছে—যে-কোন মহতেরে ভাঙিয়া, হুসিয়া, গুড়া করিয়া, উন্মত্তভাবে কোন এক অজ্ঞাত কলে নৃত্য করিয়া চর রচনা করিবার জন্য বহিয়া লইয়া যাইবে। বরির মত কমলাও দুঃখ পাইবে, যেদনা পাইবে, হয়তো লুকাইয়া গোপনে চোখের জল ফেলিবে; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের স্নেহ ও সান্নিধ্যর দুই বিশিষ্ট সান্নিধ্যই উঠিয়া আবার আর এক-জলকে ভালবাসিবার জন্য বনকে জৈরায় করিবে এবং ভবিষ্যতে বিবাহিত স্নানীর বিধি ও নীতিসঙ্গত আশির্বাদ আশ্রয়মণ্ডল করিবার সময়ে একবা

যাঘর উর্গত, উন্মত্ত, নীতি ও বিধি-বিশুদ্ধ বাহুবল্লভকে প্রতিরোধ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহাকে স্মরণ করিয়া ‘হুদয়হীন’ বলিয়া বিচার দিবে।

খাওয়ার পর কাতিক কহিলেন, “একটু বিশ্রাম করলে তো কর।” বলিয়া হাঁকিলেন, “ওগো, শুনছা!” পরেশ কহিল, “থাম্গে, বাড়ি যাই—একটু কাজ আছে।” কাতিক-গৃহিণী বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, “কি বলছিলে?” কাতিক কহিলেন, “বাবাজীকে বলছি একটু বিশ্রাম করলে, তো বলছেন—বাড়িতে কাজ আছে।” বলিয়া স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া মূবের কথা চোখের ইগিতে জনাইলেন। গৃহিণী কহিলেন, “এই খেয়ে এত রোদে গিয়ে কাজ নেই—পাশের ঘরে বিছানা করে দিয়েছে, একটু শয়ে যেও।” নিশ্চিতমত্বে রোগীর বিশ্বাসপন্নায় আত্মীয়স্বজনদের কাছে সহায় চিকিৎসক যেমন রুঢ় সত্য প্রকাশ করিতে বিশ্বাসবোধ করেন, পরেশ যেমনই কিতক ও তাহার স্ত্রীর কাছে আসিয়া আঘাতের আভাস দিতে বিশ্বাসবোধ করিল। এক মহতের ভাবিয়া সে ঘরে গিয়া শইয়া পড়িল।

মেঝেতে বিছানো সত্তরপ্তর উপর পরিপাটী করিয়া শয্যা রচনা করিয়াছে—বোধ হয় কমলা নিজে। অদূরভবিষ্যতে সে নিজে এই শয্যায় অংশভাগিনী হইবে ভাবিয়া হয়তো তাহার স্নানাদেহে পূজক জাগিয়াছে, বকের স্পন্দন স্রুতর হইয়াছে, মনের মধ্যে সুখানন্দ হইয়াছে। খাওয়ার সময়ে চোখোচোখি হইবার কমলার হাসি তাহার মনে পড়িল—কমনার কথকক নিশ্চিতরূপে করতলগত করিয়া মানুষ যেমন করিয়া হাসে, তেমনই হাসি। যেন তাহাদের দুইজনের জীবনযাত্রাপথ চিরদিনের জন্য এক হইয়া গিয়াছে, আর কোন দিন কোন কারণে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইবে না। প্রভাতে সূর্যের দিকে প্রথম চোখ মেলিয়া কমল যেমন সারাদিনের কথা ভাবিয়া হাসে, কমলাও হয়তো তেমনই তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া তাহাদের আগামী মিলিত-জীবনের শত সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া হাসিয়াছে।

আরতিও আজ সকালে এমনই হাসি হাসিয়াছিল। সেও নিবিচাছে, একান্ত নিভরতার সহিত নিজের জীবন-পথকে তাহার পথের সহিত মিলাইয়া দিয়াছে। তাহার অন্তরাত্ম্য এই মিলনকে পরম আনন্দ ও প্রগাঢ় আন্তরিকতার সহিত স্বীকার করিয়াছে। তবু কমলার কথা ভাবিয়া তাহার মনে বাধা বাজিল।

ঘর অন্ধকার; ঘরের এক কোণে মাড়ুসার জালে একটা মাছি ধরা পড়িয়া আত্মগঞ্জন করিতেছে; ঘরের বাতাসে একটি মিষ্ট ও সৌম্য গন্ধ। বাহিরে উঠানে কতকগুলো কাক কলরব সহকারে কলহ করিতেছে; রামাঘরের বারান্দায় মেয়েদের কথাবার্তার শব্দ কানে আসিতেছে। এই পরিচিত শব্দ-গম্ভীর জীবনের পরিমণ্ডল একেবারে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া কোন এক অপরিচিত জীবনের মধ্যে যাইতে হইবে ভাবিয়া পরেশের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী রম্মা খুলিয়া ঢুকিল। মেঝেতে পা মেলিয়া বসিয়া কহিল, “কিহে, কি করছ?” পরেশ চোখ মেলিয়া তাকাইল। শ্রীমতী কহিল, “ঘুমুচ্ছ নাকি?” পরেশ কহিল, “না, ঘুম আসছে না।” শ্রীমতী নাক উচাইয়া কহিল, “কমলীর বিছানার শূদ্রে ওর বালিশে মাথা রেখে ঘুম আসছে না কেন? কিসের এত ভাবনা তোমার?” পরেশ হাসিমর চোটা করিয়া কহিল, “কি আর ভাবনা? দিনের বেলায় ঘুমোতে পারি না আমি।” কথাটা উঠাইয়া দিয়া কহিল, “কারও সাড়া পাচ্ছি নে আর, কোথায় গেলেন সব?” শ্রীমতী কহিল, “তোমার শাদশুড়ী আর দাঁশি শাদশুড়ী গেল, ঘনশামের বাড়ি, তোমার ‘সব’ও গেছে তাদের সঙ্গে। বললার এত করে থাকতে, শুনল না।” চোখ লিলািয়া কহিল, “কমলীর মন ভাল যেই কিনা!” পরেশ কহিল, “কারণ?” শ্রীমতী খনখনে স্বরে কহিল, “কি করে থাকবে? যাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তার সম্মুখে বা-তা কথা কানে আসলে কারও মন ভাল থাকে”, পরেশ উল্লসকণ্ঠে কহিল, “কার কাছে কি শুনেন?” শ্রীমতী কহিল, “খদের মন কাছে, ফটকে ছুড়িটির তোমাকে নিয়ে কাড়-করখানায় কথা।” পরেশ শ্রু-বৃত্তিত করিয়া বিরক্তির সহিত কহিল, “তার মানে?” কণ্ঠকার দিয়া শ্রীমতী কহিল, “তার মানে ফুঁমি ভাল জানা।” বলিয়া এক মহতের খিচ দৃষ্টিতে পরেশের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, “তোমার জন্য বেলা দুটো পর্যন্ত না খেয়ে বসে থাকি, বিয়ে-করা ছুড়ির মত সান্নিধ্য বসে থাকারো, বরজা বন্দ করে পাশে বসে হাবি, গল্প, রসস্বাদ, একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া—” কণ্ঠস্থর তীক্ষ্ণকণ্ঠ করিয়া কহিল, “সব শুনাই হে, শুনতে কিছু বাকি নেই আমায়।” পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, “আপনাদের

চায়ের বাবু



আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে
প্রস্তুত আমাদের চায়ের বাবু ও
সরঞ্জামসমূহ আজ ভারতের সর্বত্র
মনোভাষার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে।
অসংখ্য 'প্ল্যান্টার' ও ব্যবহার-
কারীগণ কর্তৃক প্রশংসিত ও চা
কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক অনুমোদিত
আমাদের প্রত্যেকটি বাবু গ্যারান্টি
দেওয়া আছে।

দে চাটাজ্জী
এও কোং

১৩৫, ক্যানিং স্ট্রীট।

ফোন-কলি ০৮৬



একমুখের বাবু

ভিটা কর্ডিয়াল

সর্বপ্রকার স্ত্রীরোগে প্রয়োজনীয়,
যথা—বস্তুপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, স্রাবাশ্রুতা,
স্রাবাধিকা, বাধক প্রভৃতি উপসর্গে
কাণ্ড্যকর। নিয়মিত ব্যবহার করুন।



গ্লোব রিসার্চ ইনস্টিটিউট

৩০এ শ্রমসতলা স্ট্রিট, কলিকাতা।

দিল্লী, ইউ পি এন্ড পাঞ্জাবের একমাত্র পরিচালক—

এস, বি, রত্নাকর এন্ড কোং

(হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি)

চান্দিনি চক্, দিল্লী

“জাতিকে বাঁচাতে হলে চাই শিম্পের প্রমার
শিম্পের প্রমারে --- চাই জাতীয় ব্যাঙ্ক।”

উভয়ের

সে

বা

র

প্রতীক্ষার

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

প্রধান কর্মকেন্দ্র- ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

শাখা—কলেজ স্ট্রিট, শ্যামবাজার, গোহাটি, শিলেট, তেজপুর ও বড়পেটা
দিল্লী, আগ্রা, লক্ষৌ, ইত্যাদি শিল্পক্ষেত্রে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

গ্রাম : কয়েনস্

ফোন : কালঃ ৫৪৯

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ জে, সি, চক্রবর্তী।

পুত্র-চরটি অনেক বাড়িয়ে বলেছে। দুইয়ের একটা ডাক থেকে ফিরে ঠুন্দের বাড়ি গিয়েছিলাম। উনি না খায়েই ছাড়লেন না। ওদ শিখিতা মহিলা উনি, আপনার নাতনীটির মত পুত্রুষের গয়ের অতি লাগলে গলে যান না, কাজেই সামনে বসেই খাইয়েছিলেন, খওয়ার পর গল্প করেছিলেন, হয়তো হেসেও ছিলেন, কিন্তু তাতে দেখটা কি হয়েছে? "তুমি?" শ্রীমতী কণ্ঠস্বর দিয়া কহিল, "দেখ হয় কি? বাড়িতে একটা পুরুষ নেই, ঘরের গিল্মী অসুখে পড়ে, এ অবস্থায় একটা খেড়ে পুত্রুষকে নিয়ে একটা ধিপ্পী মেয়ের চলাচলি করায় দোষ নেই? এই তোমার বুদ্ধি?" পরেশ জবাব দিল না, শ্রীমতী বলিতে লাগিল, "মেয়েটার এত রকম পর্যন্ত বর জোটে নি, তাই কাণ্ডজ্ঞানের মাথা খেয়ে বর তার জিনিসে মুখ দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তুমি? দুদিন বাদে একটা মেয়ের জামিন-মরণের ভার নিতে যাচ্ছ, আর সে মেয়ে যা-তা, যার-তার নয়—তোমার এই কাণ্ড! তাছাড়া বামুনদের ছেলে হয়ে কয়েতের মেয়ের হাতে ভাত খাওয়া! জাত গেছে তোমার। ভাগ্যে কাতিক ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে, তাই কেউ কিছু বলছে না, না হলে গায়ের লোক একঘরে বসত তোমারা?" পরেশ কহিল, "বেশ তো! একঘরে জিলাম একদিন, আমার হাংলিই বা কী? কী?" চোখ দুইটা কুচকাইয়া শ্রীমতী কহিল, "তার মানে?" পরেশ কহিল, "আমার ওপর আপনাদের যদি বিশ্বাস না থাকে, কি করছি, কোথায় যাচ্ছি দেখবার জন্য পিছনে যদি চার লাগতে হয়, তো বিয়ে বন্ধ করে দিও না। এখনও অনেক সময় আছে, চেষ্টা করলেই মনের মত পার যোগাড় করে ঠিক দিনেই কমলার বিয়ে দিতে পারবোনা।" শ্রীমতী দুই চোখ বড় করিয়া সবুজে কহিল, "ও সব কি কথা রে?" পরেশ নীরবকণ্ঠে কহিল, "ঠিক কথাই তো বলছি। ডাক্তারকে সকলের বাড়িতেই যেতে হয়, সকলের সংগেই মিশতে হয়, সবাই তাকে আরাতির মত আদর আপ্যায়ন করে, এসব সহ্য করবার মত মনের প্রসারতা যে মেয়ের না থাকে, তার ডাক্তারের স্ত্রী হওয়া চলে না, হলেও তার কিবাহিত জীবন সংবের হয় না।"

শ্রীমতী তর তর করিয়া "কমলা তো কিছুই বলে নি ভাই। ও বর দুখের মাকে-কটিকে বলতে মানা করেন দিচ্ছে।" পরেশ কহিল, "আপনিই তো বলছেন এইমাত্র, ও রকম করছেন।"

শ্রীমতী কাজে সরিয়া আসিয়া কহিল, "আমি মিথ্যে করে বলছিলাম। ও হেনন মেয়ে নয়। ওর সে কত বশিষ, তা তুমি যখন শুক নিয়ে দূর করবে, বুঝতে পারবে। আজ একটু আগে ওকে আমি ডেকে বললাম, 'আমি তো তোমাকে, তোর বরের সঙ্গে কাজ করি চলে, ও কি জবাব দিলে জান, বললে—কাগড়া করে কি হবে? ভগবানের কাছে যে প্রার্থনা আমি সন্মানপূর্ণ করছি, তিনি যদি তা শ্রবণ থাকেন, তো ওকে আমি পাবেই, কেউ ওর মন ভাঙতে পারবে না।' আমি তো ওকেই কয়েক মিনিট ওই কথা শ্রবণ অব্যাহত।" বলিয়া গালে হাত দিয়া দুই চোখ বিস্ফারিত করিল। পরেশ মনে মনে কহিল, এ যদি আপনায় বানানো কথা না হয় তো আমিও অবাক।" প্রকরণে মৃদু হাসাসহকারে কহিল, "ভাই নাকি! কিন্তু যদি ভগবান না থাকেন? আর থাকলেও যদি তার কানের দোষ ঘটে থাকে, রাস তো কম নয়!" শ্রীমতী জিব কটিয়া কহিল, "ছিঃ! ছিঃ! ও সব কথা বলো না, ওতে পাগল হয়।" পরেশ নীরব রহিল। শ্রীমতী কহিল, "কমলার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না—এ কথা জুলেও মনে ঠাই দিও না। ও তোমাকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা বলে জেনেছে, এখন থেকেই নাম পড়তে শব্দ করছে। তোমাকে সারাদিন একঘর না দেখতে পেলো ডাক্তার তোমার মাঝের মত ছুটুট করে, দেখলে বেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়।"

কমলার মুখখানি পরেশের মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়ে, সীমাবদ্ধ জ্ঞান-সংকীর্ণ প্রতিজ্ঞতা; স্বল্প আশা ও স্বল্প সন্তোষ। তাই তাহার মত একজন সাধারণ লোককে ঘেরিয়া মনে মনে স্বখ-সৌধ রচনা করিয়াছে। যেদিন তাহার চক্ষের সম্মুখে সেই স্বখ-সৌধ স্বপ্নের মতই ভিলাইয়া বাইবে, সেদিন যে অপরিসীম বাধার তাহার মুখখানি বিবর্ণ ও বিহবল হইয়া উঠিবে, তাহার উদ্ভাপ পরেশ যেন নিজের বকের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল। অথচ উপায় নাই। আরতিকে তাহার চাই-ই। আরতির মত মেহে ও মনে সৌন্দর্যময়ী নারীকে নিজস্ব ভাবে পাইবার জন্য তাহার মনের মধ্যে যে তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা মিটাইবার সাধ্য কমলার মত সাদাসিধে পাশ্বে গ্রাম্য ছািকার নাই।

শ্রীমতী কহিল, "কি হে, রাগ পড়ল? শাস্ত দিতে হয় তো

আমাকেই দাও ভাই, কমলীর উপর রেগে থেকো না।" ঢোক গিলিয়া কহিল, "সত্যি বলছি—আমরা দুজন ছাড়া কেউ কিছু জানে না—আর জানবেও না। কিন্তু আমার একটু অনুরোধ রাখতে হবে ভাই। দু বেলা দুবার শব্দ রোগী দেখে আসবে, নাই বা ওই ছুটিটার সঙ্গে এত মিশলে। আজ না পড়ুক, লোকের চোখে তো পড়বেই একদিন—তখন নানা কথা উঠবে, তখন তোমার শব্দ-রাশ-গাড়ীর কি মনে হবে বল দেখি।" পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "হেডমাস্টার মহাশয়ের স্ত্রীকে নিয়ে উনি তো চলে যাচ্ছেন পরশু।"

শ্রীমতী পরম প্লবকের সহিত কহিল, "সত্যি নাকি?" নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যাক ভাই, ভালয় ভালয়—আমি সত্যনারায়ণের পূজা দেব একদিন।"

(৩১)

সেদিন পরেশ যখন সভানের বাড়িতে পেণীছিল, তখন সম্প্রা হাতে বেশ দের নাই। ঠৈকখানা খোলা ছিল, পরেশ একটা চেয়ার টানিয়া সম্মুখে বাসিল। অনতিবিলম্বে আরতি আসিল। মুখ নিবতিশয় গম্ভীর। ভারী গলায় প্রশ্ন করিল, "বিকলে এলে না?" পরেশ মাথা চুলকাইয়া কহিল, "একটা কলে ছিল।" চোখ দুইটি ছোট করিয়া আরতি কহিল, "কল ছিল বুঝি?" পরেশ বাড় নাড়িয়া কহিল, "না, নেমন্তন্ন ছিল।"

"কোথায়?"

"বমলাদের বাড়িতে।"

ওঠের প্রান্তলয় স্বয়ং কুণ্ঠিত করিয়া প্রচ্ছন্ন বাগ্গের সুরে আরতি কহিল, "কমলার কাছেই ছিলে এতক্ষণ?" পরেশ প্রশ্নবলেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, কমলার এক দিদিমা গল্প করছিলেন—"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া আরতি কহিল, "দিদিমা! ভাল।" কমলা কুচকাইয়া কঠিনের শান দিয়া কহিল, "তা আমার কথাটা মনেই ছিল না তোমার হয়।"

পরেশ জোর দিয়া কহিল, "বা রে! মনে ছিল না! বল কি আরতি?" কঠিনের ক্ষোভের আমেজ মিশাইয়া কহিল, "কিন্তু এমনই নাহজবান্দা মেয়েমানুষ যে, কিছুতেই ছাড়তে চাইছিলেন না।"

আরতি গম্ভীর স্বরে কহিল, "ঠুন্দের কিছু জানিয়েছ?" পরেশ হাসিমুখে চোটা করিয়া কহিল, "পাগল! এখন আমার জানান।" আরতি দুটুকু কহিল, "এখনই তো জাননো উচিত, ওরা তা হলে অন্যর চোটা করানো।" পরেশ কহিল, "তাহে অনেক গোলমালের সৃষ্টি হতো।" জু কুণ্ঠিত করিয়া আরতি কহিল, "এ হ'লে কি করবে ঠিক করেছ?" পরেশ কহিল, "আমি তো বলেছি আরতি, তোমারও যা পথ, আমারও তাই।" আরতি ভীক্ষুস্বরে কহিল, "কিন্তু কমলার পথের মতও তো ছাড়তে পারছ না দেখছি।" তাহাছ আমাকে পথে বার করে, আমার সন্মোদনত ফেলে পাঁচিয়ে এসে কমলার পিছ নেবে—"

পরেশ আত স্বরে কহিল, "আমার সম্পদে তোমার এই ধারণা আরতি?" বলিয়া ঠিকিয়া দাঁড়াইতেই আরতি কহিল, "উইছ যে!" পরেশ ক্ষোভের স্বরে কহিল, "অনটা ধারণা হয়ে গেল, এখন বাই, সভানবাবু এলে আসন।" বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্গত হইতেই আরতি চাপা সুরে ডাকিল, "শোন।" বলিয়া দুই পা আগাইয়া আসিল। পরেশও ফিরিয়া আরতি মূখোন্মুখী দাঁড়াইতেই আরতি কহিল, "কেন তুমি বিকলে এলে না? আমি সারাক্ষণ—" আরতি কথা শেষ করিতে পারিল না—অভিনানের বাগে কঠিনের বৃদ্ধ হইল। পরেশ আরতির চিবুকে হাত দিয়া মুখখানি ভুলিলার চোখা করিতে করিতে কহিল, "একি অস্বাভাবিক! তুমিও ছেলোমানুষ!" আরতি ফোস করিয়া উঠিয়া জলভরা চোখে বিদ্রুপের চমক হাসিয়া কহিল, "এর মধ্যে বাড়িয়ে গেছি তাহলে নাকি! তোমার কমলাই বুঝি কাটা টস্টেস!"

দরজার দাঁড়াইয়া দুইয়ের মা কহিল, "মামীমা, উনি ধরে গেছে, চায়ের জল চড়িয়ে দেবে?" পরেশ শব্দবাহিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। আরতি মুখ ফিরাইয়া কড়া গলায় কহিল, "ওর জন্যে অনুমতি নিতে হবে নাকি? দাওবে যাও। আর ময়দাটা বেগে রাখগে। যাচ্ছি এখনই।" দুইয়ের মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বাড় নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল।

পরেশ কহিল, "দুইয়ের মাটা দেখে গেল, সব ওদের বাড়িতে গিয়ে বলে দেবে—মাগী গোয়েন্দাগিরি করে।"

ভারতের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতিবিদ

মহামান্য ভারত সন্মতি স্বতন্ত্র কর্তৃক উক্ত প্রশংসিত। ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্র অসাধারণ শক্তিশালী অন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাজ-জ্যোতিষী জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিভূষণ



পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জ্যোতিষাণব, সামাদ্রিকর, এম্-আর-এ-এস্ (লন্ডন); প্রেসিডেন্ট-বিশ্ববিখ্যাত অল ইণ্ডিয়া এণ্ট্রোলজিকেল এণ্ড এথনোমিকেল সোসাইটী।

এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিলামাত্র মানব জীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নির্ণয়ে সিন্ধুহস্ত। ইহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা মাত্রা ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বাধীন রাজ্যের নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়া ও ভারতের বাহিরের, যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিংগাপুর প্রভৃতি দেশের মনীষীসমূহকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্মুখে ভূরিভূরি ক্ষমতা লিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দৌলখাই ব্যক্তিগত পারা যায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতিষবিদ—যাহার গণনাশক্তি উপলব্ধি করিয়া মহামান্য সন্মতি প্ৰবণ প্রশংসা জানাইয়াছেন এবং আন্তরজন স্বাধীন নরপতি উক্ত সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন।

ইহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্র অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী সমবেত হইয়া ভারতীয় পণ্ডিত মহাসভার সভায় একমাত্র ইহারকেই “জ্যোতিষ শিরোমণি” উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগকালে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অসংখ্য শক্তি প্রয়োগে উক্তর, কবিরাজ পরিহিত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, ভীষণ মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আত্মদুঃখ, বংশ নশ ইত্যে রক্ষা, দুরদুশ্চেষ্টের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তি সম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিখ্যাত ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল।

হিঃ স্ হাইনেস্ মহারাজা আটলিফ বলেন—“পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়—মৃত্যু ও বিমিত।”

হ্ র্ হাইনেস্ মাননীয় স্বতন্ত্র মহারাজা ত্রিপুরা স্টেট বলেন—“তান্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।”

কালিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মথোপাধ্যায় কে-টি বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্রের গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্নানাদি পিতার উপযুক্ত পুত্রতাই সম্ভব।”

সম্রাটের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—“ভবিষ্যৎবাণী বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।”

উড়িষ্যার মাননীয় এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি কে রায় বলেন—“তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।”

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দেব রায়কর বলেন—“পণ্ডিতজীর গণনা ও তন্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া সন্তোষিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।”

কেউমরুড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব শ্রীস্বর্গেশ দাস বলেন—“তিনি আমার মতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।”

ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতচন্দ্র মহাকবি শ্রীহরিন্দ্র সিংহপ্রভাচরণ বলেন—“শ্রীমান রমেশচন্দ্র ব্যালা নবীন ইংলণ্ডে দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনাসাধারণ ক্ষমতা।”

উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেমব্লীর মেম্বর মাননীয় শ্রীমতী সরস্বা দেবী বলেন—“আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন কোনওজন দেখি নাই।”

বিলভের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্যার সি. মাথবর্ নায়ার কে-টি বলেন—“পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।”

চীন মহাশয়ের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, কৃষ্ণল বলেন—“আপনার হিমচি প্রদেশের উত্তরই আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।”

ভাণ্ডারের অসংখ্য সংখ্য হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন—“আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচ আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পুত্রের জন্ম বৎ, পুত্রহীনতা।”

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য কবচ

উপকার না হইলে মৃত্যু ফেরৎ গ্যারান্টি পত্র দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ কলকাতা কুস্তুর ইহার উপাসক, যারো ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজকীয় ঐশ্বর্য, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা, সুখ ও শ্রী লাভ করেন। (১৮৫৬) মূল্য বাৎসর্য ১০০। অশুভ শক্তিসম্পন্ন ও সংখ্য মূলপ্রদ কবচসমূহের বহুৎ কবচ ২৯৯০। প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য সাধন কবচ।

বগলামুখী কবচ শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় সফললাভ, আকস্মিক সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপলব্ধি মনকে সন্তোষিত রাখিয়া কল্যাণলাভে প্রবৃত্ত। মূল্য ১৮০, শক্তিশালী বহুৎ ৩৪০। (এই কবচ ভাওয়াল সম্রাটের সন্মতি করিয়াছেন।)

সূর্য কবচ সূর্যদেবী মনোরোগমুক্তি ও স্বাস্থ্যসাধন বিধান করিতেছেন সূর্যবৎ সূর্যকবচ যারো মানব নীরোগ, সুস্থকায় ও দীর্ঘ-জীবী হয়। মহাব্যাধি প্রমেহ, অশ, বহুমত্র, ভগদর, বক্ষা, হিপানি প্রভৃতি যে কোন দুরারোগ্য জটিল ব্যাধি ইহাতে আরোহ লাভ করে। মূল্য ১৮০, বহুৎ সূর্য কবচ মূল্য ১৫০০। সংখ্য ফলপ্রদ আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন ১৫০০।

অল ইণ্ডিয়া এণ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এথনোমিক্যাল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং নিচিরশীল জ্যোতিষ ও তন্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস:—১০৫ (আ) প্রে স্ট্রীট “বসন্ত নিবাস”, (শ্রীশ্রীনগর ও কালী মন্দির), কালিকাতা।

ফোন: বি. বি. ৬৬৬৫। সন্ধ্যার সময়—প্রাতে ৮টায় হইতে ১১টায়।

রাষ্ট্র অফিস—৫৭, ধর্মতলা স্ট্রীট (ওয়েলিংটন স্কয়ারের মোড়), কালিকাতা। ফোন: কালিকাতা ৫৭৬২। সময়—বৈকাল ৫ই হইতে ৭টায়।

লন্ডন অফিস—মিঃ এম.এ. কাটিন্স, ৭-এ, ওয়েস্টওয়ে, রেইনিস্ পার্ক, লন্ডন।

আরতি কহিল, “ওই নাকি! আগে জানলে আরও ভাল করে দেখিয়ে দিইতুম, তোমার লুকোচুরি পালা শেষ হয়ে যেত।”

বাহিরে জুতার শব্দ হইতেই আরতি জুতা চাইয়া কহিল, “জামাইবা, আসছেন, আমি যাই, তুমি বস।” আরতি দ্রুতপদক্ষেপে বাহিরে চলিয়া গেল। পরেশ বসিয়া পড়িল।

সত্যেন্দ্র আসিয়া পরেশকে দেখিয়া কহিলেন, “এই যে ডাক্তারবাবু, কখন এলেন?” পরেশ কহিল, “এইমাত্র।” সত্যেন্দ্র কহিলেন, “বসুন, আমি ধড়-চড়াগুলো ছেড়ে আসি।” বলিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে জামা-কাপড় বদলাইয়া, হাত-মুখ ধুইয়া, সত্যেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, “সকালে যা ভয় করছিলুম, তা হয় নি। জরুরী আর বড়ো নি, বরং কমাতে শুরুর করেছে।” পরেশ আগ্রহের সহিত কহিল, “তাই নাকি! তা হলে হয়তো আঙ্কালের মধ্যে জরুরী রেমিশান হয়ে যেতে পারে।” সত্যেন্দ্র কহিলেন, “জরুরী যদি দু-একদিনে কমেই যায়, তা হলে এত হাঙ্গামা করে বর্ধমান পাঠিয়ে কি হবে?” পরেশ কহিল, “আরতি দেবী থাকতে পারবেন না বেশিদিন বলছিলেন যে।” সত্যেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, “ওর সেক্রেটারি লিখেছে—শরীরের উঠলে বর্ধমানের ছুটির আগেই জয়েন করতে। ও যদি লিখে দেয়—ওর শরীর সারে নি—আর আপনি একটা সার্টিফিকেট দেন তো আরও ছুটি পেতে পারে।”

কিছুক্ষণ পরে আরতি আসিয়া হাজির হইল—দুই হাতে খাবারের প্লেট, পিছনে পিছনে আসিল দুখের মা—দুই হাতে দুই ক্লাস জল।

পরেশ কহিল, “আবার আমার জন্যে নিয়ে এলেন?” আরতি কহিল, “বড়লোক শশুরের বাড়িতে না হয় খেয়েই এসেছেন, তা বলে গরিবের বাড়িতে এক মুঠো খসখসে দেয়া কি?”

পরেশ কহিল, “তা কি আমি বলছি, আমার ক্ষিদে নেই।”

আরতি নীরসকণ্ঠে কহিল, “ক্ষিদে না থাকলে ফেলে রাখবেন, আমি চা নিয়ে আসি।” বলিয়া চলিয়া গেল।

সত্যেন্দ্র কহিলেন, “মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে দেখছি। আর এতেও না হয়! সংসারের ঝগড়া, তার উপর রোগীর সেবা। আপনার ওমুখটা আশ্চর্য কাজ করেছে তাই, না হলে ওর যদি রোগটা এই সময় চড়া দিয়া উঠত তো মুশকিল হত।” আরতি আসিল, সত্যেন্দ্র হাত গুটাইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া বাগের স্বরে কহিল, “আপনারও ক্ষিদে নেই বুঝি?” সত্যেন্দ্র স্তানমুখে সখেদে কহিলেন, “হিল, উবে গেছে। একজনের একচোখোমি খেলে ক্ষিদে থাকে?” আরতি ক্রটিম কোপে অপূর্ণ মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, “ওই হচ্ছে আর কি? খেয়ে নিচ টপটি—আমার অনেক কাজ পড়ে।” পরেশকে কহিল, “খুজেন যি! জোর করে খেয়ে কাজ নেই—শেষে আপনার শব্দশূন্য শাড়া আমাদের গালাগালি দেবেন।” সত্যেন্দ্র কহিলেন, “পরেশবাবু, থালাশুধু না খেতে পেরে নাকি কবে দুখ করাছিলেন, আজ আর সে দুখ রেখে কাজ নেই, সব গিলে ফেলুন, না হলে আরতির রাগ যাবে না।”

আরতি নতমুখে চা ঢালিতে ঢালিতে কহিল, “বেশ তো, খান না—ডাক্তার মনুষ্য এমন এক হজমগুণী তৈরি করে খপেন যে, সব হজম হয়ে যাবে।”

সত্যেন্দ্র গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “আজ্ঞা আরতি, তোমার কি মতি আর ছাটি নেই?”

আরতি চকিত মুখে তুলিয়া কহিল, “মানে? আমি কি মিথ্যা বলছি নাকি?” সত্যেন্দ্র অপ্রতিভভাবে কহিলেন, “না না, তা বলি নি, মনে—বর্ধমানের ছুটিটা কাটিয়ে গেলে চলে না?” আরতি কহিল, “চলবে না কেন? চাকরির মাস ছাড়তে পারলে সারা জীবনটাই কাটিয়ে দেওয়া চলে।” বলিয়া পরেশের দিকে একবার চাহিয়া আবার নতমুখে চা ঢালিতে লাগিল।

সত্যেন্দ্র হতাশভাবে পরেশের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, “তা হলে আর কি! নিয়ে যাবার ব্যবস্থাই বজায় রাখতে হবে।” পরেশ কহিল, “সেই ভাল, স্থান পরিবর্তন অনেক সময় ওষুধের চেয়েও বেশি কাজ করে—এখনই চেষ্টা সেখানে হয়তো উনি আরও তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন।”

আরতি রান্নাঘরে চলিয়া গেল। সত্যেন্দ্র ও পরেশ গল্প করিতে লাগিল। স্থির হইল, পরের দিন শেষরাতে পরেশ এবং বে লোকটি আসিবে সে, গরুর গাড়িতে করিয়া নিকটবর্তী স্টেশনে রওয়ানা হইবে;

সকালে আরতি ও সুনীতি পালকী চাড়ায়া যাত্রা করিবে। গোমস্তা মহাশয় পালকী ও গাড়ির ব্যবস্থা করিবেন।

এদিকে বাহিরের সারা আকাশ কলো মেঘে ছাইয়া গিয়া কিম্বিক্রম করিয়া বৃষ্টি পড়িতে শুরুর করিল এবং শীতের তীব্র শীতল বাতাস তীব্রতর ও প্রবলতর হইয়া উঠিল। সত্যেন্দ্র উৎকণ্ঠার সহিত কহিলেন, “বৃষ্টি শুরুর হলে যে! বাদলা হবে নাকি?” পরেশ সবজ্ঞাতার মত কহিল, “পোনের মেঘ তো, সকলেই ছেড়ে যাবে বোধ হয়।”

রাত্রি আটটার সময়ে পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “রাত হ'ল, চল তা হলে।” সত্যেন্দ্র কহিলেন, “পাগল নাকি! এই বৃষ্টিতে কোথায় যাবেন?”

পরেশ কহিল, “এমন কিছু বৃষ্টি পড়ছে না, খুব যেতে পারব।”

সত্যেন্দ্র কহিল, “পারবেন, তা জানি—আপনার মত বয়সে আমিও পারতুম। তা হলেও আরতির মতামতটা একটু জেনে আসা দরকার।” বলিয়া সত্যেন্দ্র ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সত্যেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন না, আসিল আরতি, আদেশের সুরে কহিল, “এই বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি যেতে হবে না—এইখানেই খেয়ে নাও, তারপর যদি বৃষ্টি ছাড় তো বাড়ি যেও।” তারপর আকাশে কালো মেঘের বিদ্যুতের এক টকরা যেন আরতির কালো চোখে চমক দিয়া উঠিল, ঝকঝক দিয়া আরতি কহিল, “এত বাড়ি যাবার তাড়া কেন বল দেখি। কে আছে সেখানে? একটা রাত্রি এখানে থাকলে দোষ কি?”

পরেশ পরম বিস্ময়ের সহিত আরতির মুখের দিকে তাকাইল। দুই দিনেই কঠিনতার মালিন্যের সুর লাগিয়াছে, প্রগল্ভী প্রহরিনী হইয়া উঠিয়াছে। তবু নতুন চাকরির মত আরতির এই নতুন কর্তব্য পরেশের ভাল লাগিল। মাথা চুলকাইয়া কহিল, “মাসীমা ভাববেন।” আরতি কহিল, “মাসীমা যাতে না ভাবেন, তার ব্যবস্থা করা হবে—দুখের মা বাড়ি যাবার সময়ে খবর দিয়ে যাবে।” তারপর মুখ ও চোখের ভাবে বাণ্যপারটির চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিয়া কহিল, “আমার রান্নার বেশি দাঁড় নেই। তুমি হাত-মুখ ধোবে তো ধুয়ে নাওগে।” বলিয়া চলিয়া গেল। পরেশ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

রাত্রি দশটার পরে বৃষ্টি ও বায়ুর বেগ আরও বাড়িয়া গেল।

পরেশ সত্যেন্দ্রকে কহিল, “একটা ছাটা দিন, তা হলেই যেতে পারব।” সত্যেন্দ্র কহিলেন, “এই ঝড়ে ছাটা নিয়ে যেতে পারবেন কি?” পরেশ কহিল, “খুব পারব।” সত্যেন্দ্র ছাটা আনিতে গেলে আরতি দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া পরেশের মনের পানে তাকাইয়া কহিল, “কই, যাও দেখি।” সত্যেন্দ্র ছাটা আনিতে পরেশ কহিল, “যেতে পারব না বলে মনে হচ্ছে।” সত্যেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, “বললুম যে, পারবেন না—তবু ওল্ড মেনদের কথায় তো আপনার কান দেবেন না।” বলিয়া পরেশের মত পরিবর্তনের আসল করণটির দিকে কটাক করিলেন।

ঐক্যবান্য চৌকি পাতিয়া পরেশের বিছানার ব্যবস্থা হইল।

রাত্রি বারোটা পর্যন্ত সকলে রোগীর ঘরে কাটাইল। সুনীতির জ্বর অনেকটা কীময়া গিয়াছে, ঘুমের ঔষধের প্রভাবে শান্তভাবে ঘুমাইতেছে।

সত্যেন্দ্র পাশের ঘরে থোকাকে লইয়া শীতে গেল, আরতি রহিল রোগীর ঘরে, পরেশ আসিয়া নিজের বিছানায় শুলিল।

পরেশের ঘুম আসিল না। বাহিরে ঝঝঝ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, ঝোড়ো গাভাস পাগলের মত পাগের ডালে নাড়া দিয়া, দরজা-জনালায় ধাক্কা দিয়া কখনও তীব্র আতনাদ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, বিদ্যুতের আলো দরজা-জনালায় ফক দিয়া ঘরে ঢুকিয়া সারা ঘরটাকে ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বলিত করিয়া তুলিতেছে, মেঘের গুরু-গুরু ডাকে আকাশ ও পৃথিবী কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। পরেশের মনের মধ্যে বাহিরের এই মাতামতির ছোঁয়াচ লাগিল। গম্ভীরা-সংক্ষেপ, আইন-কানুন, রীতি-নীতি, শিক্ষা-শাসনিতা কোন কিছুতে ভ্রক্ষেপ না করিয়া একটু কোমল, কমনীয়, কবোচ নরসদেহকে দুই সবল বাহু দিয়া বৃকে জড়াইয়া ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত দেহ ব্যাবুল হইয়া উঠিল।

আজ সন্ধ্যার পর হইতে আরতি তাহাকে কারণে-অকারণে কতবার স্পর্শ দিয়াছে। রাতে খাওয়ার পরে রোগীর ঘরে একটা ছোট টেবল ফেলিয়া বসিয়া তিনজনে তাস খেলিতেছিল। আরতি তাহর ঠিক পাশেই বসিয়া ছিল। কতবার হাতে হাত ঠোকরাইয়াছিল, পায়ে পা ঠোকরাইয়াছিল, আরতির কানের উপরের কুচা চুলগুলি তাহার গালে ঠোকরাইয়াছিল। আরতি ইচ্ছা করিয়া কতবার নিজের পায়ের পাতা দিয়া তাহার পায়ের পাতার চাপ দিয়াছিল

মহাজাতি

ব্যাকলিঃ

নিরাপত্তা, সুরক্ষণ ও
সেবাই আমাদের
আদর্শ

৭৫নং রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা।



Dwarkanin & Son
LTD.

১২নং এস্প্রানেড্ ইন্সট, কলিকাতা।
ভারতের বৃহত্তম বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা।

ই আই এবং বি এণ্ড এ রেলওয়ে

“রেলের লোকের যুদ্ধ প্রদর্শনীয় নহে; সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, এরূপ চমকপ্রদ জয়লাভেও ইহা গৌরবান্বিত হয় না; কিন্তু ইহা এরূপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ—যাহার উপর সৈন্যদের যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করে; আর এই যুদ্ধের অকৃতকার্যতার ফলে কেবল যে যুদ্ধনিরত ব্যক্তিদেরই জীবন নাশ হয় এমন নহে, পরন্তু ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের অসংখ্য পরিবারে দুঃখ-দুর্দশা আনয়ন করে।”

—মেম্বার ওয়ার ট্রান্সপোর্ট।

অনর্থক মালগাড়ীকে আটকাইয়া না রাখিয়া এবং মালগাড়ীগুলিতে যে পরিমাণ মাল ধরে, ঠিক সেই পরিমাণ মাল বোঝাই করিয়া আপনারাও আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন।

অনাবশ্যক ভ্রমণ পরিহার করিয়া এবং অত্যাৱশ্যক কার্যোপলক্ষে ভ্রমণ যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া আপনারা আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন।

রেল ভ্রমণ পরিহার করুন

একবার পরেশ অনেকক্ষণ আরতি হাতটি নিজের মঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। শূইতে আমার ঠিক পূর্বেই (সেতেন অবশ্য কাছে-দূরে ছিলেন না) তাহার গালে আঙুল দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া চোখের দুটো ঘন, কঠোর স্বর গাড় করিয়া, ইপিগতময় হাসি হাসিয়া আরতি করিয়াছিল, “যাও, শয়ে শয়ে তোমার কনলার স্থান দেখগে।” উত্তরে পরেশ আরতির গালটি টিপিয়া দিয়াছিল এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া অপ্রত্যাখিনিয় আরও গুরুতর শাস্তিবিধানের উদ্যোগ করিতেই সেতেনের গরুর শব্দ শুনিয়া আরতি জু দুইটিতে সতকঁতাসতক তরঙ্গ তুলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সহসা মনে হইল, কে যেন দরজায় মৃদু আঘাত দিতেছে। পরেশ নাক-ইয়া উঠিয়া বিজ্ঞান হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। আরতি আসিয়াছে নাকি? কিবো হাওয়ার শব্দও হইতে পারে। আবার মৃদু আঘাতের শব্দ। পরেশের বকের ভিতরটা দু'লিয়া উঠিল। দুই লাফে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আবার শব্দ! চাপাকণ্ঠে পরেশ প্রশ্ন করিল, “কে?” সতকঁ মৃদুকণ্ঠে জবাব আসিল, “আমি—আরতি, দরজা খোল।”

পরেশ দরজা খুলিতেই এক বালক শীতল জেলো হাওয়া ঘরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিল আরতি—গায়ে নীল রঙের রাদপার, মাথা খেলা, চুল বিশৃঙ্খল, মুখে রহস্যময় হাসি, পাশিশ করা আবলস কঠোর মত করিয়া চক্কেতে চোখ।

উত্তেজনায় পরেশের কণ্ঠ রম্ভপ্রয়া হইয়া আসিয়াছিল, কোনমতে বলিল, “ওই একলা ঘরে, মানে—সেতেনকে—” আরতি বাগ দিয়া অপদেশের মতো কহিল, “দরজা বন্ধ করে দাও না—ঘরে বৃষ্টির ছটি আসছে যে!” পরেশ দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

আরতি নিজামের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। পরেশ কাছে আসিতেই কহিল, “খুব ঘুমুটিয়েছে বাকি,” পরেশ কহিল, “না।” আরতি কহিল, “এতক্ষণ ঘরে থাকা দিচ্ছি, খোলাই নি কেন?” পরেশ অপরাধীর মত বহিল, “সবুত পাই নি—যা বাতাসে আর বৃষ্টিতে শব্দ—আরতি দিকি কি করছেন জগীরা?” আরতি কহিল, “খুব ঘুমুটিয়েছে। আমার কিছুতেই ঘুম এলো না—সুতরাং যেন ভয় করতে লাগলো।” তাহানামে, তোমার সঙ্গে একটু, গল্প করিগে, দরজার খোলা তুলে দিয়া চলে এসেছি। তা, তোমাকে বোঝ হয় না? দিলাম ঘুম জাগিয়ে দিয়ে।” পরেশের ঠোঁট দুইটি শূক-ইয়া গিয়াছিল, তিনি দিয়া ভিজাইয়া হাসিকার চোড়া বরিয়া কহিল, “বল কি আরতি! আমারও ঘুম আসে নি—তোমার কথাই ভাবছিলাম।” চোখ দুইটি নাচাইয়া পরেশের মূত্রে আরতি কহিল, “সাবি নাকি! আমার ভায়া।”

কঠিনের আঁত মৃদু, আলোকে আলো-ছায়াতরা ঘর, বাহিরে বর্ষণ-ময় রাত্রি, কাছে পিঠে কেহ কেবাও জাগিয়া এই, সামনে দাঁড়াইয়া আরতি পরেশের মনে হইল, বঙ্গোময় সমুদ্রের নাকথানে, নিজের এক পলিগে, প্রাথমিক প্রদোষে, সে ও আরতি যেন মথোমধি দাঁড়াইয়া আছে।

আরতি কহিল, “চুষ করে দাঁড়িয়া রইলে কেন? পোহ, আমি বরং একটা চোয়ার টেনে বসি।” পরেশ অপ্রতিভভাবে কহিল, “না না, তুমি কিছুনাও বস, আমি চোয়ারে বসছি।” বলিয়া ঘরের এক পাশে জড়া করা চোয়ারগুলো হইতে একটা টানিয়া আনিবার জন্য বাইতে উদাত হইতেই থপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া আরতি ভীক্ষাকণ্ঠে বহিল, “কনলার মত কেমল আর কচি না বলে আমার কাছে বসতে ইচ্ছা করে না বাকি?”

আরতির চাহনি, কণ্ঠস্বর ও স্পর্শ পরেশের মনে যে আগুন জ্বলিতোছিল, ততোধিক দৃঢ় প্রকল্প করিল। চোখেতে ঘিরিয়া আরতির মথোমধি দাঁড়াইয়া দুই হাত দিয়া বাহু চাপিয়া ধরিয়া তাহার মূত্থের দিকে তাকাইয়া গাড় স্নরে কহিল, “করে আরতি, আরও অনেক কিছু ইচ্ছে করে।” আরতির পাতলা ঝাটা ঠোঁট দুইটি উঠিল মারায়ক মদির হাসি। চোখের তারা দুইটি হইয়া উঠিল হ্রদের মত চঞ্চল, মুখ লাগ করিয়া মৃদু বস্পিত কণ্ঠে কহিল, “কি?” মূত্থের মধ্যে উদ্ভম আবরণে পরেশ আরতিকে বকে তড়াইয়া ধরিল, শিশুর বাহুদ্বন্দ্বনে তাহাকে নিশীড়িত করিয়া তাহার মুখে চোখ কপালে কপালে ত্রিবার চুষন করিতে লাগিল। আরতি নিজেই ছাড়াইয়া লইবার জন্য ক্ষীণ চেষ্টা করিয়া কহিল, “ছাড়! তুমি বোধ হয় ভুল করছ, আমি কনলা—আরতি।”

পরেশ হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, “জানি, তুমি আমারই আরতি—আমার জীবনে সর্বপ্রথম নারী, যে আমার বাহুদ্বন্দ্বনে ধরা দিয়েছে।”

আরতিও গভীর অবস্থার সন্নিহিত কহিল, “তুমি আমার জীবনে প্রথম পুরুষ—যার হাতে ধরা দিলাম।” বলিয়া নিঃশেষে নিজেই ছাড়িয়া দিল।

নিভৃত মিলনের প্রথম উচ্ছ্বাসটা খিটাইয়া আসিবার পর তাহারা দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া, একই শাল গায়ে জড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল।

আরতি কহিল, “তুমি কি আমাদের পেঁচে দিয়ে ফিরে আসবে ভাবছ?” পরেশ ঘাড় নাড়িয়া “হা” জনাইল। আরতি কহিল, “ভারপর?”

“এখানের সব ব্যবস্থা করে তোমার কাছে ফিরে যাব।” আরতি আবদারের মূত্রে কহিল, “না, যা ব্যবস্থা করতে হবে, কালই করে ফেল, আর আসতে পারে না তুমি।” পরেশ কহিল, “এত তাড়াতাড়ি!” বাধা দিয়া আরতি কহিল, “তা হোক, কি এমন ব্যবস্থা করতে হবে? বিনয়বাবুকে বলো, করে দেবেন।” পরেশ কহিল, “বিনয় কাণা যে বাড়িতে নেই।” আরতি কহিল, “নাই বা থাকলেন, পরে চিঠি লিখলেও চলবে। মোট কথা, আমি আর ছেড়ে দেব না তোমাকে।” পরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, “আমাকে বিশ্বাস হয় না নাকি?” আরতি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “না, পুরুষকে বিশ্বাস কর না আমি।” পরেশ কহিল, “কেন?” জবাব দিল না আরতি।

আরতির মনে পড়িল সুখেন্দুকে—তাহার মাসভূতে ভাইয়ের বন্ধু। তাহাদের বাড়িতে আসিত, তাহাকে পড়াইত, কত উপহার দিত। সুখেন্দু পড়িত স্কটিশচার্চ কলেজে, সে পড়িত বেদন স্কুলে—একসঙ্গে প্রতিদিন প্রামে করিয়া পড়িতে যাইত তাহারা, একসঙ্গে বাড়ি ফিরিত। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া সে স্কটিশচার্চে ভর্তি হইল, সুখেন্দু তখন ফোর্ড-ইয়ারের ছাত্র, সেই সময়ে দুইজনে কতদিন কলেজ হইতে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গড়ের মাঠে, আলিপুর জুড়ে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে—আরও কত জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত, আবার যথামতো ভাঙ্গা ছাত্রছাত্রীর মত বাড়ি ফিরিত। এমনই করিয়া তাহারা দুইজন দুইজনকে ভালবাসিল, দুইজন দুইজনের মন জানিল, দুইজন পাশাপাশি বসিয়া কতদিন রঙিন কত স্থান দেখিল। বিএ পাস করিয়া সুখেন্দু, ইউনিভার্সিটিতে ঢলিয়া গেল। সেখানে সহপাঠিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা ছাত্রী, নামজাদা স্কন্দরী স্মৃতির ফাদে ধরা পড়িল। তারপর তাহাদের বাড়ি আসা বন্ধ করিল সে, তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিল এবং অচিরে অবলীকরণে তাহাকে মন হইতে কাড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার ভালবাসা লজ্জায় অপমান মনের কোণে মুখ গড়িয়া পড়িয়া অনাহারে আত্মহত্যা করিল।

আরতি কহিল, “কেন আবার—এমনই বিশ্বাস কর না। তুমি ফিরে এলে আর হয়তো ঘিরবে না, কনলার হাতেই ধরা সেলে।”

পরেশ আরতিকে ঘনতর করিয়া কাছে টানিয়া কহিল, “পাগল নাকি!”

আরতি মাথা নাড়িয়া কহিল, “আমি পাগল হই আর যাই হই, তোমাকে আমার সঙ্গেই যেতে হবে, কালই সব ব্যবস্থা করে ফেল। আমার হাতে যখন ধরা পড়েছে, যতদিন বেঁচে থাকব—ছাড়া পাবে বলে ভেব না।”

ঘর হইতে যাইবার আগে আরতি কহিল, “কমলা! উপর হয়তো অন্যায় করছি আমি, কিন্তু ভগবান নিজে থেকে আজ পর্যন্ত কোনও কিছু আমাকে দেন নি, তাই পরের হাত থেকে নিজের প্রার্থিত বস্তু ছৌঁ মেয়ে কেড়ে নিতে হচ্ছে। কনলা হইতো দুঃখ পাবে, কিন্তু জানি, তার বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন আবার তার মৃতি ভরে দেবে—”

(৩২)

পরের দিন সকালে বাড়ি ফিরিবার সময়ে পরেশ দৌখল, বিনয়ের দৈকথানা খোলা। পরেশ ঘরে ঢুকিয়া হাঁকিল, “বাকাবাবু!” বিনয় সাড়া দিল, “কে? পরেশ? এস বাবা।” পরেশ খাড়ি মগা গিয়া দৌখল, বিনয় ধর পরিচয় করিতে লাগল। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “কাকিয়া এসেছে না?” বিনয় কহিল, “পাগল! পোষ মাসে আবার আসে? তা ছাড়া, বীর বিয়ে না হলে আসবে না।” একটা চোয়ার দেখাইয়া কহিল, “ওই চোয়ারটায় বস বাবাজী।” পরেশ কহিল, “খাব, বসব না। পবি সেগেছে?” বিনয় কহিল, “হ্যাঁ, ঘাটা প্রায় শূন্যিয়ে এসেছে।” ডোক ফিরিয়া পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, “বীর বিয়ে কোথায় ঠিক হ'ল নাকি?” বিনয় কহিল, “ঠিক এমন কিছু হয় নি, তবে আমার শালা চোটা করছে। আমার শালাকে জানো তো—সোজার মানব, কোথাও একটা লাগিয়ে দেবে ঠিক।”

পরেশ চুষ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিনয় কহিল, “তা বাবাজী, তোমার খবর বল—প্রাক্টিশের কিছু উদ্রিত হয়েছে?” পরেশ কহিল, “তা একটু হয়েছে বইকি!” বিনয় হাসিয়া কহিল, “আমি তো বনেছিলাম বাবাজী, সুবিধে হবে। বিয়ে না হইতেই এই, বিয়ে হবার পরে আরও অনেক সুবিধে হবে।” পরেশ কহিল, “আমি একবার কলকাতা যাচ্ছি কাল।” বিনয় বিস্ময়ের স্বরে কহিল, “এখন কলকাতা কেন? বিশেষ কোন কাজ আছে নাকি?”



Block by
RISING ART COTTAGE
 BLOCK MAKERS, PHOTO ENGRAVERS, DESIGNERS & FINE ART PRINTERS.
 103, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA.

পরেশ গম্ভীরমুখে কহিল, “হ্যাঁ, ওষুধ কতগুলো কিনতে হবে। তা ছাড়া আরও কতগুলো দরকারী জিনিসপত্র—”

বাধা দিয়া বিনয় কহিল, “ফিরছ কখন?”

পরেশ কহিল, “দু’চার দিন দেরি হবে। মাসীমা একা থাকবেন—খোঁজখবর নেবেন কহিল,—”

বিনয় কহিল, “আমাকে বলতে হবে না বাবা, আমি তো নেবই, তা ছাড়া তোমার ডাক্তার আছে, ঘনশ্যাম আছে, ওরা সবাই নেবে।”

সন্ধ্যার পরে পরেশ একটা বড় ট্রাকে কাপড়জামা, ডাক্তারি বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র ভরিতেছিল, মাসীমা আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ দেখিয়া কহিলেন, “কলকাতা কি জনো যাচ্ছিস?” পরেশ মুখ না তুলিয়াই কহিল, “কাজ আছে।” মাসীমা কহিলেন, “কি কাজ শুন?”

“ওষুধপত্র কিনতে হবে—জামাকাপড় তৈরি করতে হবে।”

বাধা দিয়া মাসীমা কহিলেন, “তোমার শব্দব্যাভূতে বলেছিস?” পরেশ কহিল, “কি দরকার? দু’দিন পরেই ফিরে আসছি তো!” মাসীমা কহিলেন, “তবে, বলা উচিত ছিল, এখন ওরাই হ’ল তোর সত্যিকার সাপনার, ওদের না জানিয়ে কোন কাজ করা উচিত নয় তোর।” পরেশ নীরবে নিজের কাজ করিতে লাগিল। মাসীমা কহিলেন, “তাড়াহাড়ি ফিরি বাপু, বিয়ের আর বেশি দেরি নেই—”

(৩৩)

দিন দশ পরে বিকাল পাঁচটার সময়ে কার্তিক ডাক্তারের বাড়িতে হালধূল পড়িয়া গেল। গ্রামের ভদ্র ইঁদুর সকল শ্রেণীর আলাল-বৃন্দ-মিন্তা কাঁচিকি ডাক্তারের উঠানে আসিয়া জড়াই হইল। কার্তিক ডাক্তার বারান্দায় খাটের উপরে খাড়া উপবিষ্ট, কপালে কৃষ্ণরেখাবর্ণী, মাথের কঠোর গম্ভীর, রক্তবর্ণ চক্ষুর দৃষ্টি ভূমির উপরে নাস্ত। খাটের পাশে একটা মোড়ায় ঘনশ্যাম বসিয়া আছে; অন্যর উপরে শুয়াইত ডান হাতের উপর মূপটি তিনকড়িতে রাখিত। তাহার কণ্ঠ ও ফেলের মাথা যে কার্তিকের দিকে আঁতরন করিয়া অনেক দূরে পৌঁছিয়াছে, মাথের ভাবে তাহাই সে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। হার ও পরাগ মোড়া সংগ্রহ করিতে না পারিয়া উঠানেই লক্ষলক্ষ ও হাঁক-ডাক শব্দ করিয়া দিয়াছে। কার্তিকের ঘনশ্যাম পারিষদদের বারান্দায় কেহ উকু হইয়া বসিয়া, কেহ খাড়া দাঁড়াইয়া, নীরবে অথবা সর্বদা ফোড় ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে।

রাসাখানের বারান্দায় কার্তিক-গৃহিণী দেওয়ান চেস দিয়া পা দেলিয়া বসিয়া আছে, তাহার পাশেই গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন বহির মা। উভয়েরই মুখ বিষণ্ণ ও গম্ভীর। ভাইদের দুইজনকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে পাড়ার মেয়ে—ইহারাও নিজ নিজ মাথের যথাসাধ্য সম-দোদার ভাব ফুটিয়াবর চেষ্টাকরত ‘আহা-উহু’ করিতেছে। শ্রীমতী ও কমলা এখনো নাই। ফেলের উপরে, অঙ্গকার ঘরে পা দেলিয়া বসিয়া আছে শ্রীমতী, তাহার কোলে মুখ গুঁজিয়া থালি মেকের উপর উপড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে কমলা।

হার, চীৎকার করিয়া কহিল, “কিছুতেই সহ্য করব না, যারা এর ভেতরে আছে তাদের নখে টিপে টিপে মারব।” বলিয়া বাম হাতের বৃদ্ধা আঙুলের নখের উপর ডান হাতের বৃদ্ধা আঙুলের নখটি টিপিয়া, দাঁত দাঁত ঘষিয়া, চোখ দুইটা ছোট ও কপাল কৃষ্ণিত করিয়া উকুন মারিবার ভঙ্গী করিল।

পরাগ মুখহাত নাড়িয়া কহিল, “হয়ছে, হয়েছে! তখন যে ভোজ খাবার লোভে সব দিশেহারা হয়ে গেলে কিনা! না হলে বলি নি তখন, মহেশ আচার্য্যার ছেলে, ও বাড়ির বাঁশ সোজা হবার নয়; শহরে লেখা-পড়া শিখে এলেও ভাল ক’র দেখেছেন বাজিয়ে তবে সব ঠিক কর? না, তখন বৃদ্ধ ঠেকে বলা হ’ল—কোন চিন্তা নেই, আমি যখন সত্যে ধরোঁছ, তখন আর গোঁষ খেতে সাহস করবে না। যতই হোক ছত্র তো! এখন গড়েভড়ির ঠালাটা সামলাও!” বলিয়া ঘনশ্যামের দিকে আঁশ্বদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মাথাটা ঝাঁকাইয়া দিল। ঘনশ্যাম ঝাঁকড়া প্রু দুইটির মধ্যস্থ সংকীর্ণ ফাঁকিকূ একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া ভারী গলায় কহিল, “ঠিকই বলেছিলাম, কিছু গোলমাল হ’ত না, তবে পাড়ার লোকে বদ্ চাল দেয় তো কি করব বল!” হার এতক্ষণ কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, “তার মানে? কিছু করতে পারব না আমরা? সারা সমাজের গায়ে একটা লোক খোঁচা মারবে হরদম, আর আমরা

চুপচাপ দাড়িয়ে সহ্য করব! তার চেয়ে সব এক সংগে গলায় কলসী বেঁধে নতুন পুত্রের লজ্জা ভুবে মরিগে চল।” বলিয়া বোধ করি ভূবিয়া মরিবার জন্যই সদর দরজার দিকে ছুটিল। কিন্তু কেহই তাহার অনুগামী হইল না বা তাহাকে ফিরতে অনুরোধ করিল না দেখিয়া কতকটা যাইয়াই ফিরাই আসিয়া ডান হাতটা শূন্যে নাড়িতে নাড়িতে কহিল, “ভূবে মরব কিসের জন্যে? মরদের বাচ্চা, মেয়েমানুষ তো নয়! কেউ না পারে একাই আমি শোধ নেব, কেমন করে মেয়ের বিয়ে দেয়, দেখে নেব।”

পরাগ হাঁকিয়া কহিল, “আর ফটফটান করতে হবে না। সব বাহাদুরি দেখা আছে। নিয়ে কি করে বন্ধ করবে শুন! ছেলেকেই যখন সারজমিন থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তখন—”

হার, বাধা দিয়া কহিল, “এই মাথাতে অনেক বৃদ্ধি আছে বাবা!”

বলিয়া নিজের তালতে বারকয়েক টাটি মারিয়া কহিল, “তোমাদের মত ভোজিবেল্ মাকী ঘি নয়, আমল গাওয়া ঘি আমার মাথায়।” বলিয়া ঠোট দুইটি চাপিয়া, বাম চোখটি ছোট করিয়া ঘাড়টি ঝাঁকাইয়া কহিল, “বরের আসন থেকে হাতকড়া দিয়ে বর উঠিয়ে নিয়ে আসব।” বলিয়া বাম হাতের উপর ডান হাতটি চাপাইয়া পরাগের দিকে বাড়াইয়া দিল।

হার ও পরাগের বড়বাড়ি দেখিয়া ঘনশ্যাম মোড়ার উপরে গম্ভীরভাবে আর বসিয়া থাকা ব্যক্তিগত মনে করিল না। দাঁড়াইয়া কহিল, “তোমরা বাজে বোকা না দেখ! কার যে কত দমত, কত বৃদ্ধি সব জানা আছে। ও ছেলের আশা ছেড়ে দাও—টেনে হিঁচড়ে খাবে এনে খাড়ে মেয়ে চাপিয়ে দিতে হবে—এমন ফালনা মেয়ে আমাদের নয়। উপবাস পত্র খেজে এনে ঠিক দিনে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। কার কি ব্যবস্থা করতে হবে, সে এখন মূল্যবান থাক। আসল কাজ শেষ করে সবাই মিলে ভেবেচিন্তে দীর্ঘমেয়াদে স্থির করতে হবে।” সমবেত ইতরশ্রেণীর লোক-গলার উদ্দেশ্যে ঘনশ্যাম হাঁকিয়া কহিল, “তোরা সব ঘর যা; কিছু ভাবনা নেই তোদের। ঠিক দিনে ভোজ খেতে চলে আসবি সব।” মাইলাদের উদ্দেশ্যে কহিল, “তোমরা সব বাড়ি ফিরে, কলকাতা করণে, বিয়ে বন্ধ হবে না।” জেনে রেখো,—পিপড়ের পাখা বেয়োলেই পাখী হয় না, পাখা ছিঁড়ে পিঁয়ে মাংসের জন্যে আমরা এখনও বেঁচে আছি গিয়ে।” বলিয়া চোখ দুইটা চাড়াইয়া, হাতের মূঠা দুইটা নখ করিয়া দাঁত দাঁত ঘষিল।

কার্তিক ও পারিষদবর্গ বাতীত একে একে সকলে চাপিয়া গেল ঘনশ্যাম হাঁকিয়া কহিল, “শ্রীমতীদর্শন কেধায় গেলো?” উপর-কোঠা হইতে শ্রীমতী সাড়া দিল, “এই যে এখানে রয়েছি, যাই।”

অনতিবিলম্বে শ্রীমতী আসিতেই কার্তিক ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি করছে?”

শ্রীমতী কহিল, “কাঁদছিল, চুপ করেছে।”

কার্তিক দীর্ঘশ্বাসে ফেলিয়া কহিলেন, “হুঁ।”

ঘনশ্যাম ফিস ফিস করিয়া শ্রীমতীকে কহিল, “তুনি একবার বিনয়ের ওখানে যাও দেখ, আসল ব্যাপারটা জেনে এস। পরেশ ওর মেরেকে নিয়ে করবার জন্যে পালিয়েছে, না সেই করেছে ছুড়ীটার সংগে গিয়ে জুটেছে।” হার, কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, বাধা দিয়া কহিল, “পাগল হয়েছে নাকি! বামনের ছেলে—” ঘনশ্যাম সকলের দিকে চোখ বুলাইয়া কহিল, “যেমন বৃদ্ধি! যার মা বামনের মেয়ে হয়ে আগরুর হাতে জাত দিয়াছিল, তার ছেলে তো! তা ছাড়া, আজকাল এ রকম বিয়ে আকছার হচ্ছে।” বলিয়া শিবিরে হইয়া ঘাড় নাড়িল।

কিন্তু যে আঁশ্বদৃষ্টিগণ এই বিশ্ফোরণ ও বিস্ফোরণের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা মাত্র একবার চিঠি, পারশের—কার্তিকের নামে। বেলা দুইটার সময়ে পিয়ন বালি করিয়া গিয়াছিল, বেলা তিনটার সময়ে দিবানিন্দা সমাপন করিয়া নিরুজ্জ্বল চক্রে চিঠি পাড়তে পাড়তে কার্তিক ডাক্তারের চোখের ঘুম এক মুহূর্তে উবিয়া গিয়াছিল।

পরেশ লিখিয়াছিল—

কলকাতা,

প্রাশ্যাপসেত,

সবিনয় নিবেদন মিলে, আমি নিরাপদে এখানে পৌঁছিয়াছি। এখানে আসিয়া দুই-চারজন সতীর্থ বন্ধুদের সংগে আলাপ-আলোচনা করিয়া আর গ্রামে ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছে না। ভাবিতেছি, সুবিধা হইলে এইখানে অথবা অন্য কোন শহরে বাসনা শূন্য করিব। এ অবস্থায়

জনপ্রিয় উন্নতিশীল প্রভিডেন্ট
বীমা প্রতিষ্ঠান।

*
নতুন বীমা আইনের নিয়মানুযায়ী
সুচু ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত

আরবান প্রভিডেন্ট

ইন্সিওরেন্স

সোসাইটি লিমিটেড

হেড অফিস :

৩ ও ৪নং হোয়ার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ৬১১

*
পলিসিহোল্ডার ও এজেন্টগণের
সর্বস্বার্থ সুরক্ষিত।

*
এজেন্সীর সর্বোদয় সন্তোষজনক

জীবন বীমার জন্য

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল

লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ

১০, ক্লাইড রো,
কলিকাতা।



আমাদের
সবল পৃষ্ঠপোষক
আমরা শুভ শারদীয়
সম্ভাষণ জানাই।

Bathgate & Co.



ফোটোশ্যুপি—শ্রীনিবাস দাস

মহত্ব আমার সহিত কমলার বিবাহ দিতে আপনি রাজী হইবেন না। কারণ আমি জানি, আপনি আপনার কন্যাটিকে নিজের চোখের সামনে রাখিতে চান। কাজেই আমি কমলকে বিবাহ করিবার আশা ত্যাগ করিয়াছি। আশা করি, আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধবদের সহায্যে এই বয়সদিনের মধ্যেই উপযুক্ত পাত্র সন্ধান করিয়া নির্দিষ্ট দিনে কমলার বিবাহ দিতে পারিবেন। এ কয়দিন আপনার কাছে যে স্নেহ ও সাহায্য পাইয়াছি, তাহার জন্য ঐদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব। ভবিষ্যতে কর্মজীবনে যদি কোনদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তাহা হইলে আবার আপনারদের চরণ দর্শন করিব। আশা করি, তখনও আপনারদের স্নেহ-বর্ষণ হইতে বঞ্চিত হইব না। আপনারা আমার কৃত্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

আপনার স্নেহপ্রার্থী পরেশ

(৩৪)

সেইদিন সম্ভার পর বৈঠকখানায় লণ্ডন জন্মালিয়া বিনয় পড়িতেছিল, হঠাৎ শ্রীমতী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “বিনয় রয়েছে নাকি?” বিনয় কহিল, “কে? শ্রীমতী পিসি? এস, বস।” শ্রীমতী ঢুকিয়া মেঝেতে পা মেলিয়া বসিয়া কহিল, “মহেশ আচার্য্যার বাড়ি গিছলাম, জনিস তো পরেশ কি কান্ড করেছে!” বিনয় সবিস্ময়ে কহিল, কি?” শ্রীমতী তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিনয়ের মুখের উপর নাস্ত করিয়া কণ্ঠস্বরে বাগ্পের স্ফুট আমেজ মিশাইয়া কহিল, “জানিস না?” বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল,

“না তো!” শ্রীমতী বাকি হাসি হাসিয়া কহিল, “পরেশ আজ চিঠি লিখেছে ডাক্তারকে। জানিয়েছে, গায়ে আর ফিরবে না, কমলকে বিয়ে করবে না, শহরে ডাক্তারি করবে, আর কোন এক শহরে মেয়েকে বিয়ে করবে। ওর মাসীকে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে লিখেছে, ও যেন ঘর-দোর বন্ধ করে চাবি তোর কাছে দিয়ে মেয়ের কাছে ফিরে যায়।” বিনয় বিস্ময়াহত কণ্ঠে কহিল, “তাই নাকি?” তারপর যেন কিছু মনে পড়িল, এইভাবে মুখ ও চোখের ভঙ্গী করিয়া কহিল, “তাই বুঝি ঘনশ্যাম তাড়াতাড়ি শুল থেকে চলে এল?” শ্রীমতী বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতে লাগিল, “আসবে না। ওরই হাতে গড়া সম্ভ্রম। ও মাঝে না থাকলে মহেশ আচার্য্যার ছেলের সঙ্গে কান্ডের ডাক্তার কি মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হত। ঘর মায়ের অমন কীর্তি। ঘনশ্যাম অনেক বলে-কয়ে ডাক্তারকে রাজী করেছিল।” বিনয় চুপ করিয়া রহিল। শ্রীমতী বলিতে লাগিল, “শুধু ঘনশ্যাম কেন, সারা গায়ের লোক জড়ো হয়েছিল যে। ডাক্তার-অস্ত্র-প্রাণ সব, আসবে না? শব্দ তোকেই দেখলাম না।” বিনয় লজ্জিত মুখে কহিল, “কিছু জানতাম না, শুলে ছিলাম কিনা। যাব কাল সকালে; ডাক্তার বুকি মুষড়ে পড়েছেন?”

“তা একটু পড়েছে বইকি! সব আয়োজন হয়ে গেছে, বিয়ে না হলে তো সব পড়। তা ছাড়া, পাকাপাকি হয়ে বিয়ে ভেঙে যাওয়া মেয়ের পক্ষে ভারী খারাপ, এই লগুন যেমন করে হোক বিয়ে দিতে না পারলে মেয়ের বিয়ে দেওয়াই দায় হবে।” কিছূক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “ডাক্তারকে কোন চিঠি দেয় মি পরেশ?” বিনয় প্রবলবেগে ঘাড়

দি টটাগু
সেন্ট্রাল ব্যাংকিং
কর্পোরেশন লিঃ

হেড অফিস :
৯, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
ফোন : ক্যালঃ ৩৪৬৭
স্থাপিত ইং ১৯৩০

আজিমগজ আখা

বিখ্যাত জমিদার ও ব্যাংকার মিঃ
ভূপত সিং দাগরের পৌরোহিত্যে
গত ২৮শে জুলাই আজিমগজ
সাখা খোলা হইয়াছে।

আমানতের হার ও সর্গাদি
সুবিধাজনক

আবেদন করুন দেবতোষ দাশগুপ্ত,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের
অশান্তির মধ্যে “মা আনন্দময়ী”
আসিতেছেন। কিন্তু মানুষের
মনে শান্তি ও আনন্দ কোথায় ?
সেই শান্তি ও আনন্দ দেবে :—

ক্লারিটা
মিউজিক স্যালুন

গ্রামোফোন, রেডিও, হারমোনিয়াম
ও সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।
১০/সি, আশুতোষ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা।

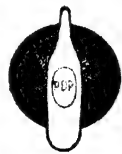
আমরা সেরামতের কাজ সুন্দররূপে
করিয়া থাকি।

আজও জুলে

যা' আজও জুলে



যে সব মানব মানবীকে অবলম্বন
ক'রে গল্প পর্যন্ত গ'ড়ে উঠেছে,
ফ্লোরেন্স্ নাইটিংগল্ সেই দুর্লভদের
মধ্যে একজন। তার কারণ তাঁর অপূর্ব
সেবারত, ইতিহাসে যার তুলনা বিরল। তিনি
যে আলো জ্বালিয়েছিলেন তা আজও আমাদের
পথ দেখায়। আজ যখন আমাদের দেশের লক্ষ
লক্ষ লোক ওষুধের অভাবে অকথ্য কষ্ট পাচ্ছে,
তাঁর আদর্শ আমাদের কাছে আসে জীবন্ত প্রেরণার
মত। এই অভাব দূর করবার যথাসাধ্য চেষ্টা
করব ব'লে আমরা পণ করেছি। পথে বিঘের
শেষ ছিল না; কিন্তু আজ সানন্দে বলতে পারি
সে বাধা আমরা অতিক্রম করেছি। আজ তাই
নিঃসংকোচে দেশবাসীর হাতে আমাদের তৈরী
ওষুধ তুলে দিতে অগ্রসর হয়েছি।



ওষুধ ও
ইনজেক্ট্যুল
প্রস্তুতকারক

মিওর ড্রাগন্স এন্ড ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানী

নাড়িয়া কহিল, “না তো।” শ্রীমতী অবিশ্বাসের সুরে কহিল, “তোর কাছে তো একটা চিঠি লেখা উচিত ছিল তার, তাকে এত ভক্তি করে, বিশ্বাস করে, তোর কাছেই ঘরের চাবি রাখতে বলেছে।” বিনয় বিরক্ত চাপিয়া কহিল, “তা নিশ্চয়ই করে, চিরদিন তাকে স্নেহ করছি, তার মঙ্গল কামনা করছি, ভক্তি করব না।” দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীমতী কহিল, “কে মান করছে রে? যত হচ্ছে ভক্তি করুক, তাই বলে কি পরের ভরাডুবি করে দিতে হবে?” বিনয় তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, “কি বলতে চাও তুমি?” শ্রীমতীও কঠিনস্বরে তীক্ষ্ণ ও উচ্চ করিয়া কহিল, “কি আর বলব? সবাই বলছে—পরেণ নাকি যাবার আগে তাকে সব জানিয়ে গিয়েছিল।” বিনয় প্রতিবাদ করিয়া কহিল, “মিথো কথা! আমার সঙ্গে দেখা করেছিল বটে, কিন্তু সে যে এখান থেকে একেবারে চলে যাচ্ছে, এ কথা ঘণাক্ষরেও জানায় নি। বলাচিল—কলকাতা যাচ্ছি, দু-চারদিন পরে ফিরব, ওর মাসীরা বেনে খোঁজ-খবর নেই।” শ্রীমতী এতক্ষণ দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া শুনিতোছিল, তাই দুইটি চাপিয়া, উপরে নীচে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “ওই তো জানানো হ’ল।” হঠাৎ কঠিনস্বরে প্রশ্ন করিয়া কহিল, “কার্তিক ভক্তার তোর কোন পাকা ধানে মই দিয়েছে রে?” বিনয় নীরবে বসিয়া রহিল। শ্রীমতী কহিতে লাগিল, “তোর উচিত ছিল সেদিন তখনই ভক্তারকে খবর দেওয়া, তা হলে গণ্ডির মূর্খদের ডেকে সামান্য সামান্য খোলাখুলি কথাবার্তা হয়ে যেত। ছোট্টা যদি বিয়ে করবার ইচ্ছা নেই বলত, তা হ’লেও ভক্তার তার ঘাড়ে মেয়ে চাপিয়ে দিতে চাইত, এমন ফালনা মেয়ে তার নয়। এমন হাংলানি করাও তার বেগিষ্ঠে লেগেনি। তার পরসার অভাব নেই, মেয়েরও রূপ-গুণের অভাব নেই যে লোকের বৈষ্যম্যে দরত হ’ল।” কঠিনস্বরে প্রখরস্বরে করিয়া কহিল, “আর তোর যদি পরশকে আমায় করবার ইচ্ছা ছিল, কার্তিক ভক্তারকে আগে বললেই পারতাম। তা হলে ভক্তার ওদিকে আর হাত বাড়াত না, এবং এমন মানুষ যে, হয়তো নিজ দুটিয়ে থেকে বিয়ে দিয়ে দিত।” দম লইয়া কহিল, “এত চাল চালতেও হ’ত না, গাঁ থেকে পালাতেও হ’ত না। আর যদি চুপ করেই ছিলি তো শেষ পর্যন্ত চুপ করেই থাকলে হ’ত, মিছেমিছি এতবড় একটা মানুষের মাথা হেঁট করালি, একটা নিদারুণ মেয়ের মনে কষ্ট দিলি—” বিনয় হতবুদ্ধির মত নির্বাক ভাবে শ্রীমতীর কথা শুনিতোছিল। ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিল, “তা হলে তোমাদের সকলের ধারণা, আমার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে আমারই পরামর্শে পরেশ এখান থেকে পালিয়েছে?”

কঙ্কার দিয়া শ্রীমতী কহিল, “আমি কিছু জানি না বাবা, সবাই বলছে।”

বিনয় কহিল, “সবাইকে বোলা, আমার মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে। আমি গরিব বটে, ওর পরের জিনিসে লোভ করবার মত নাচ নেই।” শ্রীমতী বিস্ময়ের স্বরে কহিল, “তাই নাকি? কোথায় হ’ল? কবে খবর পেলি?” বিনয় কহিল, “অজুই চিঠি এসেছে। দেখতে চাও তো আনছি।” বলিয়া বিনয় বাড়ির ভিতরে গিয়া একটা পোস্টকার্ড লইয়া আসিল। শ্রীমতী কহিল, “পাড় শোনা দেখি।” বিনয়ের স্ত্রী লিখিতেছে—দাদা এখানে খবর জন্য একটি সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। পাঠটি শ্রীমতীস্বরে বয়স বয়স বয়স বটে, কিন্তু পুন্নিসে চাকরি করে, মাসে মোটা উপার্জন। প্রথম পক্ষের একটি মাত্র ছেলে ও মেয়ে আছে। আমি মৃত দিয়াছি, আমাদের মত গরিবের মেয়ের ইহার চেয়ে কি ভাল বয় জুটবে? দাদা তোমার কথা ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তোমার ইচ্ছা মত দিয়াছি। ভাগ্যে থাকিলে মেয়ে এখানেই সুখী হইবে। আগামী এই মাঘ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। তুমি পরশটা ছুটি লইয়া এখানে চলিয়া আসিবে।

শ্রীমতী মৃদু কালো করিয়া কহিল, “পুন্নিস চাকরি! তবে তো অনেক টাকা রোজগার!” দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “ভারী সুখী হলাম শূনে। তাই তো বলেছিলাম বউমাকে—ভাইয়ের কাছে মেয়েকে নিয়ে যা, তারা শহরের লোক—অনেক রকম জানে-শোনে; ধরাধরি করে মেয়ের তোর গতি করে দেবে।” মাথা নাড়িয়া, চোখ ঘুরাইয়া কহিল, “না হ’লে গিয়ে যা দর্শনম উঠেছিল, ও মেয়ে পার করা শক্ত হ’ত। আমি উঠি বাবা! সবাইকে বলি গিয়ে।” বলিয়া ঘাইতে উদ্যত হইয়া কহিল, “এক কাজ কর, চিঠিটা আমাকে দে, কাগজে-কালিতে দেখলে কেউ আর অবিশ্বাস করবে না।”

(৩৫)

এই মাঘ। রাতি একটা।

বহুজ্ঞান স্ট্রাটের একটা ছোট দোতলা বাড়ির ছাদের এক কোণে আলিসার কাছে দাঁড়াইয়া আরতি ও পরেশ। এই বাড়ির দোতলায় দুইখানা ঘর তাহার ভাড়া লইয়াছে। আজ আরতির বন্ধু করপোরেশন স্কুলের শিক্ষায়ত্নী শ্রীমতী শোভানা দাস ও তাহার স্বামী প্রীতান দাসের বাড়িতে ও তাহাদের চেণ্টায় পরেশের সহিত আরতির হিন্দুমতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

সেদিন রাতি এগারোটায় পর চাঁদ উঠিয়াছিল। তাহার মৃদু স্নিগ্ধ আলো, প্রশংসনীয় কন্যার প্রতি দরিদ্র পিতার স্নেহোপহারের মত আলোকময়ী নগরীর উপর কুণ্ঠিতভাবে বর্ষিত হইতেছিল। সেই জেনবন্দার এক টুকরা চারিদিকের উচ্চ বাড়িগুলোর মাথা ডিঙাইয়া কোনমতে আরতিদের ছাদের এক কোণে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না-চিকণ নীলাত মূসর আকাশের পানে তাকাইয়া আরতি ও পরেশ স্বপ্ন দেখিতেছিল—আগামী অজ্ঞাত ভবিষ্যতের নয়, পশ্চাতে ফেলিয়া আসা অতি পরিচিত অতীতের।

পরেশের মনে পড়িল, বাবির কথা, কমলার কথা। বাবির অগ্রসূর মূখখানি, বহুজ্ঞান সেদিনের সেই হাসোজ্ঞান চোখ দুইটি মনে পড়িল। জীবনের বাকি বাকি কে কোথায় হারাইয়া গেল, আর কোনদিন তাহাদের সহিত হয়তো দেখা হইবে না।

আরতির মনে পড়িল সুখেন্দুকে—ধবধবে ফসাঁ রং, লম্বা-চওড়া চেহারা, খাড়া নাক, বিস্মৃত কপাল, চোখে দৃঢ় দৃষ্টি। আরতি একলা ভালবাসিয়াছিল তাহাকে। কিন্তু সে ভালবাসা খরসা, গলিয়া, ধূলা হইয়া মনের এক কোণে জ্বালের মত জ্বালা হইয়া আছে। তবু এখনও কোন কোন দিন আরতি স্বপ্নে সুখেন্দুকে দেখে—সেই আগের দিনের মত কলেজ পলাইয়া তাহার সঙ্গে সারা কলকাতা শহরে টো-টো- করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

দুইজনের সুখাব্যট আনন্দোজ্জ্বল মনের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম করুণ সুর ব্যাধিয়া উঠিল, দুইজনেরই দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। আরতি আরও কাছে ঘেষিয়া আসিয়া কহিল, “কি ভাবছ গো?” পরেশ কহিল, “তুমি?”

এই মাঘ। রাতি একটা।

কোন এক মফস্বল শহরে মোক্তার-মামার বাড়িতে বাবির বিবাহের প্রথম পর্ব অর্থাৎ কন্যাদান ও শ্রুতদণ্ডি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর—এই শহরের পুন্নিসের দারোগা, বয়স চল্লিশের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশ। বয়সরথানেক আগে বিপন্নক হইয়াছে। প্রথম পক্ষের দরুণ বৎসর দশের একটি ছেলে ও বৎসর পটির একটি মেয়ে আছে। কাজেই বিবাহ না করিয়া কোন রকমে বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিবে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু একটানা এক বৎসর বহুচর্চা সাধন করিবার পর মনটা তাহার ঘাড় বাকাইয়া দাঁড়াইল। উপরন্তু অন্যের বৃদ্ধা পিসিমা, বাহিরে বন্ধু-বান্ধবের দল পঞ্জীহীন জীবনের পরিণাম সম্মুখে তাহার চোখের সামনে এমনই ভয়াবহ চিত্র আঁকিতে শুরু করিল যে, শেষ পর্যন্ত বিবাহ করিতে রাজী হইয়া পড়িল। এবং ক্রমে মোক্তার বন্ধু (বাবির মামা) তাহার ভাগিনেয়ারী সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করিল প্রথমত বয়সের তারতম্যের দরুণ একটি বড় বড় করিল বটে, কিন্তু মেয়েকে স্বচক্ষে দেখিবার পর আপত্তি ভেদ করিলই না বরং অতিরিক্ত উৎসাহী হইয়া উঠিল। বরের বয়স, লম্বা-চওড়া মেদবহুল, লোমশ দেহ ও মেটে রং দেখিয়া সুখদা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু দাদার কাছে ধমক খইয়া, তাহা ছাড়া সম্ভাব্য কার্য সাধন হইবে ভাবিয়াও রাজী হইয়া গেল।

বাসর-ঘরে কন্যা ও বর বসিয়া আছে। বাড়ির মেয়েরা বরের বয়স ও পদনথীলা স্মরণ করিয়া কেহ কাছে ঘেষিতে সাহস করে নাই, জানালা ও দরজার আড়ালে আচ্ছাদন করিয়া মৃদু গজজন করিতেছে। বর একটা গড়গড়া হইতে লম্বা সটকার তামাক টানিতেছে। পাশে লাল দেবীতে সর্বাপা মৃড়িয়া আব্রাক ঘোমটা টানিয়া বাবি বসিয়া আছে। সুখদা একবার ঘরে ঢুকিয়া শ্বিবা-কাপ্তান পদে কাছে আসিয়া বাবির বাম হাতটি বরের জাম হাতে চাপাইয়া দিয়া, মৃদুস্ব-পড়া বলার মত, ফিস ফিস করিয়া

লজেন্স, চকোলেট, টফী ইত্যাদি এবং জ্যাম্, জেলী,
চাটনী ইত্যাদি এইখানে খাঁজ করুন—

জেম্‌স্‌ লর্ড এণ্ড সন্স

৯নং কনসালিডেটেড বিল্ডিংস্‌ কলিকাতা।

আমরা এই সমস্ত

‘টাইগার মার্ক’



মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করি

বয়েল্ড ড্রপস্‌

ক্যান্সী বন্স্‌

পিপারমিষ্ট

কম্বিকট গুডস্‌

টকী

ইত্যাদি

আমরা প্রস্তুত করি

‘পলেন্‌’ মার্ক



এই সমস্ত সামগ্রী

আনারসের জ্যাম লাইমজুস্‌

গুজবেরী জ্যাম কর্ডিয়েল

পেয়ারার জেলী মিক্সড পিকল্‌

আমের চাটনী জিঞ্জার বীয়ার

টমেটো সস্‌ ইংলিস ভিনিগার

লিমন স্কোয়াস্‌ টয়লেট পেপার

অরেঞ্জ স্কোয়াস্‌ বিনাইল

ইত্যাদি

সন্তুষ্টি সুনিশ্চিত

টোলগ্রাম—“সিডার”

ফোন-ক্যাল ৪০৬২ এবং

বি বি ৫৮০৮

ক'হিল, "তোমার হাতে সপে দিলাম, বাবা। নেহাৎ ছেলেমানুষ, কিছু জানে না। দোষ হট্টা হলে কমা ক'রো।" বর এক মুখ ধোয়া ছাড়িয়া ব'বির কোমল-কম্পমান হাতটি নিজের বাঘের থাণ্ডার মত প্রকাশ্যে কড়া-পড়া হাতের মুঠির মধ্যে ঢাপিয়া বাজখাই গলায় ক'হিল, "কিছু ভাবনা নেই অপনার। ছেলে-ছোকরা তো নয় যে ব'কিরে বলতে হবে! মেয়ের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি।" সুখদা কাম্পিত পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বর ব'বির সুগোল, সুগঠিত, কটা সেনার মত রঙের হাতে পাতলা, হাস্কা সৌন্দর্য চুড়িগুলির দিকে তাকাইয়া উচ্চকণ্ঠে আড়ালে-আড়ালে দণ্ডায়মানা রমণীবৃন্দের উদ্দেশ্যে ক'হিল, "আ। এ যে তব্বর মত সর্ব দেখছি, বেশ ভারী ভারী চুড়ি গড়িয়ে দেব এখন।" বলিয়া হাতটি পদম লোভের সহিত টিপিতে লাগিল। বাব হাতটি সরাইয়া লইবার জন্য টান দিতেই বর ক'হিল, "লাগছে নাকি?" ব'ব নীরব। বর ক'হিল, "কথা কওনা যে, ঘুম পেয়েছে নাকি? পেয়েছে তো হাত-পা মেল শূন্যে গড়া। আমিও একটু গড়ব তব্বা, যা ধকল গেছে সারাদিন। এ বয়সে কি ও সব সয়?" বলিয়া হাতটি ছাড়িয়া দিতেই বাব হাতটি টানিয়া লইয়া জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া ঘোমটা আরও আধ হাত টানিয়া দিল।

বর শালমুড়ি দিয়া শাইয়া পড়িল। বর দুই এপাশ-ওপাশ করিয়া ব'বিকে ক'হিল, "বসে রইলে কেন? শোও না।" বলিয়া বোথ করি প্রথম পক্ষের স্মারি কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। বাব তেমনি বাঁসরা রইল।

বাহিরে মেয়েরা একে একে সরিয়া পড়িয়া শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিল, ব'বির অন্যান্য লোকজন যে যেখানে পরিণ চান্দর মুড়ি দিয়া শাইয়া পড়িল। লগ্নিতে দেখিতে সারা বাঁড়টা দিনান্তে হাটতলর মত খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। শৃঙ্খল বরের নাসিকাবান্ধন, শীতের তীক্ষ্ণ-শীতল আবেশে ব'বির পাশে অশ্রুশস্যের আন্দোলিত পাতাগল্লার সরসর শব্দ, রক্তা রক্তিতর পাখীর একটিনা ডাক, ব'বির সদর দরজার সম্মুখে স্তম্ভীকৃত রক্তীপাতর চারিদিকে সমবেত কুকুরগুলার কলহের শব্দ—নিত্য প্রবহন জীবনপ্রবাহের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতে লাগিল। বর ঘুমাইয়া গড়িয়ে বাব মাথর ঘোমটা খাটো করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর পা উপর টিপিয়া খোলা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরে মোম্বলেকিত পৃথিবী দিকে তাকাইয়া রইল। তাহার মন এক হেতুে তাহার সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ পারিপার্শ্বিকতা অতিক্রম করিয়া তব্বি জীবনের মধ্যে ফিরিয়া গেল। সেখানে তাহার পরশদাদকে ঘোরিয়া তি আশা ও আন্দর, কত হাসি ও কান্না, ভারীজীবনের কত সুখ দেখা ও কম্পনের তুলিতে কত ছবি আঁকা। দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইয়া গেল; গোথায় আসিলা সে, কোথায় গেল পরশদাদা—জীবনে কোন দিন বর কোথায় দেখা হইবে না। সেদিন যদি শৃঙ্খ পায় পা পড়িয়া তাহার ব'বির পড়িয়া থাকে হইয়া যাইত, যদি পরশদাদার চোখের সামনে বর চোখে জল দেখিয়া সে মরিত পারিত, তাহা হইলে যাহাকে সে কোন দিন চাহে নাই, তাহারই চাইদা মিটাইবার জন্য তাহাকে অজ দেখা-নি স'পিয়া দিতে হইত না।

ব'বির দুই চোখ হইতে জল পড়িতে লাগিল।

ওই মাঝ রাত্রি একটা।

কার্তিক-কন্যা কমলারও বিবাহের প্রথম পর্ব শেষ হইয়াছে; বর কন্যা বাসরে গিয়া বসিয়াছে। কার্তিক ও কার্তিক-গৃহিণী খুঁতখুঁত

করিলেও, পাত্রটি ভালই। বরস বেশ নয়—পাঁচল কি ছাঁচল। বাবা-মা বাঁচিয়া নাই, জেঠাইমা মনুষ্য করিয়াছেন। জেঠা-জেঠাইমরও নিজেদের একঘর ছোট-বড় ছেলেমেয়ে—কাজেই, কার্তিক ঘরজামাই রাখেতে চাইলে তাহাদের আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। ছেলেটি শিক্ষিত ও উপাভ্যাসকম; ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাস করিয়া কোন এক কোলিয়ারিতে গদ্যমতাবার কাজ করে। দেখতে চাঙা, কাঁহিল; রং ফর্সা হি বটে, তবে কল্যাণবাদের বড়া জল-হাওয়াতে কালচে রং ধরিয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে ঘনশ্যাম যে এমন ভাল পাত্র জুটাইয়াছে, এইজন্য পাড়ার লোক ঘনশ্যামকে ঘনা ঘনা করিতেছে।

বাসরঘরে বর ও কন্যাকে ঘোরিয়া পাড়ার মেয়েরা জটলা করিতেছে। শ্রীমতী বরের সামনে বসিয়া ক'হিল, "কিহে, পছন্দ হয়েছে?" বর হাসিয়া ক'হিল, "কি করে বলব বলুন? ভাল করে একটিনারও তো দেখতে পেলাম না।" মেয়েরা ফোলাল করিয়া উঠিল; একজন ক'হিল, "দেখা এত শক্ত নাকি? সম্মনে হাটগেড়ে বসে, গলায় কাপড় দিয়ে, হাত জোড় করে বিনিয়ে বিনিয়ে বল দেখি—বদন ভাল, ঘোমটা খোল চন্দ্রনুখী।" শ্রীমতী ধমক দিয়া ক'হিল, "তোরা সব চুপ কর দেখি।" কমলার কাছে গিয়া ক'হিল, "বাসরঘরে বরের সামনে এত ঘোমটা দিতে হয় না, খোল দেখি।" বলিয়া ঘোমটাটি সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেই কমলা শ্রীমতীর হাতটি সরাইয়া দিয়া তীক্ষ্ণ চাপাশব্দে ক'হিল, "যাও।" শ্রীমতী বোধ করি কমলার মনের কথা বুঝিল, বরকে ক'হিল, "ও ভাই, আমাদের সামনে ঘোমটা খুলবে না বলছে—আমরা গেলে বুঝিয়ে বুঝিয়ে খুলিও এখন।" বর হাসিয়া ক'হিল, "আচ্ছা, তাই হবে।"

সে কোলিয়ারিতে চাকরি করে, মেয়েদের ঘোমটা-খোলা বিদ্যা তাহার জানা আছে। তাহাদের খাদের টাইমব'বুর খবিতীয়পক্ষের স্মারি কথা মনে পড়িল তাহার। তারি লাজকে মেয়েটি, দেখিবমুঠ একহাত ঘোমটা টানিত। উদ্দিষ্টদেবর সম্পর্কের জোরে মাস দুই আনাগোনা করিয়া হাতের জল ও পান খইয়া মেয়েটিকে ঘোমটা খোলইয়াছিল সে। মেয়েটি শৃঙ্খ ঘোমটা খলে নাই—চিরদিনের মত ঘোমটার বাসাই তুলিয়া দিয়াছে শেষে। স্বামীর ঘর ছাড়িয়া, হাতের পর হাত বদলাইয়া এখন সে রণীপজে স্বাধীন বাসো করিতেছে।

প্রচুর গান, গল্প ও রসিকতার পর মেয়েরা একে একে বিদায় লইল। সবলের শেষে উঠিয়া শ্রীমতী ক'হিল, "গান হে দুজনে। চললাম।" বাঁসরা মচকি হাসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চালায় গেল।

ঘর নিজের হইতেই বর কমলার কাছে ঘোঁষিয়া বসিয়া তাহার গায়ে হাত দিতেই কমলা একটু সরিয়া নসিল। বর দুই হাত দিয়া কমলাকে জপটাইয়া ধরিয়া কাছে টানিার চেষ্টা করিতেই কমলা জোর করিয়া নিজেকে ছাড়িয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অশ্রুবর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণভাবে ক'হিল, "এমন করলে আমি চলে যাব বলছি।" বর ঘাড়াইয়া গিয়া ক'হিল, "ওর বাবা! এ যে আমাদের মনোজ্ঞর সাহেলের মত মেজাজ দেখছি। থাক, আর চলে গিয়ে কাজ নেই, কাছেই বস, তবে ঘোমটাটা খুলে রাখা দয়া করে—মুখ দেখেই প্রণটা ঠাঙা কার এখন।" তারপর চোখের ভগ্নী করিয়া ক'হিল, "একদিন তো ধরা দিতে হবেই।" কমলা বরের দিকে পিছন ফিরায়া আনন্দ ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রইল।

এক হৃদয়হীন পান্যবের কথা ভাবিয়া তাহার মুখ অশ্রুস্রোত আঁধা বাধা মানিল না।



এম্পায়া র

অন্

ইণ্ডিয়া

লাইফ এসুরেন্স
কোং লিঃ

স্থাপিত-১৮৯৭

৪৭তম বার্ষিক রিপোর্টের
কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ
মোট আয়—

১৭,৫৭,০০০,

চলতি বীমার পরিমাণ—

১৬,৪৯,৮৮,০০০,

সম্পত্তির পরিমাণ—

৬,৩০,৪৬,০০০,

ডি, এম, দাশ এন্ড সন্স, লিঃ,

চীফ এজেন্টস্ :-

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম,
২৮নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

ক্যালকাটা স্ট্যাণ্ডার্ড

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত-১৯০০

হেড অফিস-৩০৯নং বহুবাজার স্ট্রীট,

(ডালহৌসী স্কোয়ার য়েণ্ড)

—কলিকাতা—

শাখাসমূহ—রায়গড়, চম্পা, বিলাসপুত্র, নাগপুত্র সিটি, নাগপুত্র
সদর, ছিন্দোয়ারা, সোণর, চন্দা, বেতুল, ভাটাপাড়া (সি পি), বোম্বাই,
পুত্রদলিয়া, চিরকুণ্ডা (বরাকর), মেদিনীপুর।

এজেন্সীঃ—পুণা, আমেদাবাদ, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, দিল্লী।

হাজারীবাগ এবং খৈরাগড় শাখা

শীঘ্রই খোলা হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার—

এস, এম, বসু।

দি ক্যালকাটা মার্কেটাইল ব্যাঙ্ক লি

হেড অফিস : ৭এ, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলধন

১০ লক্ষ টাকা

বিক্রীত মূলধন

১২ লক্ষ টাকার উপর

আদায়ীকৃত মূলধন

১ লক্ষ টাকার উপর

কারেন্ট একাউন্ট :

১০০ টাকা দিয়া একাউন্ট খোলা যায়। দৈনিক ১০০
ব্যালেন্স-এর উপর বৎসরে শতকরা ১১- টাকা সুদ দেওয়া হয়।

সেভিংস্ একাউন্ট :

৫ টাকা দিয়া একাউন্ট খোলা যায়। সপ্তাহে দুইবার টাকা
খোলা যায়। ২৫ টাকা ব্যালেন্সের উপর চেক-বাহি দেওয়া হয়।
বৎসরে শতকরা ৩ টাকা সুদ দেওয়া হয়।

স্থায়ী আমানত :

সুবিধজনক সর্ব ৬ মাস, ১ বৎসর, ২ বৎসর ও ৩ বৎসরের
গ্রহণ করা হয়।

৩ বৎসরের ক্যালসারিফিকেট :

প্রতি ৮৮০ আনায় ৩ বৎসর পর ১০ টাকা দেওয়া হয়।

প্রভিডেন্ট ফান্ড ডিপোজিট :

প্রতি মাসে ৫ হিসাবে জমা দিলে ১২ বৎসর পর ১০৬০০০০
দেওয়া হয়। ২ হইতে ৫০ টাকা পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়।

টেলিফোন : কলিকাতা ৫০৫৪

টেলিগ্রাম : কলিকাতা "টাকাফান্ড"

কলিকাতা ব্রাণ্ড :

হারিসন রোড, ভবানীপুর ও শ্যামবাজার।

অন্যান্য শাখা :

কলকগর, বেলডাংগা, কালনা, শান্তিপুর বেলদা (কন্টাই রোড)

মেদিনীপুর।

নতুন শাখা :

হাওড়া, শেওড়াফুলী, এলাহাবাদ, বেনারস ও কটক

শীঘ্রই খোলা হইবে।

অনুমোদিত জামিনে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। সুবিধা-
জনক সর্ব বিল কলেকশন্ ও বিল ডিস্কাউন্ট এবং
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ইউ, আর, ঘোষ,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

লৌহিত্যপূর্ব ভূখণ্ডের প্রব্রেশ্য

ডক্টর শ্রীনাথনীকান্ত ভট্টাচার্য

১। ময়নামতী পাহাড়ের ভূতত্ত্ব

আসাম-বেংগল রেলপথের লালমাই স্টেশন হইতে ত্রিপুরা জেলার সদর স্টেশন কুমিল্লা সহর পর্যন্ত বিস্তৃত দশ মাইল রেলপথের সমান্তরালে, দক্ষিণাংশে রেলপথ হইতে ৪ মাইল এবং উত্তরাংশে তিন মাইল পূর্বে অবস্থিত ময়নামতী-লালমাই পাহাড়টি এ পথে ভ্রমণকারী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। পাহাড়টি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় এগার মাইল দীর্ঘ, প্রস্থে উত্তরাংশে অধিকাংশ স্থানেই মাইলখানিক মাত্র। দক্ষিণাংশে প্রশস্ততর, কোন কোন স্থানে দেড় মাইল, পোনে দুই মাইল হইবে। পাহাড়ের অনেকগুলি মূড়া বা শিখর, সর্বোচ্চ শিখর প্রায় একশত ফুট উচ্চ। ঢাকা-চট্টগ্রাম সংযোজনকারী বাদশাহী রাস্তা বা ট্রান্স রোড চাটগাঁ হইতে সোজা উত্তরে কুমিল্লা পর্যন্ত আসিয়া কুমিল্লা হইতে সোজা পূর্বে দাউদকান্দি পর্যন্ত গিয়া মেঘনা তীরবর্তী হইয়াছে। দাউদকান্দি নামক বিখ্যাত বন্দরটি প্রকৃতপক্ষে গোমতী নদীর বাম তীরে অবস্থিত, কিন্তু মেঘনা নদের এক শাখার সহিত এই স্থানে গোমতীর মিলন হইয়াছে। তাই দাউদকান্দিতেও গোমতীর এক মুখ বটে, কিন্তু গোমতীর প্রকৃত মুখ মতলববাজার নামক স্থান হইয়া দাউদকান্দির প্রায় ষোল মাইল দক্ষিণে।

এই কুমিল্লা-দাউদকান্দিগামী বাদশাহী রাস্তা ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের উত্তর প্রান্তে ভেদ করিয়া গিয়াছে। সংগীম মানচিত্র দেখিলেই সমস্ত স্পষ্ট বুঝা যাইবে। পাহাড়ের উত্তরাংশের নাম ময়নামতীর পাহাড়, দক্ষিণাংশের নাম লালমাইর পাহাড়। দক্ষিণ প্রান্তের অদূরে অবস্থিত রেলওয়ে স্টেশনটি তদনুসারে লালমাই নাম পাইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদগণের মতে, চারিদিকে সমতল হিমির মধ্যে দৈব-বৈবেদের মত স্থিত এই ক্ষুদ্রকায় পাহাড়টি ত্রিপুরার পর্বতমালায়ই

পশ্চিমতম তরঙ্গ। ভূপৃষ্ঠের ক্রমসঙ্কোচনের ফলে ভূমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে ভয়ানক প্রাকৃতিক বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। সেই নটরাজের তাণ্ডবে সমুদ্রবৃক্ষে পর্বত মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় এবং পর্বত মিলাইয়া গিয়া সেই স্থানে সাগর গড়িয়া উঠে। পৃথিবীর জন্ম-দিন হইতে উহার যুগে অনবরত এই প্রকার ভাঙ্গাগাড়া চলিতেছে, সুপরিচিত ভূমিকম্পগুলি সেই ভয়াবহ প্রলয় নৃত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুনরাবৃত্তি মাত্র। এমনি এক প্রলয়ংকর বিক্ষোভের ফলে এক যুগে ভূপৃষ্ঠে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। এখন যেখানে হিমালয় পর্বতমালা, সেই যুগে সেইখানে প্রশান্ত মহাসাগরের এক শাখা ছিল। সেই সাগরশাখার তলদেশ ভূতরঙ্গশীর্ষে উৎক্ষিপ্ত হইয়া হিমালয় পর্বতরূপে উন্নীত হইল। হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিকে এশিয়া মহাদেশের বৃহৎ জুড়িয়া ভূতরঙ্গরূপে পর্বতমালা জাগিল। এই তরঙ্গ সমূহের গতি ছিল উত্তর-দক্ষিণ। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্তের দক্ষিণভাগে ভূতরঙ্গগুলির গতি হইয়াছিল পূর্ব-পশ্চিম; উহারই ফলে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়া ভূপৃষ্ঠে কুণ্ঠিত হইয়া, নাগা পাহাড়; কাছাড়-ত্রিপুরা-মণিপুর-পার্বত্যচট্টগ্রামের পাহাড়গুলি; ব্রহ্মদেশ ও মলয় উপদ্বীপের পাহাড়গুলির জন্মদান করিল। এই তরঙ্গেরই পশ্চিমতম তরঙ্গ ময়নামতী-লালমাই পাহাড় এবং বাঁচি-বিভাগ ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার ভাওয়াল-মধুপুরের উচ্চভূমি ও টিলাসমূহ। উত্তর-দক্ষিণগামী ভূতরঙ্গ এবং পূর্ব-পশ্চিমগামী ভূতরঙ্গের সংঘর্ষে বাঙ্গলা দেশের নিম্ন ভূমির সৃষ্টি,—উহার নিম্নতম অংশগুলিই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিলে পরিণত হইয়াছিল। এই বাঙ্গলা দেশের নিম্নভূমি বা গর্তকে, উহার তিন দিকের পর্বতমালা হইতে নিঃসৃত নদী-সমূহ লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া পলি মাটি স্ফারা ভরিয়া বাঙ্গলার সমতল প্রান্তর,—

বাঙ্গলার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমি-লক্ষ্যীকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

ময়নামতী-লালমাই পাহাড় তাই ভূতত্ত্ব আলোচনায় আনন্দোৎসবের পরম শিক্ষাপ্রদ বিচরণ ক্ষেত্র। লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণতম প্রান্তের শিখরদেশের নাম চণ্ডীমুড়া। উহার উপরে নাতিবৃহৎ একটি চণ্ডীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। জনপ্রবাদ এই যে, চণ্ডীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধ এই স্থানেই সংঘটিত হইয়াছিল। এই মূড়ার অনেক স্থানে প্রস্তরীভূত কাষ্ঠখণ্ডসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, উহার নমুনা ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে, কলিকাতায় বড় যাদুঘরেও নিশ্চয়ই আছে। স্থানীয় লোকে এই প্রস্তরখণ্ডসমূহকে বলে অসুরের অস্থি এবং এগুলির অস্তিত্বকেই চণ্ডীর সহিত এইস্থানে অসুরের যুদ্ধের অকাটা প্রমাণরূপে উপস্থিত করে। এই প্রস্তরীভূত কাষ্ঠখণ্ডগুলি দেখিতে অবিকল এক টুকরা লাকড়ীর মত,—কাঠের আঁশগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। হাতে লইলেই শব্দ বুঝা যায়, এ গুলি কাঠ নহে, পাথর। এই অসুরের অস্থি বা ফসিল অনেক পাহাড়ের পাওয়া যায়, একমাত্র লালমাই পাহাড়েরই ইহা বিশেষ্য নহে।

ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের আর এক ভূতাত্ত্বিক বিশেষ্য অদ্যাবধি কোন ভূতত্ত্ববিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে কিনা জানি না। ত্রিপুরা মহারাজার বাঙ্গলা ময়নামতী পাহাড়ের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত, ইহার পরেই পাহাড় শেষ। শেষ বটে, এবং ইহার উত্তরেই সমতল ভূমির আরম্ভও বটে, কিন্তু শেষ হইয়াও শেষ হয় নাই। ইহার উত্তরেও অনেক দূর পর্যন্ত, সোজা এক লাইন ধরিয়া ক্রমহ্রাসমান ক্ষুদ্রতর টিলাসমূহ ধানক্ষেতের মধ্য হইতে কিছু দূরে দূরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! ময়নামতী লালমাই পাহাড় প্রভৃতির যেন ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের ডিম্বাকার মালা গাঁথিয়া তীত হয় নাই, আবার দুই প্রান্তে দুইটি টিলার ফুল-ঝড়ি ঝুলাইয়া দিয়াছেন। উত্তর প্রান্তের ফুলঝড়িটি আমি নিজ চোখে দেখিয়াছি, দক্ষিণ প্রান্তেও এমনি ফুলঝড়ি থাকবার কথা, কিন্তু আমি নিজ চোখে দেখি নাই।

ময়নামতী পাহাড়ে বা উহার নিকটবর্তী স্থানসমূহে সুপ্রাচীন প্রস্তরযুগ হইতেই যে মানুষের বাস আরম্ভ হইয়াছিল, চট্টগ্রাম পাহাড় হইতে তাহার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রস্তর যুগে মানুষ প্রস্তরশস্ত্র ব্যবহার করিত,

ভারতীয় ব্যাংকসমূহ আজ
জাতীয় বাণিজ্য প্রসারের
বিশেষভাবে নিয়োজিত।
যুদ্ধান্তর কালে দেশে শিল্প
গঠনে যে বিশেষ সূচ্যোগ
আসিবে তাহাও জাতীয়
ব্যাংকের সহায়তায় সাফল্য-
মন্ডিত করিতে হইবে।
সমাগত ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ
সূচ্যোগ গ্রহণের নিমিত্ত এখন
ইইংরেজী জাতীয় ব্যাংকের
সহযোগিতায় আপনার কর্ম-
পন্থা স্থির করুন।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক

লিমিটেড

১৮-১, গ্রাণ্ট লেন, কলিকাতা।

গ্র্যান্ড ২-৭২ বি, আ শ্রু তো ষ
মুখার্জী রোড ও নারায়ণগঞ্জ।

ম্যানেজিং. এস. এন. সরকার

ডায়াপেপ্সিন

অজীর্ণ রোগে আশু ফলপ্রদ ঔষধ। সূক্ষ্মনির্বাচিত
উপাদানে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত।
ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয় প্রভৃতি রোগমুক্তির
পর বা অন্য কোনও কারণে পরিপাকের বিকল
অবস্থায় ইহা গ্রহণযোগ্য। ডায়াপেপ্সিন সেবনে
পার্শ্বিকর খাদ্য গ্রহণের শক্তি ফিরিয়া আসে।
স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা অচিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়)

ইউনিয়ন ড্রাগ কোং লিঃ

২৮-৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Some serve the Country
with Swords
Some with Brain.
We serve the Countries
and Nations
With our Linseed Oil.

WITH the Convoy—there moves in the waves—an essen-
tial commodity—the famous “Lion Brand” Linseed Oil
—of our own manufacture—moves far into the battle fronts,
in the factories and in every department of the Government
—Railways and Ordnance Depots for the prosecution of the
war to its victorious finish. The Allies will have the supplies
of Linseed Oil from us for all time to come.

It is not a Self Advertisement.

It stands above Truth.

Government and Railway Contractors and Exporters.
Manufacturers of Pure Mowah Oil, Groundnut Oil,
Kapoo Oil, Castor Oil, Oil Cakes and Oil Refiners.

MOHIN & CO., LTD.

44, Beadon Row, CALCUTTA.



MOHIN & CO. LTD.
44, BEADON ROW, CALCUTTA

“Purelinoll” Cal.
Telephones:

Telegram: {Office: B. B. 525
Works: Howrah 135.

প্রাতিষ্ঠিত স্লেজক রাজা বনিয়া বিবেচিত হইত। কাজেই ইহার পূর্ববর্তী কালের আর্য সভ্যতা সংশ্লিষ্ট কোন প্রত্ননিদর্শনের আবিষ্কার হ্রিপুরা জেলা হইতে বড় সম্ভবপর নহে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহাও সম্ভব হইয়াছে, এবং প্রচুর না হইলেও, এই অঞ্চল হইতে প্রাক-প্লেহস্ট যুগের অন্ত্যঃ পুইটি উন্মোচ্যোগা প্রত্ন নিদর্শনের আবিষ্কারের বার্তা আসিয়া গানি।

Figure 1

লইয়া অর্থাৎ বর্তমান কাছাড়, শ্রীহট্ট, চিপসা, নোয়াখালি জেলা এবং ময়মনসিংহ জেলার পূর্বার্ধ এবং ঢাকা জেলার প্রাচীন লৌহিত্যের পূর্বস্থ কাঞ্চর অংশ লইয়া প্রাচীন সম্রাট দ্বারা গঠিত ছিল। জানিতে পারিলার, আমার এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করার অপরাধে সম্প্রতি এই মত-বিরোধী পরীক্ষকগণ কর্তৃক ডক্টরেটের একটি থিসিস প্রত্যাখ্যাত করা ইয়াছে। কাজেই এই বিষয়টি সাবধানতা সহকারে আলোচনার যোগ্য। এই আলোচনা ভাব্যতের জন্য রাথিয়া এই স্থানে শব্দ এইটুকু জানিলেই ইইবে যে, সম্রাটগণের আমলেও অর্থাৎ ৩৫০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়েও সম্রাট বা তিপসা জেলা উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যের বর্ধিত

যে স্থানে প্রাচীন লৌহিত্য হইতে লক্ষ্য
নদী বারিহর হইয়া গিয়াছে, সেই স্থানের নাম
লাখপুর। এই স্থানে বানার বা প্রাচীন বান-
হার নদ আসিয়া লৌহিত্যে পড়িয়াছে, এবং
তাহাই পরে শীতললক্ষা নাম ধারণ করিয়া
দক্ষিণে বাহিয়া গিয়া নারায়ণগঞ্জ সহরের নিকটে
ধলেশ্বরী নদীতে পড়িয়াছে। বানার নদের
নাম লক্ষ্মণ সেনের ভাওয়াল-তান্ত্রাসনে
উল্লিখিত আছে। এই তান্ত্রাসনখানি ১৭৯০
খৃষ্টাব্দে লাখপুরের পশ্চিম-উত্তরস্থ, বানারের
পশ্চিম প্রাণের অবস্থিত কাপাসিয়া নামক
বিখ্যাত গ্রামের তিন মাইল পশ্চিমে রাজাবাড়ী

চা

ইণ্ডিয়া টি ট্রেডার্স

প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত
চা ব্যবসায়ী১, চান্দনী চক্ শ্রীট
(এন গণেশচন্দ্র এডিনিউ)
কলিকাতা।মফঃস্বল বিক্রেতাদের
একমাত্র নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।ব্রাণ্ড :—রাজপুরবাজার
২৪ পরগণা।ম্যানেজার—
পরেশনাথ মিত্র।কুমিল্লা ইউনিয়ন
ব্যাংক লিঃ

রেজিঃ অফিস : ৪, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

স্থাপিত—১৯২২

প্রথম প্রেরণের যে কোন ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের জন্য কোন দৃষ্টাবনা নাই,
আজিকার এই অনিশ্চয়তার দিনে এই কথাটা মনে রাখিবেন।ডিপজিট ... ৭,৫০,০০,০০০, উর্ধ্ব
কার্যকরী তহবিল ... ৮,৫০,০০,০০০, উর্ধ্ব

কলিকাতা অফিস :—

২২৫, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট : : ১৯এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
১০৯বি, রসা রোড, ডাবানীপদুর।

অপর শাখাসমূহ :

১। বরিশাল	৫। চট্টগ্রাম	১০। জোড়হাট	১৫। পাবনা
২। রাহুলগণবাড়িয়া	৬। মাকা	১১। মহম্মদসিংহ	১৬। পুরাণবাজার
৩। ভৈরববাজার	৭। ডিরগুড়	১২। নারায়ণগঞ্জ	১৭। রাজসাহী
৪। চাঁদপুর	৮। ধুবড়ী	১৩। নিতাইগঞ্জ	১৮। তিনসুকিয়া
	৯। গোহাটী	১৪। নওগাঁও	১৯। পাটনা
			২০। পাটনা সিটি

অস্ট্রেলিয়ান এজেন্টস্—ব্যাংক অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনি
আমেরিকান এজেন্টস্—গ্যারান্টি ট্রাস্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক
লন্ডন এজেন্টস্—বারক্লেজ ব্যাংক লিমিটেড

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ ডি (ইকন) লন্ডন, ব্যারিস্টার এট-ল।

পূজা উপলক্ষে

আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি—

বেঙ্গল ক্রেডিট ব্যাংক লিঃ

২৩, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্বপ্রকার ব্যাংকিং কার্য করা
হয়।অনুমোদিত সিকিউরিটি, বিল ও
সোনা ইত্যাদি রাখিয়া ধার পাওয়া
যায়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—জে সি সাহা

ফোন ক্যাল : ৭১৭৫

গ্রামে পাওয়া যায়। (J.A.S.B., 1942, P. 1 ff. দৃষ্টব্য)।

বানার নদ ব্রহ্মপুত্রের বান হরণ করিয়া জমালপুত্রের কিছদ নীচে জমাগ্রহণ করিয়া, মধুপুর জঙ্গলের পশ্চিম দিয়া বহিয়া, বহুদূর পর্যন্ত ঢাকা ময়মনসিংহ জেলার সীমানারূপে পশ্চিম হইতে পূর্বে বহিয়া, ত্রিমোহিনী নামক স্থানে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া, লাখপুত্রে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। শীতলক্ষ্যা নদী বর্তমানে ইহারই দক্ষিণাভিমুখী সম্প্রসারণ মাত্র। বানারের ত্রিমোহিনী-লাখপুত্র অংশের পূর্ব ও পশ্চিম ধারে ভাওয়ালের টিলাময় অঞ্চলগুলি অবস্থিত। প্রাচীনকালে লোহিতা বা ব্রহ্মপুত্র নদ এই টিলাময় স্থান ভেদ করিয়াই প্রবাহিত হইত। ময়নামতী-লালমাই পাহাড় যেনে ক্রমবর্ধমান, ভাওয়ালের টিলাগড়ি তেমন ক্রমবর্ধমান হইবার সম্ভাবনা। ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ যে এই টিলাগড়ি ভেদ করিয়া, মোজা দক্ষিণে না নামিয়া ক্রমশঃ এই অঞ্চলের উত্তর প্রান্তবাহী ও পূর্বাভিমুখী হইয়া ভৈরব-বাজারে মেঘনা নদের সহিত মিলিতে বাধ্য হইয়াছে, এই ব্যাপারও টিলাগড়ির অতি ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধনেরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

বানারের ত্রিমোহিনী-লাখপুত্র অংশের পূর্বে আরও দুইটি স্বাভাবিক জলপ্রবাহ দেখা যায়। প্রথমটির নাম পাহাড়িয়া নদী। বিত্তীয়টির নাম আড়িয়ল খাঁ। ভাওয়াল-টিলার ক্রমবর্ধনের ফলে ব্রহ্মপুত্র পূর্বদিকে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে, সম্ভবতঃ এই পাহাড়িয়া নদী ও আড়িয়ল খাঁ নদীই ক্রমান্বয়ে উহার প্রধান খাতে পরিণত হয়। ভৈরববাজারগামী খাতের জন্ম হয় ইহারও পরে। সকলেই জানেন, ভৈরববাজারগামী খাতও বর্তমানে শুষ্কপ্রায়, ব্রহ্মপুত্র বর্তমানে মধুপুর-ভাওয়াল অঞ্চলের পশ্চিম দিয়া যমুনা খাতে প্রবাহিত।

ভাওয়াল-মধুপুর অঞ্চলকে ভূতাত্ত্বিকগণ বলেন Older alluvium বা প্রাচীনতর পলি গঠিত অঞ্চল। সুপ্রাচীন কালে বর্ষা যখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত এবং নিম্নবর্ণের সমস্ত স্থান বর্ষার জলে ডুবিয়া যাইত, তখন ভাওয়াল অঞ্চল জলের উপরে থাকিত। প্রধানতঃ এই গুলেই পূর্বভারতে আৰ্য সভ্যতা প্রসারের অতি প্রাচীন যুগ হইতে এই লোহিতা, পাহাড়িয়া ও আড়িয়ল খাঁর পারে পারে জন-বসতি আরম্ভ হইয়াছিল। আড়িয়ল খাঁর তীর-বর্তী মরজাল গ্রাম হইতে কয়েক বৎসর আগে মোর্ষ যুগের বহুতর রৌপ্য মুদ্রা বা কার্ণাপণ আবিষ্কৃত হয়। আমি বহু চেষ্টায় উহারে ১০টি ঢাকা বাদ্যযন্ত্রের জন্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই স্থান লাখপুত্র হইতে প্রায় ১৪ মাইল পূর্বে এবং এই স্থানে মোর্ষ যুগের মুদ্রার আবিষ্কার হইতে বোঝা যায়, কত প্রাচীনকাল হইতে এই অঞ্চলে আৰ্য সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে। লোহিতাকে আমরা

সমতটের পশ্চিম সীমানা ধরিয়াছি, কাজেই এই স্থানকে সমতটের অন্তর্গত ধরিতে হইবে।

লোহিতার পূর্ব পারে অবস্থিত এগার-সিন্ধু নামক স্থানটির নামাখ মনোযোগ সহ-কারে বোধিতব্য। এই স্থানটি ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পারে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে সমতটের অন্তর্গত ধরিতে হইবে। এই স্থানে একা-দশটি নদী একত্র মিলিয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম হইয়াছিল এগার-সিন্ধু। নদী অর্থে সিন্ধু শব্দটির ব্যবহার বৈদিক যুগেই হইত, কাজেই এই নামটি এই স্থানের প্রাচীন-ত্বের সাক্ষ্য। আড়িয়ল খাঁর তীরবাসিগণ মোর্ষ যুগে যখন কার্ণাপণ ব্যবহার করিত, প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের সমগ্র নৌ-বাণিজ্য যখন বিশাল লোহিতার বক্ষ বাহিয়া সমুদ্রে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে চলাচল করিত, সেই সময়েই এগারটি মোহনার উপরে অবস্থিত এই লক্ষ্মীমন্ত স্থানটি এই নাম পাইয়া থাকিবে। এই নামটি এবং এই অঞ্চলের গ্রামের নামের মধ্যে সিংহী, বসুদ্রী ইত্যাদি নাম দেখিয়া এই অঞ্চলে আৰ্য সভ্যতা বিস্তারের বয়স অনুমান করা যায়। প্রাচীন লোহিতা ও আড়িয়ল খাঁ নদের মধ্যবর্তী পাহাড়িয়া অঞ্চল শুষ্ক ভূতাত্ত্বিকেরই বিশুদ্ধ অনুসন্ধান ক্ষেত্র নহে, মরজালে কার্ণাপণ আবিষ্কার হইতে বোঝা যায় যে, ইহা প্রত্নতাত্ত্বিকেরও অতি লোভনীয় অনুসন্ধান ক্ষেত্র। অগ্চৎ বলিতে গেলে এই অঞ্চলে অদাব্যিধি কোন অনুসন্ধানই হয় নাই।

খ। শিল্পায় ২য় খণ্ড-২য় লিপি আবিষ্কার

সমতটে প্রাক্ গুপ্ত যুগের দ্বিতীয় নিদর্শনটি সম্প্রদে এইবার আলোচনা করিব। নোয়াখালি জেলার ছাগলনাইয়া থানাটির আকৃতি ভারি চমৎকার। সমগ্র নোয়াখালি জেলার আর কোথাও পাহাড় নাই, কিন্তু এই স্থানে পার্বত্য ত্রিপুরার পর্বতমালা হইতে বাহির হইয়া দুইটি শৈলশ্রেণী যেন বুমীরের দীর্ঘ ও দস্তবহুল দুইটি ঠোঁটের মত ছাগল-নাইয়া থানাটিকে মুখে পরিয়া অবস্থান করিতেছে। কাজেই সহজেই বোধগম্য যে, দুই ধারে পাহাড়ের উচ্চ প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত এই স্থানটী বেশ প্রাচীন স্থান। সমগ্র নোয়াখালী জেলা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, ডাকাতিয়া ফেণী বাহিত পলি দ্বারা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবার পূর্বেও, এই পর্বতমালারোহিত স্থানটিতে লোক-বসতি হইবার কথা। আৰ্য সভ্যতা প্রসারের আদি যুগেও এই স্থানেই হয়ত প্রথম উহা প্রসৃত হইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অনুমানের সমর্থক প্রত্ন-তাত্ত্বিক প্রমাণও মিলিয়া গিয়াছে। বর্তমানে ফেণী বলিয়া পরিচিত আধুনিক মহকুমা সহরটির মাইল তিনেক পূর্বে ছাগলনাইয়া থানার সীমানার মধ্যে, শিল্পুয়া নামে একটি বিস্কৃত স্থান আছে। উত্তর শিল্পুয়া, নধ্য শিল্পুয়া, দক্ষিণ শিল্পুয়া ইত্যাদি নামে এই

প্রাক্ গুপ্ত গ্রামটি বিভক্ত। এই গ্রামে ভারতীয় প্রত্ন বিভাগের ভূতপূর্ব সর্বাধিক শ্রীযুক্ত কাশী-নাথ দীক্ষিত মহাশয় খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দির লিপি যুক্ত একটি মূর্তির পাদপাঠ আবিষ্কৃত করেন। এই আবিষ্কার স্থানটি বর্তমানে আইন অনুসারে সংরক্ষিত বলিয়া বিধোষিত হইয়াছে, কিন্তু যুগ্মের জন্য এই স্থানে খননাদি আরম্ভ করা সম্ভবপর হয় নাই। দূর্ভাগ্যক্রমে, প্রত্নবিভাগ এই আবিষ্কারের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা না হইত, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্বন্ধে এপর্যন্ত আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। এমন কি লিপিটি যে সভ্য দ্বিতীয় খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের সেই সম্বন্ধে কোন প্রমাণও অদাব্যিধি প্রকাশিত করেন নাই। তাই এই আবিষ্কার সন্দেহ-সমাকুল হইয়া রহিলেও, ফেণী অঞ্চলের বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য ইহার বার্তা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

৩। পরবর্তীকালের প্রত্ননিদর্শনসমূহ

ত্রিপুরা জেলা হইতে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার-গুলির কালপর্যায় অনুসারে সজ্জিত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১। মহারাজাধিরাজ বৈদ্য গুপ্তের তাম্র-শাসন। এই তাম্রশাসনখানি বর্তমানে ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। প্রত্নতত্ত্বোৎসাহী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয় এই তাম্রশাসন-খানির আবিষ্কর্তা। ময়নামতী পাহাড়ের উত্তর প্রান্ত হইতে প্রায় দশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গুণাইঘর গ্রামে ১৯২৫ সনে এই তাম্র-শাসনখানি আবিষ্কৃত হয়। ১৯৩০ সনের Indian Historical Quarterly পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই তাম্রশাসনখানির পাঠ প্রকাশিত করেন। তাম্রশাসনখানি গুপ্তাব্দের ১৮৮ সনে অথবা ৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই তাম্র-শাসন দ্বারা মহারাজা বৈদ্য গুপ্ত সামন্ত মহারাজা রুদ্র দত্ত প্রাপ্তিভিত্তিক এক বৌদ্ধবিহারে এগার পাটক অথবা ৪৪০ দ্রোণ ভূমি দান করেন। প্রদত্ত ভূমির এক সীমানায় গণিকাগ্রহণ গ্রামের উল্লেখ আছে। ইহাই যে বর্তমান গুণাইঘর গ্রাম, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ লক্ষ্যের যোগ্য এই যে, সমুদ্র গুপ্তের রাজ্যকালে যে সমতট রাজ্য প্রত্যুত রাজ্য ছিল, তাহা এখন মহারাজাধিরাজ বৈদ্য গুপ্তের রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। সামন্ত মহারাজ রুদ্র দত্তের বিহার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া জানা যায়, তিনিই এই সময় এই অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন।

মহারাজাধিরাজ বৈদ্য গুপ্তের ৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই ভূমি দানের ৪০৮২ বৎসরের মধ্যেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়, এবং পূর্ব ভারত হইতে গুপ্ত শাসন লোপ পায়। সেই স্থানে ক্রমান্বয়ে আমরা ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচার দেব নামক মহারাজাধিরাজ উপাধি-

ম্যানেরিয়া ও

পুরাতন জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া যেসব রোগী
জীবনের আশা ছাড়িয়াছেন

একবার—

গোবিন্দ সুধা

সেবন করুন

পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না
সর্বত্রই পাওয়া যাইতেছে

★ মাহারা ঠিকিষ্ট হইতে ইচ্ছুক আবেদন করুন

++গোবিন্দ সুধা কোং++

৩৬৫, আপার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

ধার্মী তিনজন সম্রাটপদাভিমানে রাজার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। লৌহিত্যের পূর্ব পারে ইহাদের শাসন সীমা প্রসৃত ছিল, এমন কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। লৌহিত্যের পূর্বোন্মীত ভূখণ্ডে তখন প্রাগ্-জ্যোতিষ্মত্বের অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল, এইরূপই প্রমাণ পাওয়া যায়। কামরূপরাজ তক্ষর বর্মার নিধনপূর (পঞ্চখণ্ড) শাসনে দেখা যায়, পঞ্চখণ্ড পরগণায় তিন শতেরও অধিক গ্রাহ্যগণ ভাস্করের পঞ্চম পূর্বপুরুষ ভূতি বর্মা স্থাপিত করেন। সেই তাম্রশাসন নষ্ট হইয়া যাওয়ায় কামরূপের রাজধানীতে থাকিয়া ভাস্কর বর্মা পুনরায় তাম্রশাসন সম্পাদন করিয়া গ্রাহ্যগণের অধিকার স্বীকার করেন। ভূতি বর্মার পিতামহ মহেন্দ্র বর্মা দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ভূতি বর্মা নিজেও একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। গ্রাহ্য জেলায় ভূতিবর্মার সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকার দেখিয়া বুঝা যায়, ত্রিপুরা নোয়াখালিও বাকী ছিল না, এবং সমগ্র সমতট প্রদেশেই প্রাগ্-জ্যোতিষ্মত্বের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। শাসনের পুত্র বিভাত্যের ইঞ্জিনায়ার প্রশংসনীয় প্রয়োজ্যসম্পন্ন শ্রীমন্ত রাজমোহন নাথ মহাশয় কিছুদিন পূর্বে ভূতি বর্মার একটি শিলালিপি আবিষ্কার করেন। ইহার পাঠ আমি আয়ত, ১৩৪৮-এর “ভারতবর্ষ” পত্রে প্রকাশিত করি। ইহার তারিখ ৫৫৪ খ্রিষ্টাব্দ। ভূতি বর্মার পিতামহ মহেন্দ্র বর্মার দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্বাহ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া মনে হয়, ভূতি বর্মার পিতামহের আমলেই সমতট অধিকৃত হইয়া থাকিবে এবং বৈদ্য গোবর্ধন ৫০৮ খ্রিষ্টাব্দে গুণোদ্যতের সন্তান গ্রামে ভূমি দানের পরে, ক্রমহীন্যমানশীল গুপ্ত রাজগণের শাসন লৌহিত্যের পূর্ব পারে দ্রুত লুপ্ত হইয়াছিল।

ধর্মাদিত্য-গোপচন্দ্র-সম্রাটের দেবের শাসন লুপ্ত হইলে পূর্ব ভারতে শশাংকের অভ্যুদয়। শশাংক বেশ প্রবল প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে পূর্ব ভারতের সম্রাট পদবী বাচাই হইয়াছিলেন। গাঞ্জাম হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বাঙ্গলা ও বিহার তাঁহার শাসনাধীনে ছিল। শশাংকের অনেক স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলা হইতে তাঁহার দুইখানা তাম্রশাসনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। শশাংকের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া উত্তরাপথের সম্রাট হর্ষবর্ধন বড় সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শশাংকের মৃত্যুর পরে ভাস্কর বর্মার নাগালা দেশ অধিকার করেন এবং কামরূপ হইতে তাম্রশাসন প্রচার করেন। সমতটে আগে হইতেই প্রাগ্-জ্যোতিষ্মত্ব বুজগণের অধিকার ছিল, এইবার বাঙ্গলা দেশেও তাহাদের অধিকার বিস্তৃত হইল।

হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মার মৃত্যুর পরে পূর্ব ভারতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত

হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গলা দেশে জয়নাগ নামক একজন রাজার অসিত্যের পরিচায়ক তাম্রশাসন ও স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে জয়নাগ শশাংকের পূর্ববর্তী রাজা।

এই সময়ের অবলম্বিত পরে, পর গুপ্ত বংশের আদিভা সেন যখন মগধে রাজা, তখন সমতটে এক নতুন রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাই খজা বংশ।

২। দেবখজের তাম্রশাসনস্বরূপ

প্রাচীন গ্রন্থপুস্তকের পূর্ব পারে অবস্থিত লাখপুর নামক স্থানটির পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। লাখপুর হইতে পাঁচ ছয় মাইল দক্ষিণ পূর্বে আশ্রুপুত্র গ্রামটি অবস্থিত। এই স্থানে ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি পুরোনো মাটির টিপি কাটিতে এই তাম্রশাসন দুইখানা এবং কয়েকটি ধাতুময় ছোট টেতা পাওয়া যায়। একখানি তাম্রশাসনের পাঠ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উদ্ধার করেন। পরে এশিয়াটিক সোসাইটির স্মারিকা পত্রিকার (Memoir) প্রথম খণ্ডে, ১৯০৫ সনে, অকালে পরলোকগত প্রতিভাবান প্রত্নতাত্ত্বিক গঙ্গামোহন লস্কর মহোদয় দুইখানি তাম্রশাসনেরই পাঠ প্রকাশিত করেন। তাম্রশাসন দুইখানি দ্বারা মহারাজারাজ দেবখজা স্থানীয় বৌদ্ধ বিহারে ভূমি দান করেন। প্রথম তাম্রশাসনখানিতে মহারাণী প্রভাবতী ও রাজপুত্র রাজরাজ ভট্টের উল্লেখ আছে। দুইখানি তাম্রশাসনই জয়কাম্বিত বাসক হইতে প্রদত্ত। ১৯১৪ সনে প্রকাশিত বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত মদীয় প্রবন্ধে এই স্থানকে আমি বর্তমান বড়কামতা বা চান্দিনা বলিয়া অনুমান করি। সম্প্রতি দেখিতে পাইলাম, লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত হইতে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে জয়কাম্বিত নামে একটি গ্রাম আছে। এই স্থানে কোন প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন আছে কি না অনুসন্ধান। এই তাম্রশাসনস্বরূপের সহিত দেবখজা মহিষী মহারাণী প্রভাবতীর লিপিপত্রও বিবেচ্য।

৩। দেউলবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত মহারাণী প্রভাবতীর লিপিমত সর্বগণী মর্তি

কুমিল্লা সহরের ১৪ মাইল দক্ষিণে কুমিল্লা-চট্টগ্রাম রাস্তার উপর দেউলবাড়ী নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে অনেক বৎসর আগে এই মর্তিখানি আবিষ্কৃত হয়। ১৯২০ সনে এই মর্তিখানি কুমিল্লার আনীত হইলে ইহার পাদপীঠের লিপি অনুসন্ধিৎসুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারত গবর্ণমেন্ট প্রচারিত এপিগ্রাফিয়ার্শিক পত্রিকার সপ্তদশ খণ্ডে ৩৫৭-৩৫৯ পৃষ্ঠায় এই মর্তির বিবরণ ও লিপির পাঠ আমি প্রকাশিত করিয়াছি। লিপিতে দুইটি শ্লোক আছে। প্রথম শ্লোকের মর্মার্থ এই যে, খজোদাম নামে একজন নৃপাধিরাজ ছিলেন, তাঁহার পুত্র জাতখজা, জাতখজের পুত্র দেবখজা। তাঁহার রাজ্ঞী মহিষী মহাদেবী

শ্রীপ্রভাবতী, ভক্তিহসকরে সর্বগণী প্রতিমাকে সোনা দিয়া মূর্তি দিয়াছিলেন। সর্বগণী অর্ন্তভূজা ও দণ্ডায়মান, প্রায় হাত খানিক উঠ, নীচে বাহন সিংহ। দুই ধারে দুই অনুচরী। প্রতিমার গায়ে স্থানে স্থানে সোনা লাগিয়া ছিল। লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তস্থ চন্দ্রীমুড়ার মন্দিরে লইয়া মর্তিখানি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তথা হইতে মর্তিখানি চুরি যায়। কিছুদিন আগে শূন্য হইতে পাইয়াছিল, মর্তিখানি নাকি আবার পাওয়া গিয়াছে।

সমতট রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে প্রাপ্ত খজা বংশের এই তিনখানি লিপি হইতে খজা রাজ্যের আয়তন সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়। চীন দেশীয় পরিমাপক হিউএন সঙ ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে সমতটে আসিয়াছিলেন। ইংরাজ নামক পরিমাপক ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে সমতটে আসিয়া উহার সিংহাসনে রাজভট্টকে দেখিতে পান। কাজেই হিউএন সঙ দেবখজের বা তাহার পিতার সময়ে সমতটে আসিয়াছিলেন। দেবখজের তাম্রশাসনে এক “বৃহৎ পরমেশ্বর” প্রদত্ত ভূমির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি প্রাগ্-জ্যোতিষ্মত্বের ভাস্কর বর্মা হইবারই সম্ভাবনা। কারণ এই সময়ের অনেক পূর্বে হইতেই এই অঞ্চল প্রাগ্-জ্যোতিষ্মত্ববর্গের পূর্ব ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

৪। লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসন

সমতটের দক্ষিণপথে অর্থাৎ বর্তমান ত্রিপুরা-নোয়াখালি জেলা ভূদ্বীয়া যখন খজা বংশের রাজত্ব চালিতেছিল, তখন (৭ম শতাব্দী) উহার উত্তরপথে শ্রীহট্ট কাছাড় জেলায় যে ভিন্ন বংশ রাজত্ব করিতেছিল, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ রক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বা নিকটবর্তী কালে ত্রিপুরা মহারাজার জমিদারী টেটের সুপারিন্টেন্ডেন্ট Mr. MacMum একখানি তাম্রশাসন বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। পরলোকগত গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয় ইহার পাঠোদ্ধার করিবার জন্য শাসনখানি এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে ধরে লইয়াছিলেন। তাহার অকালমৃত্যুর পরে তাহার পিতা শাসনখানি বেংগল অনুসন্ধান সানিটিকে কিছুদিনের জন্য ধর দেন। অধ্যাপক ডব্লিউ শ্রীমন্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় তখন ইহার পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন। এটিপ্রাণিক্যা ইন্ডিকা পত্রিকায় পঞ্চদশ খণ্ডে সেই পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে।

শাসনখানি সপ্তম শতাব্দের কুটিলাক্ষের লিপিত। এই শাসন হইতে আমরা লোকনাথ নামক একজন সামন্ত নরপতির পরিচয় জানিতে পারি। লোকনাথ শাসনে পিতার নাম করেন নাই। মাতার নাম গোত্র দেবী। গোত্র-দেবীর পিতা কেশব গ্রাহ্যগণ পিতা ও শূদ্রা মাতার সন্তান, জাতিতে পারশব বলিয়া উল্লিখিত।

শাশনাল এক্সপ্রেস ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ১৯২৭ সন-

হেড অফিস:

৩ ও ৬, হেয়ার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

সর্বত্র ব্রাঞ্চ ও এজেন্সী আছে

বার্মিংহামের সুবিধা ও সুযোগ আমাদের
গ্রাহকবর্গ সমাক্ষ অবগত আছেন।
আমরা হয় ত আপনারও প্রয়োজন
মিটাইতে পারিব।

বি, এন্, চ্যাটার্জি, এম, এ,
এফ, আর, জি, এস (লন্ডন),
এফ, আর, এস, এ (লন্ডন),
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

টি, আর, বসু, এম, এ,
জেনারেল ম্যানেজার।

‘লক্ষ্মী’র কথা

প্রতি বৎসর শারদীয় সংখ্যায় আমরা ‘লক্ষ্মী’র কথা প্রচার করি। কাগজ
নিয়ন্ত্রণ আইনের জন্য বর্তমান বৎসরে প্রত্যেক পত্রিকাতেই স্থানাভাব। সুতরাং
এইবার আমাদের ‘কথা’ সংক্ষেপেই সারিতে হইল।

দারুণ দুঃসময় সত্ত্বেও গত বৎসরে ‘লক্ষ্মী’র নতুন বীমার পরিমাণ হইয়াছিল
দুই কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। সম্ভূত বীমা তহবিলের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া
হইল দুই কোটি বিশ লক্ষ টাকার উপর। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, এতদ্দেশবাসীর
উপর ‘লক্ষ্মী’র প্রভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং শীঘ্রই এমন দিন আসিতেছে যেদিন
ভারতের প্রতি গৃহে ‘লক্ষ্মী’র বীমাপত্রের কল্যাণে চণ্ডমা লক্ষ্মীদেবী অটলা হইয়া
থাকিবেন। অলমতিবিস্তরেন।

দি লক্ষ্মী ইনশিওর্যান্স কোং লিঃ

হেড অফিস—লাহোর

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার—শ্রীশচীন বাগচী

হুস নুনো স্পেশাল পূজা ক্লীয়ারেন্স সেল

(১৫ই নবেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে)

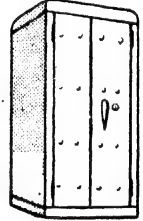
নিম্নে বর্ণিত সর্বকম ইম্পাতের ও অন্যান্য সামগ্রীর জন্য
অনুগ্রহপূর্বক এই ঠিকানায় খোঁজ করুন বা ফোন করুন:

বি, ব্রাঙ্ক এণ্ড কোং

ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স, ৩ ও ৪নং হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা

কারখানা—১নং ইন্টালী মার্কেট ও ২নং আমহাষ্ট স্ট্রীট।

গদাম—(১) শশিভূষণ দে স্ট্রীট (২) পাইকপাড়া রোড



ইম্পাতের স্প্রিংয়ের খাট ৬'০"০"×২'-০"

(ভাঁজ করিয়া রাখার ব্যবস্থা সম্বলিত)

(ফটকে ৭৫টি আছে)

প্রত্যেকটি ৭৫, টাকা

ইম্পাতের কার্বিনেট ৬'০"০"×১৫" (ফটকে

১৫টি আছে)

২৬০, টাকা

ইম্পাতের কার্বিনেট ৬'০"০"×১৮" (ফটকে

৫০টি আছে)

২৮০, টাকা

ইম্পাতের টেবিল ৪'০"২" (ফটকে ১৫টি

আছে)

৭০, টাকা

ইম্পাতের টেবিল ৫'০"০" একপাশ

লকার সহ

১৭০, টাকা

ইম্পাতের রাক্ ৬'০"০"×১৮" সাইড-

গালি বন্ধ (ফটকে ২৫টি আছে)

১০০, টাকা

ইম্পাতের রাক্ ৬'০"০"×১' সাইডগালি

বন্ধ

১৫, টাকা

বিভিন্ন আকারের লোহার সিঁদুক—

উচ্চতা ২৪"×৮০ডা ১৮"×বেধ

১৬" — দুইটি চাবি সহ—ওজন

অনুমান ২৫ মণ হইতে ৩ মণ

২৯০, টাকা

উচ্চতা ২৭"×২০"×১৮" বেধ

দুইটি চাবি সহ—ওজন ৪ মণের

কাছাকাছি

৩৫০, টাকা

৩০"×২৪"×২৪" বেধ—দুইটি

চাবি সহ—ওজন ৪৫ মণের

কাছাকাছি

৪৫০, টাকা

ইলেকট্রিক হিটার (অটোমেটিক সুইচ)

অফ-এর ব্যবস্থা সহ

৭০, টাকা

ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রী এবং বাড়ী ও অফিসের বিভিন্ন বকমের প্রথম শ্রেণীর
সেগুন কাঠের ফার্ণিচার এবং রবারের সামগ্রী বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

এই পারশবের দৌহি়য় লোকনাথের একজন গ্রাহ্মণ মহাসামন্ত ছিলেন প্রবোধ শর্ম। তিনি সুবংশ বা সুবংশ বিষয়ে "কৃতাক্তা-বিশ্ব-অটীষ ভূখণ্ডে" যেখানে—"মৃগ-মিষ-বাহ-বাহ-সারস্পাদি" নিজেদের বাড়ী ঘর করিয়া সুখে যিচ্ছ বাস করিতেছে সেইখানে, তখন নারায়ণের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। যুবরাজ লক্ষ্মীনাথকে দত্তক করিয়া অঙ্গের করিলে লোকনাথ এই মন্দিরের জন্য এক সেই স্থানবাসী গ্রাহ্মণগণের জন্য প্রকাণ্ড এক ভূখণ্ড দান করেন। সাম্মবিশিষ্ট প্রশান্ত-দেব এই দানকর্ম দ্বিল সম্পাদন দ্বারা সুবংশ করিয়া দেন। গ্রাহ্মণগণের নাম ও কে কত জমি পাইবে তাহা শাসনে উল্লিখিত আছে। মোট জমির পরিমাণ বহু শত ব্রোণ এবং বর্তমান মাপের দুই তিন বর্গ মাইল জড়িয়া উঠা অবস্থিত ছিল।

লোকনাথ সম্বন্ধে নিম্ন তথ্যগুলি অবগত হওয়া যায়। তিনি যুদ্ধে বীর্যবান ও সাহসী ছিলেন, তাহার অনেক অশ্বসাদী সৈন্য ছিল। পরমেশ্বরের অর্থাৎ সাবভৌম নরপতি, যিনি লোকনাথের অধিরাজ ছিলেন, তিনি লোকনাথের সহিত সম্বর্ষে অনেকবার সৈনিক ক্ষয় করিয়াছেন, কিন্তু লোকনাথকে অধিকারচ্যুত করিতে পারেন নাই। জয়তুগবর্ষ নামক স্থানের দুর্লভ্য যুদ্ধে লোকনাথের আগ্রহ সহকারে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়া দেখিয়া এবং লোকনাথের নানারূপ প্রশংসা শুনিয়া জীব-ধারণ নামক নরপতি মন্ত্রিগণের পরামর্শে লোকনাথের সৈন্য এবং বিষয় কোনটোই হাত দিলেন না।

এই শাসন প্রদত্ত ভূমি কোথায়, সুবংশ এবং জয়তুগবর্ষ কোথায় তাহা প্রায় বহু প্রাচীন অনুসন্ধান করিতেছে, বঙ্গের অন্যান্য প্রাচীন পণ্ডিতগণও করিয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই। এত দিনে যেন উহার সম্ভান পাইয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে।

প্রাচীন আমলে মহাবাহী বৌদ্ধদের প্রধান প্রাচীন অষ্ট সাহস্রিকা প্রজাপারমিতা পুথি বৌদ্ধ গৃহস্থের ঘরে ঘরে এবং বৌদ্ধ বিহার-সমূহে রক্ষিত হইত। এই গ্রন্থের বহু হাতের কথা পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার এক-খানা কেন্দ্রজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে, উহা ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দের নকল। আর একখানা কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বর্তমান কালের কালীঘাটের কালী, তারকেশ্বরের শিব, গোহাটীর নিকটস্থ কামাক্ষা দেবী, সপ্তমথের শিব ইত্যাদির মত সেই আমলেও বিখ্যাত বিখ্যাত দেবস্থান ও দেবদেবী বিষ্টি ছিল। ঐ প্রজাপারমিতার পুথি দুই-তিনটিতে স্থানের নামসহ ঐ সমস্ত দেবদেবীর বিব দেওয়া আছে। ফরাসী পণ্ডিত ফঁসে উহার বৌদ্ধ-মার্তি তত্ত্ব পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এই সমস্ত লেবেলযুক্ত দেবদেবীর ছবি

তালিকা দিয়াছেন, কতগুলির ছবিও দিয়া-ছেন। মদীয় মার্তি তত্ত্বের পুস্তকেও পূর্ব-বঙ্গের কয়েকটি মার্তির বর্ণনা ও ছবি দেওয়া আছে। এই তালিকায় দেখা যায়, সমস্তে জয়তুগ নামক স্থানে একটি বিখ্যাত লোক-নাথ মার্তি ও মন্দির ছিল। ত্রিপুরা শাসনের জয়তুগবর্ষ এবং এই লোকনাথের মন্দিরের অধিষ্ঠানভূমি জয়তুগ নামক স্থান যে এক স্থান নহে, এমন কোন প্রমাণ নাই। এই জয়-তুগবর্ষ লোকনাথের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়। লোকনাথের শাসনের অক্ষর এবং দেবখঞ্জের শাসনের অক্ষর একই সময়ের, কাজেই ইহার দুইজনে সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। খঞ্জদের অধিকৃত সমস্তের অংশ ত্রিপুরা নোয়াখালি জড়িয়া ছিল। কাজেই লোক-নাথের রাজ্য সমস্তের অপর অংশ গ্রীহটু কাছাড় হইবার সম্ভাবনা। এই যুক্তিপূর্ণতায় অনুসরণ করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া নজরে পড়িল, শীলচরের ১৪ মাইল উত্তরে দুর্লা নদীর এক শাখার নাম সুবংশ গাঙ্গ। শীলচর সহরটি বরাক নদীর উপরে অবস্থিত। এই সহরের ৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জাটিগা নদী উত্তর হইতে আসিয়া বরাকে পড়িয়াছে। এই মিলন স্থানের আড়াই মাইল উত্তর-পূর্বে দুর্লা বা সুবংশ গাঙ্গ আসিয়া জাটিগাতে পড়িয়াছে। শীলচরের আট মাইল উত্তরে আবংগ নামে স্থান, ১১ মাইল উত্তরে জাটিগা নামক স্থান। আবংগের দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে বামনীপাড়া নামক স্থান, প্রাচীন গ্রাহ্মণ বসতির স্মারক। জাটিগাও জয়তুগ এবং স্থানের নামে নদীর নাম হওয়ার সম্ভাবনায় সুবংশ নামটি সুবংশ বিষয়ের স্মারিকক্ষ্য করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা নিশ্চিত হইবার পূর্বে ইহার বেশী আর জোর করিয়া বলা চলে না।

ষষ্ঠ শতাব্দের মধ্য ভাগে প্রাগজ্যোতিষ সম্রাট ভূতি বর্মী গ্রীহট্টের পশ্চিম-দিক তিন শতা-ধিক গ্রাহ্মণ বসাইয়া তথায় আর্থ সভ্যতার এক কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। উহার শত বৎসর পরে, খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দের মধ্য ভাগে পণ্ডিত পাই, সামন্তরাজ লোকনাথ পশ্চিম-ভাগে ৩০ মাইল পূর্বে জাটিগা-দুর্লা-সুবংশ গাঙ্গের উপত্যকায় অনন্ত নারায়ণের মন্দিরে এবং গ্রাহ্মণ পালনের জন্য ভূমি দান করিয়া সেই আর্থ সভ্যতা প্রসারের সহায়তাই করিয়া চলিয়াছেন। এই অপূর্ব হিন্দু মিশনের কার্য এতদিন পরে বর্ণিত পাইয়া আমরা আর্থ-সভ্যতার পূর্ববিস্তার প্রসারের গতি লক্ষ্য করিতে পারিতেছি। শীলচরের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সুবংশায়ত তীর্থ ভুবন পাছাড়ে অসংখ্য দেবদেবীর মার্তি এবং অশুভূতানুর্গণ সুদীর্ঘ পর্বতগুহা ও সুদৃগা কি করিয়া গড়িয়া উঠিল, তাহাও বর্ণিত পাইতেছি। লোকনাথের অধিরাজ জীবনধারণ নৃপের

অন্য কোন পরিচয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ তিনি কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মের বংশীয় ছিলেন, ভাস্কর বর্মের পুত্র বা ভ্রাতৃপুত্র হওয়া অসম্ভব নহে।

খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দি কাছাড় হইতে আরম্ভ করিয়া নোয়াখালি পর্যন্ত ভূভাগের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কিঞ্চিৎ পরি-চয় আমরা পাইলাম। কাছাড়ের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে জয়তুগ বা বর্তমান জাটিগা উপত্যকা পর্যন্ত যে সমস্ত দেশ বিস্তৃত ছিল, তাহারও একটা আভাস পাওয়া গেল। পূর্ব ভারতের বাকী অংশ অর্থাৎ চট্টগ্রাম জেলার প্রাচীন নাম ছিল হরিকেল মণ্ডল। চীনা পরিব্রাজকগণের গ্রন্থে কয়েকবার হরিকেল নামে এই দেশের উল্লেখ আমরা পাই। উত্তর সমস্তে যখন লোক-নাথের বংশ, দক্ষিণ সমস্তে যখন খল্ল বংশ রাজ্য করিতেছিল, তখন বা তাহার অন্যাবহিত পরে হরিকেল মণ্ডলে কান্তিদেব নামক একজন রাজার অস্তিত্বের কথা আমরা জানিতে পারি।

৫। কান্তিদেবের চট্টগ্রাম তাম্রশাসন

চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত যতীন্দ্র-নাথ শিকদার মহাশয় চট্টগ্রাম সহরের বড় আখড়া নামক মন্দিরে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এই শাসনখানি আবিষ্কার করেন। ১৯২৩ সনে ইহা ঢাকা মিউজিয়ামের জন্য সংগৃহীত হয়। ১৯২২ সনের নভেম্বর মাসের মার্গারিটিউ পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই শাসনখানির একটি চিত্র প্রস্তুত পাঠ প্রকাশিত করেন। ইহা একখানি অসমাপ্ত তাম্রশাসন, ইহাতে রাজবংশাবলি অংশ আছে কিন্তু দামাংশ নাই। বর্ধমানপুর নামক রাজ-ধানী হইতে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব এই শাসনখানি প্রচার করিতেছেন। বর্ধমানপুর কোথায় ছিল অদ্যাবধি জানা যায় নাই। ইহাকে পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমানের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া কয়েকজন ঐতিহাসিক গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি Indian Historical Quarterly পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই শাসনখানির প্রাস্তম্ভান এবং হরিকেল দেশের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিয়া-ছেন। এই চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কান্তিদেব হরিকেল মণ্ডলের ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন, অতএব তিনি নিজেকে মহারাজা-ধিরাজ বলিয়া ঘোষণা করিতে স্পিধা করেন নাই। সমস্তের দেবখঞ্জও মহারাজাধিরাজ ও এই যুগের পরেই একশত বৎসর বা তাহারও অধিককাল ধরিয়া পূর্ব ভারতে রাজত্ব করিয়াছিল। কামরূপ রাজগণ দুর্লা হইয়া

* লোকনাথের পরে কাছাড় গ্রীহট্ট অঞ্চলের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। গ্রীহট্টের বিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসন জানা যায় ১১শ-১২শ শতাব্দি এই অঞ্চল গোবিন্দ-কেশব দেব নামক রাজা রাজ্য করিতেছিলেন। এটিপ্রাচীনা ইন্ডিকা, ১৯শ খণ্ড।

পাণ্ডাছিলেন। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কালে কামরূপে ভাস্কর বর্মের বংশের শাসন লুপ্ত হয় এবং স্লেচ্ছরাজ শালস্তম্ভ কামরূপ আধিকার করেন। ফলে পূর্ব ভারতে অরাজকতা ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার আর অবধি রহিল না। অবশেষে ৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি বৎসরে বাঙ্গালার উত্তম জনসাধারণ গোপালকে রাজা নির্বাচিত করিয়া পাল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিলে পূর্ব ভারতের এই ভয়ানক অবস্থা দূর হয়। লৌহিত্যের পূর্বে পাল বংশের শাসন প্রসূত হইয়াছিল কি না জানিবার কোন উপকরণ অব্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। হইয়াছিল বলিয়াই বর্তমানে ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ ৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রতিহার সম্রাট মহেন্দ্র পাল যখন প্রবল হইয়া বাঙ্গলা-বিহারব্যাপী পাল রাজ্য অধিকার করেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে লৌহিত্যের পূর্বে পারেও ভাির অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। রাজসাহী জেলায় পাহাড়পুর হইতে মহেন্দ্র পালের ৫ম বৎসরের লিপি পাওয়া গিয়াছে এবং মহেন্দ্র পাল-পুত্র মহাপালের দুইখানি লিপি ত্রিপুরা জেলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৬। মহাপালের বাঘাউড়া লিপি

মহাপালের লিপিবদ্ধ একখানি বিষ্ণু মূর্তি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ত্রিপুরা জেলার রাহুলগোড়িয়া মহকুমার বাঘাউড়া গ্রামে একটি পুন্ডরান পুকুর হইতে মাটি তুলিতে আবিষ্কৃত হয়। ঢাকার প্রমোদসাহসম্পন্ন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি-টি মহোদয়ের চেষ্টায় ১৯১৪ সনে ঢাকায় উহার ফটোগ্রাফ আনীত হয় এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত রাখাগোবিন্দ বসাক মহাশয় ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় মূর্তির পাদপটীকায় লিপির এক পাঠ প্রকাশিত করেন। পরের মাসে আনি এক সংশোধিত পাঠ প্রকাশ করি। পরে এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা পত্রিকার সন্তদশ খণ্ডে আমার এই পাঠ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লিপির মর্ম এই যে, মহাপালের তৃতীয় রাজ্যসম্বন্ধে সম্রাট বিলকিন্দক গ্রামনিবাসী বসুদন্ত পুত্র বণিক লোকদত্ত মাতা, পিতা ও নিজের পুণ্য ও যশোবর্ষ কামনায় এই নারায়ণভট্টরাক নামক কীর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই লিপির সহিত মহাপালের অপর লিপিস্থানও বিবেচ্য।

৭। মহাপালের নারায়ণপুর শিলালিপি

ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার মংলখানার অধীন নারায়ণপুর গ্রামে পুরানো পুকুর কালাইতে একখানি লিপিবদ্ধ গণেশ মূর্তি পাওয়া যায়। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার ১৩৫০, শ্রাবণের প্রবাসীতে এই লিপির পাঠ প্রকাশিত করিয়াছেন। লিপিস্থান মহাপালের চতুর্থ রাজ্যসম্বন্ধে অর্থাৎ ৯৯২

খ্রীষ্টাব্দের। সম্রাটের বিলকিন্দক গ্রামনিবাসী জন্মল মিথের পুত্র বণিক বসুদন্ত মিত্র মূর্তিখানি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

প্রথম লিপির বিলকিন্দক এবং দ্বিতীয় লিপির বিলকিন্দক নাম সাদৃশ্যে এক গ্রাম বলিয়াই মনে হয়। রাহুলগোড়িয়ায় কিছু পশ্চিমে রেল লাইনের ধারে বিলকিন্দয়া বলিয়া একটি গ্রাম আছে। এই গ্রাম ধনী বণিকগণের আবাসস্থল ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। কোন প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন আছে কি না অনুসন্ধান করি। সম্ভবতঃ এই গ্রামেরই দুইজন ধনী বণিকের কীর্তি এই দুইখানি লিপিবদ্ধ মূর্তি। এই লিপি দুইখানি সম্রাটের অবস্থান নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এইরকম আরও কত লিপি যে অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, কে জানে? ত্রিপুরা জেলায় যোগ্য ব্যক্তি নৈরুদ্বে পূর্ব ও পশ্চিমী প্রসঙ্গসম্বন্ধে চেষ্টা অনায়াস হয় নাই। পরলোকগত অনন্সকুলচন্দ্র রায় মহাশয় এই চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। কুমিল্লায় একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে, গ্রীকাইলে সম্প্রতি আর একটি কলেজ হইয়াছে। হাইস্কুলের তে অভাবই নাই। কিন্তু প্রস্তুত দরদ কোথাও দৌরভেদে না।

এই দুইখানি লিপি হইতে জানা গেল, খ্রীষ্টাব্দের ৯৯১ এবং ৯৯২তে ত্রিপুরা জেলা প্রতিহার মহাপালের উত্তর ভারতব্যাপী প্রকাশ সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ পাল রাজ্যের অন্তর্গত রূপেই, পাল রাজ্য প্রতিহার সম্রাটের পদনত হওয়ায় পাল রাজ্যের এই অংশও প্রতিহার অধিকারে চলিয়া গিয়াছিল। অবশ্য, তাহা নাও হইতে পারে। বৌদ্ধভারত পশ্চিম পার পশ্চিম অধিকার করিয়া প্রবল প্রভা প্রভিহার সম্রাট লৌহিত্যের পূর্ব পারস্ব পূর্ব ভারতের বাক অংশটুকুও অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন।

প্রতিহার সম্রাটের এই আঘাত হইতে পাল রাজ্য উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু ধর্মপাল-দেবপালের দিন আর ফিরিয়া আসে নাই। পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে পূর্ববঙ্গে তাহাদের প্রভাব একেবারে কমিয়া গেল। ভারেন্দ্র গ্রামে প্রাপ্ত মূর্তি লিপি হইতে জানা যায়, প্রতিহার শাসন লোপের পরেই চন্দ্র উপাধিধারী রাজগণের অধিকার ত্রিপুরা জেলায় বসুমূল হইয়াছিল। বগেও বিক্রমপুরকে রাজধানী করিয়া, এই যুগেই শ্রীচন্দ্রের বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮। লয়বচন্দ্রের তারেন্দ্র নটেশ্বর মূর্তিলিপি

এই লিপিস্থানির আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয়। ত্রিপুরা জেলার প্রায়সম্পদ উম্মারে বৈকুণ্ঠনাথ, অনায়াস অক্ষর উলোহসম্পন্ন। ১৯১১ সনে আমি কুমিল্লা কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া যাই, তখন বৈকুণ্ঠনাথ এই লিপির ছাপ

আনিয়া আমার হস্তে দেন। ইহা প্রতিষ্ঠা পত্রিকায় এবং ১৯১৪ সনের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় A Forgotten Kingdom of East Bengal নামক মদীয় প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় ১৯১৫ সনে আমার সংশোধিত পাঠ প্রকাশিত হয়। পরে এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা পত্রিকার সন্তদশ খণ্ডে ইহা আবার প্রকাশিত হয়।

এই লিপির মর্ম এই যে, শ্রীমঙ্গরহসঙ্গ দেবের অষ্টাদশ সন্তবৎসরে কীর্তিপাল গ্রীকসুদেবের পুত্র ভাবু দেব কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে পুন্ড্রা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে এই নটেশ্বর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অক্ষয় তত্ত্বের বিচারে এই লিপি ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের যুগের। জ্যোতিষিক বিচারে যে সম্রাট বৎসরে এই সম্রাট তিথি নক্ষত্র বারের মিলন হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দই এই লিপি সম্পাদন ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার বৎসর বলিয়া সম্ভবপর মনে হয়।

সমসাময়িক যুগে বগে বিক্রমপুর রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীচন্দ্র নামক নরপতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। শ্রীচন্দ্রের অব্যাবধি চারিখানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, দুইখানা ফরিদপুর জেলায় ইদিলপুরে এবং কোদারপুরে। দুইখানা ঢাকা জেলায়, রামপালে এবং ধুলা নামক গ্রামে। বংশধারা এইরূপঃ পুণ্ড্রচন্দ্র, তাহার পুত্র সুবর্ণচন্দ্র, তাহার পুত্র লৌলোকচন্দ্র। লৌলোকচন্দ্র ছিলেন “আধারো হরিকেলরাজককুদজ্ঞানিতানাথ প্রিয়াম”-হরিকেল রাজের রাজচিহ্ন। যে হয়, তাহা যে লক্ষ্মী স্মিতহাস্যে উভাসিত করিতেন, তাহার আধারবরূপ ছিলেন। এবং দিল্লীপের মত তিনি চন্দ্রবংশে রাজত্ব হইয়াছিলেন। তাহার পুত্র শ্রীচন্দ্র রাজা হইয়া পৃথিবী একাতপত্র করিয়াছিলেন।

ইহার পরে বগের আর একজন রাজার সংবাদ আমার জানিতে পারি। ইহার নাম গোবিন্দচন্দ্র। ঢোল সম্রাট রাজেন্দ্র ঢোল পূর্ব ভারত জয়ে আসিয়া ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কাজেই ১০২০ খ্রীষ্টাব্দের এখানে ওখানে ইহার রাজত্বকাল। গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত লিপিবদ্ধ দুইখানি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। একখানি সূর্যমূর্তি, হাতিয়া কি সোনাবংশে আবিষ্কৃত, বর্তমানে ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত। এইখানি গোবিন্দচন্দ্রের দ্বাদশ সন্তবৎসরে। অপরখানি বিষ্ণুমূর্তি ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পরগণায় বেতকা গ্রামে আবিষ্কৃত, বর্তমানে আউটশাহী গ্রামে রক্ষিত। এইখানি গোবিন্দচন্দ্রের ২০ সন্তবৎসরে প্রতিষ্ঠিত। গোবিন্দচন্দ্র ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী বৎসরে রাজত্ব আরম্ভ করিয়া ছিলেন বলিয়া ধরিলে তাহার পূর্ববর্তী

A New Home for an Old Quest

IT has always been a Goodyear working principle that nothing is good enough which can be made better.

And it has been Goodyear experience that the source of betterment is less often the materials used than what is done with them.

On this premise Goodyear since its earliest days has pursued research to advance the usefulness and value of its industrial rubber products and printing supplies.

It was this unrelenting quest for improvement which fathered the first cord-bodied transmission belt, the first vulcanized belt-splice, the first mile-long conveyor belt, the first asbestos cord steam hose, the first high-capacity dredging sleeves plus a host of other Goodyear advances.

During this past year Goodyear dedicated a new home for its scientific resources — what is believed to be in personnel, facilities and equipment

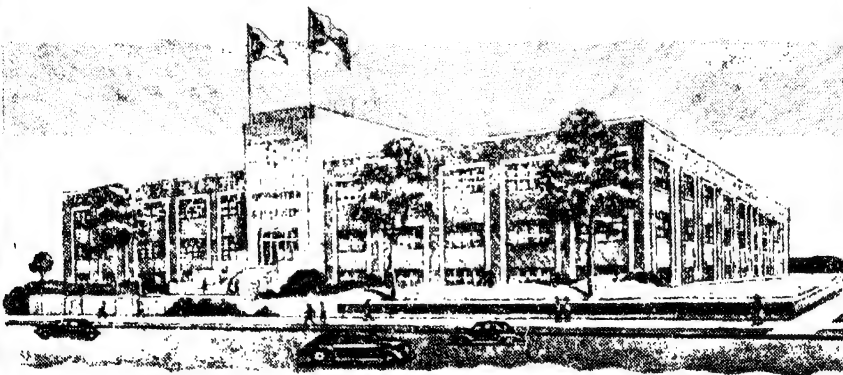
the finest laboratory for its purpose in the world.

Its bold and various activities now are concentrated on war products, but the lessons learned will inevitably insure greater service to industry when applied to the products of peace.

From the developments spurred by war, such possibilities are foreseeable as steel cable transmission belts, plastic glass, feather-light insulating materials, hundred-mile conveyor belt systems, plastic water pipes burstproof against freezing, metal-wood laminations for plane and car bodies, mildew-proof tents and awnings, synthetic latex cushioning, crashproof fuel tanks, and many like wonders on which we now are at work.

Firm in its purpose to stand forth always as "science headquarters" of the rubber industry, Goodyear aims to fulfil the promise "the best is yet to come."

PRODUCTS OF GOODYEAR RESEARCH



GOOD YEAR
THE GREATEST NAME IN RUBBER

রাজা শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরের সিংহাসনে ১৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে আরোহণ করেন।

শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে দেখা যায়, চন্দ্র উপদিগ্ধারগণের "রোহিতাগিরিভূজাং বংশঃ" বংশের আদি পুরুষ পূর্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রোহিতাগিরি লালমাই পাহাড় বলিয়াই বোধ হয়। কাজেই দেখা যাই-তেছে, লালমাই পাহাড়ের মালিক চন্দ্র উপাধি-ধারী এক রাজবংশ প্রায় ১০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই অঞ্চলে রাজা হইয়া বসিয়া-ছিলেন। লয়হচন্দ্র এই বংশেরই একজন ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার অষ্টাদশ সম্বৎসর হইলে, তিনি ১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রোহিতাগিরির সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং এই বংশেরই এক শাখার বংশধর প্রায় সমকালেই বঙ্গে বিক্রমপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের মানচিত্র দ্রষ্টব্য। পাহাড়শ্রেণীর মাঝামাঝি স্থানের কিঞ্চিৎ উত্তরে, বড়ুরাগামী রাস্তা যেখানে পাহাড় পার হইয়াছে তথায়, পর্বতের উপরে বেশ বিস্তৃত সমতল স্থান আছে। তথায় কোটবাড়ী বলিয়া পরিচিত সমচতুর্কোণ ধ্বংসস্থূপের শ্রেণী আছে। সম্ভবতঃ এই স্থানেই ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে একথানা তাম্রশাসন পাওয়া যায়। রাস্তা প্রস্তুতকালে এই ধ্বংসস্থূপের মধ্য হইতে অনেকগুলি পাথরের মূর্তি পাওয়া যায়। এই স্থানেই কিছুদিন পূর্বে ইটের জন্য খুঁড়িতে যাইয়া সামরিক পুতলিভাগের ঠিকাদারগণ মন্দিরের ভূনাবশেষ এবং বহু ধাতব মূর্তি ও আরাবানী মূর্তা এবং পট্টিকেরা নামাঙ্কিত মূর্তা আবিষ্কার করে। উহাদের মধ্য হইতে একখানি ধ্যানীবৃদ্ধ মূর্তি ঢাকা মিউজিয়মে সংগৃহীত হইয়াছে। এই স্থানে পর্বতশীর্ষে দুর্গাদি দ্বারা সুদৃষ্টিতে ছোটখাটো একটি সহর যে ছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পাহাড়ের সমস্ত পশ্চিম প্রান্তে জড়িয়া ৮।১০ মাইল পর্যন্ত পাটিকারা পরগণা বর্তমান। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয়, পর্বতশীর্ষে এই ধ্বংসস্থূপ ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে বিখ্যাত প্রাচীন পট্টিকেরা নগরীর। ফুসে সাহেব ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা যে অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞা-পারমিতার পুঁথি হইতে সেই আমলের প্রসিদ্ধ বোধি দেবদেবীর তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে

"পট্টিকের চুল্লবরভবনে চুন্দা" দেবীর উল্লেখ এবং ছবি দেওয়া আছে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানাও পট্টিকেরা নগরের উল্লেখ আছে।

৯। রণবৎকমল শ্রীহরিকাল দেবের তাম্রশাসন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ময়নামতী পাহাড়ের উপর দিয়া রাস্তা তৈয়ার করিবারকালে ইহা পাওয়া যায় এবং ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট মিঃ ইলিয়ট উহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। পণ্ডিত কোলব্রুক সাহেব ১৮০৭ সনে ইহার পাঠ প্রকাশিত করেন। ১৯২৯ সনে মদীয় Iconography পুস্তকে আমি দেখাই যে, এই শাসনে পট্টিকেরা নগরীর উল্লেখ আছে, কোল-ব্রুক পড়ার ভুলে উহা ধরিতে পারেন নাই। ১৯৩০ সালের ইন্ডিয়ান হিষ্টরিকেল কোয়া-টার্লি পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই শাসনখানির সংশোধিত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই শাসনখানি দ্বারা রাজা রণবৎকমল শ্রীহরিকাল দেবের সপ্তদশ সম্বৎসরে ১১৪১ শকব্দে তাহার মন্ত্রী ধাড়ি-এব পট্টিকেরা নগরে দুর্গোত্তারা মন্দিরে বেজবুড় গ্রাম হইতে ২০ প্রাণ ভূমি দান করেন। ১১৪১ শক=১২১৯—১২২০ খ্রীষ্টাব্দ। কাজেই হরিকাল দেব ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে পট্টিকেরা সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দেই পট্টিকেরা চুন্দাবৌ বিখ্যাত হইয়াছিলেন দেখিয়া ঐ সময় হইতেই বা তাহারও পূর্বে আমরা পট্টিকেরা নগরের অস্তিত্ব জানিতে পারি। সম্ভবতঃ রোহিতা গিরিভাগকারী চন্দ্ররাজগণ পট্টিকেরাতেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পট্টিকেরা রাজ্যের করণ ও রৌদ্রসপুর্ন ইতিহাস এই যুগের ব্রহ্মদেশের ইতিহাসের সহিত যুক্ত।

ব্রহ্মরাজ ক্যানজিট্টার (১০৮৪—১১১২ খৃঃ) পরমাসুন্দরী একমাত্র কন্যার নাম ছিল মোয়ে-ও-খি। পট্টিকেরা রাজকুমারের সহিত তাহার প্রণয়ের ফলে যে শিশু জন্মগ্রহণ করে, তিনিই ব্রহ্মদেশের বিখ্যাততম রাজা অলংশিশু (১১১২—১১৮৭ খৃঃ)। অলংশিশু পট্টিকেরা রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া চলিতেন এবং স্বয়ং এক পট্টিকেরা রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে অলংশিশু পুত্র নরধু (১১৮৪—১১৯১ খৃঃ) দ্বারা নিহত হন। নরধু স্বহস্তে বিমাতা পট্টিকেরা রাজকুমারীকে

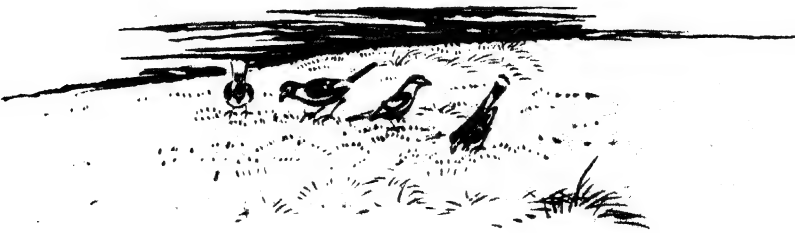
বধ করেন। মর্মাহত পট্টিকেরারাজ প্রেরিত দুঃসাহসী আটজন বীরের হস্তে নরধু নিহত হন এবং হরিকাল দেবের রাজ্য প্রাপ্তির মাত্র দশ বৎসর পূর্বে পট্টিকেরা বীজগণ এই অশ্রুত প্রতিহিংসা গ্রহণ কার্য সমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মরাজ-ধানী পেগানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সামরিক পুত্ৰ বিভাগের খননের ফলে ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের শিখরে শিখরে অসংখ্য প্রাচীন কার্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন পট্টিকেরা নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রাচীন মূর্তি ও মূর্তা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রায় বিভাগ কর্তৃক এই সমস্তের সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইলে পট্টিকেরা প্রাচীন ইতিহাস নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠবে, সন্দেহ নাই।

পট্টিকেরা দক্ষিণে চট্টগ্রাম অঞ্চলেও যে এই সময় আর একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য বিদ্যমান ছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

১০। দামোদর দেবের তাম্রশাসন।

অদ্যাবধি দামোদর দেবের দুইখানি তাম্র-শাসন পাওয়া গিয়াছে। প্রথমখানি পাওয়া যায় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, চট্টগ্রাম সহরের নিকট নসিরাবাদ গ্রামে। ইহার তারিখ ১১৬৫ শকাব্দ বা ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। বংশধারা এইরূপে:— পুত্রমোহন, মধুসূদন, বাসুদেব, দামোদর। দ্বিতীয় শাসনখানি পাওয়া যায় ত্রিপুরা জেলার মেহার গ্রামে। উহা দ্বারা সমস্ত মন্ডলে মেহার গ্রামে ভূমিদান করা হইয়াছে। উহার তারিখ ১১৫৬ শকাব্দ, রাজ্যের চতুর্থ সম্বৎসরে প্রদত্ত। কাজেই দামোদর ১১৫৩ শকাব্দ বা ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হইয়াছিলেন। মেহার পর্যন্ত ইহার অধিকার বিস্তৃত দেখিয়া মনে হয়, এই সময় সম্ভবতঃ পট্টিকেরা রাজবংশ লুপ্ত হইয়াছিল কারণ, মেহার হইতে পাটিকারা অল্পই দূরে। দামোদর দেবের উপাধি ছিল অরিরাজ-চান্দ-মাধব ইহার অল্প পরেই আমরা সম্ভবতঃ এই বংশেরই অরিরাজ দনুজমাধব উপাধিধারী দশরথ দেবকে বিক্রমপুরের সিংহাসনে উপনিষ্ঠ বোধিতে পাই। এই সময়ের পূর্বে লৌহিত্যের পশ্চিম পার হইতে সেন বংশের শাসন লুপ্ত হইয়াছিল। দশরথ দেব লৌহিত্যের দুই পার্শ্বের সমস্ত ভূমি,—ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ,—মিলাইয়া একটি বৈশ প্রবল প্রতাপ রাজা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।



শ্রীশ্রীকৃষ্ণেশ্বরী মাতার প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত

কৃষ্ণেশ্বরী কবচ

পূরুষের সিন্ধু প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি ও চর্যাদেশের অপূর্ণ সম্মিলন। ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে মন্ত্রপূত কবচ ধারণে মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকরী প্রাপ্তি, কার্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি সৌভাগ্য লাভ, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি, শত্রুদিগকে বশীভূত করা ও পরাভূত করা, কলহেরা, বসন্ত, শ্বেলগ, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারীর হাত হইতে আত্মরক্ষা ও অকালমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ অনায়াসে করা যায়। বন্দ্যমানারী পুত্রবর্তী হয়, ভৃত, প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ, চোর ও অশ্বিনভয় হইতে রক্ষা পাইবার রহস্যমন্ত্রস্বরূপ ইহা ধারণে কৃপিত গ্রহ সন্তোষ হয় এবং অতি দরিদ্রও ধনবান হইয়া থাকেন। পর লিখিলেই ধারণের নিয়মাবলী পঠান হয়।

পূরুষকার—ও দৈবী শক্তির অধীন বলিয়া সকলেরই ইহা ধারণ করা কর্তব্য।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণেশ্বরী মাতার মন্দির
বেদনাধ ধাম, কুন্ডা পোতা, (এস পি)।

অবফ্যানের

চা

স্বাদে - তৃপ্তি দেয়
গন্ধে - আনন্দ দেয়
দোহে - লাভ্য ফোটায়ে



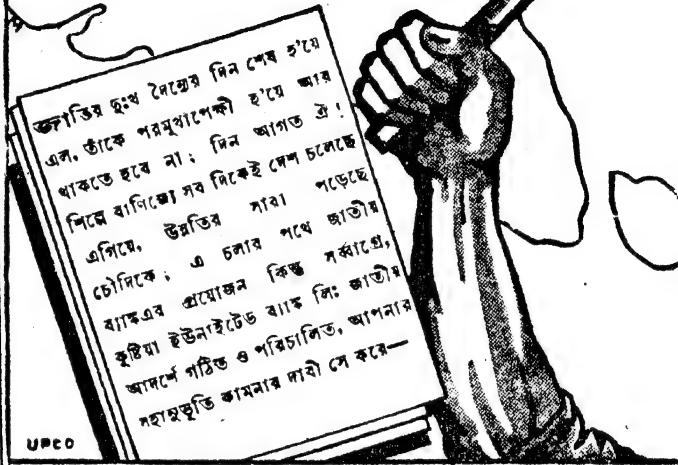
অবফ্যান টি কোং

টি মার্কেট ১৩ কমিশন এজেন্ট

১৮, রাজা উডমন্ট ষ্ট্রীট

কলিকাতা

১০৩, আগুতোর দুখাড়ী বাড়ি কলিকাতা
১০০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা
৭৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা
২০/১, নানবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

দিন-
আগত ঐ

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড
লিমিটেড

২৫ অক্টোবর - ২৯, প্লাট রোড, কলিকাতা।

আমানতের হার ও সর্বদা সন্নিধানক
ব্যবসায়ীদিগকে সকল প্রকার সন্নিধান দেওয়া হয়।

Gram:—Jatiadhan

::

স্থাপিত : ইং ১৯৩৬

শাখা সমূহ

বাংলা
কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, চর-
মুগদুরিয়া, বেরহামগঞ্জ,
গোপালগঞ্জ, বড়বাজার
(কলিঃ), উল্টাডাঙ্গা
(কলিঃ), বরিশাল, ঢাকা,
নারায়ণগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ

বিহার
পাটনা, আরা, ছাপরা
ও মজঃ ফর পুর,
বেনারস (ইউ, পি)

শীঘ্রই ভারতের প্রধান প্রধান ব্যবসায়িক শাখা খোলা হইতেছে।

ডাঃ জে সি চক্রবর্তী—চেয়ারম্যান

কনকভূষণ মদ্যার্জি—ডিরেক্টর-ইন-চার্জ, ওয়েস্টার্ন সার্কেল

মিঃ বি বি রায় চৌধুরী

ডিরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার

মিঃ বিমল রায় চৌধুরী

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

তোদবিণী

প্রেমাক্ষুর আত্মী

ভা ৫ মাসের এক পড়ন্ত বেসায় খাল-ধার দিয়ে বাড়ি ফির ছিলুম। কদিন থেকে বৃষ্টি বন্ধ, দারুণ চাপা গরমের জন্য শহরবাসীদের ওপর দিয়ে তাপসহনশীলতার যে পরীক্ষা লান তরই একটি মহলা চলেছিল। ঘামে আর খাল-ধারের মেটে স্তর ধুলায় অঙ্গটি পচা ভাদ্রের একটি বিশিষ্ট সংস্করণ হয়ে গেছে, এমন সময় আকাশের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল।

দেখতে দেখতে মিনিট কয়েকের মধ্যেই সারা শহর অন্ধকার হয়ে গেল। বরষতে দৃষ্ণ আছে ভেবে দৌড়ে হাটা শুরু করলুম, কিন্তু বাধা চেষ্টা! কিছুদূর যেতে না যেতে মঘলধরে বৃষ্টি গমে গেল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হোয়ে আশ্রয়ের চেষ্টায় মারলুম



ভিখারিণী আবার বসে—কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!

দৌড়। শেষকালে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে এক খোলার চালের বাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়া গেল।

যে জায়গাটায় এসে আশ্রয় নিলুম সেখানে আরও দু-চার জন রাহীলোক দাঁড়িয়েছিল। একটা বড় খোলার চালের বাড়ি, রাস্তার ধারে চালাটা খানিকটা বের করা আর খোলা—তারই নিচে মাথা গুঁজে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলুম। মাথা বাঁচল বটে, কিন্তু জলের ছাঁটে সর্বাঙ্গ ভিজতে লাগল আর মাঝে মাঝে দম্কা বাতাস আত্মসম্প্রদায় ওপরে বলাৎকার শুরু করে দিলে।

অন্যন্যপায় হোয়ে কাক-ভেজার আনন্দ উপভোগ করতে লাগলুম। বৃষ্টির ছাঁট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার আশে-পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা একে একে সরে পড়তে লাগল। আমার বাড়ি অনেক দূরে—বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়া সুবিবেচনার কাজ হবে না, কাজেই স্থির করা গেল জল না ধামলে নড়ব না।

এতক্ষণে আমার আশ-পাশের চারদিকে ভাল করে দেখবার সুযোগ হোলো। গলিটা বেশ চওড়া—দুখানা গরুর গাড়ি পাশা-পাশি যেতে পারে। গলির দুধারেই খোলার বাড়ি, একেবারে শেষ অবধি।

দেখলুম আমার সামনেই রাস্তার ওপাশে আর একখানা খোলার বাড়ির গা ঘেঁষে এক ভিখারী বসে অবিশ্রান্ত চোঁচিয়ে ভিক্ষা চাইছে। লোকটি অন্ধ। মাথায় লম্বা চুল ও মুখের লম্বা দাড়ির অধিকাংশই পাকা। হিন্দুস্থানী ভাষায় সে চাটাজিল—সে আফগানের মধ্যে আছা ও খোদার বাহুদা শব্দে মনে হোলো সে বাস্তি মুসলমান।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলেছে; বৃষ্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সাহসের সেই অন্ধ ভিখারীও অবিশ্রান্ত চীৎকার করছে। কখনো বা বৃষ্টির শব্দ তার আওয়াজকে ঢেকে ফেলছে কখনো বা তার কণ্ঠস্বর বৃষ্টির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছে। আমি এ পারে দাঁড়িয়ে ভিজো ভিজো লোকটির কৃচ্ছ্রসাধনা দেখছি আর মনে মনে গবেষণা করছি, আছা ওরফে খোদা হিন্দুস্থানী ভাষা বন্ধুতে পারে কি না!

বেলা পড়ে আসতে লাগল। ক্রমে রাস্তা জনবিরল হয়ে পড়ল। বৃষ্টিধারা কখনো একেবারে কমে আসে কিন্তু আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করলেই আবার চোপ আসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জল-সন্মাদিস্থ হওয়ার চাইতে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বেরিয়ে পড়া প্রায়ঃ এই রকম একটা সংকল্প মনে মনে দৃঢ় করবার চেষ্টা করছি এমন সময় আমার কাণের কাছে করুণ কণ্ঠে আনাদের জাতীয় সঙ্গীত ধ্বনিত হোলো—কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!

চমকে পাশে চেয়ে দেখি একটি মোরে! বয়স তার বাইশ-তেরিশ বছর হবে, রংটি ফিকে মোঘের মত মালো। একখানা ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত। শাড়িখানা ভিজো গায়ের সঙ্গে একেবারে জেলেটে গিয়েছে, তার ছিদ্র অবকাশ দিয়ে উত্তমাপের প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে। অঙ্গ তার ভিখারিণীর মত কুশ নয় বেশ সুপুষ্ট—বিশেষজ্ঞের চোখে প্রথমেই তা ধরা পড়বে। সমস্ত দেহে এমন কর্মনীয়তা ও লাভণ্য যে রাস্তা দিয়ে চলে গেলে ফিরে চাইতে হয়, পাশে এসে দাঁড়ালে তো কথাই নেই।

ভিখারিণী আবার বলল—কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!

দেখলুম সে থর থর করে কপিছে।

বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করব কিনা ভাবছি এমন সময় আবার সে বলে উঠল একটি পরসে ভিক্ষে দাও বাবা।

এবার তার চোখে চোখ পড়ল। চোখ দুটি এমন কিছু সম্পন্ন নয়; কিন্তু কি অশ্রুত চাহনি সে চোখে! এমন করুণ দৃষ্টি আমি জীবনে দেখিনি। হস্তশ্রী মালগের এক কোণে জগল পরিবেষ্টিত নিজস্ব স্বচ্ছ পৃষ্কারিণীর ধারে বসে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে ধরণীর যে মর্মব্যথা সেই কালো জলের বৃকে ফুটে উঠতে দেখা যায়,

যুদ্ধোত্তর শিল্প-বাণিজ্য

যুদ্ধান্তে ভারতের সর্ববিধ শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণে যথেষ্ট সুযোগ আসিবে। বস্তুতঃ ইতিমধ্যেই দেশীয় শিল্প উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতেই এদিক হইতে জাতির অর্থনৈতিক জীবন বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইবে।

যুদ্ধোত্তর শিল্প-বাণিজ্য গঠনে মূলধন সংগ্রহের জন্য এখন হইতেই দূরদর্শিতার আবশ্যিক। 'সিটি ব্যাংক' এযাবত বহুসংখ্যক জাতীয় শিল্পের মূলধন যোগাইয়া আসিতেছে এবং সুদক্ষ পরিচালনাধীন যুদ্ধোত্তর শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদনপত্রাদি বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছে।

সিটি ব্যাংক লিমিটেড

৬নং ক্লাইভ স্ট্রীট : কলিকাতা।

চেয়ারম্যানঃ যোগেশ চন্দ্র সরকার

ম্যানেজারঃ শিশির কুমার বিশ্বাস

তার চোখ দুটিতে যেন সেই বাধা স্থির হয়ে আছে। কোনো প্রশ্ন না করে একটা পরস্য পকেট থেকে বের করে তার হাতে দিলুম।

ওপরে সেই অশ্ব বৃন্দ তখনো তারম্বরে খেদাদকে আবেদন জানাচ্ছে, ব্যুটিখারা সমানে চলেছে; মেঘমন্ডিত স্মৃতিমিত সূর্যালোক আমার চারিদিকে অলৌকিক মায়াজাল বিস্তার করতে লাগল।

পাশের মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলুম, আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে।

তার সঙ্গে আমি যে কথা বলতে চাই, তার সম্বন্ধে জানতে চাই তা বুদ্ধিতে পেরে আমার কাছ থেকে সে বেশ একটু দূরে সরে নড়ল। তারপরে হঠাৎ ব্যুটি মাথায় নিয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে সেই অশ্ব বৃন্দের হাতে পরস্যাটা দিয়ে সামনের খোলার বাড়িটার ভেতর ঢুকে গেল।

ব্যাপারটা অশুভত ঠেকল। মনে হোতে লাগল, ঐ মেয়েটা বোধ হয় ঐ বড়েরই কেউ হবে, চারদিক থেকে ভিক্ষা করে নিয়ে এসে বড়ের কাছে জমা দেয়। ঐ বাড়িটার মধ্যেও সে নিশ্চয় ভিক্ষা করতে চুকেছে—ব্যাপারটা শেষ অবধি দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম।

ব্যুটি সমানে চলেছে। ওর মধ্যে কখনো চেপে আসে কখনো বা প্রায় থেমে যায়। সম্বোধন হোয়ে এলেও মেঘ কটে যাওয়ার তখনো একটু আলো আছে। বাম্ব ভিখারীর চীৎকার একটু মন্দা পড়ছে, বোধ হয় সারাবিন চোঁচিয়ে এবার তার দম ফুরিয়ে এসেছে। আমি একদৃষ্টে সেই খোলার বাড়ির দরজার দিক চেয়ে আছি।

হঠাৎ দেখলুম একটা স্ত্রীলোক সেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে দরজার ধারের বাঁধানো রকের ওপর এসে বসল। চারদিকের মতন কোনো আর রোগা, দমদম সাদা একখানা চওড়া শাড়ি পরা চুল বাঁধার বাঁধার দেখেই বুদ্ধিতে পারলুম কে সে কেন ওখানে বসে আছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে আর একটা স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে রকে বসল। আমি যে বাড়িটার ধারে দাঁড়িয়েছিলুম, দেখলুম সেখানকার বরজাতেও দু-চার জন স্ত্রীলোক এসে জমা হয়েছিল। অশ্বকার ঘোর ঘোর আগ্নেই তারা বেসানি খুলে বসল দেখলুম ওপরের সেই অশ্ব বৃন্দও তার জায়গা ছেড়ে উঠে লাঠি ছুঁকতে ঠুকতে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত যেন তা যেতেই দেখলুম আমার সেই দয়াময়ী ভিখারিণী পরিষ্কার কাপড় পরে সেই দরজায় এসে দাঁড়াল। বোধ হয় এই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে ব্যুটিও একবারে থ থেমে গেল।

সংসারে আশ্চর্য ব্যাপারের অভাব নেই। শহরে যারা চোখ চোখে বাস করে অনেক আশ্চর্য ব্যাপারই তাদের কাছে অতিসাধারণ হয়ে ওঠে, তবুও এই ভিখারিণীর ব্যাপারটা আমার কাছে অশুভত ঠেকল। আমি স্থির করলুম তার সম্বন্ধে জানতেই হবে।

জামাটা গা থেকে খুলে নিড়ে কাঁধে ফেলেছিলাম। সেই অবস্থাতেই রাস্তা পার হোয়ে ভিখারিণীর কাছে গিয়ে দরদস্তুর করে একবারে তার ঘরে গিয়ে উঠলুম।

ঘরের ভেতরকার আসবাবও তৈজসপত্রের বিবরণ আর দোব না। বাঙালী পাঠক-পাঠিকারা সে বিবরণ বহুবার অন্যত পাঠ করেছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম তোমার নাম কি?

—আদরিণী, আংরি বলে সবাই ডাকে।

ঘরের মধ্যে একটা ডিটমারের আলো জ্বলছিল, আদরিণী তার পশ্চাতে একটু ব্যুটিয়ে দিয়ে আমার কাছে এসে বসল।

জিজ্ঞাসা করলুম—আমাকে চিনতে পারছ?

প্রশ্ন শুনেই আংরি হাসতে আরম্ভ করে দিলে। হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করার সে বলে—আঁহা কত চমৎত জান! আজ কি নেশা করা হয়েছে শার্মি?

এই বলেই সে ভিজ্জ জামাটা আমার কাঁধ থেকে তুলে নিয়ে বলে—দাঁড়াও উল্লসের ঘরে এটাকে টাঙিয়ে দিবে আমি—একদৃষ্ট

শুকিয়ে যাবে।

আদরিণী জামাটা আমার হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম, কি জানি বেপোটা জায়গায় এসে আজ জামাটাই কি আক্কেল সেলামী দিতে হয়। কিন্তু তখনই সে ফিরে এসে বলে—একদৃষ্ট শুকিয়ে যাবে।

তারপরে আমার ব্যুটিতে হাত দিয়ে বলে—এঃ ব্যুটিও যে ভিজ্জ গিয়েছে। একখানা শাড়ি পরে ওটা খুলে দাও, শুকোতে দিয়ে দি।

সে উঠে গিয়ে আলনা থেকে একখানা চিরকুট ময়লা শাড়ি নিয়ে এসে বলে—নাও ওটা ছেড়ে ফেল।

ব্যুটিখানা আর বেহাত করবার ইচ্ছা ছিল না। বললুম—ও এখনি গায়েই শুকিয়ে যাবে। তুমি একটু স্থির হোয়ে বোসো তো, তোমায় গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করি!

শাড়িখানা ছুড়ে একপাশে ফেলে দিয়ে সে আমার গা ঘেঁষে বসে বলে—বল।

আবার জিজ্ঞাসা করলুম—ঠিক করে বল তো আমায় চিনতে পারছ কি না?

—তুমি তো মোড়ের ঐ বাঁশগোলায় কাজ কর। আগে দু-তিনবার এসেছিলে।

একটু রসিকতা করবার লোভ সামলতে পারলুম না—বললুম—ছেলেবেলা থেকে বাঁশের সংগ ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও ঠিক বাঁশগোলায় কখনো কাজ করিনি।

রসিকতাটা ঠিক বুদ্ধিতে না পেরে আদরিণী হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি বললুম—দেখ তোমার কাছে একটা বিশেষ কাজ এসেছি। গোটাকতক কথার ঠিক উত্তর দিতে হবে—আমার অন্য কোন মতলব নেই, অবিশ্যি তোমার যা প্রাপ্য তা দোষ ভয় নেই।

আমার কথা শুনে আদরিণী ভয় পেয়ে গেল। সে আমার চোখে গা ঘেঁষে বসেছিল, বেশ বুদ্ধিতে পারলুম অতি সন্তর্পণে আমার স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছে। হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে সেই দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—আপনি কি পুলিশের লোক? বাবা আমি কোনো দোষ করি নি, আমার ওপর কোনো অত্যাচার করবেন না, আমি আপনার মেয়ে—মেয়েকে রক্ষা করুন।

এই বলে সে আমার পা দুটো চেপে ধরলে।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লুম। কেন সে আদরিণী অতখানি বাড়িবাড়ি করলে, তা বুদ্ধিতে পারলুম না। তাকে অভয় ও সাধনা দিয়ে বললুম—আমি মোটেই পুলিশের লোক নই বরং আমার দ্বারা যদি তোমার কোনো উপকার হয় তো বল আমি তা করতে চেষ্টা করব। তুমি বড় ভাল মেয়ে। তোমার মনের একটু পরিচর পেয়েছি বলেই তোমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি—তোমার কোনো ভয় নেই।

আদরিণীর মুখে হাসি ফুটল। অস্বাস পেয়ে সে আবার 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরলে। বলে—আমি তোমার মেয়ে, তুমি আমার বাবা।

এই বলে সে আমার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলে—বাবার বয়েস কত? —তেইশ বছর।

আদরিণী খিল খিল করে হেসে উঠে বলে—বেশ তোমার বাপ আর মেয়ে একই বয়সী। আমারও তেইশ বছর বয়েস বাবা।

ঠিক এই সময় আমাদের চমকে দিয়ে ঘরের বাইরে কে কণ্ঠস্বর দিলে—কে রে! কার সঙ্গে অমন মস্করা হচ্ছে! কে এয়েছে?

আদরিণীর হাসি থেমে গেল। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বলে উঠল—তোমার বর এয়েছে। রাস্তা থেকে তোমার বর নিয়ে এয়েচি—আর না ভেজ্জের।

সকল ধাক্কা দিয়ে এক নারী ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমার মনে

শারদোৎসবে

ছেলেমেয়েদের সন্তুষ্ট করিতে
বড়ুয়া কেক, পাউরুটী
ও বিস্কুটই
শ্রেষ্ঠ।



দেখিয়া লইবেন।

বড়ুয়া বেকারী

অফিস ও ফ্যাক্টরী:

১২৩নং ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা।

এই ক্রমোন্নতি ও তীব্র প্রতিযোগিতার দিনে যদি কৃতকার্য হইতে চান, তবে পূর্ণোদ্যমে কাজ করিতে হইবে, হেলাছলে করিলে চলিবে না। আপনাকে সর্বোৎকৃষ্ট হইতে হইবে। বিজয়মালা একমাত্র কৃতীরই প্রাপ্য। উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে হইলে আপনাকে সাধারণের উপরে উঠিতে হইবে। সেইরূপ এই ব্যাংকও ইহার অত্যুৎকৃষ্ট কর্মক্ষমতা, পরিচালনা সম্পর্কে নিজস্ব নীতি এবং পৃষ্ঠপোষক-বর্গের সাহিত সৌহার্দপূর্ণ আচরণ দ্বারা সাফল্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছে।

ব্যাংক অব্ কমাস লিঃ

(সিডিউলভুক্ত)

১২নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহঃ—কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর,
বর্ধমান, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর ও ঢাকা।



কুসুমপেলব কুন্তলরাজি। আপনার সৌন্দর্য
বৃদ্ধি ও অক্ষুন্ন রাখার জন্য অবশ্যই কিনিতে
চলিবেন না—

কামিনীয়া অয়েল

(রোজিঃ)

খাঁটি বনজ গাছগাছড়া সহযোগে প্রস্তুতবিধায়
উহা সর্বপ্রকার শিরঃরোগের মহৌষধ। ইহা
কেশমূলের পুষ্টিসাধন করে, চুলপড়া বন্ধ
করে এবং উহার সুদৃষ্টি গন্ধে মন প্রফুল্ল
পাকে।

নারী সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ গৌর

কামিনীয়া অয়েল

ইহা অত্যুৎকৃষ্টবিধায় দেশের সর্বত্র সমাদৃত,
শত শত প্রশংসাপত্র, সার্টিফিকেট অব্
মেরিটস্ এবং স্বর্ণপদকাদি পাইয়াছে।



সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে মণি— অটো দিলবাহার

উহা একটি সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ বলিয়াই
পৃথিবীর সর্বত্র উহা সমাদৃত হইতেছে।
আপনার রুমালে মাত্র কয়েক ফোটা দিলেই
ভেইজীং জুইফলের স্থায়ী গন্ধে আপনার
মন-প্রাণ মাতোয়ারা হইবে। চারি আনার ডাক-
টিকিট পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা পাঠান
হয়।

কামিনীয়া স্নো

সুখমামণ্ডিত মুখশ্রী

লাভ করা যায় একমাত্র
স্বকের যথাযথ যত্ন দ্বারা

ভারতবর্ষে সকলেরই মুখমণ্ডলকে তীক্ষ্ণ
রৌদ্র, ধূলিবাণি, উত্তপ্ত বায়ু, প্রচণ্ড বাতাস
ইত্যাদির সম্মুখীন হইতে হয়, এজন্যই স্বকের
যত্ন লওয়া অত্যাৱশ্যক। কামিনীয়া স্নো
রৌদ্রদংশ ঝক, রূপ, মেচেতা ও অন্যান্য সর্ব-
প্রকার স্বকের সৌন্দর্যনাশক উপসর্গাদি দূর
করিতে অম্বিতীয়। আপনার স্বকের সৌন্দর্য



নিখুঁত রাখিতে
হইলে, বাহির
হওয়ার পূর্বে
ও বাহির হইতে
আসিয়া কয়েক-
বার উহা
মাশিশ করা
উচিত।

সর্বত্র পাওয়া
যায়।

সোল এজেন্টস্—

এংলো-ইন্ডিয়ান ড্রাগ এন্ড কেমিক্যাল কোং, বোম্বাই ২।

হোলো দীনবন্দু! মিস্তরের 'জগদম্বা' বন্ধি নাটক থেকে উঠে
এল।

আদরিণী বলে—দেখ তোর জন্যে কেমন বর জুটিয়ে
এসেছি।

তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—কি বাবা পছন্দ হয়?

—মুখে আগুন! দিনে দিনে কত রঙই হচ্ছে! নে নে
আনখোতা রেখে শীগগির কর। আবার লোক আসবে—

এই বলে স্বামীলোকটি বেরিয়ে গেল। আমি হাঁপ ছেড়ে
বাকলুম।

আদরিণী হাসত হাসতে বলে—কেমন বাবা, পছন্দ হয়েছে
আমার মাকে?

জিজ্ঞাসা করলুম—উটি কি তোমার মা নাকি?

আদরিণী অন্যদিকে মুখ করে সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে ঘর
থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই আমার জামাতা হাতে নিয়ে সে ফিরে এল।

খেললুম আমার ধপধপে

নাদা সিল্ক টাইলের

সাঁট ধোঁয়ায় প্রায় কাল

হয়ে গিয়েছে আর তা

থেকে মাছের খোল আর

ধোঁয়ায় মিলিয়ে এমন

একটা বিকট গন্ধ

বেরুচ্ছে যে, গায়ে

দেওয়া দূরের কথা,

চোঁকে কাছে রাখলে

বমি তেলে আসে।

জামাতাকে গুঁড়ি রে

পাশে রেখে বললুম—

ঠিকতা তো খুব

হোলো, এবার আমার

কথার জবাব দাও

দিকন।

—কি বল?

—আমার কাছ থেকে

একটা পরসা চেয়ে নিয়ে

ঐ যে অশ্ব বড়োটা

দিলে, ও তোমার কে

হয়?

আদরিণী কি ছু ফণ

অবাক হোয়ে আমার

মুখের দিকে চেয়ে

থেকে বলল—ও তুমিই

বন্ধিছ!

—কে হয় ও বড়োটা তোমার?

—কে আবার হবে! ও তো মোচোলমান।

—তবে?

আদরিণী কোনো কথা বলল না, চুপচাপ মাটির দিকে চেয়ে
বসে রইল।

বললুম—তোমার তো অভাব কিছুই দেখছি না, তবে তুমি
ভিক্ষাবৃত্তি কর কেন? আর কার জন্যেই বা কর?

আদরিণী চট করে উঠে দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বাইরের
দিকে কি দেখে ফিরে এসে বলল—বাবা, আজ তুমি বাড়ী যাও, বস্তু

দেঁরি হয়ে গিয়েছে—বলব—তোমাকে আমার সব কথা বলব, কিন্তু
আজ নয়—কবে আসবে বল?

—আবার আসতে হবে?

—নিশ্চয় আসতে হবে। জুলো না, আমি তোমার মেয়ে।

তোমরা কি জাভ?

—জাতীয়া আমি জানি না, তবে আমার শরীরে ব্রাহ্মণের
রক্ত আছে, এইটুকু বলতে পারি।

—কি গোস্বর?

—ভরম্বাজ।

—তোমার ভরম্বাজের দিবা রইল—পরশ্ব এস।

আদরিণীর বাবা ছিল ব্রাহ্মণ। বাঁকুড়ার কোন এক গ্রামে
তাদের বাড়ি ছিল। কলকাতায় সে রসুইয়ে বাবুদের কাজ করত।

লোকের বাড়ি পূজা ও বিয়ে ইত্যাদি উৎসবে কাজ করে সে বেশ
দু-পরসা উপার্জন করত। পরিবার থাকত দেশে, কিন্তু আদরিণীর

যখন সাত বছর বয়েস, তখন তার বাপ তাকে ও তার মাকে কলকাতার
নিয়ে এসে এই বাড়িতে তুলে। বছরখানেক যেতে না যেতে তার এক

ভাই জন্মাল, আর তার ফলে তার মা মারা গেল। বাপের সঙ্গে আগে
থাকত এই বাড়িউল্লর প্রণয় ছিল, মা মারা যেতে সে খোলাখুলিভাবেই

ঐ মেয়েমানুষটির সঙ্গে ঘর করতে লাগল। আট বছরের আদরিণী

তার মা-মরা ভাইটিকে

মানুষ করতে লাগল।

ভাইটি তার কা ছে ই

থাকে, সেই তাকে

খাওয়ায় দাওয়ায়, ঘুম

পাড়ায়। তার ওপরে

নতুন মার সঙ্গে খাটে,

সংসারের কাজে যোগান

দেয়, বাজার থেকে

জিনিসপত্র কিনে আনে।

দেখ করলে বাপও

ঠেঙায়, নতুন মাও ঠেঙায়

—গা লা গা লি গু লো

শতবোয় মাথোই নয়।

এমনি করে দিন

চলছিল। যখন তার

দশ এগারো বছর

বয়েস, সেই সময় তার

বাপ মারা গেল। বাপ

মারা যেতে নতুন মা

তাকে এক বাবুদের

বাড়ি বাসনমাজার

কাজে লাগিয়ে দিলে।

সকালবেলা উঠে সে তার

ভাই নন্দকে নিয়ে বাবু-

দের বাড়ি চলে যেত



জনেকক্ষ চুপচাপ থাকার পর একবার সে বলে—বাবা তোমাকে একটা কথা বলব।

—কি বল?

—আমি এই বস্তু ছেড়ে দিতে চাই।

কাজ করতে, আর বাড়ি ফিরত রাতি দশটা এগারোটার সময়—সেখানেই
দু-বেলা খেতে পেত। দু-টাকা তার মাইনে ছিল বটে; কিন্তু সে
টাকা সে পেত না। তার নতুন মা ঠিক সময়ে গিয়ে বাবুদের কাছে
গিয়ে তার মাইনেটা নিয়ে আসত—ছেলেমানুষ হারিয়ে ফেলতে
পারে।

আদরিণী নন্দকে মানুষ করে তুলবে—এই তার বাবির। মনের
অভিমান। নন্দর জামা-কাপড় কেনো কিছুই খরচই নতুন মা দেয়
না। তাই কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে বাবুদের বাড়ি থেকে নন্দকে
নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে ভিক্ষা করতে। দু-চার পরসা যা পায়,
তাই জমিয়ে জমিয়ে ভাইকে জামা-কাপড় কিনে দেয়। মধ্যে মধ্যে
বাবুদের বাড়ির ছোট ছেলেদের ছেঁড়া জামাও পায়।

নন্দ বড় হবে, লেখাপড়া শিখবে, বিয়ে করে বৌ নিয়ে এসে
সমোর পাতবে, দাঁদের দুঃখ খোঁচাবে এই তার চিন্তা, এই তার সুখ।
এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সে সব কষ্টই সহ্য করে। আরও কষ্ট
সহ্য করতে রাজী।

ম্যালেরিয়া ও সর্বজনীন মাত্র ৩ মাত্রায় বন্ধ হইবেই

কুইনাইনের সমতুল্য প্রচণ্ড শক্তিশালী
ক্যালিসিয়ামযুক্ত নতুন রক্ত কণিকা
উৎপাদক, আয়ুর্বেদীয় ভেষজসংযোগে
বহু গবেষণায় প্রস্তুত — সুপারীকৃত
জরুর যম—“জ্বরকরঞ্জ”—গডঃ রেজিঃ

ইহা সেবনে নতুন পুরাতন ম্যালেরিয়া,
পালাজ্বর, লিভারশ্লেইসংযুক্ত ঘস-
ঘসে জ্বর ইত্যাদি মাত্র ৩।৪ মাত্রায় বন্ধ
হইয়া ১ শিশিতে নিদ্রাব্য আরোগ্য
হইবে। জীর্ণশীর্ণ পেট মোটা
শিশুদের ক্রিমি, লিভারশ্লেই
সংযুক্ত ঘস-ঘসে জ্বর আরোগ্য হইয়া
দেহ সতেজ ও ওজন বৃদ্ধি পাইবে।
মূল্যাদিঃ—২০ পিল পূর্ণ শিশি ১০,
৬ শিশি ৪৫০, ১৮ শিশি ১৩০০,
অগ্রিম টাকা পাঠাইলে মাল্য লাগে না।

বিনামূল্যে

১ শিশি “জ্বরকরঞ্জ” এজেন্সী গ্রহণেচ্ছ,
চিকিৎসক ও ঔষধ বিক্রেতাগণকে ডাক-
খরচাদি ১০ পাঠাইলেই প্রেরিত হইবে।
পরীক্ষান্তে অব্যর্থ প্রমাণে এজেন্সী
লউন। মফঃস্বলস্থ চিকিৎসক মহো-
দয়গণ “জ্বরকরঞ্জ” ব্যবহার করিলে
চিকিৎসার সুনাম বৃদ্ধি পাইবে।

লিখন—

বহু বৎসরের অভিজ্ঞতালব্ধ ম্যালেরিয়া চিকিৎসক

বৈদ্যরাজ এস্. ভিষগুরু,

অধ্যক্ষঃ—অধ্যায়ন লেবরেটরী

১৩, বারানসী ঘোষ ২য় লেন, কলিঃ ও সর্বত্র প্রাপ্তব্য

ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি
নির্ভর করে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-
গুলির আর্থিক সাহায্যের উপর—

ভারতীয় উন্নতিশীল ব্যাঙ্কগুলির
অন্যতম

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

বাণিজ্য
ব্যাঙ্কিং কার্য
করা হয়।

হেড অফিস

২১-এ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা অফিসঃ—

ঢাকুরিয়া, দক্ষিণ কলিকাতা,
ওরঙ্গাবাদ, জগদীপুর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মিঃ ডি, এন্, চাটার্জী বি, এ



CORRUGNATE

THE KING OF
ANTI-CORROSIVE PAINTS
USED ALL OVER INDIA
SINCE 1898

The STANDARD PAINT WORKS LTD.
PAINT HOUSE 44, BEADON ROW, CALCUTTA

নন্দর ছ-বছর বয়স হোলো। আদরিণী ঠিক করলে তাকে ইস্কুলে পাঠাবে। তার জামা-কাপড়, ইস্কুলের মাইনে, বইয়ের দাম এসব কোথা থেকে আসবে? নতুন মা কিছই দিতে চায় না। নন্দকে ইস্কুলে পাঠাবার জন্য বেশী জেদাজেদ আরম্ভ করায় নতুন মা বলে—জামি এত পরস কোথায় পাব? তুই তো উপযুক্ত হয়েছিস, এবার তুই পরসা রোজগার করে ভাইকে মানুষ কর।

নতুন মার প্রস্তাব শুনে আদরিণী বুঝতে পারলে নন্দর সঙ্গে সঙ্গে তারও বয়স বেড়েছে—বিনা সুপারিসে সে নিজেই পরসা রোজগার করতে পারে।

ভাইকে সে ছেলের মতন করে মানুষ করেছে, তার জন্য বেশাবিস্তৃত তো দূরের কথা, প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে—বাবুদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়ে সে রাস্তায় দাঁড়াতে আরম্ভ করলে।

নন্দ রোজ সকালে সেজেগুজে বই বগলে নিয়ে ইস্কুলে যায়। আর তারই খরচ জোগাবার জন্য আদরিণী সন্ধ্যাবেলায় সেজেগুজে রাস্তায় দাঁড়ায়। প্রতি রাতে যা রোজগার হয়, নতুন মা নিয়ে নেয়। সে বলে—তোদের মানুষ করবার জন্য আমার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এই টাকাটা উঠে গেলে তোরা পরস। তুই রাখিস—তার আগে একটি পরসও পাবি নে।

আদরিণীর কোনো দুঃখ নেই। ভাই মানুষ হবে, যে ভাইকে সে বুকে করে মানুষ করেছে, তার তুলনায় কোনো কন্টই কম নয়।

বছর পাঁচ ছয় বেশ কটল। একদিন আদরিণী শুনতে পেলে নন্দ আর ইস্কুলে যায় না। সারাদিন ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে দিখি-বিড়ি খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—ইস্কুলের মাইনে এতই খরচ হয়ে যায়।

খবরটা শুনে সে কেঁদে ফেলে। ভাইকে ডেকে বোঝালে, এমন কিস নি ভাই। তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হোলো আমার দুঃখ বুঝবে।

ভাই মানলে না। লেখাপড়া তার ভাল লাগে না, লেখাপড়া তার হবে না। নতুন মা-ও তার সঙ্গে সায় দিলে। বন্ধ—এতগুলো করে টাকা মিছিমিছি নষ্ট করা—খদিও সে টাকা তারই রোজগার।

নন্দ খায় দায় হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে রাতে বাড়ি আসে না। বলে কোথায় কাজ শিখছে, সারারাত খাটতে হয়। সকালবেলা বাড়ি আসে—চুল উস্কেখুস্কে, চোখ রাঙা।

নতুন মার সঙ্গে নন্দর ঝগড়া হয়। নতুন মা বলে, তোক আর খেতে দিতে পারব না—বোরো যা আমার বাড়ি থেকে।

আদরিণী তাকে বোঝায়, নিজেও বুঝতে পারে নন্দ আর সে নন্দ নেই। ভরত ঋষির হরিণের মতন সে হরিণীর সম্মান পেয়েছে—তার বুকের মধ্যে হা হা করে ওঠে।

একদিন নতুন মার সঙ্গে কি নিয়ে নন্দর ঝগড়া বাধল। নতুন-মা তাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিলে। আদরিণী তাকে কত মানা করলে। বন্ধ—বাসুনি নন্দ, তুই চলে গেলে আমার কি বইল। দুদিন থাক, দেনাটা শোধ হোয়ে গেলে আমরা দুজনেই চলে যাব।

নন্দ শুনলে না, চলে গেল।

আদরিণীর সংসার শূন্য হোয়ে গেল। ভাইকে মানুষ করে তুলবে, সে লেখাপড়া শিখে পরসা রোজগার করবে, তার বিয়ে হবে, ছেলেমেয়ে হবে, তাদের কোলে কোরে মানুষ করবে—এই তার চিন্তা ছিল, এই তার লক্ষ্য ছিল। এই জন্য ভেরো বছর বয়সে সে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কোথা থেকে কালা মেঘ এসে তার মানস-উদ্যান ছেয়ে ফেলে, তার জীবন অন্ধকার হোয়ে গেল। তার একমাত্র অবলম্বন, যাকে কেন্দ্র করে সে বেঁচেছিল সেই অতি রুঢ় আঘাত দিয়ে তার সুখস্বপ্ন নষ্ট করে দিলে।

নন্দ মধ্যে মধ্যে আসে। রুদ্ধ চুল, মনে হয় কতদিন নাওয়া-

খাওয়া হয় নি। সে পরসা চায়। কিন্তু আদরিণী পরস কোথায় পাবে!

আবার সে ভিক্ষায় বেঁচেতে লাগল। দুপুরবেলা ঘণ্টা দু-তিন ঘুরে বেশ রোজগার হোতে লাগল। ভিক্ষার পরসা জমিয়ে জমিয়ে সে নন্দকে সাহায্য করতে থাকে। আশা কুহকিনী আবার তার মনে রঙীন কল্পনা জাগিয়ে তুলতে থাকে। নন্দ মানুষ হবে—তাকে নিয়ে সে নিজের সংসার গড়ে তুলবে।

এই সময়ে আদরিণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তার জীবনের এই ইতিহাস একদিনে নয়, তার ঘরে চৌদ্দ পনেরো দিন গিয়ে কিছু দেখে কিছু শুনে একটু একটু করে জানতে পারলাম।

সাধারণ মানুষ একসঙ্গে দুটো জীবন-যাপন করে। এক তার কর্মজীবন অর্থাৎ বাস্তব জীবন। যেখানে সে খায়দায় কাজকর্ম করে অর্থ রোজগার করে, নিজের সুখ ও স্বার্থের সঙ্গে নিয়ত যেখানে বাহিরের সংসারের সঙ্গে স্পর্শ চলেছে। যাকে বৈজ্ঞানিক নাম দিয়েছেন জীবন সংগ্রাম। অন্যটি তার মানস জীবন, যেখানে বাস্তবের সঙ্গে কোনো সংগ্রাম নাই। নিজের মনের গঠন, অভিরূচি ও কল্পনা নিয়ে সে এক রাজ্য তৈরি করে সেখানে বাস করে। হয়ত বাস্তব জীবনে সে রাস্তায় মট্টে, মানস জীবনে সে বিশেষ রাজা। এই কর্মজীবনের সঙ্গে মানস জীবনের যে যত বেশী আপোষ করতে পারে সেই তত বেশী কাজের লোক। অধিকাংশ লোকই সে আপোষ করতে পারে না তাই জগতে কাজের লোকের সংখ্যা কম।

বাস্তব জীবনে অতি নিম্নশ্রেণীর দেহোপজীবনী হোলেও আমি দেখতে পেতুম মানস জীবনে আদরিণী মহীয়সী নারী। বহু সংসারের কঠী সে সেখানে—স্বামী, পুত্র পরিজন ও আশ্রিতজন ভরা তার গৃহ। বাস্তব জীবনে সে নিঃস্ব কিছু মানস জীবনে তার দান ধানের অশ্ব নাই—দুঃখীজনের প্রতি সহমর্মিতায় সে পরম-কারুণিক। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে রাতি মিশ্রপ্রহর অবধি দেহ বিজ্ঞর করা তার উপজীবিকা। কিন্তু মনে হয় সে সার্বভৌম। সেখানে স্বামী ছাড়া তার অন্য ধ্যান নাই।

একদিন আদরিণী আমায় বলে—বাবা আমি আর সহ্য করতে পারছি নে। যে ভাইকে মানুষ করবার জন্য স্পেচ্ছায় এই ব্রীতি বরণ করেছিলাম সে তো বদমাইস হোয়ে গেল। আর কেন! তুমি আমার নিয়ে চল তোমার বাড়িতে।

বন্ধু—আমার বাড়িতে গিয়ে কি করবে? সে বলে—তোমাদের বাড়িতে গিয়ে ঝিয়ের কাজ করব। আমায় মাইনে দিতে হবে না—দুবেলা দুটী খেতে দেবে।

সমানবয়সী মেয়ে নিয়ে বাড়ীতে উপস্থিত হোলে আমার পিতৃঘে সে কেউ বিশ্বাস করবে না সে কথা বলে তাকে আঘাত দিতে সংকোচ হোলো। বন্ধু—আচ্ছা বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে দেখব।

কিছুদিন পরে আদরিণীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি তার ঘরের সামনে উঠানে একটা ছোঁড়া দাঁড়িয়ে আছে আর সে তার ঘরের দরজার একটা পাল্লা ধরে তার সঙ্গে গল্প করছে। আমাকে দেখেই ছোঁড়াটা চলে গেল। দেখলাম আদরিণীর ডানদিকের ভুরুর পাশে বগটা একটু ফোলা আর তার চারিদিকে অনেকখানি জায়গা কাশ্মিরে পড়ে আছে

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে, কি করে লাগল ওখানটায়?

আদরিণী গম্ভীরভাবে বলে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে বাবা।

—নেশা করে পড়ে গিয়েছিলে বুঝি?

—খেতে পাইনে আবার নেশা!

জেরায় প্রকাশ পেল দিন দশেক আগে একদিন তার ভাই নন্দ

ষষ্ঠীর দিনে —



দুগ্ধাপ্জার প্রারম্ভে, ষষ্ঠীর দিনে সন্তানের মঙ্গল কামনা করে মায়াদের উপবাস করা হিন্দুর প্রচলিত রীতি। কিন্তু মায়াদের জানা উচিত, কেবল উপবাসে বিশেষ কিছু লাভ হয় না, কেননা “স্বর্গের করুণা শূন্য তাঁরই মেলে যিনি নিজের চেষ্টা করেন।” ষষ্ঠীর দিনে তাই সন্তানের স্বাস্থ্যের কথা আর একটু ভেবে দেখতে হবে। শিশুর স্বাস্থ্য প্রধানতঃ নির্ভর করে খাদ্যের উপর। শিশুর পক্ষে কোন খাদ্য শ্রেষ্ঠ? মাতৃদুগ্ধ?—কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতির আশ্চর্য ব্যবস্থা। শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্তনে তার জন্যে সব চেয়ে উপযোগী খাদ্য

বর্তমান। কিন্তু কোন কারণে যদি স্তন্যদান সম্ভব না হয়? তাহলে? গরুর দুগ্ধ? কখনো না। শিশুর পক্ষে গরুর দুগ্ধ বড় বেশী গুরুপাক, সেজন্যে বমি, যকৃৎপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি জন্মায়। ডাক্তাররা তাই মাতৃদুগ্ধের অনুরূপ গৃহযুক্ত গুড়া দুগ্ধ (Humanised Dried Milk) দিতে বলেন। আবার তা কিন্তু টাটকা হওয়া চাই। বিদেশী দুগ্ধ এদেশে আমদানী হতে যে সময় নেয়, তারই মধ্যে বহুলাংশে নষ্ট হয়ে যায়। অপর পক্ষে ভিটামিনিক পাওয়া যায় টাটকা তাজা অবস্থাতেই।



ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিমিটেড, কলিকাতা

মদ খেয়ে এসে তার কাছে টাকা চায়। টাকা কাছে ছিল না। কদিন থেকে শরীর খারাপ থাকার দৃশ্যে বোলা ভিকার বেরুতে পারে নি। নন্দ সে কথা মানলে না। শেষকালে রোগে গিয়ে সে তাকে মেয়ে অজ্ঞান করে রেখে যায়।

আদরিণীর দুই চোখ জলে ভরে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে—একি পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলব না তো আর কি বলব!

সেদিন সে আশ্চর্য রকমে গম্ভীরভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল। তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখার কি হোলো একবারও সে প্রশ্ন আমাকে করলে না। যদিও প্রতি মুহূর্তেই আমি আশংকা করছিলাম এবার বোধ হয় সে কথা জিজ্ঞাসা করবে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর একবার সে বললে—বাবা তোমাকে একটা কথা বলব।

—কি বল?

—আমি এই বৃত্তি ছেড়ে দিতে চাই।

খুব ভাল। কি করবে?

—আমি বিয়ে করে চলে যাব এখন থেকে।

সে তো ভাল কথা। কাকে বিয়ে করবে?

—হেমাকে। তোমায় সম্প্রদান করতে হবে কিন্তু।

বল্লভ—সম্প্রদান করতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু হেমাটি কে?

—ঐ যে লোকটি উঠানে দাঁড়িয়েছিল, তুমি আসতে চলে গেল।

ও কাদের ছেলে?

হাড়ীদের! ! !

আদরিণীদের বস্তির একটু দূরেই একটা বড় মাঠ পড়েছিল। বড় মানে শহরের হিসাবে বড়। এই মাঠের একদিকে কয়েকখর মুসলমান বাস করত। এরা সারা মাঠে বড় বড় চটাই পেতে টিকে দিত এই জন্য এই মাঠকে ও অঞ্চলের লোকেরা টিকে পাড়ার মাঠ বলত। সে সময় কলকাতার অনেক যায়গায় এই রকম টিকেপাড়ার মাঠ ছিল। এই টিকেপাড়ার মাঠের আর এককোণে ছিল ত্রিশ পরিশ্রম ঘর হাড়ীর বাস। হাড়ীরা শূর্যের পুষ্ট আর সেই শূর্যের দল মাঝে মাঝে বোরিয়ে পড়ে টিকেপাড়ায় গিয়ে চটাইয়ের আশ পাশে টিকে চটকে দিত বলে টিকেওয়ালাদের সঙ্গে হাড়ীদের দস্তুরমতন যুদ্ধ বেধে যেত। হাড়ীরা স্ত্রীপুরুষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো।

হাড়ীদের মধ্যেও বড়লোক, মেজেলোক ও ছোটলোক এই তিন সম্প্রদায়। বড়লোকের মেয়েরা মেথরাণীর কাজ ছেড়ে দিয়ে ছেড়া জামাকাপড়ের বন্দলে বাসন বিক্রি করত। ছেলেরা পুজো-পার্বণে লোকের বাড়ীতে শানাই বাজাত ও অন্য সময় বাঁশের চাঁচাচার দিয়ে ঝড়ি, চটাই, দমি ও শোভাযাত্রায় বাহার দেবার বড় বড় পুতুল তৈরী করত। মেজেলোকদের মেয়েরা লোকের বাড়ী মেথরাণীর কাজ করতে আর পুরুষেরা বাঁশের কাজ করত। আর ছোটলোকদের স্ত্রীপুরুষ মেথরের কাজ করত। হেমা হচ্ছে হাড়ীদের মধ্যে বড়লোকের ছেলে। তাদের বাড়ীর কেউ মেথর মেথরাণীর কাজ করে না। হেমা শানাই বাজায় আর অন্য সময়ে বাঁশের কাজ করে।

আদরিণীর নতুন মার নাম ছিল নিস্তারিণী। তার অধীনে আদরিণী ছাড়া আরও অনেকগুলি হতভাগিনী বাদি করত। এদের সবার রোজগারই তার তহবিলে জমা হতো। এই মেয়েগুলি তাকে নিস্তার মা বলে ডাকত। আমি তার নাম দিয়েছিলাম—ফাদার নিস্তার।

নিস্তারিণীর বাড়িতে কতগুলো খালিঘর ছিল। সেগুলোকে সে ষষ্ঠী হিসাবে ভাড়া দিত। এই ঘরগুলোকে কলা হোজে খোজে আসলে কিন্তু ঘরগুলো ছিল গোপন বিলম্বক। কাঁচের

যে কোনো স্ত্রীপুরুষ এসে ঘণ্টার দু-আনা দিয়ে এই ঘর ভাড়া নিতে পারত। ফাদার নিস্তারের খোন্ডের কথা তখনকার দিনের গৃহীলোক মাঠেরই জানা ছিল।

হাড়িপাড়ার মেয়েদের দেহসৌন্দর্যের কথা সকলেই জানে। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় তারা দুপাড়ির লোকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে করতে যেত। ফলে তাদের মধ্যে অনেককেই ফাদার নিস্তারের খোন্ডেতে দেখা যেত। মাঝে মাঝে সেখানে শাশুড়ী বোয়ে, মারে বিয়ে মাথা ঠোকাঠুকি হোয়ে গিয়ে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হতো। এইখানকারই এক বয়স্কা হাড়ী গিন্নীর সঙ্গে হেমার প্রণয় হয়েছিল এবং তারা প্রায়ই ফাদার নিস্তারের খোন্ডেতে আসত মিলনের জন্য। এই সূত্রে আদরিণীর সঙ্গে হেমার পরিচয় ঘটে।

হেমাকে নিয়ে তাদের পাড়ার যে স্ত্রীলোকটি খোন্ডেতে আসত তার বেশ প্রতিপত্তি ছিল। এদিকে ফাদার নিস্তারের দাপটে বাধে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এরা দুজনেই তাদের বিয়ে নিয়ে দু-দিকে ঘোঁটা বাধিয়ে তুলে। এই ঘোঁটা যখন বেশ জমে উঠেছে, সেই সময় আমি তাদের বিয়ের কথা শুনলাম।

সত্যি কথা বলতে কি, আদরিণীর বিয়ের সম্বন্ধটি আমারও ভাল লাগল না। বিয়েতে আমার কিছু আপত্তি ছিল না। কিন্তু হাড়ীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, এই চিন্তা আমাকে পীড়া দিতে লাগল।

আদরিণী আমার বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল—বাবা তুমি কি বল?

জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা তুমি বিয়ে করতে চাও কেন? এখন যে অবস্থায় আছ, বিয়ে করে কি তার চেয়ে ভাল থাকবে?

আদরিণী বললে—এখন আমি কিছুই ভাল নেই, বিয়ে করলে হয়ত এর চেয়ে ভাল থাকতে পারি। নন্দকে মানুষ করব বলে এ কাজ আরম্ভ করেছিলাম, নইলে লোকের বাড়ি গভীর খেটে আমার ভাত-কাপড়ের খরচ উঠে যেত। হয়ত একটা ভাল লোকের সঙ্গে ঘর করতে পারতুম। কিন্তু আমার বরাত। যার জন্য এত করলুম সে হোলো একটা অমানুষ—আমার দংশ সে বুঝলে না। বিয়ে করলে আর যাই হোক, তবু নিজের ঘর পাব—ছেলেপিলে পাব। এ জীবন আর সহ্য করতে পারছি না।

আমি বললুম—আচ্ছা, তোমাকে যদি লেখাপড়া শেখবার কন্ডাবস্ত করে দিই। তুমি নিজের জীবিকার জন্য কোনো একটা কাজ শিখে স্বাধীনভাবে থাকবে। কোনো ভুললোককে বিয়ে করবে—না হয় এমনই ভুলভাবে থাকবে—এমন তো অনেক মেয়ে আছে।

আমার কথা শুনে আদরিণীর মন্থনা খুঁশিতে ভরে উঠল। সে বললে—আমার লেখাপড়া হবে বাবা? বয়েস যে অনেক হয়েছে গিয়েছে তোমার মেয়ের!

—লেখাপড়ার আবার বয়েস আছে নাকি? মন দিলে সব বয়সেই লেখাপড়া শেখা যায়।

—সেই ভাল বাবা। তুমি তার ব্যবস্থা কর—বিয়ে এখন থাক।

বাল্যকালে একটি বিধবা মহিলা আমাদের পড়াতে। ভবিষ্যতে ইনি শিক্ষায়ত্নী কাজ ছেড়ে দিয়ে এক বিধবা আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। তার নিজের টাকাকড়ি কিছু ছিল না, চারদিক থেকে চাঁদা তুলে কোনো রকমে আশ্রম চালাতেন। আমার বাবা এই আশ্রমের একজন মুরুব্বী ছিলেন। আশ্রম অনেকগুলি বিধবার সঙ্গে করেকটি অনাথা কুমারীও প্রতিপালিত হতো। আমি সাহস করে একদিন আশ্রমের কঠী ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করে আদরিণীর কথা বললাম। বলা বাহুল্য আদরিণী যে ফাদার নিস্তারের আশ্রমের লোক, সে কথা একদম চোপে গিয়েছিলুম। তার সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যায় মিলিয়ে বেশ একটি কল্প কাহিনী রচনা করে ভীকে শোনালুম।

এইট ও ক্লক শেভিং ব্রাশই লইবেন

ইহা ব্যবহারে রণ, ফুস্কুড়ি
প্রভৃতি হয় না

এই শেভিংস ব্রাশের ক্যাঁচগুলি রবার-
যোগে মজুত করিয়া দৃঢ়রূপে বসানো।
খুব স্বাস্থ্যসম্মত প্রক্রিয়ায় এবং দক্ষ
কোয়ালিটি ও চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে
ইহা প্রস্তুত।

সর্বতোভাবেই নিরাপদ

দি

ভেনাস এণ্ড কোং

কালীঘাট, কলিকাতা।

১২১/১/১, মনোহরপুত্র রোড।

বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৬৭নং রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম-বিশ্বজসোসাইটি

স্থাপিত-১৯৩৩

ফোন-পিকে ৩০২০ ও ১৯৬

অনুমোদিত মূলধন	...	১,০০,০০,০০০, টাকা
বিক্রয়ার্থ	"	১০,০০,০০০, "
বিক্রীত	"	৯,৫৫,৩০০, "
আদায়ীকৃত	"	৫,৫৬,০১০, "

কেবলমাত্র স্থায়ী আমানতই গ্রহণ করা হয়। স্থায়ী আমানতের
সুদের হার আবেদন করিলে জানান হয়। সুদ ত্রৈমাসিক দেয়।

জমি বিক্রয় :

কলিকাতার দক্ষিণাংশে বিভিন্ন মূল্যের জমি বিক্রয় আছে।

গভীর গবেষণালব্ধ আবিষ্কার

কুইন'টিন, এমিটিন
প্লাস কোজ, ক্যা
সিয়াম উইথ লিভার
এক স্ট্রো ক'ট স
প্রভৃতির এমপাল
ও নানা প্রকার
ট্যাবলেট প্রস্তুত
কারক।

কুইনোবিন ম্যালেরিয়ায়
গ্যাস্মনল অব্যর্থকলপ্রদ
বোটোন অল্পওজীর্ণতা
নাম করে-
দুর্বলজন্যক
ম্যাক্সপ্রদ টনিক

বহুবিধ সিরাপ ও
এলোপ্যাথিক ঔষধ
এবং পেটে-ট ঔষধ
প্রস্তুতকারক। বিস্তা-
রিত বিবরণের জন্য
পত্র লিখুন।



এমিয়াটিক ড্রাগ হাউস

কলিকাতা

সব শূন্যে তিনি প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন করলেন—তার সংগে আমার কি সম্বন্ধ? কোথায় আলাপ হোলো?

এই রকম সব প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলুম। প্রায় আধ ঘণ্টাটুকু জেরা করে তিনি আমায় বলেন—আপাততঃ প্রেমের ফণ্ড কম থাকায় কিছুদিন নতুন মেয়ে আশ্রমে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। শূন্য তাই নয়, আমার হাতে যে একটি উদ্ভারকামী নুতনী আছে এবং তার হিতাহিতের প্রতি আমি বিশেষ মনোযোগী— এই শব্দ সংবাদটি অবিলম্বে আমার বাড়িতে জ্ঞানিয়ে দিলেন।

আমার বাবার সংগে একই সরকারী দপ্তরে এক ভদ্রলোক কারি করতেন। তিনি ছিলেন ক্রীশ্চান এবং অবিবাহিত। আতুর ও দুঃখীজনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল অপারিসীম। ইনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন, বাণ্ড মাঝে মাঝে আমাদের নিয়ে তাঁর বাড়িতে যেতেন। কলকাতার রাস্তায় যে অসংখ্য আতুর ও অনাথ শিশু বালিকা ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্য কি করে একটা আশ্রম খালা যায়, এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হোতা। কিছুদিন পর ভদ্রলোক সত্যিই একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। আমাদের বাড়ির কাছেই সম্ভ্রাম একখানা ভাড়া বাড়ি গড়া নিয়ে রাস্তা থেকে আট দশজন আতুর কুড়িয়ে নিয়ে এসে তিনি রাজ সন্মুখ করে দিলেন। সহায় সম্পদ তাঁর কিছুই ছিল না। প্রতিদিন সকালে বড় একখানা থলি বগলে নিয়ে তিনি দুর্দৃষ্ট ভিক্ষায় বসতেন। বেক্ষ প্রায় বারোটা নাগাদ আধ মণটক চাল ও কিছু প্রকার নিয়ে বাড়ি ফিরে রাধা চড়িয়ে দিতেন। তারপর নিজের হাতে আতুরদের স্নান করিয়ে খাইয়ে আবার বেরুতেন ভিক্ষা সংগ্রহে। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর সেই প্রচেষ্টা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোলো। মাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি সৈদিকে আকৃষ্ট হোলো—দেশজাড়া তাঁর নামডাক হোলো, তাঁর মনসকামনা সিদ্ধ হোলো। কিন্তু বিখ্যাত হওয়ার বিপদ আছে। বৃদ্ধবয়সে বদনামের শশা মাধ্যম নিয়ে তাঁকে সেই নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে যেতে হোলো।

সে কথা থাক, আমি একদিন সম্ভ্রামের সময় তাঁর কাছে গিয়ে আদরিণীকে তাঁর আশ্রমে স্থান দিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করলুম। আদরিণীর যে দুঃখের কাহিনী আমি তাঁর কথোচ্চলুম, তা শুন্যে ভদ্রলোকের চক্ষু সজল হয়ে উঠল। কি করে তার সংগে আমার পরিচয় হোলো, তার সংগে আমার কি সম্পর্ক, বাবা এ বিষয়ে কিছু জানেন কি না, সে সব কোনো প্রশ্নই তিনি আমাকে করলেন না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেন—দেখ হে, আমাদের আশ্রমে কোনো মেয়ে নেই তো। পুরুষদের আশ্রমে তাকে নিয়ে এসে রাখা সুবিবেচনার কাজ হবে না। তুমি ছেলেমানুষ তখন আমার চম্বিশ বছর বয়স, এ সব কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। এই বলে, ভবিষ্যতে আশ্রমে মেয়েদের যে বিভাগ হবে, সে সম্বন্ধে আমাকে বলতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমি উঠতেই তিনি বলেন—তাইত হে, তবে সে মেয়েটির সম্বন্ধে কি করা যায়? তুমি যে রকম বয়সে, তাতে তো মনে হচ্ছে সে যদি ভাল আশ্রয় না পায় তা হোলো বিপথগামিনী হোতে পারে।

—অজ্ঞে হ্যাঁ, তা পারে।

—তবে! তার সম্বন্ধে আমরা যখন জানতে পেরেছি, তখন কিছু দায়িত্ব আমাদের ওপরেও এসেছে। তার ভালমন্দের বিষয়ে একেবারে নিরপেক্ষ তো হোতে পারছি না। কি বল?

আমি আর কি বলব। চূপ করে থাকা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

তিনি বলেন—এক কাজ করা যাক। মেয়েটিকে নিয়ে এস। আপাততঃ তাকে আমার ভাই কিংবা বেনের বাড়িতে রেখে দোব। পরে একটা ব্যবস্থা হবেই। ডগবান যখন তাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তখন একটা ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন।

পরদিন সকালে আদরিণীকে গিয়ে বললুম—তোমার সব ব্যবস্থা

ঠিক করে ফেলেছি। ভাল গৃহস্থের বাড়িতে থাকবে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে—থবে ভাল লোক তরা।

আদরিণী একেবারে লাফিয়ে উঠল। আনন্দের আতিশয্যে সে আমায় জড়িয়ে ধরে বলে—তুমি আমার সত্যিকার বাবা। গেল জন্মে তুমি আমার বাবা ছিলে নিশ্চয়।

শুনলুম, ফাদার নিস্তার এ কয়দিন উঠতে বসতে আদরিণীকে ঠেঙিয়েছে। হেমাঙ্কে সে বাড়িতে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছে, কিন্তু হেমা কিছুতেই নিস্তারের কথা শোনে না। আদরিণী বলে—আহা আমি চলে গেলে ছোঁড়াটার ভারী কষ্ট হবে—বড় ভালবাসে সে আমাকে।

আনন্দের উৎসাহে গড় গড় করে সে অনেক কথা বলে যেতে লাগল। আমি বললুম—আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই, তোমার জিনিসপত্র কি নেবার গুছিয়ে নাও—এইবেলা বেরিয়ে পড়।

আদরিণী বলে—এখনকার কোনো জিনিস নেব না বাবা—এ পাপের জিনিস নিয়ে গেরস্তর পুণ্যের সংসারে ঢুকব না। নতুন করে জীবন আরম্ভ করব। এতদিন আমার জীবন যেভাবে কেটেছে, আমি মনে করব সে আমার নয়। এই পৃথিবীতে আমি যেন এমনি এসেছি, আমার বাপ, মা, ভাই কেউ নেই—কেউ কোনদিন ছিল না। আমি যেন একদীন জন্মেছি—বারা আমায় আশ্রয় দিলে, তারাই হবে আমার সব।

আমি বললুম—ভদ্রও একটা দুটো শাড়ি-গামছা ইত্যাদি নাও, কি জানি সেখানে গিয়ে তুমিও অসুবিধায় পড়বে, তাদেরও অসুবিধা হবে।

আমার কথায় রাজী হয়ে আদরিণী আলমারি থেকে কতকগুলো কাপড় বার করলে। পোটিলা বাঁধতে বাঁধতে সে বলে—এবার বাবা আমি মন্তর নেব। তোমাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে কিন্তু—

বললুম—বেশ!

আদরিণী জিজ্ঞাসা করলে—কি জাত তারা?

—কারা?

যেখানে যাচ্ছি।

—তারা ক্রীশ্চান, জাতটুত মানে না।

—এ্যা! ক্রীশ্চান! গরু খায়?

আদরিণীর মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। সে পেটিলাটাকে তাক্কিলোর সংগে একদিকে সরিয়ে দিলে।

বললুম—ক্রীশ্চান হোলেই কি গরু খেতে হবে নাকি? তারা বোধ হয় মাছ-মাংসও খায় না।

আদরিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কঠিন সুয়ে বলে—না বাবা, জীবন ভোর অনেক পাপ করেছে, আর ক্রীশ্চানের অন্ন খাব না। বরং তা আছে হবে, সেখানে যাব না। হাজার হোক হিন্দুর মেয়ে আমি।

কথগুলো শুন্যে আমার রাগ হোলো। প্রতিদিন ছাত্রশ জাতের কাছে দেহ বিক্রী করে যে হিন্দু অন্ধ থাকে, ক্রীশ্চানের ঘরে থাকলে সে হিন্দু যে কিছুতেই নষ্ট হবে না, এই সোজা কথাটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুতেই সে সেকথা মানতে রাজী হোলো না। শেষকালে সে কাঁদতে আরম্ভ করলে।

ফাদার নিস্তার বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। এর মধ্যে সে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে—আবার কি হোলো? দিনরাত অমন করে মরছ কেন?

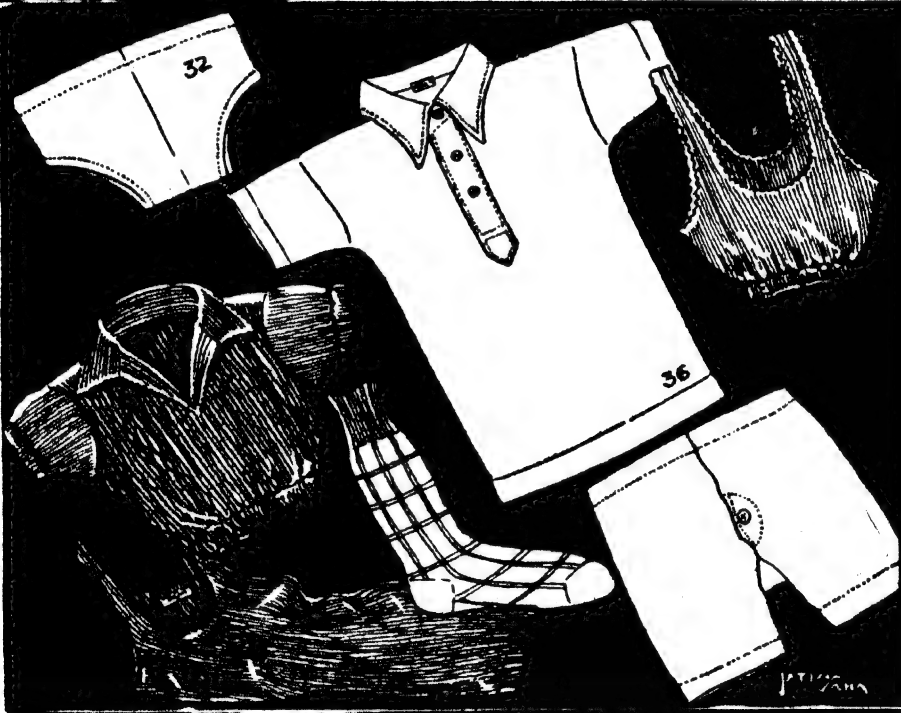
আদরিণী কিছু না বলে নীরবে কাঁদতে লাগল। নিস্তারিণী আমায় দিকে চেয়ে বলে—হ্যাঁ গা ভালমানুষের বাছা! ওর মাধ্যম এ সব কি বৃদ্ধি পিচ্ছ? এতে কি তোমার ভাল হবে, না ওরই ভাল হবে? কদিন থেকে যে এমন নাচনাচি সুরু করছে—বলি কেন? কিসের জন্য শুন?

জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে?



ব্যবহারে

উৎসাহে—



মিলান এণ্ড কোম্পানী

নানাবিধ হোমিয়ারী প্রভৃতি প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক

১০৯-১১০ খোংরা পট্টী স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—বড়বাজার ৪০৭৩

টেলিগ্রাম—MILCOHOSRY, Cal.

—বলে চলে যাব, বিয়ে করব—নেথাপড়া শিখব। যা দিকিন্

হুই—

আদরিণী এবার গজের উঠল—আলবৎ বাব।

—তবে রে? বলে ফাদার নিস্তার একেবারে সিংহবিহ্বলে আদরিণীর ওপরে বাঁপিয়ে পড়ে তাকে অমানুষিক প্রহার করতে প্ররম্ভ করলে। আদরিণী কোনো বাধা দিলে না। সে মাটিতে পড়ে বলতে লাগল—মার মার, মেরে যদি ফেলতে পারিস তবে ফেল।

ফাদার নিস্তারের চীৎকারে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা এসে ভিড় করে দাঁড়াল, কিন্তু তারা কেউ আদরিণীকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এল না। এদিকে নিস্তারিণী মেরেই যেতে লাগল। শেষকালে খাটের তলা থেকে একটা ঘটি তেনে নিয়ে তাই দিয়ে আদরিণীর মাথা ও মুখ খেঁচাতে আরম্ভ করে দিলে।

এবার আমি ছুটে গিয়ে নিস্তারিণীকে ধরে ফেললাম। বাড়ির মধ্যে তখন বাইরেরও অনেক স্ত্রী-পুরুষ এসে জমা হয়েছে, তারা সকলেই পাড়ার লোক, সকলেই আংরী ও ফাদার নিস্তারকে চেনে।

আমি ধরামাত নিস্তারিণী গজের উঠল—ভাল হবে না বলছি, তুমি সরে যাও। আমি নিস্তারিণী বাড়িউলি—আমায় চেনো না?

আমার মাথার তখন রাগ চড়ে গিয়েছে। নিস্তারিণীকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এলাম। সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের বললাম—আমি একে পুলিশে দোব—তোমরা সবাই দেখেছ, এ আংরীকে কি রকম মেরেছে।

পুলিশের নাম শুনেই ভিড়ের পুরুষ দর্শকরা একে একে সরে পড়তে আরম্ভ করলে। ঠিক সেই মুহূর্তেই হেমা ও তাদের পাড়ার এক পাল স্ত্রী-পুরুষ দোড়ো বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকল।

হেমা জিজ্ঞাসা করতে লাগল—কে কাকে মেরে! আংরী—আংরী কোথায়?

একবার চারদিক চেয়ে নিয়ে সে তড়াক করে দাওয়ার উঠে ঘরের মধ্যে উর্গাক দিয়ে আদরিণীকে দেখে বলল—ইঃ এ যে মেরে ফেলেছে রে! কে মেরে? বল কে মেরে?

আদরিণীর মুখে কথা নেই, চোখে তার অশ্রু পর্যন্ত নেই—একটা বিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতা। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে, হেমাদের পাড়ার মেয়েরা ফাটি ফাটি করছে, এমন সময় হেমা বলল—চ আংরী আমাদের ঘরকে চ—কাল লগননা আছে—

আদরিণী মাটি থেকে উঠে টলতে টলতে বলল—চ।

ফাদার নিস্তার এতক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে হাপায়ের মতন ভোস্ ভোস্ করছিল। মোটা মানুষ, পরিশ্রম করে কিছু ক্রান্তি আসা স্বাভাবিক। কিন্তু আদরিণীকে অগ্রসর হোতে দেখে সে গজের উঠে বলল—খবদার আংরী, বাড়ির বাইরে পা বাড়িয়েছ কি

খসে করে ফেলব—আমার নাম নিস্তারিণী—

নিস্তারিণীর মুখের কথা শেষ হোতে না হোতে আদরিণী ঘরের ভেতর থেকে লাফিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট দাওয়া উপরে একেবারে তার ওপরে বাঁপিয়ে পড়ল। নিস্তারিণীর নাকে ছিল ইয়া ফাদি নং। দুই কাণের ওপর থেকে ডিম অবধি সারি করে মাকড়সী—এক মুহূর্তের মধ্যে নাকের নং ও এক কাণের দু-তিনটে মাকড়সী ও তার সঙ্গে যথোচিত চামড়া ও মাংস উড়ে গিয়ে রক্তাক্তা ছুটিতে লাগল।

—ওয়ে বাবা, এক রকম—বলে নিস্তারিণী ভেে ঘুরে মাটিতে পড়ল, ঐরাবতের মতন। রক্ত দেখে আদরিণীর মাথায় বেন খস চেপে গেল। সে তারই ওপরে তার পেটে দমামদম লাথি মারতে আরম্ভ করে দিলে।

বাড়ির অন্য মেয়েরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। কেউ এগিয়ে এসে তাকে ধরলে না—উঠোন রক্তে ভেসে যেতে লাগল। আদরিণীকে গিয়ে ধরব না পলায়ন করব ভাবছি, এমন সময় হেমা গিয়ে তাকে ধরে ফেলল।

আদরিণী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—চ হেমা।

আমি গাঢ় গাঢ় দরজা অবধি এগিয়ে পড়েছিলাম। আদরিণী এসে আমার একখানা হাত ধরে বলল—বাবা বৃদ্ধি মেরের কীর্ত দেখে সরে পড়িছিলে?

আমরা রাস্তার বোঁরে পড়লাম। মাঠের কাছে পেঁগছে আমি বললাম—আচ্ছা এবার আমি চললাম।

আদরিণী বলল—চলে বাবা! আচ্ছা তাহলে কাল নিশ্চয় এস—কাল আমার বিয়ে।

বললাম—ঠিক বলতে পারছি না, তবে দু-এক দিনের মধ্যে আসব।

—না না কাল আসতেই হবে।

তারপর একটু হেসে বলল—তোমার ভ্রম্মবাজের দিবা রইল।

তার সঙ্গে সেই প্রথম আলাপের কথা মনে পড়ল।

ভ্রম্মবাজের দিবা রাখতে পারি নি। বোধ হয়, সংসাহখানেক পরে একদিন বিকেলে আদরিণীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। দেখলাম তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এক মাথা সিঁদুর দিয়ে একখানা লালপেড়ে কোরা শাড়ি পরে সে আমায় প্রণাম করলে।

বিয়ে করে কেমন লাগছে সে কথা জিজ্ঞাসা করবার প্রলোভন হোতে লাগল। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করবার আগেই খুশিতে ভগমগ হোয়ে আদরিণী বলল—জান বাবা, আমরা এখান থেকে চলে বাচ্ছ পশ্চিমে। আমাদের দুজনেরই রেলের চাকরি হোচ্ছে—মেখর ও মেথরাণীর কাজ। ও পাশ আনতে গেছে, কাল সকালবেলায় চলে যাব—



কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

স্থাপিত ১৯১৪ ইং

হেড অফিস :---কুমিল্লা

কলিকাতা অফিস :---৪নং ক্লাইভঘাট স্ট্রীট

নিরাপদ সংস্থানার্থ এই ব্যাঙ্ক এক বিশিষ্ট স্থান
অধিকার করিয়াছে।

সারা ভারতে ও ভারতের বাহরে যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

ক্রমোন্নতির পরিচয়

মূলধন এবং রিজার্ভ তহবিল

সন	বিক্রয়ীকৃত	আদায়ীকৃত	রিজার্ভ
১৯৪২ ...	৩৯,৩৬,৬০০,	২২,২০,০৫৫,	৯,৪০,০০০,
১৯৪৩ ...	৫৫,৮৬,৮৬০,	৩০,৪৭,৭২১,	১৪,০০,০০০,
১৯৪৪ ...	৮০,০০,০০০,	৪০,০০,০০০,	২০,০০,০০০,

আয়, লাভ এবং গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি

সন	আয়	নীট লাভ	গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি
১৯৪২ ...	১১,৬২,২৮১,	২,১৭,৭৫৫,	১,০৯,৫৩,১০০,
১৯৪৩ ...	১৬,৪৭,৪৫৭,	৩,৬১,২৩৬,	২,০৯,০০,০০০,
১৯৪৪ ...	১০,৮৩,২২৮, (জুন পর্যন্ত)	৩,৭৯,২০৯, (জুন পর্যন্ত)	২,৭৫,০০,০০০, (আগষ্ট পর্যন্ত)

এজেন্সী ও শাখা অফিস সমস্ত পৃথিবীতে

লণ্ডন এজেন্ট :---ওয়েস্টমিনস্টার ব্যাঙ্ক লিঃ

অস্ট্রেলিয়ান এজেন্ট :---শ্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব অস্ট্রেলেশিয়া

এমেরিকান এজেন্ট :---ব্যাঙ্কাস ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ এন, টি, দত্ত এম, এল, সি।



রবীন্দ্রনাথের নাট্যনাট

প্রথম নাথ বিধী

যে সব নাটকে আমরা নৃত্যনাট্য বলতেছি সেগুলি কবির শেষ জীবনে লিখিত। আবার ঋতু নাট্যগুলিও শেষ জীবনের রচনা। স্থূল বিচারে এই দুই শ্রেণীর নাটকে এক জাতীয় মনে হইতে পারে কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে। এই দুই শ্রেণীর নাটকেই সংগীত ও নৃত্য প্রধান হইলেও নৃত্যনাট্যে নৃত্যই ভাবের একমাত্র বাহন অর্থাৎ যে কথাটি কবি যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন নৃত্যের সাহায্য ছাড়া তাহা কখনই সোভাবে প্রকাশিত হইতে পারিত না।

স্বাভাবিকতঃ, ঋতু নাট্যের নৃত্যকে সম্বলুলের আনন্দ বলা যাইতে পারে। এই নৃত্য বহুলের আনন্দকে প্রকাশ করিতেছে। রাজপুত্রীতে উৎসব, সেই সাধারণ উৎসবের আনন্দকে পুরবাসীরা নাচের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেছে। রাজ সভায় উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, সেই উৎসবের সমষ্টির উল্লাসকে নর্তকীর দল রূপ দিতেছে।

কিন্তু নৃত্য নাট্যগুলির নৃত্যের সঙ্গে বহুলের মনোভাবের কোন যোগ নাই; তাহা এককের সুখদুঃখকে, এককের আশাআনন্দকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে সংগীত যেমন তাহার প্রতিভার প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার নাট্যপ্রবাহের আলোচনা করিলেও তেমন কথা যাইবে যে শেষ জীবনের নাটকের মধ্যেও গানের অবিসম্বাদিত প্রাধান্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য দ্বারা কবি তাহার নাট্য জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন—ঋতু নাট্য ও নৃত্য নাট্যের গানের দ্বারাই সে জীবনের শেষ হইয়াছে। কিন্তু প্রথম জীবনের গীতি নাট্যে ও শেষ জীবনের এই শ্রেণীর নাটকে কত প্রভেদ।

ঋতু নাট্যে ও নৃত্য নাট্যে চারিটি দৃষ্টান্ত সন্মিলন ঘটিয়াছে। কাব্য, সংগীত, নৃত্য ও চিত্র। ইহাকে কবির নাটকীয় টেকনিকের চতুরঙ্গ রীতি বলা যাইতে পারে। এই চারিটির মধ্যে কাব্যের স্বাদ যে-কোন পাঠক গ্রন্থ পড়িলেই পাইতে পারেন। সূত্রের স্বাদ পাওয়াও দুরূহ নয়, স্বরলিপি আছে, বিশেষজ্ঞ বাস্তি আছেন; কিন্তু অপর দুটির স্বাদ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। যাহাদের এই সব অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহারা সেই নৃত্যের চন্দ্র সৌন্দর্য জানেন; রঙ্গমঞ্চ সংজ্ঞা আলোক ও বেশভূষায়, অভিনেত্রীদের অঙ্গান্তরে যে বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিত তাহা দর্শকের স্মৃতিতে থাকিলেও লুপ্ত ঐশ্বর্যের মধ্যেই পরিণত হইয়াছে। সে সব হয়তো আর পুনরাবস্থার করা যাইবে না, কবির বাস্তবের সঙ্গেই হয়তো তাহারা প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে তাহার শেষ জীবনের এই দুই শ্রেণীর নাটকের প্রকৃত মহিমা নির্ভর করিতেছে, কাব্য, সূত্র, নৃত্য ও চিত্রের চতুরঙ্গ রীতির সান্নিধ্য, সমাবেশের উপরে। কেবল গ্রন্থের দ্বারা বিচার করিলে ইহার কাব্যংশই প্রকট হইবে অথচ প্রচ্ছন্ন অন্য তিনটি অঙ্গ অন্ততঃ রূপনাতেও না দেখিতে পারিলে ইহাদের প্রতি আবিচার করিবার আশঙ্কাই সমাধিক।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের কালানুক্রমিক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে উত্তরায়ণের তাহার নাটকে গানের সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিংবা একথানা নাটকে যখন পরবর্তী কালে রূপান্তরিত করিয়াছেন তাহাতে গানের সংখ্যা বাড়িয়াছে; সংস্করণ ভেদেও এই একই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এবং শেষ পর্যন্ত তাহার নাটক নিরবচ্ছিন্ন গানের মালায় পরিণত হইয়াছে, কেবল মাঝে মাঝে এক গানের সঙ্গে অন্য গানের জোড়া দিবার জায়গায় একট,

করিয়া গদ্য বা পাঠ্যপত্রীর উক্তি। গ্রীক নাটক মূলে যেমন গীতি-সর্বস্ব ছিল, কলেক্ট্রমে তাহাতে সংগীতের প্রাধান্য কমিয়া নাটকীয় অংশ বাড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাহার বিপরীত প্রক্রিয়া দেখা যায়। গদ্য বা পদ্য নাটকীয় উক্তি ক্রমে সংকীর্ণ হইতে হইতে শেষবরসে একেবারে সংগীতকে আসর ছাড়িয়া দিয়া তাহারা নেপথ্যে প্রস্থান করিয়াছে।

এমন যে হইয়াছে তাহার অবশ্য কারণ আছে। জীবন-পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি ভাব রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করিতে হইতেছিল সংগীত ছাড়া যাহা প্রকাশযোগ্য নয়। সেইজন্য শেষ জীবনে সংগীত তাহার ভাবের প্রধান বাহন। নাটকের মধ্য দিয়াও কবি ক্রমে কতকগুলি সূক্ষ্মশরীরী, ছায়ারূপী বস্তু প্রকাশের চেষ্টা করিতেছিলেন। ভাব যতই সূক্ষ্ম হইতে লাগিল তাহার দৃষ্ট, প্রকাশের জন্য ততই সূত্রের সারথী অধিকতর আবশ্যক হইতে লাগিল। ভাব সূক্ষ্মতর হইয়া পড়িল সূত্রও যেন আর তাহাকে সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তখন সূত্রের সঙ্গে নৃত্যের যোগের প্রয়োজন হইল। যে-জীবের সংজ্ঞা নাই, যে-আকুলতার ভাষা নাই, ছন্দ যাহার আভাস মাত্র দিতে পারে, সূত্র যাহার ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু জানে না, শিক্ষিত অঙ্গের ছন্দোময় বাজনা সেই অনগ্ন আকৃতিকে আভাসিত করিয়া তুলিতে প্রাণপণ করে—ইহাই নৃত্য। ভাবের পরিবর্তন ও পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নৃত্য নৃত্য বাহনের সম্ভান করিতে হইয়াছে। এইরূপ সম্ভানের ফলে তিনি ক্রমে কথা হইতে সূত্র, সূত্র হইতে নৃত্য, এবং শেষে নৃত্য হইতে চিত্রের চতুরঙ্গ রীতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে শাপমোচন, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ও শ্যামা যথার্থ

পাড়িবার মতন নভেল

শশধর দত্তের	
রক্তাক্ত ধরণী	২১০
স্বর্গাদিগ গরীয়সী	২১
আগুন ও মেয়ে	২১
সব্যসাচারী প্রত্যাভর্তন	২১০
প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর	
সব্বের প্রদীপ	২১
নীড় ও বিহঙ্গ	২১
ধূলার ধরণী	২১
চেউয়ের দোলা	২১
মাটির মায়া	১১০
দীপের আলো	১১০
পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যের	
পতিতা ধীরতী	১১০
সৌরীন্দ্রমোহন মুনোপাধ্যায়ের	
রাহুগ্রস্ত শশী	২১
নব-নায়িকা	২১
যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের	
সাধের কাজল	২১
পথের বাণী	২১০
জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর	
খেয়ালী তরুণী	১১০
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
অপরিচিতা	২১০
মুক্তিমন্ডপ	২১
আশালতা সিংহের	
সহরের মোহ	১১০
শৈলজানন্দ মুনোপাধ্যায়ের	
অন্য আশ্রম	২১
হোমানল	২১
শৈলবালা ঘোষজ্যার	
বিনির্গম	১১০
অরু	১১০
গঙ্গাপুত্র	১১০

প্রফুল্লময়ী দেবীর	
চাষা	১১০
পূর্ণিমা	১১০
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
দেউলিয়ার জমা খরচ	১১০
বিরের ফুল (২য় সং)	১১০
প্রোতের ফুল (২য় সং)	২১
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
জীবনের জটিলতা	১১৭
ধরাবাঁধা জীবন	১১
অমরেন্দ্রনাথ মুনোপাধ্যায়ের	
বিয়েগান্ধ	১১০
ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
পূরনারী	১১০
বিধায়ক ভট্টাচার্য ও অনিল ভট্টাচার্যের একাঙ্ক নাটক	
পুনর্মুখিকোভব	৫০
কেশবচন্দ্র গুপ্তের	
গণ্ডগোল	২১

নবকথা সিরিজ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুনোপাধ্যায় প্রণীত
নতুন ধরণের স্যাড্‌ভেঞ্চার

- ১। অর্থমন্ডল
 - ২। আরামবাগ
 - ৩। ইরাবতী ৬। উপা
 - ৪। ঈশা ৭। কবি-মশাই
 - ৫। উপকণ্ঠ ৮। "৯"কার
- বিস্ময়কর গ্রন্থ।
অভিনব রচনাকৌশল।
ক্রাইম নভেল নতুনতম
ঘটনার সমাবেশ।
প্রত্যেক উপন্যাস—মূল্য ১১০

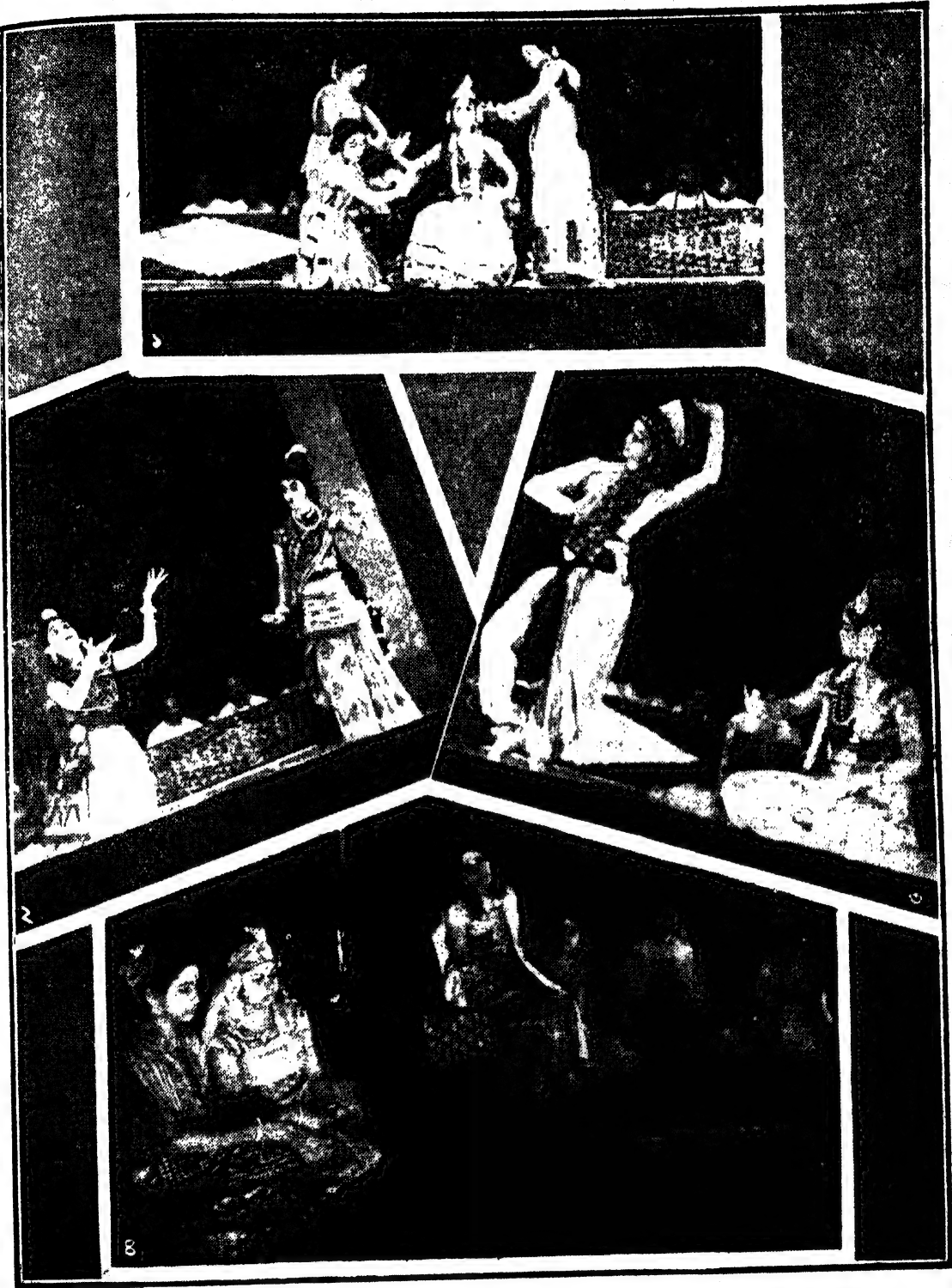
রহস্যরোমাঞ্চ স্যাড্‌ভেঞ্চার

সিরিজ

বৈচিত্র্যপূর্ণ উপন্যাস
প্রত্যেক উপন্যাসের
মূল্য ১১ টাকা।

- ১। মৃত্যুচক্র (২য় সং)
- ২। রক্ত-পিপাসা (,)
- ৩। রহস্য-বিভীষিকা (,)
- ৪। গুপ্ত-চক্রান্ত (,)
- ৫। সময়ান-সংগিনী (,)
- ৬। রোজার ঘাড়ে বোকা
- ৭। মৃত্যু-প্রহেলিকা (২য়)
- ৮। মরণের মায়াজাল (,)
- ৯। শত্রু-সংঘর্ষ
- ১০। মৃত্যু-বড়লত
- ১১। খুনের-জের
- ১২। রক্ত-ভাণ্ডব
- ১৩। মৃত্যুচক্রে মায়াবিনী
- ১৪। পিশাচ ব্যাধের জাল
- ১৫। চীনা দস্যুর ইন্দ্রজাল (২য় সং)
- ১৬। জীবন্ত-কংকাল
- ১৭। পরীর পাহাড়
- ১৮। দস্যু-মায়াবী
- ১৯। খুনের নেশা
- ২০। রক্ত-লোলুপ
- ২১। মৃত্যুরণ
- ২২। নীল সাগরে রক্ত-লীলা (২য়)
- ২৩। প্রিয়ার চক্রান্ত
- ২৪। ফিফথ কলাম (২য় সং)
- ২৫। মৃতের প্রতিশোধ
- ২৬। মরণজয়ী
- ২৭। খুন ডাকাতি গুম
- ২৮। পিশাচিনী
- ২৯। দস্যুরাজ

প্রকাশক--ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, ৬০নং বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা।



(১) নৃত্যনাট্যে 'শ্যামা', (২) নৃত্যনাট্যে 'কমলালিকা', (৩) নৃত্যনাট্যে 'চিত্রাঙ্গদা' ও (৪) 'নটীর পূজার' এক একটি দৃশ্য।
চিত্রশিল্পী: কলকাতার সৌজন্যে।

নৃত্যনাট্য। নটীর পূজা নৃত্যনাট্য পর্যায়ের নয় কিন্তু নটীর পূজাতেই যেন নৃত্যনাট্যের সূচনা। এই নাটকখানিতে নৃত্য যে কেবল প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নয়—নটীর চরম নৃত্যই ইহার প্রাণবস্তু। ওই নৃত্যটি ছাড়া নাটকের বক্তব্য কিছুতেই প্রকাশ করা যাইত না; নৃত্যটিকে বাদ দিলে নাটক অনারূপ ধারণ করিবে। নৃত্যই এই পর্যায়ের নাটকের বাহন আগে বলিয়াছি—এবারে তাহার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যাইবে। নাটকের সমস্ত গতি গোড়া হইতে এই চরম পারিধামের দিকে ধাবিত এবং শেষ মুহূর্তে কেবল শ্রীমতী নয় সমগ্র নাটকখানি আত্মসংসর্গের নৃত্যের মধ্য দিয়া শান্তি ও সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নাটক হিসাবে নটীর পূজার অলোচনার ক্ষেত্র ইহা না হইলেও এখানে এই তথ্যটি উল্লেখ করা আবশ্যিক।

জীবনপরিধামের সংগে সংগে রবীন্দ্রনাথের শিল্প গতি ও নৃত্যরসের দিকে অধিকতর আগ্রহের সংগে মোড় ঘুরিতেছিল একথা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু কেবলমাত্র এই ভিতরের তর্গিগণেই নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে এমন মনে করবার কারণ নাই। ভিতরের তাগিদ যতই প্রবল হোক ভারতীয় সাহিত্যে নৃত্যনাট্যের কোন সজীব আদর্শ নাই; যে-নৃত্য আছে তাহা রবীন্দ্রনাথের রচিকর নয়, আর কতক তো তাহার নিজেরই সৃষ্টি। কিন্তু ইহা তো কেবল নৃত্য মাত্র নয়, ইহা নৃত্যনাট্য; অর্থাৎ একটা জটিল কাহিনীর আদ্যন্ত হেতুর ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রকাশ। চোখের সম্মুখে এই সজীব আদর্শের অভাবই তাহার প্রতিভাকে যেন নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এমন সময়ে ১৯২৭-এ তিনি জাভা ও বালিশীপ ভ্রমণে যান। সেখানে নৃত্যনাট্য এখনো সজীব। সেই সজীব আদর্শই তাহার প্রতিভার শেষ বাহ্যিক দূর করিয়া দিল। নৃত্যনাট্যের একটা আদর্শ দ্বিগুণা তিনি ফিরিয়া আসিলেন, এবং স্বকীয় প্রতিভার দ্বারা পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিয়া নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি করিলেন। এই পর্যায়ের চারখানি নাটকই ১৯২৭-এর অনেক পরে লিখিত।

নটীর পূজা অবশ্য ১৯২৬-এ লিখিত, কিন্তু তাহাতে এইমাত্র প্রমাণ হয়, যে নৃত্যনাট্য রচনার আকৃতি তাহার মনে কাজ করিতে ছিল, কিন্তু আদর্শের অভাবেই আকৃতি রূপ লাভ করিতে পারিতেছিল না।

এখানে যে-সব পত্র উদ্ধৃত করিতেছি তাহার সমস্তই 'জাভা যাত্রীর পত্র' হইতে। এই গ্রন্থের অধিকাংশ পত্রই ওদেশের নৃত্যনাট্যের উল্লেখ আছে। তাহাতে বর্ণিত পারা যায় জাভার এই প্রাণবস্তুটিই কবিকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং সেই সংগে তাহার অগোচর মনের মধ্যে যেন একটা সজীব নৃত্যনাট্যের আদর্শ গড়িয়া জ্বলিতেছিল।

“এদেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারকেল বন যেমন সমুদ্রহাওয়ায় দুলছে তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত। এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তন গানে সে আপন আবেগসঞ্চারের পথ পেয়েছে, এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কহিতে চায়, তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায় ফেরায়; যুদ্ধে বিগ্রহে, ভালো-বাসার প্রকাশে, এমন কি ভড়িমাতে সমস্তটাই নাচ। সেই নাচের ভাষা যারা ঠিক মতো জানে তারা বেশ হয় গম্পের ধারাটা ঠিক মতো অনুসরণ করতে পারে। সেদিন এখানকার এক রাজবাড়িতে আমরা নাচ দেখছিলাম। খানিকবাদে শোনা গেল এই নাচ-অভিনয়ে বিষয়টা হচ্ছে শাল্ল-সত্যবতীর আখ্যান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে।” যাত্রী; জাভাযাত্রীর পত্র।

জাভার নৃত্যভিনয় হইতে কবি যে তাহার নৃত্য নাট্যের আদর্শ পাইয়া থাকিলেন—ইহার পরে আর সন্দেহ করা উচিত নয়। কিন্তু জাভার নৃত্যনাট্যকে গ্রহণ করবার সময়ে তিনি তাহাতে একটি বড় রকমের পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। জাভার বাণীহীন নৃত্যের সংগে তিনি বাণীর যোগ করিয়া দিয়াছেন; জাভার যাত্রা ছিল কেবলমাত্র নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথের হাতে তাহা সংগীতসনাথ নৃত্যনাট্যিকায় পরিণত হইয়াছে।

কবি বলিয়াছেন “এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে।” জাভার “নারকেল বন যেমন সমুদ্রহাওয়ায় দুলছে, তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত।” আর “বাঙাল দেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তন গানে সে আপন আবেগসঞ্চারের পথ পেয়েছে, এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি।” জাভার নৃত্যাদর্শের সংগে বাঙালার আত্মপ্রকাশের পন্থা সংগীতের যোগ সাধনই তাহার কৃতিত্ব—এবং সেই জন্যই হয়তো তাহার নৃত্যনাট্য জাভার নৃত্যভিনয়ের চেয়ে পূর্ণতর।

স্বতন্ত্রীয়ত, কবি বলিতেছেন, “এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে।” রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে দুটি ধারাই লক্ষিত হয়। ‘শাপ মোচনে’ ঘটনা নাই বলিলেই হয়, কেবলই বিশুদ্ধ ভাবের আবেগের প্রকাশ—নৃত্যে এবং সংগীতে। কিন্তু চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামাতে ঘটনার ধারা স্টিমিত হইলেও তাহা বর্তমান—এবং ঘটনা ও ভাবনা যুগপৎ প্রকাশিত হইয়াছে—নৃত্যে এবং সংগীতে।

“আজ সকালে দশটার সময়ে আমাদের এখানেই গৃহকর্তা—আজ একটা নাচের বাসস্থান করেছিলেন।”

মেয়ে দু'জনে পুরুষের ভূমিকা নিয়েছিল। অজুন আর পুরুষের বাসু। * * * খানিকটা কথাবার্তার পরে দু'জনের লড়াই। * * *

“মটীয়া যে মেয়ে সেটা বস্তুতে কিছুই বাধে না, অতিরিক্ত যত্ন সেটা লুকোবার চেষ্টাও করে নি। তার কারণ যারা নাচছে, তারা মেয়ে কি পুরুষ সেটা গোপন নাচটা কি সেইটেই দেখবার বিষয়। দেহটা মেয়ের কিন্তু লড়াইটা পুরুষের, এর মধ্যে একটা বিরুদ্ধতা আছে বললে এই অস্বস্ত সমাবেশে বিষয়টা আরো যেন তীব্র হয়ে ওঠে। কমর্নিয়তার আধারে বীররসের উচ্ছলতা।” যাত্রী; জাভাযাত্রীর পত্র।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যেও কবি মেয়েকেই পুরুষের ভূমিকা দিতেন। বাঙালী বালিকার অভ্যুত্থানের ও বহুসেনের ভূমিকা গ্রহণে ওই একই রসের উদ্ভব হইত—কমর্নিয়তার আধারে বীররসের উচ্ছলতা।

“কাল রাতে আমাদের এখানেও একটা নাচ হয়ে গেল। পূর্ব রাতে যে-দুইজন বালিকা নেচেছিল, তাদের মধ্যে একজন আজ পুরুষ-সত্ত্বের মুখোশ পরে সত্ত্বের নাচ নাচলে। আশ্চর্য ব্যাপারটা হচ্ছে এর মধ্যে নাচের শ্রী সম্পূর্ণ রক্ষা করেও ভাবের ভঙ্গীতে গলার আওয়াজে পুরো মায়ায় বিদ্বৎকতা করে গেল। পুরুষের মুখোশের সঙ্গে তার অভিনয়ের কিছুমাত্র অসঙ্গতিসা হোলো না। বেশ-ভূষার সৌন্দর্যও একটু মাত্র ব্যত্যয় হয় নি। নাচের শোভনতাকে বিকৃত না করেও যে তার মধ্যে বাগ্যবিদ্যার রস এমন করে আনা যেতে পারে এ আমার কাছে আশ্চর্য ঠেক্লে। এরা প্রধানত নাচের ভিতর দিয়েই সমস্ত হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করতে চায়, সুতরাং বিদ্যুৎপের মধ্যেও এরা চন্দ্র রাখতে বাধ্য। এরা বিদ্যুৎপকে বিরূপ করতে পারে না—এদের রাক্ষসেরাও নাচে।” যাত্রী, জাভাযাত্রীর পত্র।

এই বিদ্যুৎপনৃত্যের কিছু আভাস যেন ‘তাসের দেশ’ নাটকে আছে। সে দেশের তাসের জনতার চলাফেরা, কথাবার্তা ও সংগীতে এই বিদ্যুৎপনৃত্যের ভঙ্গী।

“সেই সম্মানবেলাতেই রাজবাড়িতে আর একটি ব্যাপার দেখলাম, মুখোশ-পরা নটদের অভিনয়। আমরা জাপান থেকে যে-সব মুখোশ এনোছিলাম, তার থেকে বেশ বোঝা যায়—মুখোশ-ভাঁড় একপ্রকারে বিশেষ কলাবিদ্যা। এতে যথেষ্ট গুরুত্বপা চাই। আমাদের সকলেরই মধ্যে যেমন বাস্তবিক তেমনি প্রতীকিত বিশেষ আছে। বিশেষ ছাঁচ ও ভাব-প্রকাশ অনুসারে আমাদের মুখের ছাঁচ এক এক রকম প্রণী নির্দেশ করে। মুখোশ-ভাঁড় যে গণী করে সে সেই প্রণী-প্রকৃতিতে মুখোশে বেশে দেয়। সেই বিশেষ প্রণীর মুখের ভাব-বৈচিত্র্যকে একটি বিশেষ ছাঁচে সে সংহত করে। নট সেই মুখোশ পরে এলে আমরা তখন দেখতে পাই একটা বিশেষ মানুষ্যকে কেবল নয়, বিশেষ ভাবের এক প্রণীর মানুষ্যকে। সাধারণত অভিনয়তো ভাব-অনুসারে অঙ্গভঙ্গী করে। কিন্তু মুখোশে মুখের ভঙ্গী স্থির করে বেঁধে দিয়েছে। এইজন্যে অভিনয়তার কাজ হচ্ছে মুখোশেরই সামঞ্জস্য রেখে অঙ্গভঙ্গী করা। মূলে ধরেটা তারা বাধা, এমন করে তাল দিতে হবে যাতে, প্রত্যেক মুহূর্তে সেই ধার্যতার ব্যাখ্যা হয়। কিছু অসংগত

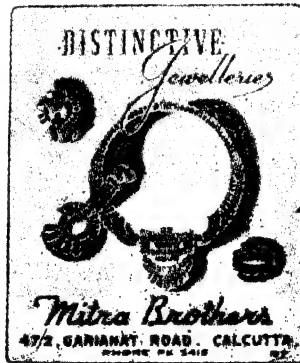
না হয়। এই অভিনয়ে তাই দেখলুম।" বত্মী; রচয়িতার পদ।

মুখোষ-নৃত্য রবীন্দ্রনাথের মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই জাতীয় নাটক রচনায় তিনি মনোযোগ দেন নাই। মুখোষ-নৃত্য রচনা করিয়া গেলে বাঙলা সাহিত্য আর একটা দিকে যে কেবল সমৃদ্ধতর হইত তাহা নয়, রবীন্দ্র নাট্য প্রতিভারও একটা নতুনতর পরিচয় পাওয়া যাইত। আমার তো মনে হয় মুখোষ-নাট্য তাহার প্রতিভার বিশেষ অনুকূল ছিল, কারণ রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির চেয়ে শ্রেণীর বিকাশেই অধিকতর দক্ষ ছিলেন। নাটকে ব্যক্তির মনে যে দ্রুত লগ্নে ঘন ঘন ভাববিবর্তন ও পটপরিবর্তন ঘটে, শ্রেণীর মনে সে রকমটি ঠিক ঘটে না; শ্রেণী-মনের ভাব ও পট পরিবর্তনটিমে তালে ঘটিয়া থাকে। রবীন্দ্র-নাথের নাটকের একটি প্রধান চরিত্র এই যে, ঘটনার তাল ও ব্যক্তির ভাবনার তাল এক সঙ্গ্রে চলিতে পারে না; অর্থাৎ নাটকে যে রকম আত্মসমীক্ষা, অপ্রত্যাশিত ও মুহূর্মহু ভাব বিপর্যয় দর্শকে আশা করে, তাহাতে ঠিক যেমনটি নাই। অভিনেতার নুখে অবিরাম ভাব-বলাকার সম্ভরণ না ঘটতে মুখটা অনেক পরিমাণে অবিচলিত মুখোষের সঙ্গোত হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাট্যে অভিনেতা যে পরিমাণে ব্যক্তি তাহার চেয়ে বেশি করিয়া যেন

সে একটা বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি। অভিনেতার মুখের উপরে একটা মুখোষ ভুলিয়া দিলে মুখের এই মৌলিক চরিত্র ঢাকা পড়িয়া গিয়া যেন একটা গুণে পরিণত হইতে পারিত। বিশেষ করিয়া তাহার 'তাসের দেশ' একান্তভাবে মুখোষ-নৃত্যের উপযোগী। এই নাটকের তাসের জনতার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের চেয়ে শ্রেণী-ব্যক্তিত্ব অধিকতর। রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র ব্যক্তি, কিন্তু তাস ও তাসানী-গণ শ্রেণীস্বরূপ। এক্ষেত্রে তাহাদের মুখে মুখোষের ব্যবস্থা হইলে অভিনয়ের অঙ্গ হানি না হইয়া, শ্রেণীরূপটি স্পষ্ট হইয়া ওঠাতে রস-বর্ধন হইত বলিয়াই মনে হয়।

এইযে নৃত্যনাট্যের কথা বলিলাম—ইহার মূলের তত্ত্বটি কি? আগেই বলিয়াছি যে জীবন-দর্শনের পরিণতির সঙ্গো তাল রাখিয়া তাহার আটো একটা পরিবর্তন ঘটিতেছিল—এবং এই পরিবর্তনের তাগিদেই তিনি প্রথম বয়সের গীতিনাট্য হইতে গতানুগতিক কমেডি, ট্রাজেডি ও তত্ত্বনাট্যের ভিতর দিয়া শেষ বয়সের ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রথম বয়সের গীতিনাট্যে নিছক ঘটনার ও আবেগের মাত্র প্রকাশ; তাহার মূলে কোন সচেতন তত্ত্বরূপ নাই। শেষ বয়সের ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মূলে একটি সচেতন তত্ত্ব নিহিত আছে। কবির দীর্ঘ

জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ধীর অথচ অনিবার্য গতিতে এই তত্ত্বের দিকে তাহাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। অতি সংক্ষেপে এই তত্ত্বকে বলা যাইতে পারে নটরাজ শিবের আইডিয়া। যে শিল্পী নটরাজ মূর্তি পরিকল্পনা করিয়া ছিলেন, তিনি দেখিয়াছিলেন বিশ্বের কারণ-স্বরূপ মূল আবেগ ছন্দে লীলায়িত হইয়া জীবনে ও জগতে এক রহস্যময় বিচিত্র দিব্য-শক্তির লীলা চলিতেছে; তাহারই নৃত্যছন্দের পদপ্রান্তে ভাঙিতেছে, গড়িতেছে; বাঁধবসতা ও সৌন্দর্য, ভীষণতা ও মাধুর্য, নিঃস্বভাবতা ও পরিপূর্ণতা তাহার নৃত্য চঞ্চল দুই চরণের যেন দুই বিরুদ্ধ গুণ। যে-হৃতভাগ্য খণ্ডশঃ দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখিতেছে তাহার চোখে ইহা রিক্ত, ভীষণ, বাঁধবস, ভাঙন-মুখী ও অসম্পূর্ণ; সে কেবল তাণ্ডবের চন্দ্র সূর্য্য তারা খসিয়া-পড়া ভঙ্গি বিশ্ব-অট্টালিকা-টাই দেখিতে পাইল; কিন্তু যে-সৌভাগ্যবানের দৃষ্টি পরিপূর্ণ, সে নটরাজের দুই চরণের লীলা-ই প্রত্যক্ষ করিতেছে বলিয়া জীবন ও জগৎ তাহার কাছে সন্দর, মধুর এবং চির পরিপূর্ণ; সে দেখিতে পায় চন্দ্র সূর্য্য তারা খসাইয়া লইয়া নৃত্যনতর বিশ্ববর্মা গড়িয়া উঠিতেছে; সে দেখিতে পায় সূর্য-দুঃখ জন্ম-মৃত্যুর উপাদান ছানিয়া মহন্তর জীবন গঠনের লীলা হইতেছে, তাহার চোখে জীবন ও জগৎ



আপনার প্রসাধন সামগ্রী

গুলিকে সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত
করিবারা যাবতীয় সেন্ট ও
এরোম্যাটিক্ কেমিক্যাল যথা-
সম্ভব সুলভে সরবরাহ
করিয়া থাকি।

পূজা স্পেশাল কম্পাউন্ড } প্রতি পাঃ
কোকোনাট অয়েল কম্পাঃ } ৬০,
তিল অয়েল কম্পাউন্ড ... ৬০,
আমলা কম্পাউন্ড ... ৪০,
আয়ুর্বেদিক অয়েল কম্পাঃ
(Free from Synthetic) ... ৪০,
স্নো কম্পাঃ (Rose Smell) ৮০,
হ্যান্ডকার্টিফ সেন্ট কম্পাঃ ... ৮০,

এই সব দ্রব্যাদির অন্যান্য এসেন্স ও
এরোম্যাটিক্ কেমিক্যালের দর ও
ক্যাটালগ পত্র লিখিলে পাঠাইয়া থাকি।

মফঃস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত
সরবরাহ করা হয়।

এসেম এ্যাণ্ড বোতল সাপ্লাই
এজেন্সি

১৪নং রাধাবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

হাজী আহমদ আলী সাহেবের
শূলসুধা

রেজিস্টার্ড নং ১৪৭০

পিত্তশূল, অম্লশূল, অম্লপিত্ত, কোষ্ঠ-
কাঠিন্য ইত্যাদি যাবতীয় শূলরোগের
অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান—

শূলসুধা ঔষধালয়

—ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর—

ডাঃ জালালউদ্দীন আহমদ, এস, এ, এস।

৫৭নং আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

—হেড অফিস—

ঢাকা

ব্যাংকং ভারতের প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রণী

---শাখা অফিস---

—কলিকাতায়—

বালীগঞ্জ, ভবানীপুর,
বড়বাজার, শ্যামবাজার।

বাহিরে

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ,
নোয়াখালী, সোনাপুর, চৌমুহনী,
চাঁদপুর, পূরানগর, ফেণী, কৃষ্ণ-
নগর, বহরমপুর, জলপাইগুড়ী,
বর্ধমান, দৌলতগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ,
পূর্ণিয়া, পাটনা, আরা, বেনারস,
রাঁচী, ভাগলপুর, জামসেদপুর,
লক্ষ্মী ও আগ্রা।

নোয়াখালী
ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ

রিজার্ভ ব্যাংকের সিডিউলভুক্ত

হেড অফিসঃ---১০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

---কার্যকরী তহবিল---

১,৫০,০০,০০০

প্রায় দেড় কোটি

আধুনিক ব্যাংকের যাবতীয় সুবিধা
দেওয়া হইয়া থাকে।

—ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এস. সি. পাল

বিপ্লব এবং সুন্দর। খণ্ড-দৃষ্টি নটরাজের পটভূমির বাহিরের পর্দাখানা মাত্র দেখিয়াই ইহাই বাস্তব, আর বাস্তব বীভৎস এবং ভয়ঙ্কর। পরিপূর্ণ দৃষ্টিবান রংগমণ্ডের পর্দাখানা উঠাইয়া নটরাজের নৃত্যলীলা দেখিয়া লে নব শৃঙ্খল মিলিয়া কি সুন্দর, আর বিপ্লব!

এখন জীবনের সাধনায় এই পরিপূর্ণতার পূর্নের অধিকারী কবি হইয়াছেন বলিয়াই তাঁর আর পর্দাখানা মাত্র দেখিয়া হতাশ হইতে পারেন নতুন নৃত্য দেখিয়া বৃদ্ধিতে পরিণত হইয়া ভাঙন নতুন গড়নের ভূমিকা হইতে মুক্ত জীবনেরই অঙ্গ; বিরহ নিবিড়তর লেনেরই সূচনা—আর সবসুখ মিলিয়া জগৎ; জীবন স্বকীয় মহিমায় পরিপূর্ণ, বৈশিষ্ট্য।

জগৎ ও জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রের নিকটেই এই তত্ত্বটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইহাকে সত্য বলিয়া মানি পাইয়াছেন। প্রকৃতির ঋতুরংগশালায়, দেশের অনুপমভাষার বিবর্তনে, (নটরাজ ঋতুরংগশালা); মানুষের জীবনের বিরহ মল্লের লীলায়, (শাপ মোচন); রূপ ও প্রকৃতির সত্তার স্বদেশ (নৃত্যনাট্য সত্যাপন); প্রেম ও দৈহের বিপরীত দাবীর

সংগ্রামে (নৃত্যনাট্য 'চন্দ্রালিকা' ও 'শ্যামা'); অর্থাৎ এই তত্ত্ব আর রবীন্দ্রনাথের কাছে তত্ত্ব মাত্র থাকে নাই, জগৎ ও জীবনের সঙ্গে একার্থক হইয়া উঠিয়া ইহা নতুন মহিমা লাভ করিয়াছে; ইহা তাহার কাছে বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তব বলিতে রবীন্দ্রনাথ এই পূর্ণতাকেই বোঝেন।

এক্ষণে তাহার রচনা হইতেই এই তত্ত্ব-রূপটি প্রকাশের চেষ্টা করা যাক্।

"নটরাজের তাড়বে তাহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বিহরাকাশে বপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, আর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকাশের সেই বিরাট নৃত্যক্ষেপে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলায় উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধন মুক্ত হয়। নটরাজ পালা গানের ইহাই মর্ম।" নটরাজ ঋতুরংগশালা।

আমরা যাহাকে জগৎ বলিয়াছি কবির ভাষায় তাহা 'বিহরাকাশে বপলোক', আর আমরা যাহাকে জীবন বলিয়াছি কবির ভাষায় তাহা 'অন্তরাকাশে রসলোক'। যে-সৌভাগ্যবান নটরাজের লীলায় যোগ বিয়া তাহার নটসংগী হইতে পারিয়াছে, তাহার মন 'বন্ধন-মুক্ত' হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে ইহাইই সম্যাসী, ইহাইই সম্যাস। সংসারত্যাগী গতানুগতিক সম্যাসীরা কেবল নটরাজের

ভাঙন-মুখী চরণখানাই দেখিতে পাইয়াছে, তাই তাহার কাছে তাহাদের কোন গুরুত্ব নাই। 'নটরাজ ঋতুরংগশালা' নৃত্যনাট্যের অন্তর্গত না হইলেও এক্ষণে তাহার আলোচনা অসম্ভব নয়, কারণ কবির নৃত্যতত্ত্বটি অত্যন্ত সচেতনভাবে ইহাতে প্রকট।


জগৎ ও জীবন মিলিয়া যে বিশ্বব্যাপার তাহার মধ্যে কবি নটরাজের লীলাকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

"নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুস্থিত ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মৃত্ত সূর্যের ছন্দ হে।"

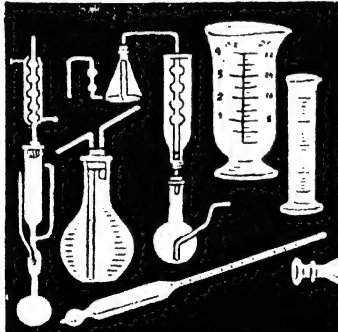
নটরাজের নৃত্যের তালেই কবির রসলোক হইতে সুস্থিত নিকরীণী স্বপ্ন ভাঙিয়া জগতের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়ে।

"নৃত্যে তোমার মূর্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মারা।
বিশ্ব তনুতে অণুতে অণুতে
কাঁদে নৃত্যের ছায়া"
"নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল
বিদ্রোহী পরমাণু;
পদবৃগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্র-ভান্ড"

নটরাজের এক পদক্ষেপ কবির রসলোকে আর এক পদক্ষেপে বিহলোকে; বিহলোকের পদপাতে অনুপমভাষা যে কেবল উন্মথিত



মিস্টার কে. এল. গোস্বামী
পরিচালক ও প্রদর্শনকারী



"নিউট্রল"
সর্বোৎকৃষ্ট এলক্যালিবিহীন
গ্লাস



ভারতের লেবরেটরী গ্রাস
প্রস্তুতের আদি প্রতিষ্ঠান।

S. G. W.

সাইন্টিফিক গ্লাস ও ইলেকট্রিক
 অফিস :- ৪৪নং কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা।
 ফ্যাক্টরী :- ৩৫নং গোপাল চ্যাটার্জী রোড, কলিকাতা।

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় দস্ত মঞ্জন

কলডিনা
টুথপেস্টশ্রীনাথ কেমিক্যাল
কলিকাতা**সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক**

লিমিটেড

হেড্ অফিস :

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট,
কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ২১২৫ ও ৬৪৮০

বিক্রীত মূলধন	১০,০০,০০০ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	৪,৫৫,৮৬১ টাকা
অমানত জমা	৫০,০৯৪৯৩ টাকা

শাখাসমূহ

সাউথ ক্যালকাটা, শ্যামবাজার, নিউ মার্কেট, নৈহাটী,
ভাটপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, রঙপুর,
নীলফামারী, নৈয়দপুর, হিলি, বালুরঘাট, দুবরাজপুর,
কুচবিহার, এলাহাবাদ, বেনারস, জলপাইগুড়ি।

বাঁকুড়া ও সিউড়ী শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ফোন—ক্যাল ০৮৯৪

গ্রাম—Interested

এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শতকরা ৭১০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

শাখাসমূহ :

আজমিরগঞ্জ
এলাহাবাদ
আমরবতী
বেনারস
ভৈরব
কাণপুর
চাকুলিয়া
ছাপরা
দাজিলিং

ফরাসাবাদ
বালেশ্বর
মীর্জাপুর
গয়া
ঘাটাল
গোপালগঞ্জ
জৈনপুর
কালকতি
খাড়াগ্রাম

জম্বলপুর
কাটরা (এলাহাবাদ)
খলপুর
লক্ষ্মী
মৌদীনীপুর
মহারাজগঞ্জ
নাগপুর
উত্তর কলিকাতা

রায়পুর (সি পি)
রাণাঘাট
সৈয়দপুর
শ্যামবাজার
গ্রীহট
উনাও
জামশেদপুর
শিলিগুড়ি

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : এস, কে, গঙ্গোপাধ্যায়।

হুইতেছে তাহা নয়, বিশ্রোহী বস্তুপূঞ্জের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহাকে সুন্দর করিয়া তুলিতেছে।

“তব নৃত্যের প্রাণ বেদনায়
বিবশ বিবশ জাগে চেতনায়,

সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে।

জীবন-মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদমস্ত হে।”

সুখদুঃখ সেই নৃত্যছন্দের তরঙ্গের
তাপপড়া এবং জীবন-মৃত্যুর আক্ষেপ ও
উল্লাসে সেই নৃত্যের ডমরুর ধ্বনি।

এ হেন নটরাজের কবিশিষ্য তিনি।

“নটরাজ, আমি তব

কবি শিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মূর্তি মন্দ লব।”

“প্রভু, এই আমার বন্দনা

নৃত্যগানে অপিচ চরণ-তলে, তুমি মোর গুরু;”

“অবসাদে যেন অনামনে

তাল ভণ্ড নাহি কর।”

নটরাজের কবিশিষ্যের ইহাই সম্যাস, কারণ গুরুর সঙ্গে বিশ্বনৃত্যে যোগ দেওয়াতে তাহার মন বন্দন-মুক্ত। এই বিশ্বনৃত্যে তাল ভণ্ড হইলেই নটরাজের অভিশম্পাত বর্ষিত হয়, তখন আবার দীঘ সাধনার দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় (শাপমোচন)।

“এই পশ্চত কাল লিখোঁছ এমন সময় ডাক পড়ল। মেয়েরা স্বত্বরূপ অভিনয় করবে আজ দুঃখা খেলায়। তাদের অভ্যাস করাতে হবে। ওরা অশপাণিমার লতানে রেখা দিয়ে গানের সুরের উপর নকশা কাটতে থাকে। মনে মনে ভাবি এর অর্থটা কী! আমাদের প্রতিদিনটা লাগ-ধরা, ছেঁড়াখোঁড়া, কাটাকুটিতে ভরা। তার মধ্যে এর সংগতি কোথায়। যারা লোকহিত-ব্রতপরায়ণ সমাজী তারা বলে বাস্তব সংসারে দুঃখেন্দ্রীয়া শ্রীহীনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে এই বিলাসের অবতারণা কেন। তারা জানে দরিদ্রনারায়ণ তো নাচ শেখেন নি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবলি ছটফট করে বেড়ান, তাতে ছন্দ নেই। এরা এই কথাটা ভুলে যায় যে, দরিদ্র শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনের চিন্তাটাই যদি একান্ত সত্য হতো তাহলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগতো না, এটাকে পাগলামি বলতুম।

“দরিদ্রনারায়ণকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনেই বসাতে হবে, তাকে লক্ষ্মীছাড়া করে রাখবো না। আমাদের পুরোশ শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্রবেশ আর অশপাণীর তার ঈশ্বর্য, বিবেক এই দুইয়ের মিলনেই সত্য। সাধুরা এই মিলনকে যখন স্বীকার করতে চান না, তখন কবির সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তখন শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দাহাই পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সকল অন্তর্ভাবের নান্দ্যভেদ আহ্বান করবো যারা ‘বাগধারিণি সংপূজ্যে।’ হৃদয়ের মধ্যে অভাব ও অভাবের সূচকতার লীলা।” পথে ও পথেরপ্রান্তে; পত্র ৪৭

কবি বাঁহাদের লোকহিত ব্রতপরায়ণ

লক্ষ্মীসী বশিরাছেন তাঁহারা নটরাজের
ভাঙন-ধরাণে চরণখানার লীলাই দেখিতে পান,
কাজেই তাঁহারা দেখেন, বাস্তব সংসারে
দুঃখেন্দ্রীয়া শ্রীহীনতার অন্ত নেই। কিন্তু কবির
দৃষ্টি পূর্ণতর, তিনি নটরাজের নৃত্যের সবটা
দেখিতে পান, কাজেই তাঁহার কাছে সবদুঃখ
মিলিয়া বিশ্বব্যাপার সুন্দর—বাস্তবের ময়লা
ছেঁড়া পদাধিনাই। একান্ত নয়। আর এই
বাস্তবের অপরিচ্ছন্ন জীর্ণ পদাধিনা অপসারিত
করিয়া দিবার উপায় নৃত্য, শিশু। নৃত্যের
আনন্দের অভিঘাতে পদাধিনা সরিয়া গেলে
দেখিতে পাওয়া যায় বাস্তবের লক্ষ্মীছাড়া
দরিদ্রনারায়ণই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীসিনাথ নারায়ণ।

এই পত্রখণ্ডে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার
মতো। কবি ‘দরিদ্র নারায়ণের’ রূপক লইয়া
আরম্ভ করিয়াছেন বটে কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া
শিবের রূপে বারংবার ফিরিয়া আসিয়াছেন—
নটরাজ যে শিবের অন্যতম রূপ।

উপরিউক্ত অংশগুলির সাহায্যে কবির
নৃত্যতত্ত্ব হয়তো কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধিতে
পারা যাইবে। এবারে তাঁহার নৃত্যনাট্য
চারখানি লইয়া আলোচনা করা যাক।

‘শাপমোচন’

‘শাপমোচনকেই’ যথার্থভাবে নৃত্যনাট্য
বলা চলে—কারণ শাপমোচনের শাপের হেতু
গম্ভীর সৌরসেনের সংগীতকলায় তালভণ্ড।
নটরাজ জন্মমৃত্যু, ভাঙা গড়ার মধ্যে তাল
রক্ষা করিয়া বিশ্বনৃত্য করিতেছেন, যে-
হতভাগ্য তাঁহার তালের সঙ্গে তাল রক্ষা
করিয়া না চলিতে পারিতেছে জীবনে তাহাকে
দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। এই রকম এক
তাল ভণ্ডের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইতে
‘শাপমোচন’ নৃত্যনাট্যের উদ্ভব।

কিন্তু আর এক হিসাবে ‘শাপ মোচনের’
চেষ্টে পরবর্তী তিনখানি নাটক সম্পূর্ণতর;
প্রথমখানিতে কেবল ভাবাবেগের প্রকাশ;
দ্বিতীয় তিনখানিতে ভাবাবেগের সঙ্গে ঘটনার
বেগও আছে।

‘গম্ভীর’ সৌরসেন সুরজোলের সংগীত সভায়
কলানায়কদের অগ্রণী। সৌরসেন তার প্রেমসী মদুমতী
গোড়ে সুমেরুশিখরে সূর্য প্রদক্ষিণে। সৌরসেনের
মন ছিল উদাসী। তাই অবস্থানে তার মূগ্ধতা তাল
গেল কেটে, উর্বশীর নাচে শব্দে পড়ল বাধা,
ইন্দ্রাণীর কপোল উল্লস রাঙা হয়ে। স্থলিতহৃদয়
সুরসভার অভিধাণে গম্ভীরের দেহশ্রী বিকৃত হয়ে
গেল, অরুণেশ্বরের নাম নিয়ে তার জন্ম হল গাম্ভীর
রাজগৃহে।”

এইরূপে সৌরসেনের প্রায়শ্চিত্ত জীবনের
সূত্রপাত আরম্ভ।

আবার এদিকে—

“মদুমতী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে
রইলো, বললে, ‘বিচ্ছেদ ষাটওনা, দেবী একই
লোকে আমাদের গতি হোক, একই দুঃখ ভোগে,
একই অবমাননায়।’ শচী সঙ্কল্পে দৃষ্টিতে ইন্দ্রের
পানে তাকালেন। ইন্দ্র বললেন—তথাস্তু, বাও
মতৌ, সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে। সেই

দুঃখে ইন্দ্রপাতন অপরাধের ক্ষমা।” মদুমতী জন্ম
নিল মদুমতীকুলে—নাম নিল কমলিকা।”

সৌরসেন তাল ভণ্ডের অপরাধে বিকৃত
সৌন্দর্য অরুণেশ্বর হইল। তাহার কারণ
নটরাজের দুই চরণের লীলা-সামঞ্জস্য যে
দেখিতে না পারি জগৎ তাহার কাছে অসুন্দর।
মদুমতী কমলা কমলিকার সঙ্গে
অরুণেশ্বরের বিবাহ স্থির হইল।

‘রাজহস্তারী’ পুটে রক্তসনে মদুমতীসভায়
এসেছে মদুমতী অরুণেশ্বরের অশ্রু বিহারিণী
বীণা। শব্দ সংগীতে সেই রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে
কন্যার বিবাহ। যথাকালে রাজবধু এল পতিগৃহে।”

এবারে কমলিকার প্রায়শ্চিত্ত-পরীক্ষা
আরম্ভ হইল—কারণ জন্মতাল স্বামীর
অধীশ্বিনী বলিয়া দুঃখের অধঃভাগও যে
তাহার।

‘নির্বাণদীপ অশ্রুধার যথেষ্ট প্রতিরাতে স্বামীর
কাছে বধু সমাগম। কমলিকা বলে—‘প্রভু তোমাকে
দেখবার জন্য আমার দিন আমার রাতি উৎসুক।
আমাকে দেখা দাও।’.....

‘রাজা বললেন—প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড়
মিলনকে নষ্ট করো না এই মিনতি।”

মহিষীকে দুঃখিত দেখিয়া রাজা বলিলেন,
কাল চৈত্রসংক্রান্তির দিনে নাগকেশবের বনে
সখাদের সঙ্গে তাঁহার নৃত্যের দিন। রাণী
তখন যেন তাঁহাকে দেখিয়া লয়। চৈত্র
সংক্রান্তির রাতে আবার মিলন। রাণী বলিলেন
নাচতো দেখিলাম কিন্তু সেই দলের মধ্যে
একজন কুশ্রী কেন?

‘রাজা শব্দ হয়ে রইল। কিন্তু গুরু বললে,
ঐ কুশ্রীর পরম বেদনাতেই তো সুন্দরের আহ্বান।
কালো মেঘের লজ্জাকে সাক্ষ্য দিতেই স্বর্গরশ্মি
তার ললাটে পুরায় ইন্দ্রধনু, ময়নীরস কালো মর্ষের
অভিশাপের উপর স্বর্গের কন্যা যখন নামে
তখনই তো শ্যামল সুন্দরের আবির্ভাব। প্রিয়তমে
সেই বরুণই কি তোমার হৃদয়কে কাল যত্নে
করানি।”

‘দম-বিকৃতির পীড়া সহিতে পারিনে’—এই বলে
মহিষী আসন থেকে উঠে পড়ল। রাজা তার হাত
ধরে বললে, ‘একদিন সহিতে পারবে আপনাই
আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে। কুশ্রীর আশ্রয়োগে
সুন্দরের সার্থকতা।”

রাণী সূর্যোদয়ের মহোত্তে রাজাকে
দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

‘রাজা বললেন—‘তাই হোক, ভীড়তা যাক’
কেটে।’ দেখা হল। টলে উঠল যুগলের সংসার।
‘বী অনায়, কী নিষ্ঠুর বধনা’—বলতে বলতে
কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পাশিয়ে দেল।”

কমলিকা রাজগৃহ হইতে দূরে আশ্র-
নিবাসন করিল। রাণীর দুঃখের কারণ—
সুন্দর ও কুশ্রী, আনন্দ ও দুঃখ মিলাইয়াই যে
জগতের পরিপূর্ণরূপ—এ তত্ত্ব সে বোঝে
নাই। অসুন্দর-ভাটী জগৎকে, দুঃখ-ভাটী
জীবনকেই সে একান্ত ভাবিয়াছিল, কাজেই
প্রিয়তমও তাহার চোখে কুশ্রী। বিরহের
তপস্যায় এই পূর্ণতার বোধ তাহার মনে
উদিত হইল—তখন চোখের দৃষ্টির উপরে

জাতীয় শিল্পের সংগঠন
প্রচেষ্টায় আমরা আপনাদের
সহযোগিতা কামনা করি

প্রবর্তক ব্যাংক লি:

হেড অফিস:—৬১, বহুবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

স্থাপিত: ১৯২৯

শাখা

চট্টগ্রাম, চন্দ্রনগর, রাজসাহী ও সিরাজগঞ্জ।
সান্তাহার ও নৈমিসিংহ শাখা শীঘ্রই
খোলা হইবে।

সুদ:—সেভিংস ২%, কারেন্ট ৫%।
ফিক্সড ডিপজিট, ক্যাস সার্টিফিকেট,
প্রভিডেন্ট ফান্ড, লোন ও ওভার-
ড্রাফট সম্বন্ধে বিবরণ পত্র লিখিলেই
জানান হয়।

সুবিধাজনক সত্বে শেয়ার ও
কোম্পানীর বণজ লয় বিক্রয় করা হয়।
চেয়ারম্যান—শ্রীমতিলাল রায়

(প্রবর্তক সম্ব-প্রতিষ্ঠাতা)
ফোন বি বি ৪১৮

---যে সকল তথ্য আপনার আস্থা আনবে---

ব্রয়োবংশতিতম ত্রৈবার্ষিক হিসাববিকাশে দেখা যায়

উন্নততর মৃত্যুর হার—

এবং ব্যয়ের হার হ্রাস পাইয়াছে।

শতকরা ৩ টাকা সুদের হারে কোম্পানীর দেনাপাওনার হিসাব করিয়াও আলোচ্য
তিন বৎসরে নিট লাভের পরিমাণ ১,৫০,৮৮,০৯২ টাকা। তন্মারা বীমাকারীদের
তহবিলে বাড়িয়াছে আরও ৫৪ লাখ টাকা।

বোনাস | আজীবন বীমায় হাজার করা প্রতি বৎসরে ১২১০ টাকা
ঘোষণা | মেয়াদী বীমায় হাজার করা প্রতি বৎসরে ১০ টাকা

ও রি য়ে টা ল

গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

স্থাপিত:

১৮৭৪ সাল

ব্রাঞ্চ অফিস—ওরিয়েন্টাল
এসিওরেন্স বিল্ডিংস্

হেড অফিস:

বোম্বাই

২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ফোন: কলি: ৫০০

“কী ছাঁদে তেরী তেঁও এবে আজ...?”

যদি অভিজ্ঞ কুতল নারীর সৌন্দর্য এবং বিস্তৃত
নারিকেল তৈলই তাহার শ্রেষ্ঠ উপাদান।
বিশুদ্ধতা এবং গন্ধের অভিনব সৌকর্য্যের
জন্য “রস্কোর” প্রখ্যাত নারিকেল তৈল
সত্যই অতুলনীয়।

রস্কোর মুখ্যমন্ত্রি
নারিকেল তৈল
বিশুদ্ধ ও রমণীয়

ফ্রান্স রস. এও কোং লিঃ - কলিকাতা



এজেন্ট:—বেনলন এন্ড কোং (ইন্ডিয়া) লিঃ, ১২নং ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিঃ।

আর তাহার ভয়সা রহিল না, তখনই সে প্রিয়তমকে অপূর্ণ সৌন্দর্যে ভূষিত দেখিল।

রাণীর নিবাসনের বনের প্রান্তে রাণীর পরে রাণী রাজার বাঁশধানি ও নৃত্য চলিতে থাকে। এমন করিয়া কিছুদিন যায়।

“রাজ মহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—আজ আমি যাবো। আমার চোখকে আমি আর ভয় করিনে।”

“বাঁশা থাম্লে। মহিষী থমকে দাঁড়ালে। রাজা বল্লে—ভয় কোনো না প্রিয়ে, ভয় কোনো না।.....

“আমার কিছু ভয় নেই, তোমারই জয় হ’ল।— এই বলে” মহিষী অচিরে আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে। ধীরে ধীরে তুললে রাজার মূখের কাছে। কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে। বলে উঠল—প্রভু আমার, প্রিয় আমার, একী সুন্দর রূপ তোমার। কখন দুইজনেরই অগোচরে বিরহ বেদনার তাপে ইন্দের শাপ স্থানিত হয়ে পড়ে গেছে।”

রাণীর যে দৃষ্টিতে রাজাকে কুশ্রী মনে হইয়াছিল তাহা অসম্পূর্ণ, এখন যে দৃষ্টিতে রাজাকে সুন্দর মনে হইল তাহা পূর্ণ। এই পূর্ণতা লাভের জন্য তপস্যার প্রয়োজন—এক্ষেত্রে বিরহের দুঃখই সেই তপস্যার ভাপ। রাজাও বিরহের দ্বারা, দুঃখের শানির দ্বারা ছন্দঃস্থলনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া স্বর্গের সৌন্দর্যকে ফিরায়া পাইয়াছে।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

শাপমোচন ও নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার তত্ত্ব অনুসরণ। প্রেমের মোহ ও প্রেমের মূর্ত্তি মিলিয়াই প্রেমের পূর্ণতা। প্রেমে দুই-ই আছে, কিন্তু কোনটাই একান্ত নহে। যে কোন একটিকে একান্ত করিয়া দেখিলেই ছন্দঃপতন ঘটে—এবং দুঃখের দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন দুজনেই প্রেমের মোহটাকেই একান্ত বলিয়া মানিয়াছিল, কিন্তু পরে ভিতর হইতে আঘাত পাইয়া প্রেমের মূর্ত্তিকে মানিতে বাধ্য হইয়াছে এবং তাহার ফলে প্রেমের সত্যে আঁসিয়া উপনীত হইয়াছে।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার রঙ্গমণ্ডের পুস্তিকার ছায়াভিনয়ের উল্লেখ আছে। এই ছায়াভিনয়ের প্রসঙ্গে বলা যাইবে খুব সম্ভবতঃ এই ধারণাটিও কবি জ্ঞাত হইতে পাইয়াছেন। জাভাঘাত্রী পত্রে একাধিকবার ছায়াভিনয়ের উল্লেখ আছে।

“সেখানে মহাভারতের বিরট পর্ব থেকে ছায়াভিনয়ের পালা চলছিল। ছায়াভিনয় এদেশ ছাড়া আর কোথাও দেখিনি, জুতএব বাকিয়ে বলা দরকার। একটা সাদা কাপড়ের পট টাঙানো, তার সামনে একটা মস্ত প্রদীপ উজ্জ্বল শিখা নিয়ে জ্বলছে, তার দুই ধারে পাতলা চামড়ার অঁকা

মহাভারতের নানা চরিত্রের ছবি সাজানো, তাদের হাত পাগুলো দড়ির টানে নড়ানো যার এমনভাবে গথি। এই ছবিগুলো এক একটা লম্বা কাঠিতে বধি। একজন সুর করে গল্পটা আউড়ে যায়, আর সেই গল্প অনুসার ছবিগুলোকে পটের উপরে নানা ভঙ্গীতে নড়তে দোলাতে চলাতে থাকে। ভাবের সংগে সঙ্গতি রেখে গা মলান বাজে।” যাত্রীঃ জাভাঘাত্রী পত্র।

চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা সুপরিচিত গ্রন্থ, কাজেই তাহাদের কাহিনীর বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক।

কমলিকা ও চিত্রাঙ্গদা দুজনেই একই ভুল করিয়াছিল। খণ্ডদৃষ্টিবশতঃ প্রকৃত সৌন্দর্য কাহাকে বলে তাহারা বুঝিতে পারে নাই। কমলিকার চোখে রাজা কুশ্রী, আবার অর্জুনের প্রত্যাখ্যানে চিত্রাঙ্গদা বুঝিতে পারিল নারীর লীলত সৌন্দর্য তাহাতে নাই। বিরহের তপস্যাতেই দুই জনের পূর্ণ দৃষ্টি-লাভ ঘটিল। স্বামী বিরহিতা তাপিতা কমলিকা পূর্ণ দৃষ্টি লাভ করিয়া স্বামীকে দিয়া সৌন্দর্যে ভূষিত দেখিতে পাইল। আর চিত্রাঙ্গদার বিরহ আত্মস্বতঃ। দেবদত্ত সৌন্দর্যময়ী নারী প্রকৃত চিত্রাঙ্গদাকে আড়ালে রাখিয়া সব সুখ যেন ভোগ করিতেছে—এই দুঃখই চিত্রাঙ্গদার চিত্তে বলবান করিল; তখনই সে অনায়াসে দেবদত্ত রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় স্বরূপ সৌন্দর্য অস্তিত্বের দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াইতে সাহস সঞ্চয় করিল।

চিত্রাঙ্গদা ও প্রকৃতি দুইজনেই প্রেমাস্পদকে পাইবার জন্য অলৌকিক উপায় অবলম্বন করিয়াছিল; মদনের বর ও মাতার নাগপাশ মন্ত্র। অলৌকিক উপায়েই দুইজনে সিদ্ধকাম হইল। ইহাতে প্রেমের মোহের পরিচয়।

কিন্তু আবার দুজনেই মোহ ভঙ্গের সাহস অর্জন করিয়া অলৌকিকতার পাশ ন্যস্ত করিয়া প্রেমাস্পদকে ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রেমের পূর্ণতার প্রাপ্ত্যেই চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে কীর্তির পথে ছাড়িয়া দিল; প্রকৃতি আনন্দকে ছাড়িয়া দিল তাহার ধর্ম সাধনার পথে। একজনের বাঁধ সাধনা, অপরের ধর্ম সাধনা নষ্ট করিয়া তাহার প্রেমাস্পদকে খর্ব না করিবার ইচ্ছা। এমন যে করিতে পারিল তাহার কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে মিলন ও বিরহ মিলাইয়াই প্রেমের পরিপূর্ণ রূপ।

নাগপাশ মন্ত্রাবলম্বী যে আনন্দকে প্রকৃতি পাইবার মুখে ছিল, সে তো তৃষ্ণার জলপ্রাণী সাধন-সমুজ্জ্বল দিব্যমূর্ত্তি নয়; প্রকৃতি দৌল মস্তাহত এই পরিমলান পুরুষ আগেকার মূর্তির ভগ্নাংশ মাত্র। হস্তগত প্রণয়্যাস্পদের

ভগ্নাংশের চেয়ে ছাড়া-পাওয়া পূর্ণ মূর্তিকে প্রকৃতি কাম্যভর মনে করিল; তাই সে অনায়াসে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিল। চিত্রাঙ্গদাও যে অনায়াসে অর্জুনকে ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছে, তাহার ভয় ছিল পাছে তাহার মূখ-সৌন্দর্যের লীলা তরঙ্গিণীতে বীরকীর্তি বিসর্জন দিয়া বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন পূর্বতন অস্তিত্বের খণ্ডাংশে পরিণত হয়।

শ্যামার সমস্যা, নিদারুণ, এবং তাহার পরিণামের মধ্যে সাস্ত্রনার লেশ মাত্র নাই। কমলিকা, চিত্রাঙ্গদা শেষ পর্যন্ত প্রেমের সাধুতা লাভ করিয়াছে; প্রকৃতির তাগের মধ্যেই তাহার তৃপ্ত আছে। কিন্তু শ্যামার ভাগ্যে নিদারুণ অভিলাষনা ছাড়া আর কি জুটিল? উত্তায়ের মৃত্যুর পাপের জন্য যোধ কর এইরূপ পরিণামের প্রয়োজন ছিল। পাপের দ্বারা লম্ব প্রেম ভোগ করিবার সৌভাগ্য তাহার হইল না।

অরুণেশ্বর, অর্জুন ও আনন্দ শেষ পর্যন্ত সার্থকতার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু বন্ধু-সেনের ট্রাজেডি এই যে শ্যামাকে সে সত্যই ভালবাসে কিন্তু পাপবোধের চেতনা তাহাকে গ্রহণ করিবার পথের অন্তরায়। তাহার অধিক শ্যামাকে চাহে, অপসার্য সেই তৃষ্ণার ভূগার হাত হইতে ছিনাইয়া লইতেছে। সে জানে বিধাতা পাপকে ক্ষমা করেন কিন্তু তাহার ক্ষমাহীনতার জন্য তাঁহার ক্ষমা নাই।

“জানি গো তুমি ক্ষমিবে তরে
যে অভাগিণী পাপের ভারে

চরণে তব বিনতা,
ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা।”

নৃত্যনাট্য কথ্যানীর বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাযাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ইহাদের ভাঙ্গা সংগে ভাব প্রকাশের বাহনের কি নিগূঢ় যোগ! যে-কোন ঘটনাকে নৃত্যের দ্বারা প্রকাশ করিলে চলবে না, অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই। আবার নৃত্যনাট্যগুলিতে ভাব ও ভাব প্রকাশের বাহনের মধ্যে এমন দেহাঙ্গ যোগ আছে—এমন মনে করা চলে না। ভাব ও তাহার বাহনের মধ্যে অনিবার্য যোগ সাধনে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব। এই নৃত্যনাট্যগুলিতে যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্র সাহিত্যের অতি পুরাতন সত্য; তাহার যৌবনের রচনাতেই তাহা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই ভাবকে নৃত্য বাহনের হাতে সমর্পণ করিবার দৃষ্টান্ত নৃত্যনাট্যগুলি। জ্ঞাতো নৃত্যনাট্যের সজীব আদর্শ দেখিয়াছিলেন বলিয়া তিনি আংশিক স্বপ্নী; তাহার পূর্ণদর্শন আমরা রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে দেখিতে পাইলাম বলিয়া আমাদের স্বপ্ন কবির কাছে পূর্ণতর।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

অমৃত সালসা

৪৬ বৎসরের আবিষ্কৃত

স্বর্ণঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দ্রুত রক্ত পরিষ্কার হয় এবং ক্রীণ ও দুর্বল দেহ সবল ও পুষ্ট হয়। অনন্তমূলে ও ভোগাচীন প্রভৃতি ৮০ প্রকার শৈথিল্য শোধন ও বলকারক উপাদান এবং স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত এই অমৃত সালসা সকল ক্ষতাত ও সকল বয়সে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ। যে কোন কারণে শরীরের রক্ত দূষিত হউক না কেন, সর্বপ্রকার তাহা সংশোধন করাই প্রধান কর্তব্য। এই শৌণিত সংশোধন করে অমৃত সালসাই সর্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। বাত, খোসা, পচিড়া, চুলকানি, শরীরে ঢাকা দাগ, দূষিত রক্ত ও রক্তদূষিতজনিত শারীরিক বিকৃতি এবং স্নায়বিক দোর্বলতা অমৃত সালসা সেবনে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়। অমৃত সালসার আরও একটি অদ্ভুত ক্ষমতা—ইহা সর্বপ্রকার স্ত্রী-ব্যাদির মহৌষধ। ইহা সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যও অমৃত সালসা উৎকৃষ্ট ঔষধ। গুণের পরীক্ষা—অমৃত সালসা সেবনের পূর্বে একবার আপনাদের দেহ ওজন করিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন, সেহের ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন বলের সঞ্চার হইতেছে।

মূল্য ১ শিশি—১০, ডাক মাসুল—৫০ আনা। ৩ শিশি—২৫০, ডাক মাসুল—১৫০ আনা।

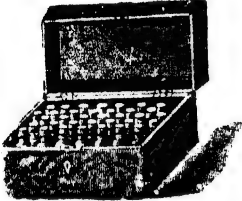
মহাশ্বাসারিষ্ট

শ্বাস, কল ও হাঁপানীর একমাত্র মহৌষধ।

শ্বাস ও হাঁপানীর মত যন্ত্রণাদায়ক ও প্রাণলব্ধ রোগ আর নাই। শ্বাসরোগ যেমনই কঠিন আমাদের মহাশ্বাসারিষ্ট তেমনই অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন মহৌষধ। ইহার ২১৩ লাগ সেকেন শ্বাসের প্রবল টান বন্ধ হয়। নিয়মিত সেবনে চিরন্তন শ্বাস ও হাঁপানীরোগ আরোগ্য হয়। ইহার শক্তি কখনও বিফল হয় নাই। মহাশ্বাসারিষ্ট হাঁপানী রোগীর পরম বন্ধু। মূল্য প্রতি শিশি ১১০, মাসুল—১৫০ আনা।

গৃহ চিকিৎসা সার বাক্স

মূল্য ১০, দল টাকা, ডাক মাসুল ১৫০ আনা।



সুসজ্জিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধের প্রচার ও ব্যবসাধারণের উপকারের জন্য বহু মূল্যবান ২৬ প্রকার ঔষধ সম্বলিত এই গৃহ-চিকিৎসার বাক্স বর্তমান দুর্দিনের বাজারে নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করা হইতেছে। এইরূপ একটি বাক্স প্রতি গৃহে থাকা একান্ত প্রয়োজন। চিকিৎসকগণও ইহার সহায়ে প্রস্তুত লাভবান হইবেন।

এই বাক্সের সহিত ১ একখানা “ব্যবস্থাপন” ও “কবিরাজী চিকিৎসা শিক্ষা” নামক ১ খানা পুস্তক অতিরিক্ত উপহার দিয়া থাকি। এই বাক্সের ২৬ প্রকার ঔষধের মধ্যে যে কোন ঔষধ পৃথক লাইলে প্রতি কোটার মূল্য ১, পাণ্ডায়ে। প্রত্যেক প্রকার ঔষধ ৫ সপ্তাহ করিয়া থাকে।

মধুপর্ণা

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যই কুলক্ষ্মীগণের পরম সম্পদ। নীরোগ ও সুস্থ থাকিলেই সেই সম্পদের প্রীতি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু রোগই সংসারে সুখ ও সৌন্দর্যের পরম শত্রু। বহু পরিশ্রম ও গবেষণালব্ধ আমাদের মধুপর্ণা নিয়মিত সেবনে যাবতীয় স্ত্রী-ব্যদি অতিক্রম আরোগ্য হইয়া কুলক্ষ্মীগণকে অতুল সুখ ও সৌন্দর্যের অধিকারী করে।

মাসিক ধর্মের গোলযোগ, প্রদর, বাদক, গুন্মা, ক্ষতগত ও জরায়ুগত দোষ এবং তত্ত্বানিত হাত, পা ও চক্ষু জ্বালা, মাথাধরা ও হৃদরোগ প্রভৃতি উপসর্গ দূর করিত মধুপর্ণার সম্যক ব্যবহার আর আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কারণে মধুপর্ণাই নারী সৌন্দর্যের অক্ষুন্নত আকর। তাই আজ প্রতি ঘরে ঘরে ইহার অপরিসীম আদর। মূল্য ১ শিশি—২১০ টাকা, ডাক মাস ১৫০।



বিশুদ্ধ পশ্মমধু ব্যবহারী চক্ষু-রোগের মহৌষধ। নানাবিধ চিকিৎসায় যে সকল চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় নাই এবং ছানি না কাটিলে যে চক্ষুরোগ আরোগ্য হইবে না বলিয়া ডাক্তারগণ বলিয়াছেন, সেই চক্ষুরোগ আমাদের পশ্মমধু আশ্চর্যরূপে

আরোগ্য করিবে। মূল্য এক শিশি ১, এক টাকা, ডাক মাস ৫০ আনা; তিন শিশি ২৫০ আনা, ডাক মাস ১৫০ আনা।

শিবশক্তি বটিকা

মালেরিয়া ও সর্বপ্রকার জ্বরের ঘন

অর কুইনাইন সেবনের প্রয়োজন নাই। মালেরিয়া, কালাজ্বর, নতুন ও পুরাতন জ্বর, পলীহা ও যক্ষ্মসংক্রান্ত জ্বর ও বিষমজ্বরের প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বরে আমাদের বহু গবেষণালব্ধ শিবশক্তি বটিকার শক্তি অসাধারণ। সর্ব সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ কৃতজ্ঞ ইহা পরীক্ষিত ও

প্রশংসিত। আর জ্বরের জন্য ভাবিতে হইবে না। বহু চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগী শিবশক্তি বটিকা ব্যবহারে নির্দোষরূপে আরোগ্য হইয়াছেন। মূল্য ১১১ ১ কোটি ১০০ আনা, ২১১ ১ কোটি ১১০ আনা, ৩১১ ১ কোটি ১৫০ আনা। ডাক মাস ৫০ আনা।

মকরধ্বজ

প্রতি তোলা—৫,
৩০ মাত্রা ১১০ টাকা।
বহুদুর্লভজারিত মকরধ্বজ
প্রতি তোলা—২০,
৩০ মাত্রা ২১০ টাকা।

সিদ্ধ মকরধ্বজ

প্রতি তোলা—৩০,
৩০ মাত্রা ৪, ১০ টাকা।
ডাক মাস ৫০ আনা।

কবিরাজ

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

মহৎ আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়

১৪৪১নং আপার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

চ্যবনপ্রাশ

১ শিশি—২০, ডাক মাস—৫০

স্বর্ণনাভি

আসামের—১ তোলা—

৫০, টাকা।

নেপালের—১ তোলা—

৪০, টাকা।

স্বর্ণভস্ম

১ তোলা—১২৫, টাকা।

বুদ্ধ ও মান্নিবা

শ্রী যতীন্দ্রমোহন বাগচী

চম্পানগরে 'সুবসন্তক'—বসন্ত উৎসব;
পথে উপবনে ভবনে-ভবনে উঠে তারই কলরব।
নগরীর নটী শ্রেষ্ঠ রূপসী গৃহবাতাসে একাকিনী বসি'
মুগ্ধ আকাশে মেলি' দিয়া তার ক্ষুদ্র নয়ন-মন,
জ্যোৎস্নাধারায় ভাসায় নীরবে বেদনার আবেদন!

সারা নগরীর বরসুন্দরী মল্লিকা নাম তার,
কৃষ্ণকলার শ্রেষ্ঠপ্রতিমা, মূর্তি সে প্রতিভার;
কত রস-রুচি শিল্প যতনে বাঁধে বাসা তার ঐ দেহমনে,
নৃত্য চিত্রে, সুরস বাণীতে তুলনা তাহার নাই;
যত জ্ঞানী গুণী নিশি নিশি আসি' সঙ্গাপ্যাসী তাই!

চম্পারাজে যুগ-রীতি,—যে-বা রূপসী কণ্ঠহার,—
অন্যে যুবতী,—প্রকৃতিরই মতো ভোগ্যা সে সবারকার!
জ্যোৎস্না যেমন স্পর্শ-উদার, মলয়া যেমন মৃদু-দুয়ার,
সেবা-অধিকার তেমনই তাহার সবার অনুক্ষণ;
সৌরভসম অকুণ্ঠ তার রূপ-রস-যৌবন!

—সেই মল্লিকা, কত না জনার কামা যে কামনার,
ক'র কামনায় আজ সে কাটায় বাগত নিশি তার?
যে পূর-গোষ্ঠী তার পাশে আসে নিতি সাক্ষে সুখসঙ্গপিয়াসে,
কোন বেদনায় দৃষ্টি তাহার ক'র আজ পরিহার,
পর্ব্যামিনী যাপে একাকিনী একান্তে আপনার!



সারা নগরীর সেরা যৌবন প্রণয়-ভিখারী তার;
একখানি মুখ শুধু তারই মাঝে মনে পড়ে বারবার;—
নগরপালের তরুণ কুমার নয়ন-মনের আনন্দ তার,—
আনন্দ নাম,—এ হেন সন্ধ্যা মিলন-বন্দ্য্য করি'
নবসাজ পরি' চোখেরই উপরি গেছে তারে পরিহার!

কাব্যরসের দোসর যোজন, সঙ্গীত-সহকারী,
নৃত্যকলার ছন্দে বশ্য অভিজ্ঞ অধিকারী;
তা'রে ছাড়ি' আজি নিষ্ফল রাত, নিঃপ্রভ চোখে চন্দের বাতি,
নমের সখা মমের সাথী সে ছাড়া নাই যে কেহ;
নিজরূপে তাই লাগে ধিক্কার, নিজগুণে সন্দেহ।

অদূরে কোথায় ডাকিছে কপোতী,—নিশি যায়, নিশি যায়;
জ্যোৎস্না-বিভোল মস্ত মলয়া থেকে থেকে শিহরায়!
মধু-মালতীর মন্দির সুবাস অধীর উছাসে ফেলে নিঃবাস;
পূরবাসী যবে মধু-উৎসবে ভরিছে রঙের ঝারি,
তারি মাঝে কাদে পিড়ি' মায়া-ফাদে বসন্ত-রাণী নারী!

চতুর্দশীর চন্দ্র লুকায় দূর দিগন্তপারে;
বাথাতুরা নারী তেমনই জাগিয়া বসি' বাতায়ন-ধারে;
কত-না চিন্তা, কল্পনা নানা বিহঙ্গ সম ব্যাপটিছে জানা,—
আহত বাথায় পথ নাই পায় বন্দ খাঁচার স্বারে,
সহসা যেন-বা টুটিল স্বপ্ন মনের অশ্বকারে!



—মনে হ'ল যেন পুষ্পবনের নিখিল গন্ধ হরি'
আকাশ ছাড়িয়া নামিল চন্দ্র আনন্দ-রূপ ধরি';
ধীরে ধীরে তার মুখে দিয়া চুমা, বলে নিশিতোর, ঘুমা সখি, ঘুমা,
অমনি ভগ্নল তল্লাজকিমা, ফিরে' এল সম্মুখে,
বাতায়ন-পথে প্রভাতের বায়ু শিখলা আচম্ভিত!

মনে পড়ে' গেল, গত বসন্তে হেন প্রভাতের কথা,—
প্রমোদবনের হিম্মালে সেই চঞ্চল ব্যাকুলতা;—
ফুল-রাশি জিঁড়ি ভাগ্যের হাতে বোদিন সহসা আনন্দসাথে
অঘটনমুখে সেই বৃকে-বৃকে চাকিতের পরশন,—
সুখা-বিষে-মেধা সেই সুখদেশা, শান্তিক্ত শিহরণ!

জাগ্রত চোখে পড়ে যেন সেই ক্ষণিক স্বর্গবাস,—
কোমার ভাঙা সেই লাজে-রাজ্য যৌবন উচ্ছ্বাস;
প্রেম-বোধ হীন গত জীবনের নর জাগরণ দেহ ও মনের—
মন্দির-অধীর সেই দুজনের চঞ্চল চোখের চাওয়া,—
সেই বিহ্বল পলকের ন্যায় আপনা হারিয়ে-যাওয়া!

তারপরে,—সেই নৃত্যসভার উদ্দম মধু-নিশি,—
রক্তের সাথে স্মৃতির স্মৃতি আজও আছে যেন মিশি'!
সেই দুজনের সুখ-সঙ্গতি ছন্দ ও তাল, বন্ধ ও যতি,
সুরতরঙ্গে নন্দিত গতি নন্দন-সভাপথে,
সারা নগরের গুণী-রসিকের বন্দিত মনোরথে!

সংকুতি-অশ্রুত ভাগ্যের মতো, হায়রে, ঘটিল কি যে—
সুর-সঙ্গতে কেটে গেল তাল-কেমনে সে বৃক্শেই যে!
আনন্দ যেন আনন্দ নয়, কোথা গেল সেই প্রীতি-পরিচয়,
মল্লিকা মনে মনে বিস্ময়, কি যে তার অপরাধ,—
প্রণয়ের পথে যাহে জীবনের ফরাইল সুখসাম!

—কত অভিমান—ভেসে গেল সব, সে মনে না পেয়ে সাজা
সেতারের তার কেটে যেন তার, বেদনায় সুরহারা!
এই কি সে প্রেম, এই ভালবাসা! এই কি নারীর প্রাণান্ত আশা,—
এরি লাগি' এত প্রাণের পিপাসা করেছে সে পরিহার,
হায়রে প্রণয়, নারীর ভাগ্য! হায়, তার অধিকার!

রূপজীবনী সে—নগরপালের গ্রহণ-যোগ্য নয়,—
বৃক্ষের মুখে ইঙ্গিতে শব্দ পেয়েছে সে পরিচয়!
প্রেমবন্ধন—তারও জাতিভুল! সমাজধর্ম—সেই নিভুল?
প্রাণের ধর্ম করে নিম্ন নিম্নে নিষেধের মানা,—
মানুষের গড়া আচার—সে দিব দেবতার দ্বারে হানা!

প্রাণের মন্ত্র অপৌরুষেয়,—বেদের উপরে স্থান,—
সাক্ষী তাহার অন্তরবাসী মানুষের ভগবান।
সংহিতা তার শাস্ত্রের বুলি চিত্ত তাহার তুলিল ব্যাকুলি,
তৃতীয় দৃষ্টি গেল যেন খুলি' সহসা তাহার ভাল,
বৃক্ষ বাঘিনী জাগিয়া উঠিল মনের অন্তরালে!

—লইল শপথ—করিবে না কমা, জীবন থাকিতে তার,
দৃষ্ট ছাড়িয়া অন্ত-হাতে অসহ অত্যাচার!
যেথা প্রাণ, সেথা শ্রম তাহার, তুচ্ছ আচার করি' পরিহার,
বিচারের বলে প্রাণের ধর্ম মানিবে সে শব্দ অজ্ঞ,
নিষেধের ভয় নাই গণি', অপরাধে নাই লাজ।

বিদ্রোহ তার অন্তরে জ্বলে, বিদ্রোহ বাণীমাঝে,
দৃষ্টি চোখে তার বিদ্রোহ-জ্বালা বহিঃশিখায় সাজে!
অতীতের রূপ—কোথা গেল আজ, নয়ন-ভোলান' প্রসাধন-সাজ
করিবে না আর,—সে যে বড় লাজ—প্রণয়ের অপমান;
বিদ্রোহে তার জাগিল নারীর মূর্ছিত সম্মান!

—শব্দ এক বাথা,—আনন্দ লাগি' প্রাণ করে হায়, হায়!
প্রেম-অঙ্কুরে অমর যে তরু, অন্যদের সে কি যায়?
মৃগাল-দণ্ড—যদি ভাঙ তারে, অন্তরে তার সূত্র না ছাড়ে
মমতা-ক্ষণ—বালির বেলায় সে কি কভু বাঁধা পড়ে?
গোপন-বাহিনী আপনা লুকায় শতধারে সে যে করে!



(২)

রাজপুত্রবীরের জাগিল প্রহরী, প্রভাতী উঠিল বাজি',
পূর্ব আকাশে উদিল অরুণ বাসন্তী রঙে সাজি';—
সহসা ডংকা পড়ে চারিভিতে— আজই প্রাতে এই চম্পাপুত্রীতে
উদবেন আসি' পুণ্যতিথিতে পূর্ণচন্দ্রসম—
প্রভু ভগবান সঙ্গত বৃক্ষ চিরপুদ্গমোত্তম।

অমাত্যগণসঙ্গে নৃপতি অমনি পদব্রজে
নগর-ভোরগে বসিতে চলিল বৃক্ষের পদরজে।
পৌষবৃক্ষ চলে সাথে-সাথে যার যা' সাধা, উপায়ন হাতে,—
আবালবৃক্ষ লজিতে প্রভুর দুল্লভ দরশন;
উৎসব ছুঁলি' নব উৎসাহে মাতিল সবাব মন।

রাজপুরীমাঝে সঙ্কীর্ণ সভা মর্মর চমকে,
শতেক শতেক চন্দ্রাতপের শব্দ বিতান ধরে।

কার প্রজ্জ্বল চারু শিলাতলে চিত্রাখন-শ্বেত শতদলে,
মুস্তার মালা ঝুলিছে ঝালরে অজস্র অগণন;
একান্তে তারই তথাগতেরে স্বর্ণ-সিংহাসন।

সহস্রদল পদ্ম যেন সে ফুটিল কনক-সরে;
শুকতার সম আয়ত নয়নে দীপ্ত করুণা ধরে!
মুণ্ডিতশির সন্ন্যাসীদল গৈরিক যেন গঙ্গার জল।
ঢালে শ্রাবণের বন্যার ধারা জনসমুদ্রমাঝে;
গদগদনাদী গোমুখী যেন-বা মানবকণ্ঠে বাজে!

স্বাগতম্! সুস্বাগতম্! দেব, অমিতাভ ভগবান!
'শরণং গচ্ছামি' বলি' সবে বিকায় মনঃপ্রাণ।
চারিপাশে যেন ভিক্ষুকদল, ভিক্ষু হইতে বাসনা প্রবল,
পরিশি' প্রভুর চরণকমল গাহে সঙ্গীত-গান—
জয় জয় জয় শাক্যতনয়, স্বাগত অধিষ্ঠান!

বন্দনাশেষে বুদ্ধ তাঁহার তুলিয়া পদ্মপাণি
আশিস সবরে ধীরগম্ভীরে বিলান অমৃতবাণী:—
জীবন-নাট্যের যাবনিকা তুলি' মম'দেশ দেখাইল খুলি'
দুঃখ-শোকের বিয়োগান্তক যত-কিছু অভিনয়:—
মিথ্যা জীবন, মরণের হাতে নিতি যার পরাজয়!

রূপ যৌবন মিথ্যা সকলই, মৃত্যু সত্য-সার;
প্রজ্ঞা সমাধি শাসনে কেবল পায় জীব উদ্ধার;
দুঃখশোকের শান্তি লভিতে সিংধ সাধনা চাই সমাধিতে,
বাসনার বীজ পাকিতে নরের নাহিক মোক্ষ-আশা,
ভোগের তৃষ্ণা ভুলাইতে নাহে দুঃখের দুর্বাসা!

প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অবধি চলিল তত্ত্বকথা:—
সব সভাজন একমনে যেন পান করে সে বারতা!
নুতন দর্শিত লীড়া আজ সবে দীন যেন ফিরে' পায় বৈভবে,
সুখের আলো যেন-বা পাড়িল অধমনিশির বৃক্ষে,—
মুষ্টি-তরণী মিলিল সহসা বুদ্ধ-কারার মূণে!



সারাদিন ধরি' শুনিল সকলে, অসীম ভাগ্য মানি',
মানবমনের মুক্তি-নিদান বৈরাগ্যের বাণী;
ভিক্ষুদলের গেরুয়াবর্ণে চম্পাবাসীর মানসপর্ণে
ঘনতর হয়ে ঘনাইল ধং গৈরিকরাঙা বাসে;
বুদ্ধচরণে যতেক যাত্রী মিলিল মোক্ষ-আশা।

অমৃতকণ্ঠে বৈরাগ্যের উঠে জয়-জয়নাদ;
পাণিমাচাড় করে শব্দে হেসে জ্বলন্ত প্রতিবাদ!
দলে-দলে লোক লড়িয়া দীক্ষা করে বৃদ্ধের করুণা ভিক্ষা,
শিষ্যপ্রধান আনন্দ শব্দে প্রভুর চরণতলে
ভিক্ষা জানায় জুড়ি' দুই পাণি, তিতিয়া নয়নজলে।

"জানি, দেব, তব অহেতুকী কৃপা এ অধমে সর্বদা,
তবু কেন দীনে মিলিলনা আজও তব 'উপসম্পদা'?
বৈরাগ্যের গৈরিকবাস পায়নি শব্দে এ অক্ষম দাস,
সবার অঙ্গে তব পবিত্র পতাকা দেখিতে পাই,
প্রীচরণে মোরে ঠাই দিলে প্রভু, তবু তা যে মিলে নাই!"

(৩)

বিয়ল বসনে বিয়ল ভূষণে হেনকালে মল্লিকা—
আঁখি-কোণে চাপা অশ্রুর আড়ে দু'টি প্রদীপ্ত শিখা!—
দুঃখচরণে নমি' বারবার জানায় কাতরে নিবেদন তার,
"তব নব বাণী শুনিয়াছি স্বামি,—সে শব্দে কথার মোহ,
অসত্য সেই তত্ত্বের মোর উত্তর,—বিদ্রোহ।

বিধির বিধানে বিশ্বের বৃক্কে তুমি আদি-বিদ্রোহী;
তোমার বাণীর বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ-কেতু বহি।

ভিক্ষুতে তব ভরিলে জগৎ বৃদ্ধ হবে এ সৃষ্টির পথ,
কিন্তু তোমার বিশ্বনাথের বিরুদ্ধপথগামী—
তোমার সত্য আমার মিথ্যা, তাই বিদ্রোহী আমি।”

শান্তিপন্থানে চাই’ তার পানে রহিয়া কতক্ষণ,
অরুণ হইল বৃদ্ধের আঁখি, করুণ হইল মন।
শ্রীকরপদে আঁত ধীরে ধীরে পরখটি তার বুলাইয়া শিরে—
সুতঙ্গ হইয়া প্রভু ভগবান রহিল নিরন্তর,—
তুয়ার গণিয়া করি’ পড়ে যেন করুণার নিব্বার!

ক্ষণপরে ধীরে কহে মল্লিকা কাটাইয়া অবসাদ,
“ক্ষমাবিত প্রভু, অথবা জনার অবিনয়-অপরাধ।
দুঃখ-সুখের নূতন তত্ত্ব, যেমন করেই বল সে তথ্য,
মোর কাছে শুদ্ধ নয় অথবা, অসত্য অতিশয়;
জরা ও মরণই সত্য যদি সে—যৌবন কেন নয়?

ফুলের গন্ধ ফুলের সুস্বাদু মিথ্যা তোমার কাছে—
বর্ণ গন্ধ সবই যদি মায়া,—সে কি ফিরে’ মরিয়াছে?
পুণি’মা-চাঁদ হোকা’ মায়া-ফাদি’ আধার-কায়ার সে যে প্রতিবাদ!
ভাগের অর্থ কোথা থাকে, যদি ভাগের কেহ না মানে?
প্রকৃতিরই তারা যমজ-পুত্র সৃষ্টির উপাদানে!

যে কামনা মোর রক্তে নাটকে, সেই তো জীবন মোর;
প্রাণতরঙ্গে মৃত্যু-ধারা যা’, সে কি বন্ধনডোর?
বাসনাই মোর সৃষ্টির মূল, তারে বল’ প্রভু, দৃষ্টির ভুল?
আলোক-বাতাস সার্থক কিসে? আমারই তো ইচ্ছা,—
মোরই কামনায় মূলরস পেয়ে তবে তারা প্রাণ পায়।

হিংসার কথা তুলিও না প্রভু, হিংসায় বাঁচে প্রাণ,—
একটো রাখিতে শতকে মারেন স্রষ্টা যে ভগবান!
এই জীবলোকে সজনে-বিজনে গিরি অরণ্যে গহে তপোবনে,
বিশ্ব ভরিয়া নিত্যানিয়াত যে সৃষ্টিলালা চলে,
হিংসাই তার প্রধান মন্ত্র—উগ্ৰীত পলে পলে।”

সুস্মিত মুখে বৃদ্ধ তথাপি রহিল বাক্যহীন;
যুক্তি যে তার ক্ষুরধার, বাকি, বৃক্কে তাহা উদাসীন!
আশিস-হস্ত রাখি’ তার শিরে স্নেহের আদর বুলায় সে ধীরে,
শুভ্রজপাটে চিন্তার রেখা বাকি-বা ফটিয়া উঠে,—
পুষ্পের বৃক্কে পিপীলিকাসম পঙ্কজ পত্রপুটে!

(৪)

চম্পানগরে আজ বৃদ্ধের এল বিনায়ের পালা,
বিজয়ের ছায়া শ্রীহীন করেছে বিজয়োৎসবশালা!
রাজের লোক নূতন ধর্মে ছোপায়ে বসন মনের মর্মে
প্রভুর কৃপায় ভিক্ষু-দীক্ষা লয়ে যায় দলে-দলে;
নানা উপদেশে স্তবে আরাধনে রাতি বাড়িয়া চলে।

বৃদ্ধ আদেশে আনন্দ আসি’ শূভদীক্ষার তরে
নতজানু হয়ে প্রভুর সম্মুখে বসিল ভক্তিভরে।
‘উপসম্পদা’ সবে সুরু হয়— মল্লিকা আসি’ এ হেন সময়
বন্যার মত ভাঙিয়া পড়িল বৃদ্ধের রাজ্য পায়—
অনুচ্যুত রহিল মন্ত্র,—বিশ্বদে, বেদনায়!

কুস্তলভার ধ্বংস এলায় প্রভুর চরণ-ঢাকি’—
পশ্ম বেড়িয়া লুটে যেন বাণ-বিশ্ব বনের পাখী! •
কার্দী কহে, “দেব, বড় দয়া শুনি, মোরে করি’ লহ তব ভিক্ষুণী
আজ হতে তব অপার কৃপার সঙ্গ না যাব ছাড়ি’,
সুখহারা এই শূন্য জীবন আর তো সহিতে নারি।”

উত্তরে শুদ্ধ কাঁহলা বৃদ্ধ করুণাসিক্ত স্বরে,
“মল্লিকা, শোন উপদেশ মোর ফিরে’ যাও তুমি ঘরে;
চম্পায় যবে ফিরিব আবার, সিন্ধু হইবে বাসনা তোমার,—
এত বাল প্রভু বাতার লাগি’ ফিরতে দাঁড়ায়ে উঠে;
মল্লিকামুখে, কি ভাবি, না জানি, আনন্দালোক ফুটে!

চম্পা হইতে সেই যাত্রাই হইল তাহার শেষ;
সুভাষিত্যমতে ধর্মবাণীতে ভরি’ দিয়া দিক্‌দেশ,
হিরণ্যবতী নদীর ওপারে কুশীনগরের অরণ্যধারে
ভিক্ষুপ্রয়াসী আনন্দ কোলে মাথাটি রাখিয়া তার—
শেষ-লিঙ্গবানে রক্ষিলা প্রভু নম্বর দেহ-ভার।



(৫)

কয় বৎসর গেছে তারপর, তথাগত কথাসেষ;
বৃদ্ধ-কিরণ সম্পাতে ধীরে উজ্জ্বলি, উঠে দেশ।
সংঘের কাজ লয়ে নিজ হাতে আনন্দ নব উৎসাহে মাতে,
কর্মের ভার বাঁহি’ চলে তার শূঁধেতে প্রভুর ঋণ—
কস্তুরীমৃগ আপন গঞ্জে ছুটে যেন নিশিদিন!

উদয় হইতে অস্ত অবধি বিশ্রাম নাই জানে;
যেথায় রাতি, পথের বাটী দেহ চলে সেইখানে।
কোথা নালন্দা, বিদিশা, কোশল, কোথায় মথুরা, পারা, পিৎপল
নূতন ধর্ম প্রচারের লাগি’ উদ্যম অনিবার,—
আর্মাবর্ত জড়ি’ বৃদ্ধের পড়ে জয়-জয়কার।

—চম্পায় সেই মধুপুণিমা, গত সে তো কতদিন,
জ্যোৎস্নায় মেধা কত সন্দেশো সেই হতে স্মৃতিজনীন;
কত দীক্ষা-বারু-বসন্ত ফুলবাস হয়ে হয়েছে অস্ত,
যৌবন-বনে কত বিহঙ্গ দিয়া গেছে সুখসাদা,—
প্রভুর কৃপায় আনন্দ কাছে সবই আজ সুরহারা!

—একখানি মৃৎ তবু থেকে থেকে চোখে ভেসে উঠে তার,—
কামনা-গড়া সেই মায়াভরা মূর্তি মল্লিকার!
প্রভুর স্নেহের প্রত্যাধিকারী বাকবৈভবে অপূর্ণ নারী,
ভিক্ষু-দীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে যার লাগি বারবার,
বৃদ্ধ আদেশে সঙ্গা যাহার করেছে সে পরিহার!

নীতি, উপদেশ, আচার, ধর্ম, দশশীল ব্যাখ্যান—
গুরুদর মা-কিছু গ্রন্থে গাঁথবে—এই আজ তার ধ্যান।
মীমাংসা ভারী করিবারে স্থির অহংসাথে যতক স্থাবির—
সম্মিলিত মহাসংগীতি করেছে সংগঠন—
রাজগৃহে আজই সন্তপণী গৃহায় সে আয়োজন।

উঠে কলরব, শব্দ উৎসব—সময় প্রভাতকাল;
গেরুয়া-ছটার রোরের আলো রাঙিয়া হয়েছে লাল!
দিক্দেশ হ'তে সভার জন্য মিলিয়াছে আসি জন-অরণ্য,—
কত উপাসক, কত দর্শক, কত-না ভক্তজন—
বারাণসী হ'তে শ্রাবস্তী সীমা-অপূর্ণ সে মিলন!

শোভাযাত্রায় চলে আনন্দ স্থাবির দলের মাঝে,
বৃদ্ধদেবের জয়গান সাথে তৃষ্ণা-উৎসাহ বাজে।
পুষ্পে ও লাজে ভরে ওঠে ঠাই, লোকারণ্যের সীমালেশ্য নাই;
বিরাট জনতা স্বিধা-বিভিন্ন ধীরে দেয় পথ ছাড়ি,
—এ হেন সময় বৃদ্ধবাসে কেবা আসে এ নারী!

(৬)

মল্লিকা আসি সহসা ধরিতে বসনপ্রান্তখানি,
চমকি 'থমকি' থামে আনন্দ, মুখে নাই তার বাণী!
প্রভুর আদেশ করিয়া স্মরণ চকিতে টানিয়া লয় সে বসন,—
সবল মূর্তির কবল হইতে নিষ্কৃতি নাই তবু,
ডাকে মনে মনে, "অশরণ জনে উদ্ধার কর, প্রভু!"

বৃদ্ধকণ্ঠে কহে মল্লিকা, "জানি তব পরিচয়,
আনন্দ মোর, বৃদ্ধ আমার, তুমি তো ভিক্ষু নয়!"
বৃদ্ধ প্রেমের দীপ্ত গরিমা ক্ষুধ প্রাপ্তের দূত মহিমা
সৌন্দর্যের নাই বৃদ্ধি সীমা আজ সে মল্লিকার;
শতজন্মের বাসনার শিখা ঢেকে জ্বলিছে তার!



প্রচণ্ড বলে আনন্দ তার বসন লইল টানি,—
সে শক্তি কিসে ব্যর্থ করিবে অবলার কণি পাণি?
সেই গুরুবেগে পড়ে সে ধরায়, শিলা-সংঘাতে চেতনা হারায়!
কুঠাবিহীন চলে আনন্দ না করিয়া দুঃপাত,
দ্রুততর পদে, ছাড়িয়ে যেন-বা মোহন মারের হাত!

গিরিগৃহাতলে মহাসংঘের নৈঋত্ প্রথামত
সিম্পাতের মস্তগা লাগি মাতে অহং যত।
পথ বল ও সন্ত আচার, সঙ্কুতভুক্ত, বিনয়, বিচার,
অহংসা, শূচি, ক্রোধ ও রুচি, সমাধি ও নির্বাণ;
তর্কে, আলাপে, মন্ত্রে ও শ্লোকে কেটে যায় দিনমান।

আগত গোথূলি,—কাটিল না তবু মৃদ্ধা মল্লিকার;
ভক্তেরা ডাবে—ভক্তির কিবা শক্তি চমৎকার!
এই তো প্রভুর সমাধি-সাধিকা, এই তো বৃদ্ধি ধর্মোপাসিকা,
আনন্দ শূদ্ধ উদ্ভা হ'য়ে চাহে দিগন্তপানে,—
দিনান্ত-চিতা যেথা হ'তে তার রক্ত নয়ন হানে!

সম্মাপরণে চেতনা লভিয়া ধীরে উঠে বসে নারী—
উৎসর্গ পাশে স্বিতীয় উৎস,—নয়নে উৎস-বারি!
সভা-শেষে যবে জন-অরণ্য শতমুখে গাহি ধনা ধনা,
এই পথ দিয়ে ঘরে ফিরে—গাহি বৃদ্ধের জয়গান,—
তার পাশে বাকি শিহরিয়া উঠে দৃষ্টির ভগবান!

(৭)

রাজগৃহে আজি ধ্বংসাবশেষ,—কেবা করে কার নাম?
কোথা বৈভার, সন্তপণী, কোথায় তপোদারাম!
কোথা অহংসা, কোথায় শান্তি? চিরমানবের মনের দ্রাবি
ভেমনই চলিছে—সেই আগে-পিছে জরা-মরণের পথ,—
দৃষ্ট-সুখের যুগান্তে চলে বিশ্বনাথের রথ!



সুখ-দুঃখের অসীত জীবন গড়িতে নতন করি
ত্যাগের ভিত্তি রচিতবার আশা ভোগেরই রাজ্য ভরি!

—কোথা গেল সেই পুণ্যকীর্তি? কোথায় বা সেই ত্যাগের ভিত্তি?
যেমন মানুষ তেমনি চলিছে প্রকৃতির নিরবশেষে,—
বাসনা হরণের আমূল্য হো আর পাখর হ'ল না শেষে?

কামনার হাতে নিষ্কৃতি পেতে, পাষাণে বাঁধিয়া বুক,
জড় লাগি' তপস্যা যে-বা, চাহি' মোক্ষের মুখ,—

কৃষ্ণকোঠিন সেই যে সাধনা— যদি বলি, সেও নতন কামনা,
সহজ মার্গ এড়ায়ে সে শুধু অন্য ভিন্ন পথ,—
সম্মাসনী যাহে খর ভেঙে যায় মরু-দরি-পর্বত!

দিনরাত্রির আধারে-আলোকে চলেছে কালের চাকা,

বাহি' বিচিত্র সৃষ্টির লীলা—বিভিন্ন রঙে আঁকা!

প্রকৃতির চির-নৃত্য-সভায় ছয় ঋতু নাচে ধরা-আড়িনায়,
শ্যামল-স্বর্ণ বিবিধ বর্ণে বারে-বারে ঘুরে-ফিরে;
চলিয়াছে চির-আরাতি-নৃত্য নটরাজ-অঙ্গিরে।

বৈরাগ্যের গৈরিকে নাহি যায় বস্ত্রের রাঙা!

ধরণী ভাসায় যে অশ্রু,—সে কি ছাড়ে বৈরাগী-ডাঙা?

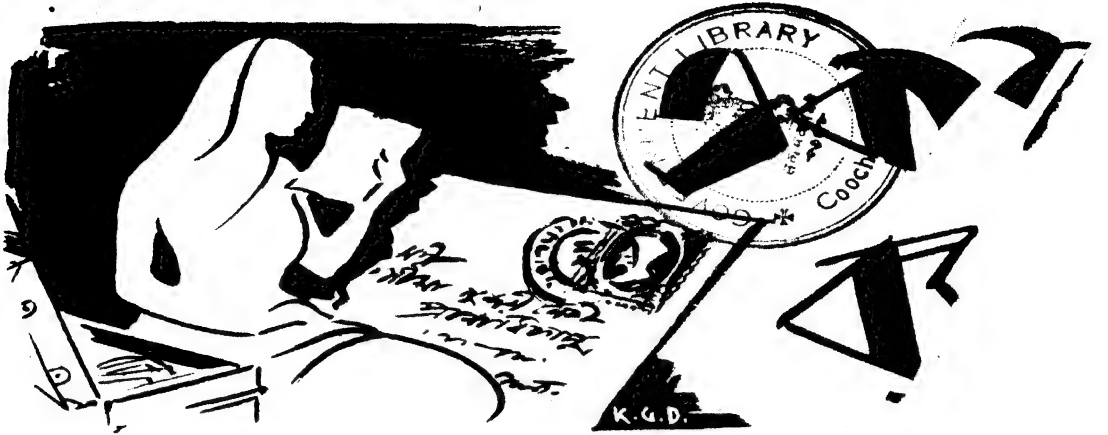
ভগবান এসে বলে যায় ভুল, সে ভুল কাটে না তবু একচুল!
বাসনা-কামনা তেমনই চলিছে মানবের সুখে-দুখে,
প্রণয়ের শিখা তেমনই জ্বলিছে প্রেমিকের বৃকে-বৃকে!

রাজগিরি-বকে আজও হেরি' সেই উষ্ণ-প্রস্রবণ,
মনে হয়, বৃক্ষি—মল্লিকারই সে অনন্ত ক্রন্দন!

কত-না বিহার, পত্ণ নবরূপে পরিণত আজি ধুবসের স্তূপে;
বিরহের চোখে অশ্রুধারাতে নিভে না সে প্রেম-শিখা;
—তাই ভাবি, একি! কারে ফিরে' দেখি—বৃন্দ, না মল্লিকা?

যে সকল ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তির উপর বর্তমান গাথা-
কাব্যটির রচনা সম্ভবপর হইয়াছে, দিল্লীর সুপরিচিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত
সুকুমার দত্ত মহাশয়ের 'মল্লিকা' আখ্যানটি তাহার অন্যতম। ভারতের
পিচারসহ ইতিহাস নাই; তাই, বৃন্দদেবসংক্রান্ত আড়াই হাজার বৎসর
পূর্বেরকার ইতিকথার উপাদানের উপর লিখিত বর্তমান প্রেমমূলক
কাব্যখানির দৌকর্যার্থ অনেকখানি কল্পনার রং চড়াইতে সাহস
করিয়াছি। কারণ কাব্য কাব্যই, ইতিহাস নহে।—লেখক।





১
বাথখুলে তাঁর এই চিঠিখানা পেলাম।
শ্রীমতী অসীমাসুন্দরী দেবী
প্রাণাধিকাসু,

দেখ তো, মিছি মিছি আমায় এত
ভাবিয়েছিলে। কত রকম 'হয়তো' যে এসে
আমায় চিন্তিত করে' তুলেছিল তার আর ঠিক
নেই। বড় চিঠি না লিখলে উত্তর দেবে না?
কত বড়? ক'হাত লম্বা ক'হাত চওড়া চিঠি
গাও? শেলী রবীন্দ্রনাথই তো তোমার প্রিয়



ভূমি আশার মনের কত নিকটে

কবি জানতাম, হঠাৎ 'মিলটন' ফরমাস করে'
বসছ কেন, পর তো দুল হঠাৎ 'পাইজোর'
চাইছ কেন বন্ধুতে পারছি না। যাক—চেষ্টা
করব তবু।

রাগ করেছি কি না? ভূমি এ অবস্থায় কি
করতে! রাগের চেয়ে আমার ভয়ই বেশী
হয়েছিল কিন্তু। আমার গা বেসে আশংকাও
থাকে যে। আমি কয়েকদিন থেকে রোজই

তোমার চিঠি আশা করছি। দু'একদিন পোস্টা-
ফিস পর্যন্ত গেছি। চিঠি না আসাতে সত্যিই
থব খারাপ লাগছিল।

আচ্ছা, তোমার কাসি এখনও সারছে
কেন বলত? কাসি একেবারে না সারা পয়
গান গেয়ে না। সেয়ে গেলেই গাইতে
কিন্তু। ভূমি লিখেছ, "ভগবান বোধহয়
করে' বিয়ের সময়টুকু পর্যন্ত গানের
একেবারে নষ্ট করে' দেন নি। ভগবানের
দয়া। আজকাল ভাবছেন এখন আর গান
কি দরকার....."

তোমার অসীম দয়াময় ভগবানকে
প্রভু যা যা করবার তা'তো করেইছ, এ
করে' তোমার দয়াটুকু ফেরত নাও, আ
গান গেয়ে বাঁচ। না হয় তোমায় কি
দেব! তোমার এই করুণাময় ভগবান!
আমার যে আলাপ নেই—থাকলে আমি
সিমে'র জন্যে অনুরোধ করতাম একটা
বাজানোটা ছেড়ে দিলে সত্যি সত্যি।
জনো ভাবছ কেন? তোমার টিউটারে
আমি যেমন করে' হোক পাঠাব। লিখে
শিখব। কিন্তু আমার নিজের জীবনে
যেটা পরে শিখব বলে' ফেলে রেখেছি
শেখা হয় নি। টাকার জন্যে ভেবো
অত সঙ্কোচেরও দরকার নেই, অ
আরম্ভ কর সেতার।

.....এখন রাগি অনেক। রাস্তায় এ
চলাচল বন্ধ হয়েছে। বারোটা বেজে
বোধ হয়। বোধ হয় বলছি তার কা
প্রোট 'টাইম পুঁসিটি' কেন জামি
সাতটা এগারো মিনিটে থেমে এ
যেন একটা তুমুল ভাব। পথ
যেন হঠাৎ কিছু দেখে মুগ্ধ হই
হঠাৎ কোন স্মৃতি এসে মনের

হুন্না উঠেছে। আমার কিন্তু
ঘনঘোর বর্ষা বেশি ভাল
হাসিনী প্রাণ উন্মাদিনী—
চেয়েও—

পাত মোদিত
মাতিয়া

ডাহুকী
তিয়া

ন লাগে আমার।
ন মূখের তুলনা
প্রিয়া ছিল না,
ও লাগে নি।
দর কোন-
একটুও
চাঁদের
দুরই।
নয়ে
ছ,

পাচ্ছি তুমি শূন্যে ঘুমাচ্ছ...এলোমেলো কায়কট।
চুল কাপছে কপালের উপর...কান দুটি চুল
দিয়ে ঢাকা...চোখ বুজে আমারই বালিশে মাথা
রেখে ঘুমাচ্ছ.....

২

কুড়ি বছর আগেকার চিঠি।

এক শূন্য কথাই? মনের কথা নয়? কি
জানি আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় মাঝে
মাঝে। বিয়ের পূর্বে এ'র সম্বন্ধে যা শুন-
ছিলাম, বিয়ে করে দেখলাম ঠিক সে-রকমটি
নন তিনি। কেমন যেন ভালমানুষ গোছের।
সর্বদাই আমার সামান্যতম অসুবিধা দূর
করবার জন্যে ব্যস্ত। তারপর ক্রমশঃ কতদিন
কাটল। ক্রমশঃ কেমন বদলে গেলেন যেন। এখন
মনে হচ্ছে ঠেকে চিনতে পারি নি। অথচ এক-
সঙ্গে কুড়ি বছর একাদিক্রমে এক ঘরে বাস
করেছি। এক বিছানায় শুলেছি। এ'রই সাতটি
সন্তানের জননী আমি। পাড়া-পড়শী আত্মীয়-
স্বজন সকলের চক্ষেই আমরা আদর্শ দম্পতি
ছিলাম। কিন্তু একথা আজ স্বীকার করছি,
আমাদের মনের মিল হয় নি। উনি যে জগতেব
লোক ছিলেন, সে জগতে আমি অস্বস্তি বোধ
করতাম। চিঠিতে ঠুর ম্য কান্ত-কোমল রূপ
টে উঠেছে, আসলে কিন্তু সেরকম লোক
নন না উনি। অত্যন্ত রাশভারি কড়া
জর লোক ছিলেন। পান থেকে চূণ
উপায় ছিল না। দিনরাত লেখাপড়া
থাকতেন এবং নিজ'নে থাকতে ভাল-
ব। কাছাকাছি কেউ জোরে কথা বললেও
হতেন। বকতেন, এমনকি মারধোরও
। ছেলেমেয়েরা এর জন্যে কত বকুনি
বি-চাকর কতবার লাঞ্চিত হয়েছে।
লে পশুরা যেমন নিজ'ন স্থান খুঁজে
, কারও সান্নিধ্য পছন্দ করে না, ঠুরও
নেকটা তেমনি ছিল। এক-আধ দিন
ীবনই উনি এমনভাবে কাটিয়েছেন।
র ঠুর বেশ সুস্থই ছিল। কেন যে
তন জানি না। মোট কথা, আমি
রিনি ঠুরকে। একটা জিনিস কিন্তু
কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। জীবনে
গান অকর্তব্য করেন নি। আমাদের
তক কোন অসুবিধা ঘটতে দেন নি।
'চে ছিলেন, আমাদের কোন কষ্ট ছিল
র পরও কোনও কষ্ট নেই। ছেলেদের
রে' গেছেন, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে
শহরে পাকা বাড়ি করে' গেছেন, লাইফ
ওরেন্স করে' গেছেন। সেদিক দিয়ে
র কোন কষ্ট নেই। তবে এতদিনের সংগীকে
একটা অভাব বোধ করছি বই কি।
কথা। তিনি ম'খে যদিও বলেন নি
(চিঠিতে অত কথা লিখতেন,
তেন না কিছু) তবু এটা আমি
ব'বে, তিনি আমাকে ভাল-
রনের সে ঘটনাটা ভুলব না

ডাক্তারবাবু আসতেই বললেন, "চিকিৎসা
জন্যে নয়—দেখা করবার জন্যে, ত্রেণে
পাঠিয়েছি। চল্লুম—"

"কোথায়?"

"কোথায় আবার। হুকুম এসেছে,—"

"ওসব কথা বলছেন কেন। কোন কষ্ট
হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, বুকের কাছে একটু। ওসব কিছু
নয়, সিমু তুমি একটা গান গাও—"

"কোনটা গাইব?"

"যেটা খুশি।"

ডাক্তারবাবুর দিকে চাইলাম।

তিনি বললেন—"হ্যাঁ, গান' না।"

ধরলাম—"জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে..."
গান শুনতে শুনতেই মারা গেলেন তিনি।

আজ নীলিমা আসবে। অত্যন্ত অধীর-
চিত্তে তার প্রতীক্ষা করছি। নীলিমার অশ্রুত
ক্ষমতা, তার শরীরে নাকি প্রেতাশ্রা ভর করে।



একবারেই চিনতে পারছো না—না?

যে কোন লোকের প্রেতাশ্রা সে নাকি আনতে
পারে। সেদিন বকুল মাসীকে আনিয়েছিল
নাকি। বকুল মাসীর গলার স্মরণ নাকি অবিকল
শুনতে পেয়েছিল তার ছেলেরা।

৩

নীলিমার চোখমুখ হঠাৎ কেমন যেন
বদলে গেল। চোখের দৃষ্টিও কেমন হয়ে গেল
যেন।

একি, এ যে ঠিক তাঁরই দৃষ্টি। নির্নিমেমে
আমার দিকে চেয়ে আছে!

"আমাকে ডেকেছ কেন?"

অবিকল তাঁরই গলার স্মরণ।

একটু ইতস্ততঃ করে' বললাম, "আমাকে
চিনতে পারছ না?"

"না।"

"একবারেই চিনতে পারছ না?"

"না।"

"আমাদের মনে পড়ে না তোমার?"

"না।"

"একটুও না?"

"না।"



‘চৈতে কুয়া, ভাদরে বান,—নরমুণ্ড গড়াগড়ি যান।’ খনার বচনে আছে। তেরশো পঞ্চাশ সালের কার্তিক মাস, লোকে ওই কথাটা নিয়েই আলোচনা করে প্রায় সারাদিন। গত চৈত্র মাসে কুয়াসা হয়েছিল কিনা—একথায় কেউ বলে—ওরে বাপরে! একবারে কাঁচা কয়লার খোঁয়ার মত চারিদিক ঢেকে গিয়েছিল; মনে নাই? কেউ বলে—হ্যাঁ-হ্যাঁ। মনে পড়েছে। কেউ ভুরু কুঁচকে গভীর চিন্তা করে মনে করতে চেষ্টা করে। কেউ ঘাড় নাড়ে যার অর্থ হ্যাঁ অথবা না দুই হাতে পারে। কেউ বলে—উঁহু! নাঃ; তা’ ছাড়া চৈত্রে কুয়াসার সঙ্গে নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাওয়ার সম্বন্ধটা যে কোথায় তা’ ঠিক ধরাও যায় না।

মিহির মুখুজ্জের কাঁচা বয়েস, তাজা রক্ত, তার ওপর ডাক্তার মানুষ, সে ঠেঁটি বোঁকিয়ে হেসে বলে—যে দেশে আকাশে অমাবস্যা লাগলে পায়ে বাত টাটায়, সেই দেশেই চৈতে কুয়াসা হলে আট মাস পরে নরমুণ্ড গড়াগড়ি যায়। মধ্যে মধ্যে চটেও ওঠে—বলে—মা চণ্ডী আছেন, শনি-সতানারায়ণ আছেন, বিপত্তারিণী আছেন তোমাদের—তাদের কাছে যাও না। রাত দুপুরে অমায় জ্বালাতে এস কেন? চরণোদক খাওয়াও গে রুগীকে—ওষু দেব না আমি। যা তোদের ওই চণ্ডীমায়ের পাণ্ডা ভট্টাচার্য্যর কাছে; যা—ভাগ—ভাগ এখান থেকে।

মিহির ডাক্তারের তয়ানক রাগ এই ভট্টাচার্য্যর ওপর। হ্রিপূরা ভট্টাচার্য্য—চণ্ডীমায়ের পূজক প্রবীণ মানুষ—অকৃত্রিম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আচারে আচরণে অতটু ফাঁকি নাই, চণ্ডীমায়ের সেবা করেন প্রাণ ঢেলে, চোখ বৃঞ্জে ধ্যান করতে ব’লে—চোখের কোন থেকে জল গড়িয়ে পড়ে, মায়ের নাম করতে আবেগে প্রৌড়ের ঠেঁটি দুটি কাঁপে—লোকে বলে—গভীর রাতে নিজনে মায়ের সঙ্গে হ্রিপূরা ভট্টাচার্য্যর কথাবার্তা হয়। পাথরের মূর্তি থেকে মা মা কি বেরিয়ে এসে

ভট্টাচার্য্যর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। অশ্রুত স্বাস্থ্য তাঁর—আজও পর্যন্ত কখনও ওষু খান নাই। কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা—গায়ে কখনও জামা কি চাদর কিম্বা আলোয়ান কিছু দেন না, মাথায় ছাতা নেন না, পায়ে জুতোর কথা এর পর বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এ গায়ের লোক—যারা অপর জায়গায় গিয়ে ভট্টাচার্য্যর গল্প করে—তারা অন্ততঃ প্রয়োজন বোধ করে না। ভট্টাচার্য্য হাসেন ডাক্তারের কথা শুনে। বলেন—উই পোকার পক্ষোপগমের আশ্ফালন। দু-জনের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা লড়াই চলে আসছে।

এই ঝগড়া চলে আসছে নেপথ্য স্বপ্নের মত। দু-চারবার মুখোমুখি ঝগড়াও হয়েছে। সেবার হঠাৎ একদিন মিহির ডাক্তারকে ডাকতে এল হ্রিপূরা ভট্টাচার্য্যর ছেলে। তার ছেলের অর্থাৎ ভট্টাচার্য্যর নাতির জ্বর হয়েছে; সাতদিন কেটে গেছে, কিন্তু জ্বর কোন-কমেই বাগ মানে নাই, দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, পেটে বেদনা, মাথায় ব্যস্তগা, জ্বর একবারের জায়গায় দিনে দুবার বাড়ছে, প্রবল জ্বরের সময় দু-চারটে ভুলও বকছে রোগী। ভট্টাচার্য্যর ছেলে ডাক্তারের হাত দুটি চেপে ধরে বলেছিল—ডাক্তার বাবু, খোকাকে আপনি বাঁচান।

ডাক্তার মনে মনে ভাবছিল—হ্রিপূরা ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে একটু রহস্য করবে কি না; কিন্তু অকস্মাৎ ভট্টাচার্য্যর ছেলের আবৃত্তিতে সে সম্প্রস্তু হয়ে উঠল—তার মূখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার চমকে গেল। ভ্রুলোকের দু-চোখের কোণ থেকে জলের দৃষ্টী ধারা গড়িয়ে পড়ছে। ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে দরদী পরমাখ্যায়ের মত বললে—এ কি? তার জন্যে আপনি কান্নাছেন কেন? জ্বর আর কার না হয়! চন্দন এখনি আমি বাচ্ছি, ভয় কি! আমি বলছি ছেলে ভাল হয়ে যাবে।

ভট্টাচার্য্যর ছেলের নাম গিরিজা; গিরিজা চোখের জল মুছে একটা গভীর শীঘ্র নিশ্বাস ফেলে বললে,— বাবা বলছেন ডাক্তার

বাবু—। আর সে বলতে পারলে না, বৃকের ভিতর থেকে কান্না শুনে উঠে তার গলার ভেতরটা খেন চেপে ধরলে, শব্দ তেঁট দাঁট খর খর করে কাঁপতে লাগল। বড়ো হাওয়ার তড়ানার অবস্থার পাজার মত।

—কি বলছেন আপনার বাবা? রাগে বিরক্তিতে ডাক্তারের কপালের মসৃণ চামড়া কুঁচকে উঠল, গলার স্বর রুঢ় হয়ে উঠল।

অনেক কণ্টে গিরিজা আত্মসম্বরণ করে বললে—বাবা বলছেন—ডাক্তার ডাকি ডাক, কিন্তু মায়ের ইচ্ছের ওপর কারু হাত নাই।

ডাক্তার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, বললে—মা তো পাথরের, তার আবার ইচ্ছে আনিচ্ছে কি?

গিরিজা শিউরে উঠল, কিন্তু প্রতিবাদ করে ডাক্তারকে চটাতে সে সাহস করলে না।

মায়ের ইচ্ছের কথা হ্রিপূরা ভট্টাচার্য নিজেরই বললেন ডাক্তারকে।

অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে ছেলেটিকে দেখে ডাক্তার চিন্তিত মুখেই বাইরে এসে কল বস্ত্র থেকে ওষুধ বের করে নিজের হাতে মিকশচার তৈরী করে দিলে, ইনজেকশন দিলে, একখানা কাগজে যথা সম্ভব সরল ভাষায় কখন কি করতে হবে লিখে দিলে। এতক্ষণ পর্যন্ত হ্রিপূরা ভট্টাচার্য একটা কথাও বলেন নি। এবার অশ্রুত একটা হাসি হেসে বললেন—দেখলেন?

—দেখলাম। টাইফয়েড। দেখাতে একটা দেবী হয়ে গেছে।

হ্রিপূরা ভট্টাচার্য নীরবে আবার একটা হাসলেন। ডাক্তার বললে—রোগ অনেকটা বেড়ে গেছে। তা হাক। ভর নেই সেরে যাবে।

ভট্টাচার্য ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়লেন। অর্থ তার সম্পদ।

ডাক্তার এবার ফেটে পড়ল। বললে—আপনি কি মানুষ?

ভট্টাচার্য বললেন—মানুষ বড় অসহায় ডাক্তারবাবু, তার কোন হাত নাই।

—কি বলছেন আপনি?

—ও ছেলে বাঁচবে না।

ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ভট্টাচার্য বললেন—সে কথা গিরিজাকে আমি বলেছি। তবে বাপের মন, যা করতে চায় করুক, আমি বাধা দেব না। কিন্তু—

কথা অসমাপ্ত রেখে হ্রিপূরা ভট্টাচার্য আবার হাসলেন।

ডাক্তার অত্যন্ত রুঢ় ভাষায় কঠিন কণ্ঠে বললে—আপনি এসব বলবেন না ওদের কাছে। ওরা নাভাসি হলে সেবা বর ঠিক মত হবে না, রোগীকে বাঁচানো সত্যিই কঠিন হবে।

হ্রিপূরা ভট্টাচার্য বললেন—মা আমাকে স্বপ্নে বলেছেন ডাক্তার-বাবু, ও রোগ সহজও নয়, কঠিনও নয়—ও রোগ মৃত্যু রোগ।

শব্দ একদিন নয়, আটটা দিন পর্যন্ত ছেলেটিকে নিয়ে যম-মানুষে টানাটানি চলল; এই আটটা দিনের প্রথম সাত দিন বাদ দিয়ে একশ দিনই হ্রিপূরা ভট্টাচার্য ওই একই কথা বলেছেন—একই হাসি হেসেছেন, একই স্থির শালভাবে বাইরের দাওয়াটির উপর বসে ডাক্তারের রোগী দেখে বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করেছেন। ডাক্তারেরও যেন জেদ চেপে গিয়েছিল, সে ফিজের কথা বলে নাই ওষুধের দরমার হিসেব রাখে নাই, নিজের থেকে প্রত্যাহ দূরার করে নিয়মিত রোগী দেখেছে, দরকার বৃদ্ধি রাখে পর্যন্ত থেকেছে; আটটার দিনের রাতে, একশ দিনের রাতে, আটটা দিনের রাতে সে সমস্ত রাতি রোগীর বিছানার পাশে ঠায় জেগে বসে থেকেছে। আটটা দিনের রাতে তিনটার পর মিহির বেরিয়ে এল রোগীর ঘর থেকে।

হ্রিপূরা ভট্টাচার্য হাওয়ার উপর বসেছিলেন, ডাক্তারকে বেরিয়ে আসতে দেখেই বললেন—ভারা মা! তারপর সম্পদ একটা পড়ীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—“সকাল তোমারই ইচ্ছা—ইচ্ছাময়ী তারা ভূমি।”

ডাক্তার রুঢ় স্বরে বললে—না। আপনার ইচ্ছাময়ী ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। অজ্ঞের টাইসিস কেটে গেছে।

ভট্টাচার্য আঁচ চমকে উঠল।

ডাক্তার বললে—কাল থেকে রোগীর অবস্থা ভালোয় নিচে চলবে মনে হচ্ছে। সবিস্ময়ে ভট্টাচার্য ডাক্তারের মুখের দিকে চাইল।

ডাক্তারের অনুমান মিথ্যা হ'ল না, ছেলেটি এরপর ধীরে ধীরে উঠল। পরিতাপের দিনের পর সে অল্পখা করলে।

আরও একবার হয়েছিল এমনি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ।

গ্রামের ধনী জমিদারের মাড়হীন দৌহিত্র, মাতামহ মাতামহ যাকে বলে চক্কর মণি; দূরন্ত ছেলে চুরি করে একটা সন্দেশ মা দিয়ে মেকের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল; তারপর ক্রমশঃ প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে ধনুকের মত বৈকতে আরম্ভ করলে। মিহির ডাক্তার লক্ষ দেখে অনেক অনুসন্ধানে আবিষ্কার করলে ঘোড়ার আন্তাব খেলতে গিয়ে হুটু খেয়েছে, পায়ের একটা আঙুলের নখ উঠে গেছে। কথাটা অনেক দিনের, তখন গত মহাযুদ্ধের আমল, ওষুধ এ



সবিস্ময়ে ভট্টাচার্য ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তখন তেমন তৈরী হ'ত না, ভারত মহাসাগরে 'এমডেনের' দৌরায়ে বিদেশ থেকেও মাল আসত না; মিহির ডাক্তারের যে ওষুড়ির দরকার ছিল সে কোনরকমেই পাওয়া গেল না। বড়লোকের বাড়ী, মিহির ডাক্তার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে না রেখে সম্পদই বললে—ওষুধ নেই—আমার কোন হাত নেই।

ওষুধের অভাবে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এসেন; দেব-মন্দিরে পূজা গেল, স্বস্তায়ন আরম্ভ হল। কলকাতার ডাক্তার মিহির ডাক্তারের কথাই সমর্থন করলেন—কোন আশা নেই।

মাতামহী মাৰ্বেল পাথরের মেনের উপর মাথা কুঁতে আরম্ভ করলেন; তার সে বৃক্কটা কামার বাড়ীটা ভরে গেল শ্বাসরোধী শোকের আবেগে। ছেলেটি বিছানার উপর পড়ে আছে—নিখর নিশ্বাস। শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে বলে পাজিরের উপরটা শব্দ মড়ছে; মধ্য মধ্য এক একটা আকোষ আসছে আর সমস্ত লোক শ্বাস ধুন্দ্ব করে স্থির দাঁড়তে রোগীর দিকে তাকিয়ে থাকছে—হয় তো হঠাৎ এখনি সব স্থির হয়ে যাবে।

সামান্য এক টুকরো ঐ তুলো জুড়ালিরে সুচটাকে পরিশোধন করে নেয়।
ডাক্তারখানার বাইরের দাওয়ার বসে শশী ডোম বলে—ডাক্তার বাবু!

—কে? শশী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি? কুইনিন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রোগীতে কুইনিন পাচ্ছে না, তাকে কোথেকে দেব রে?

শশী বললে—আজ্ঞে, তা হ'লে ষ্ঠে আমি মরে যাব বাবু।

রোগ ধরলে—। শশী চুপ করে বার। ডাক্তার একটু হাসে।
বলে—কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে? এই ধান চালের বাজার তার
ওপর তোর আবার রাত্রের কাজ! কি রে? ডাক্তার এবার হা-হা
করে হাসে।

শশী মাটির দিকে মুখ নামিয়ে চুপ করে থাকে। সেও
মুচকে মুচকে হাসে। এবং সে হাসিটুকু অপরের কাছে লুকোবার
জেনেই সে মুখ নামায়।

(দুই)

শশী ডোম এ অঞ্চলে সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি। সরকারী মহল
থেকে ভিখারী-নির্কারি, এমন কি এখানকার কুকুরগুলো পর্যন্ত
তাকে চেনে। সে হিসেবে শশীর খ্যাতিকে অস্বীকার করা চলে
না; তবে বিখ্যাত নয় কথ্যাত শশী এখানকার পাকা দাগী চোর।
শশী ম্যালেরিয়ার সময়টায় কুইনিন খায়। শুধু এবার এই নরমুণ্ড
গড়াগড়ি খাবার বছরেই নয়—বরাবরই সে খায়। “কাতকের সাত
সন্ধানের আট, ভাতার পুতকে যতনে রাখ, হাঁড়ি তুলে শূধাবি ভাত।”
এ সময়টার পেটপুত্রে খেতে দিতে পর্যন্ত বারণ আছে। শশী
সেও পালন করে। কুইনিন খাওয়ার উপকারিতা সে বন্ধে এসেছে
জ্বলে। সে অনেক দিন আগে—শশীর তখন কাটা বয়েস, জ্বলে

বোম্ব হয় মিতরীয়ারের জেল, বর্ধমান জেলে করেদীদের মধ্যে
কম্প জুর দেখা দিয়েছিল। সেই সময় সপ্তাহে দুদিন কি তিনিদিদ
করেদীদের ফাইল বন্দী অর্থাৎ সারিবন্দী দাঁড় করিয়ে জেল ডাক্তার
প্রত্যেকের হাতে দিত এক একটা কুইনিনের বাড়ি; তারপর জমাদার
হাকিম—স—র কা—র।

করেদীরা সেলাম দিয়ে টপাটপ মুখে ফেলে দিত কুইনিনের বাড়ি।
এর ফলে শশী ওই কম্পজুরের লক্ষ্যকাণ্ডের মধ্যেও মহাবীরের মত
অকম্পিত শরীরে দিন দিন উত্তরোত্তর শক্তি সামর্থ্য লাভ করেছিল;
সঙ্গে সঙ্গে সে উপলব্ধি করেছিল ‘কুইনিনের’ উপকারিতা। অবশ্য
আরও একটা বল তার ছিল—হিপদুরা ভট্টাচার্যের দেওয়া ‘মা-চণ্ডীর
আশীর্বাদী দিয়ে তৈরী করা মাদুলী; কুইনিন খাওয়ার সঙ্গে
মাদুলীটা ধুয়েও সে নিয়মিত জ্বল খেত। ডাক্তারেরা বলেন,
গ্রাউ সহযোগে কুইনিনের কার্যকরী শক্তি বেড়ে যায়; শশীর
ধারণা ভট্টাচার্যের মা চণ্ডীর মাদুলী খোয়া জ্বল সহযোগে ডাক্তারী
‘কুইনিন’ অব্যর্থ। “মালোয়ারীর বাবারও সাধা নাই যে কাছে
আসে।” শশী তার সহচর অনুচরদের বহুবার এ কথা বলেছে।
কিন্তু তারা তেতো বলে আর কাণ ভেঁ ভেঁ করে বলে কুইনিন
কিছুতেই বরপাস্ত করে উঠতে পারে না।

শশী মিহির ডাক্তারের দোকান থেকে ম্যালেরিয়ার সময় নিয়মিত
কুইনিন কিনে খায়, চণ্ডীতলায় যায় কোনদিন দুটো কলা, কোনদিন
দুটো শশা, কোনদিন বা গাভাখানেক উচ্ছে মায়ের উঠানে ঢেলে দিয়ে
প্রগাম করে, ভট্টাচার্য মশায়কে বলে—একটুকুন চমামোতা দেবেন বাবা!
ভট্টাচার্য প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না, শশীর হাতে চরণা-
মৃত দিয়ে বলেন—তোর ভক্তিতো অগাধ রে শশী—কিন্তু মা তাকে
সুস্মৃতি কেন দেন না সেইটে বুঝি না!

শশী চরণামৃতটুকু সুপ শব্দ করে মুখে টেনে নিয়ে হাতখানি
মাথায় বুলাতে বুলাতে দাঁত মেলে হাসে।

হিন্দুস্থান

ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিসঃ ৫ ও ৬, হেয়ার স্ট্রীট
কলিকাতা।

শাখাসমূহ

বড়গড় (উড়িষ্যা), বদরগঞ্জ,
ভবানীপুর, চক্ৰবর্তীপুর (বিহার),
ঢাকা, কাটোয়া।

বেনারস, বড়বাজার শাখা

শ্রীমতী খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরঃ

সমর চৌধুরী।

ডিরেক্টর-ইন-চার্জঃ

শান্তি গুহ।

জন স্বাস্থ্য কল্যাণে



মোন জিট্রিবিটর :-

প্রসিদ্ধ মিছরী বিক্রয় = ডুত নাথ গবাই
১৯৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা

ক'রে তুলুন ভারতকে এক মহাশক্তিমান দেশ

★ যুদ্ধ করছেন আজ
ভারতমাতা অতীতের
সেই বশত্ররপথ্যিনি
শ্রীদুর্গার মত অস্ত্রধার
হাত হাতে পৃথিবীকে
যুদ্ধ করবার জন্য।
যাকে উপযুক্ত অস্ত্রসম্পদে
সাজিয়ে দিয়ে পূজা
করুন।

দি ইণ্ডিয়ান
মেসিন টুল
ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ

ইতিহাসে অকুলনীর এই মহাবুদ্ধ সত্তি-
কারের কোথায় চ'লছে জানেন কি ? জলে
নয়, স্থলে নয়, আকাশেও নয়, এই
মহাবুদ্ধ চ'লছে পৃথিবীর বহুশক্তির
কারখানাগুলিতে।

দি
ইণ্ডিয়ান কাটলারী
ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ

সৈনিকের বুদ্ধিগুণের হাত হইতে যে
কল্যাণময় বস্তুজ্ঞ আজ পৃথিবীর শান্তি,
সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার
করিচ্ছে - জানেন কি যে সেই
বস্তুজ্ঞ নির্মাণের কারখানাগুলিতে
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন কাটিবার
যন্ত্রগুলির বাহা না হইলে
সমস্ত বস্তুজ্ঞই অসম্পূর্ণ ?

ম্যানোজিং এজেন্টস
ইণ্ডো-ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার্স
২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

ফোন - কলি: ১৮১৭

একমাত্র স্বত্বাধিকারী - প্রাইনটুয়ান ডট্টাচার্য

টেলিগ্রাম - 'ইটিস', কলি:

মিহির ডাক্তারের কুইনিন এবং ভটচাঁয় মশায়ের চরণামৃতের বলে বলীয়ান হয়ে সে গভীর রাত্রে বর্ষার ঝিপি-ঝিপি জলে ভিজে—হিমেল বাতাস গায়ে লাগিয়ে চুরি করে বেড়ায়।

মিহির ডাক্তার এবং ত্রিপুরা ভটচাঁয় দুজনেরই উপর সমান ভক্তিমান শশী। ডাক্তার এবং ভটচাঁয় দুজনেই এই নিষ্ঠার জন্য চার শশীকে না ভালবেসে পারেন না।

ডাক্তারের কথা শুনে শশী একটু চিন্তিত হ'ল। ডাক্তার জ্বলেন—সত্যিই কুইনিন আজ পাবি নে। শশীর মূখের হাসি মিলিয়ে গেল। 'কুনিয়ান পাওয়া যাবে না?'

দূরে আকাশে কোথায় গৌঁ গৌঁ শব্দ উঠছে। রাস্তার লোকজন মধ্যে মধ্যে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। ছোট ছেলেগুলোর হাড়-পাঞ্জিরা দল অবস্থা; কেউ দুদিন কেউবা চারদিন মাত্র জ্বর থেকে উঠেছে, এই অবস্থাতেও সব ছোট্ট বোরয়ে আসছে দর থেকে। 'উড়ো যাত্রা! উড়ো ভাড়া!'

শশী একবার আকাশের দিকে তাকালে, উড়ো জাহাজটা এখনও তার পড়বার মত করে আসে নাই, দেখা যাচ্ছে না। দেহতেও শিঙ হয় না। এক তো দেখে দেখে আরুচি ধরেছে প্রায়। সকাল দিকে রাতি দুপহর তিন পহর পর্যন্ত ও গুলোর বাওয়া আসার বরষ নাই; গোঙতে গোঙাতে যাচ্ছে আসাও; আসছে যাচ্ছে। যেন একখানা, কখন দুখানা—চারখানা, এক সপ্তক মধ্যে মধ্যে জ্বার দশ দিশখানা পাখীর দলের মত দাঁক হাঁধে উড়ে যায়। এর ওপর ওগুলোর ওপর শশীর ভয়ানক রাগ। তার ধারণা, ওইখানের প্রজা লাগাতেই এবার বর্ষার মেঘ ছিরবুটে গিয়ে এমন ধারার সর্বনাশ হল চলেছে—তাকেই ভাদ্রে এমন প্রলয় বান হয়েছিল।

ওগুলো নাশি যুদ্ধ করতে যায়। যুদ্ধ! কথাটা মনে করে শশী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এখানকার লোক বলে কাল যুদ্ধ! শে টাকা—পর্যদিশ টাকা মগ চাল! দশ টাকা বিশ টাকা জোড়া ঘুপড়, চিনি নাই, কেরাসিন তেল আনতে হয় ইউনিয়ন মোর্ডের টিকিট দেখিয়ে, সাগুর সের চার টাকা—ও সব দ্রবের কথা—ভাঙা রজা মোরামত করবার জন্যে একটা পেরেকের দরকার হয়েছিল শশীর—একটা পেরেকের দাম নিয়েছে চার পয়সা!

শশী দোকানীর উপর ভয়ানক চটে গিয়েছিল—একটা পেরেকের দাম চার পয়সা?!

দোকানী হেসে বলেছিল—এর পরে চার আনা দিলেও আর গাবি না।

পেরেকটা নিয়ে আমার বুকে ঠেকে বসিয়ে দাও, আরও চারটে যসসা দেব। বলে রাগ করে শশী একটা আনি ফেলে নিয়ে পেরেকটা নিয়ে এসেছিল। এবং সেই দিন রাতেই দোকানীর ঘোলা থেকে দুটি সস্তা ধান চুরি করে এর শেষ দিয়েছিল। শেষ বলা চলে না, নাজা দিয়েছিল বলতে হয়—কারণ দুটো বস্তু আর হস্ততঃ একমণ হসেসে দু'মণ ধানের দাম আঠারো টাকা দরে ভরিশ টাকা। শশী সবথ পেয়েছে পনেরো টাকা। চার পয়সার বদলে পনেরো টাকা—বুকের বদলে নাকের চেয়েও বেশী।

ধান চালের দরের দিক দিয়ে হিসেব করলে শশীর এখন রম সুসময়। এবং সত্যিই শশীর আর্থিক অবস্থা এখন ভাল। যো তার স্ত্রী একদিন একখানা পাঁচ টাকার নোট একটাকার নোট ৩ম করে—হাটে বাজার করতে বের করেছিল, খোদ দারোগা হাটে ছল—সে পর্যন্ত দেখেছে। কিন্তু তবু শশী ধান চালের এই বাজারের রন্য হাস্য করে। বৈশাখের শেষ থেকে ধান চালের অভাবে মানুষের সে হাহাকার, না খেতে পেয়ে মানুষের মরনের কথা মনে লে আজও শশী মনের মূখে বলে—ভগমান—কানে কালা করে দাও, চাখে কাণা করে দাও। না হয় তো একবারে জানে মেরে দাও যাব।

নরমুন্ড গড়াগড়ি যাবার সেই গৌরচন্দ্রিকা—অর্থাৎ আনন্দ। আষাঢ় শ্রাৱণে লোকে খেতে পেলে না, তারপর ভাদ্রে হল বান।

আকালের পর বান—বানের পর মড়ক। 'নরমুন্ড গড়াগড়ি' কথার কথা নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব, সত্যসত্য গড়াগড়ি যাচ্ছে। গ্রামে কাক নাই—বুকুর নাই—অগাহীন গ্রাম থেকে নরমাসে লেভে তারা শ্মশানে গিয়ে পড়েছে। গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণ কোনে শ্মশান;—ও দিকটার আকাশে প্রায় অহরহই শবুনের পাল—পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে দেখা যায়। শরীর শিউরে ওঠে। শ্মশানে মড়া পোড়াতে গেলে পাঁচটা দশটা মড়ার মাথা বাঁশ দিয়ে গড়িয়ে নদীতে না ফেলে চিতা সাজানো যায় না।

শশী সেদিন তার জাতি ভাইকে পোড়াতে শ্মশানে গিয়েছিল। কাটা খস, শর বীরের মত চেহারা, বুকের ছাতিখানা দেখে মনে হত যেন পাকা ভালগাছের গোড়া। আকালের বাজারে খেতে না পেয়ে হাড় পাঞ্জিরা বোরয়ে হয়েছিল যেন শবুকনো বেজুর গাছ। তারপর ধরল জ্বর, জ্বরের পরই হাট-পা ফুলতে শুরু হল। দিন পনের পর ঘরের চালের ফুটোয় তলপাতা দিয়ে ঢাকতে উঠে হঠাৎ কি হ'ল বলে চাল থেকে নেমে মাটিতে পা দিয়েই কাটা গাছের মত মাটির উপর তাড় খেয়ে পড়ে গেল। তাকে পোড়াতে গিয়ে শশী খানিকটা দূরে বসল। শরীর তার শিউরে উঠেছিল। চারদিকে মড়ার মাথা তার হাড়। ভাইপোর চিতা সাড়াতে চার চারটে মড়ার মাথা ছুঁড়ে ফেলতে হ'ল নদীর জলে। হরন অর্থাৎ হরেন্দ্র চিতা সাজাচ্ছিল—সেই কলমে উটা তাতী বউয়ের মাথা উঠা হ'ল ঘোষেদের ছোট্টকার আর উটা লাগছে যেন মাটিজীদের ফিউজী নেয়েটার।

হবে! তার আর আশ্চর্য কি? হরেন্দ্র ও বাজারের মড়া পোড়বার কঠ কেটে দেহবার কাজ করতে আরম্ভ করেছে। প্রায় প্রতি মড়ার সঙ্গেই সে শ্মশানে আসে।

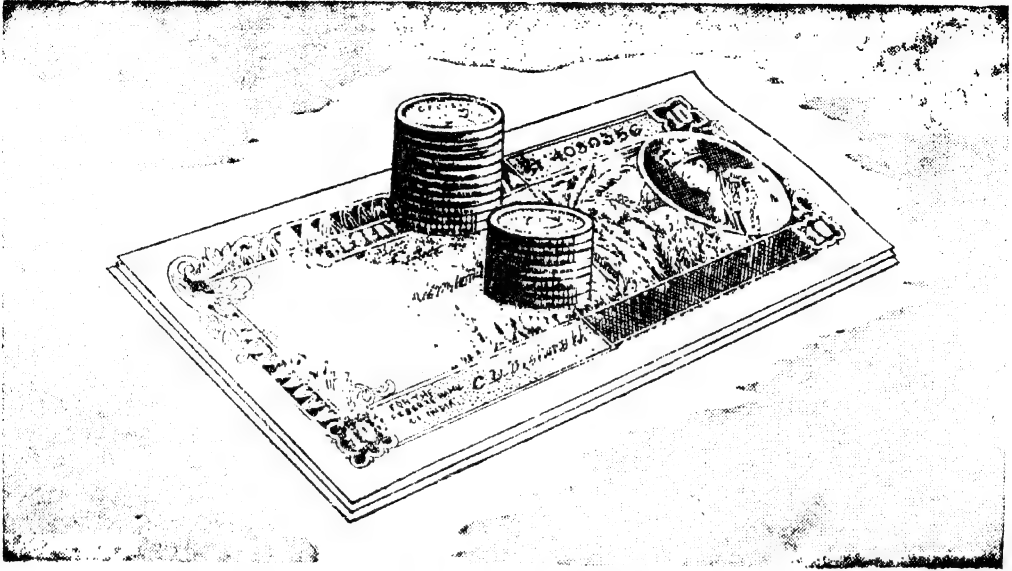
একজন বলেছিল—বাকী গুলো? হরেন্দ্র এবার চুপ করে গিয়েছিল। চারদিকেই মড়ার মাথা চোখ নাকে শবুনা গছের—দু'পাতি প্রকট দাঁত বের করে সমস্ত মাথাগুলো এবই বরষ দীর্ঘকাল চেঁচালা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে; জোর বাতাস দিলে গড়িয়ে কোনটা কার ভাঙলার গিয়ে ঠেকে কে তার হিসেব রাখা? মড়ার মাথার আশ্চর্য কিছু নাই, কেবল মরণ হয়েছে আশ্চর্যের। প্রথমে জ্বর, তারপর হাট পা দুখ মোলা, তারপর হঠাৎ কারুর মরুর হুচ্ছে কলবার মত তেজ দাঁম তেতই শেষ হয়ে যাচ্ছে; কারুর আর একটা পাঞ্জা জ্বর; অধিকাংশ লোকের কিন্তু মরণ আচম্বিতে, ভৈরবানি জ্বর এসব কিছুই না—আচম্বিতে মরছে। যে মরছে সেও জানতে পারছে না, অন্য লোকেও বুঝতে পারছে না—কখন কি হ'ল।

শশী সে দিন অনেক ভেবে চিন্তে বলেছিল—ভাবর মাসের পাকা হাল পড়ে যেন! শশীর উপমাটি হাস্যকর অথবা গ্রাম্য হলেও যারা ভাদ্র মাসে পাকা ভাল পড়া দেখেছে তাদের কাছে ওর মূল্য আছে।

তাতী বউয়ের মাথার কথা হরেন্দ্র বলছিল! তাতী বউয়ের জ্বর হয়ে হাট পা ফুলেছিল, সামান্য বেশী নয়। সে দিন সে সকালে উঠেছে, ঘরের কাজকর্ম করেছে, হাটবার ছিল স্বামীকে হাটে পাঠিয়েছে—নিশেষ করে বলে দিয়েছে—হিন্দুখানী আমদাৎ আচার-ওয়ালারা যদি আসে তবে একটুকুন আমদাৎ নিয়ে এস। দাস অর্থাৎ ত্রুতুবায় মশায় হাট থেকে ফিরে এসে দেখে দাওয়ার উপর আয়না চিরুণী, সিম্পল কোটো, জেলের বাটি রেখে বউ শূয়ে আছে পাশেই। শূয়ে নয়, মরে পড়ে আছে।

দস্তদের সেজ দত্ত রাতে খেয়ে দেয়ে শূয়ে সকালে আর উঠল না। দিল্লী যুগ্মসেনার মডই শূয়ে আছে, দেহ কাঠের মত শুষ্ক, স্রবের মত ঠান্ডা, মূখের পাশে খানিকটা গেঁজলা জমে আছে আর তারই চারিপাশে চোগেছে অজস্র কাঠ-বঁপ'পড়ে।

মিহিরী মানে মিশ্র বাড়ীর আট দশ জন লোকের মধ্যে থাকল শবু, দেউজন—একটা বউ আর ছোট একটা ছেলে, সেটাকে ধরতে



সম্রাথে বেঁচে কারও নয়!

সুদিনে গৃহে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করে—কারণ তখন টাকাপয়সা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কিছুরই অভাব হয় না, কিন্তু দুদিনে সবাই যায় দূরে সরে—তখন অশান্তি এবং কষ্টভোগের হয় পরাক্রাণী। দুদিনের এই কবালি গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ব্যাংক।

ব্যাংক একমাত্র বন্ধু জ্বলে আপনাকে সহায় সহিত সাহায্য করিবে যদি সুসময়ে আপনি কিছু কিছু সংরক্ষণ করিয়া ব্যাংকে গচ্ছিত রাখেন। ব্যাংকের সংগিত টাকায় শোধ আপনার ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করিবে তাহা নয়;—পরোক্ষে দেশীয় বাণিজ্য ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সাহায্য করিয়া জাতীয় কল্যাণে পালন করিবে।

জাতীয় উন্নতির মূল—আর্থিক উন্নতি

দেশের আর্থিক উন্নতি নির্ভর করে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর। এদের বাঁচিয়ে রাখতে ও উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে এবং দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারে একমাত্র বিপুল অর্থসম্পত্তিসম্পন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত ব্যাংক।

দ্য ড্রাজ্জলিং ব্যাংক

লিমিটেড।

কলিকাতা

OPS
SAINT: RAY

হলে আধখানার বেশী ধর চলে না। আট দশ জনের মরণ ঠিক ওই জন্মাসের পাকা তাল পড়ার মত। মাস খানেকের মধ্যে বাড়ীটা ফাঁক হয়ে গেল। তিন ভাইয়ের বড় ভাই গাঙ্গা খেয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসছিল, হঠাৎ একেবারে হঠাৎ একবার আঁ শব্দ করেই ঢুপ করে পড়ল মাটিতে মূখ গড়জে। মেজ জন গিয়েছিল কুটুম্ব বাড়ী। কালী পূজার দিন—বেচারি কুটুম্ব বাড়ীর পুজোয় মাংস খাবার লাভে যাচ্ছিল। কি যে হয়েছিল—কেমন ভাবে যে মরল সে কেউ দেখে নি—তবে দেখা গেল পথের ধারে একটা গাছ তলায় গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে মরবে পড়ে আছে। ছোটজন অবশ্য মাসখানেক ভুগে মরেছে। ছোট জনকে পুড়িয়ে এসে শ্মশান বন্ধুরা হাকিলে—গুড়ি কই, নিমপাতা কই? একটুও ঠিক করে রাখতে পার নি বাপদে? সামনের ঘরের দরজার সামনে একপাটি কপাটে মাথা রেখে মিশ্রগম্ভীর তিন সন্তানের শোকে কাঁদর হয়ে বসেছিল। উত্তর দিতে পারলে না সে।

রক্তস্রবের শ্মশান বন্ধুদের একজন বললে, আমরা তোমাদের ঢাকর নই। আমাদেরও মরণের ভয় আছে। হলে মরেছে—শোক হয়েছে জানি, সইতে না পার আমরা মর্জি নিমপাতা দাও, দিয়ে বরং পারতো গলার দড়ি দিয়ে, জল আছে ডুবে মরো, যা খুসী করো।

মিশ্রগম্ভীর তবু রুড়ল না। এবার একজন এগিয়ে এসে গা চলে বললে—শুনছ গো!—স—। তার মৃত্যুর কথা সে শেষ করতে পারলে না, চোখ বিস্ফারিত করে বললে—একি— এ কে— এ যে—। ততক্ষণে তার হাতের নাড়া ফেটুক পেয়েছিল—তারই ফেল মিশ্রগম্ভীর দেহখানা শক্ত কাঠের মত গড়িয়ে পড়ে গেল।

কদিন পরেই মরল মিশ্রদের মির্জিড় মেয়েটা। সেও মরে পড়েছিল, হাতের কাছে তেঁতুলের আচারের একটা পাতা—হাতে মুখে আচারের দাগ, লোভ হয় খেতে খেতেই মরেছে।

রজনী সরকারের বউ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছিল, একটু ভাড়াভাড়ি উঠছিল, হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় বৃকে হাত দিয়ে বসে পড়ল—তারপর গড়তে গড়তে এসে পড়ল একেবারে নীচে।

মানুষের মরণের ব্য্ত্তান্ত মনে করতে করতে শরীর হাত-পা কেন হিম হয়ে আসে। শরীর আলচান করে ওঠে। শরী অস্থির হয়ে নিজেকে নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কুইনিং না হলে তার চলবে কি করে? জবুর যদি হয় তারপর যদি হাত-পা ফোলে? রাতে ধান বোকাই বসতা মাথাং করে চলবার সময় কি পথের উপর পড়ে মরে থাকবে?

—কুনিয়ান আমার চাই ডাক্তার বাবু। দাম যা লেন—দোব আমি। কুনিয়ান আমার চাই। শরীর রক্ত কণ্টম্বর ও কথার ভগ্নগীতে ডাক্তার চমকে উঠল।

মিহির ডাক্তারও বড় রোখা লোক। সে তন্ময় চোখ রাঙানী কারুর সহ্য করে না, সে রাজা রাজডাই চোক আর শেঠ মহাজনই হোক কিম্বা দারোগা জমাদারই হোক। ডাক্তার জু কুচকে ঈষৎ ঘাড় বোঁকিয়ে তাকিয়ে বললে—না। তারপর আপনার কাজ করতে আরম্ভ করলে; একটু পর আবার বললে—যারা রোগে ভুগছে তাদের না দিয়ে ও ওষুদ তাকে দিতে পারব না। আর শেণী দাম নিয়ে ওষুদ আমি বেঁচি না।

শরী দমে গেল। আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আর এক উপায় আছে। ডাক্তারের কম্পাউন্ডার। সে দিতে পারে। বেশী দাম নেয় বলেই শরী আজও তার কাছে কুইনিং কেনে নাই। এইবার তাকেই ধরতে হবে। শরী রাস্তার উপর নেমে এসে দাঁড়াল। ডাক্তারের সামনে কম্পাউন্ডারকে কুইনিংর জন্য বলা যে উচিত নয় এ জ্ঞান শরীর টনটনে। ডাক্তারের পাশের ঘরে কম্পাউন্ডার চিনে-মাটির সাদা থলটায় খট খট করে ওষুদ মাড়ছে। এ দিকে তাকালেই শরী সট করে তাকে দৃষ্টি আঙুলের নাড়া দিয়ে ডাকবে।

কম্পাউন্ডার তাকিয়েছে; শরী হাত তুললে, কিন্তু ডাকা হল না। সে, কম্পাউন্ডার, ডাক্তার, অন্য যোগী যারা ছিল—সবাই চকিত হয়ে উঠল। থানার সামনে রাস্তাটা দেখেই পশ্চিম মুখ থেকে

বেঁক একেবারে দক্ষিণ মুখ ফিরেছে সেইখান থেকে রোল উঠল বল—হু—রি—, হরি—বো—ল।

কেউ গেল আর কি?

কে? ডাক্তার ভেবে দেখছিল—এক হতে পারে? কিন্তু ডাক্তারও ভেবে ঠিক করতে পারে না! চণ্ডীদাস দত্ত? হাফিজ সেখ? নিশী ময়রার পরিবার? মহাদেবের মা? আরও অনেক নাম মনে পড়ল। যে কেউ হতে পারে। যে কেউ। হঠাৎ মনে হল—হতে পারে না কেবল হাফিজ সেখ। ওটা তার ভুল হয়েছে। হিরিবোল তুলে হাফিজের যাবার কথা নয়।

মরণের আশ্চর্য কিছু নাই, এ ব্যক্তির বাঁচাই আশ্চর্য—কিন্তু তবুও সবাই রাস্তার ওইদিকটার উপর চেয়ে রইল। শরীও চেয়ে রইল। চারটে লোক অতি কষ্টে মড়া বেরে আনছে; মধ্যে মধ্যে দাঁড়াচ্ছে। সঙ্গে দৃষ্টি মেয়ে! একটা বড় মানুখ বলে মনে হচ্ছে। এতখানি যোগ্য!

ব—ল হ—রি—

—কে? কে মারা গেল? ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাওয়ার উপর দাঁড়াল।

—আনু, আনু। আনু ঠাকুর। ওই যে কেট দীঘির পাড়ে থাকত।

—আমার অনিরুদ্ধ, ডাক্তারবাবু, আমার সোনার অনিরুদ্ধ বাবা! চীৎকার করে উঠল একটা প্রৌঢ়া বিধবা—অনিরুদ্ধের মা। —ওরে বাবা আনু রে—; বলে সে সেই পথের ধুলোর উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। পিছনে একটা অবগুণ্ঠনবতী মেয়ে। ফোলে একটা বছর দুইরেকের ছেলে। ছেলেটিকে জড়িয়ে বেরিয়ে আছে দু'খানি হাত, আর মাটির উপর দেখা যাচ্ছে দু'খানি পায়ের পাতা। সমস্ত লোকের দৃষ্টি সেই দিকে নিলম্ব হল আপনা থেকে; কাঁচা সোনার মত রঙ; কোমল লাগবা যেন ঝরে পড়ছে ওই হাত দু'খানি থেকে। দু'গাঁহ রঙ চটা শাবা শাঁখা ছাড়া কোন গয়না ছিল না। কিন্তু ওতেই কি শোভা হয়েছে সে হাতের! আহা—হা।

শরীও চেয়ে দেখছিল ওই হাত দু'খানি। আনু'র মা বৃকে ফটিয়ে আত্মনাদ করছিল—কিন্তু সমস্ত লোকগলি সকলুগ অস্তরে আক্ষেপ করে ভাবছিল—ওই সোনার প্রতিমার মত মেয়েটির দুর্ভাগ্যের কথা!

ডাক্তার রুমাল দিয়ে চোখ মুছেল।

—আহ! হায়—হায়—হায়। মা! এ কি করলি মা! বক্তার কণ্টম্বর শুনে সকলে কিন্তু এবার সোনার প্রতিমার দিক থেকেও চকিত হয়ে দৃষ্টি ফেরালে। পূজার ফুলের সাজ হাতে নিয়ে কখন সকলের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ত্রিপুরা ভট্টাচার্য। তাঁর ঠোঁট দুটি কাঁপছে। চোখ দিয়ে ঝলরে ধারা গড়িয়ে আসছে; বেদনাকাতর নিঃশব্দক দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন ওই বয়টির নিকে।

ভট্টাচার্যের চোখের জল দেখে অকস্মাৎ শরীর চোখ দুটিও কর-কর করে উঠল। শরীও কেঁদে ফেললে। আহ—হায়—হায়—হায়! হে ভগমান! কয়েক মূহুর্ত পরেই সে কিন্তু নিজেই অবাক হয়ে গেল। আনু ঠাকুর মরেছে তাতে তো তার কাদবার কথা নয়! শবটা বহন করে তখন বাহকেরা যানিকটা এগিয়ে গেছে। শরী চোখের জল মুছে ফেললে। তার অন্তরের মাথা প্রতিশোধমূলক আক্রোশ জেগে উঠল। আনু ঠাকুর পুলিশের গুস্তচর। সাক্ষাৎ সয়তান। বদমাস—পাজীর একশেষ ছিল আনু ঠাকুর। কিন্তু আনু'র ষড় এত সুন্দর! শরী আশ্চর্য হয়ে যায়।

(তিন)

আনু ঠাকুর সিঁড়ি পুলিশের চর ছিল। এখানকার লোক সে নয়, পুলিশের দারোগাই তাকে এনে এখানে রেখেছিল। আনু'র গ্রাম থেকে আনু'র সমবয়সী জনককে ছেলে ধরা পড়েছিল—একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের নামলায়। আনু'র সমবয়সী হলেও আনু'র



প্রতিচ্ছবি

মনের মুকুরে সৌভাগ্য লক্ষ্যীর
প্রতীক অবলোকন করুন।
কালকাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক আপনার
সৌভাগ্যদূত, আপনার শক্তি, আপনার
নিজস্ব সৃষ্টি।



শাখাসমূহ

ব্যারাকপুর, খিদিরপুর, বগুড়া, বেনারস, নাগপুর,
নাগপুর সিটি, মোনাথভজন (ইউ, পি), যোৎমল
(বেরার), বারহাজ (জিলা গোরক্ষপুর) ও দ্বারভাঙ্গা।

ক্যালকাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক লিঃ
১৪/৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

বন্দু কোন কালেই তারা ছিল না। তারা ছিল কলেক্টরের ছাত্র, আনন্দ ছিল গ্রাম্য ঠাকুর অর্থাৎ ভুল সংস্কৃত মন্ত্র আউড়ে পূজা করে বেড়াতে। সেই মামলায় সে নিজেরা মিথ্যা কাফী দিয়ে পুলিশের সুনজরে পড়ে। সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আনন্দ নিজের গ্রামে মার্বভেঁয়া অফিসের জন্য এমন ক্রিয়াবল্যপ অনেক করেছিল—যার ফলে গ্রামে বাস করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। সর্বশেষে আনন্দ নিজের একখানা গেলাল ঘরে নিজে আগুন দিয়ে পুলিশকে জ্বালালে গ্রামের লোকে তাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। পুলিশ সমস্ত বৃক্ষে আনন্দকে গোপনে শাসিয়ে দিয়ে স্পর্শ জ্ঞান দিয়ে গেল যে, আনন্দ এ ভাবের অন্যায়কে তারা সমর্থন করতে পারবে না। ভবিষ্যতে বাধ্য হয়ে তাকে সাজা দিতে হবে। এবং সংপরমর্শ হিন্দেবে দারোগা তাকে জানালে, এ গ্রাম ছেড়ে ফুল্লরাপুর্নে গিয়ে বাস করাই তার উচিত। বাজারপ্রধান যায়গা। কাজকর্ম জটিল। থানার গোপন কাজকর্ম করলে তাতেও কিছু কিছু উপার্জন হবে। আর এখানে থাকলে আনন্দ বিপদ অনিবার্য। আনন্দ সেই এসে এখানে বাস করেছিল। আনন্দের মা লোকের বাড়ীতে দেবসেবার ভোগ রান্না করত, আনন্দ পূজা করত। অন্য সময়ে আনন্দ এখানে ওখানে ঘুরে যে সব খবর সংগ্রহ করত, জানিয়ে আনন্দ থানায়। আনন্দের জনেই শশী ধরা পড়েছে—তিনার। আনন্দের জনেই ডাক্তারের ফেরারী এক খড়্গতুত ভাই ধরা পড়ল সেদিন। গত আগষ্ট মুনভমেন্টের সময় থেকে ডাক্তারের ভাইকে পুলিশ ধরেছিল।

শুধু শশীই নয়, ডাক্তারই নয়, ত্রিপুড়া ভট্টাচার্য ও আনন্দের উপর সংযুক্ত হিঁসে ন। চণ্ডী মায়ের ঐ পূজক পদটির প্রতি আনন্দ সোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল। ভট্টাচার্যের পূজাপদ্ধতি ভুল, অবলো প্রত্নতির প্রতি চতুর চরসুলভ দৃষ্টি সজাগ রেখে ঠোরাফেরা সে অনেক করেছে; না পেয়ে, ভট্টাচার্যের নামে রটনা আরম্ভ করেছিল—“ত্রিপুড়া ভট্টাচার্য চণ্ডীহলা লুটে খাচ্ছে। হাতে নাতে প্রমাণ বাবা, সম্ভার সন্নয় ভট্টাচার্য যখন বাড়ী যায় তখন তার পোঁটলাটা দেখো!”

চণ্ডী মাঝে যে যা পুজো দেয়—তার একটা অংশ ভট্টাচার্যের বিধিমাট পায়। দেবস্থানের অংশটা ভট্টাচার্য মশাই ভাগ করে দেবভাণ্ডারে জমা রাখেন। আনন্দ বলত—বেড়ালে মাছ ভাগ করলে গেরমততে কি পায়? এখানকার লোকেরা কানা—কানা—কানা!

তাতেও যখন কিছু হল না তখন আনন্দ দারোগাকে বলছিল, চণ্ডীভলায় ফেরারী আসামীরা সমস্যা সাজে আসে। আমি নিজে দেখেছি, অল্প বয়েস, গাঁজা খায় না, ইংরেজী বই পড়ে।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়, একজন অল্পবয়সী লেখাপড়া জানা সম্যাসী এসেছিলেন চণ্ডীভলায়; বৃক্ষ ভট্টাচার্যের ভারী ভাল লেগেছিল সম্যাসীটিকে। যন্ত্র করে তিনি খাওয়াতেন—যেতে চাইলে আরও দু’দিন থেকে যেতে অনুরোধ করতেন। দারোগা একদিন এসে সম্যাসীকে জেরা আরম্ভ করলেন। —আপনার নাম কি? বাড়ী কাথায়?

সম্যাসী হেসে বলছিল—সে বলব না, বলবার নিয়ম নয়।

দারোগা তন্মাস করলে সম্যাসীর জিনিষপত্র। কয়েকখানা চিঠিপত্র পড়েই দারোগা থমতমত খেয়ে গেল। রিটার্ড ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর কেন্দার গাঙ্গুলীর চিঠি। প্রাণাধিকর, My dear son বলে পাঠ—ঘরে ফিরে সংসারী হবার জন্য অনুরোধ মিনি! দারোগার বর্ধিত বতই বাঁকা হোক এক্ষেত্রে সোজা জিনিষটা বুঝতে তার বিলম্ব হ’ল না। সে ক্ষণ চেয়ে বললে—যখন যা অসুবিধে হবে আমাকে জানাবেন। মানে—যা দরকার হবে আপনার। মানে প্রয়োজন হলেই জানাবেন আপনি।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চারিপাশ ঘুরে দেখে—কাকে বললেন জানি না—হারামজান্না বামন কোথায় গেল? আনন্দ—সেই আনুটা?

সেই আনু ভট্টাচার্য অফ মরল।

বারা আনন্দের শব্দধারা দেখে নাই—ভাদের প্রতিটি জন বললে একটা আপদ গেল। আনন্দের উপর কেউই সন্তুষ্ট ছিল না।

শশী এসে আপনার দাওয়ার উপর বসল, বারবার ভাবতে চেষ্টা করলে—আনন্দ মরেছে বেশ হয়েছে। কিন্তু বারবারই তার মনে হ’ল নরম সোনায় গড়া সুড়োল দু’খানি হাতের কথা। রঙ উঠে যাওয়া সাদা দু’গাছি শাখায় সে হাত দু’খানি কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল—সেই হাত দু’খানিকে নিরাভরণ কল্পনা করতে গিয়ে বারবারই তার চোখে জল এল।

শশীর স্ত্রী ঘরের ভিতর কাজ করছিল। শশীর পায়ের শব্দ সে চেনে। গভীর রাতে শশী যখন দুত এবং প্রায় শব্দহীন পক্ষেপে বাড়ী ফেরে—তখন সে জেগে কাণ পেতে বসে থাকে এবং শশীর পদক্ষেপ প্রায় শব্দহীন হলেও ওই অতিক্ষীণ শব্দের মধ্য থেকে বুঝতে পারে যে শশী ফিরছে। সে দরজা খুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার পাশে। শশীর পায়ের শব্দ শুনাই সে জল পরিপূর্ণ ঝক ঝক তক্তকে একটি কানার বাটী এনে তার পাশে নামিয়ে দিলে। শশী কুনিয়ান খেয়েছে—এইবার মাদুলী খোয়া জল খাবে। বাটীটার দিকে একবার চেয়ে দেখে শশী চোখ ফিরিয়ে নিলে।

বউ বললে—খাও।

শশী তার দিকে ফিরে চেয়ে বললে—উ?

—মায়ের মাদুলী খুয়ে জল খাও। ওই দেখ জল দিয়েছি।

হুঁ।

বউ চলে যাচ্ছিল। শশী ডেকে বললে—বোতলটা দে তো।

বোতল? শশীর বউ আশ্চর্য হয়ে গেল।

হ্যাঁ। আবার শশী বউয়ের দিকে ফিরে চাইলে। বউ আতঙ্কিত হয়ে উঠলো; এই ফিরে চাওয়ার মানেই হ’ল, শশী এইবার গা খাড়া দিয়ে উঠে এসে তার চুলের মূর্ছিতে ধরে মাটির উপর আছড়ে ফেলে দুটি লাগি মেঝে বলবে—হ্যাঁ, বোতল। শুনতে পাও না হারামজান্না! শশী উঠল। বউটা ভয়ে চোখ বজ্জে ঘাড় পিঠ সংযুক্ত করে হাত দুটি মাথার উপরে তুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। শশী কিন্তু বউকে মারলে না—সে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে বোতলটা বার করে খানিকটা নিজেরা মদ খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মনে হল বুদ্ধের ভেতরটা যেন হু হু করছে—মাথার তালু থেকে সমস্ত কপালটা কেন্দন কিম্ব কিম্ব করছে। গায়ে যেন বল নাই, পা যেন উলছে। এতটুকু মনে এতখানি নেশা শশীর কখনও হয় না।

ঘুরতে ঘুরতে সে এসে দাঁড়াল ‘লা-ঘাটার’ ঘাটে। সামনে নদী দেখে তার থেগাল হ’ল। ঘাটের পূর্ব দিকে শ্মশান। সে নিজেই চমকে উঠল। শ্মশানে তিনটে চিতা জ্বলছে। শশীর দেহ থেকে বল যেন নিঃশেষে চলে গিয়েছে, তার হাত পা নাড়বারও যেন ক্ষমতা নাই—তার মূখটা পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেল—হাঁ করে সে চেয়ে রইল ওই তিনটে জ্বলন্ত চিতার দিকে। মরণকে শশীর বড় ভয়।

ওপার থেকে খেয়া ডোঙাটা এসে এপারে লাগল। যাত্রী নাই। অকারণেই ডোঙাটা নিয়ে এসে এপার লাগালে নোটন মূর্চি—ডোঙার খেয়া মাঝি। চারিদিকে রোগ—রোগ আর রোগ—লোকের পথ হাটবার শক্তি কোথায়? যাবার আসবার মত মনের উৎসাহ কোথায়? তবু নোটন বসে থাকে ডোঙা নিয়ে; পেটের দায়, বিশ টাকা মণ চাল—সে চাল আসবে কোথা থেকে? যে দু’চারজন কি দশজন আসে—ভাদের পার করলেও কুড়ি পরস্রা হবে। সে ডোঙার ওপর বসে থাকে, আর শ্মশানের চিতার সংখ্যা গণনা করে যায়। ওতে নোটনের সময় কাটে। শশী নোটনের একজন বড় মজেল। বন্য়ার সময় দু’একদিন রাতে শশী নোটনকে ডাকে। নোটন তাকে পার করে দেয়। তার জন্য শশী যা দেয়—আজকালকার রোজকারের অনুপাতে সে নোটনের দশ বিশ দিনের রোজকার।

—শশী?

এ্যা? নিতান্ত বোকার মত শশী উত্তর দিলে।

—কিছু বলাহিস না কি? মৃদুস্বরে নোটন প্রশ্ন করলে। আজ রাতে ডোঙা চাই নাকি?

শারদোৎসবে

প্রিয় পরিজনদের সংগে মিলনের অর্থশত
আনন্দকে সার্থক করে তুলুন—পারিবারিক
জীবনের এই সুখশান্তিকে ভবিষ্যৎ
জীবনেও স্প্রতিষ্ঠিত করুন। আর্থিক
সচ্ছন্দতাই এই সুখ-শান্তির অন্যতম
উপাদান। আপনার ও আপনার পরিজনদের
ভবিষ্যৎ নিরপত্তা ও আর্থিক সচ্ছন্দতার
ভার ইস্ট এন্ড ওয়েস্টের হাতে সমর্পণ
করিয়া নিশ্চিন্ত হউন।

ইষ্ট এন্ড ওয়েস্ট

হিসি ওরেন্স কোং লিঃ
(হেড অফিস—বোম্বাই।)

চীফ এজেন্টস
মোহন এন্ড চৌধুরী
১০নং ক্রাইড রো, কলিকাতা।



সান বার্লী
পাল পাউডার

শিশু ও রুগ্নের জন্য
সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য-পানীয় এখন
জনপ্রিয় আকারসমূহে পাওয়া
যাইতেছে।

চিকিৎসকগণ কর্তৃক পরীক্ষিত
ও অনুমোদিত

দি নিউ স্ট্যান্ডার্ড বার্লী ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ
১০৫, কটন স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিহারের এজেন্টস—ওরিয়েন্টাল সাফল্যার্স, বেগমপুর, পটনা সিটি।
কলিকাতার চীফ ফ্যাক্টরি—বেঙ্গল সাফল্যার্স, ৩১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
আসামের এজেন্টস—শচীন্দ্রকুমার পাল, ৩৯, বীজুন স্ট্রীট, কলিকাতা।



SURYANIDHI DUSADHALAYA LTD. PEELKHANA, Dacca
Dr. P. SHEBEAN'S DRUG & CHEMICAL WORKS. Mg. Agt. MADHUSUDAN SAHA ESSENCE

মকরঞ্জ ও চ্যবনপ্রাশ

আসব, অরিন্ট, চূর্ণ, বটী, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি বিশুদ্ধতায় সর্বশ্রেষ্ঠ
অর্ধ শতাব্দীর উপর হইতে প্রচলিত

মাখন মলম

প্রাথমিক চিকিৎসা, কাটা, পোড়া খা, কণ্ডু, ক্ষত ও চর্মরোগের ঔষধ। বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ তৈলের গ্লিসারিনমুক্ত ও প্রীতিগন্ধময়, প্রতিষেধক প্রসাধন।

স্বর্ণ ও রৌপ্যদকপ্রাপ্ত, সুধীজনের প্রশংসিত

জনপ্রিয় ও সুলভতম

মেডিকেটেড ক্যাক্টর আয়েল

আমলা, তিল, বাদাম, নারিকেল তৈল ও প্রসাধন দ্রব্যাদি বিশুদ্ধতায়, পরিমিত গন্ধমাত্রায় এবং আয়ুর্বেদীয় ভেষজের সংমিশ্রণের
উৎকর্ষতায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

—ব্রাণ্ড—

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ কালীর বাজার,

২৬নং শিবতলা লেন, বড়বাজার—কলিকাতা,

হাওড়া ও চট্টগ্রাম।

সুধীনিধি ঔষধালয় লিঃ,

ডাঃ পি, শেখিনের

ড্রাগ অ্যান্ড কেমিকেল ওয়ার্কস

ম্যাঃ এঃ মধুসূদন শাহ এন্ড সন্স লিঃ,

পিলখানা, ঢাকা।

আনন্দের মা আবার হাউ হাউ করে উঠল। শব্দে আনন্দের মা
নয়, সম্মানবঞ্ছিতরা সকলেই চোখ মুদ্রণে। কিন্তু অবগুণ্ঠনাবত।

নর্দার্ন ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

(স্থাপিত-১৯২৯)

ভারতে অন্যতম বিশ্বস্ত
প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস—

৫ ও ৬, হেয়ার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

শাখাসমূহ

হাওড়া, বালীগঞ্জ, কদমতলা, পাবনা,
মৌদীনাপুর, সম্বলপুর, বেনারস ও
শ্যামবাজার।

বিস্তারিত, চাঁপডাঙ্গা ও দক্ষিণ কলিকাতা
শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন:

মিঃ এ. রায় চৌধুরী,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।



নামের অনুকরণই গুণের অনুসরণ নয়,

সামান্য নামান্তরে যেন প্রবঞ্চিত হবেন না—

* কণ্ঠদাবানল—চর্মরোগের জগৎবিখ্যাত মলম।

* সর্বজ্বরগজসিংহ—সকলপ্রকার জ্বরে স্থায়ী ফলপ্রদ।

* সর্বদ্রুহতাশন—সকল প্রকার দাঁদের শ্রেষ্ঠ মলম।

* শূলোগুণ—সকল প্রকার
বেদনার মহৌষধ।



সাবধান!

কিনবার সময় ঠিকভাবে খাটী জিনিস
দেখিয়া লইবেন।

এল, এম, শাহ সঙ্খানিধি

= এণ্ড কোং লিঃ =

হেড অফিস—ঢাকা।

গ্রাণ্ড—৩২-ই, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা।

ন্যাশনাল সিটি ইনাসুরেন্স লিঃ

১৩৫নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোনঃ—ক্যালঃ ২৭৮

সুলভ খরচে সর্বাধিক নিরাপদের সহিত জীবন-বীমা
করার আদর্শ পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৪৩ সাল আর একটি রেকর্ড স্থাপনকারী বছর

নূতন বীমা

৮,৫০,০০০ টাকার উর্দ্ধে

জীবন বীমা তহবিল

১,১০,০০০ " "

প্রিমিয়মের আয়

১,০০,০০০ " "

সম্পত্তি

২,৭০,০০০ " "

কে, সি, দালান
ম্যানেজার



গাঁহন গাভের নাইয়া

ফোটোশিল্পী—শ্রীঅনিল ঘোষ

ওই মেয়েটির কোন স্পন্দন চিহ্ন বুঝা গেল না। ভিজ় কাপড় তখনও প্রায় গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে লেগেছিল, তবুও কিছ্ বুঝা গেল না।

চরণোদক দিয়ে ভটচায় ভাড়াভাড়ি ঘাটের দিকে চলে গেলেন। ঘাটে কে বসে রয়েছে! উপু হয়ে বসে হাতের ছাঁদের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে ছিল শশী। ভটচায় বিরক্ত হয়েই বললেন—কে?

শশী মুখ তুললে। সে বসে বসে কাঁদছিল।

কি রে শশী, কাঁদছিস কেন?

শশী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। বললে—আঃ বাবাঠাকুর আমার নরণ কেনে হয় না?

—কি হ'ল তোরা?

আঃ—ওই সব কাঁচ কাঁচ মেয়ে বিধবা হচ্ছে বাবাঠাকুর, কত লোক মরে যেছে, এ যে আর দেখতে পারছি বাবা!

আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। ভটচায় অকস্মাৎ বরবর করে কেঁদে ফেললেন।

আনুর মা পৃথিবীতে অনেক কাল এসেছে। কোপার ঘা খেয়ে ছাদ যখন জমে যায়, তখন মুষলধারার বর্ষণেও যেমন গলে না—তেমনি ভাবেই আনুর মায়ের বুকের ভিতটা জমে গেছে। সংসারের নিষ্ঠুর অভাব অনটনের বর্ষণের মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটা বজ্রাঘাত হয়—তাতে ছাদের মত জমাট বুকটায় এক একটা চিড় খায়—সে ফাটল দিয়ে অঙ্গস্বল্প জল ভেতরে যায়, কিন্তু অধিকাংশই পিছলে বেরিয়ে যায়। সে চন্ডীতলাতেই বসেছিল চারটি প্রসাদের জন্য। ভটচায়ের টোঁটের কম্পন তার চোখ এড়ায় নাই। সে সেই সুযোগ স্নিকড়ে ধরেছে। একটা থামে ঠেস দিয়ে বসে সে ঢুলছিল।

হঠাৎ বউটি তার হাত ধরে টানলে।

—আঃ ছাড়। কি?

উত্তর না দিয়ে বউটি তবু টানছে। আনুর মা অভ্যাসমত বিরক্তিপূর্ণ উচ্চকণ্ঠে বললে—কি? আমার মাথা খাও তুমি! কি হল, কি?

বউ তার হাতখানা টেনে কোলের ঘুমন্ত ছেলেটির কপালের উপর রাখলে।

আনুর মা এবার ঈষৎ চণ্ডল হল, ভাল করে নিজে ছেলেটির কপালের উপর হাত দিয়ে দেখে বললে—ছাঁকছাঁক করছে যেন মনে হচ্ছে। হুঁ। তারপর সে বললে—ও তোমার কিছ্ নয়। রোদ লেগেছে। রোদ থেকে সরে বস। কথাটা বলে যেন তার তৃপ্তি হ'ল না, বউয়ের হাত ধরে টেনে সরিয়ে এনে বললে—“সরে—ব—স—”।

শশী উপু হয়ে বসেছিল তার আর সহ্য হ'ল না, সে রুচ-স্বরে বললে—কি রকম মানুষ তুমি ঠাকরুণ? যেমন বেটা ছিল তোমার, তেমনি তুমি? এইখানেই তুমি নড়া ধরে হিঁচড়ে টানছ, ঘরে গিয়ে তা হ'লে তো মায়াবা তুমি ধরে!

শশী জাঁততে ডোম, ও অণ্ডলে ছোটলোক বলে, কিন্তু সে দাগী চোর, সেই কারণে লোকে তাকে ভয় করে। আনুর মা তার ক্রুদ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে আত্মসম্বরণ করে বললে—ছেলেটার গা ছাঁক ছাঁক করছে বাবা, তাই বলছি রোদ্দুর থেকে সরে বস। তা কাণের মাথা খেয়ে কথা কাণে নেয় না আবাগী—তাই সরিয়ে দিলাম টেনে। আমারও ত বাবা মানুষের শরীর।

শশী এত সব কথা শুনছিল না, সে সেখাছিল—বউটি ওই ননীর মত হাত দু'খান দিয়ে ছেলেটির গলা জড়িয়ে ধরেছে। ছেলের কপাল নিজের গালে ঠেকিয়ে গায়ের উত্তাপ অনুভব করছে।

শশী বললে—জ্বর হয়েছে? ঠাকরুণ দেবী কর না। ডাক্তার দেখাও আজই।

—ডাক্তার?

শক্তি মিশ্র রসায়ন

জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় অনিয়মিত আচার ও বিহারের দ্বারা শরীরের সার বস্তু ক্ষয়জনিত সর্বপ্রকার দুর্বলতায় শক্তি মিশ্র রসায়ন অমৃত স্বরূপ। ইহা শরীরের সপ্ত ধাতুকে (রক্ত, মাংস, মেদ, রস, অস্থি, মজ্জা ও শক্ত) সংশোধিত করিয়া শরীরকে তেজোবান, মাংসপেশী ও স্নায়ুশ্রেণী সূক্ষ্ম এবং সজীবিত করতঃ জীবনীশক্তি, মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহা স্বাস্থ্য, বলবীৰ্য ও জীবনী-শক্তিবর্ধক বহু প্রকার তেজস্কর ঔষধের সারাংশের রাসায়নিক সংমিশ্রণে প্রস্তুত। এক মাত্রা সেবনেই ইহার আশ্চর্য শক্তি অনুভব করিতে পারিবেন। ইহা সেবনে স্নায়বিক দৌৰ্ব্বালা, বহুমূত্র, মূত্রাশয় ও প্রস্রাবের সর্বপ্রকার গোলযোগ প্রভৃতি আচার নিদোষরূপে আরোগ্য হইবে। প্রসবের ২-১১ মাস পূর্বে এবং প্রসবের পরে এই ঔষধ সেবন করিলে কুললক্ষ্মীগণের গর্ভাবস্থায় কোন রোগ, প্রসবজনিত অবসাদ ও দুর্বলতা বা কোন প্রকার সূতিকারোগের আশঙ্কা থাকে না। কঠিন রোগ ভোগের পরবর্তী শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা ও অবসাদ দূর করিতে ইহা অশ্বিতীয়। সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য শিশু, বালক, বৃদ্ধ, বগিতা ও পুত্রুষ সকলেই সকল ঋতুতে ইহা সেবন করিতে পারেন। শক্তিমিশ্র রসায়ন নিয়মিত সেবনে সর্বরোগ বিনষ্ট হইবে, শরীরের কান্তি, পুষ্ট, বলবীৰ্য বৃদ্ধি হইবে এবং নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুৎপন্ন হইয়া নব জীবন লাভ হইবে। ইহার প্রতি কৌটাই অমৃতত্ব। মূল্য ১ শিশি—২ টাকা, মাশুলদি ১০০ আনা। ৩ শিশি—৫০০ টাকা, মাশুলদি ২৫০ আনা।

মহাশক্তি সূধা

মহাশক্তি সূধা দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া ও সর্বপ্রকার জ্বরের যম। আর কুইনাইন সেবনের প্রয়োজন নাই। আয়ুর্বেদীয় উপাদানে প্রস্তুত এই মহাশক্তি সূধা সেবনে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগা ও যক্ষ্ম সংযুক্ত জ্বর ও সর্বাধ নতুন ও পুরাতন জ্বরে মহাশক্তির ন্যায় কার্য করে। ইহা প্রতি গৃহে রাখিলে আর জ্বরের জন্য ভাবিতে হইবে না বা কোন চিকিৎসকের সাহায্য দরকার হইবে না। মূল্য ১ কোটা ১০ আনা, মাশুলদি ৫০ আনা। ৩ কোটা ১০ আনা, মাশুলদি ৫০ আনা।

শ্বাসকাসারিষ্য

ইহা সর্বপ্রকার দুঃস্বাস হাপানী। শ্বাস ও কাসের মহৌষধ। শ্বাসকাসারিষ্য উত্তর রোগের অসহ্য যন্ত্রণা উপশম ও স্থায়ী আরোগ্য সম্পাদনে অশ্বিতীয়। কিছুদিন নিয়মিত সেবনে রোগের মূল কারণ দূরীভূত করিয়া ইহা ভবিষ্যতের আক্রমণ নিবারণ করে। শ্বাসকাসে জীবন্ত রোগী ইহা সেবনে নবজীবন লাভ করিবেন। মূল্য ১ শিশি ১০০, মাশুলদি ১৫০, ৩ শিশি ৪ টাকা, মাশুলদি ২৫০ আনা।



আমাদের এই বিশুদ্ধ পদ্মমধু সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে চক্ষু হইতে জলপড়া, চক্ষুর নানাবিধ যন্ত্রণা, চক্ষুক্ষত, বাসনা দৃষ্টি ও ছানিপড়া ও রাতকানা প্রভৃতি রোগ সত্ত্বর আরোগ্য হয়। মূল্য ১ শিশি ১ টাকা, ৩ শিশি ২৫০ আনা, মাশুলদি ৫০ আনা।

বঙ্গদেশবাসিনীরিত সিন্ধ
মকরমুখ

১ তোলা ১২ টাকা
৭ মাত্রা ৫০ আনা
১০ মাত্রা ২০০ টাকা
বঙ্গদেশবাসিনীরিত
১ তোলা ৫ টাকা
৭ মাত্রা ১৫০ আনা
১০ মাত্রা ১০০ টাকা
মাশুলদি ৫০ আনা।

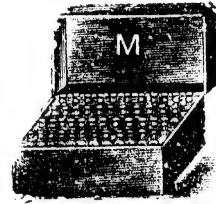
নবশক্তি ঔষধালয়

কবিরাজ ক্রীশনিরকুমার সেন গুপ্ত

কবিরাজ ক্রীশনিরকুমার সেন গুপ্ত

২৯৬ এ, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

গৃহ চিকিৎসার বাক্স



মূল্য এক বাস ১০ টাকা, ডাঃ মার ১০০ আনা।

এই পরম হিতকর গৃহ-চিকিৎসার বাস প্রত্যেক প্রকারের ঔষধ ৫ সপ্তাহ (৩৫ বর্ষ) করিয়া ২৬ প্রকার ঔষধ আছে। পরিবারস্থ সকলেই ঔষধ প্রয়োগ প্রণালী ও ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া সন্দের চিকিৎসা করিতে পারিবেন। এই বাসের যে কোন ঔষধ পৃথক লইলে প্রতি কৌটার মূল্য ১ টাকা লাগিবে।

মহা সোমেশ্বর রসায়ন

ইহা স্মৃতিশক্তি, মেধা, বলবীৰ্য বর্ধক ও মস্তিষ্কের দুর্বলতা-নাশক পরম মহৌষধ। স্মৃতিরিক্ত মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম ও অতিরিক্ত অধ্যয়নজনিত অবসাদ ইহা সত্ত্বর নিরায়ন করে। ছাত্র, চিন্তাশীল ও পরিশ্রমী ব্যক্তিগণের ইহাই একমাত্র বন্ধু। স্মৃতিশক্তি-হীন ও অল্প মেধা বিশিষ্টের পক্ষে ইহা অমৃতস্বরূপ। ইহা শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতানাশক মহৌষধ। মূল্য ১ শিশি ২ টাকা, মাশুলদি ৫০ আনা। ৩ শিশি ৫ টাকা, মাশুলদি ১০০ আনা।

স্বর্ণ ভদ্র

১ তোলা ১২৫ টাকা

মৃগনাভি

আমের—১ তোলা ৫০ টাকা
নেপালের—১ তোলা ৪০ টাকা

চ্যবনপ্রাশ

১ শিশি ১৫০ টাকা
মাশুলদি ৫০ আনা।

—হ্যাঁ। আর বাবাঠাকুর যে পুষ্প দিলেন—গলায় বেঁধে দাও।
আনন্দের মা হাসলে: বললে—ভাত্তার দেখাবার পরমা কোথা
শাব থল?

—যাও কেনে ভাত্তার বাবুর কাছে। ভাত্তার বাবু তো মানুষ
বটে—না—পাথর? ওই কচি মেয়ের একটি ছেলে, মায়ী হবে না
ভাত্তারের?

আনন্দের মা শশীর মুখের দিকে চেয়ে নীরবে বসে রইল। সে
চাঁদ্রিনের সম্মুখে শশী যেন কেমন অসোয়াসিত অনভব করলে।
ভাকিয়ে আছে দেখে দেখি? ঠায় একদৃষ্টে—পলক পড়ে না।

আনন্দের মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সক্রমণ কণ্ঠে বললে—
ওই কচি বউ—কোলে দুধের ছেলে—আমি ওদের মুখে কি দেব বাবা
শশী? আমার পোড়া পেটের কথা ছেড়েই দিলাম—ওদের আমি
বচাব কি করে? আর—আমার সোনার পুতুল বউ!

শশীর চোখ দিয়েও জল পড়তে আরম্ভ হল।

(চার)

পরদিন সকাল দেলা। ভাত্তারের ভাত্তারখানায় রোগীরা এসে
বসে আছে। সংখ্যায় ষাট জনের কম হবে না, কক্ষালসার শরীর
—ফুলো ফুলো মুখ—হাত পাও ফুলেছে, হলুদ চোখ, রক্ত গায়ের
কাপড় চোপড়ের গন্ধে বাতাস পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ঘরের
দুখো কম্পাউন্ডার চিনে মাটির বড় খলটায় খট খট শব্দে ওয়ধ
নাড়ছে। ভাত্তার নাই। ফলে বেরিয়েছে। টাকা দিয়ে যারা ভাত্তারকে
ডেকে—ভাত্তার তাদের বাড়ীগুলো প্রথমই মেরে আসে।

রোগে যারা বেশী কাতর তারা কাতরাকেছে।

যারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ তারা আলোচনা বরছে কে কে মরেছে
গত রাতে। যদি দস্তর বউ মহাদেব দেব সদা বিবাহিতা কন্যা।

ঘোষদের মেয়ে সরলা। সত্যরাম বাড়ীদুই মরেছে মাঠে; আউশ ধান
কাটতে গিয়েছিল জ্বর নিয়ে। বিকেল পর্যন্ত ফিরল না দেখে
খোঁজ করে সত্যরামকে ধানের উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখতে
পেয়েছে।

ভাত্তারের ডিসপেন্সারীর পাশেই ধুজু সিনয়ের দোকান।
ধুজুর আড়তের সংগে কণ্টোলের দোকান আছে, কেরোসিন তেল,
চিনি বিক্রী হয়। তারও সংগে আছে সরকারী ভিক্রে দেওয়ার
বাবস্থা। ওখানে একটা জনতা জমে গেছে। চাল ফুরিয়ে গেছে—
বিাল হচ্ছে ঘাসের বীজের মত এক রকম জিনিষ—নাম বলছে—
বাজরা। তাই নিতেই ভিড়ের অন্ত নাই। নিচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে
অভিযোগও করছে।

আনন্দের মাও এসে দাঁড়িয়েছে ওদের মধ্যে। বাজরা নিয়ে সেগুলি
নেড়ে চেড়ে বললে—এ কি করে খাবে মানুষে?

ধুজু বললে—এও আর বড় জোর আসছে সন্তাহ। তার পরই
ফুরবে—আর নাই।

একটি লোক হেসে বললে—আজ্ঞে তা চলবে।

—চলবে? ওই দেখ—কটা নস্তা আর পুঁজি। আর লোক
দেখাচ্ছিস তো?

আজ্ঞে—এ খেলে সাত দিনেই লোক অনেক পাতলা পড়ে
যাবে।

আনন্দের মা ভাবছিল নাতিকে আর বউটাকে এই একটু বেশী
করে খেতে দেবে। তা হ'লেই সে খালাস। বাড়ী হাত পা। পরক্ষণেই
সে শিউরে উঠল। বউটাই তো—তার ভরসা। কালই সে কথা আনন্দের
মা খুব ভাল ভাবে বুঝে নিয়েছে।

ভট্টাচার কেঁদেছে সে দেখেছে, এবং সে যে ওই বউটার প্রতি
মমতায়, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শূদ্ধ কামাই নয়, কাল

সত্যই বাংলার ও বাঙ্গালী জাতির গৌরবময় সৃষ্টি।
আগড়পাড়া কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠানের

গণ্ডার মার্কা

গেঞ্জী ও ইজের

তা ছাড়া অগাণ্য পোষাকিয় দ্রব্য।

সুন্দর, সৌখীন, অথচ টেকসুই।

একবার ব্যবহার করিলে আপনিও বুদ্ধিতে পারিবেন, এর শূদ্ধতা ও স্থায়িত্বের প্রচ্ছন্নতা।

শুদ্ধ বাংলায় নয়, এমন কি বাংলার বাহিরে

যেখানেই বাঙালী — সেইখানেই এর সমাদর।

কারখানা ও হেড অফিস :—আগড়পাড়া, বি এন্ড এ আর, ২৪ পরগণা।

পরিচালক :—শ্রীদুর্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ব্রাঞ্চ :—১০নং অপার সার্কুলার রোড, দ্বিতলে রুম নং ৩২, শিয়ালদহ, কলিকাতা

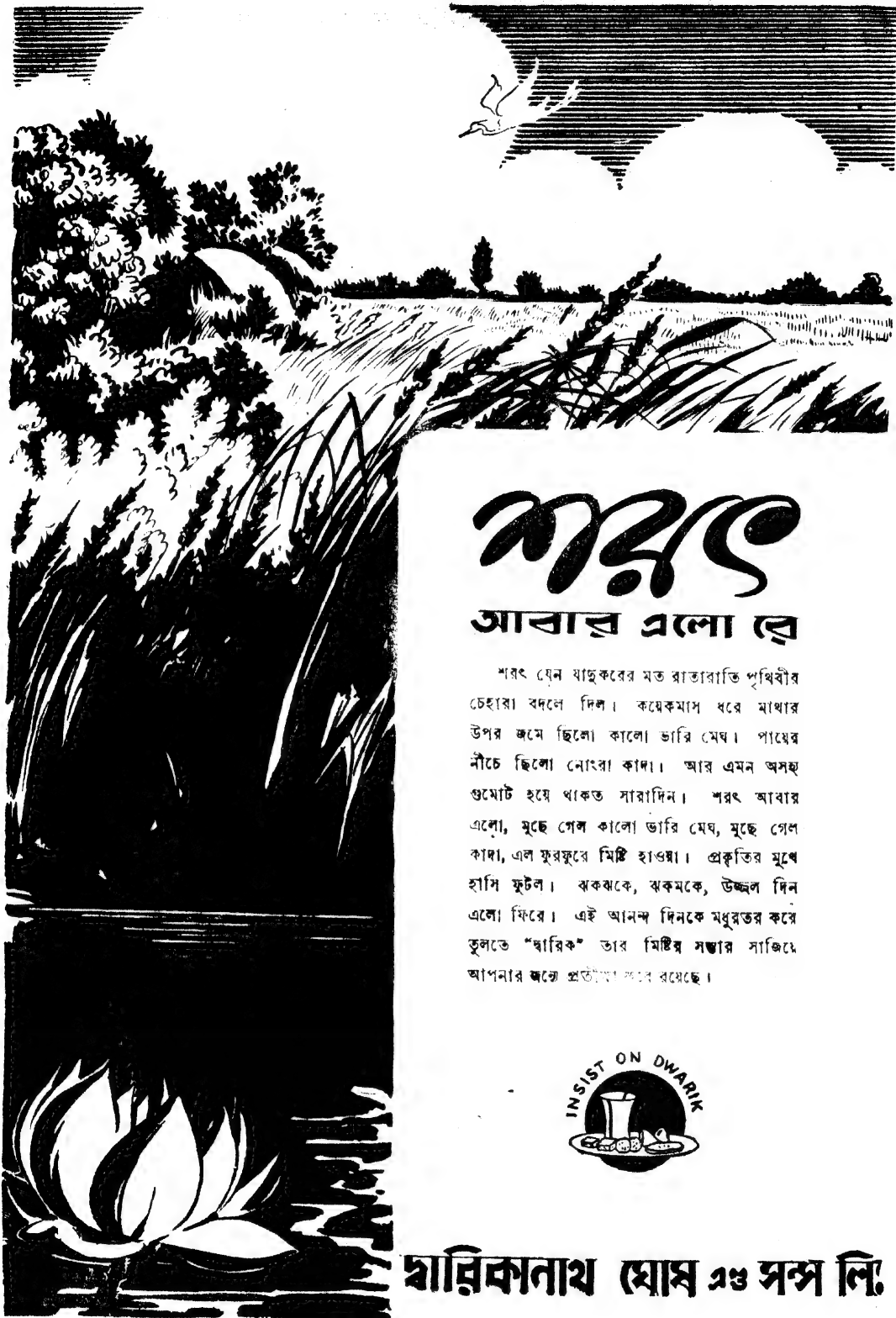
” হাওড়া—চাঁদমারী ঘাট, (হাওড়া স্টেশনের সম্মুখে)

” নৈহাটী—অরবিন্দ রোড (২৪ পরগণা)

” বর্ধমান—রাণীগঞ্জ বাজার (বর্ধমান)

” টাটানগর—সাকচী বাজার

” বারাসত—বারাসতের স্টেশনের সম্মুখে এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান স্থানে।



শরৎ

আবার এলো রে

শরৎ যেন বাছুরের মত রাতারাতি পৃথিবীর
চেহারা বদলে দিল। কয়েকমাস ধরে মাথার
উপর জমে ছিলো কালো ভারি মেঘ। পাখের
নীচে ছিলো নোংরা কাঁদা। আর এমন অসহ্য
গুমোট হয়ে থাকত সারাদিন। শরৎ আবার
এলো, মুছে গেল কালো ভারি মেঘ, মুছে গেল
কাঁদা, এল ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়া। প্রকৃতির মুখে
হাসি ফুটল। ঝকঝকে, ঝকঝকে, উজ্জল দিন
এলো ফিরে। এই আনন্দ দিনকে মধুরতর করে
তুলতে “দ্বারিক” তার মিষ্টি সন্টার সাজিয়ে
আপনার সঙ্গে প্রতীক্ষা করে রয়েছে।



দ্বারিকানাথ ঘোষ প্রসঙ্গ লি.

চটায় তাদের যে পরিমাণে প্রসাদ দিয়েছে সে আনন্দের মা আশাই করে নি। শশীর কান্নাও তার মনে পড়ল—সেও ওই বউটার উপর মমতায়। শশীই তাকে কথাটা বুদ্ধির দিয়েছে। সে যে বলেছিল ওই কচি মেয়ের একটি ছেলে—ডাক্তারের মায়া হবে না!

শেখীতলা থেকে বাড়ী ফিরবার পথে শশীর কথাটা আনন্দের মা পরখ করেও দেখেছে। শশীর কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ডাক্তারের মায়া হয়েছিল। দুপুর বেলা খেয়েদেয়ে ডাক্তার কারুর নয়, ওই সময়টায় সে খানিকটা বিশ্রাম করে। লাখ টাকা দিলে ওঠে না। ডাক্তার শূয়েছিল। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আনন্দের মা ভাবছিল—ডাক্তারকে ডাকবে কি না! ছেলোটার জ্বর সত্যিই বেশী। বোশেখ মাসের দুপুরের কচি লতার মত নোঁতয়ে পড়েছিল। জানালাটা খানিকটা খোঁক হয়েছিল—সেই ফাকের ভিতর দিয়ে আনন্দের মা বার দুয়েক চেয়ে দেখে হতাশ হয়ে ফিরেই যাচ্ছিল। হঠাৎ জানালাটা সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে ডাক্তার দেখা দিলে—কে? কি?

আনন্দের মা সভয়ে বলেছিল—আজ্ঞে ডাক্তারবাবু, বউমার খোঁকাটির বড় জ্বর। হতভানী আজই হাতের শাখা ভাঙ্গলে—সিপের সিঁদুর মুছেল, আবার ওই ছেলেটুকু—তার—। আনন্দের মায়ের চোখ ফেটে হু হু করে জল বোঁরয়ে আসছিল—তার আন—আঃ তার সোনার থান্দু! কিন্তু তার জন্যে সে কাঁদলে লোকে তাকে মায়া করবে না। আনন্দের মা দাঁতে দাঁত টিপে বারবার অঁচল দিয়ে চোখ মুছেছিল।

ডাক্তার বোঁরয়ে এসে ছেলেটির কপালে হাত দিয়ে গম্ভীরভাবে বলেছিল হুঁ। এ যে অনেকখানি জ্বর। কখন জ্বর এল?

কখন থেকেই বোধ হয়।

ডাক্তার থর করে দেখে ওষুধ দিয়েছে। পয়সার কথা মখেও আসে নাই। বরং বাড়ীর ভিতর থেকে একটা পুরিয়া করে খানিকটা সাগুদানা হলে নিজে বলেছিল—এই সাগু করে দিয়ে। সাগুদানা বাজারের মধ্য থেকে লেগে চারটাকা দেয়।

আনন্দের মা সাগুর পুরিয়াটা নিজে হাতে নেয় নাই। অবগুণতনমতী বউয়ের কাপের কাছে ডেকে বলেছিল—নাও বউমা—সাগুর পুরিয়াটা নাও। ওগো—হাত—পাত। আঃ—কি আবার চেয়ে গেলো তুমি! হাত! হাত! হাত পা—ত—!

ডাক্তার বলেছিল—বকবোন না ওঁকে। ছেলে মানুষ। তার ওপর এত বড় একটা আঘাত—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল ডাক্তার।

আনন্দের মায়ের মখে ফুটে উঠেছিল—আঁত ক্ষীণ—কিন্তু অতিবক একটি হাসির রেখা। কিন্তু তার শীর্ণ রোখাঙ্কিত মুখের অজস্র রেখার মধ্যে সে হাসি চোখে পড়বার মত নয়।

ধেজু সিংয়ের দোকানে সরকারী ভিক্ষা আড়াই সের বাজরা আঁচলে নিয়ে আনন্দের মা এসে দাঁড়াল ডাক্তারের ডিসপেন্সারীর সামনে। ছেলেটার আবার ওষুধ চাই। সমস্ত রাত ছেলেটা জ্বরে ধুকছে। ডাক্তার সাগুদানা দিয়েছিল—সে সাগুদানা তেমনিই আছে। মায়ের দুখই খেতে চায় নাই তো সাগুর জল!

ডিসপেন্সারীর দিকে পা বাড়ালে কিন্তু আনন্দের মায়ের শ্বিধা হেঁজল। ভাবছিল ডাক্তারের সামনে সে গিয়ে দাঁড়াবে—কিন্তু ডাক্তার যদি বলে ওষুধের দাম এনেছে? তার চেয়ে বাপ্পী বড়ীকে সঙ্গে দিয়ে বউটাকে পাঠিয়ে দিলে ওই ন্যাসাদের মধ্যে আর আনন্দের মাকে পড়তে হবে না। আজ সে বলে দেবে বউটাকে—যাকে বলে কাশে কিল মেরে বলে দেবে এতখানি ঘোমটার আদিখোঁতার কাজ নাই। ঘোমটাটা একটুখানি কম করো। মুখের দিকে চাইলে মানুষের মায়া হবে। মনে মনে এত সব ভেবেও কিন্তু আনন্দের মা গলা বাড়িয়ে ডিসপেন্সারীর ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলে। নাঃ—ডাক্তার নাই।

রতন হাড়ি বললে—শশীটার পরে ঠাকরুণ, দশটার পরে।

কম্পান্ডার বাবু বলছে দশ বাড়ীতে ডাক আছে। তা ছাড়া আমরা সব আগাম এসে বসে আছি।

‘আগাম এর্সেইছস—তোরা সব আগাম মর’, মনে মনে এই অভিসম্পাত দিয়ে আনন্দের মা খুসী হয়ে বাড়ীর পথ ধরলে। শূধু গাল দিয়ে নয়, ডাক্তারের সামনে ভিক্ষার জন্য হাত পাতার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছে বলেই সে খুসী হয়েছে বেশী।

প্রতিদিনের মত আকাশে উড়া জাহাজের দল আসছে। গোস্তানী শোনা যাচ্ছে। আনন্দের মা আকাশের দিকে চেয়ে পথ চলছিল। শূধু সে নয়, সব লোক—সবাই চেয়ে আছে।

—এই যে আপনি!

আনন্দের মা চমকে উঠল। ডাক্তার! ডাক্তার তার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এই যে, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

আনন্দের মা ঘোমটাটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আঁচলের বাজরা হাতে দিয়ে নেড়ে বলতে গেল—পোড়া পেটের—

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললে—চলুন আপনার নাটকে দেখে যাই। আনন্দের মা অবাক হ'ল না। ডাক্তার নিজেই কৈফিয়ৎ দিয়ে বললে—এই এদের বাড়ীতে ডাক ছিল—আপনার বাড়ীর পাশে এসে মনে হ'ল ছেলেটির কথা। তা' বাড়ীতে কেউ নাই। বউটি ছেলেমানুষ ঘোমটা টেনে বসে আছে—কথা বলে না—

আনন্দের মা হাউ হাউ করে উঠল—কপাল—আমার পোড়া ঝাঁপাল বাবা, কি বলব লজ্জার কথা বল? ও মানুষ নয় বাবা—ও মানুষ নয়—গরু ভেড়ার সঙ্গে কোন তফাৎ নাই। শূধু ওই চেহারা। বলতে বলতেই আনন্দের মা প্রায় ছুঁটিছিল, ডাক্তারের অনুগ্রহে সে যে কৃত-কৃতার্থ হয়ে গেছে তাই প্রকাশের জন্য আপনার অজ্ঞাতসারেই সে আকুল হয়ে উঠেছিল। সে কৃতকৃতার্থতা এতখানি যে তার ঘা-খাওয়া শক্তমনের অতি বাস্তব সচেতনতাও এই সময়টিতে সাময়িকভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

ডাক্তার পর্যন্ত একটু বাস্তু এবং লজ্জিত হয়ে পড়ল আনন্দের মায়ের আচরণে। সে বললে, থাক—থাক—এতখানি বাস্তু হবেন না। এতখানি—। আর ডাক্তারের মুখে দিয়ে কথা বের হল না—এই মুহূর্তে আনন্দের মা যা করলে—তাতে ডাক্তার সন্তোষিত হয়ে গেল। আনন্দের মা পুতবধুর মাথার ঘোমটা টেনে খুলে দিয়ে বললে—দেখ বাবা দেখ, এই হতভাগীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি—আর আমার বুক হু-হু করে জ্বলে ওঠে। এর ওপর যদি ছেলেটার কিছু হয়—। আনন্দের মা বর বর করে কেঁদে ফেললে।

ডাক্তারেরও চোখ ফেটে জল এল।

অপূর্ব সুন্দর মুখ। রুক্ষ ঘন চুল। অশ্রুত বড় দুটি চোখ—হ্যাঁ অশ্রুত—এতবড় চোখে একটি ছাড়া কোন ভাষা নাই; ডাক্তার বুকতে পারলে না তার অর্থ; বিন্দুর অথবা ভল্ল! ফ্যাল ফ্যাল করে সে চেয়ে আছে ডাক্তারের দিকে। নারীসুলভ লজ্জাও সে দৃষ্টি নত হয় না। ডাক্তারের স্নায়ুশৃঙ্খলাতে একটা প্রবাহ বয়ে গেল—মনের মধ্যে জেগে উঠল প্রবল মমতার আবেগ। আহা, এমন সুন্দর মেয়ে, এর ওই শিশুটির যদি কিছু হয়—তবে সত্যি মেয়েটির অবস্থা কি যে হবে সে কম্পনা করা যায় না। মেয়েটির যা হবে হবে—ডাক্তারেরই যে আক্ষেপের সীমা থাকবে না।

মিহিরবাবু তবুও ডাক্তার। আত্মসম্বরণ করে সে বললে, ভয় কি? কিছু ভয় করবেন না, ছেলে সেয়ে যাবে। মেয়েটিরও এতক্ষণে সম্ভবত হয়েছে। সে ধীরে ধীরে ঘোমটা টেনে দিলে।

পিছনে কে বলে উঠল—তারা! তারা!

ডাক্তার, আনন্দের মা মুখ ফিরিয়ে দেখলে—কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন হ্রিদুয়া ভট্টাচার্য, হাতে অকিসী আর ফুলের সাজ। মিহির ডাক্তার বলে মনে অভ্যন্ত রুঢ় হয়ে উঠল। ভট্টাচার্যকে সে জানে। মনে পড়ল ভট্টাচার্যের নিজের পোত্রের অসুখের কথা;

দেওয়ান বাগান

উৎকৃষ্ট
গাছ ও বীজের
সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান



কলেজস্ট্রীট মার্কেট (কলিকাতা)

শাখা

শাখা

১০ নং লিওনে স্ট্রীট শিয়ালদহ স্টেশন মেন
(লিউ মার্কেট) ৫ নং প্লাটফর্ম
কলিকাতা

বিশেষ প্রত্যাশা : ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

কপ্তোল দরে বীজ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

নিষ্ঠুরতম কথা বলতে ভট্টাচার্যের বাধে না। হ্রুৎকৃত করে ডাক্তার ভট্টাচার্যের দিকে চাইলে। কিন্তু ভট্টাচার্য চেয়েছিলেন রত্ন শিশু এবং তার মায়ের দিকে। অত্যন্ত করুণ দৃষ্টি ভট্টাচার্যের চোখে। ডাক্তারের ভয় হ'ল। ভট্টাচার্যের করুণার অর্থ অতি বিচিত্র।

ভট্টাচার্য কিন্তু বললেন, কোন ভয় নেই। ডাক্তার ঠিক রলেন, কোন ভয় নেই।

আনন্দের মা বললে, বলুন বাবা—তাই বলুন—আশীর্বাদ করুন।

ভট্টাচার্য বললেন, আশীর্বাদ তো কালই করেছি মা। তোমরা চলে এলে, দেখলাম থোকর জ্বর এলো, মন খারাপ হয়ে গেল আমার। সমস্ত দিন মনের মধ্যে ওই কথাই ঘুরল আর ফিরল। সম্ভবত জপে বসলাম—মনে মনে বললাম, মা, আমার এ কথা যদি মিথ্যে হয়, তবে বল—তার আগে আমি মরি, ম'রে লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই। আর আমার হাতের পুজো যদি নিস—তবে বল, আশীর্বাদী দে—যাতে দুর্ভাগিনীর ধনের কল্যাণ হয়, রোগ ভাল হয়—দীর্ঘজীবী হয়ে সে বেঁচে থাকে। বলব কি মা! ঠিক সেই মুহূর্তে মায়ের মাথা থেকে খসে পড়ল এই জবাব।

ডাক্তারের শরীর পর্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। আনন্দের মা অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। চোখ দিয়ে অনর্গল জল ঝরে পড়ছিল। কিন্তু অশ্রুত ওই তরুণী মা-টি, স্থির হয়ে বসে আছে পাথরের মত।

ভট্টাচার্য বলছিলেন, কাল রাতেই ভালোম—যাই দিয়ে আসি মায়ের আশীর্বাদী, তা' বড়ো মানুষ—চোখের নজর তো আর ভাল নেই। আর বেরতে পারলাম না। নাও, ধর আশীর্বাদী।

আশীর্বাদী দিয়েও ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাক্তার অত্যন্ত ধীরভাবে ছেলেটিকে পরীক্ষা করে দেখাচ্ছিল। পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার ইনজেকশনের সরঞ্জাম পেরে কল্পলেন। আনন্দের মা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে উঠল, ডাক্তারবাবু!

বাগ থেকে দেখে দেখে একটি ইনজেকশনের ওষুধের এম্পিউল বার করে ডাক্তার বললে, ভয় নাই। ম্যালেরিয়া জ্বর—

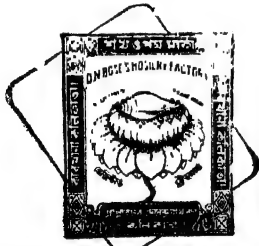
—তবে? ইনজেকশন দেবেন কেন? রোগ কঠিন না হলে—

—কঠিনে যাতে না দাঁড়ায়—তারই ব্যবস্থা করছি। কুইনিন ইনজেকশন দেব। এম্পিউলটির মধ্যায় তুলো জড়িয়ে সুকোশলে আঙুলের চাপে মটু করে মাথার দিকটা ভেঙ্গে ফেলে ডাক্তার সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে নিলে ওষুধটুকু। তারপর আনন্দের মায়ের দিকে চেয়ে হেসে বললে, এই দেখুন—আপনি মুখে দিয়ে দেখুন না এক ফোঁটা—কুইনিন, কি আর কিছু। বলে সে এম্পিউলটি উপড় করে ধরলে আনন্দের মায়ের হাতের উপর। প্রায় আধ ফোঁটখানেক ওষুধ ঝরে পড়ল। ডাক্তার হেসে বললে, দেখুন না!

আনন্দের মা জিভ দিয়ে চেটে বিস্মিতভাবে মুখ নেড়ে কয়েকবার আশ্বাসন অনুভব করবার চেষ্টা করে বললে, কুইনয়ান তো তেতো ডাক্তারবাবু।

চকিতে বিস্ময় ফটে উঠল ডাক্তারের দৃষ্টিতে। আনন্দের মায়ের দিকে চেয়ে সে বললে, হ্যাঁ, তেতেই তো।

—কিন্তু এ তো তেতো নয়।



ডি.এন.বসু

ক্যালি-নীট গ্রু-সার্ট
কালার-সার্ট, স্কাপ্তো
পোলি-সার্ট
শো-ওয়েল, সিলকট
সেটী-ভেট

চতুঃপদ্য মার্কা
গেজী

D.N. BOSE'S
HOSIERY FACTORY
36/1A, SARKAR LANE, CALCUTTA

PHONE: 88 6557

রায় কাজিন এও কোঃ
জুয়েলার্স : ওয়াচমেকার্স
ক্রীমেন হাউস
৪ ডালহৌসী স্টোয়ার, কলিকাতা
ফোন-কলি: ৪২৮২ গ্রাম-জুয়েলারী

প্রথম বৎসরেই
অসাধারণ সাফল্য

দি

পিয়ারলেস লাইফ
এসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিসঃ—

৮, লায়ন্স রোড, কলিকাতা।

শ্রমচর হার—

মাত্র শতকরা ৬৮.৯ টাকা

সুবিধাজনক সর্বোচ্চ চীফ এজেন্ট
এবং অর্গানাইজার চাই।

✱

ফোন :

আর, রায়, বি-এ,

ক্যাল ৪১০১

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।



আজ আগমনীর আবাহনে কি সুর উঠেছে বেজে :—

মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নর-নারীর মনে যেরূপ আবেগ ও আনন্দের
হিলোল এনে দেয় সেইরূপ “শান্তি কেমিক্যালের” দ্রব্য সম্ভারই আপনাদের মনে শান্তি
ও আনন্দ এনে দেবে।

“শান্তি স্নো”

“শান্তি কোকোনাট অয়েল”

“শান্তি ফেস্ পাউডার”

“শান্তি আমলা”

ব্যবহারে মুখাবয়বে লাভণ্য ফুটে উঠে

ও স্বক মসৃণ হয়।

কেশচর্চায় অম্বিতীয়।

কেশবর্ধক ও বায়ুনাশক।

সোল ডিস্ট্রিবিউটর :— শান্তি স্টোর্স

৫নং প্রম্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

তেতো নয়! ডাক্তার ভাংগা এ্যাম্পউলটা তুলে
এর দেখকল, তারপর সিরিজ থেকে এক ফোটা নিজের হাতে নিয়ে
চোখে দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। শব্দ স্পিরিটের গন্ধযুক্ত
খানিকটা জ্বল। ডাক্তার সতর্ক হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর
সিরিজের ওষুধটুকু পিণ্ডন ঠেলে মাটির ওপর ফেলে দিয়ে বললে—
যাক, ও-বেলা এসে আমি ইনজেকশন দিয়ে যাব। এ-বেলা ওষুধ
দেব একটা। কেউ গিয়ে—

আনন্দের মা বললে, আমি যাব বাবা।

ডাক্তার উঠে আবার বললে, কোন ভয় নেই। দরকার হবে
না, তবে দরকার হলে তখনই খবর দেবেন আমাকে।

ভটচাঁয় দাঁড়িয়েই ছিলেন। তিনি বললেন, শুনলে মা, ডাক্তার
বললেন, কোন ভয় নেই। বলছি যে, আমার মা বলেছেন।

প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

ডাক্তারের সঙ্গেই তিনি বোরিয়ে এলেন। পথে দুজনে এক-
সঙ্গেই চলছিলেন। ঘটনাটা নতুন। কিছুক্ষণ পর ভটচাঁয়
জিজ্ঞাসা করলেন, কোন ভয় নাই বলেই মনে হয়—কি বলেন
ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার বললেন, আপাততঃ ভয় তো কিছু দেখলাম না।
তবে—ম্যালিংন্যান্ট-ম্যালেরিয়া যদি হয়—ডাক্তার চূপ করলেন।
ভটচাঁয় তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ডাক্তার নীরবেই পথ চলতে লাগল। ডাক্তারের নীরবতায়
উৎকণ্ঠিত হয়ে ভটচাঁয় উদাস কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন, তারা—তারা—
না।

ডাক্তার ডিসপেন্সারীতে এসে কুইনিনের এ্যাম্পউলগুলি
প্রত্যেকটি ভেগে নিজে আবাদ করে দেখে ফেলে দিলে। নিজের
মনেই বললে—স্কাউন্ডেল। আনন্দের মা এ্যাম্পউলের ভিতরের
ত্রল পদার্থের আবাদ নিয়ে বলেছিলেন তেতো নয়। সে তার ভ্রম
নয়, এ্যাম্পউলের ভিতরে কুইনিন নাই। শব্দ জ্বল।

(পাঁচ)

শশী এসে দাঁড়াল। ডাক্তারের বিরক্তির আর সীমা রইল
না। রুক্ষস্বরেই সে বললে, তাকে না আমি কাল বলে দিয়েছি শশী
—কুইনিন রোগীতে পাচ্ছে না—তাকে দিতে আমি পারব না।
শিউলীর পাতা ছেঁচে খেগে—বেলপাতা ছেঁচে খেগে—ছাতিমের ছাল
সেধ করে খেগে যা।

—আজ্ঞে না। সে জনো নয়; ওই—ওই আন ঠাকুরের—
অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার বললে, কি? কি? আনুঠাকুরের
ছেলে কেমন আছে? এই তো দেখে আসছি আমি।

—আজ্ঞে তেমনি আছে ছেলে। আমি ওষুধ নিতে এসেছি।
ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে গেল। আনন্দের জন্যে শশী তিনবার
ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। আর সেই শশী এসেছে—।

ডাক্তারের বিস্মিত দৃষ্টি অত্যন্ত স্পষ্ট—শশী মাথা নীচু করে
ঈষৎ লজ্জিতভাবেই বললে—ওই পানে আসছিলাম—তা আনু ঠাকুরের
মা বললে—আমার নাতির ওষুধটা যদি এনে দাও বাবা শশী।

কথাটা বলেও তার মনে হ'ল বলাটা তার সম্পূর্ণ হয় নাই,
ডাক্তারের সর্বস্বয় প্রশ্নের জবাবও এ নয়। তাই সে আবার বললে,
কাল শ্মশান থেকে এল মশায়, ওই কচি বউটিকে দেখে বড় মায়ী হ'ল।
আ—হা—হা—মশায়—ভগমানের—। শশীর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। সে
চূপ করে গেল।

ডাক্তারও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—বস। দিচ্ছি
ওষুধ। ডাক্তার নিজেই উঠল ওষুধ তৈরী করতে। কম্পাউন্ডারি
তাঁর পাকা—কিন্তু গড়ে কুইনিনের সঙ্গে ময়দা মিশিয়ে সে
কুইনিন সারিয়ে ফেলে।

শশী আপন মনেই বললে, কাল সারারাত ঘুমুই নাই ডাক্তার-
বাবু। এক একবার মনে হচ্ছিল—আনু ঠাকুর মরেছে—বেশ মরেছে।

কিন্তু—ওই বউটির কথা মনে হয়েছে, আর হাসি হাসি করেছে। শশী
চূপ করলে।

নিবিষ্ট মনে ডাক্তার নিক্তির দিকে তাকিয়ে ওষুধ ওজন
করছিল—সেও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। শশীর কথাগুলির
সঙ্গে তার মনের তার এক সর বাজছে। এর মধ্যে এতটুকু কিছ
অসঙ্গত দেখতে পেলে না।

বাইরে রোগীরা কাতর হচ্ছে।

কম্পাউন্ডার একটা বড় বোতল থেকে শিশিতে ওষুধ ঢেলে
দিচ্ছে।

শশীর প্রাণ যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠছে এদের মধ্যে বসে।
মানুষের মরণ দেখে তার বড় ভয় হয়। কিন্তু জীবনশীল রোগী
মানুষকে দেখে তার মন নাড়া খেতো না। এক একজনের
কাতরানি দেখে তার হাসি পেত। মড়াকাল্য শব্দে তার রাগ হতো।
আপন মনেই সে বলত—আদিখোতা। হোর কি এখা মারতে সে
বাপু? কিন্তু কাল সম্ভাবনা থেকে তার সব যেন ওলোটপালট
হয়ে গেছে। বউটির বৈধবা দেখে তার মন সেই সে হাসি হার করতে
সুরু করেছে, সে হাসি হার-এর আর বিরাম নাই। রোগী মানুষের
কাতরানি শব্দে তার বুকে কেমন করে উঠেছে, শোকাতুর মানুষের
কাল্য শব্দে সে মনে মনে হাসি হাসি করে সারা করেছে। এমন কি
কাল রাত্রে চুরি করতে বোরিয়ে খোঁসনের কানায় গলি গিয়ে যাবার
সময় ঘোষবুড়ীর গুণ শব্দে কাল্য শব্দে তার সর্বাঙ্গ খর খর
কেপে উঠেছিল। মাথার বসতাটা পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল।
ঘোষবুড়ীর মেয়ে সরলা কাল মারেছে। নিস্ততঃ রাত্রে, সবাই
ঘুমিয়েছে—বুড়ী কেঁদে চলছে। আগের দিন হলোও শশীর
মনে হ'ত, এই বসতাটা বুড়ীর বুকে চাপিয়ে দেয়; বুড়ীর ওই
বিনিয়ে বিনিয়ে কাল্য চিরদিনের মতো বন্ধ করে দেয়; যে পথে
গিয়েছে তার সরলা—সেই পথেই বুড়ীরে রওনা করে দেয়। কিন্তু
আর তা মনে হয় নাই। দাঁতে দাঁত টিপে সে কোন মতে গলি
থেকে বোরিয়ে যখন আনন্দের মায়ের বাড়ীর কানায় এসে দাঁড়িয়েছিল,
তখন তার বুকে যেন ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছিল। পরিশ্রমের
হাঁপানীর সঙ্গে একটা শোকাতুর আগুনে তার কনুইকনুই ফেটে যেতে
চাচ্ছিল যেন। আনন্দের মায়ের ভাঙা বিড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে
বাড়ীর একটা নিরলা কোণে কুণ্ডলে তার জগনের মধ্যে বসতটা
ন্যামিয়ে দিয়ে সেইখানেই সে বকে হাত দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস বসেছিল।

চণ্ডীতলায় আনন্দের মা যে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে
বলেছিল—ওই কচি বউ, কোলে দুপুরে ছেলে, আমি ওদের মূখ
কি দোব বাবা শশী?

সে কথাটা শশী ভুলতে পারে নাই। আনন্দের মায়ের দুঃখের
জন্য নয়। ওই কচি বউ আর তার কোলের দুপুর ছেলের জন্য—
সেও ভেবে সারা হয়েছে সমস্ত দিন। সবই তো কি যাবে ওরা?

না-খেতে পেয়ে শুকিয়ে ছেলেটা প্রাকৃতিক মৃত হয়ে যাবে—
পাখীর ছানার মত চি-চি করে চোঁচালে। বউটির ওই সোনার মত
রঙের উপর ময়লার ছাপ পড়বে, ছোঁড়া কাপড়ে তার মাথার শব্দ
চুলের অর্ধেকটা বোরিয়ে পড়বে, পিঠের পোটটিই বহুতো খোঁচা বাদে—
একটা মাটির খোলা হাতে করে ফিরবে—। শশীর বুকের ভিতরটা
অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে বোরিয়ে পড়েছিল বসতা হাতে। তার স্বা
বলেছিল, আজ আবার কি করতে যাবা? এই তো পরশ

বাধা দিয়ে শশী হিংস্রভাবে তর্জন করে উঠেছিল।

শশীর স্বা আর কিছু বলতে সাহস করে নাই।

সমস্ত সকালটা শশী আনন্দের মায়ের বাড়ীর ধরে মারেছে।
আনন্দের মা যখন বাজার আনতে এসেছিল, তখন থেকে মারেছে।
কিন্তু, বউটি অশ্রুত দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল মাটির পাড়লের মত,
তার ওই মুখের দিকে চেয়ে বাড়ীতে সে কিছ-ই চুকে পড়ে পারে
নাই। সে একটা খোপের আড়ালে বসে মাদের ডাঁটি তুলে তার
নরম দিকটা চিবিয়েছে, আর বউটির মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে।

বাণেরহাট মিলস্

(বাণেরহাট কো-অপারেটিভ
উইভিং ইউনিয়ন লিঃ)

১৯৩৯ সাল হইতে লভ্যাংশ
দিয়া আসিতেছে।

এখনও শেয়ার পাওয়া যায়
এজেন্সী ও শেয়ারের জন্য আবেদন করুন।

কলিকাতা অফিস--৭৭-১, হ্যারিসন রোড,
ফোনঃ বি. বি. ৬২৯৬



বীমা আইন মতে
সর্বোচ্চ জমানত
৫০,০০০ টাকা
সরকারের নিকট আছে

“হারিয়ে ফেলা জাতীয় বিশেষত্ব
বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে
দরিদ্র ও পতিত জাতকে তুলতে হবে।”
—বিবেকানন্দ

আমাদেরও তাই চেষ্টা, যাতে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি ৫০০ টাকার একটি
বীমাপত্র গ্রহণ করে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি করতে শেখেন।

ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল

প্রভিডেন্ট সোসাইটি লিমিটেড
১৫, চিত্তরঞ্জন এজেনিউ, কলিকাতা।

এজেন্সী গ্রহণ করিয়া দেশের সেবা ও আয় বৃদ্ধি করুন।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কলিকাতা

ফোন : কাল ৩২৫৩
(৩টি লাইন)

চিত্তাকর্ষক আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন	...	১,০০,০০,০০০ টাকা
বিলকৃত মূলধন	...	৪০,০০,০০০ টাকা
বিক্রীত মূলধন	...	৪০,০০,০০০ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	৩২,০০,০০০ টাকার উদ্দেশ্য
মজুত তহবিল	...	৬,২৫,০০০ টাকার উদ্দেশ্য

—অফিসসমূহ—

কলিকাতা সার্কেলঃ—শ্যামবাজার, হ্যারিসন রোড, ভবানীপুর, বালীগঞ্জ, হাওড়া, বড়বাজার,
বহুবাজার, হাটখোলা, লেক মার্কেট।

বেঙ্গল সার্কেলঃ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, চৌমুহনী, কুষ্টিয়া।

বিহার সার্কেলঃ—পাটনা, পাটনা সিটি, জামসেদপুর, সাক্‌চী, চাইবাসা, ঝরিয়া।

ইউ পি সার্কেলঃ—দিল্লী, নয়াদিল্লী, লক্ষ্মী, কানপুর, মেটন রোড (কানপুর)।

আসাম সার্কেলঃ—শিলং, গোহাটী, তেজপুর, ধুবড়ী, নগাঁও।

কে, এন, দানাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

তারপর এল আনন্দের মা—সঙ্গে ডাক্তার, একটু পরেই এল ভট্টাচার্য মশায়। ভট্টাচার্য, ডাক্তার বেরিয়ে যাবার পর শশী বাড়ী ঢুকেছিল। ধানের বস্তাটা দেখিয়ে দিতেই আনন্দের মা কৃতকৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। বউটি কিন্তু একটি কথাও বলে নাই। সেই তেমনভাবে বসেছিল। আনন্দের মা বলেছিল, তুমি একটু বসবে বাবা শশী, আমি তা হলে দশ সের ধান বেচে দুটী চাল ভাল নিয়ে আসি।

শশী আপত্তি করে নাই। কিন্তু আনন্দের মা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই সে দারুণ অস্বস্তি অনুভব করতে আরম্ভ করেছিল। ঘোমটা দিয়ে বউটি বসে আছে একভাবে সেই পুতুলের মত; খালি হাত দুখানি বেরিয়ে আছে, কোলের কাছে ছেলেটা শূন্যে আছে নিশ্চয়ই হয়ে। চূপ করে বসে শশীর মনে হয়েছিল—তার টুটিটা সেন কে চেপে ধরেছে, বকের ওপর একটা পাখর চাপিয়ে দিয়েছে। জীবনে অনেকবার পুলিশে তাকে হাজতে পুরে রেখেছে—অম্বকার ঘাটে ছোট ঘরটায় সে একা বসে থেকেছে, শিকঘেরা দরজার ওপাশে কনফেঞ্চল ঘরেছে—তার চলন্ত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে শশীর রাত কাটাতে এতটুকু কষ্ট হয় নাই। কিন্তু আজকের এই বসে থাকার উপেক্ষাকর কষ্টকর অনুভূতি কখনও সে ভোগ করে নাই। তাই দোকান থেকে ফিরে এসে আনন্দের মা যখন তাকে বলেছিল—আর একটু যদি ধুত করে বস বাবা শশী, তবে আমি ডাক্তারবাড়ী কাছে থেকে ওষুধটা নিয়ে আসি, শশী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—তুমি বস ঠাকরুণ, তুমি বস। আমি যেছি।

ডাক্তারের এখানে এই রোগা লোকগুলির মধ্যে বসে তাদের কাতরানী শ্রুত তার প্রাণ আবার হাঁপিয়ে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছে—উঠে ছুটে পালিয়ে যায় সে, কিন্তু সেই হাতখানি তাকে যেন

ডাকছে—কই আমার থাকার ওষুধ?

* * * * *

আট দিন পর।

ডাক্তার চূপ করে বসেছিল তার ডিসপেন্সারীর সামনের খোলা দাওয়ার উপর। রাহি আটটা বাজে। কান্তিক মাসের শেষ, এবার এই মধ্যে কনকনে ঠান্ডা বোধ হচ্ছে। ডাক্তার বন্যার জলের ঠান্ডা উঠছে মাটি থেকে। গ্রামখানার এই দিকটাকেই বলে বাজারপাড়া। এ পাড়ায় মানুষের সাড়া সাড়ে দশটা এগারটার কমে কখন স্তব্ধ হয় না। দোকানে দোকানে আলো জ্বুলে, লটকোনের দোকানে খাতা মেলায়—তহবিলের টাকা গুণতি হয়। ময়রাদের দোকানে ভিয়েন চলে, বাতাসা কাটে—কদমা কাটে; রসের সম্ভব পাক করে—সারা রাত রসে ভিজতে পায়। কাটা কাপড়ের দোকানে খটো-খটো শব্দ কঠর কল চলে। কাপড়ের দোকানে—কাপড়ের নম্বর দেখে থাকে—থাকে সাজানো চলতে থাকে। দু পাশের দোকানের মাঝখান দিয়ে যে পাকা রাস্তাটা চলে গেছে একদিকে মুরাশদাবাদ অন্যদিকে বেহার—সেই পথে কাঁ-কাঁ শব্দ তুলে গরুর গাড়ী যায় আসে;—বেহারের দিক থেকে আসে শালকাঠ, শালপাতা; মুরাশদাবাদের দিক হ'তে আসে কলাই, কুমড়া, পেঁয়াজ, লঙ্কা; নিকটবর্তী অঞ্চল হ'তে আসে ধান। ওদিক থেকে সাঁওতালের আসে গজুরীর সম্মানে; এদিক থেকে আসে স্থানীয় লোকজন, পূর্বের অঞ্চলের সাত আট ক্রোশের মধোর গ্রামগুলির এইটিই নিকটস্থ রেল স্টেশন। এবার কিন্তু এই মধ্যে সব স্তব্ধ অম্বকার। দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, রাস্তাটা খাঁ-খাঁ করছে। ডাক্তার পথের দিকে চেয়ে বসেছিল।

ডাক্তারের মেয়ে ডেকে বললে—বাবা ঘরে এসে বসুন, মা বলছেন—হিম পড়ছে যে।

এ, বোস এণ্ড কোং

৫২নং ডাব্লু, সি, বনার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা।

“ডেকরেটার”

বিবাহে, শুভকাক্ষে, জনসমাগমে মিলনবাসরকে আনন্দে রঙিন করে তুলতে হ'লে—

বি, বি—৭৭৬—এ

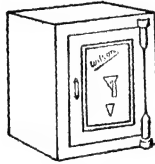
ফোন করুন।

মফঃস্বলের কাজেও এঁদের বিশেষত্ব।

এ, বোস এণ্ড কোং

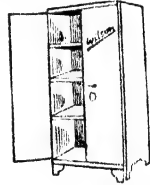
বিবাহ-বাসরের সাজ-সরঞ্জাম, দরবার—সামি যানা, গ্রেট জু প্রভৃতির জন্য সুপ্রসংসিত।

উইলসনের
ফায়ারপ্রুফ সিস্টেম



গুণে
শ্রেষ্ঠ

উইলসনের
ইম্প্রুভের আলমারী



ইণ্ডিয়ান মেটাল এণ্ড স্টীল প্রোডাক্টস্

শো-রুম—(১) ১২, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

(২) ৯৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শাখা—চাঁদনী চক, দিল্লী। (ইম্প্রিয়াল ব্যাঙ্কের পশ্চাৎভাগে)

সবর উৎকৃষ্টরূপে আপনার রেডিও মেরামত করিতে হইলে আমাদের নিকট দিন। সবপ্রকার রেডিও ও গ্রামোফোনফায়ার আমাদের নিকট সবদাই মজুত থাকে।
রেডিও রিসার্চ কর্ণার

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—গ্যাণ্ডিন এণ্ড কোং

২০/১, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

ভাগ্যবিপর্যয়ের দূরবস্থা
ও অর্থভাবের কষ্ট থেকে
পরিবারবর্গকে রক্ষা করিতে

বাসন্তী প্রভিডেন্ট

ইন্সি ওরেন্স

কোম্পানী লি.ম্যাটেড

এ আজই জীবনবীমা করুন।

—হেড্ অফিস—

৩১, আশুতোষ মুখার্জী রোড,
ভবনীপুর, কলিকাতা।

এজেন্সীর সর্তাবলী
সুবিধাজনক।

বি. মুখার্জী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

টেলিগ্রাম—“Rainbow”, Calcutta.
Phone : P. K. 2681.

দি

শিলং ব্যাঙ্কিং —কর্পোরেশন লিঃ—

হেড্ অফিস...শিলং।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১৫, ক্রাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্যান্য ব্রাঞ্চ—গ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ।

*

নিরাপত্তায় নির্ভরযোগ্য এবং সকল প্রকার
সুবিধাদায়ী প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান ॥

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

শ্রীসুনীল দত্ত, বি-কম্,
আর-এ, এফ-আই-এস্-এ,
এফ্-আর-ই-এস্ (লন্ডন),
জেনারেল ম্যানেজার।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ন্যাশনাল চেম্বারস ব্যাঙ্ক লিঃ

(স্থাপিত ১৯২৮ সাল)

হেড্ অফিস—গোহাটী

সেন্ট্রাল অফিস—৫০।১, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা

গোহাটী নগরী (অসাম) ও ঢাকা

নিম্ন স্থানে শীঘ্রই শাখা খোলা হইতেছে

পাটনা, এলাহাবাদ, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ

ও

করাচী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :

দেবাংশু সেনগুপ্ত, এম, এ (কম)।

—মাছি।

—খাবুর করবেন, মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—না। শশী ফিরবে মতিপুর গেছে। তারপর ইনজেকশন দিয়ে এসে খাব।

শশী গেছে মতিপুরের বাজার। মতিপুরের বাজার এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বাজার, বিশেষ করে ওষধের এমন ষ্টক—জেলার দূর শহরেও নাই। ‘প্রন্টোসিল’ আর কয়েকটা ইনজেকশন আনতে গেছে শশী। ইনজেকশনের চেয়েও জরুরী দরকার প্রন্টোসিল পিলের। পাওয়া না গেলে—সে কথা ভাবতে ডাক্তার অধীর চণ্ডল হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠাকুরের ছেলেটির ম্যালিংগন্যাট ম্যালেরিয়া হয় নাই, হয়েছে মেনিন্জাইটিস্। ম্যালেরিয়া, বেরিবেরি, টাইফয়েড, এগুলোর অনুষ্ঠাঙ্গক হিসেবে এতদিন ছিল শৃঙ্খল নিউমোনিয়া—এবার মেনিন্জাইটিস্ও এসে জুটল। কলোরাও চলছে—এখানে ওখানে। কেনটা কলোরা কেনটা ম্যালিংগন্যাট ম্যালেরিয়া—কেনটা বেরিবেরি দূর সময়ে বৃষ্ণতে পারা যায় না। মানুষ মরছে।

আকাশের নৈখত কোণে গোঁ-গোঁ শব্দ উঠছে। ডাক্তার সেই দিকে তাকালে। গাল-নালি-সাদা তিনটে আলোক বিন্দু—উষ্ণকর মত দ্রুত বেগে চলেছে। গেলন যাচ্ছে। দিন রাত্রি—কোন সময়েই বিরাম নাই। আকাশে গেলন চলছে, পথের ওপর আজকাল দিনের বেলা যায় মিলিটারী লরী; গ্রামের পায়ে চলা পথ ধরে চলছে মজা করে রোগা মানুষ। আট দিনে ডাক্তারের হাতের রোগীর মধ্যে সর্দিশুষ্টি রোগী মরেছে। আজ রাতেই বোধ হয় আরও চারটে যাবে। মিহির ডাক্তার বরাবরই ধীর চিকিৎসক; ধীরতার সংগে সে চিকিৎসা করে, ভাল মন্দ দুই-ই সে গ্রহণও করে ধীরতার সংগে। হাত রোগীর হাতখানি ধীরে ধীরে তার বুকের উপর অথবা পাশে নামিয়ে দিয়ে শান্ত ধীর পদক্ষেপে উঠে আসে। বৃষ্ণতে পারলে আগে থেকেই রোগীর আত্মীয়স্বজনকে শান্তভাবে সহ্যদয়তার সংগে বলেও দেয় সে কথা। এবার তার শান্ত ধীরতা—এই হিমালী শীতল মৃত্যু খড়ের স্পর্শে জলের মত জমে কঠিন হয়ে উঠেছে।

চারটে হয় তো আজই যাবে—তা’ ছাড়া আজ মোক কাল হোক, দু দিন চার দিন পরে হোক—যাবেই, মৃত্যু নিশ্চিত—এমন রোগী—নসরামের স্ত্রী, ব্যোমকেশ মুখোজে, হরিশনের কন্যা, চণ্ডীর মা, রামচরণের ভাই—পচিজন। পচিজন কেন—প্রন্টোসিল আর ইনজেকশনগুলো না পেলে—; শীতপ্রধান দেশের নদীর ওপরের কঠিন বরফের স্তরের তলদেশের জল চণ্ডল হয়ে উঠল যেন; ডাক্তারের মন ঈষৎ চণ্ডল হয়ে উঠল। তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল সেই অদ্ভুত মেরোটর কথা। অচণ্ডল স্তম্ভ মেরোটিকে সেই প্রথম দিন থেকেই একভাবেই দেখে আসছে। অবগুণ্ঠনে সর্বাঙ্গ ঢেকে একপাশে বনে থাকে—দেখা যায় শৃঙ্খল দুখানি নিরাভরণতায় সঙ্কর সূকোমল লাগণভরা হাত—এই হাত দুখানি দেখলেই মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীই যেন কাঙাল হয়ে গিয়েছে। আর দেখা যায় অতি শৃঙ্খল দুখানি পা; মধ্যে মধ্যে কদাচিত্ চোখে পড়ে তার মুখ তাতে সেই এক অভিব্যক্তি, যার অর্থ ডাক্তার আজও বৃষ্ণতে পারে নাই। মধ্যে মধ্যে ডাক্তারের সন্দেহ হয়, মেরোট বোধ হয় পাগল অথবা—। ডাক্তারের মন অকস্মাৎ অন্য দিকে ফিরল—একটা সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণাণ কিছু তার মনকে অত্যন্ত স্পর্শ করেছে।

কাষার রোল উঠছে। বেশী দূর নয়। নসরামের বাড়ী থেকে উঠছে। নসরাম স্ত্রীই মারা গেল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার একটু হাসলে। আজই মরবে এমন কথা ডাক্তার ভাবে নাই। মরেছে—তাতেও সে বিস্মিত হয় নাই। হঠাৎ হৃদযন্ত্র স্তম্ভ হয়ে গেল।

—ডাক্তারবাবু!

—কে?

—আমি।

ডাক্তার টচটা জ্বাললে। গ্রিপ্সুরা ভটচায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ডাক্তার উঠে এগিয়ে এল। —আপনি কি ওখান থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ। একবার চলুন আপনি।

ডাক্তারের পায়ের নখের ডগা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা উৎকীর্ণত অনুভূতি বিদ্যুৎ বেগে খেলে গেল। গিয়ে কি করবে সে? কি করতে পারে? মিনিটখানেক সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

—ডাক্তারবাবু।

দৃঢ় সংকল্পের একটা গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার সোজা হয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ, তাই-ই করবে সে। লাম্বার পাংচারই করবে। তার বিদ্যার দুঃসাহসিক চেষ্টাই সে করবে। লাম্বার পাংচার পল্লী গ্রামে দুঃসাহসিক চেষ্টা। কলেজে সে দেখেছে, সেখানে বোধ হয় চার পঁচটা কেস নিজে হাতে করেছে—কিন্তু তারপর আর করে নাই। তা হোক। এ ছাড়া উপায় নাই।

সে সময়ে পরীক্ষা করে দেখে সূচ বেছে নিয়ে বাগ হাতে বেরিয়ে পড়ল।

গ্রিপ্সুরা ভটচায়—আনুর মা স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখছিল ডাক্তারের কার্যকলাপ। থর থর করে কাঁপছিল তারা।

মেরুদণ্ডের ভিতর থেকে ডাক্তার সূচটা সময়ে বার করে নিয়ে নিঃশ্বাস ফেললে। এতক্ষণ তার অনাদিকৈ তাকাবার অবকাশ হল। সামনেই লণ্ঠন জ্বলছে। ওপারে মেরোট বসে আছে। তার মুখের অবগুণ্ঠন খসে গেছে। সেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ডাক্তারের সূচটির দিকে। ডাক্তারের হাত থেকে সিরিজটা খসে পড়ে গেল। সে কেপে উঠেছে।

চাকিত হয়ে ভটচায় প্রশ্ন করলে—ডাক্তারবাবু:

আনুর মা ঝুঁকে পড়ল রূপন নাতীর উপর, অনুভব করে দেখছে সে।

ডাক্তার শান্তস্বরে বললে—রোগী ঘুমচ্ছে।

ভটচায় বললে—মাযের চরণোদক একটু—

ডাক্তার বললে—দিন।

ও-পাশে বাইরের দরজার মূখে দীর্ঘনিঃশ্বাস কে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তার বললে—কে, শশী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ছেলে কেমন আছে? ক’তস্বরে তার অপরিসীম উন্মেষণ।

—এখন একটু ভাল। কিন্তু তুই ওষুধ পেয়েছিস?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বার বার ঘাড় নেড়ে শশী বললে—আজ্ঞে না।

ডাক্তার সময়ে ডাঙা সিরিজের কাঁচাগুলি কুড়িয়ে নিয়ে উঠল। আনুর মাকে ডেকে বললে,—দেখুন!

আনুর মা কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে—ডাক্তারবাবু?!

ভটচায় এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। শশীও এগিয়ে এল। ডাক্তার বললে, দেখুন আমার—। বলেই সে ওই মেরোটর দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

আনুর মা ডাক্তারের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখে বলে উঠল —আপনি বলুন ডাক্তারবাবু, আপনি বলুন। ও হতভাগী কালা—বোবা।

সকলের মধ্যে ফুটে উঠল অদ্ভুত অভিব্যক্তি—বিস্ময়—করুণা—হয়তো কিছুখানি তীক্ষ্ণাণও আছে তার মধ্যে। ডাক্তারের মুখে তার প্রকাশ সব চেয়ে কম। এ সন্দেহ তার হয়েছিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার বললে—আমার শেষ চেষ্টা আমি করলাম। যদি ভাল থাকে কাল সকালে খবর দেবেন।

ডাক্তার মাথা নত করে অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হ’ল আপনাবাড়ীর দিকে।

ভারতবাসী হিসাবে আপনি
নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করিবেন

তুলেখা কার্ল

উৎকৃষ্ট বিদেশী ফাউনটেনপেন
কার্লের সহিত সাফল্যের সহিত
প্রতিযোগিতা করিতেছে।

মৈত্র ব্রাদার্স এণ্ড
কোং লিঃ

হেড অফিস ও কারখানা :

কম্বা রোড, পোঃ ঢাকুরিয়া, কলিকাতা

উৎসবের—
শ্রেষ্ঠ সুন্দর উপহার—
সকল মহিলাদের প্রিয়।



সুগন্ধি
নীহার
আমলা

যন্ত্রিত্ব দীর্ঘ
রাখে ও বেশ
প্রতি করে



গ্লোব কোসমেটিক ওয়ার্কস

১৭, আর, জি, কর রোড, কলিকাতা।

সত্যশ-কবিরাজের

শ্বাসারি

হাঁপানি কাশির যন্ত্র

১ দাগে হাঁপ কমে, ১ শিশিতে উপশম

১ দাগ শ্বাসারি সেবনেই জমাট কফ তরল হয়। উঠিয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস যন্ত্রণার
নিবর্তি হয়। শ্বাসারি শ্বাসনালীর দুর্বলতা সম্পূর্ণভাবে দূর করে এবং হৃদযন্ত্রকে সবল
করে বলিয়া ইহা ব্যবহারে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়।

লক্ষ লক্ষ রোগী ঐহার শ্বাসারি ব্যবহারে
নির্দোষরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহার
বলেন—“শ্বাসারি”তে ঐহার উপকার পাওয়া যায়

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিকিৎসকগণ ইহার
উচ্চপ্রশংসা করেন ও রোগীদের ব্যবস্থা দেন।

প্রথম দাগ সেবনেই ইহার অসীম শক্তির পরিচয় পাইবেন।

হাঁপ কাশি, ব্রংকাইটিস প্রভৃতিতে
প্রথম হইতে “শ্বাসারি” সেবন করিলে
রোগ বৃদ্ধির ভয় থাকে না।

মূল্য—প্রতি শিশি ১১০, ডাকমাশুল—১৮০

সত্যশ-কবিরাজের অবলাবল

অসপ বা অধিক রক্তস্রাব, বিলম্বে রক্তস্রাব, শ্বেত, কৃষ্ণ বা বিবিধ বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত
রক্তস্রাব, কণ্ঠরক্ত বা স্বত্বকালে বেদনা বা জ্বালা, তলপেট ভর, তলপেটের বাম বা দক্ষিণ-
ভাগে বেদনা প্রভৃতি রক্তোঃ সম্বন্ধীয় রোগ ও তাহাদের উপশম “অবলাবল” সেবনে
নির্দোষরূপে ভাল হয়।

নিয়মিত ৩ শিশি সেবনে বাধকদোষ দূর হয়।

মূল্য প্রতি শিশি—১, ডাকমাশুল—১৮০, একত্রে ৩ শিশি—২৫০, মাশুল—১০

সর্বত্র বড় বড় দোকানে ও ঔষধালায়ে পাওয়া যায়।

কবিরাজ এস, সি, শর্মা এণ্ড সন্স

আনুর্ভৌদীয়া ঔষধালায়
সাহাপুর, পোঃ বেহালা, কলিকাতা

ভট্টাচার্য ও ডাক্তারের পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেলেন। উদাস দূরেতে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে পথ চলছিলেন ভট্টাচার্য। শশী এখনও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই দিকে চেয়ে; লনের আলোর ও-পাশে মেয়েটির দিকে চেয়ে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে বিক্ষফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে—সে কাঁপছে। আনন্দের মায়ের কথা কণ্ঠির মধ্যে সে যেন গভীর আতঙ্কের কিছুর সম্মান পেয়েছে।

(ছয়)

বোবা মেয়ে কাঁদছিল। রাতি প্রায় তিনটে। ছেলেটি মারা গেছে। শশী আর থাকতে পারলে না। সে ছুটে বেরিয়ে গেল আনন্দের বাড়ী থেকে।

কালো বোবা বউটি—দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আনন্দের মা নাতির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল। মধ্যরাতি থেকে আবার তার আক্ষেপ সূর্য হয়েছিল: চাঁৎকার করে উঠছিল সে আগের মত। কালো বউটির সেসব কিছুরই কিন্তু কাণে যায় নাই। ছেলেকে ঘুমিতে দেখে সেও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। একে কালো—তার উপর ঘুমন্ত অবস্থা—চাঁৎকার তাকে স্পর্শই করে নাই।

শশী কিন্তু সেই সম্বন্ধ থেকেই ছিল, যান নাই। কেউ অনুরোধ করে নাই—তবু সে গভীর উৎকণ্ঠা বৃকে নিয়ে বসেছিল। গলাব ভিতর কিছুর যেন মধ্যে মধ্যে আটকে যাচ্ছে: মনে হয়েছে কাঁধের উপর থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত একটা মৃদু অথচ অজ্ঞাত অসামান্যতর বস্তুনা অনুভব করছে; বৃকের ভিতরে ঢোকির আঘাত পড়ছে এমনভাবে হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে, তবু সে যেতে পারে নাই। ভগবানকে ডাকে নাই।—ডাক্তারের ওই সূচ ফটিয়ে দিয়ে যাবে এই প্রতীক্ষা করে। এক একবার ছেলেটা নড়েছে—তার শশী চমকে উঠেছে। সংগে সংগে মনে হয়েছে তার টুটিটা কে চেপে ধরলে যেন। যত্নসহ চোখ দিয়ে তার তল পড়েছে বহুবীর।

আনন্দের মা ব্যস্ত হয়ে উঠল—বৃকে পড়ল নাতির উপর। শশী উপর হয়েই জানোয়ারের মত এগিয়ে গেল খানিকটা।

চাঁৎকার করে কেঁদে আনন্দের মা শিশুটির বৃকের উপর আছড়ে পড়ল। শশী কাঁপতে আরম্ভ করলে—মনে হল তার দম বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেল। বউটি অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। মুখের ঘোমটা বসে গেছে। শশী অকস্মাৎ চাঁৎকার করে কেঁদে উঠল—ওঃ—ওঃ—ওঃ! ওই চাঁৎকারে জাগল বউটি। তার বধির কাণের নিদ্রাস্তম্ভ স্নায়ুতন্ত্রীতেও যা দিয়েছে শশীর চাঁৎকার। বউটি বিক্ষফারিত দৃষ্টিতে দেখলে—শাশুড়ী শিশুর উপর উপড়ে হয়ে পড়েছে। কৃৎসিত শশীর কামায় ভাঙা বিকৃত মুখ তার চোখে পড়ল; কাণেও যাচ্ছিল এই চাঁৎকারের স্পর্শ—অন্ধকার গভীর গহীর মধ্যে গহ্বরমুখের শব্দধ্বনির মত। সেও উপড়ে হয়ে পড়ল ছেলের উপর, হাত দিয়ে নেড়ে স্পর্শে মাথায় বৃকালে—স্থির দৃষ্টিতে ছেলের নিঃসন্দেহের দিকে, মুখের দিকে চেয়ে বৃকালে—তারপর—ছেলের দেহটা ছিনিয়ে নিলে একটা চাঁৎকার করে। বোবার শোকাক্ত চাঁৎকার; তার মধ্যে কথা নাই—শব্দ একটানা লম্বা বেদনায় তরঙ্গায়িত একখানি, হ্যাঁ—একখানি কণ্ঠস্বর—। কার্তিক মাসের আকাশে উল্কাপাত হয় বেশী; শশীব মনে পড়ল সেই তারা খসে পড়ার কথা—হঠাৎ আকাশ গিরে ছুটে যায় নীল আলো, কিছুর গিয়ে নিজে যায়। চোখ সইতে পারে না—মন প্রাণ কেমন করে ওঠে—কিন্তু এমন আলোর ছটা আর হয় না। ঠিক তেমনি! এমন কামা আর হয় না। সে কখনও শোনেনি।

শশীর আর সহ্য হল না। সে ছুটে বেরিয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে সে ছুটে চলেছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাতি। অমাবস্যার কাছাকাছি বোধ হয়। রাস্তার দু'পাশে ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে নিরুচ্চ মাটির চিহ্নের মত। হঠাৎ চোখে পড়ল সরু লম্বা এক টুকরো

আলো। জানালায় মুখের ফাঁক দিয়ে ঘরের আলো বেরিয়ে আসছে। শশী দাঁড়াল। ডাকল—ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারেরই বাড়ী; শশীর ভুল হয় নাই। জানালা খুলে গেল—কে? শশী? ডাক্তারেরও চিনতে ভুল হয় নাই। অনেক রোগীরই মরবার আশংকা আছে, তাবেরও আপনার জন্মেরা আসতে পারে—কিন্তু ডাক্তার এই ডাকট্রিই প্রতীক্ষা করে বিন্দু হয়ে বসে ছিল। আরও সে জানত শশীই আসবে ডাকতে।

—একবার আসুন। মরে গেছে জেনেও শশী ডাকলে।

ডাক্তার বেরিয়ে এল। শশীকে প্রশ্ন করলে না—কেমন অবস্থা।

শশী বললে—আপনি যান—আমি ভট্টাচার্য মশায়ের কাছ থেকে মায়ের পুণ্য নিয়ে আসি।

ডাক্তার বললে—যা—ছুটে যা।

শশী আবার ছুটল।

ভট্টাচার্য বাড়ীতে নাই। মায়ের মন্দির হতে ফেরেন নাই আজ। শশী আবার ছুটল। চারপাশে ঘন জংগল—থমথম করছে চারিদিক, চি—চি—ঝি—ঝি করে ডাকছে—ঝি ঝি পোকা আরও কত কাঁটপতঙ্গ—চাঁ—চাঁ শব্দে ডাকছে পেঁচা। রাতি তিন পহর হয়ে গেল। শশী ঢুকল চাউতলায়। মন্দিরের অন্ধকার পারান্দায় ভট্টাচার্য বসে আছেন স্থির হয়ে। শশী ডাকলে—ভট্টাচার্য মশায়। ঠাকুর মশায়।

—তারা—তারা মা! ভট্টাচার্য চণ্ডল হয়ে উঠলেন—কে?

শশী?

—আজ্ঞে মায়ের পুণ্য নিয়ে চলুন একবার।

ভট্টাচার্য উঠলেন। পুণ্য নিলেন। তাঁর বৃকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। জীবনে বোধ হয় এমন কণ্ঠ কখনও হয় নাই। তবু বলতে চাইলেন—ভয় কি? কোন ভয় নাই! কিন্তু মুখ দিয়ে সে কথা বের হল না। অন্ধকার ঘুমন্ত পল্লীর মধ্য দিয়ে চারখানি পায়ের শব্দ দ্রুততালে বেজে এগিয়ে চলল। আরও একটি করে শব্দ দু'জনেরই কাণে আসছিল—বৃকের ভিতরে ধক—ধক—শব্দ উঠছে।

* * * * *

বোবা মেয়ে কাঁদছে।

ডাক্তার বেরিয়ে এল। ভট্টাচার্য বেরিয়ে এলেন। শশীও বেরিয়ে এল। আনন্দের মা—ডাক্তারকে কিছুর বললে না, ভট্টাচার্যকে ডাকলে না—ডাকলে, বাবা শশী!

তিনজনেই দাঁড়াল।

আনন্দের মা বললে—আমার গতির কি হবে বাবা? তুমি—

শশী পাথরের মত দাঁড়িয়ে গেল।

ডাক্তার বললে—তুই যা শশী—তা ভিন্ন—।

ভট্টাচার্যের গলা দিয়ে বের হল—অদ্ভুত একটা স্বর।

এদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুকে দাখ করে না—মাটির মধ্যে পুড়ে দেয়।

আনন্দের মা বললে—নিয়ম আমি খাব। কিন্তু গর্ত করতে আমি তো পারব না।

ভট্টাচার্য দাঁড়ালেন—এগিয়ে চললেন—দ্রুতপদে। ঘাড় হেঁট করে যেতে যেতে হাতের মটোর মধ্যে তিনি কচলে পিষ্ট করছিলেন একটা জবাফুল—দু'তিনটে পেলপাতা।

ডাক্তার ডাকলে—দাঁড়ান ভট্টাচার্য মশায়। সেও দ্রুতপদে এগিয়ে চলল।

ভট্টাচার্য দাঁড়ালেন না। ডাক্তার গতি দ্রুততর করলে।

রাতি শেষে হিমতীক্ষা বাতাস বইতে সূর্য করেছিল। পাশেই একটা বাড়ীতে কেউ বিনিয়ে বিনিয়ে মৃদুস্বরে কাঁদছে। ঘুম ভেঙে গেছে, সন্তানমান অন্ধকারের মধ্যে মনে পড়েছে মৃত প্রিয়জনকে। দূরে কোথাও কতকগুলো বৃকুর একসত্তো চাঁৎকার করে কাঁদছে।

আনন্দাসবে—

প্রেম ও প্রীতির নৈবেদ্য
রাজনতী জন্ম ও মাস্ক কিমাম
মুদ্, মাদকতা ও সাদে গাথে অভুলনীয়।



দি টোব্যাকো ট্রেডার্স

৫৪, বেঙ্গলগাছিয়া রোড, কলিকাতা
ফোন : বি বি, ৩৯৭৯

সাদার্ন ব্যাঙ্ক লি.

২২ অফিস-১৪২৩ ব্রিটিশ বালিবাগা। দোকান-১৭৭৭, ৫১৮৯

ব্রাঞ্চ—বড় বাজার জামবাজার, ভবানীপুর
বসিরহাট, খুলনা ও পাটনা।

সদ্যের হার

কারেন্ট—৩%

সেভিংস্—১১%

ফিক্সড ডিপজিট

২১% হইতে ৪%

স্ববিধাজনক সর্বোৎকৃষ্ট ও মিলিটারী বিলের উপর টাকা ধার দেওয়া হয়
এবং সকল প্রকার ব্যাংকিং কার্য করা হয়।

১৯৪২—৪৩ সালে শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ (ই কান স্ট্যান্ডার্ডিভার্সিটি)
দেওয়া হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ডাঃ অমলকুমার রায় চৌধুরী, এম ডি।

“ইণ্ডিয়ান হারবাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট”

এর কয়েকটি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ

মালেরিয়ার জন্য—এ্যান্টি-টারসিয়ান ট্যাবলেট (ANTI-TERTIAN TABLET)

বেরিবেরিতে—কুকুভিন (KOKUVIN)

ফাইলেরিয়ার জন্য—ক্যালোফিল (CALOFIL)

কাসি এবং ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতিতে—সিরাপ তালিশ

(SYRUP TALISH ET VASAK COMP.)

কলিকাতা ও হাওড়ার প্রধান প্রধান ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

যা রু তি ড্রা গ সি ণ্ডি কে ট

সোল ডিস্ট্রিবিউটারস্

রুম নং ডি-২৭।২৮

৮৪৩, ক্লাইভ স্ট্রীট—কলিকাতা।

ফোন—কলি: ৫৭৮৯

লাল হৈছে। কুসুর বাদে। ডাক্তার আরও দ্রুত চলতে চেষ্টা করলে। এগুলো তাকে ভত পীড়িত করছে না—কিন্তু এখনও শোনা যাচ্ছে ওই বোবা মেয়ের কান্না।

ভট্টাচার্য পিছন থেকে ডাকলে—দাঁড়ান ডাক্তারবাবু। যুবক ডাক্তার—ভট্টাচার্যকে অতিক্রম করে গেছে। ডাক্তার দাঁড়ালে না।

সে অস্থিরভাবে টানছিল—স্টেথিসকোপের রবাবের নল দুটো। একটা নল ছিঁড়ে গেল। বেশ হয়েছে। কি হবে ডাক্তারী করে? বোবা মেয়ের কান্না এখনও শোনা যাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবী-য়ে যেন ছড়িয়ে পড়েছে ওর কান্না। ডাক্তারের মনে হল—ও কান্না যেন কখনও থামবে না—চারদিকে কান্না। মানুষ মরছে! মরবে! আর যথেষ্ট হয় তাদের নিষ্কৃতি নাই। এই তেরশো পঞ্চাশেই সব ধুয়ে নুড়ে যাবে। চাঁৎকার করতে ইচ্ছে হ'ল ডাক্তারের—ভূয়ো—ভূয়ো সব ভূয়ো! সে ছুটে গিয়ে উঠল আপনাব ডিসপেনসারীর দাওয়ায়।

ঘরের মধ্যে ঢুকে অস্থকারের মধ্যেই সে চেয়ারে বসে পড়ল। চমকে উঠল ডাক্তার। বোবা মেয়ের কান্না শোনা যাচ্ছে। দেওয়ালের কোণ চিরে আসছে সে কান্না।

কান্না নয়—ঝাঁঝের ডাক।

ডাক্তার টচ জ্বাললে; পোকটা দেখা যায় না। আলোর ছটাও গিয়ে দেওয়ালে পড়ছে না, পড়েছে আলমারীর উপর। Poison! বিয়! সাবধান!

ডাক্তার অগ্রসর হ'ল আলমারীর দিকে।

—ডাক্তারবাবু!

ভট্টাচার্য ডাকছেন রাস্তা থেকে। ডাক্তার উত্তর দিলে না। টচটা নিজের দিলে।

ভট্টাচার্য আবার ডাকলেন। কিন্তু উত্তর এলো না। ভট্টাচার্য একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে চললেন। এগিয়ে চললেন চণ্ডীতলায় পথে।

দরজা খুলে দেবীর সম্মুখে দাঁড়ালেন। ভিতরে প্রবেশ করলেন কিছুদ্ধণ ভেবে, নেড়ে দেখলেন দেবী প্রতিমা। শীতাত শেষ রাত্রে মর্তি থেকে কিম বের হচ্ছে। কঠিন। মানুষের শবও এত কঠিন হয় না।

ভট্টাচার্য যেন পাগল হয়ে গেলেন।

হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল বলির খাঁড়খানা নিয়ে—। শিউরে উঠলেন ভট্টাচার্য। তারপর দাঁতে দাঁত টিপে খাঁড়খানা আরও শক্ত করে ধরলেন—নিজের গলাতেই—

* * * * *

পর্যাদন সকাল বেলা।

ডাক্তার ধীরে ধীরে এসে চেয়ারে বসলে। উঃ কি রাতিই গেছে কাল। এখনও বিষের আলমারীর দরজাটা খোলা রয়েছে। মাথায় হাত দিয়ে বসল সে। মাথায় বস্তগা হচ্ছে।

রোগী অনেকে এসে বসে আছে। অনেকে আসছে। প্রতিদিনের মত আজও গত রাত্রে কে কে মরেছে তারই হিসেব হচ্ছে। তিনজন মরেছে গত রাত্রে। নসুদামের স্ত্রী, পঞ্চ বাউড়ী, গোবিন্দ বৈরাগী।

—আনু, ঠাকুরের ছেলোটো মরেছে কাল। একজন বললে।

ডাক্তার আবার অস্থির হয়ে উঠল। রাতি জাগরণের অবসর অবসন্ন ডাক্তারের কাণের স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্যে এখনও যেন মধ্যে মধ্যে বেজে উঠছে বোবা মেয়ের কান্না। সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন দৃষ্টির সম্মুখে মনের উদাসীনতার সুযোগে—ভেসে উঠছে সেই ছবি।

—ডাক্তারবাবু!

বোমকেশ বাবুর ভাইপো। কুড়িটা টাকা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে সে বললে—ওষুদের দাম। আর—

ডাক্তার অবসন্ন দৃষ্টি তুলে চাইলে তার দিকে।

—এবেলা যাবেন বারোটার পর।

—বারোটার পর?

—হ্যাঁ। আজ স্বস্তায়ন করাচ্ছি। হয়ে যাক স্বস্তায়নটা।

—বেশ।

বোমকেশ বাবুর ভাইপো মৃদুস্বরে বললে—চণ্ডীতলায় পুজো দিলাম, বলি দিলাম, খানিকটা প্রসাদী মাংস আছে। বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দিই?

—নিশ্চয়।

বোমকেশের ভাইপো বললে—ভট্টাচার্য মশায় কেমন হয়ে গেছেন। কি যে নম নম করে পুজো করলেন! বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়লেন—আমার মনে হল যা—তা বলছেন। মধ্যে মধ্যে থুকে করে হাসছেন।

গোঁ গোঁ শব্দ উঠল।

ছেলোরা চাঁৎকার করে উঠল—ওরে লাগারে—কতরে! কতরে!

বোমকেশের ভাইপোর কথাটা জমল না। সে উঠল, বললে—

এবেলাতেই দেখে ওষুদ দেবেন।

ডাক্তারের মুখেও বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। ঘাড় নেড়ে সে প্রেসক্রিপশন লিখতে আরম্ভ করলে।

এরোপেলনের ঝাঁক এগিয়ে আসছে। গর্জন বাড়ছে। সে শব্দ ছাপিয়ে উঠল কাগজর শব্দ। তারস্বরে কাদিতে। স্ত্রীলোকের কণ্ঠের কান্না।

—কে? —কে রে? কে গেল? বাইরে রোগীরা গবেষণা করছে।

ডাক্তার লিখেই চলেছে। ও কান্না তাকে বিচলিত করে না। যে কান্না কাল রাত্রে শুনেন—তারপর—?

কান্না এগিয়ে আসছে।

—কে? কে? শশীর বউ? শশী ডোমের বউ? —কি হ'ল রে? অ-ডোম বউ?

—ওগো!—আমার মরন—

—কে—শশী?

—হ্যাঁ গো! গায়ের বাইরে গাছের ডালে—গলায় দড়ি লাগিয়ে—থানায় খবর দিতে যাচ্ছি গো!—

শশীর স্ত্রীও থোমে গেল—আকাশের দিকে চেয়ে দেখছে। একদল—বিশ পাঁচশখানা উড়ো জাহাজ চলেছে।

ডাক্তারের কলম থোমে গেছে।

শশী আত্মহত্যা করেছে?!! এরোপেলনের শব্দের মধ্যে বোবা মেয়ের কান্না শুনতে পাচ্ছে ডাক্তার।



হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

বিশুদ্ধ না হইলে ফল পাওয়া যায় না

কিন্তু কোনও বৈজ্ঞানিক লেবরেটরীতে ইহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষার উপায়
অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং বিশুদ্ধ ঔষধ পাওয়ার একমাত্র
উপায় বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হইতে ঔষধ সংগ্রহ করা।

অত্যাৱশ্যক কয়েকখানি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক

তুলনামূলক মেটেরিয়া মেডিকা

(থেরা পিউটিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল)
ঔষধের পরিচয়, প্রস্তুত প্রক্রিয়া,
ক্রিয়াস্থল ও কোন কোন উপসর্গে
ব্যবহৃত হয়, রোগীর মানসিক
অবস্থা এবং ঐ মানসিক অবস্থা-
সম্পন্ন লক্ষণবিশিষ্ট সমস্তরের
কোনও ঔষধ থাকিলে তাহার
বৈশিষ্ট্যমূলক তুলনা ইত্যাদি
যথাসম্ভব দেওয়া হইয়াছে।

২২৮৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬ টাকা মাত্র।

পারিবারিক চিকিৎসা

কেবলমাত্র বঙ্গভাষায় লক্ষ লক্ষ
পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে।
পঞ্চদশ সংস্করণে “নব-পর্যায়”
নাম দিয়া “রক্তের চাপ (Blood
Pressure)” ও “বিমান আক্রমণে
বিপত্তি” সম্বন্ধে চিকিৎসা প্রণালী
সংযোজিত হইয়াছে।

১১৯২ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪ টাকা মাত্র।

THE PHARMACUTIST'S MANUAL

The Pharmacopoeia of Homoeo-
pathic Medicines (10th Ed.) in-
corporates fully the direction of
the latest official Homoeopathic
Pharmacopoeia of the U. S. A. to-
gether with those of the A. H. P.
& G. H. P. and includes about 70
Indian Drugs and all Resinoids.

Price Rs. 5/- only.

MANUAL OF MATERIA MEDICA

With Allen's Clinicals;
also contains quotations from
'Hahnemann,' 'Hering,' 'Clarke',
etc., etc.

Over 2,000 pages in 2 Vols.

Price Rs. 10/- only.

পঞ্চাশ বৎসরের উদ্ধৃকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য হোমিওপ্যাথিক
প্রতিষ্ঠান

এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

ইকনমিক ফার্মেসী

৮৪, ব্রাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।

ঐশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিজ্যোতিষ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগেশ কবোঁর রচয়িতা ঐশানচন্দ্রের নামের সহিত বাঙালী পাঠক নিত্যমত অপরিচিত নহেন। তিনি কবির হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ তারিখের জন্ম হয়।

ঐশানচন্দ্রের জীবনকথা আমরা বিশেষ কিছুই জানি না; এইটুকু মাত্র জানা আছে যে, তিনি অনেক দিন হাংগলী কলেজীতে এবং সেখানে জীবনে হাইস্কোলে কর্ম করিয়াছিলেন।

গ্রন্থাবলী

ঐশানচন্দ্র কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন। সে-যুগের প্রায় সকল সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। চিত্ত মকুর। (পদ্য গ্রন্থ) সন ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)। পৃঃ ১৪৭।

পুস্তকের আখ্যাপ্তে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও উৎসর্গপত্রের এই অংশ হইতে দেখা যায় যে, ইহা ঐশানচন্দ্রের লিখিতঃ—
“স্বল্পাপদ শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় মহাশয়!...অগ্রজ বলিয়া ‘চিত্ত-মকুর’ আপনাই অর্চনার উপকরণ...কনিষ্ঠ বলিয়া আমার প্রতি যেরূপ স্নেহদৃষ্টি আছে.....”

গ্রন্থকারের “বিজ্ঞাপনে” প্রকাশঃ—“ইহার অনেকগুলি কবিতা বন্ধুবর্গের অনুরোধে ইতিপূর্বে এডুকেশন গেজেট ও বাম্ধব পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।...চিৎমকুর তাহার প্রথম উদ্যম।”

২। বাসন্তী। (গীতিকাব্য) ইং ১৮৮০। পৃঃ ১৬২।

পুস্তকের আখ্যাপ্তে গ্রন্থকারের নাম নাই। প্রকাশক বিনোদবিহারী মল্লখাপাধ্যায় “বিজ্ঞাপনে” লিখিয়াছেনঃ—“গ্রন্থকারের যে সকল কবিতা ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শন, বাম্ধব ও আর্ষদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলি ও কতগুলি অপ্ৰকাশিত কবিতা সংগ্রহ করিয়া বাসন্তী প্রকাশ করিলাম। গ্রন্থকার সাধারণের নিকট নিত্যমত অপরিচিত না হইতেও পারেন। তাহার ‘চিত্ত-মকুর’ ও পূর্বোক্ত সাময়িকপত্রখণ্ড কবিতাগুলি বোধ হয় সাধারণের নিকট নিত্যমত

অনাদর প্রাপ্ত হয় নাই। বসন্তকালে প্রকাশ করিবার মানস ছিল বলিয়া বাসন্তী নাম দেওয়া হয়, কিন্তু কার্যগতিকে বিলম্ব হইয়া পড়িল।... পাইকপাড়া ১০ই শ্রাবণ ১২৮৭।”

৩। যোগেশ কাব্য। ইং ১৮৮১। পৃঃ ১৪২।

গ্রন্থখানি “সহোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত।



ঐশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৫৬—১৮৯৭

উৎসর্গপত্রে গ্রন্থকার লিখিতেছেনঃ—“যোগেশ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা তোমায় বলিয়া দিই। যোগেশ কাব্যনিক উপন্যাস নহে; যোগেশ জীবিকাংশই যোগেশের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। যোগেশ আমার আজীবন সুহৃদ—আমার সংসারের সন্ধান—আমার অন্তরের অন্তর—আমার কবিতা সহায় ছিলেন।...যোগেশ অমিতাকর ছন্দ লিখিলাম, জাঁনি না তোমার কিরূপ লাগিবে, কিন্তু তুমি আমার ‘চিত্ত-মকুর’ ও ‘বাসন্তী’ আদরের সহিত পাঠ করিয়াছিলে। পদ্মপুস্তক, খিদিরপুর। ২৫এ ফাল্গুন ১২৮৭ সাল।

৪। চিত্রা। (গীতিকাব্য) ইং ১৮৮৭। পৃঃ ১৭২।

পুস্তকের “আনুষঙ্গিক কথা” প্রকাশঃ—
“চিত্রার প্রায় সকল কবিতাই পূর্বে বঙ্গদর্শন, আর্ষদর্শন, বাম্ধব, ভারতী, নবজীবন, প্রচার, পাণ্ডিত্য সমালোচক, কম্পনা, সাধারণী, সময় প্রভৃতি মাসিক ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত

হইয়াছিল। অপ্ৰকাশিত দুই একটি কবিতাও ইহাতে আছে। সকল কবিতারই কিছু কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিয়াছি।...হংগলী, চৈত্র ১২৯০।”

নির্বাচিত কাব্য সংগ্রহ
ঐশানচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থ হইতে নির্বাচিত করিয়া বাহা কাব্য-সম্পদে গ্রাহ্য বিবেচিত হইয়াছে, এবং একটি রচনা-সংগ্রহ ‘বাংলার কবি ও কাব্য’ গ্রন্থমালায় অমৃতভূক্ত হইয়া সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অপ্ৰকাশিত রচনা

১০১৮ সালের বৈশাখ-সংখ্যা ‘বঙ্গদর্শনে’ শ্রীবিনোদবিহারী বিনোদবিহারী “কবি ঐশানচন্দ্রের অপ্ৰকাশিত কবিতা” নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি ঐশানচন্দ্রের কতগুলি অপ্ৰকাশিত রচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

“কবি ঐশানচন্দ্রের তিনখানি অপ্ৰকাশিত গ্রন্থের জামরা সন্ধান পাইয়াছি। একখানির নাম ‘অনন্ত’, একখানির নাম ‘দেবীতীর্থ’ এবং একখানি কতগুলি কবিতার সমষ্টি।.....

১। অনন্ত—‘অনন্ত’ [নয় সর্গে সমাপ্ত] একখানি ষড় কাব্য এবং ইহার নামের নাম ‘অনন্ত’। কর্মফল-পূর্ণিত জীবনের যাতনায় পৌঁছায় অনন্তের মহাপ্রাপ্ত কাঁদিয়া উঠিল। অনন্ত দেখিলেন, বিশ্বের বস্তুমান বস্তুধার দুঃখ, কষ্ট, যাতনা অবশ্যম্ভাবী। তাই জীবিকুলের শাস্তির জন্য অনন্তের প্রাণ বাল্মীকির জন্মে বিশ্ববিমিত্রের মত নৃতন জগৎ নির্মাণ করিতে চাহিল।...

২। দেবীতীর্থ—গ্রন্থখানি দশ সর্গে সম্পূর্ণ। ‘অনন্তের’ সর্গের মত ইহার সর্গগুলি ছোট ছোট নয়। এখানি একখানি মহা-কাব্যের মত এবং ইহার বর্ণনায় বিষয়ও মনোহা-হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের নিপুণ বিশেষণে কবির উচ্চতর শক্তির পরিচায়ক। কবি যোগেশের অদৃশ্য করিয়াই এ কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন।

কিন্তু কবি ইহাতে ‘যোগেশ’ অপেক্ষা এক সোপান অগ্রগত হইয়াছেন। যোগেশ কতকটা অকর্তব্য কর্মসিদ্ধ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া উদ্যম হৃদয়-প্রোতে শব্দ নিজের হৃদয়-বর্তি অনুসরণ করিয়া অকলে ভাসিয়াছে, ইহাতে কবি দ্বাৰাইতে

লক্ষ্য হওস্বার মহোষধি



১৬ দিন মধ্যে ১ হইতে ৪ ইঞ্চি লম্বা হইবেন।... গ্যারান্টি দেওয়া।

আপনার দেহের বৃদ্ধিসাধক ২০০ গ্রাম নিম্নস্থ ঔষধের ফলেই আপনি খর্বাকৃতি হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত টালস্পাইন আপনার দেহের বৃদ্ধিসাধক নিষ্কৃত গ্রন্থিসমূহকে সজীব ও সক্রিয় করিবে এবং ১৬ দিন মধ্যে আপনার উচ্চতা বৃদ্ধি পাইবে।

ইংল্যান্ডের একটি বিখ্যাত ল্যাবরেটরীতে টালস্পাইন ট্যাবলেট প্রস্তুত হয়। ইহার ফরমুলা চিকিৎসকসকলই দেখিতে পারেন। প্রত্যহ দুইটি করিয়া ট্যাবলেট ১৬ দিন সেবন করিলেই দেখিবেন আপনার উচ্চতা কয়েক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছে। বহু ব্যক্তি এই অত্যুচ্চ স্প্যান্ড ফুড ব্যবহারে সুফল পাইয়াছেন।

টালস্পাইন স্প্যান্ড ফুডের প্রত্যেক মোড়কের মধ্যে গ্যারান্টি দেওয়া থাকে।

সমস্ত নকল জিনিষ লইবেন না—টালস্পাইন লেখা আছে কিনা দেখিয়া লইবেন।

মূল্য প্রতি প্যাকেট ৫০০ টাকা, প্যাকিং ও ডাকমামূল্য বাদ ১, স্বতন্ত্র।

পূনরায় মাল পাঠাইবার অর্ডারসহ প্রত্যহ বহু অস্বাভিক প্রলোপাত আসিতেছে।

T MADE IN ENGLAND
TALSPINE
GLAND FOOD TABLETS

ডিপার্টমেন্ট:

দি ব্রিটিশ ট্রেডিং কোং

লাইসেন্সপ্রাপ্ত ফার্মাসিউটিক্যাল ডীলারস
এবং ম্যানুফ্যাকচারারস,
নবাব বিল্ডিং, টমাস কুক এন্ড সন্স লিমিটেড
বিশ্বরীতি দিকে,
ডিসার্ট পি সি, ৩২৭, হুগলী রোড, বোম্বাই।

আমাদের—

গোঞ্জি, মোজা, ব্লাউজ,
সর্বপ্রকার স্পোর্টিং সার্ট,
ডুসার, জামিরা
প্রভৃতি

আধুনিক হোসিয়ারী দ্রব্যাদি সকলেরই আদরণীয়।

মূল্য তালিকার জন্য লিখুন

টেলিগ্রাম—টেক্সটাইল, কলি:



ফোন—বড়বাজার ১৮৫৮

হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও পাইকারী বিক্রেতা

টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ
৮৭ ওস্ত চানাবাজার স্ট্রীট, কলি:

সর্বদা 'রাণীর' পেটেন্ট ঔষধই চাহিবেন

পিক-আপ—সাধারণ ভগ্নস্বাস্থ্য, স্নায়ুদৌর্বল্য, দুর্বলতা ও অনিদ্রার জন্য।

চারকোট্যাব—অম্ল, অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া, উদরাময় ও আমাশয়ের প্রথমাবস্থায়।

বার্থল—ভেষজ উপাদানে প্রস্তুত জন্মবধের নিশ্চিত ফলপ্রদ সেবনীয় ঔষধ।

ভীমা ২নং—(নিম্ন সহযোগে) চর্মরোগে অম্বিতীয়।

ভীমা ৩নং—(চালমোগরা সহযোগে) খোস, পিচড়া ও সোরিয়াসিস ইত্যাদির মহোষধি।

হারবোটোন—ভরুণ ও পুরাতন ম্যালেরিয়ায় অব্যর্থ।

হিপ্যোটোন—যকৃতের গোলযোগে। লীভারের ক্রিয়া উত্তেজিত করে, পিত্ত নিষ্কাশণ বৃদ্ধি এবং হজমশক্তি পরিবর্ধিত করে। শিশুদের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

ইউটেরল—জন্মদোষের অব্যর্থ প্রতিকার।

অনুপন্ন প্রসঙ্গ -

সতী পাউডার—কমনীয় মূত্রে কোমল প্রসাধন। শিশুর কোমল চর্মের পরম উপযোগী।

বিউটি লোসন—চর্মের শ্যামলতা দূর করিয়া গৌরবর্ণ দান করে।

ভুগুরাজ কেশ তৈল—মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

ফ্যাক্টরী:— রাণী এও কোং লিঃ

রাজনগর,
ঢাকা।

রাজারদেউলি, ঢাকা।

"রাণীকো"
টোলঃ
ঢাকা।

নাহিরাকল, 'স্বাভাৱিক জ্ঞান নাই।' বৃদ্ধাইতে

চাহিয়াছেন—
"কতবাই জীবনময় অকর্তব্য পাপ।"

(৩) কবিতাবলী—ইহাতে চতুর্বিংশতিটি কবিতা সম্মিলিত।

১। পূর্ণিমা, ২। মালতীর আক্ষেপ, ৩। কোরক-গীতি, ৪। জগত, ৫। আমি তোর এত কি সুন্দর? ৬। দুইখানি ছবি, ৭। গান, ৮। তিনখানি ছবি, ৯। বিজা, ১০। তুমি কি রমণী?, ১১। প্রতিমা, ১২। পণ্ডিত ইন্দ্রেন্দ্র বিদ্যা-মাগের স্বর্গরোহণ, ১৩। বন্ধুসংস্পর্শ, ১৪। কবির দিব্য বন্ধু, ১৫। ভালবাসা, ১৬। আবাহন, ১৭। পৌরগীতি, ১৮। বিশ্বাস, ১৯। সত্যমূল, ২০। দিশেছায়া, ২১। বর্ষশেষে, ২২। মৃত-পতির কক্ষস্থল ও বন্ধুদর্শনে, ২৩। তরঙ্গী-বক, ২৪। মহামাশু, ২৫। বিশ্বাসিত ও পরশু, ২৬।

‘পূর্ণিমা’ প্রকাশ

১৩০০ সালের বৈশাখ মাসে ইশানচন্দ্রেরই ‘উৎসাহে ও উদ্যোগে’ হুগলী বর্ষাবোধিয়া ধইতে ‘পূর্ণিমা’ নামে একখানি উজাগের মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার ‘সূচনা’য় ইশানচন্দ্র লিখিয়াছিলেনঃ—

সকলের জীবনে এমন অবসর অনেক থাকে যাহা অতিবাহিত করিবার জন্য অবলম্বন খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়। নালকে খেলা করে, প্রোঁতে শাপ্প আলোচনা করেন, বৃন্দে হরিনাম করেন, কিন্তু ঘুমায়ে কি করিবেন ভাবিতে হয়। উপন্যাস বা নভেল পাঠ যুবকের পক্ষে সুখকর বটে; সাধারণ তাহাই করিয়া থাকেন। কিন্তু সে ইংরাজী ভাষায়। দেশীয় ভাষায় সুখপাঠ উপন্যাস অতি অল্প, নভেল নাই বলিলেই হয়। ইংরাজীতে এরূপ পুস্তক বিস্তার আছে—এত আছে যে সমস্ত জীবন পাঠ করিলেও নভেল বা উপন্যাস পাঠ সমাপ্ত হয় না। ইংরাজের নভেল বা উপন্যাস পাঠে ইংরাজের সামাজিক গার্হস্থ্য ও বাহ্যিক জীবনের বাধ্য-মণ্ডের আলোচনা হইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের স্বজাতির এ সকল কথাও ত অবশ্য জ্ঞাতব্য; তাহার আলোচনার উপায় কি? পুরাণে অতি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান ও অতি সুন্দর আদর্শ চরিত্রের উল্লেখ দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু দুইয়ের বিষয় অধিকাংশ ইংরাজীতে শিক্ষিত যুবকের চক্ষে সে সকল অজানিত অলৌকিক ‘আজগা’বি’ ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। তাহার শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থা হয় না, সুতরাং সে সকল পাঠে পুচ্ছাও হয় না। যদি বা কখন পুচ্ছা হয়, তবে গ্রন্থার অভাবে তাহার যথোচিত মন্তব্য হয় না। এরূপ প্রকৃতির পাঠকেরা অগত্যা হয়, অবসর অপব্যয় করেন, নই ইংরাজী নভেল বা উপন্যাস পাঠ করিয়াই সময় অতিবাহিত করেন। স্বদেশের জ্ঞাতব্য কথা তাহাদের নিকট অপরি-জ্ঞাতই থাকিয়া যায়। যাঁহাদের গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা হয়, তাঁহারা কেহ কেহ ইংরাজী ভাষার সাময়িক পত্রিকা বা বিজ্ঞান

দর্শন পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতেও সময়ের সঞ্চয় হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেসকল কঠিন অধ্যয়নে কয়জনের অনুরাগ দেখা যায়? পাতকখানায় দুঃখবিশেষের স্বাধীন চিন্তা বা গুরুতর বিষয়ের আলোচনার অবসর থাকে না। কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা অর্থোপা-জ্ঞানের জন্য যেরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন তাহাতে সখ করিয়া বা জ্ঞানোপার্জনের জন্য গুরুতর অধ্যয়নে তাঁহারা মনোনিবেশ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ কলেজের সংকীর্ণ শিক্ষা-বসন্ত দর্শন বিজ্ঞানের গ্রন্থ দূরে থাকুক, Nineteenth Century, Fort-nineteenth বা Saturday Review প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় আলোচিত গুরুতর বিষয়গুলি সম্পূর্ণ হৃদয়গম্য করিতে তাঁহাদের বিদ্যা বৃদ্ধি কুলাইয়া উঠে না। আমরা অবশ্য সকল শিক্ষিত যুবকের কথা বলিতেছি না। সাধারণের কথাই বলিতেছি।

যাঁহাদের প্রতিভা আছে তাঁহারা অল্প বয়সেই বিস্তারিত গুরুতর কার্য করিয়া থাকেন। প্রতিভা; কিন্তু ব্যক্তি বিরল। আমাদের পাঠক-বর্গের মধ্যে যদি প্রতিভাসম্পন্ন কোন যুবক থাকেন, তাঁহাদের উপরোক্ত কথায় অভ্যস্তান করি-বার কারণ নাই। আমরা সাধারণের একজন—সাধারণের কথাই বলিতেছি। বস্তুতঃ শিক্ষিত সাধারণ যুবকবর্গের জন্যই দেশীয় ভাষায় মাসিক পত্রিকার প্রচার হওয়া আবশ্যিক। পত্রিকার উদ্দেশ্য যে কেবল শিক্ষা প্রদান তাহা নহে। লেখক মাঠেই কিছু এমন বিষয়াদ্ধিসম্পন্ন নহেন যে তাঁনি পাঠক মাঠেরই গুরুত্বান্বিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। লেখক তাঁহার নিজের মনোগত ভাব প্রকাশ করিবেন, পাঠক তাঁহার কিছু জ্ঞাতব্য থাকে গ্রহণ করিবেন, ভুলভ্রান্তি থাকে তাঁহার আলোচনা করিবেন। অধিকন্তু যদি পাঠক সহৃদয় হইলে তবে লেখকের সে ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া দিবেন। ফলতঃ আমাদের পত্রিকার উদ্দেশ্য তাহাই। আমরা সকল বিষয়েরই অনশ্লীলন করিব, সে অনশ্লীলনে লেখকের আত্মপ্রতিরক্ত ত আছেই, পক্ষান্তরে যদি অন্যের সেরূপ অনশ্লীলন বৃত্তি তাঁহার স্মারায় ক্রিষ্ট-শ্রম ও পরিচালিত হয় তাহাতেও ব্যক্তিগত ও সমাজগত মঙ্গল আছে। আমরা জানি এবং যাঁহারা বঙ্গভাষার বর্তমান পারিপ্ৰস্তিকের কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহারাও জানেন যে প্রবোধচেষ্টায় হইতে আধুনিক নব্য-ভারত ও সাহিত্য পর্যন্ত পত্রিকার প্রচারে কতশত ইংরাজীতে শিক্ষিত যুবকবৃন্দের বিজাতীয় বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা সত্ত্বেও বঙ্গভাষার প্রতি মতি গতি ফিরিয়াছে—বাগালা গ্রন্থ পাঠে পুচ্ছা হইতেছে—বঙ্গভাষায় রচনা করিতে সাহ হইতেছে—সম্পাদক যুবকের কথা—বঙ্গভাষাকে প্রীতির চক্রে লেঁধেতে অভ্যাস হইতেছে। পত্রিকার সৌভাগ্য বত হউক না হউক, বঙ্গভাষার প্রচুর মণ্ডল সম্মিত হইতেছে সুতরাং স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গল নই আর কি বলিব। ইহার বেহু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে পূর্ণিমা পত্রিকার সম্পাদকেরা কিছু আর সোপান হাতে ধরিয়া তাঁহাদের মতিগতি পরিবর্তন করেন নাই বা তাঁহাদের হাত ধরিয়া তাঁদের লেখক করিয়া দেন

নাই। সম্পাদকেরা আপনাদের বিদ্যাবৃদ্ধি ও যত্নে যতদূর সম্ভব ভাষার উন্নতিপক্ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন, দশটা ভাল কথা—দশটা উচ্চাচর বঙ্গভাষার প্রকাশিত হইতে লাগিল—তাঁহা দেখিয়া শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি বঙ্গভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। লোকে বুঝিল যে চেষ্টা করিলে নিজীব অসার বঙ্গভাষায়ও, মহৎ চিন্তা বা মহত্ব ভাব প্রকাশ করা যায়। মাতৃভাষা সহজেই বাগ্মণীর হৃদয়ের ভাষা। ইংরাজী ভাষায় যত বড় পণ্ডিত হউন না কেন, পরজাতি অপেক্ষা আপন ভাষায় হৃদয়ের ভাবগুলি প্রকাশ করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত সুখবোধ করেন। তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষার ক্ষুধিত অভাবেই লোকে ইংরাজিতে মনোভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং এরূপ ঘটনায় বঙ্গভাষায় তাঁহাদের অনুরাগ হইবে তাঁহার আর বিচার কি? দিন দিন মহৎ ভাবগুলি দেশীয় ভাষায় সঞ্জিত হইয়া পরিচিত মতিতে পাঠকের চক্ষে পতিত হওয়ায়, ক্রমশঃ দেশের প্রাচীন শাস্ত্র ও পৌরাণিক কথা শিক্ষিত যুবকেরা আর পূর্বের ন্যায় জটিল ও অপ্রসঙ্গিক বলিয়া জবহেলা না করিয়া সেইগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে লাগিলেন। বিষয়গুলি ইংরাজী ধরণে পরিলক্ষিত পত্রিকাগুলি ও পরিব্রাজ হওয়ায় দেশীয় মতি হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বিভিন্ন মতি ধারণ করিলেও, ইংরাজীশিক্ষিত লোকের পক্ষে তাঁহা-দের মূল অবরব নিত্যত অপরিচিত থাকিল না। তখন পাঠক স্বদেশের ও স্বজাতির মহত্ব হৃদয়গম্য করিতে উৎসুক হইলেন। এইরূপে ভাষার বর্তমান উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। ইহাতে কতদূর শূদ্র ফল ফলিয়াছে তাহা পরলোকগত মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগলা রচনার সংগে আধুনিক রচনার একবার তুলনা করিয়া দেখিলেই হৃদয়গম্য হইবে। অপর দেশের ভাষার ইতিহাসে পর্য্যবেক্ষণ করিবার প্রয়োজন হইবে না, গত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে মাসিক পত্রিকা প্রচারে যেরূপ শূদ্র ফল ফলিয়াছে ও ফলিতেছে তাহা দেখিয়া আমাদের এই চেষ্টা ফলবতী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও লিপিশক্তি সকলই অপ্রচুর। আমরা কার্যে রতী হইলাম তাঁহার দৃষ্টা উদ্দেশ্য কতক অবসর কেন্দ্রন করা, কতক বা স্বাধীন চিন্তার চণ্ডাল করা এবং গোপ উদ্দেশ্য যাঁহারা আভাঙা কালোজ গোরা তাঁহাদের মাতৃভাষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা। আমরা উন্নত হৃদয়ে বলিতেছি যে, এরূপ কালোজ গোরাবাদের নিকটেই আমাদের আশা ভরসা বিস্তর। তাঁহাদের যে যিলা আছে, বুদ্ধি আছে, অধ্যয়ন আছে, তাঁহাদের পরিচর তাঁহারা সেনেট গৃহে বারম্বার দিয়াছেন। বঙ্গদেশের বর্তমান অস্থায়ী তাঁহাঁগকেই চিহ্নিত বা (Covenanted) ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের গুরুতর রাজকাৰ্য্যের ভার যেরূপ চিহ্নিত (Covenanted) কর্মচারীর ন্যায়ই সম্পন্ন হইতেছে—আমাদের ভাষার গুরুতর কার্য সেইরূপ উপাধিপ্রাপ্ত যুবকবর্গের ন্যায়ই সম্পন্ন হইবে বলিয়া আমাদের আশা ভরসা। এক্ষণে তাঁহাদিগকে এ কার্যেতে সৌখিন বৈদ্যরূপে (Volunteer) পরিণত করিতে পারিলেই আমাদের আশা ফলবতী হয়। আমরা তাঁহাদের কৃপাশ্রুতি আকর্ষণ করিবার জন্য বহালোভ ও বহালমত্ব চেষ্টা ও যত্ন করিতে দৃষ্টি করিব না। এক্ষণে তাঁহাদের নিকট আমাদের

*এই সকল কবিতার অধিকাংশই ইশানচন্দ্র জীবনশায় ‘পূর্ণিমা’তে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

—র না ব



ADHYAKSHA
MATHUR BABU

BLOOD-VITA

contains all the needed correctly balanced vital principles necessary for the maintenance of health and growth.



BLOOD-VITA

is synonymous with vitality, energy and good health which means resistance to disease and infections, such as, Malaria, Kalazar, Typhoid & Tuberculosis etc.



BLOOD-VITA

NURSES UP THE HUMAN PLANT PROMOTING THE EVENTFUL GROWTH, AS STRONG & STURDY AS THE

Seasoned **MIGHTY OAK**

EVERY DOSE ENRICHES THE BLOOD AND INCREASES VITALITY.

ADHYAKSHA MATHUR BABU'S
MEDICAL RESEARCH LABORATORY
P-23, CENTRAL AVENUE, CALCUTTA

ব্লাড-ভিটা।

দুর্বলতা ও ক্ষমহীনতা যে কোন রোগে আদর্শ টনিক ও রক্ত পরিশোধক।

ইহা অধুনিকতম পরীক্ষাগারে বিশেষজ্ঞদের বহু বর্ষব্যাপী পরীক্ষার ফল। স্বাভাবিক নিষিদ্ধে যে কোন ব্যক্তি ও যে কোনও ক্ষুদ্রতম ব্যবহার করা যায়। নিয়মিত সেবনে ইহা অকালবার্ধক্য দূরীভূত করিয়া শরীরে যুৎসনোচিত কর্মশক্তি আনয়ন করে।

জাতীয় সোভাগ্যের



জীবন্ত প্রতীক

বাঙালীর জাতীয় জীবনে দাশ ব্যাংকের অভূতপূর্ব ক্রমোন্নতি এবং জনপ্রিয়তা অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎবাহী অনিন্দ্য বিধান।

বৈজ্ঞানিক সংগঠন-পদ্ধতি এবং সুশৃঙ্খল সম্মেলন-প্রক্রিয়ার কল্যাণে দাশ ব্যাংক লিমিটেডের নিরাপত্তা এবং সচ্ছলতা উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ।

বাঙালীর যুদ্ধব্যাঘাতব্যাপী স্বপ্ন এবং সাধনার ফলেই দাশ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা। বাঙালীর জাতীয় সংস্কার, সংহতি এবং সামর্থ্যের কল্যাণেই দাশ ব্যাংক সর্বল, সফল এবং সার্থক।

বিশ্বব্যাপী বিশ্ববৈরী সাধ্য নাই যে, জাগ্রত বাঙালীর জাতীয় সোভাগ্যের প্রতীকস্বরূপ এই অপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির প্রগতির পন্থা প্রতিরোধ করে।

বস্তুতঃ দেশবাসীমাত্রেই বিশ্বাসভাজন কর্মবীর আলামোহন দাশের সম্প্রদায় পরিচালনার গুণে, সুদক্ষ, কর্তব্যপ্রাণ কর্মীবৃন্দের ঐকান্তিক পরিশ্রম ও সেবাপরায়ণতার ফলে এবং আপনাদের অটল বিশ্বাস ও অধারিত সহযোগিতার কল্যাণেই দাশ ব্যাংক লিমিটেড ব্যাপক জগতে বাঙালীর বৃদ্ধি, অধিকার এবং যোগ্যতাকে আজ প্রমাণিত, সম্মানিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

--দাশ ব্যাংকের ক্রমোন্নতির পরিচয়--

বৎসর	আদায়ী মূলধন	ডিপোজিট
এপ্রিল (উন্মোচন মাস) ১৯৪০	০,০৯,০০০, উর্দু	১,০৫০, উর্দু
ডিসেম্বর, ১৯৪০	৫,৭২,০০০, ..	৩,১৯,০০০, ..
ডিসেম্বর, ১৯৪১	৮,১৮,০০০, ..	২৪,৮২,০০০, ..
ডিসেম্বর, ১৯৪২	৯,৪৭,০০০, ..	৪০,০০,০০০, ..
ডিসেম্বর, ১৯৪৩	১০,০০,০০০, ..	১,১০,০০,০০০, ..
জুন, ১৯৪৪ (হিসাব সাপক্ষে)	১০,০০,০০০, ..	১,৫১,০০,০০০, ..

ডাইরেক্টর বোর্ড :

কর্মবীর আলামোহন দাশ,
চেয়ারম্যান;
মি: শ্রীপতি মখার্জি,
ডাইরেক্টর-ইন-চার্জ;
মি: নরসিং পাল;
মি: বিমলাপতি মখার্জি;
মি: শিবরত্নর দাশ।

দেশবাসী মাত্রেই

বিশ্বাসভাজন-

দাশ ব্যাংক লিমিটেড

৯-এ ব্লাইভ স্ট্রিট :: কলিকাতা

এই প্রার্থনা ত্যাগে যেন আমাদেরকে "দেশীয়" বলিয়া আমাদের সঙ্গ ত্যাগ না করেন।

পূর্ণিমা সর্বল বিষয়েরই অসোচনা হইবে।

যে কোন বিষয়ের রচনা উপদেশ হইবে, তাহাই

ইহাতে প্রকাশিত হইবে। তবে সাধারণের

অশুভকর ও অসুবিধাজনক বিষয় ইহাতে প্রকাশিত

হইবে না। রচনার নির্বাচনের জন্য ইহার

সমিতি গঠিত হইয়াছে, সেই সমিতি কর্তৃক

নির্বাচিত হইয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে।

খ্যাতনামা লেখকদের রচনা সমিতি কর্তৃক

পরম সমাদরে গৃহীত হইবে।

শিক্ষিত যুবকবৃন্দ অনুগ্রহ করিয়া পূর্ণিমায়

প্রকাশ করিবার জন্য রচনার প্রেরণ করিলে

সমিতির অভ্যন্তর ও উদ্যম সর্বল সফল হইবে।

"পূর্ণিমা"র প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই

ঈশানচন্দ্রের লিখিত "পূর্ণিমা" নামে একটি

কবিতা স্থান পাইয়াছিল। কবিতাটি নিম্নে

উদ্ধৃত হইল :-

পূর্ণিমা

১

(আমি) পারি না বহিতে, এ রূপের ভার,

(আমার) আকুল হইল বেহা।

(আমি) ব্যজিয়া গেছি, প্রণয়ী আমার,

দেখা যে দিল না কেহ।

(আমার) বুকের ভিতর, সুখের পাহাড়,

ছুটিছে প্রেমের বান।

(দেখ) দৃ কুল ভাষায়, উঠিছে উথলি,

আমার আকুল প্রাণ।

(আমি) বলি বলি করি, বল যে গেল না,

সাপের ময়ম বগ।

(আমি) পারি না ভাবিতে, এ রূপ রাশিতে,

লইয়া সুখের বাধা।

(আমি) ভেসে ভেসে যাই, স্নেহ নাহি পাই,

তু যে হাল না দেখা।

(আমি) এমন ব্যক্তি, অকালে পড়িয়া,

ভবিষ্যৎ পারি না একা।

২

(তবে) কে আত ভুবনে, প্রণয়ী তেনন,

এর যে হার মান।

(আমার) রূপের মাগর, মথিত করিয়া,

কর যে পীড়ার পান।

(আমি) নরন ভবিষ্য, যৌবন চাঙ্গিষ,

চলি রূপের বান।

(আমি) শ্রবণ ভরিয়া, চালিষ সংগীত,

জন্ম ভরিয়া প্রাণ।

(আমি) জগত ঘুরিয়া, জ্বল ভরিয়া

রোখিছ প্রকৃতি শোভা।

নিতি নব নব, সুখের দেখা

প্রেমিক-মানস-লোভা।

নিশির নিঃসর্গ, বিশ্ব কার সনে,

কহে কি নিগূঢ় কথা।

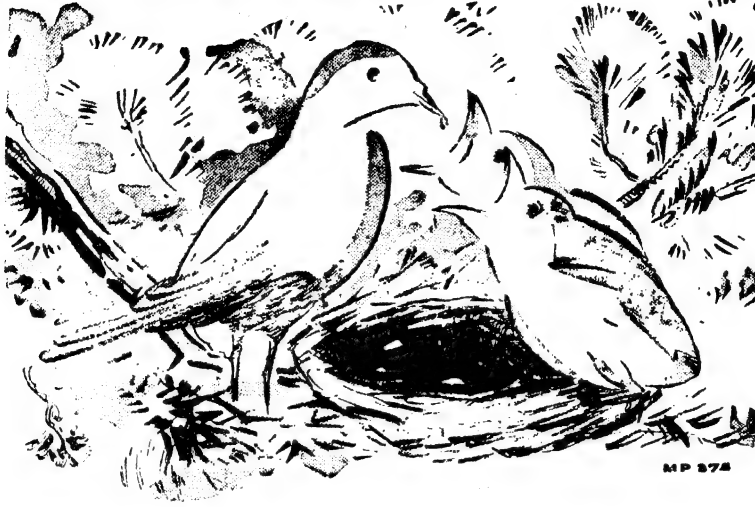
(আমি) পেরোই সন্ধান, জন্মে করিয়া,

লইয়া যাইব তথা।

৩

(আমি) আপনার তরে আপনা সঁপিব,

চাহি না হে প্রতিদান।



Feed them properly

শিল্প ও বাণিজ্য ভারতমাতার দুইটি অসহায় সন্তান। তাদের লালনপালন করে আত্মরক্ষা করতে বলীয়ান করে তুলুন। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখান।

একটু শক্ত সমর্থ হলেই ভারতমাতা এদের পাখীর মতো স্বাধীন ভাবে উড়তে শেখাতে পারেন এবং জীবনের রথ-চক্র চালিয়ে দিতে পারেন পূর্ণ গতিতে। তাদের সাহায্যে তিনি আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন সারা জগতে, কারণ এরাই যে তাঁর শক্তি, —এরাই যে তাঁর সব।



হাজারাদী ব্যাংক ও তার সমস্ত শক্তি খাটিয়ে এবং সৌভিৎস ব্যাংক স্কীম, প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কীম ইত্যাদি দিয়ে ভারতের শিল্প বাণিজ্যরূপী যুগল সন্তানকে শক্তিশালী করে তুলছে পরাধীন ভারতের আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে।

আসুন, সকলে মিলে এদের পরিপূর্ণতার ব্যবস্থা করি।

হাজারাদী ব্যাংক লিঃ

হেড অফিস—৮০, ক্রাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা—বালো, বিহার, আসাম
ও ইউ. পি. এর সর্বত্র।



কালীচরণ সেন,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

৮৮) জোহাতে মজিরা, জোহাতে ভবিষ্যৎ,
জুড়াব আমার প্রাণ।

৮৯) বলিবে কেবলি, সুখেই কলম্বা,
সরাসরে মনের বাধ।

৯০) নয়নে বদনে, হৃদয়ে পাড়িয়া,
মিটার মনের সাধ।

৯১) নাহি মিটে ক্ষুধা, বলিবে সে কথা,
ক্ষেত্রে না রাখিবে বকে।

৯২) গলিয়া গলিয়া, যাইব মিশিয়া,
তোমার সাধের সুখে।

এ রূপ যৌবন, এই দেহ মন,
প্রণয় পূরিত প্রাণ।

এস প্রাণবদ্ধ হৃদয়ে ধরিয়া
কর হে বারেক চাপ।

৪

দিসের কাষে, সাজে নানা সাজে,
বিচিত্র মানব মতি।

৯৩) চিনিতে পারিলে, হৃদয় তাহার
দিসের কুটিল গতি।

নিরঞ্জন বকে, প্রাণ একা থাকে,
স্বরূপ দেখিতে পাই।

ওই মিশি হৃদয়ে, আসি ধীরে ধীরে
প্রণয়ী খুঁজিয়া যাই।

মনের মতন, মেলে না যে জন।

অগাসের সবি প্রাণ।

এ রূপ যৌবন এত আকর্ষণ,

তাহে কি ফুলার স্থান।

৯৪) আধ আধ সাধ, পারি না মিটে
খুঁজিয়া বেড়াই ভরা।

ওহে পরিপূর্ণ, লুকায়ে কোথায়,
আইস নিকটে ঘরা।

‘পূর্ণিমা’র ইশানচন্দ্রের অনেকগুলি
গদ্য-পদ্য রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল।
দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহার কয়েকটি গদ্য
রচনার উল্লেখ করিতেছি :-

১। সম্বন্ধ নিগম	১৩০০ সাল
২। কুবুদ্ধি (সমালোচনা)	১৩০০-০১ সাল
৩। শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী	১৩০০ সাল
৪। বাস্করচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩০১ সাল
৫। বোস্বাই ভ্রমণ	১৩০২ সাল
৬। মানব জীবনে কোন দায়িত্ব আছে কি?	১৩০৪ সাল

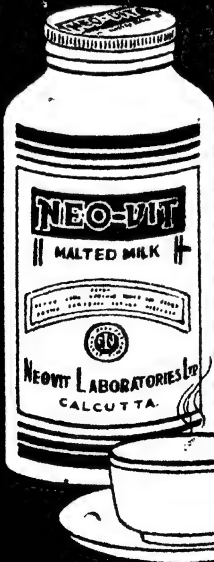
ইহা ছাড়া তাহার লিখিত “সুধাময়ী”
নামে একটি উপন্যাসও ১৩০১, ১৩০২ ও
১৩০৪ সালে আংশিক প্রকাশিত হইয়াছিল।
১৩০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহার মৃত্যুর
পরেও তাহার রচিত অনেকগুলি কবিতা
‘পূর্ণিমা’র মুদ্রিত হয়।

মৃত্যু

ইশানচন্দ্র ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন
তারিখে বিব পান করিয়া আত্মহত্যা করেন। মৃত্যু-
কালে তাহার বয়স ৪২ বৎসর হইয়াছিল। তাহার
মৃত্যুতে হৃৎগত, বাশবোড়ার ‘পূর্ণিমা’
পর এই শোক-সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন :-

“কবিবর হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি
ইশানচন্দ্র ইহজগতে আর নাই। সেই ভীষণ
ভূমিকম্পের রাশিতে ইশান ইহলোক পরিভ্রমণ
করিয়াছেন। সন ১২৬২ সালের ৩রা চৈত্র,
শুক্লাবার, ইশান ভূমিষ্ঠ হন, তাহার বেমানান
বৎসর বয়স হইয়াছিল। ইশানের অকণ্ঠস্বরে
সকলেই দুঃখিত, তাহারই উৎসাহে এবং
উদ্যোগে আমাদের পূর্ণিমা প্রকাশিত হয়, তিনি
সেই অবধি পূর্ণিমার প্রধান সহায় ও পুণ্য-
শোভক ছিলেন। আমরা সকলে তাহার
আকস্মিক বিয়োগে অবসন্ন। তাহার প্রতিষ্ঠিত
এই সংখ্যার পূর্ণিমার দেওয়া হইল।”
‘পূর্ণিমা’, আষাঢ় ১৩০৪, পৃ. ১২৪।

ইশানচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য
বাংলা কাব্য-জগতে যখন হেমচন্দ্র ও
নবীনচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রভাব, ইশান-
চন্দ্র তখনই সাহিত্যিক সমাজে কবি-খ্যাতি
অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে খ্যাতি এক-
দিকে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং অন্য দিকে
রবীন্দ্রনাথের চাপে স্থায়ী হইবার অবকাশ
পায় নাই। নৌভাগ্যের বিষয়, বাংলা-সাহিত্যের



চাই স্বাস্থ্য ও শক্তি

নিও-ভিট

মাল্টেড মিল্ক

শিশু, বৃদ্ধ, রোগী ও প্রসূতির
পক্ষে নির্ভরযোগ্য খাদ্য



নিও-ভিট লেবোরেটরীজ লিঃ, কলিকাতা।

—বাঙলা ভাষায়—

বিশ্বসাহিত্যের প্রেমের প্রেমের গল্প
প্রেম ও প্রিয়

—মূল্য আড়াই টাকা—

লিওনার্ড ফ্রাঙ্কের

কার্ল ম্যান্ড আমা—

১.

প্রস্‌পার মেরিমর

কার্লমেন—

১.

লিও টলস্টয়ের

রেক্সারেকমান—

২১০

ম্যাক্স গোর্কির

ছোট গল্প—

২১০

আইভান টুরগেনিভের

ছোট গল্প—

২১০

ম্যাক্স গোর্কির

ডায়েরি—

২১০

—প্রাপ্তিস্থানঃ—

এ. আর. ব্যানার্জী ম্যান্ড বাদাস

—৫৪/৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—

ইউ. এন. ধর ম্যান্ড সনস লিঃ

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা

সত্য সমাজের পরিবর্তনশীল
রুচির সঙ্গে তাল রেখে
চলতে পারে

আমাদের

শাড়ী—ব্লাউজ

পূজার উপহার

শাড়ী—ব্লাউজ

ছেলেমেয়েদের পোষাক



কমলাভাষ্য লিঃ

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট :: কলিকাতা

ফোন বি বি ৬৪২

আধুনিক রুচি সম্পন্নঃ—

বিভিন্ন প্রকার শয্যাভবোর বিপুল সমাবেশ

— অনন্তচরণ মাল্লিক এণ্ড কোং —

১৬৭/৫নং ধর্মতলা স্ট্রীট (চাদনী চক), কলিকাতা।

ফোন : কাল ১৪০৬

আজ ৬৫ বৎসরের অধিক আপনাদের সেবায় নিযুক্ত

—বিবাহে দেওয়া সৌখীন ও মনোমত—
শয্যাভবোর জন্য আমরাই বিশেষ পরিচিতি

দেবের তিনি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ পেশ
করিয়া গিয়াছেন. সেগুলি হইতেই তাঁহার
প্রতিভা ও কবি-কীর্তি সম্বন্ধে পুনর্বিচার
করা সম্ভব। ঈশানচন্দ্র নিম্নশ্রেণীর কবি ছিলেন
না। যে-কারণে তিনি মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর
জন্মে নিজ হাতে নিজের জীবনের অবসান
করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার যাবতীয় কাব্য-
প্রকাশের মূলে সেই কারণই ছিল; অধিকাংশ
বিবর্তাই, বিশেষ করিয়া 'যোগেশ কাব্য'খানি
একটা অন্তর্গত জ্বালায় জর্জরিত। সক্ষম
কবিতা বসিয়াই সেগুলি পাঠকের মনেও জ্বালা
ধরিয়া দেয়। সেই বেদনা ও জ্বালা পরিমাণে
অধিক বলিয়াই ঈশানচন্দ্রের কবি-প্রতিভা
সম সাধকতা লাভ করে নাই; যাহারা
তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারাও মুগ্ধ হইয়াছেন,
তিনি জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারেন নাই।
বঙ্গীয় - সাহিত্য - পরিষদগ্রন্থাবলীভুক্ত
বঙ্গের কবি ও কাব্য গ্রন্থমালায় ঈশান-
চন্দ্রের কবিতার একটি সংকলন বাহির
হইয়াছে, তাহা হইতেই অনুসন্ধানসমূহ পাঠক
তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইবেন।
আমরা এখানে দুই-একটি কবিতার অংশবিশেষ
উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ক্ষমতার সামান্য নিদর্শন
নিবেদ্য।

সন্তান দর্শনে

১

এই জীবনের ওই প্রথম বিকাশ!
ওই কান্না ওই হাসি, ওই আনন্দের রাশি,
আমিমা মাখান ওই আধ আধ ভাব,
এ জীবনে একদিন হইত প্রকাশ!
শৈশবে সবাই হাস্য, ওই সন্তানের প্রার
এ ভীষণ জীবনের সুন্দর মঞ্জারি!
ভাসে রে কালের তটে আপনা পাসরি!

২

ওই কি জীবন? হায় কতই বিভেদ!
ভাবিলে কালে রে মন, মানবের কি জীবন,
কোথা ফুটে-কোথা টুটে-কতই প্রভেদ!
কি যে হয় ওই মুখ, কি যে হয় ওই বুক,
কোথা থাকে ওই সুখ যৌবন বিকাশে!
কি লয়ে সংসারে পশি কি থাকে বয়সে!

৩

বৃথা ক্ষোভ! এ সংসারে এমনি জীবন!
প্রকৃত সুখের যাহা, স্বপ্ন কিম্বা মোহ তাহা,
সংসারীর সে কামনা দুখের কারণ।
নিকৃষ্ট অবোধ জন, কিম্বা শ্রেষ্ঠ কবিজন

সে কলিত সুখ সুখ করে অন্তঃকরণ!
নহে এ সংসার কিন্তু তাদের কারণ।

৪

সুখশূন্য মরুপ্রায়ে তবে কি সংসার!
জীবন কি কিছু নয়, সুখ কি যন্ত্রণাময়,
এত ক্লেশ এত শ্রম সব কি মিছার?
এই দেহপিণ্ড লয়ে, এ অনন্ত দুখ সয়ে?
পার্থিব জীবন কি রে বিড়ম্বনা সার?
নরভাগ্যে জীবনে কি নাই পুরস্কার?
(বাসন্তী)

একদিন

হৃদয়-মন্দিরে প্রাণ,
দেবীর চরণতলে
ছিল ঘুমাইয়া।
বিজন-মন্দিরে সেই
প্রাণীমাত্র নাহি ছিল
দিতে জাগাইয়া ॥
অতীত পূজার বেলা,
অনশনে ক্লান্ত প্রাণ
ঘুমে অচেতন।
খেলায় পড়েছে ঢাল,
পাখাণে ললট পড়ি
স্বেদ করে ঘন ॥

কাতর বদনখানি
মুদিত নয়ন দুটি
গেছে কিছুরে খুলে।

দুই প্রান্তে অশ্রুজল
ধারা দিয়ে পড়িতেছে
দেবীপদমূলে ॥

দেবীর প্রতিমাখানি
বিরাজিত সিংহাসনে
পাখাণ-মুক্তি।

এক করে সুধাভাণ্ড,
আর করে বরাভয়,
ওঠে করে প্রীতি ॥

সুগোল উন্নত গ্রীবা,
ঈষদ্বাক্ষমে নত
তাঁহে দুঃখজন ॥

পল্লবে আবৃত আশ,
আশ বিকসিত মৃদু
স্নেহে অচেতন ॥

সেই দৃষ্টি বিগলিয়া
প্রাণের অধরে মম
পড়িতেছে ধীরে।

পূর্ণিমার আলো যেন
গিয়াছে মিশিয়া, শব্দক
সরসীর নীরে ॥

অনাবৃত নেত্র-পথে
পাশিয়া সে ভাতি, মম
প্রাণের অন্তরে।

স্বপ্নের চন্দ্র মত
উজলিয়া অন্তঃস্থল,
স্বপ্ন বিতরে ॥

অতীত পূজার বেলা,
তথাপি নীরবে প্রাণ
আজ কি কারণ?

একে তার ক্ষীণ দেহ,
তাঁহে ঘোর ভগ্নসম্মান
সদা নিমগন।

কি জানি কি হ'ল ভাবি,
মন্দিরের ম্যার ঠৌল,
হেরিন্দু গোপনে।

দৌধনু নির্ভর প্রাণ,
ওই ভাবে আছে পড়ি
দেবীর চরণে ॥

অস্থির হইনু আমি,
প্রাণের সে দশা বুকে
সহিল না আর।

'প্রাণ-প্রাণ-প্রাণ' বলি,
বিষম কাতর-স্বরে
করিনু চীৎকার ॥

শিহরি উঠিয়া বাসি
উন্মাদের মত প্রাণ,
চৌদিকে হেরিল।

শিহরি উঠিল দেবী,
পাখাণ-নয়নে তাঁর
স্নেহ মিলাইল ॥ (চিন্তা)

স্নেহ

দেবি!
আবৃত শরীরে তুমি চক্ষুর কণিকা জ্বলে
বিরাজ আমার।

স্পর্শ শক্তি রূপে তুমি এই শরীরের ককে
সতত প্রচার ॥

শব্দ শক্তিরূপে তুমি শ্রবণের মূলে মম
কর অবস্থান।

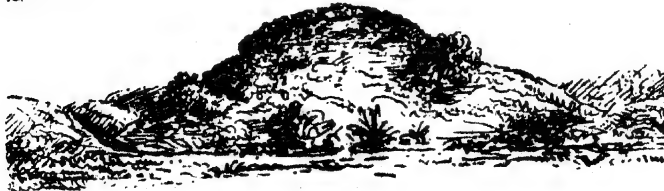
জ্ঞানরূপে চিত্তে মম ঢালিয়া অন্ত ধারা
তুমি বিদ্যমান ॥

দর্পণ বিহীনে যথা আপন আকৃতি কিবা,
নহে অনুমান।

তোমা বিনা সেই রূপ প্রাণের ব্রহ্মাণ্ড মম
নহে বিদ্যমান ॥

তুমি মম-আমি তব, যেই তুমি, সেই আমি,
নহি ভিন্নাকার।

তব অপার্থিব রূপে আমরা তপ্ত প্রাণে
করি নমস্কার ॥ (চিন্তা)



‘মহাকালী আশ্রম’ হাতীবগান টোল



হেড অফিস—৮২ (বি), গ্রে স্ট্রীট।

ব্রাঞ্চ—৮০১১২ (বি), গ্রে স্ট্রীট।

শাখা অফিস—পিওবি(কে)সেন্ট্রাল এভিনিউ—গ্রে স্ট্রীট মোড়

পি-এম বাকচির পঞ্জিকার প্রধানতম গণক এবং ভারতবর্ষের তামিল প্রকৃতি বহুবিধ পঞ্জিকা প্রণেতা ৫০ বর্ষের অভিজ্ঞ ও তত্ত্বশাস্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত তান্ত্রিক পণ্ডিত

শ্রীচন্দ্রচরণ স্মৃতি-জ্যোতির্ভূষণ।

আপনি যে কোন স্থানেরই লোক হউন আপনি বা আপনার নিকট বা দূর আত্মীয় পণ্ডিত মহাশয়ের পুণ্যমুখ্য। স্মৃতিভিত্তিক পণ্যমণ্ডিত পণ্ডিত শ্রীশ্রীকালীমন্দিরে পুণ্যচরণ সিম্ব প্রত্যেক কবচ সদা ফলপ্রসূ, কবচগুলি চরাচরে ও মন্ডপ্রভাবে জীবন্তের ন্যায় কার্য করে। কবচ ধারণ করিবার অভিনব স্মৃতি ও সাহস আসিবে। প্রত্যেক কবচ বিশ্বাসের সহিত ধারণ করিতে হয়, বিশ্বাস না থাকিলেও চরা ও মন্ডপ্রভাবে নিশ্চয় অতীষ্ট সিদ্ধি হইবে। পণ্ডিত মহাশয়ের পুণ্যতন পুণ্যগণ ইংরেজ ও মুসলমান রাজত্বের পূর্বে হইতে অদ্যাবধি ভারতবর্ষে সিম্ব পুণ্য বলিয়া খ্যাত। এই কবচগুলি গ্রহণ সময়ে শনিবার অমাবসায় চাহসপল মহানিশায় স্নাতবস্ত্রে হোমালন্ত একবর্ণা সর্বদা পাতা দ্বারা কুম্ভম গোয়ালনী মিশ্রিত মসিমোহে রত্নদণ্ডী লেখনী দ্বারা হোমপিন-শিখালোকে প্রণব বীজ ও মন্ত্রাদি লিখিত হয়।

বিশেষ ব্রহ্মাণ্ড—এলোপ্যাথিক কবিরাজী প্রকৃতি ষষ্ঠ সেবনে ফল না পাইলে এই কবচ ধারণে নিশ্চয় রোগমুক্ত হইবেন।

কবচ ধারণকারীর নাম, গোর এবং উদ্দেশ্য সহ পত্র লিখিবেন। এই মহাশক্তিসম্পন্ন কবচ ধারণে ফল না পাইলে মূল্য ফেরৎ পাইবেন।



শ্রীশ্রীঅনুব্রহ্ম কবচ

সর্ব কার্য সিদ্ধি—চাকুরী প্রাপ্তি, কর্মোন্নতি হয়, মূল্য—২০। মহানবগ্রহ কবচ—২।

সূর্য কবচ

ধারণে মানব সুস্থকর, হাটের দোষ, প্রমেহ, ভগন্দর, আমাশয় হৃৎকম্প প্রকৃতি দুরোগ্যে ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। মূল্য—৪০।

চন্দ্র কবচ

ধারণে যক্ষ্মা, উদরী, সর্দি, হাঁপান, গজমাল্য, শ্লেশ্মা ঘটিত পীড়া আরোগ্য হয়। মূল্য—৪০।

মঙ্গল কবচ

ধারণে চর্মরোগ, পিত্তরোগ, রক্তপ্রাব, রক্তামাশয়, অশ, শ্বেত-কুষ্ঠ, পথিত কুষ্ঠ ভাল হয়। মূল্য—৪০।

নূর কবচ

লাগব্য বর্ষ হয়। মূল্য—৪০।

ব্রহ্মপতি কবচ

ধারণে বায়ু, রোগ, রক্তপ্রেশার, শিরঃ-পীড়া, মূত্র ভাল হয়। মূল্য—৪০।

শুক্র কবচ

ধারণে স্ত্রীলোকের নাড়ীর দোষ গর্ভাশয়ের ধাতবীয় পীড়া অকালে মৃত বংশ হইয়া পেটে বলের মত হওয়া বিনা অস্ত্রোপচারে সুস্থ হয়। মূল্য—৪০।

শনি কবচ

ধারণে কার্যসিদ্ধি, ব্যবসায় উন্নতি। মূল্য—৪০।

ব্রাহ্ম কবচ

ধারণে বাতব্যাধি, পক্ষাঘাত, শরীর কাম্পন, উন্মাদ (পাগল) রোগ মুক্ত হয়।

মহাযজ্ঞাঙ্কুর কবচ

ধারণে ব্যাধি-গ্রস্ত, চিরমৃত, ব্যক্তি আরোগ্য এবং যে কোন রিপ্ট ফাঁড়া কাটিয়া দীর্ঘায়ুলাভ করিবেন। মূল্য—১০।

বনদা কবচ

ধারণে সোভাগ্য বর্ষ ও কল-মুখি হয়। মূল্য—১০।

লং শরক্ষা কবচ

এই কবচ চিরমুখ্য ৪০ বর্ষ বাসেও উত্তম দীর্ঘায়ু পত্র লাভ করিবেন। মূল্য—৫।

বগলানুগী কবচ

ধারণে যে অভিলাষ করিবেন অচিরে তাহা লাভ করিবেন। প্রত্যেক ও পরোক্ষভাবে শত্রু নষ্ট হইবে, মোক্ষমায় জয় ও চাকুরী পুনঃ প্রাপ্তি, ব্যবসায় উন্নতি হইবে। মূল্য—১০।

স্বতন্ত্র সা কবচ

শ্রীলোকের পুণ্য পুণ্য সন্তান হয় ৫।৬।৭।৮।৯ মাসগর্ভে অভ্যুদে এবং ৫ বর্ষ মধ্যে পুণ্য পুণ্য সন্তান নষ্ট হয়, এই কবচ ধারণে নিশ্চয় দীর্ঘায়ু সন্তান হইবে। মূল্য—৭।

সরস্বতী কবচ

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষার পাশ এবং

লশাকরণ কবচ

চিরশয়, পর্যন্ত বশীভূত হয়, সর্ব কর্মে প্রমত্ত হয়—মূল্য—৫। বৃহৎ বশীকরণ কবচ—৫।

ব্রাহ্ম কবচ

প্রত্যেক গর্ভবতীর ধারণ কর্তব্য। ভৌতিক দোষ নষ্ট হয়, মূল্য—১০।

বাস্তু বিচার

বাস্তু হতে ২৪ হাত নিম্নে মাটি এক ছটক পাঠাইলে ভূগর্ভে ধনরত্ন ও নিম্নোক্ত ভাষ্করগণ নিজে ও স্ত্রী পুত্রকে কবচ ধারণ করাইয়া রোগ মুক্ত হইয়াছেন—

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর একেমুন্নাথ ঘোষ, এম এস সি এম ডি এস সি এফ জেড এস এফ আর সি এস।

ডাঃ জে এন মৈত্র, এম ডি প্রফেসর ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতালের প্যাথলজিকেল ডিপার্টমেন্ট।

সিডিল সায়েন্স রিসার্চমন্ডা কুন্ডু, সিডিল, বীরভূম।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র, এম এ এম সি।

স্ট্রাট উপরোক্ত ঠিকনার অথবা শ্রীচন্দ্রচরণ স্মৃতি-জ্যোতির্ভূষণের দ্বারা দিবেন।

সহকারী পণ্ডিত ও আশ্রমের কর্মচারী শ্রীমতিশ্রী জ্যোতির্ভূষণ, শ্রীবিজুতীকৃষ্ণ স্মৃতি জ্যোতির্ভূষণ ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শাস্ত্রী।



বিপদ এর কাকে বলে!

দেখানো বাতিক তাহার কামিনকালেও ছিল না
—যাহাকে বলে “দশচক্র।”

শিরিষ সিকদার নামে যে ছোকরা কাস্ ডিপার্ট-মেন্টে নতুন ভর্তি হইয়াছে—কথায় কথায় হঠাৎ জানা গেল ছোকরা নাকি পামিস্ট। আর যায় কোথা? ঘরশুদ্ধ লোক তাহাকে ছাঁকিয়া ধরে আর কি। টিফিনে অনেকের খাওয়াই হয় নাই আজ।

জিমিসটা এমন মজার—এক মৃহুতে পয়ষড়ি টাকা ওজনের মোহাং কেরাণীটি একেবারে ত্রিকা-লজ্জ মহাপদুপতির পর্যায়ভুক্ত

হইয়া পড়িল। ইহার জ্ঞানচক্র সাহায্যে সহজেই একবার আপন আপন অ-দৃষ্টের উপর চিকিত্ত দৃষ্টিপাত করিয়া লইতে চায়।

পশুপতি অবশ্য দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে-ছিল—এই সব বোগাস ব্যাপারে কোনকালেই তাহার অস্পা নাই, কিন্তু মটি করিল শিরিষ নিজে। ‘খপ’ করিয়া পশুপতির হাতবান্য টানিয়া লইয়া কহিল—দেখি গুস্ত মশাই আপনার লাকটা? এখন তো আপনার পোয়াবারো, এই তো সোদিন কুড়িটা টাকা ইনকুমেণ্ট হয়ে গেল।

হাসিখসি—মানে—বাইরে থেকে দেখতে যাকে বলে প্রকৃত স্বভাবা বোনো স্ত্রীলোককে চেনেন?

—কেন বলুন তো? সাদিশ্ব স্বরে প্রতি-প্রশ্ন করে পশুপতি।

বর্ণনা শুনিয়া চট করিয়া অনিলার কথাই মনে পড়িয়া যায়, তবে কি তাহারই কোনো বিপদ? ইদানীং তাহার শরীরটাও যেন তেমনি ভাল নাই। এই তো কবে একদিন যেন মাথা ধরিয়াছে বলিয়া রত্রে ভাতই খাইল না। যদিও পশুপতির এ সব হাত দেখা-দেখিতে বিশ্বাস নাই—তবু খামোকা অনিলার কথাই বা বলিল কেন শিরিষ?

শিরিষ কিন্তু বলিল অন্য কথা। বলিল—এই ধরনের কোনো স্ত্রীলোক আপনার ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে।

—ক্ষতি?

—ক্ষতি বা প্রতারণা যাই বলুন। মনে আর কি পরম আশ্রয় সেজে তলে তলে ধীরে ধীরে অনিদ্রা চিন্তা করছে। এই সবই তো বিপদ কি না।

শত্রু যদি বন্ধুর ছদ্মবেশে অনিদ্রা চিন্তা করতে থাকে—তাকে এড়ানো সহজ নয়। বাই হোক আপনার পরিচিত যদি কেউ এ রকম থাকে—থাকে কেন আছেই তার থেকে সাবধানে থাকবেন।

পশুপতি যেন সকল সময়ে পড়িয়াছে—আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বন্ধব পরিচিত জন-সমুদ্রের ভিতর এলোপাথাড়ি হাবুডুদু খাইয়াও কাহাকেও খুঁজিয়া মেলে না যে?

ছোট খুঁড়ি আছেন যাতে লম্বা ফর্সা—কিন্তু জীবনে কি তাহাকে হাসিতে দেখিয়াছে পশুপতি? রাজা মাসী ফর্সা বটে কিন্তু বামনের পরবর্তী স্টেজ মাত্র। মাসী পিসি খুঁড়ি জোঁঠ, দাঁদি বোঁদি কহাশেও ঠিক ধরা যায় না। কহারও সহিত কালে ভদ্রে দেখা হয় কহারও সহিত হয় না। তবে? অনিলা তাহার অনিদ্রা চিন্তা করিতেছে? অনিলা তাহাকে প্রতারণা করিবে? অসম্ভব! ভুল। অনেক কন্টে গলা ভিজাইয়া বলে—কি রকম অনিদ্রা?

—ডেফিনিটলি কি করে বলি এত অল্প সময়ের মধ্যে? শারীরিক মানসিক আর্থিক যে কোনো—মানে কান্দ খুঁজছে সে।

পশুপতি বাড়ি ফিরিতেছে। রাজাই ফেরে—পাচটা প’রতাল্লিশে তাহার ছ’টি হয়, তিন তলার অফিস, সিঁড়ি ভাঙতেই লাগে পাঁচ মিনিট। ঘাম মুছিয়া ভিড় চৌলতে চৌলতে ট্রাম লাইনটুকু অসিতেও প্রায় মিনিট দশেক কাটিয়া যায়, অবশেষে জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে কোন প্রকারে নিজেকে চৌলিয়া দিয়া ট্রামের ভিতর মাত্র একখনি পা রাখিবার মত স্থান সংগ্রহ করা। বাস্ আর কিছুর করিবার নাই। পাঁচ সাতখানা ট্রাম ছাড়িয়া দিয়াও মোটের মাথায় সাতটর মধ্যে সে নিজের রাজহাে আসিয়া পৌঁছাইতে পারে।

স্বাধীন সমাজ। হাসানখী স্ত্রী, বাধা জেলেমেয়ে, পশুপতি নিজে ক্ষুদ্রতাবাজ লোক—সুখের সংসার পশুপতির। কিন্তু আজ আর পশুপতির মনে সুখ নাই। সাতটর মধ্যে বাড়ি ফিরিবার তাগদাও নাই। সন্ধ্যা আউটের রাস্তার মত মুখ করিয়া—ঝড় ঝোঝাই গরুর গাড়ির গতিতত্ত্বগীতে এসপ্লানেড হইতে হাটা মারিয়া বাড়ি ফিরিতেছে।

লড়াই করিয়া ইণ্ডি কয়েক জায়গা দখলের পশুপতি আজ তাহার নাই। আজ তাহার মন খারাপ।

অবশ্য সব কর্মের মত—পশুপতির মন খারাপেরও একটা কারণ আছে, কারণটা এই যে, পশুপতি আজ হাত দেখাইয়াছে। হাত

শ্রী আত্মপূর্ণা দেবী

কিন্তু হাত দেখার পর যাহা বলিল, সেটা ঠিক সৌভাগ্যের পরিচয় নয়। বার বার উল্টাইয়া পাণ্টাইয়া দেখিয়া সন্নিবন্ধস্বরে কহিল—আইতো—মুস্কিল করলে দেখছি—

খুব ভাঁওতা দিচ্ছেন বে? মুস্কিল জাবার কি মশাই?

—মুস্কিল এই—একটা পাগলহের দৃষ্টি এসে পড়ছে—শগণিরই কোনো বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে—আচ্ছা, লম্বা ফর্সা বেশ

চন্দ্রনাথ দাঁ

প্রোপ্রাইটার।

১। বেঙ্গল টোব্যাকো ম্যানুফ্যাক্টরী
৯নং উত্তর চৌধুরী রোড, উল্টাডাঙ্গা,
কলিকাতা।

২। ক্যালকাটা মোলাসেস্
সাপ্লাই কোং
৬৭।৪৭, প্রিন্স বাস্ক রোড,
কলিকাতা।

৩। সুভদ্রাগনপাথ সীতারাম
২২নং রাজার চক, বড়বাজার,
কলিকাতা।

সকল প্রকার মিঠাকড়া ও
সুগন্ধি মাখা তামাক, চিটা-
গুড়, আলফা তরা পাওয়া যায়।

৪। চন্দ্রনাথ বিশ্বনাথ
৩১নং জাহঙ্গির লেন, কলিকাতা।
প্লাস, এনামেল ও পোরসিলেন ওয়ার
বিক্রেতা।

টেক্সট-সেন্ট্রাল গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ
লিঃ ও হিন্দুস্থান পটারি
ফোন : বি. বি. ৫২৬১ ও বি. বি. ১৯৬৩
টেলিগ্রাম :—বেনটোমাকো

হাঁওয়া সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড



৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

রক্ত ! রক্ত !!

চলাচলের উপর নজর রাখুন।

শরীরের রক্ত দূষিত হইলে যে কোনও
প্রকার রোগের আক্রমণে অচল হইয়া
পড়িবেন। এই অনিবার্য কলঙ্ক হইতে মুক্তি
পাইতে হইলে আনুবেদিশাস্ত্রী কবিবাজ
আর, এন. চক্রবর্তী

রক্ত সঞ্জীবনী

আনুবেদিশাস্ত্রী বহুদ্রব্য ভেষজ ও তেজস্কর
রাসায়নিক সংমিশ্রণে বিজ্ঞানসম্মত
প্রণালীতে প্রস্তুত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন
রক্তপরিশোধক ভ্রোষ্ট টনিক ব্যবহারে
দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়।

রক্তদূষিতজনিত সব প্রকার ব্যাধি—বাত,
চর্মরোগ, চুলকানি, রক্তশূন্যতা, রক্তের
চাপ বৃদ্ধি এবং পাকশয় ও অন্ত্রপ্রদেশের
উপর ইহার প্রিয়া আশ্চর্যজনক।

শ্রী-পুষ্কর সকলেই সকল অবস্থাতে ব্যবহার
করিতে পারিবেন। মূল্য—২, মাঃ ৫/০।

হরিশ্রর আনুবেদ ঔষধালয়

২৪, দেবেশ্বর ঘোষ রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা। ফোন : সাউথ ৩০৮

৫৩ঃ রইমার এন্ড কোং ও এম্. ভট্টাচার্য।

আনন্দ-উৎসবে অপরিহার্য

সকল ঋতুতে সম্মান হৃদয় ও স্নিগ্ধ

স্নো-ভিউ

দার্ডিউলিন্স



সোল ডিস্ট্রিবিউটার্স :

কমলালয় ষ্টোর্স লিঃ

ধর্মতলা : : : কলিকাতা

কিন্তী প্রশ্ন করিবার সাহস হয় নাই পশুপতির। শব্দ সেই থেকে ভাবনা ঘুরে করিয়াছে। অনিলা—হাঁ অনিলা ভিন্ন আর কে? তাহার ক্ষতি করিবার ফাঁদ বুজিতেছে?

কি করিবে? স্ত্রীরা স্বামীর কী ক্ষতি করিতে পারে? কোন ধরনের অনিষ্ট? কিরূপ প্রভাষণ? সংসারের টাকা লইয়া বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিবে? কিন্তু কেন? তাহাদের অবস্থা যে পশুপতির চাইতে দশ গুণ ভালো। তবে? পশুপতিক লোকইয়া—আর কাহাকেও? ছিঃ এই আট বছর ঘর করার পর? অসম্ভব কি? হয় তো বরাবরই—পশুপতি মর্দু, সন্দরী স্ত্রীর প্রেমে গদ গদ।

যৌক কেন? এটা তো ভালো নয়। সার্জ-গোজটাও একটু যেন বেশী বেশী না? এই যে পশুপতির দিদিরা—কখনো শাড়ির সঙ্গে এক-খানা সেমিজ ব্যবহার করেন কি না সন্দেহ। আর অনিলা? ফ্লাউস পেটিকোট সেমিজ বিডস। শাড়িরই বা বাহার কত। সেনা সাবানেও মাসের মাস খরচ হয় না।

এই সব খরচ জোগায় পশুপতি আর অনিলা হয়তো তাহার অনপস্থিতিতে—

অশ্বকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল—হঠাৎ চমক ভাঙিল। নিজের দরজা ছাড়িয়া বিপিনবাবুর দরজায় আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু বাড়ি ঢুকিয়া লাভই বা কি?

—সুবিধেই করে দিলাম—বলিয়া গম্ভীর ভাবে উপরে উঠিয়া যায় পশুপতি।

কথার গভীর তাৎপর্য হৃদয়গম করিবার কথা নয়—অনিলা সরল মনে উপরে উঠিয়া আসিয়া বলে—হ্যাঁ গা দেরি হল কেন বললে না? সেই থেকে ভেবে মরিছি—

আর থাক যথেষ্ট হয়েছে—খুব দরদ দেখিয়েছে। তবু যদি না—বলিয়া পশুপতি গজ্ গজ্ করিতে করিতে সাবান তোললে লইয়া স্নানের ঘরে চলিয়া গেল।

অনিলা অন্যাক। ব্যাপার কি লোকটার? চাকরি গিয়াছে না কি? না সাহেবের বাড়ি থাইয়া আসিয়াছে? থাক মন ভালো হইলে আপনাই কথা বলিবে, বেশী প্রশ্নে কাজ নাই।

পশুপতি ভাবে—দেখেছে অগ্রাহ্য? অম্লান বদনে আপনার কাজ করা হচ্ছে। স্বামী গুরুজন—রাগ দেখিয়া ভয়ের লেশ নাই। অথচ কথা না কহিয়া পশুপতির পেট ফাঁপিতেছে। কাজেই দেওয়ানকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে হয়—“ভেবে মরিছলাম—” ভাবনার বহর কত! আন্তর চোটে মোড়ের মাথা থেকে তো কাপ পাতা দায় হয়ে ওঠে। বিপিনের শ্যালার দিন রাত্তির এখানে আসবার কি দরকার শুনি?

—ও আবার কি? দিদির ডেলে মন্টু না? চিনতে পারলে না?

—মন্টু? দিঙ্গী থেকে উড়ে এল হঠাৎ?

উড়ে আসবে কেন রৈলে চড়েই এসেছে। দিদির জামাইবাবুকে দিঙ্গীতে নিয়ে যাবে বলে চারদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। তাই বলে দিলাম—কাল সকলে এখানে থেকে খাওয়া দাওয়া করে যাবে।

পশুপতি ঈষৎ সন্দিশ্ব সুরে বলে—কই আগে তো আসবার কথা শুনিনি?

—তবে আমি মিছে কথা বলেছি। মরণ আর কি! কুসংগীর সঙ্গে জটেশ নেশা ভাঙ করে এলে না কি? বলিয়া বিরক্ত ভরে উঠিয়া যায় অনিলা।

পশুপতির গা জোল হইয়া আসে। এই যো—সন্দেশের আর অবকাশ কোথায়? শাচ্ছন্দে তাহার মরণ টাঁকিয়া গেল অনিলা? কই এত বছর বিবাহ হইয়াছে কোনদিন অনিহার মুখে এ সব কথা শোনা গিয়াছে? ভাল মানুষ্য করিয়া থাকে—আজ ধরা পড়িয়া বেপারোয়া হইয়া উঠিয়াছে। হ্যাঁ, মন্টু না ঘন্টা, নিখাৎ সেই বিপিনের শ্যালার—হয়তো দিনেমা থাইবার ব্যবস্থা করিয়া গেল! তোর ‘পাশ’ আছে তোর গোষ্ঠীবর্গকে লইয়া না না বাপু? পরের দোয়ের জন্য এত মাথা বাথা কিবেব? আচ্ছা খুকীটাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা! কবিরসেই তো সন্দেহ মেটে।

ইহারই কিছুক্ষণ পরে—অনিলা পশুপতির জন্য গরম লুচি ভাজিতেছে। খুকী আসিয়া প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ মা, বিকেল বেলা মন্টু এসেছিল না? বাবা বলে কি, ও বাড়ির শ্যামল মামা—আমাকে বললে—‘মিথোবাদী’



.....বিপিনের শ্যালার দিনরাত্তির

আচ্ছা এ ধরনের স্ত্রীরা তো স্বামীকে বিব খাওয়াইতেও পচাচপদ হয় না? কতই তো দৃষ্টান্ত আছে।

দূরে ছাই ও সব হাত দেখা ফেকা স’ বাজে, কিছু নয়। কিন্তু নয়ই বা কেন? সকলের বিষয়ই তো ঠিক ঠিক বলিয়াছে ছেকরা।

অনিলায় ব্যবহারটাও সব সময়ই কিছু আর পতিততার মত নয়।

এই তো সৌন্দ পশুপতিক না বলিয়া—বিপিন বাবুর শ্যালার সঙ্গে সিনেমায় গেল—অবশ্য বিপিনের স্ত্রীও সঙ্গে ছিল। কিন্তু থাইবার দরকারটাই বা কি? অত সিনেমায়

এখানে আসবার কি দরকার শুনি?

গৃহ তো তাহার সম্পর্ক গৃহের সঙ্গে তুলনীয়। তবু বাড়ি ভিন্ন যখন পথ নাই—ইতস্ততঃ করিতেছে বড়া নাড়িবে কিনা, দরজা আপনাই খুলিয়া গেল। কে একজন বাহির হইতেছে—অশ্বকারে ভালো ঠাইর হয় না।

পশুপতি সন্দিশ্বভাবে সরিয়া দাঁড়াইল—ভিতর হইতে অনিলায় গলা—কথা থাকলো

কিন্তু? ঠিক তো? জ্বলে যাবে না?

এবং কপাটটা ভেজাইবার উপক্রম করিতে না করিতে পশুপতি নাটকীয় ভঙ্গিতে সশব্দ প্রবেশে প্রথমত খাইয়া বলে—তুমি? কখন এসে? এত দেরি করলে যে?

ফোন :
বি. বি. ৩৮২০

বাংলার ভবিষ্যৎ জাতির
স্বাস্থ্যের দৃঢ় ভিত্তি

বিধনাত্মক স্বত

— জনস্বাস্থ্যকর —

পঞ্চানন আশ
এও কোং

২১ নং, রামকৃষ্ণপুর রাস্তা, লেন

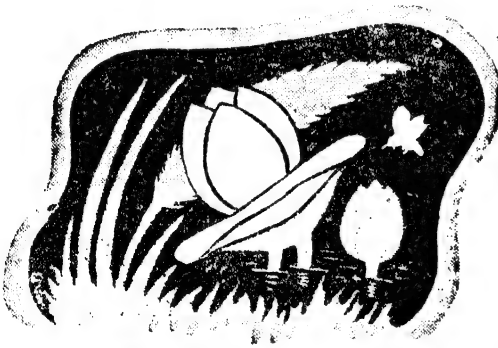
বজ্রবাজার — চিনিপটী

— কলিকাতা —

বীরভোগ্য। বসুন্ধরা।



লিফ্টার এটি সেপটিক
কলিকাতা



শারদীয় অভিনন্দন!

দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন উহার কিয়দংশ সাহায্য করিয়া আমরা আজ জাতীয় কর্তব্য পালনে সক্ষম হইয়াছি। আমাদের এই শুভপ্রচেষ্টায় যাহাদের পূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্য পাইতেছি তাহারা আমাদের শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

একটি প্রগতিশীল নির্ভরযোগ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

হেড অফিস : ৩১, ম্যাগো লেন, কলিকাতা। ফোন : ক্যাল ২৬২২

নয়ান"—এমন কান মলে দিয়েছে—উঃ জ্বালা করছে।

অনিলা কিছুক্ষণ মেয়েরই দিকে সাধু ভাষা যাহাকে 'রোষ কষায়িত নেত্র' বলে সেই দৃষ্টিতে চাইয়া কহিল—বলেছে এই কথা? করেছে তোকে? বটে? রোসো।

পশুপতি ছাদে বেড়াইতেছে—মাথার রঙটা কেমন চড়িয়া গাছে। মেয়েটাকে না মারিলেই হইত—হাদি বলিয়া দেয়? অনিলা? হাতে নাতে ধরা পড়িয়া যদি ভয়ংকর কিছু প্রতিহিংসা লইতে চায়? অনিলার হাতেই তো পশুপতির 'মরণ কাঠি জীবন কাঠি'—আচ্ছা তাই কি সম্ভব? পশুপতির কি মাথা খারাপ হইয়াছে? দিবা লুচি ভাজার গন্ধ আসিতেছে—পেটের মধ্যে তাগাদাও আসিতেছে দিবা—সকালেই না অনিলা বলিয়াছিল আজ মাংস রাঁধবে? লুচি আর মাংস?

অজ্ঞতসরে পশুপতি রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়? কিন্তু ও কি? ভগবানই যে পশুপতিকে পাগল করিবার ভার লইয়াছেন—অনিলা পশুপতির দৃষ্টির বাটিতে কি মিশাইতেছে? সাদা সাদা গুড়া? হায় ঈশ্বর!

কিন্ধা ধনা ঈশ্বর! এই তো পশুপতির জীবন লীলা শেষ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু উঃ নারী জাতিকে কি বিধাতা এমন করিয়া গড়িয়াছেন? অমতে গরল—মিছরি ছুরি? ছেলেবেলায় পড়া গিরিশ ঘোষের নাটকের ভাষা পশুপতির মনের মধ্যে 'কিল্‌বিল্‌' করিয়া ওঠে।

বজ্রনির্ঘোষে ভয়ানক একটা কিছ্র বলিতে ইচ্ছা করিলেও গলার স্বর সহজে বাহির হয় না, কণ্ঠজল সব শুকাইয়া গিয়াছে যেন। অনেক কষ্টে যাহা বাহির হয় তাহা এই—দৃষে কি মেশানো হচ্ছে?

অনিলা চাকিতে পিছন পানে চাইয়া মিশ্রির গড়ার শিশিটা ঠুকিয়া মাটিতে বসাইয়া কহিল—বিষ।

বলা বহুলা দৃষে না মেশাক উজ্জ বস্তুটি কণ্ঠস্বরে মিশাইতে কাপণ্য করে নাই।

—হুঁ।

ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যাইতেছে। পশুপতি কড়িরগার দিকে দৃষ্টি মেলিয়া বিছানায় পড়িয়া। ঘুম আসে নাই—আসিবার কথাও নয়—পেট রীতিমত বন্ধ সরু করিয়াছে।

অথচ অনিলা মূখের কথাটি মাত্র না শোইয়া নিজে খাইয়া দাইয়া পশের ঘরে মেয়েছেলেদের কাছে শুইয়া পড়িল।

বিছানায় পড়িয়া থাকিলেও আন্দাজী বোকা গেল নিবারণ খাওয়া সারিয়া রান্নাঘর ধোওয়া সরু করিয়াছে।

পেটের আগ্নির প্রকাপে মনের আগুন ঈষৎ যেন কমিয়া আসিতেছিল—হতাশার শেষ সীমায় আসিয়া স্বিগ্ধ বনে জ্বলিয়া উঠিল। অজ্ঞ পশুপতি কেন সত্য সত্য স্বামীর উপবাসের ব্যস্ততা করিয়া অক্লেশে ধমায়? অথচ এই বিষময় সর্প লইয়া পশুপতি নিঃশঙ্কচিত্তে

এতকাল কাটাওয়া আসিল?

যাক নিদ্দা সর্ব সন্তাপহারিণী, এক সময় দেখা দিবেনই।

—হয়তো দেয়ালের কাছে, পিতলের ঢাকা চাপা দেওয়া অনিলার পরিপাটি হাতের গুদাইয়া রাখা আহাৰ্য্য বস্তুগুলো চোখে পড়িলে ইতিহাস অনাদ্য হইত। কিন্তু রঙিন শেড দেওয়া আলোর ক্যাপে ঘরের মধ্যস্থানটা ছাড়া সহজে কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না।

সকালে ঘুম ভাঙতেই পশুপতির কানে গেল অনিলা নিবারণকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিতেছে—বটে সব পড়ে আছে? হাত দেওয়া হয়নি? আচ্ছা। যা জিগেস করে আর বাড়ির ভাত রুচবে—না বাজারের খাবার এনে সেবা হবে?

নিবারণকে অবশ্য প্রশ্ন করিতে হইল না—আমার জন্যে কাউকে কিছু করতে হবে না—বলিয়া সদা নিদ্রোখিত পশুপতি চটিটা পায়ে গলিইয়া বাহির হইয়া গেল।

পড়িবা তো পড় সামনেই বিপিনের শ্যাল। শ্যামল।

—এই যে পশুপতিবাবু, ভালই হল, অনিলাদিকে বলে দেবেন—দিদি বলেছেন—

হঠাৎ পশুপতি মারমুখ হইয়া দাঁত খিঁচাইয়া ভাঙচাইয়া ওঠে—অনিলাদিকে বলে যেনে' ভারী আমার সাতকালের দিদি পেয়েছেন—চম্বশ ঘণ্টা আমার বাড়িতে তোমার কি দরকার হ্যাঁ ছোকরা? যাও যাও—

শ্যামল অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ ত কাইয়া চলিয়া গেল, বোধ করি ভাবিল পশুপতি হঠাৎ গাঁজা ধরিয়াছে। সে দিদির বাড়ি থাকিয়া এম এস-সি পড়ে, বরাবর আসা যাওয়া আছে—ভাল ছেলে—পশুপতিও তাহাকে যথেষ্ট ভাল বাসে—হঠাৎ এ কি?

অসম্মত অতুচ্ছ পশুপতিকে দেখিয়া অফিসের অনেকেই বিস্মিত হইয়া কুশল প্রশ্ন করিল। পশুপতি কহাকেও একটা নাজে জবাব দিল; কহাকেও দিল না। শিরিষ সিকদারকে আর একবার নিরলয় লইয়া বসিতে হইবে। ধর—অনিলাকে বশে আনিতে কোনো রকম ধারণ বা কবচ টবচ—কত কি তো ছই পাশ থাকে।

টিফিনের সময়টা আসিলে হয়।

কিন্তু পশুপতির আজ নিতান্তই অদৃষ্ট খারাপ, উঠি উঠি করিতেছে—উপরওয়ালার তলব আসিল। না আসিবে কেন তাহাকে যে এখন শনিতে ঘিরিয়াছে। শিরিষ সিকদারকে নিরলয় পাওয়ার আশা ঘটিল।

টিফিন রুমে আসিবার অবসর মিলিতে এবিধে আশা ঘোরলো হইয়া উঠিয়ছে। কিন্তু পশুপতির নাম লইয়া হাস-হাস হইতেছে মানে?

শিরিষ সিকদার—ইয়ার ছোকরাটা বলে কি?—দেখছেন আজ পশুপতিবাবুর মুখ-খানি? 'আষাঢ়া প্রথম দিবস' একেবারে। যাকে বলে প্রীতমুখ-মুখ। খুব গ্রাফ দিয়ে দিরাছি কাল। আপনার মধ্যে ওনার দাঁড়ি

বর্ণনা শুনে দিলাম ঠুকে এক লম্বা—আহা মুখ শুনিয়ে আসিস। উনি আবার সেদিন বলছিলেন—'আমি মশাই কারুর ভাওতার ভুল না'—সেই যে সেদিন ইনসপেক্টর সেই ডব্লুকে এসেছিলেন? এদিকে তো এক কথায়—

অমূল্য বোস কহিল—আরে মশাই আপনি একেবারে যে মোক্ষম কথা বলে বসলেন—

—নির্ঘাত গিমির সঙ্গে কৌদল হয়েছি।

—তা' একটু হওয়া ভালো, প্রেম গাড় হয়। যখন তখন গিমির বড়াই—আর কি কথার এমন ভাব দেখাতে চান—ওনারে এই বয়সেও যে রকম নিবিড় প্রেম, এমন আর একালের নব দম্পতির মধ্যেও নেই।

—আজ তো কই টিফিন করতে এলো না ডব্লুকে?

—বাড়ি থেকে ভাতও খেয়ে আসিনি বোধ হয়। যাক গে মশাই রহস্যটা ভেঙে দেবেন—একদিনেই রোগা হয়ে গেছে ডব্লুকে।

পশুপতি স্তম্ভিত। মাটিতে শিকড় গাড়িয়া গেছে তাহার, শিরিষ সিকদারের উপর রাগ করিবার মত জোরালো অবস্থাও নাই মনের।

শুধু—অনিলাকে কি বলিয়া শান্ত করা যাইবে—শ্যামলকে মুখ দেখানো যাইবে কেমন করিয়া, এই দৃষ্টিশক্তিতে যেন মাথা হইতে সর্ব-শরীরে পাক দিতে থাকে।

ঘরোয়া ফিরিয়া অনেক মাসাবদা করিয়া সন্ধির মন্ত্র রচনা করিতে হয়। ধরো—এমনও তো বলা যায় পশুপতি কাল একটা অভিনয় পরিহাস করিয়াছিল, কিন্তু এমনি বোকা অনিলা—ভালো কথা—ব্রাউসের জন্য হিটের কাপড়ের কথা বলিতেছিল না সেদিন? স্নো সাবানও যেন অনেকদিন কেনা হয় নাই। কপালের চুল পাতলা হইয়া আসিতেছে বলিয়া সেদিন অক্লেপ করিতেছিল না অনিলা? কি নেওয়া যায়? বাথগেটের ক্যান্ডির অয়েল? জবাকসুম? লক্ষ্মীবিলাস? মহাভূপারাজ?

কিন্তু এত করিবার আর প্রয়োজন ছিল না।

পাঁচ সাতটা প্যাকেট হাতে 'বেহাতি' অবস্থায় কড়ানড়ার পরিবর্তে জুতার আগা দিয়া সজ্জের থাকা দিতে নিবারণ আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, এবং একটি গাল হাসিয়া কহিল—আপনি এখন এলেন বাবু? মা এই মাসুর চলে গেলেন।

—চলে গেলেন? কোথায়?

—অজ্ঞে, কেন? দিল্লীতে। টেরেন ফেল হবার ভয়ে টেঞ্জিয়ানাকে বা উষ্মশাসে দৌড় করিয়েছে—এতক্ষণে হাওড়া ইন্ট্রান শেপাছে গেল। বাবায় কি কথা ছিল না বাবু?

জুতার কাছে মান খোঁওয়ানোর ভয়ে পশুপতি কষ্টে শ্বাস লইয়া সহজভাবে বলে—কথা ছিল—বাকি, কথা ছিল। তবে আজই—কার সঙ্গে গেল।

মাসীমা মেসোমশাই মণ্টু দাদাবাবু এখানেই সব খাওয়া দাওয়া করলেন কি না।

ব্যক্তির সম্পদেই

দেশের সম্পদ!

এই সম্পদ গড়ে তোলে একমাত্র
বিশ্বদল আর্থিক সংগতিসম্পন্ন
সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত
ব্যাংক

ইণ্ডিয়ান

ন্যাশন্যাল ব্যাংক

—লিমিটেড—

হেড অফিস:—৮, লায়ন্স রোড
কলিকাতা।

একটি সুপরিচালিত এবং
সুপ্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

—ব্রাঞ্চ—

বম্বে, বিহার, সি পি ও বাংগালুর সর্বত্র।
লিকিউরিটি অনুসারে ব্যবসায়ীদের
সুবিধাজনক সর্বোচ্চ টাকা ধার
দেওয়া হয়।

আর, রায়, বি-এ,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ফোন: কলিঃ ৪১০১ টেলিঃ ক্রিয়াকারি, কলিকাতা।

ট্রান্সফার শেয়ার এখনও কিছু আছে

বঙ্কশ্রী হোসিয়ারী

—এও উইডিং মিলস্ লিঃ—

এই কোম্পানীর সমস্ত শেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।
ইহা একটি লভ্যাংশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।

শতকরা ১০ লভ্যাংশ

(ঘোষণা করা হইয়াছে (৩১/৩/৪৪ ইং)।

মধ্যবর্তী লভ্যাংশ

১৯৪৪ সনের সেপ্টেম্বরের কাজের উপর
পুনরায় ভাল লভ্যাংশ আশা করা যায়।

সমমূল্যে কিছু ট্রান্সফার শেয়ার

আবিলম্বে বিক্রয় করা যাইতে পারে।

আবেদন করুন:—

নার্কেটস্ ইউনিয়ন লিঃ

২১-এ, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—কাল-২০৭৩

টেলি—ব্যাংক কলিকাতা

বেঙ্ক ল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৬

২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

—মূলধন—

অধিকৃত—	২৫,০০,০০০, টাকা
বিলকৃত ও গৃহীত—	১২,৫০,০০০, টাকা
আদায়ীকৃত—	৭,০০,০০০, টাকার অধিক

কার্যকরী তহবিল—১,৮৫,০০,০০০, লক্ষ টাকার অধিক

১৯৪৩ সালে শতকরা ১০, হারে ডিভিডেন্ড দেওয়া হইয়াছে। এ পর্যন্ত প্রদত্ত ডিভিডেন্ডের
পরিমাণ অংশীদারদের অর্থের শতকরা একশত টাকা।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর:—এল, এম, মুখার্জি

এম, এসসি: এ, সি, আই, এস (লন্ডন); চার্টার্ড সেক্রেটারী।



গৃহস্থালী

ফটোশিল্পী—শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

আমার তো ওবেলার ভাত তরকারি আছে, তেই চলে যাবে—আপনি কি খাবেন বাবু? পাউরুটি এনে দেব?

—দরকার নেই বেরো। আমার খাওয়া বাওয়ার কথা কিছু বলে যায়নি তো?

—আজ্ঞে, তাতো কিছু বললেন না—শুধু এই গল্পরটুক দিয়ে গেলেন।

নিশ্চয় পত্তরটুকুতে আছে কি?

বন্দ্যু পাগলের সঙ্গে ঘর করা না কি সহজ মানুষের কর্ম নয়, অনিলার তো নয়ই, এতে তাকে জেলেই দাও আর ফাঁসিই দাও।

নাও ঠালা। বিপদ আর কাকে বলে? পশুপতিরই যে গলায় ফাঁস লাগাইতে সাধ বাইতেছে। শ্মিরিষ আর তামাসা করিল কই?

গগনাটা তো নিতু'লই এইমাছে দেখা বাইতেছে।

এই যে—হাওড়া স্টেশনে গিয়া টেলের টিকিট জোগাড় করা—সোজা বিপদ সেটা? আর ছুটির জোগাড়? সেই বা সহজ কিসে? তা'ছাড়া—সরকারী 'ভ্রমণ কমাও' নীতির অবমাননা তো আছেই।

এত বিপদে ফোঁসিল কে?

জ্যাম, জেলী, চাটনী, আচার, মসলা
ইত্যাদির প্রয়োজন হইলে একমাত্র
ঈষ্টার্ন কন্টিমেন্টস অফিস
জিনিয়গালিই লইবেন



জ্যাম,
জেলী,
আমের
চাটনী,
কারি
পাউডার,
টমেটো সস
ও কেচাপ
মিক্সিওটক
আচার এবং
মসলা
ইত্যাদি

ম্যানুফ্যাকচারার :-

ঈষ্টার্ন কন্টিমেন্টস কোং,

ফোন—ক্যাল ৬১৭৪, পোঃ বক্স ২১১৭
টেলী—“মার্ম্যালাভেড”



ক্যামিক্যাল কিনিবর
বেলায় “ষ্টাণ্ডার্ড” মার্ক
দেখিয়া অবশ্য কিনিবেন

আমরা নিম্নোক্ত কেমিক্যাল দ্রব্যাদি নির্দেশভাবে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

- ০ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড।
- ০ পটাশ এসিটাস্।
- ০ পটাশ সাইট্রাস্।
- ০ সোডি সাইট্রাস্।
- ০ সল্ভার নাইট্রেট।
- ০ ফেরিয়েট এম্বন সাইট্রাস্।
- ০ মাকুরিয়াস্ নাইট্রেট।
- ০ লেডসার এসিটেট।

ফোনঃ বি.বি. ৪০১০

গ্রামঃ “সাইট্রাস” ক্যাল্

ষ্টাণ্ডার্ড কেমিক্যাল

এন্ড ফার্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস্ লিঃ, কলিকাতা

স্থাপিত—১৯২৪



সকল উৎসবেই প্রয়োজন

না যে কে র চা

গন্ধে অতুলনীয়

স্বাদে অনুপম

বর্ণে অনবদ্য

নায়েক জী মার্ক

২৭, শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

— ম্যানোজিং এজেন্টস —

চণ্ডীচরণ নায়েক

প্রসিদ্ধ হং সিমেন্ট ও লোহ বাষপারী
১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

আধুনিক সমাজ ও চিত্রকলা

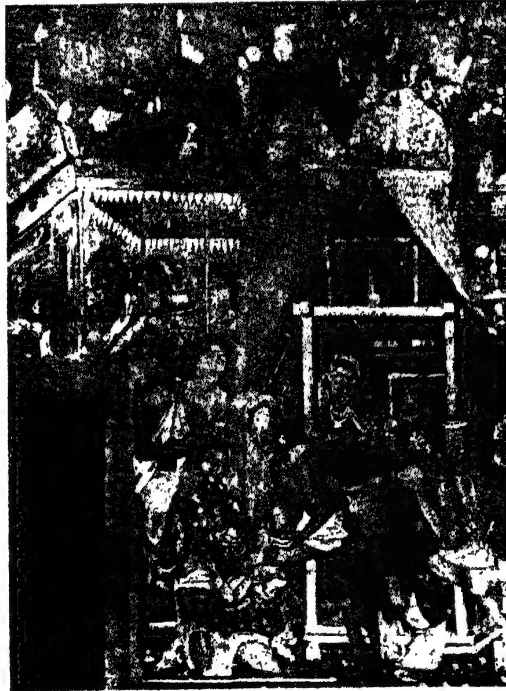
দু হাজার বছরেরও বেশী যে অতীতের পরিমাপ ভারতের সেই সুদীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী সমাজ ও জীবনযাত্রার প্রথা ও রীতি-নীতি ভারতীয় চিত্রকলায় মধ্যে যতখানি প্রতিভা হলে তার তুলনা অন্যান্য জাতির ইতিহাসে বিরল। কেবল চিত্রের সাহায্যে ভারতীয় সমাজের ধারাবাহিক ইতিহাস গড়ে তোলা সম্ভব না হলেও গুরুত্ব যুগ থেকে সুদূর পরবর্তী কালের সমাজজীবনের ছবি সমসাময়িক সাহিত্য ও কলাশিল্পের সমবেত শিল্পীমণ্ডল প্রায় সম্পূর্ণ রূপ নিয়েছে বলা যায়।

প্রাক্ মোহেনজোদারো

ইতিহাসের জন্ম হবার হুঁ পূর্বের প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্থল চিত্রকলার সাহায্যে আমরা সুদূর অতীতের আদিম সমাজ-পদ্ধতির মূল তথ্য মোটামুটি আয়ত্ত করতে পারি। চিত্রগুলি স্থল পদ্ধতিতে আঁকা হলেও কোন কোনটির জীবন্ততাব সত্যই বিস্ময় উদ্ভূত করে। রায়গড় জেলার অন্তর্গত সিংগনপুরের পাথরে আঁকা চিত্র এবং মিজাপুর ও হাশেমগাবাদ জেলার গুহাগায়ে অঙ্কিত অনুরূপ চিত্র থেকে—যেগুলির তারিখ সম্বন্ধে বিস্ময়কর মতভেদ দেখা যায়—আমরা জানতে পারি যে তখন খাদ্য সংগ্রহের প্রধান উপায় ছিল শিকার এবং নৃত্যকলা, সম্ভবতঃ ধর্মসংক্রান্ত ও আনন্দানুকূল প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল। শিকার ও নৃত্যনৃগণ উভয়ের মধ্যেই সম্ভবতঃ জীবনযাপনের নির্দেশ মেলে।

ভারতের আমরা এলাম ইতিহাসের সূচনাকালীন

সিদ্ধু তীরের সভ্যতার যুগে। মোহেন-জোদারো এবং অন্যান্য স্থানে জ্যামিতিক খাঁচে অথবা প্রাকৃতিক আকর্ষণে চিত্রিত যে সব মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে সেগুলির অঙ্কন কার্য কে করেছে জানবার উপায় নেই, তবে এই সুন্দর শিল্পকায়ে মেয়েদের হাত ছিল ধরে নিলে বিশেষ ভুল করা হবে না। মনে রাখতে হবে যে আলংকারিক চিত্রাঙ্কণ প্রধানতঃ মেয়েদেরই একচেটিয়া ব্যাপার। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কথাটা আরো বেশী খাটে, উদাহরণস্বরূপ এদেশের আলংকার উল্লেখ করা যায়।



দ্বিতীয় নারায়ণ ভোজন

অজন্তা

সেরগুজা প্লেটের রামগড় পাহাড়ের ঘোঁ-মারা গুহার প্রাচীরচিত্রের ভূশাংশগুলি ডঃ ব্রুস থঃ পুঃ তৃতীয় শতাব্দীর বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু স্যার জন মার্শালের মতে ওগুলি থঃ পুঃ প্রথম শতাব্দীর অন্তর্গত। এই ভূশাংশগুলির কথা বাদ দিলে ঐতিহাসিক আমলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে সব চিত্রের অস্তিত্ব আছে আমরা তার সন্ধান পাই অজন্তায়।

অজন্তায় সর্বাপেক্ষা পুরাতন প্রাচীর-চিত্রগুলি আছে ১নং ও ১০নং গুহার, এগুলি

আঁকা সুদূর হয় থঃ পুঃ দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দীতে। সাত আট শতাব্দী ধরে আঁকা অজন্তায় প্রাচীরচিত্রগুলিতে সমসাময়িক সভ্যতার বহু বিচিত্র বিবরণ অঙ্কন পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে ১, ২, ১৬ এবং ১৭নং গুহার গুরুত্ব যুগে অঙ্কিত চিত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এই চিত্রগুলি সর্বাপেক্ষা ভাল অবস্থায় আছে। এই সব চিত্র তৎকালীন সমাজ-জীবন ও আচার ব্যবহারের অপূর্ব নিদর্শন। চিত্রগুলি ধর্ম বিষয়ক এবং বৌদ্ধ ধর্ম জনপ্রিয় করার উপেক্ষা বুদ্ধের জীবনকথা ও জ্ঞাতকে বর্ণিত তার পূর্বজন্মগুলির কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত, কিন্তু চিত্রের সংঘটিত সম্পর্কে শিল্পীদের উপলব্ধি ছিল অসাধারণ এবং কল্পনায় সাহায্যে সমসাময়িক জীবনের ছবি তারা এই পবিত্র কাহিনীতে ঢুকিয়ে খাপ খাইয়ে দিতে পেরেছিলেন।

সমাজের সর্বোচ্চ স্তর থেকে নিম্নতম স্তরের জীবন

উৎসবে



বাজে খরচ কম করুন !!

যুগ যুগান্তর ধরে—
মায়েস কাছে প্রার্থনা করেছেন
“ধনং দেহি—”

তিনি শুনেনছেন—পূরণ করেছেন
আপনার প্রার্থনা।

আপনার কাছে
—পরিবারের প্রার্থনা—
পেয়েছেন যে ধন

তার অপব্যয় না করে
ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করুন।

তিন বৎসরের ক্যাশ
সার্টিফিকেট ক্রয় করুন।

স্থায়ী আয়ান্তে সুবিধাজনক সতে
উদ্ভূত তহবিল গচ্ছিত রাখুন
এবং
চলতি হিসাব খুলুন।

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং
কাজকারবারের জন্য

দি প্রোভাপুর ব্যাঙ্ক লি.

টেলিগ্রাম-মোচাক ♦ স্থাপিত-১৯২১

—হেড অফিস—

১৬, ম্যাগো লেন, কলিকাতা।

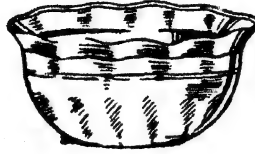
—ব্রাঞ্চ—

উল্‌বাড়িয়া : : আমতা

মিঃ জে. সি. চক্রবর্তী,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

মিঃ অরবিন্দ রায়,
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

পিতল
বাঁসার



খাগড়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মোকামের উচ্চশ্রেণীর বাসন,
এলমনিয়াম ও দশকর্মের যাবতীয় দ্রব্য বিক্রোতা।



পাল এণ্ড কোং

১৫৬, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা

GERMLINE

The Great Fever-Germ-Killer

জ্বরমলিন

জ্বরের যম

জ্বরমলিন

একদিনে জ্বর ছাড়ে
পথ্যের বিচার নাই

SOLD EVERYWHERE সর্বত্র প্রাপ্য

জার্মলিন লিমিটেড,

৪৭, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা।

এই চিত্রগুলিতে নিখুঁতভাবে প্রতি-
নিশ্চিত হয়েছে। তোরণ-স্বার সমন্বিত
নগরী ও পল্লী অংশ, রাজপ্রাসাদ ও দায়িত্ব
পল্লীবাঁসীর কুটীর সমভাবে চিত্রে স্থান
পেয়েছে। এমনভাবেই আঁকা হয়েছে নগর
গ্রামাঙ্গীবনের চিত্র। রাজা ও রাণীর আঁকা
য়েছে রাজসভার জীকজমক ও সমারোহ
ভূতি আনুষ্ঠানিক সমস্ত গোরবের সঙ্গে।
রাজার অভিব্যক্তি, প্রজাদের কাছে রাজার
শ্রমদান, বয়স্কদের সঙ্গে পরামর্শ অথবা
চরকায়া পরিচালনা, সহচরীপরিবৃত্তা রাণী
অথবা রাজা ও রাণী উভয়ে, নিজ নিজ কর্মে
নবুজ ভূত্যবর্গ, প্রসাধন দৃশ্য, নিভৃত
বিবাহিক জীবনের ছবি, নাগরিকের জীবন-
দ্রা, পল্লীজীবন, গো-মহিষাদির সঙ্গে মাঠে
থবা কুটীরে রন্ধনরত কৃষক—সমস্তই চিত্রে

রূপ প্রকাশ করে বেশী। নারী এবং
পুরুষদেরও মুক্তা ও মূল্যবান প্রস্তুতাদির বহু
ও বিচিত্র অলংকার ধারণের মধ্যে যে অলংকার-
প্রীতি দেখা যায় তাও এই সৌন্দর্যবোধের
পরিচায়ক। নর্তকীদের পরিধানে প্রলম্বিত
রঙীন বেশ থেকে রঙীন ড্রেস কাপড়ের প্রতি
অনুরাগের প্রমাণ মেলে। পুরুষের পরিচ্ছদ
দেখা যায় ধৃতি,
স ম্যা সী র
আ ল খা ব্রা
জাতীয় ঢোলা
জামা এবং
বি দে শী দে র
নিজ নিজ
লি শি ষ্টে পরি-
চ্ছদ।

ধারার ব্যবস্থা এবং সংগীতযন্ত্র ও বাসন
পত্ৰাদির ছবিও দেখা যায়। শান্তির সময়ের
চিত্রের প্রাধান্য থাকলেও বিরতিভাবে শ্বল-
যুদ্ধ এবং সমুদ্র যুদ্ধের চিত্রও আঁকা হয়েছে।
মানুষের সর্বপ্রকার মনোবৃত্তি, মহত্তম থেকে
হীনতম—প্রেম ভীতি দয়া মারামি ক্রোধ লোভ
শোক চুরি-ডাকাতির স্পৃহা এবং লঠিতরাজের



সংগীত ও নৃত্যোৎসব

স্থান পেয়েছে। তাছাড়া বিরতি শোভাযাত্রা এবং
নৃত্যগীত সমন্বিত আনন্দোৎসবের চিত্রও
আছে। সাধু-সন্ন্যাসীরাও বার পড়েন নি।
সে-যুগের তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধের পরিচয়
পাওয়া যায় রাজ-রাণী ও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের
সিল্ক অথবা মসলিনের অঙ্গলক্ষণীকৃত সূক্ষ্ম
শাড়ী এবং ওড়নায় গোপন করার চেয়ে যা

যেরকম যন্ত্র ও মমতার সঙ্গে শিল্পীরা
তরলতা এবং প্রাণীদের চিত্র একেছেন তার
মধ্যে পশুপাখী ও প্রকৃতির প্রতি সেকালের
পুরুষ ও নারীর ভালবাসার পরিচয় পাওয়া
যায়।

চলচ্চিত্রের জন্য ব্যবহৃত রথ, নৌকা, হাতী,
ঘোড়া ইত্যাদি যান-বাহন, এই সকল পশু



রাজার নগর পরিদর্শন

উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিগ্রহের প্রবৃত্তি ইত্যাদি চিত্রগুলিতে যেভাবে
রূপায়িত করা হয়েছে পরবর্তীকালের ভারতীয় চিত্রকলায়
আর কোনদিন তা হয় নি।

সাহিত্যে চিত্রকলার কথা

প্রাচীন ভারতের চিত্রকলা সমসাময়িক সমাজ কিরূপ
ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছে দেখানো হল। সংস্কৃত
সাহিত্যেও চিত্রকলা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। এ
থেকে জোবালো প্রমাণ মিলে যে প্রাচীন যুগে সমাজের
সঙ্গে চিত্রকলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল আমাদের বর্তমান
যুগে যার কোন অঙ্গিত নেই। কবির আশ্রয়স্থিত আশ্র-
কননে প্রেমসী কলতলার স্মৃতি অবলম্বন
করে স্বহস্তে আঁকিত চিত্র হাতে দুঃখিত—
কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের এই দৃশ্য
মানসপটে কল্পনার তুলিতে কে না একেছে?
সংস্কৃত সাহিত্য থেকে—বিখ্যাত গ্রন্থগুলির
মধ্যে শকুন্তলা, রথবংশ ও রজাবলীর নাম
করলেই যথেষ্ট হবে, আমরা জানতে পারি
যে রাজবংশ ও সম্ভ্রান্ত বংশের পুরুষ ও

। প্রিমিয়ার থ্রাসওয়াস থোস

P 48 Sch. No. XLV, C.I.T.
রাধাবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা।

সর্বপ্রকার কাঁচের জিনিষ
ও
কর্কের
ফুকিফ ও সাপ্রায়ার

মফঃস্বল জর্ডার সরবরাহ
করা হয়।

। প্রিমিয়ার থ্রাসওয়াস থোস

শরৎ লক্ষ্মীর আগমনে

বাংলার ঘরে ঘরে আবার কল্যাণ-
প্রীতিতে ভরিতা উঠুক, সকল দুঃখ-
দৈন্য দূর হউক—ইহাই আমাদের
একমাত্র কামনা।

বিশ্বব্যাপী এই বিশ্বের সমস্ত
বাজারে প্রয়োজনীয় কিছুই পাওয়া
যায় না—তাই জনসাধারণের শ্রুভঙ্কার
ও সহযোগিতার বিনিময়ে আমরা
স্বাভাবিক দ্রুতপাণ্য প্রয়োজনীয়
জিনিষ সরাসরি আমদানী করিয়া

সামান্য মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা
করিয়াছি।

মাল চলাচলের সুব্যবস্থা না
থাকায় মাল প্রেরণে বিলম্ব
হইলেও মফঃস্বল গ্রাহকবর্গের
সুবিধা ও স্বার্থরক্ষার্থে আমরা
সকল সময়ই সচেষ্ট रहিয়াছি।



আপনাদের সেবা ও সন্তুষ্টি করাই
আমাদের চরম লক্ষ্য।

শারদীয়া থোস

কমিশন এজেন্টস এবং জেনারেল জর্ডার
সাপ্লাইয়ার্স

৫৭, ক্রাইস্ট স্ট্রীট (রাজকাটরা), কলিকাতা।



আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

হাঁপানির কষ্ট যখন বাড়ে, তখন রাত কাটে একটা
দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে। এ্যাজমলীন এই রকম
কষ্টের সময় অদ্ভুত কাজ করে। ভারতের এক
প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবাধ লক্ষ লক্ষ লোক
এ্যাজমলীন খেয়ে চিরদিনের মত রোগমুক্ত হয়েছেন।
হাঁপানি ছাড়া যে কোন রকম কাস, ব্রঙ্কাইটিস্
প্রভৃতি কঠিন অসুখও এ্যাজমলীন সম্পূর্ণভাবে
সারিয়ে দেয়। এই ঔষধ ব্যবহার করে নিজেকে
আজই রোগমুক্ত করুন।

বিনামূল্যে—আপনি ইচ্ছা করিলে প্রস্তুতকারকের নিকট ডাক খরচা
বাবদ ৫০ স্টাম্প পাঠাইয়া বিনামূল্যে পরীক্ষার জন্য নমুনা নিতে পারেন।

সর্বত্র পাওয়া যায়।

এ্যাজমলীন

প্রস্তুতকারক : জি, ডি এণ্ড কোং

৮৮, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলার এজেন্ট—রাইমার এণ্ড কোং

১১৪, আশুতোষ মদ্যার্জি রোড, কলিকাতা।

নারী মূর্তিচিত্র অঙ্কন করতেন। এইসব চিত্রে প্রায়শঃ প্রাকৃতিক দৃশ্য স্থান পেত। সেখানে চিত্রকলায় দক্ষতা উদ্ভবের অভিলষিত গুণ বলে পরিগণিত হত এবং সমাজের সকল স্তরের পুরুষ ও নারী চিত্রাঙ্কণ বিদ্যার চর্চা করতেন। স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দেখে উষা তার প্রতি অনুরাগিনী হলে তার সহচরী চিত্রলেখা কল্পনা থেকে অনিরুদ্ধের মূর্তি এঁকেছিল। নরনারীর কাহিনী গড়ে তুলবার উপায় হিসাবে চিত্রকে কাহিনীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়ার এই ধরনের দৃষ্টান্ত সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বিরহী ও বিরহিণীকে সাঙ্ক্ষ্য দেবার এবং তরুণ তরুণীর মনে প্রেম সঞ্চার করবার উপায় হিসাবে মূর্তিচিত্রকে কাজে লাগানো ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তাদের স্বপ্ন-বাসবদত্তায় উদয়ন ও বাসবদত্তার অনুপস্থিতিতেই তাদের মাতাপিতা দুজনের চিত্রের পরিণয় সম্পন্ন করেছিলেন।

বাংসায়নের কামসূত্রে চোষটি কলার মধ্যে সংগীত ও নৃত্যকলার সংগে চিত্রকলাকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, নাগরিকের এই কলায় দখল থাকা প্রয়োজন। বাংসায়নের নাগরিক হল ফ্যাসন দূরস্ত মানুষ অর্থাৎ সহরের সভ্য লোক, বিশেষতঃ ঘমামাজা গিস্তিকরা যুবক। এই রকম একটি যুবকের ঘরে কি কি দ্রব্য থাকা উচিত তার বর্ণনায় রং, তুলি ও অঙ্কনের জন্য একটি

কাঠ ফলকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশের কলাবোধ ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন পুরুষ ও নারী কেবল নিজের আনন্দের জন্যই চিত্রকলার চর্চা করতেন (বিনোদ), অপরপক্ষে গণিকারা, যাদের বাংসায়ন এবং অন্যান্য কামদর্শী গ্রন্থকার চোষটি কলা আয়ত্ত করার উপদেশ দিয়েছেন, দামোদর গুপ্তের মন্তব্য অনুসারে তারা নিছক পুরুষের মন ভুলাবার জন্য নৃত্যগীত প্রভৃতি অন্যান্য কলায় পারদর্শিতা দেখাবার মত একই উদ্দেশ্যে চিত্রকলা শিক্ষা করত।

চিত্রশালা

সেকালের সমাজে চিত্রশালা অথবা ছবির গ্যালারির স্থান কি ছিল এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে প্রবন্ধ শেষ করব। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যুগের চিত্রশালার উল্লেখ পাওয়া যায় রামায়ণে, লঙ্কা নগরীর বর্ণনায় রাবণের চিত্রশালার কথা আছে। পরবর্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্য থেকে জানা যায় যে রাজার এবং রাণীদেরও নিজ নিজ চিত্রশালা থাকত। ধনী নগরবাসীরাও নিজস্ব চিত্রশালা রাখতেন। মাছকটিকে বারবণিতাদের ঐশ্বর্য ও প্রাসাদোপম হর্ম্যের বর্ণনা আছে। চিত্রকলায় এদের দক্ষতার কথা আগেই বলা হয়েছে। এরাও নিজস্ব চিত্রশালা রাখা গর্বের বিষয় মনে করত। বিশেষ বারহরের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষেও চিত্রশালা থাকার কথা সংস্কৃত সাহিত্যে

পাওয়া যায়, যেমন, শয়ন-চিত্রশালা এবং জল-মন্ডপের চিত্রশালা।

জনসাধারণের জন্য নির্মিত চিত্রশালাগুলি পুরুষ ও নারী উভয়েরই বিরামস্থান ছিল। অভিসারিকারা এবং সম্ভবতঃ বারবণিতারাও সেখানে যাতায়াত করত। অপরূহ চিত্রশালা খোলা হলে নাগরিকেরা সপরিবারে সেখানে বেড়াতে যেতেন—এজন্য, শরৎকাল ছিল প্রশস্ত সময়। চিত্রশালার মনোরম পরিবেশে আত্মীয়স্বজনদের সংগে দর্শকদের সঙ্গী আবেগমণ্ডিত সাজানো সুন্দর সুন্দর চিত্র-দর্শনের আনন্দ গন্ধধূপের সুবাস ভেসে এসে আরও বাড়িয়ে দিত।

চিত্রশালায় নানারকম চিত্র থাকত। শৃংগার রসের চিত্র, জলন্তীড়া অথবা রাসলীলা ইত্যাদি ঐতীহ্যকৌতুকের চিত্র, শিকার দৃশ্য, দেবতা ও উপদেবতা, রাজা ও রাণী, বীর ও বীরায়ণাদের জীবনের দৃশ্য, পশুপাখী এবং মৃদুদর্শনী জাতাপাতা ও ফুলের চিত্রে চিত্রশালার দেয়াল সজ্জিত থাকত। বাসগৃহে যশ বা হত্যালীলার চিত্র বিফলমুহুর্তের নিবন্ধ আছে, কিন্তু এসব চিত্র সাধারণ চিত্রশালা, সভাগৃহ এবং মন্দিরের দেয়াল আঁকা চলত।

সংস্কৃত কাব্য ও নাটকে চিত্রশালা-ভবনের অর্থাৎ চিত্রশালা যে গৃহে অবস্থিত সেই গৃহের বর্ণনা পাওয়া যায়। নারদশিষ্যশাস্ত্র নামক দৃশ্যপ্রাপ্য গ্রন্থে চিত্রশালা ভবনের বিবরণ পাওয়া যায়। বহু ক্ষেত্রে চিত্রশালার জন্যই সুন্দর স্বতন্ত্র গৃহ থাকত। চিত্রশালা ভবনের বাইরেটা হত বিমান অথবা মন্দিরের মত, বিশাল স্তম্ভ ও বিশ্ণুচক্র চহর থাকত এবং সমস্ত অংশ ফুল ও অন্যান্য আলংকারিক চিত্রে সজ্জিত করা হত। একটি বৃহৎ বাঁহ-কক্ষ বা প্রবেশ-কক্ষের মধ্য দিয়ে ভিতরের চিত্রশালায় প্রবেশ করতে হত। ভগ্নভূতি থেকে জানা যায় চিত্রশালা কক্ষে বাতায়ন থাকত। ভগ্নভূতি তাঁর উত্তরমার্গচরিতের একটি স্মরণীয় দৃশ্যে চিত্রশালাকে অমর করে গিয়েছেন। রাম ও সীতা একান্ত আগ্রহের সঙ্গে চিত্রশালার দেওয়ালে অঙ্কিত নিজেদেরই জীবনের চিত্র দর্শন করছেন। রাম নিখুঁতভাবে প্রত্যেকটি দৃশ্য বর্ণনা করছেন। চিত্রদর্শন শেষ হবার পর সীতা ক্লান্ত হয়ে পড়লে রাম তাকে সাদরে অনন্যেয় জানালেন বাতায়নের কাছে গিয়ে বিশ্রাম করতে, যেখানে মৃদু বাতাস তাঁর গায়ে লাগবে।

চিত্রকলার সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে যতই জানবার চেষ্টা করা যায় ভারতের সেই গৌরবময় অতীতে কলাশিল্প সম্পর্কে উল্লাস ও উদ্দীপনার পরিচয় পেয়ে আমরা তত বেশী গ্রাম্হা অনুভব করি এবং সেই সঙ্গে এই ভেবে ক্ষোভও পেড়ে যায় যে একদিন যে সমাজে উচ্চকলার প্রতি সার্বজনীন অনুরাগ দেখা যেত সেই সমাজের এতদূর অবনতি ঘটেছে যে ও বিষয়ে প্রায় কারোই কিছুমাত্র দরদ দেখা যায় না।

মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভের একমাত্র উপায়

আমার জ্যোতিষী

বান্ধবপিত শাস্ত্রের নির্দেশমত আসল প্রহর

(নিম্নলিখিত মূল্য ফেরৎ লইবার চুক্তিতে) ধারণ করা

কোন রকম ধারণে আপনাদের অজীহ্ব সিদ্ধ হইবে

জানিতে হইলে আপনাদের জন্মপত্রিকা বা

জন্ম তারিখসহ অগ্রিম ১ পাইয়া বা বান্ধবপিত লইবে

আমার বান্ধবপিতা বা বান্ধবপিতা

নিশ্চয়ই আপনাদের সুফল লাভ হইবে।

রকম ধারণ করিয়া যদি আপনি

কোন ফল না পান তবে রকম ফেরৎ

১৫ দিনের মধ্যে রকম ফেরৎ দিলে মূল্য ফেরৎ দিব

এবং গণ্যমেন্ট হইতে রেজিস্ট্রী কৃত

ক. এন. নিহোগী সানিকার

পোঃ আলম বাজার কাউন্সিল কলিকাতা।

শাখা ২৩৩ নং অপার টিওপ্লুর রোড।

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ—আমরা সকলপ্রকার আধুনিক ডিজাইনের সোনা, রূপার অলংকারাদি প্রস্তুত করিয়া থাকি। প্রতিমার গহনা প্রস্তুত করা আমাদের বিশেষত্ব। বাজার অপেক্ষা মজুরী অনেক সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কন্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক

— অফ এশিয়া লিঃ —

একমাত্র ব্যাঙ্ক যাহাকে
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পৃষ্ঠ-
পোষকতা করিতেন।

কেন ?

যেহেতু—

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে
তিনি প্রাণের সহিত
ভাল বাসিতেন এবং
ইহা তাদেরই একটি
প্রচেষ্টা;

যেহেতু—

তিনি জানিতেন ইহাতে
ন্যস্ত তাদের অর্থ
সম্পূর্ণ নিরাপদ ;

যেহেতু—

তিনি জানিতেন যে
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় জাগ্রত
হইলেই জাতীয় শিল্প
বিস্তার সহজে সম্ভব।



ইহাতে যোগদান উপলক্ষে
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের
বাণী :—

“একথা আমি দৃঢ়তার
সহিত বলিতে পারি যে,
বাংলাদেশে এরূপ ব্যাঙ্ক
খুব কমই আছে, যাহারা
তাদের দৃঃসময়ে.....একটি
অর্থশালী ও প্রতিপত্তি-
শালী পরিবারের উপর
নির্ভর করিতে পারেন।”

“ইহাদের পরিচালনায়
এই ব্যাঙ্কের সাফল্য
সুনিশ্চিত।”

গ্রাণ্ড :—

ঢাকা, নাগায়গঞ্জ, মিরকাপিম,
লৌহজঙ্গা, চরমুগুরিয়া, মাদারী-
পুর, গোপালদী (ঢাকা), সুনামগঞ্জ
(আসাম), শিলং (আসাম),
বৃন্দাবন (মধ্যপ্রদেশ)।

কলিকাতা শাখা :

১০নং রাসবিহারী এডিনিউ,
কলিকাতা।

হেড্ অফিস—১২, ক্রাইভ স্ট্রীট,
কলিকাতা

ফোন :—ক্যাল, ৫৮৯০

মনোরঞ্জন পাল, এম, এ,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।



লম্বা কালো চেহারার মানুষটা। নাক দুটো একটু চাপা বলে গলার স্বর যানকটো ধ্বনিসিক হয়ে বেরিয়ে আসে। সমস্ত বরাতায় বাড়তি কিছু নেই, যেন রাশি রাশি পেশীর সমষ্টি। পূর্ব বাংলাতেও আজকাল অসম্ভব ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে। কচুরিপানার হুমকির বিধাত্ত হয়ে উঠেছে নদীর জল। তাই বয়স বছর বয়সেই জীর্ণতা দেখা দিয়েছে শীতলের দেহে। অথচ ওর বাপের কথা মনে করলে লজ্জায় শীতলের মাথা নত হয়ে আসে। বায়ান্তর বছরেও কী চেহারা ছিল তার, আর কী শক্তি। ভোলায় ঝড়ে যদি দেশের চাপা পড়ে না মরত, তা হলে আরো দশ বরো বছর সে যে আরো বে-ওজর বেঁচে থাকত পারত তাতে আর সন্দেহ কী।

নৌকার হাল ধরে এলোমেলোভাবে কত কী ভেবে চলে শীতল। আড়িয়াল খাঁর শাদা জলে পশ্চিমের রাশি রাশি বাতাস বৃষ্টি-বিন্দুর মতো জলের কণা উড়িয়ে দিচ্ছে—যেন দৃষ্টি হয়েছে স্পর্শ আর ধূনির একটা বিচিত্র ধ্বনিপাক। হালকা একটুকরো মেখে নদীর এদিকটায় ছায়া পড়েছে, বাকের ওপারে থরথরে ঝলমল করছে জল, খালের মধ্যে কচুরিপানার সবুজ ছোপ—নদীটা যেন বহুদূরপা। পাল-মাটির জমিতে বৈশাখী মেঘের রঙ ধরা পরিপুষ্ট ধানের ক্ষেতে জোয়ারের জল খেলা করে বিড়াচ্ছে।

এই পথ—কতদিনের চেনা পথ। ফরিদপুর থেকে, মাদারীপুর থেকে কতবার সে সোয়ারী নিয়ে গেছে এই পথ দিয়ে। কতবার বৈশাখী ঝড় আর জলের রাক্ষস উল্লাস তার নৌকা-খানকে নাচিয়েছে খেলার খেলালে। চোখের সামনে স্তিমারের ডেউ লেগে নৌকা ডুবে গেছে, ধূনেছে দু'রের অশ্বকারে ডাকাতের অক্রমণে অসহায় নৌকাযাত্রীর আত্ননাড়। তবু কী অমংকার গেছে সে দিনগুলো। পূজোর সময় পরদেশীরা ঘরে ফিরেছে, হাসি আর গানে মুখের হয়ে উঠেছে নদীর জল, বাঁশীতে ভাটিয়ালীর সুর মনকে ব্যাকুল করে দিয়েছে। বাইচের নৌকার অমবম করে করতাল বেজেছে—

উঠেছে উদ্‌গম চীৎকার। গ্রামের হরিসভা থেকে কীতনের সুর এসেছে, গাটজড়া বাঁধা বরকনে নিয়ে আনন্দিত মুখে গাঁয়ের মেয়েরা 'জলসই' করতে এসেছে গাঙের ঘাটে। কিন্তু এই তিন বছরে কোথা থেকে কী হয়ে গেল সমস্ত।

—ও মাঝি, আর কয় বাক?

ঘুম থেকে উঠে একটা বিড়ি ধারিয়েছে সোয়ারী তারাপদ। উৎসুক ব্যাকুল চোখ বাইরে নদীর দিকে মেল দিয়ে বলছে, সন্ধ্যার আগে পেঁছে বিতে হবে যে।

মেঘের ছায়াটা একটু একটু করে সরে যাচ্ছে—যেন একটা বিরাট পাখী সূর্যের ওপর থেকে ডানার আড়াল সরিয়ে নিয়ে ভেসে গেল দিগন্তের দিকে। শীতলের পাকধরা চুল-গুলা চিকচিক করে উঠল, ঘর্মসিক্ত চওড়া কপাল জ্বলে উঠল জ্বলজ্বল করে।

ভাটায় বড় জোর টান দিয়েছে বাবু। পালের ওপর ভোটা চলাই। বাতাস ঠিক থাকলে সন্ধ্যার মধ্যে পেঁছে দিতে পারব। কথায় মন মানতে চায় না, পথ কি সোজা নাকি। নইলে গণ টেনে চলনা বাবু। —তারাপদ অধৈর্য হয়ে উঠেছে: সাঁঝের ভেতর না পেঁছলে আমার চলবে না।

—গণ টানার এখন দরকার হবে না বাবু!— শীতল হাসল।—বাতাস পড়ে গেলে টানব তখন। আপনি স্থির হয়ে বসুন।

কিন্তু স্থির হয়ে বসবার জো কোথায় তারাপদর। মনটা যদি পাখী হত তা হলে

কখন হাওয়ার আগে উড়ে যেত সে। মানুষ না হতে পারলে দেশে ফিরব না—উত্তেজিত তারাপদ নাটকীয় ধরণে আশ্ফলন করে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তাই বলে সম্পূর্ণ নাটকীয় নয়, অভিমানে এবং অপমান-বিশ্ব অবস্থায় সে দিন আর হিতাহিত জ্ঞান ছিল না তার।

ভয়াত ব্যাকুল কণ্ঠে অরুণা জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় যাবে?

চলোয়।

—বালাই যাটবাট। কবে আসবে?

—তোমরা মরলে।

এবার আর যাট যাট বলনি অরুণা। হয় তো নিজেই মকুই কামনা করেছিল, এ অপমান আর লাঞ্ছনার জন্যে নিজেকেই ঘোলা আনা দায়ী ভেবেছিল হয়তো। তাই মহলা শাড়ীর আঁচলে চোখের জল মুছে ফেলে বলেছিল, আমি তোমার পথে কাঁটা দেব না বেশিদিন, কিন্তু মেয়েটা ভো বোনো দোষ করেনি।

তারাপদ সে কথার কোনো জবাব দেয়নি। সমস্ত মাথাটা যেন বিস্ফোরক পূর্ণ হয়ে আছে, জবাব দিতে গেলেই যেন ভয়ংকর একটা কান্ড হয়ে যাবে। নিরুত্তরে সূটকেশটা হাতে করে সে নৌকায় এসে উঠেছিল।

হুকো হাতে শব্দে জানকী চক্রবর্তী বেরিয়ে এসেছিলেন। অল্প বিষয় হেসে



— কত কী ভেবে চলে শীতল।

বলেছিলেন, ঘরে বসে তাস পাশায় সময় না কাটিয়ে চাকরী বাকরী চেফটা করাই ভালো। পেঁছেই চিঠি দিয়ে বাবাজী।

তখন নৌকা ছেড়ে দিয়েছে, লগির

জীবন যাত্রার পথ
নির্ভর করে আপনার
সম্পত্তি অর্থের
উপর

নবজীবন

ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস :

৮০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনার দায়িত্ব অংশ করিয়া নিজের
ও নিজের পরিবারবর্গের নিরাপত্তার
ব্যবস্থা করুন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য টেলিফোনে
বড়বাজার ৫৫০৮ কিম্বা পত্র দ্বারা
অনুসন্ধান করুন।

সর্বত্র উচ্চ পারিতোষিকে
বিশ্বস্ত এজেন্ট আবশ্যক

এম. দত্ত

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আপনার শারদীয়া পূজা ফর্দে আমাদের লাভজনক.
ক্যাস সার্টিফিকেটের কথা লিখতে ভুলিবেন না।

মার্কেটাইল এক্সচেঞ্জ

—ব্যাক লিঃ—

—হেড অফিস—

পি ৭, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা।

ফোন—

কাল—৩৮৩৯



ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—
মিঃ জে, এন, সেন।

—ব্রাণ্ড—
রাণাঘাট

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

মা! আপনার ইহাই প্রয়োজন!

মুরাটোন



জীবনের তথা মাতৃহের দায়িত্ব ও আনন্দ
অবিচ্ছেদ্য। প্রসবের পূর্বে বা পরে
অক্ষুধা, অজীর্ণ, মাথাঘোরা অথবা
অনুদ্রুপ স্নাত্যাহানিতে স্বাস্থ্য
ও শক্তির পুনরুদ্ধারে সুরা-
টোন অশ্বিতীয়।



এসোসিয়েটেড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রীজ লিঃ

ক লি কা তা

খোঁচার চক্রবর্তী বাড়ীর ঘাট ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। মুষ বার করে কঠিন তিক্ত গলায় তারাপদ জবাব দিয়েছিল, হাঁ, আপনার আশ্বাসের চালের সাশ্রয় করে দিয়ে গেলাম।

জানকী চক্রবর্তী কী জবাব দিয়েছিলেন তা শোনা যায়নি। শুধু চোখে পড়েছিল, ঘাটের কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

তারপরে তারাপদ চলে গেল পশ্চিমে। শুধু পশ্চিম নয়, পশ্চিম ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে। দিল্লী, লাহোর, লয়ালাপুর। আত্মীয় নেই, পরিচিত নেই, সহায় সম্মল কিছু নেই। শত্রুগ্ৰীহীন বুদ্ধ কঠিন মাটি, আগুনের পিণ্ডের মতো সূর্য, উত্তপ্ত লুণের ঝাপটা, পাঞ্জাবের শহরে দুর্গন্ধ নোংরা গিল। কতদিন কেটে গেছে অনাহারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুখময় এল। একটা পশমের কারখানায় ছোট মতো একটা চাকরী জুটেছিল—এই পাঁচ বছরের মাইনে দাঁড়িয়েছে দেড়শো টাকায়। আজ অন্তত তারাপদ কারো মুখাপেক্ষী নয়, অন্তত অরুণাকে কাছে নিয়ে গিয়ে দুটি ঘেতে দেবার মতো সংগতি তার হয়েছে। আর সঙ্গে সংগেই মনে পড়েছে বাংলা দেশের শ্যামল মাটি, নদীর গেরুয়া জল, সিন্ধু আকাশ। তাই এক মাসের ছাটিতে দেশে ফিরছে তারাপদ। জলে খেলে বাংলার স্নেহ গভীর স্পর্শ যেন তাকে আকুল করে দিয়েছে।

আর ক্রমাগত অরুণার কথা মনে পড়ছে, ভেগে উঠছে একটা অতি তীব্র অনুতাপ বোধ। এতটা করবার কী দরকার ছিল। তা ছাড়া অরুণা কোনো দোষ করেনি। কোনোদিন একটি কথা বলেনি সে। শব্দের অম্ল্যে দিন যাপনের শ্লানিকে তারাপদের ভীতনে যথাসম্ভব সহজ আর স্বাভাবিক করে তুলবার চেষ্টাই বরং সে করেছে। তবু কেন অরুণাকেই সে আঘাত করল সব চাইতে বেশি, কেন এই পাঁচ বছরের মধ্যে একখানা চিঠি লিখেও সে তাদের খোঁজ নেয়নি? কী যেন একটা বোঁক চেপে গিয়েছিল, অপমানিত পৌরুষের কোন কেন্দ্রবিন্দুতে যা লেগেছিল একটা। আজ তার জন্যে সে অনুতাপ, ক্ষতিপূরণ করবার যথাসাম্য চেষ্টাও সে করবে।

ও মাঝি, সাঁঝের আগে কি কিছুতেই পৌঁছানো যাবে না? হাওয়াতো তেমন জোর টেকছে না। নইলে গুণি নাও না।

শীতল আবার হাসল।

—বাস্তব হবেন না বাবু, গালের সময় হয়নি এখনো।

পাড়ের দিকে একবার তাকাল শীতল। খাড়া পাড় প্রায় আট দশ হাত ওপরে উঠে গেছে পাহাড়ের মতো—থেকে থেকে বুরু বুরু

করে ভেঙে পড়ছে মাটির চাণ্ডাড়—খানিকটা ঘোলা জল ঘুরপাক খেয়ে উঠছে ঘণ্টার মতো। আড়িয়াল খাঁর শ্রান্তিহীন ভাঙন। এদিকের একটা গ্রাম প্রায় অর্ধেকের বেশি নদীর তলে নিশ্চিত হয়ে গেছে, দু' তিনটে পত্রহীন শুকনো নারকেল গাছ এখনো জলের মাঝখানে তির্যক রেখায় দাঁড়িয়ে স্রোতের টানে থর থর করে কাঁপছে। উঁচু পাড়ের এখানে ওখানে খাঁড়ির মতো হয়ে নদীর জল ঢুকে গেছে—মাটির গায়ে অজস্র ফাটল, কাটা গাছ আর হিজলের ঘন সারি দুর্ভেদ্য হয়ে আছে। ওখানে গুল নিয়ে নামা অসম্ভব। কিন্তু তারাপদের তাগিদ অন্তত বেশি, বড় বেশি স্বার্থপর মানুষের মন।



ক্রমাগত অরুণা ও মেয়েটার কথাই মনে পড়ছে।

তারাপদের শেষ নেই অবশ্য। বহুদিন পরে সে ফিরছে—দুর্ভাগ্যবান। এই স্বার্থবাকুল মনোভাব অপরিচিত বা অস্বাভাবিক নয় শীতলের কাছে। আজ পাঁচ বছরের ওপর সে মাঝিগিরি করছে, মানুষের এই দুর্বল বাগ্মতা বিরক্তি জাগায় না তার—সহানুভূতিই আকর্ষণ করে বরং।

কিন্তু এই নদী—এই গ্রামগুলো। তিন বছরে কী আশ্চর্য পরিবর্তন। শীতলের চোখের সামনে দিয়েই তো দুর্ভিক্ষের এত বড় একটা ঝাপটা বয়ে গেল। এই নদী দিয়ে সে কত মরা মানুষ ভেসে যেতে দেখেছে, দেখেছে উজাড় হয়ে গেল গ্রামের পরে গ্রাম। আড়িয়াল খাঁর আনিবার্য ভাঙনের মতো মৃত্যুর নিম্নর হাত নিম্নমভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে গেছে সমস্ত। গ্রীহীন শূন্যপ্রায় গ্রামগুলো যেন শ্মশানের মতো দাঁড়িয়ে। চরের ওপরে ওই বাড়িগুলো থেকে কীতনের সর এসেছে কতদিন, এসেছে রয়ানী গানের উত্তাল কণ্ঠ। কিন্তু দু' বছরের মধ্যেই সব আশ্চর্যভাবে নীরব আর নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। মানুষ যারা আছে

তারা যেন মানুষ নয়, কতগুলো আকারহীন, অবয়বহীন ছায়ামূর্তি মাত্র।

হাওয়ার গতি লক্ষ্য করে পালের মুখটা বদলে দিলে শীতল।

—কদিন পরে দেশে আসছেন বাবু?

কদিন? সে অনেক দিন হল বই কি—পাঁচ বছর।

—দেশের কিছুই জানেন না বাকি?

—না।—তারাপদ জু কুণ্ঠিত করলে, না, বিশেষ কিছুই—! এদিকে খুব দুর্ভিক্ষ গেছে না মাঝি? কাগজে যেন দেখছিলাম। আচ্ছা, মন্দ গায়ের কোনো খবর জানো তুমি?

না, শীতল জানে না। না জানলেও কিছু অনুমান করা কঠিন নয় তার পক্ষে। কিন্তু কী হবে সে কথা তারাপদকে বলে। দুঃসংবাদ দিয়ে তার লাভ কী। তা ছাড়া তারাপদ হয়তো বড়লোক। হয়তো তার আত্মীয়স্বজন সুখে-স্বচ্ছন্দেই দিন কাটিয়ে চলেছে। দেশের সব লোকই তো আর না খেয়ে মরেনি। কত মানুষ তো এই ফাঁকে দস্তুর মতো রাজা বাদশা বনে গেল।

অন্যমনস্কের মতো তারাপদ আবার বললে, গুণটা টেনে গেলে—

শীতল সে কথার জবাব দিল না।

বাকের পর বাক। পথ যেন আর ফুরোয় না। ভাঁটার টান প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে আসছে, পালের বাতাস মন্দা। শুধু খাড়া পাড়ের গায়ে নদীর অচেতন হিংসা আঘাত করে যাচ্ছে, বদ্ব্যপক শব্দে অবিশ্রাম ভাঙন। ঘোলা জলে এক রাশ ফেনা ফটে উঠছে, তারপরেই ছিন্ন মালা থেকে ছড়ানো রাশি রাশি ফুলের মতো খরস্রোতে ভেসে চলে যাচ্ছে। তারাপদের নৌকোর ওপর একটা কাক বারকয়েক অকারণে চক্ক দিয়ে কা কা করে উড়ে চলে গেল।

অসীম বিরক্তি আর অসহিষ্ণুতা নিয়ে একটার পর একটা বিড়ি টেনে চলল তারাপদ। মাঝিটার যেন গরজ নেই কিছু, গুল টেনে গেলে এতক্ষণ—! কিন্তু বলে বলে হয়রান হয়ে হয়ে গেল সে। এত স্বার্থপর হয় মানুষ। একটুখানি গা ঘামালে এমন কি ক্ষতি হতে পারে? লোকটার; পাঁচ বছর পরে সে দেশে ফিরছে অথচ যেন কোনো তাগিদ নেই, এতটুকু সমবেদনা নেই তার জন্যে।

অরুণা কী করছে এখন! হয়তো বিকেল বেলায় গা ধুয়ে ভিজ কাপড়ে খিড়কির ঘাট থেকে ঘরে ফিরছে। বাইরের চন্ডীমন্ডপে জানকী চক্রবর্তী পাশার আসরে মেতে উঠেছেন। বড়শালা এইমাত্র হুইল আর তিনটে মাছ নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। মেয়েটা হয়তো দাদুর কোলের কাছে বসে তারি গড়গড়ির নলটা নিয়ে খেলা করছে।

বুরু বুরু ভেতরে চানক করে উঠল, মনটা আর বর্ধন মানতে চায় না। নদীতে আজ কি আর জোয়ার আসবে না? অথবা এই পাঁচ বছরে

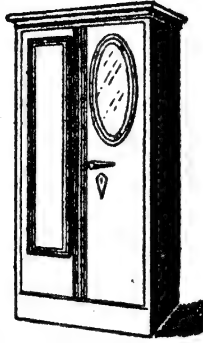
পবিত্র কপত্রী!



মুম্বাসিত
সোহাগ সিন্দুর
নারীর দেহ ঘন
পবিত্রতর করে!



গুহ এণ্ড ব্রাদার্স
কলিকাতা



পোষাকপরিচ্ছদের
আলমারী।



বিস্তারিত বিবরণের জন্য

পত্র লিখুনঃ—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফীল

ওয়ার্কস

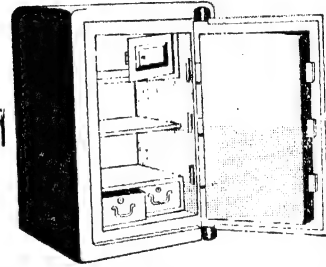
১৪, ক্লাইভ স্ট্রীট,
কলিকাতা।

“রিগ্যালের”

ইস্পাত নিশ্চিত

আলমারী, সিন্দুক,
অফিস আলমারী,
ক্যাস-বাক্স ইত্যাদি

দলিল ও অলঙ্কারের জন্য
অখণ্ডনীয় সিন্দুক।



লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ।
সেই কল্যাণের স্বারা ধন প্রী লাভ করে;
কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ,
সেই সংগ্রহের স্বারা ধন বহুলায় লাভ করে।

—বরীপ্পনাথ

আর্থিক পরিচয়

মোট চলতি বীমা

২৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার উপর

বীমা তহবিল

৫ কোটি ৪২

মোট সংস্থান

প্রায় ছয় কোটি টাকা

দাবী শোধ (১৯০৭-৪০)

তিন কোটি টাকার উপর

নতুন বীমা (১৯৪০)

৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর

শ্রবণ লক্ষ্মীর
আগমনে

বাংলার গৃহ-সংসার কল্যাণ-
প্রীতে ভরিয়া উঠুক, সকল
দুঃখ দৈন্য ও বিপদের
অবসান হোক, নৈরাশ্য অবসাদ
ও সংশয়ের মেঘ কাটিয়া যাক,
দায়িত্ব পালনের দৃঢ় সংকল্পে
সমগ্র জাতি আজ জাগিয়া
উঠুক। দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসর
ব্যাপী দেশের আর্থিক
স্বাধীনতালাভের এই প্রচেষ্টা
আপনাদের সকলের সহ-
যোগিতায় সফল ও সার্থক
হোক।

আজিকার দিনে ইহাই আমাদের
ঐকান্তিক কামনা।

হিন্দু স্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

হিন্দুস্থান বিন্ডিংস্, কলিকাতা।



আর মানে পড়ে গেল পলাশপুরের দস্ত
বাড়ির ছোট বউকে। স্বামীর অসুখের খবর
পেয়ে বাপের বাড়ি থেকে এসেছিল শীতলের
নৌকাবাহী। বয়স তখন, স্বামীর অসুখের
সংবাদেও তার কচি কোমল সন্দ্বন্দে মন্থে
দুশ্চিন্তার ছাপটা গাঢ় হয়ে পড়েনি। আশার
আনন্দে তখনো উজ্জ্বল, মাথায় টকটকে সিঁদুরের
ফোঁটা, গায়ে রাশি রাশি গয়না। অসুখে
মানুষের হয়, আবার সারেও তা। মাঝে মাঝে
খুশি মনে ছোট ছোট শাদা আঙুল দিয়ে
খালের জল নিয়ে খেলা করেছিল, পান খেয়ে
আরো রঙীন করেছিল রঙীন চৌঁট দুটো—
একবারেই ছেলেমানুষ! তারপর বাড়ির ঘাটে
যখন নৌকা ভিড়োঁছিল, তখন দেখেছিল
সামান্য ভিত্তা বাড়িতে একটা চিতা জ্বলছে,
তার স্বামীর চিতা।

এম, এস, চৌধুরী

এও সস

জুয়েলার্স এন্ড ওয়াচমেকার্স

স্থাপিত-১৯১৫

—হেড অফিস ও কারখানা—

২৫৯, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ফোন: বি, বি ২৭৪৯



নিত্য নতুন ডিজাইন ও হাল-
ফ্যান্সনের জড়োয়া গির্জামণ্ডলের
নানাবিধ মনোমুগ্ধকর

অলংকার, রৌপ্যের বাসনাদি

এবং সর্বপ্রকার ঘড়ি

বিক্রয় সর্বদা মজুদ থাকে।

পানমরা বাদ নাই—মজুরী সুলভ।

জরুরী অর্ডারী মাল ২৪ ঘণ্টার
সরবরাহ করা হয়।

সিকিম, ল্যা অগ্রিম লইয়া মধ্যস্থলের
অর্ডারী ডি, পি যোগে পাঠান হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

—কলিকাতা শাখা—

৬৩এ, কলেজ স্ট্রীট। ফোন—বি বি ৪৪৯৫

১৬১বি—রাসবিহারী এডেনউড, বালীগঞ্জ।

ফোন—পাক ২১৭৫

সঞ্চয় করুন

সঞ্চিত অর্থ লাভবান হউন

আপনার সঞ্চিত অর্থ হইতে সবচেয়ে বেশী লাভবান হইবেন যদি তাহা ইন্সট ইন্ডিয়া ষ্টক এন্ড শেয়ার ডীলার্স সিণ্ডিকেট লিঃএর মারফৎ শেয়ার মার্কেটে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর কোম্পানীগণের শেয়ারে বিনিয়োগ করেন। এই শ্রেণীর প্রথম প্রতিষ্ঠান যাহা ১৯৪০ সাল হইতে ক্রমাগত শতকরা ৭১% টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে এবং শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ সম্পর্কে যথাসম্ভব সকল রকমের সুবিধা-সুযোগের যথা নগদ-মূল্য দেওয়া, সহজ-কিন্তুতে মূল্য আদায় দেওয়া এবং সুনিশ্চিত লাভের পরিকল্পনা ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। গ্রাহকদিগকে অর্থ-বিনিয়োগ সম্পর্কে এবং শেয়ারের অদলবদল সম্পর্কে বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়।

আমাদের গ্যারান্টিড প্রিফট স্কিমের টাকা খাটান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করুন।

ইন্সট ইন্ডিয়া ষ্টক

এও শেয়ার ডীলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ

২ নং রয়েল এন্ড চেঞ্জ লেন্স, কলিকাতা

গ্রাম—হানিকম্বর

—শাখা-অফিস—

ফোন—কলি ৩৩৮২

বরিশাল, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বেনারস, ঢাকা, শ্রীহট্ট, জলপাইগুড়ি, লক্ষ্মী, লাহোর

ম্যালেরিয়া

বড় বড় ডাক্তারগণ কর্তৃক বহু
পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। ম্যালেরিয়া
ও পালাজুদের অব্যর্থ মহৌষধ

‘আনন্দবড়ী’

মাত্র তিন দিন সেবনে
জ্বর বন্ধ হয়। ৩৬০ বড়ী ১০
টাকা, মাং ১১/০ মাত্র। গরীব রোগী-
দিগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক-
গণকে অর্থমূল্যে সর্বত্র পাঠাইয়া
থাকি।

কবিরাজ
শ্রীবিষ্ণুনাথ ভট্টাচার্য

দানাপুর ক্যান্ট (পাটনা)।

পূজার বিরাট
আকর্ষণ!

যুবক মহিলা এবং
শিশুদের জন্য নতুন
ধরণের রকমারী
শাড়ী ও পোষাকের
বিপুল আয়োজন!



আমাদের ফটকে নতুন
ফ্যাসানের ও বিভিন্ন
ডিজাইনের সিল্কের, সূতীর
ও বেনারসী শাড়ী, সকল
প্রকার পোষাক মজুদ আছে।

ডালিয়া

টেলারিঃ কোঃ নিঃ
কালজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা

আমাদের প্রতিষ্ঠান রবিবার বেলা ২টার পর
অর্ধদিবস ও সোমবার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

লগির খেঁচ দিয়ে শীতল নৌকাটাকে চক্ৰবর্তী বাড়ির ঘাট থেকে বের করে নিয়ে এল। বাজারের নীচে রামাবাসী করে একটু দূরিয়ে নিয়ে আবার রওনা দেবে শেষ রাতে। গয়া গায়ে অসীম ক্লান্তি এসে বাসা বেঁধেছে কেন। মাতা বায়ান বছর বয়েস, এর ভেতরেই এত বাড়ো হয়ে গেল শীতল। অথচ ওর বাপের কথা মনে করলে—

খালের দু'বাক উজানে নামতেই মধু গায়ের বাজার। আলো নেই, মানুষ নেই, চক্ৰবর্তী বাড়ির মতোই বিম মেরে পড়ে আছে। খোঁজ করতে গেলে বাজারে হয়তো কিছুই মিলবে না। চাল নয়, তেল নয়, একটুখানি নুনের ছানো ভাবা তো পাগলামি মাত্র। আর এই বাজার! পচা বছর আগেও শীতল একে দেখেছে, আলোয় ঝলমল করত, হঠাৎ দেখলে তুল হত শহরের বাজার বলে। সেদিন আর এদিন।

সঙ্গে যা ছিল তাই দিয়েই চালে ডালে পেয়াজে খানিকটা খিচুড়ি রাখলে শীতল। কিন্তু 'আশু'র, একটা দুটো গ্রাস মুখে দিয়েই আর সে খেতে পারল না। অনিচ্ছুক শরীর, অনিচ্ছুক মন। কেবলই যেন সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে তারাওদের বিহবল মুখখানা।

এক পেট জল খেয়ে হাঁড়টাকে সে ঢেকে রাখল। ভোরবেলা নৌকা ছাড়বার আগে খেয়ে নিলেই চলবে। ক্লান্তির জনেই বোধ হয় এত খাবার লাগছে তার। একটা ঘুমিয়ে নিলেই



.....দুজন লোক দাঁড়িয়ে

সব ঠিক হয়ে যাবে। কাপড়টা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে সে শূন্যে পড়ল।

খালের ওপরে বাজারটা নিস্তব্ধ। শূন্য নৌকার তলা দিয়ে কলকল করছে কালো জল—মাথার ওপর দিয়ে পাখা মেলে উড়ে চলেছে রাত্রির পাখী। বাতাসটা ঠাণ্ডা নয়—খানিকটা উত্তপ্ত বাষ্পের মতো, যেন কারো নিঃশ্বাসের মতো গরম। পূর্ব বাংলার শ্মশানে যেন প্রেতের উষ্ণ নিঃশ্বাস। শীতলের গায়ের মধ্যে ছদ্ম ছদ্ম করতে লাগল।

ভয় ভালো, বাজারে এখনো মানুষ আছে, বেঁচেও আছে। একটা কোমল কিশোরী কণ্ঠে 'মনসা-মঙ্গলের' করেকটি পংক্তি ভেসে এল কানে:

“বিষ নয়ান এড়িয়া দেবী অমৃত চোখে চাও
তিজুবন রক্ষা করো তিজুবনের মাও”—

গলায় শব্দে কদম্ব কাতরতা। যেন এই বাজারটা, এই গ্রামটা, সমস্ত দেশটাই অসহায়

সুরে কেঁদে উঠছে, বাঁচাও আমাদের, বিষ নয়ান এড়িয়া দেবী অমৃত চোখে চাও। কিন্তু তিজুবন কি সত্যি সত্যিই রক্ষা পাবে? আকাশের নীচে এই জমাট কালো অন্ধকার ভেদ করে সে প্রাণনা কি গিয়ে পৌঁছাবে দেবতার কাণে। কে বলবে।



পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে

অনেক রাতে একটা লন্ঠনের আলো পড়ল চোখের ওপর। কে যেন চাপা গলায় ডাকছে।

—ও মাঝি, ও মাঝি, ভাড়া যাবে?

আঃ, কে বিরক্ত করে এত রাতে। এখন সে কোথাও ভাড়া যেতে পারবে না। তারও মানুষের শরীর, তারও তো সুখদুঃখ আছে।

—না, ভাড়া যাব না।

—ও মাঝি, শোনো শোনো। বড় জরুরি। ভাড়া ডবল দেব। বিপদে পড়ে গাছি, উম্মার করে দাও একটুখানি। আর শূন্যে থাকা চলল না। অসীম বিরক্তিরে একটা হাই তুলে শীতল উঠে বসল, কে?

লন্ঠন হাতে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে। যে কথা বলছে তার গায়ে হাতকাটা বেনিয়ান, ছোট ছোট করে ছটা মাথার চুল। ডান হাতে তিনটে আংটি, বাহুতে সোণার তাবিজ, গলায় বেনিয়ানের ভিতরে সোণার এক ছড়া হার চিকচিক করছে। বড়লোক এবং মহাজন নিঃসন্দেহ।

—কী হয়েছে বাবু?

—কিছু মাল নিয়ে যেতে হবে। এই বেশি নয়, বস্তা দশেক।

কিন্তু আমার নৌকা তো মালের নয় বাবু, মোরারীর।

জানিরে বাবু, জানি।—লোকটা বিরক্ত হুঁতুপ করলে সেটুকু বোঝবার বৃষ্টি আমার আছে। বড় নৌকায় নেবার যদি উপায় থাকত, তা হলে কি এক মালাই নৌকার মাঝদের তোয়ারজ করি না তিনগদ্দে ভাড়া

দিই! যত সব অকর্মা ছোকরারা জোট বেঁধেছে, গায়ের থেকে চাল ডাল কিছু নিয়ে যেতে দেখলেই কাক করে এসে ধরে। আইনও নাকি হালে কী সব হয়েছে। পরসা দিয়ে ব্যবসা করব, তবু এসব কিরে বাবা।

—তা আমি কী করব বাবু।

—বেশ কিছু করতে হবে না।—লোকটা এদিকে ওদিকে তাকাল একবার: বস্তা দশেক মাল নিয়ে রাতারাতি বস্তাভূমিরে মথুরা দাসের গোলায় পৌঁছে দেবে। আমিই মথুরা দাস, বুঝেছ। সংগেই থাকব তোমার। খুঁশি করে ভাড়া দিয়ে দেব, কোন ভয় নেই।

একটা অকারণ নিষেধ মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এ অন্যায়, এ অত্যাশ্রিত অন্যায়।

—না বাবু, পারব না।

—আরে বাবু, কত তোষামোদ করব আর। ওই যে কথায় বলে, মাতঙ্গ পড়িলে দরে, পতঙ্গ প্রহার করে—এত হয়েছে তাই। আর দর বাড়াসনে, গা তোল দয়া করে।

—দেবেন কত?

—দশ টাকা।

—কুড়ি টাকার কমে হবে না।

—কুড়ি টাকা! বলিস্ কিরে!—মথুরা দাস চোখ দুটাকে ছানাবড়া করে তুলল: কুড়ি টাকার তো একখানা নৌকাই কেনা যায়।

—তবে তাই কিনুনগে না।—শীতল আবার শূন্যে পড়বার উপক্রম করল।



খড়ের মত তীর খরখরায়

আহা মাঝি, শোন শোন।—মথুরা দাসের গলায় ব্যাকুলতার আমেজ লাগল: নে ওই পনেরো টাকাই পারি, আর দিক কারিস নে বাপদন। বড় বিপদেই পড়ছি, নইলে—

—কুড়ি টাকার কমে পারব না। যদি রাজী থাকেন তো মাল আনুন কর্তা।

—আঃ, এ যে ভদ্দরলোকের এক কথা। তবু তো ভাগিস ভদ্দর লোক নেস। আচ্ছা যা, তাই হবে। বাগে পেয়েছিস কিনা। হুঃ, যত সব—

অনিচ্ছুক শরীরটাকে টেনেটুনে শীতল উঠে দাঁড়াল। বাগে পেয়েছে। সে আর পেয়েছে কতটুকু? তার চাইতে অনেক বেশি পেয়েছে মথুরা দাস। শূন্য একটা মানুষকে নয়, এই গ্রামকে, এই দেশকে। শ্মশানের ওপর হাড়ের দৃশ্য যত আকাশ ছোঁয়া হতে থাকবে, তত উঁচু হয়ে মাথা তুলবে মথুরা দাসের কড়ি পাহাড়। আড়িয়াল খাঁ ভেঙে চলেছে দুর্নিবার ভাবে, গ্রামের পরে গ্রাম, নীড়ের পরে নীড়, দুর্ভিক্ষে শ্মশান হয়ে চলেছে সমস্ত। আর সেই

বেণী রচনায় — শাদু অতুলনীয়



শ্রীমতী বিলাস

এম, এল, বসু & কোং, লিঃ

জনহীন চড়ায় একটা ভাঙা নৌকো উবুড় হয়ে আছে। তা থাক, মথুরা দাসের নৌকার অভাব হবে না কোনো দিন।

তারাপদ কী করছে এখন? চকিতের জন্যে শীতলের মনে পড়ল : তারাপদ কী করছে এখন? অশ্বকার উঠানের মাঝখানে এখনো কি সে স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? কত আশা করেই না এসেছিল লোকটা। দেশে ফিরবার জন্যে কত ব্যস্ততা, কত তাগিদ, কতদিন যে সে আপনার জনের মুখ দেখেছিল। নাঃ, এমন জানলে কিহুতেই ভাড়া নিতনা শীতল।

—আর কত মাল চাপাবেন বাবু? আমার নৌকো যে ডুবে যাবে।

—যাবে না বাবু, যাবে না। মোটে দশটা তো বসতা। দু'কোশ রাস্তা যাবি, কুড়ি টাকা কলে করোছি। কিন্তু খুব হাঁসিয়ার—কেউ জিগেস করলে—হ্যাঁ, যা বলে দিয়েছি মনে আছে তো?

একবার ইচ্ছা হল টান মেরে বসতাগুলোকে জলে ফেলে দেয়।

মুখে চোখে জল দিয়ে শীতল নৌকো খুলে দিলে। অশ্বকারে জল বয়ে চলেছে তরল খালের মতো তীক্ষ্ণ খর ধারায়। দু'পাশের বন জঙ্গল আর বেত কাঁটায় লাগির আগা আঁকড়ে ধরে কচুরির জাংগাল পথ আটকে নৌকোটাকে বাধা দেয় বারে বারে, যেন যেতে হবে না। দূরে কোথায় কাঁরা চীংকার করে কাদছে—মড়াকান্দা নিশ্চয়। মৃত্যুর এমন সমারোহের মাঝখানে লোকের এখনো কাদবার মতো কণ্ঠ যে অবশিষ্ট আছে এইটেই অশ্চর্য।

আকাশে অনেকগুলো জ্বলজ্বল করে একসঙ্গে ছায়া ফেলেছে খালের জলে জলটা বিজলিল করছে যেন বাঘের খাবা। পচা মাটি আর পাতার অত্যাগ গন্ধ ভাসছে বাঘের গায়ের গন্ধের মতো। একটা রক্তাক্ত হিংস্র হাসির আভাষ দিগন্তকে উদ্ভাসিত করে চাঁদ উঠল—শেষ প্রহরের খণ্ড চাঁদ। সমস্ত পৃথিবীটা যেন বিস্ময়করভাবে কুটিল আর হিংসাতুর হয়ে উঠেছে; রাগিটা যেন উঠে এসেছে শ্মশানের কোল থেকে, যেন রাশি

রাশি চিতার ধোঁয়ায় রূপ নিয়েছে এই অশ্বকার। আর এই রাগিতে মথুরা দাস চাল চুরি করে নিয়ে চলেছে—চুরি করে নিয়ে চলেছে মানুষের মূখের গ্রাস। সমস্ত পরিপার্শ্ব—সমস্ত পট-ছাঁই তার অনুকূলে।

—নৌকো কার? কোথায় যাবে?

বড়গলায় প্রশ্ন এল। আর সঙ্গে সঙ্গেই দূতিনটে টেচের বাঁঝালো আলো এসে পড়ল শীতলের চোখে মুখে—কী আছে নৌকোয়? নৌকোর ভেতরে ততক্ষণ একটা চাদর মড়ি দিয়ে লম্বা হয়ে পড়েছে মথুরা দাস। কিসীফিস করে ভীরা গলায় বললে, মাঝি, ও মাঝি?

—কী আছে নৌকোতে? থামাও, ভিড়াও নৌকো।

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলে শীতল।

—শোয়ারী আছে বাবু, ভেদবমি ধরেছে। ভরানক বিপদ। ভাড়াভাড়ি পেঁছাতে না পারলে—

—ভেদ-বমি! টেচের আলোগুলো সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল; মিথো বলছে না তো? মাল-পত্তর নেই তো কিছ? চাল-টাল?

—এসে দেখুন না বাবু।

—আচ্ছা, যাও যাও। বড়ো মানুস তুমি, নিশ্চয় মিথো বলবে না।

—আজ্ঞে না।

জোরে জোরে আরো কয়েকটা খোঁচ দিয়ে শীতল নৌকোটাকে অনেক দূরে নিয়ে চলে গেল। খালের জলে বাঘের খাবা যক যক করছে—শেষ প্রহরের লালান্ত ম্লানতায় সে খাবার নখগুলো যেন রক্তাক্ত। দিগন্তে চাঁদের রক্ত-হাসি। অশ্বকারটা যেন চিতার ধোঁয়ায় ঘনীভূত।

নিরাপদ জায়গায় এসে মথুরা দাসও হাসতে সুরু করে দিলে। দাঁতগুলো জ্বলে উঠলো উল্লাসে।

—বেড়ে, বেড়ে বলছি। মাঝি। ভেদ-বমির বুগী! হি-হি-হি! এখন বাকীটা ভালোয় ভালোয় পেরিয়ে যেতে পারলে—হি-হি-হি।

শীতলের মনের মধ্যে বার বার করে একটা ভীরা ধিকার বেজে উঠেছে, বড়ো মানুস তুমি, নিশ্চয় মিথো বলবে না। মথুরার হাসির শব্দে হঠাৎ যেন তার চমক ভেঙে গেল। অবহেলায় জিহ্বাসের একটা প্রেরণা হঠাৎ সাড়া দিয়ে উঠল : কথা ক্ষণেও ফলে, অক্ষণেও ফলে। সত্যি সত্যিই কি এই মুহূর্তে ভেদ-বমি দেখা দিতে পারে না মথুরার?

খালের জলে অতি তীব্র জোয়ার এসেছে। দিনের আলোয় উজ্জ্বল আড়িয়াল খাঁর প্রশস্ত প্রসারিত স্রোত নয়—অবিপ্রাপ্ত পাড় ভেঙে চলা শ্মশানের উদাস রিক্ততাও নয়। রাগির অশ্বকারে খালের সংকীর্ণ প্রচ্ছন্ন পথে কাণ্ডো জল কলকল করে বয়ে চলেছে, যেন একটা সাপ নিঃশব্দে দংশন করে ক্ষিপ্ৰগতিতে লোকোতে চলেছে নিজের শিশুর দিশে।



স্বামী : সুনীতি, আমাদের পোকার মত গণন আমি ছোট ছিলাম, তখন আমার বাবা আমার ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন বলেই আমার জীবনের এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে—একখানা বয়েজ্ ডেকার্ড পলিসী করে।

স্ত্রী : আমরাও তাঁর মত এখন থেকেই আমাদের পোকার জন্ত ঐরূপ ব্যবস্থা করবো।

বালকের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ পলিসী
(Boys' Deferred Assurance Policy)

গ্রহণ করা প্রত্যেক পিতারই কল্যাণ।

ইন্সট্যান্স মিউচুয়াল

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস:- ১৫, ডিওর রোড এভিনিউ, কলিকাতা





পৃথিবীর অনেক কিছই সার বলে' মনে হয়, কিন্তু আসলে তারা অসার, সার-ময়ের মতন। আত্মাধরের এককোণে আরাম-চেয়ারে এলায়িত হয়ে সর্বমাত্র বিশ্ববাস্যার বিস্মৃত হতে চলেছি, চোখের পাতা প্রায় বজ্রে এসেছে, কি আসেনি, এমন সময়ে ভূইফোড় দৈতোর ন্যায় দীপেন আমার সামনে আবির্ভূত হোলো।

“বনস্পতিক দেখেচ ?” খোঁজ করল সে—একটু খাপছাড়াভাবেই।

“নাঃ। চারধার সাফ। কোনো ভয় নই।” আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম।

“এসেছিল কি আসেনি?” দীপেন তথ্যি জিজ্ঞাসু।

“আমি তাকে চোখেও দেখিনি, কানেও শুনতে পাইনি—এখানে আসা অবধি।” আমি জানালাম।

দীপেন বসে পড়ল।

“তাহলে তার জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।” বলল সেঃ “অন্ততঃ একবারটির জন্যও সে এখানে আসবে। রোজই তো আসে—তাই না ?”

আমি একদৃষ্টে দীপেনের দিকে তাকাই।

“তুমি অপেক্ষা করবে—ওর জন্যে?”

আরাম চেয়ারের আওতায় যাও বা একটু ঘুমঘুম এসেছিল ওর কথার ঝটকায় সে আমের এক ঝাপটে কেটে যায়। ষোলো আনা সজাগ হয়ে উঠতে হয়ঃ “যা?—তুমি কার খোঁজ করছিলে? বনস্পতির না?”

“হ্যাঁ।” গম্ভীর মুখে ও ঘাড় নাড়ল।

“বনস্পতির সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।”

আমি ওর দিকে চেয়ে বিস্ময়ান্বিত হই। ওর কথার মর্ম আমার মর্মে ঢোকে না, আমার নিরেট মাথার ঠেকে ঠেকে বাস্তব্যার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। সত্যি বলতে, ওর কথার কোনো অর্থ হয় বলে আমার ধারণা হয় না।

“তুমি দেখা করতে চাও—বনস্পতির সঙ্গে? এই কথাই বলবে না?” আমি ওর বিবৃতির ছিন্নস্বত্রগুলি আমার মানসপটে পরের পর সাজাই। শ্রুতি আর স্মৃতি আর সেই স্মৃতির জোড়াভাড়া দিয়ে পরস্পরায় সাজিয়ে পরস্পর সম্পর্ক বার করার চেষ্টা করি। রহস্যটা পরিষ্কার করতে চাই।

“তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও—সত্যি কি?”

“ঠিক যে চাই তা নয়—” দীপেন শর্দূষপত্র সংযোগ করেঃ “তবে তার সঙ্গে আমার দেখা না করলে নয়।”

“কেন?” স্পষ্টবাক্যে আমি জানতে চাই।

“বললে পরে বুঝবে।” দীপেন বলেঃ

“কদিন আগে গোটা পাঁচিশেক টাকার আমার দরকার পড়েছিল হঠাৎ। অর্থোন্মাদের মানসে এই আত্মায় এলাম। বন্দ্যবৎসল কোনো বন্ধুর দেখা পেয়ে যাই যদি। কিন্তু বনস্পতি ছাড়া তখন কেউ এখানে ছিল না। বাধ্য হয়ে ওকেই আমার হাতড়াতে হোলো।”

ধার করা দীপেনের এক বিলাসিতা। সেকালের বীরকেশরীদের যেমন হরিণ শিকার করে আনন্দ ছিল, দীপেনের তেমনি এই ঋণ-স্বীকার। এক রকমের মগয়াই বই কি।

এবং এই মগয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে অশ্বমেধ। দীপেনের কথায় আমার একটা কথা মনে পড়ে যায়।—“পরশুদিন শনিবার ছিল বুঝি?” আমি প্রশ্ন করি।

দীপেন তানা-নানা করে। পরশুর শনিবারকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করতে চায়, করতে পারলে বাঁচে, কিন্তু কাজটা নিতান্তই কালোজারবিরুদ্ধ বলে তেমন স্ফূর্ত্যরূপে পারে না।

“কি রকম? কিছু সুবিধা হোলো না?” আমার পুনরাপি প্রশ্ন। মগয়ার টাকাগুলো গয়র দেহা কিনা আমার জ্ঞাতব্য।

দীপেন এ-ভেরাটাকেও এড়িয়ে যায়—“ও কথা আর বোলো না।”

সে কথা বলবার নয় তা জানি। দীপেন যে ঘোড়াকে খতবোর বাইরে জ্ঞান করে সেই ঘোড়াই হাসন্তে হাসতে জিতে যায়, যাদের বাজে মনে করে তারা হেঁটে গেলেও বাজি মারে, আর দীপেন যাদের ওপর বাজি ধরে তারা চার পা মায় লেজ তুলে দৌড়েও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এমন কি চতুর্থও হয় না—শেষ পর্যন্ত সেই ‘অলসো রান’ হয়ে পড়ে। এবং মুখেই ‘অলসো রান’, আসলে তাদের রান করতো নয়, শুধু হযরাজ করা, দীপেনের মতো হতভাগাদের নাজেহাল করা নাহক। নির্বাণ জেতার ঘোড়াও যে কি করে ডিগ্বাজি ধায় সে এক রহস্য। দীপেনের কাছে এবং আমাদের কাছেও। অতএব, কথাটা অকণাই বাস্তবিক।

এই অকথাবার জন্য কতোবার ওকে আমরা বলেছি, দীপেন, টাকাগুলো ঘোড়ার পম্চাত্ত এমন অপব্যয় না করে আর কোথাও ওড়াও। আমাদের কথা বলিচ্চেন—তবে মেয়েদের পেছনে ওড়ালেও তো পারো! দীপেনের জবাব, চেনা মেয়েরা নাকি ওড়ার মতো নয়, তাদের জন্য খরচাশ করা যায় না। আমরা বলি, না হয় অচেনা অশ্বচেনাদের জন্যেই করলে, ঘোড়ারও তোমার কিছু চেনা নয় তো? ঘোড়াদের জন্যে তুমি বহুৎ করেছ কিন্তু তার কোনো প্রতিদান পেয়েছ কি?—ওর এক-চতুর্থাংশও যদি মেয়েদের যথেষ্ট দিতে যোগ্য ফল পেতেই। ঘোড়াদের কাছ থেকে তুমি কোনো সম্ভাবহার লাভ করোনি—এত টাকা ঢেলেও এতদিনে একটা ঘোড়াকে উইন্-স্লেস্ কোথাও পাওনি, কিন্তু মেয়েদের বেলা তার অন্যথা দেখতে। নেহাৎ তাকে উইন্-করতে না পারো (তোমার বরাত!) তবে স্পেসে তাকে পেতে নিশ্চয়। সিনেমায় কি রেস্‌টারি

ভাওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক

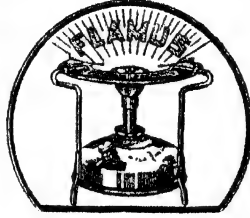


হেড অফিস : ১১৫নং ক্যানিং স্ট্রীট,
কলিকাতা।

ঢাকা, যশোহর, নৈহাটী ও
দক্ষিণ কলিকাতা শাখা
শীঘ্রই খোলা হইবে।

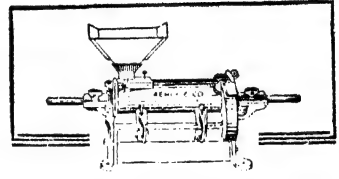
এজেন্ট ও ক্যাশিয়ার আবশ্যিক
সর্তের জন্য অবিলম্বে আবেদন
করুন।

রথীন কর,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর



Insist on ASHLY'S
KEROSENE STOVE, MIRRORS,
RICE MILL PARTS & OTHER
ENGINEERING STORES.

28, STRAND RD., CAL. Phone: Cal.3891.



জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখে জাতের সহানুভূতি!



ফোন :

"ক্যাল ২৭৬৭"

(স্থাপিত-১৯০৫)

হেড অফিস-৩নং ম্যাগো লেন, কলিকাতা

গ্রাম :

"জনসম্পদ"

শাখাসমূহ

কাঁধ	ভাগলপুর	ডোমার	বোলপুর
ঢাকা	মৈদীনীপুর	ভুলুকা	শাকচী
নারায়ণগঞ্জ	আনন্দপুর	বাঁজুড়া	পূরী
নীলফামারী	কর্ণেলগোলা	চাকুলিয়া	বালেশ্বর
মালদহ	বালীচক	কুসনগর	কটক
শান্তপুর	কোলাঘাট	চুয়াডাঙ্গা	টাটনগর
মেহেরপুর	বেলদা		

কলিকাতা শাখা

বড়বাজার শ্যামবাজার হাওড়া দক্ষিণ কলিকাতা

১৯৪২ সালে শতকরা ৫, টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

১৯৪৩ সালে শতকরা ৬, টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সব প্রকার কার্য করা হয়।

খণ ও ওভার ড্রাফট-সদ্বিধাজনক সর্তে অনুরোধিত সিকিউরিটির উপর দেওয়া হয়।

এলিটান্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

মিঃ এস. কে. জব্বার ও মিঃ সি. ঘোষ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

ডাঃ এম. এম. চ্যাটার্জী

সে না এসে যেত না। হৃদয় না পাও, এমন নিদ্রায় পড়ে না।

এর জবাবে দীপেন মুখখানা যেন কি রকম করেছে। বিবাক্ত পৃথিবীতে বিষয় প্রতিভারা যেমন করে থাকে। সামান্য মানদ্রব্য না বন্ধুল বা একান্তই ভুল বন্ধু দোষ করলে মহাপুরুষদের যেমন করা দস্তুর। কিম্বা হয়তো,—শেলীকে আমি কখনো চোখে দেখিনি,—শেলীর মতই মুখখানা করেছে হয়ত। সেই দৃশ্য শেলের মত আমাদের বৃকে বেজেছে।

তার ভাবখানা জ্ঞানান্তরে হয়ত এইঃ বহুগণ, তোমরা পাড় বেকু। দুখের সাধ কি ঘোলে মেটে? অবতৃষ্ণা কি অন্য সুধায় মেটবার?



অবহেলাভরে সেই তাড়ার মধ্যে রেখে দিল।

আমরা মূখ ফিরিয়ে নিয়েছি। অশ্বাহত দীপেনের দিকে তাকাতে পারিনি। ঘোড়ার চাট ঘোড়াতেই সইতে পারে। আর—আর পারে দীপেন। ও আমাদের কন্মো না।

তবে দীপেনের চাট মাঝে মধ্যে যে আমাদের সইতে হয় না তা নয়।

একদিনের কথা বলি। আমার নিজের কথা। মনে আছে এখনো। বর্ষাকাল, কোনো এক রাস্তার মোড়, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। এক মাসিক পত্রিকায় গল্প বেতে করকের দশটি মুদ্রা নিয়ে ফিরছি—ওই সম্বল। দীপেন এসে পাকড়ালোঃ “ভাই ভারী বিপদ, গোটা দেশে টাকা আমায় দিতে পারে? ধার চাচ্ছি।” ওর চোখমুখ উদাস, চুল উসকু খুসকু, বৈরাগ্যের চেহারা।

“পাচ টাকা দিতে পারি।” আমি বললাম। এবং দুখানা নোটের থেকে একজনকে ছাড়িয়ে এনে দীপেনের হাতে সমর্পণ করলাম।

দীপেন নোটখানাকে আলগোছে নিয়ে গকেট থেকে এক গোছা নোট বার করে তার মধ্যে রাখল। অবহেলাভরে সেই তাড়ার মধ্যে রেখে দিল। বৈরাগ্যবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত—সম্বল কি? কিন্তু এই দৃশ্য দেখে আমার

চোখ কপালে উঠে গেছে; “ম্যা, এত টাকা? তোমার আবার টাকার দরকার?”

“বাঃ, কাল শনিবার না? জানানো বৃষ্টি?” সে জবাব দিয়েছে।

তখনো শনিবারের রহস্য, আরো অনেক রহস্যের মত আমার অজানা। হিউমান্ রেস্ আর হস্ রেসের মাঝখানে দীপেন যে একটা মস্ত বড় যোগসূত্র সে কথা পরে অবশ্য জেনেছিলাম।

জেনেছিলাম পুরাকালীন জন্মমেধের আধুনিক ডেমোক্রেটিক সংস্করণ কী। সেকালের বীরত্বের বিশ্বব্যাপী পরাকাষ্ঠাদের এককালীন মাঠময় রূপান্তর দেখতেও বাকী ছিল না। শনিবারের আগে দীপেনকে দেখেছি—সমুদ্রজুল দীপ্তি—এবং শনিবারের পরেও দেখেছি—অশ্ববল্লীকিয়ায় সেবনের পূর্বে ও পরে। কিন্তু পরে আর সেই আগের দীপেনকে দেখতে পাইনি। তার বদলে আমার সম্মুখে ভাবান্তরিত (এবং ভাবান্তরিত) দি পেন্-কেই প্রকটিত হতে দেখা গেছে যেন।

তার বেদনায় আমরা বর্ষাখত জিলাম না তা নয়। আমরা, বন্দ্যবান্ধবরা, আমাদের গাম্ভাত তার অশ্বমেধ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিতে তো কাপণ্য করি নি। কিন্তু দীপেন অশ্বমেধ করছে কি অশ্বরা দীপেনমেধ করছে, আমাদের পক্ষে তা ঠিক করা একটু ঠিনই ছিল বোধ হয়। অবশেষে একালের অশ্বমেধকে আমাদেব রাজসূয় বলেই ভ্রম হয়েছে—দীপেন তো ছাৰ, এমনি কি, এ রাজাদেরও শূইয়ে দেয়, এমনি ব্যাপার।

দীপেনকে শোয়ানোর একটা গল্প শুনেছিলাম। দীপেনের কাছ থেকেই। এক শনিবার ঘোড়াদের নিকটে বিড়ম্বনা লাভ করে' মাঠের দুঃখ ঘাটে জুলবার সে রান্ধ করল—সটান লেকে গিয়ে জলপানি যাবে এই বাসনা। কিন্তু জলপথ তো ঐ একটি নয়—দুঃখ ভোলানোর আরো অনেক জলযোগ আছে। রকমকের করে' দুঃখ টুংখ ভুলে—জুলতে গিয়ে অনেক রাত হয়ে গেছে। এদিকে বাড়ীর পথও দীর্ঘতর তার টলায়মান হয়ে পড়েছে দীপেনের। অগত্যা করে কি? কোথায় শোয়? পাহারোলার হাতে না পড়ে রাতটা কাটায় কি করে? হঠাৎ সামনে ঘোড়াদের একটা জলাধার দেখতে পেয়ে তার মাথোই কুঁকড়ে সুঁকড়ে কোনোরকমে শূইয়েছে সর্পিধয়ে।

তারপরে যে-খটনার কথা সে বলে, সেটা স্বপ্ন বলেই আমার মনে হয়। অনেক ভালো ভালো গল্প শেষটায় স্বপ্ন হয়ে যায় দেখা গেছে। দীপেনের উজ্জিতে অনেক রাতে ছাকুরা গাড়ীর দুটো ঘোড়া সেখানে নাকি জল খেতে এসেছিল। তাকে সেখানে দেখে তারা যা আশ্চর্য হ'ল তা আর কহতবা নয়। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগল, “দেখেচ এই লোকটার দশা? চিন্তে পারছ একে? আমরা যখন টালগাঁজের মাঠে দৌড়াডাম তখন এই লোকটা আমাদের কতই না উৎসাহ

দিয়েছে! নাম ধরে ধরে আমাদের কতো না ডাকাডাকি! হায়, আবার যে আমাদের এই ভাবে পুনর্মিলন হবে কে জানত? অদৃষ্টের পরিহাস দেখ! আজকে আমরা এই ছাকুরা গাড়ীতে বাধা, আর সেই লোকটা কিনা এইখানে!”

দীপেন বলে, “দেখেচ, ঘোড়ারা কখনো ভোলে না। হারিয়ে দেয়, হারিয়ে যায়, কিন্তু মনে রাখে। তোমার মেয়েদের চেয়ে ভালো।” কিন্তু আমার ধারণায়, ও দুটি ঘোড়া নয়, রাতের ওরা। অশ্বজাতীয়, তবে অন্যরূপ, দীপেনের নাইটমেয়ার।

“তা, হাতড়ে পেলে কিছ?” আমি জিজ্ঞেস করি, “বনস্পতির কাছ থেকে?”

“পেলাম।” অধোবদনে বলল দীপেনঃ “তিনটে বাজতে যখন দশ মিনিট তখন চেয়েছিলাম, আর পাঁচটা বেজে যখন কুড়ি, তখন পেলাম টাকাটা।”

“অনেক বলতে হোলো বৃষ্টি?”

“আমি? না, আমি না। আমাকে কিছ বলতে হয়নি—ঐ টাকাটা একবার মুখ ফুটে চাওয়া ছাড়া”—দীপেন সত্যতরে জানায়ঃ “—একটা কথাও আমায় বলতে হয়নি।”

“খুব বকল বৃষ্টি তোমাকে? তোমার এই অশ্ববোরগের জনোই বোধ হয়?”

“বকল বলে বকল। যেমন বকুলি তেমন বকুলি—তেমনি আবার বর্ণনা। তবে ঘোড়ালটার ধার দিয়েই না। বনজগলের ব্যাপার সব।”

আমি বুঝতে পারি। বনস্পতি প্রকৃতিরাসিক। বিস্বপ্রকৃতির লীলার সে আত্মহারা।



দীপেনের নাইটমেয়ার—

গাছপালা কিলজগল বন-বাদাড় তার অন্তরঙ্গ। এমন কি, যখন সে বনমুখো নয়, তখনো সে বনের বিষয়ে মূখর। ওর বনস্পতি নাম ডাক এই কারণেই। ওকে শোনা মানে বনমর্মর শোনা।

“তোমায় এখানে একলাটি পেয়ে খুব বাকি বলে নিল? ওর সব বন্য-অভিধান-কাহিনীই বৃষ্টি—?”

“শুদুই কি বন্য অভিধান? কতো কী!

চর্মরোগে

নিমের উপকারিতা
সর্বস্থে আ জ
পৃথিবীর সকল
সভ্য জাতিই একমত



নিম
য়েনো মাঝান

নিয়মিত বাসনার কারণে
চর্মরোগে ভুগতে হয় না।
নিম টয়লেট সোপ প্রসাধন
উপযোগী সমুচিত সাবান
ইইলেও ইহাতে নিমের
চর্মরোগে নাশক শক্তি
প্ৰমাণিত বর্তমান।

THE LISTER ANTISEPTICS
& DRESSINGS CO. (1928) LTD
CHENNAI, INDIA



আপনার প্রসারিত
মেটোর
কায়ো রাজ
আমলো তৈল
মহা কণ্ঠ্য

স্বর্গে দেশেই আমলো বহু প্রচলিত



=দেশের সেবায় নিয়োজিত একমাত্র উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান=

কুবের ব্যাংক লিমিটেড

হেড অফিস—৩ ও ৪, হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

কলিকাতা
বড়বাজার
শ্যামবাজার
দক্ষিণ কলিকাতা
হাওড়া

ঢাকা
শান্তিপুর
তারকেশ্বর
রাণাঘাট
কৃষ্ণনগর
বেলুড়া
বাগী

ঝাড়গ্রাম
ভদ্রকী
সুভাগড়
বাগেরহাট
বিক্রী
গিড়নী

দার্জিলিং
রাজসাহী
বগুড়া
শিলিগুড়ি
কালিঙ্গ
বালাশোর
চন্দনবাজার

অনুমোদিত জার্মান রাখিয়া ঋণ ও ওভার ড্রাফট ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া হয়।

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাংকিং কার্য করা হয়।

ফোন :
ক্যাল-৬১১

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

মিঃ এ. কে. চক্রবর্তী

ফোন :- কাল ৭৮৮

টেলিগ্রাম :- "জীবনতরী"

আর্থ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস :- ১৫, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশের কল্যাণসাধন এবং দীর্ঘকালব্যাপী সেবারতের ভিতর দিয়া জনসাধারণের আনুকূল্যে "আর্থ ইন্সিওরেন্স" দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে। এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মূলে রহিয়াছে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা এবং সুদক্ষ পরিচালনা-নীতি।

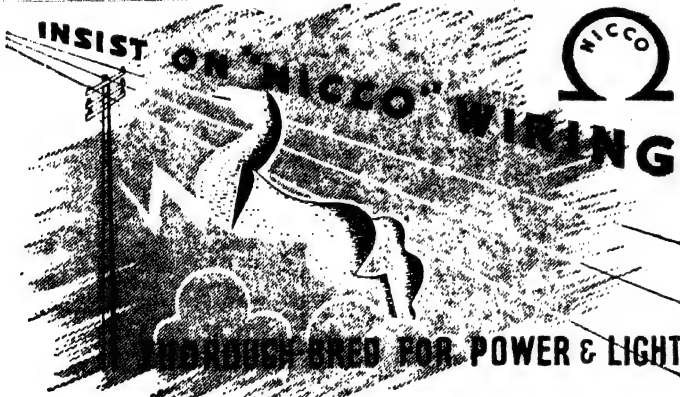
ক্রমোন্নতির পরিচয়

	১৯৩৯	১৯৫১	১৯৪৩
১। চলতি বীমার পরিমাণ	১৫,০১,০০০	৩৭,১০,৯০০	৬০,০০,০০০
২। জীবনবীমা তহবিল	১,৬৩,৪০০	৬,০০,০০০	১২,২৭,২০০
৩। গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটী	১,৯৭,১০০	৪,০৩,২০০	৯,১১,৪০০
৪। বার্ষিক প্রিমিয়াম	৮৩,০০০	২,০৩,০০০	৩,৩২,০০০

ব্রাঞ্চ ও অর্গানাইজেশন অফিস

লাহোর, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা, প্রীহট, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি।

জেনারেল ম্যানেজার—জি সি পাল, বি-এল



Electrical lines are the life-lines of the Nation. 'NICCO' is dedicated to accuracy and quality in Cables and Wires for all Electrical purposes.

We are, however, releasing only a limited part of our production capacity to meet demands from essential users supported by the necessary permits under the Non-Ferrous Metals Control Order. We are in a position to quote at present for BARE COPPER SOLID CONDUCTORS only.

NATIONAL INSULATED
CABLE CO OF INDIA LTD.
STEPHEN HOUSE :: CALCUTTA
PHONE: CAL 5660 (10 LINES) WORKS: MENGAON (C.P.) & MUMBAI (BENGAL)

বনের লাবণ্য পর্যন্ত। আর বল বলে বল। সে কী কথা—আর কথাই কী ছেঁকে বাবা! যেমন করে তুর্ভিৎ যাতে জেঁমনি যেন কথারা তার ভেতর থেকে ছিটকে ছিটকে ছুটে বেরতে লাগল। প্রথম কথাতেই টাকার দিতে রাজি হয়েছিল বলে শেষ পর্যন্ত সব আশ্বাস সইতে হলো। কি করব?"

বেচারার প্রতি আমার মায়া হয়। আমি বুঝতে পারি... বনস্পতির প্রাকৃতিক রস কিছু কিছু আমাকেও চাখতে হয়েছে। ওর অনেক গাছপালা, আমার মধ্যে শেকড় গাঢ়তে না পারলেও, তাদের শাখা-প্রশাখা আমার নাক-কানের মধ্যে বিস্তার করতে শিখা করেনি। স্বভাবতই দীপেনের প্রতি আমার মহানুভূতি না হয়ে পারে না। এমন কি, কবেকার আমার সেই পাঁচ টাকার শোকও আমি ভুলতে পারি।

আমি বলি, "আহা!" এবং আরো বলি : "তাহলে তো ঐ পাঁচ টাকা তুমি উপার্জন করেছ বলতে হবে। কায়ক্রেশেই উপার্জন করেছ। একে তো ধার বলে না। তুমি ওকে কাজ দিয়েছ, তোমার কান দিয়ে কাজ দিয়েছ—তার বদলে ওটা তোমার হকের পাওনা। ওই রোজকার রোজগার।"

"কাজ? কেবল কাজ? এমন কণ্টকর কাজ আমি জীবনে করিনি। পাঁচ টাকা উপার করতে এর চেয়ে বেশি বস্তা কখনো আমার পোহাতে হয়নি। এর বদলে স্বনির্ভর গর্ব সোঁদিয়ে কয়লা কেটে আনতে হলো আমার চের বেশি আরাম ছিল।" দীপেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

"তাহলে ফের আবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছো কেন?" আমার আশ্চর্য লাগে।

বিশ্বাসের বিষয় বাস্তবিক। অশ্বমেধের জন্যই ওর গর্ভমেষ হলেও, দীপেন এক গাধাকে বারম্বার দখ করে না। পাঠরা জবাব দেয় বলে নয়, একবারের পাত্রকে দু'বার জবাব করতে ওর কোথায় যেন বাধে। চক্ষু-লজ্জাতেই কি না কে জানে। একবার ধার করলে আর সে ধার মাড়ানো ওর স্বভাব নয়। পারংপক্ষে তাকে ভুলে যাওয়াই ওর অভ্যাস। এক হিসেবে সেটা ভালো—হতভাগাদেরও ভুলতে সময় দেওয়া হয়। সময়ের মত শোষণ আর কী আছে?

এক এক সময়ে আমি ভেবেছি যে, ইনস্ট্রাক্টার সোলারাই মরে বন্ধ দীপেন হয়। কিন্তু পরক্ষণেই বিচার করে দেখেছি—না, তাহো না। তাদের বারম্বার—দীপেনের একবার; তাদের একজনকেই পুনঃ পুনঃ, দীপেনের প্রত্যেক জনকে একান্তে; তাদের সাক্ষর জাতীয় ঠুংঠাক—আর ওর কামার-সুলভ এক ঘা। বিবেচনা করলে দুজনের ধর্মই আলাদা। তাদের অর্থকামের নিবৃত্তি নেই, কিন্তু দীপেনের একবারে মোক্ষম।

তবে কি ও স্বভাব বদলেছে? আবার ও বনস্পতিক তাহলে খোঁজে কেন?

শুভ শারদীয়োৎসবে—

আমাদের প্রীতি সন্তাষণ !



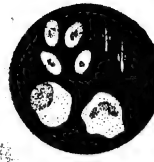
অত্যন্ত

আধিকার

হেনেক্স



"১০ সি. সি. পানীয় এমনিউল"
"সুস্বাদু শাবক হাঁসের প্রস্তুত কলিকৃত নির্যাস"
বিশেষ করিয়া সর্জনসকায় চর্কলতা, অবসরতা,
রক্তাৱতা ইত্যাদিতে বাধ্যত্ব হয়। দুইটি গালের
জন্ত ইহা সহজেই পান করা যায়, প্রতিটি এমনিউলে
৫০ গ্রাম কাচা চিকেনের সমতুল্য নির্যাস আছে।



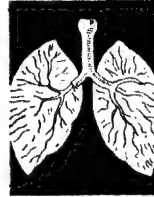
হিডোলেক্স

"১০ সি. সি. পানীয় এমনিউল"
Haemoglobin. 2 cc., Liver Ext. 2 cc.,
Red Bone Marrow Ext. 2 cc., তামা,
ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি ও ই সমন্বয়ে প্রস্তুত।
সর্বল প্রকার রক্তাৱতা, বিশেষ করিয়া প্রসবের
পূর্বে এবং পরে ও বতিন রোগ ভোগান্তে ব্যবহৃত
হয়।



লিডেক্স

"৫ সি. সি. পানীয় এমনিউল"
Liver Ext. 3 cc., Red Bone Marrow
Ext. 2 cc এবং ভিটামিন বি, দোষ, তামা ও
ম্যাগনেসিয়াম সংযোগে প্রস্তুত।
রক্তাৱতা, শরীরের ভল্লম হ্রাসে এবং লীৱী-
শক্তি হীনতার ব্যবহার্য।



নিউডোফোন

"৪ আউন্স নামাঙ্কিত শিশি"
সর্দি, কাশি, ইমগ্রুয়েন্স ও ব্রঙ্কাইটিসের বহু পরিকৃত
ও পুরাতন ঔষধ।
উৎকৃষ্ট বিদেশীয় রসায়নিক জ্যাদা এবং এশিয়া
মহাদেশীয় গাছ-গাছড়ার সমন্বয়ে প্রস্তুত।



ফিডারিনা

"কাটম সংযোগে ৪ আউন্স শিশি"
ম্যালেরিয়া, সাব্বাথ অথ ইত্যাদির উৎকৃষ্ট ঔষধবৎক
ও ঔজ্জ্বল্যক। কুইনাইন, ডোলাকলয়েক ইত্যাদি
নামাঙ্কিত রসায়নিক সমষ্টি দ্বারা ইহা প্রস্তুত।



ভাইট-এলোক

"৪ আউন্স নামাঙ্কিত শিশি"
অশোক ছাল এবং অমৃত এশিয়া মহাদেশীয় গাছ
পাছত, Vitamin B, E, ও Alcohol 20%
সংযোগে প্রস্তুত। সর্জনসকায় প্রীণে ও ভরাণ
রোগের অর্থাৎ ঔষধবৎক। সাধারণতঃ প্রসবের
ইহা সেবনীয়।
সর্বাবস্থায় ইহা একমুখী অর্থাৎ ভরাণের টনিক।



লিডারোন

"কাটম সংযোগে ৪ আউন্স শিশি"
সর্জন, Bile Salts ও গাছ-গাছড়ার হাঁসে প্রস্তুত।
সর্জনসকায় বহুত বোর ও বেরুজি নিষারক এবং
জ্বরের চর্কল মারক।



ওয়াইনো

"১০ আউন্স নামাঙ্কিত পোতন"
ইহা গোটফরটিন, অমৃতের নির্যাস, সর্জনসকায়
Glycerophosphates, Lecithin, Strychnine,
Alcohol 18% সমন্বয়ে প্রস্তুত। যে কোন প্রকার
হার্যিক শৈথিল্য, অবসরতা, ক্লান্তি, পুণ্যবতীভাৱ,
কৃত্রিম রোগ ভোগান্তের পর, সর্জন-সমন্বয়ে
এবং পরে, ইহা একটি অমৃতময়ী জ্যাদা টনিক।

বেঙ্গল ড্রাগস এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লি:

ঘ্যানুফ্যাকচারিং কম্পানি • স্থাপিত ১৯৩২

১১ রাজা রাজেন্দ্রনাথ স্ট্রীট • কলিকাতা



এম, নুরুল হোমেন

প্রথম দৃশ্য।
[রিজিয়ার পাঠ-গৃহ। দুইটি শেল্ফে সজ্জিত বই। বাম পার্শ্বে একখানা জল-চৌকির উপর একটি বীণা। দক্ষিণ পার্শ্বে ইজেলের উপর একখানা বোর্ড, তাতে সস্তরঙা প্রকাণ্ড একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন অঙ্কিত। রিজিয়ার বাম হস্তে রঙের প্যালেট, ডান হাতের তুলি দিয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্নের উপর শেষ স্পর্শ দিচ্ছে। তির্যক ভঙ্গীতে দর্শকদিগের দিকে অর্ধ পিছন ঘিরে দাঁড়ান, শব্দ মধুর profile দেখা যাচ্ছে, চেনা যায় না। এই দৃশ্যে রিজিয়া কখনও দর্শকের মুখোমুখি হয়নি, তাই সম্পর্ক অপরিচিত রয়ে গেল।]

জাহাঙ্গীর। (নেপথ্যে) ভিতরে আসতে পারি কি?

রিজিয়া। আসুন, থোস-আমদেন, সুস্বাগতম।

[জাহাঙ্গীরের প্রবেশ]

জাহাঙ্গীর। একি? ছবি আঁকার আকাঙ্ক্ষা কবে আশ্রয় করল?

রিজিয়া। আশ্রয় করে নি, তবে বর্তমানে ঐ স্প্রিংটার পৃষ্ঠে চেপে তাকে মনের লাইনে চালাতে চেষ্টা পাচ্ছি, তার গতি-রেখা ধরা পড়েছে আমার এই ছবিতে, এই দেখুন।

জাহাঙ্গীর। এ যে সস্তরঙে প্রকাণ্ড এক জিজ্ঞাসা-চিহ্ন একেছ, দেখছি। মনে হচ্ছে রামধনুকে বোর্ডে তুলি প্রশ্নে পরিণত করেছে? এ প্রশ্ন কার স্বরূপকে ব্যাখ্যাত করল?

রিজিয়া। আধুনিকার!

জাহাঙ্গীর। আধুনিকার? হে শ্যালিকা সুন্দরী, তোমার কথা ঐ জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতই আমার বুদ্ধিকে বক দেখাচ্ছে। বুঝতে টীকা প্রয়োজন।

রিজিয়া। না, টীকার সব ভেঙে যাবে। জীবনের বসন্ত দিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে, টীকা চলেবে না। এই আলোচ্য দর্শন করুন। কি দেখছেন?

জাহাঙ্গীর। দেখছি কবিতাগুরু!

রিজিয়া। ও শব্দ কবিতা নয়, ওগুলি হচ্ছে ঐ জিজ্ঞাসারূপী রামধনুর সস্তরঙ—
Vibgyor—পিঙ্ক, শব্দন :
ল্যাভেন্ডার নীল বেগুনী
মনে তোলে যে সুবধুনী
চেখে ভাষা হালকা ফিকা,
সেই হ'ল কি আধুনিকা?

জাহাঙ্গীর। বলা কঠিন। অনুবর্তনীর রূপ দেখি ত?

রিজিয়া। বেশ—

মন সাঁতারে আকাশ নীলে,
প্রাণ হরে যে গাঙের চিলে,
সবুজ প্রাণের মঞ্জুলিকা।
বলব তারেই আধুনিকা?

জাহাঙ্গীর। বলতে হচ্ছে হয় কিন্তু। বলতে না চাও, এগিয়ে যাও।

চরিত্র

রিজিয়া

জাহাঙ্গীর। রিজিয়ান ভগ্নীপতি

আহমদ—রিজিয়ার বড় ভাই, ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট

জাহির—রাশিদের হিন্দুস্থানী চাকর

কোরাল—রাশিদের P. A. (Personal

Assistant)

রাশিম—রিজিয়ার স্বামী, বিলাতফেরত

ইজনিয়র।

Lady of the Park?

রিজিয়া। আচ্ছা, যাচ্ছি :

হুম্ব বাস ও দীর্ঘ বাগী,
পাঠে শ্লেনে জামশাণী,
কম্পেন্ড-কুজ্‌খটিকা
রূপ পেলে কি আধুনিকা?

জাহাঙ্গীর। মুস্কিলে ফেললে! শেষ রঙট
দর্শন করি আগে—

রিজিয়া। দেখুন—

কমলা বনে প্রজাপতি
চরণ লঘু ক্ষিপ্ৰগতি
রক্তলাল জগ্নিশিখা
নিতে পেলে আধুনিকা?

জাহাঙ্গীর। বেশ পেলাম না। আজও না হয় ওয়া
তোমার ঐ জিজ্ঞাসার সস্তবর্ণে স্ফুট হয়ে
থাকুন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, রিজিয়া
বেগম তোমার মানস-মণ্ডল যেভাবে প্রগতি
বিচার খুঁজে ফিরছে তাতে সে কতটুকী শব্দ
তোমার নিজ দেহে আবিস্কৃত হবে
না ত? (হাস্য)

রিজিয়া। (সহাস্যে) হবেই ত! জানেন, নতুন-
পুরাতনের ভাবধারা খুব নির্বিড়রূপে
পরিপাক করেছে! যে গ্রেডের আধুনিকা
সাজতে বলেন, তাই ব'নে যেতে পারি :
একেবারে made to order.

জাহাঙ্গীর। কিন্তু পদ্য পালিত জীব ভূমি,
কত দূর চলনসই হবে, সে সম্বন্ধে
নিঃসন্দেহ হওয়া মুস্কিল।

রিজিয়া। কেন? আমার বোনকে নিয়ে ত
বিলেতও যুগ্মেছেন? আপনাদের বিবাহের
পূর্বে তিনিও ত জেনানার বান্দনী ছিলেন।
জাহাঙ্গীর। তা' বটে। তোমার বোন ত সবাইকে
জবাব করেছ। তরল-রঙীন আবহাওয়ার
ভিতর তার মানসিক উজ্জ্বলতা ও সরস
গাম্ভীর্য তাকে এক মহীয়সী মতি

অঙ্গ-দৌর্ভাগ্য দূরিত করে
অঙ্গ-বৈকল্য দূর করে



Successful Paralysis Treatment

সুখ-পদকপ্রাপ্ত প্রফেসর এ কে সাহা
চৌধুরীর সঙ্গে অঙ্গা সাক্ষাৎ করিবেন।
সাক্ষাতের সময়ঃ—বিকালে—৩টা—৭টা

সাধারণের সুবিধার জন্য সকালে ৭টা—রাতি ৯টা
পর্যন্ত মহিলা ও পুরুষ (MASSAGIST)
উপস্থিত থাকে। মেসেজের বৈকল্য, পক্ষাঘাত,
সাইটীকা, হাঁপান, জটিল ডিস্‌প্যাসিয়া, স্নায়বিক
দৌর্ভাগ্য, হাড়-বসান, রক্তচাপাধিক্য (Blood-
Pressure), বাত, পেটেবাত, মেদবৃদ্ধি ও অন্যান্য
পরোণো এথা বৈজ্ঞানিক উপায়ে অতি অল্প সময়ে
আরোগ্য করা হয়। কুচিকার হাইফোর্টের প্রধান
বিচারপতি, রায় বাহাদুর মিঃ এস্‌ সি দত্ত বলেন,
“অঙ্গ-বৈকল্য দূর করিতে প্রোঃ সাহার চিকিৎসা-
পদ্ধতি সত্যই অভিনব।” আফিসের ভিতরে কিবা
বাহিরে গিয়া চিকিৎসাও অভিজ্ঞ মহিলা ও পুরুষ
সেবক সবাই প্রস্তুত থাকে। অন্যান্য বিষয়ের জন্য
লিখুন—

Prof. Saha's Massage Home, 119/1, S. N.
Banerjee Rd., Calcutta. Phone: Cal. 3486.

ত্রিপুরা ই গুা স্ত্রী জ কর্পোরেশন

লিমিটেড

হেড অফিসঃ
১৫বি, ক্লাইভ রো,
কলিকাতা

লক্ষা আশের তুলার চাষ
বিপুল আয়তনে আরম্ভ
হইয়াছে। চাউলের কল
চলি তেছে এবং শীঘ্রই
কাগজের কল স্থাপিত হইবে।

ইহা একটি লভ্যাংশ যোজনাকারী
উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান।

জি, সি, সাহা,
মানেজিং ডিরেক্টর

“দারিদ্র্যদোষ মানুষের সকল গুণ বিনাশ করে”

আপনার উপার্জন বতাই অল্প হোক, অর্থের মিতব্যয়ে
দুর্দিনে ও অভাবিত আয়োজনে নিরুপায় হবেন না।

*

মাত্র দু চার টাকাকে যৎসামান্য বলে উপেক্ষা
না করে আজই সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করুন।

*

মনে রাখিবেন “বিস্মৃতি বিস্মৃ জল সঞ্চিত হয়ে
একদা বিশাল সমুদ্রেতে পরিণত হতে পারে।”

দি

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিতঃ—১৯২৯

হেড অফিস—৮৬বি, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। ফোনঃ কল—৫৯৪৪
অন্যান্য শাখা—বাকুড়া, ঘাটাল, টাটনাগর, নবমণীপ, বেনারস, মির্জাপুর, এলাহাবাদ,
পূর্বুলিয়া।

কাশপুর ও দক্ষিণ কলিকাতা শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।
সকল প্রকার ব্যাংকিং কার্য সুবিধাজনক সত্রে করা হয়।

Aristocracy
ANJALI
PERFUMED
COCONUT OIL
SATISH & SON
27, Jagannath Ghat Road - Calcutta

কোরামতি। বহুত দিমাকওয়ার আদমি। ওই আভেহ!

[কোরালের প্রবেশ]

আহমদ। নমস্কার কোরালবাবু।

কোরাল। আলাব আরজ্ মিস্টার—মিস্টার—মিস্টার—

আহমদ। আবু আহমদ।

কোরাল। Yea. আবু আহমদ।

আহমদ। মিস্টার রশিদ ভিতরে আছেন?

কোরাল। (ইংরেজি ভাণ্ডা সহকারে) Yes, as surely as you are here.

আহমদ। তবে বাইরে যে আউট লেখা আছে, যদি লোক চলে যায়?

কোরাল। আপনি যান নি ত?

আহমদ। না।

কোরাল। তা হ'লেই হ'ল। 'No vacancy'

লেখটা দেখেছেন ত? চাকরির চেণ্টায় যদি কেউ আসেন, তাঁদের 'thus far and no further' করে দ্যায় ওই 'আউট'। ও ডিঙিয়ে (ভাবাবেশে) সত্যিকার দর্শন-দরদারী এগিয়ে এলেই জেনে যাবেন আসল হাদিস। বৃদ্ধি খরচ করে আমিই করিয়েছি, সাহেব।

আহমদ। মানবচরিত্র অধ্যয়ন আপনার সার্থক, কোরালবাবু। যাক, মিস্টার রশিদকে একটু সংবাদ দেবেন? আমি দেখা করতে চাই।

কোরাল। আপনি বসুন, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

আহমদ। রশিদ পাকা জহুরি, বেশ মাই-ডয়্যার লোক একটি জুটিয়েছে দেখাছি।

[কোরালের পুনঃ প্রবেশ, সঙ্গে রশিদ]

রশিদ। আহমদ কি মনে করে?

আহমদ। এলাম তোমার খোস-খবরি নিতে। জীবনকে ত জোলুসময় করার যোগাড় করেছ। দেখি, তারই কিঞ্চিৎ ভাগ যদি নিতে পারি, ছোটবেলার বন্ধু তুমি।

কোরাল। আমি মেয়েদের ইন্টারভিউর ফাইল-গুলি নিয়ে আসছি স্যার। কিছু আবেদন-পত্র এখনও দেখা হয় নি।

রশিদ। আচ্ছা যান।

[কোরালের প্রস্থান]

বৃদ্ধে আহমদ? লোহার কারবারে জানান্য মলে লোকের প্রয়োজন তাই—

আহমদ। লোহাবলয়ে বন্ধন করতে চেণ্টা করছ জানান্যকে, আর অজান্যকে স্বর্ণ-শৃংখলে বন্দী করার স্বপ্ন দেখছ, না?

রশিদ। কি রকমে?

আহমদ। তোমার বিজ্ঞাপন দিয়ে। (দৃঢ়স্বরে) সত্যি বল কি চাও তুমি? ভালবাসার রোমান্স, না বিয়ে? কোনটা?

রশিদ। কোনটাই না।

আহমদ। আলবৎ, একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে।

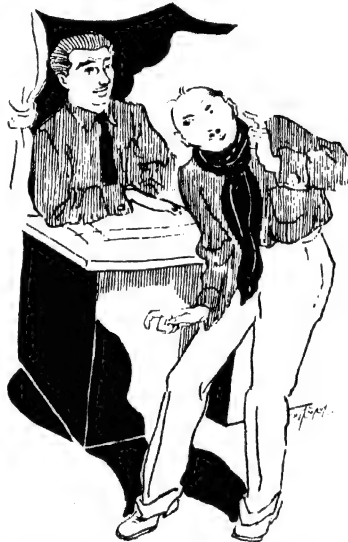
রশিদ। দেখ আহমদভাই, বিয়ে আমি আর করব না। যে পরিপূর্ণ জীবনের সাক্ষাৎ কোরোজি ওদের মেয়েদের মধ্যে, তার এক কন্স দিয়েও এখনও কেউ আমাকে সার্থক

করতে পারবে না।

আহমদ। (সংশ্লেষে) তাই অতি-আধুনিক সেক্রেটারী নিযুক্ত করে সাগরপারের নির্দেশ নারী-সংগম্পৃহাটিকে সাবলীল রাখতে চাও? নয় কি? (স-নিশ্বাসে) যাক, রিজিয়া সম্বন্ধে তোমার শেষ মত জানতে চাই।

রশিদ। (দ্বিধাভরে) তার স্ত্রীত্ব ত অস্বীকার করছি না, তবে পদারি অস্বীকারে যে মানুষ, সঙ্গিনী হিসাবে সে অনেকটা অচল—

আহমদ। রশিদ, তুমি রিজিয়াকে দেখ নি পর্যন্ত। শব্দ 'আখুত' হয়েছিল, বিলাত যাওয়ার তাড়াহুড়োয় শব্দ-দৃষ্টিটা পর্যন্ত হয় নি। (মিনতিভরে) তুমি একবার নিজেই যাচাই করে দেখ না আধুনিক সাহিত্য ও



দেখুন ত স্যার, এইটাকে আপনার চেহারা দেখা যায় কি?

জীবন সম্বন্ধে সে কিরূপ সজ্ঞান? She can play the girl of to-morrow if you choose so, তার সম্পূর্ণ শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছে সেইভাবে—

রশিদ। Well, one of the earth is worth a dozen girls of theory.

আহমদ। রিজিয়া বলে, "খোদা সহজেই না দিলেন যদি, তবে জবরদস্তির বিড়ম্বনা থেকেও তিনি রক্ষা করুন।" তাই তোমার রক্ষা। নইলে, (কঠিনস্বরে) তোমার পক্ষী-রাজ মনটার বলগা টেনে খুঁশিমত চালাতে পারি, তা জান?

রশিদ। হাঁ, তা জানি, কারিগরে সত্য দিয়ে।

আহমদ। Fine. স্বরণশক্তিটা প্রথরই রেখেছ, দেখাছি। আঁস তা'হলে। কি বলব? (ভাণ্ডা-সহকারে) Ta-Ta না Cheerio.

[হাস্য ও প্রস্থান]

কোরাল। (নেপথ্যে) আসতে পারি, স্যার?

রশিদ। আর্গুন।

[কোরালের প্রবেশ]

কোরাল। ইন্টারভিউর বাকি কাজ আজই শেষ করে দেবী যাক।

রশিদ। আচ্ছা থাক। আমার ঘনটা বেন কেমন উদ্ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখুন ইন্টারভিউর তারিখ দু'সপ্তাহ পরে দিন।

[স্টেজ দ্বিগ্ল সেকেন্ড অন্ধকার থাকলো, কিছু সময় অজিবাচিত হয়ে গেল তাই প্রকাশ করতে। আলোবিকাশের পর দেখা গেল রশিদ ও কোরাল ফাইল দেখছে। রশিদ কলিং বেল টিপল।]

জহির। হুজুর।

[জহিরের প্রবেশ]

রশিদ। দরখাস্ত করণেওয়ালি আওর কোই বাকি হ্যায়?

জহির। জি নহি।

রশিদ। আচ্ছা, তোম' যাও।

[জহিরের প্রস্থান]

কোরাল। সবার ইন্টারভিউ ত শেষ হয়ে গেল।

এখন মন কিছু স্থির করতে পারলেন, স্যার?

রশিদ। এই ত আপনাদের সব মেয়ে। এতগুলি বি-এ, এম-এ! কিন্তু মনে হয় মানসিক তীক্ষ্ণতা ও জীবনের প্রাচুর্য এদের মধ্যে তেমন marked নয়। আপনিও ত আধুনিকার একটা তালিকা দিয়েছিলেন? কেউ ত তেমন উত্তরাতে পারলেন না। বুঝাই আপনার নাম পরিবর্তন করেছিলাম, কোরালবাবু। আপনার পছন্দ দেখাছি সেই মান্যতার আমলেই পড়ে আছে।

কোরাল। বলেন কি স্যার। মেয়েদের যেসব টাইপ ইনভারসিটি জীবনে বন্দনা পেয়েছেন, তারা সবাই আমার লিষ্টে বন্দিনী ছিলেন। রশিদ। নারীপ্রগতি, মানে 'নারী রোশনী'র খোঁজ রেখেছিলেন বহুকাল?

কোরাল। হ্যাঁ—

টাক-প্রশাস্তিই বাদ সাধল।

রশিদ। (সহাস্যে) সে কি রকম?

কোরাল। দেখুন ত স্যার, এই টাকে আপনার চেহারা দেখা যায় কি?

[মস্তক নত করণ ও ঘুরিয়ে দেখান।] রশিদ। না। দেখি দেখি ভাব হয় বটে, কিন্তু দেখা যায় না।

কোরাল। যায় না ত? কিন্তু প্রগতিপারায়ণ্য বলতেন, এই টাকটা নাকি আশির মত। বানান ধরতেন, "মাথাটা একটু নীচু করুন না! খোঁপাটা ঠিক করে নিই।" কিম্বা কেউ ধাঁ করে মাথা নুইয়ে তাঁর মুখের সম্মুখে নিয়ে সলুতুভাবে বলতেন, "হাফ, লিপ-পেট্টা লেপটে যায় নি।" এইরূপ চলন্ত ড্রোিং টেবিলরূপী হয়ে তাঁদের সমাজ আমার পূর্বেকার সচ্ছল গাঁত হয়ে উঠল, সময় বিশেষে, Spanish Tango ও সময় বিশেষে রাঁধবেশী নৃত্য।

[দুদুটা নাচেরই আভাস হস্তের সামান্য তন্দ্রাভিত্ত প্রকাশিত হল।] যে আমাতে তারা পেত ইন্টরেক্ট, সেই আমি হয়ে উঠলাম ইন্টরেক্টেণ্ড।

রশিদ। (হেসে) শেষে পাগিয়ে বচলেন?



রমিলা

লৌপসর্গ চর্চার

প্রিমেক্ট সারান ব্যবহার করেন।

মুখশ্রী স্কুলের মেয়ের মত অটুট রাখার
সবচেয়ে সোজা উপায় "প্রিমেক্ট" সারান মাখা।
ইহাতে আগনার ঝক নিঃস্ব কমনীয়তায়
সম্পূর্ণ ও সম্ভাষিত হইয়া উঠিবে।

রমিলা

খ্যাতনামা চলচ্চিত্র

অভিনেত্রী

ঘনীভূত উন্মত্ত

তৈল হইতে

প্রস্তুত।

মোদী সোপ ওয়াক্স

মোদীনগর, বেগমাবাদ, ইউ পি

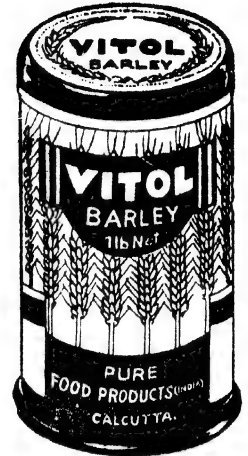
ম্যানেজিং ডিরেক্টর: রায় বাহাদুর গঙ্গাজল মোদী।



জাতীয় স্বাস্থ্য গঠনে—

ভাইটল বার্লি

একমাত্র উপযোগী



পিওর ফুড প্রোডাক্টস (ইণ্ডিয়া)

৮১নং সিকদারবাগান জুটী, কলিকাতা।



বিশুদ্ধ স্বর্ণের
সুন্দর অলংকার
নির্মণেই আমাদের
বৈশিষ্ট্য।

স্থাপিত—১৯৫১

ডি, এন, চৌধুরী

—এও কোং—

জুয়েলার্স

সান্ অফ

এম, এস, চৌধুরী

১০২, বহুবাজার জুটী,
কলিকাতা।

GANESH

Brand
MUSTARD OIL

CONTROLLED RATES

বিশুদ্ধতার নিদর্শন গবর্ণমেন্টের
"আগমার্ক" শীল দিয়া বিক্রীত
হয়।বাজারে ছাড়ার পূর্বে প্রত্যেকটি টিন
কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়। ৫ সের ও
২৫ সেরের টিনেরও পাওয়া যায়।

PRAG OIL MILLS DEPOT

খান্ড রোড ১নং জেটী, কলিকাতা এবং ঝুলনা

ফোন—ক্যাল ১৬৫

কোরাল। (সহাস্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ।
রশিদ। যাক্, এখন দেখুন ত লিস্টটা। কে
কিরূপে নম্বর পেলেন?

উত্তরের নিজ নিজ ফাইল দর্শন।
কোরাল। এই ত, Top করছেন মিস্ চিত্রাংগদা
সেন।

রশিদ। বাপরে! নামটা কি জবরজগৎ। ওই নাম
বহন করে আধুনিকার মাপকাঠিতে কারও
উদ্ভোগম্যই হওয়া অসম্ভব।

কোরাল। না স্যার, অমন কথা বলবেন না।
কলেজে উনি ছিলেন মিস্ চিত্রা, তম্বী
ভরণী। ছেলেরদের মধ্যে শুনোই, গুর
চয়ের উচ্চারণের উপর নির্ভর করত বহু

স্বী-ট্রা

[জ্ঞানকভাবে খুঁসি হয়ে]
এই! এমন একটি শব্দ হত। তার নামের
সেই বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য চলত ছাত্রদের
মধ্যে Phonetics-এর কসরৎ। সেই যে
সি-সি-স্বীট্রা এখন হয়েছেন চিত্রা-ংগদা,
কেন জানেন?

রশিদ। (সহাস্যে) না, কেন?

কোরাল। সেই তম্বগণী শব্দের মধ্যে ছাই দিয়ে
ভিতামিন পুষ্টি হয়েছেন। কাজেই,
পূর্বকাল অঙ্গদা জড়িত হয়ে নামটি দেহের
ব্যালেন্স রক্ষা করছে, স্যার! (হাস্য)



তবে কেন এমন মনে হাচ্ছিল বলতে পারেন?

ছেলের আধুনিকতা। ডাক্তার সুস্মিতের
নাম ত জানেন? গুর 'চটা' তাঁর নামের
শ্বিতীয় সয়ের উচ্চারণে—

[কঠিন উচ্চারণকে আয়ত্তে করার চেষ্টা ভগ্নাংগে।]
সিট্রা—

shrug করে—

হ'ল না

শ্বিট্রা

উ—

উচ্চতর ভাবে

[মাথা নেড়ে]

রশিদ। আপনার সি-সি-স্বীট্রা top করেছেন
বটে, কিন্তু টপকাতে পারেন নি? কৃষ্ণিতে
এগার নম্বর পেয়েছেন, বার ছিল quali-
fying mark, তাই নয় কি?

কোরাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

[কাইলো ত্রুণ্ডত অবস্থায়]
রশিদ। গুর পরে হচ্ছেন—মিস্—মিস্—

[নাম বন্ধে অপারগ, বানানে
উদ্ভার-প্রচেষ্টা—]

T-O-W-E-I, টাওয়ার! টাওয়ার! টাম্বার
প্যালিটে—

[প্রথক-প্রচেষ্টায়]

[পুনরায় উচ্চারণ—]
Miss Towei Tumber Palitte—

[মনের মত হ'ল না; মাথা বেড়ে]
নাম; নামটার acoustics ভুলে গেলাম
যেন! শুনোইলাম ত candidate-এর কাছ
থেকে, দেখুন ত উদ্ভার চলে কিনা?

কোরাল। [বানান করে] P-A-L-I-I-T-T-E:
প্যালিটে! [চিন্তাযুক্তভাবে] কোন
মেয়েটি? —which girl? —[হঠাৎ]

ওহ্ হো! উনি মিস্ টাইটম্বুর পালিত!
রশিদ। টাইটম্বুর পালিত! Gosh! নামটা
কি outrageously modern! টাইটম্বুর
—tiptop! আচ্ছা, উনি পালিত লিখতে
শেখে। E দিয়েছেন কেন?

কোরাল। ওটা বুঝলেন না স্যার, ডাক্টে—
গোটে—প্যালিটে—সম গোষ্ঠী বলে মনে
হয় না কি? ছোট্ট একটা E কিন্তু দেখুন
দিয়ে কিরূপ একটা continental
touch? আবার পুরণ পন্থায় চলতে চান,
সো ডি আচ্ছা, পালিত কন্যাকে স্মিরাং
'টপ' করে শেষের E-টাই ই-কারের সামিল
করুন।

রশিদ। [হেসে] তা' কেমন করে হয়?
পালিতের স্মীলিগে 'আপ' হবে ত?
পালিতা?

কোরাল। না, না, স্যার! [প্রচেষ্টাভাবে জিহ্বা
কাটলে] পালিত—রক্ষিত, একই অর্থ।
আ'কার যুক্ত হলে লিঙ্গ পরিবর্তন হয়
বটে, কিন্তু 'স্মী' থাকে না। রক্ষিতকে
try করে দেখুন না। বড় disconcerting!

[উত্তরের মন-খোলা হাসি]
রশিদ। আচ্ছা এর পর কে কে কবান
পেয়েছেন?

কোরাল। মিস্ রোকেরা খাফুন ও মিস্ স্তিন্দ
এলজেন্ড, এন, সি।

রশিদ। এন, সি আবার কি?

কোরাল। কেন? নেটিভ খুঁটান।

রশিদ। ও, তা হলে একবারে Cosmopolitan
Collection হয়েছে দেখছি।

কোরাল। হ্যাঁ, স্যার। আর মিস রোকেরা হ'ল
সেই বব্‌ড্‌ চুল মেয়েটি। গুর নম্বরটা
কিছু বেশী হওয়া উচিত ছিল। যা হোক
বব্‌ড্‌ চুল ত?

রশিদ। কোরালবাব, বব্‌ড্‌-চুল দেখে কিছ
আশাও হয়েছিল, মনে করেছিলাম এতদিনে
মুসলিম মেয়েরা বৃদ্ধি অগ্রগতিতে অংশ
গ্রহণ করল। ও খোদা! বললেন, মাথার
উকুন হয়েছিল বলে অশ্লি করে বব্‌ড্‌
কেটে তার হাত থেকে পরিচাপ পেতেছেন।
Phooh! নম্বর ঘাট করে কেটে দিচ্ছিলাম
আর কি? কিন্তু আধুনিকার awful
frankness-এর জন্যই অত নম্বর পেয়ে
গেলেন। সব হোপলেস্।

কোরাল। তাহলে কি ঠিক হ'ল?

রশিদ। কেউ নিমিত্ত হ'ল না।



**ঘোষ
প্রদীপ
জুয়েলার্স**

১১৪, কলেজ ট্রাট, কলিকাতা
ব্রাঙ্ক:

ডলপাইণ্ডি

ফোন: বি.বি. ২২৫৯

‘বাংলা ভাষায় রোমাণ্টিসিস্‌মের নূতন আশ্বাদ’

‘মরণ ও মরু’

১৫০

অপূর্বকুমার মৈত্র

‘পথের শেষে’

১

অপূর্বকুমার মৈত্র

পাবলিশার্স—দি বুক কোম্পানী লিঃ
কলিকাতা

ব্যাঙ্কিং ভারতের গোড়া পত্তনে যে প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল অগ্রণী
উহাদের অন্যতম

নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত)

হেড অফিস:
কুমিল্লা

কলিকাতা অফিসসমূহ:
ক্যানিং স্ট্রীট, বালীগঞ্জ, কলেজ স্ট্রীট, শ্যামবাজার।

অন্যান্য শাখা—

ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্ধমান, খুলনা, শিলচর, শিলং,
তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী ও এলাহাবাদ।

এজেন্সী:—ভারতের বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্রে

সেভিংস ব্যাঙ্ক, চলতি এবং স্থায়ী
আমানতের হিসাবে নিম্নাপদে টাকা
রাখার ব্যবস্থা আছে।

উপযুক্ত সিকিউরিটিতে টাকা দান,
ড্রাফট, টি—টি বিক্রয়, বিল ডিসকাউন্ট
প্রভৃতি ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কিং কার্য
করা হয়।

কোরাল। Then I continue to play the role of the secretary and the P.A.—the beauty and the beast—
রশিদ। Well said, Coral Babu. The beauty and the beast. [হাস্য]

[জাহিরের প্রবেশ]
জাহির। হুজুর, একটো মিস-বাবা আয়ী—
রশিদ। মিসবাবা কিরে? গাউন পরে এসেছেন?

জাহির। জি নহি, বহুত খাবসুরত আওর জুতাকা হিল বহুত উচা।

রশিদ। ক্যা, এহি দোয়াত কা মাফিক—

জাহির। উওহ্ ত উছকা আধাই হোয়েগা, হুজুর।

রশিদ। স্মিত মুখে কোরালকে দেখুন ত আশা-প্রদ মনে হচ্ছে—
কোরাল। এই যাচ্ছি।

[কোরালের হান্স ও প্রস্থান]

রশিদ। জাহির মিয়া?

জাহির। জি হুজুর।

রশিদ। আনেকা ওকত্ তোমানে দেখা? কেয়ছা আয়ী?

জাহির। জি হা হুজুর দেখা, বহুত ঠাট ছে আয়ী।

রশিদ। হম।

[একখানা Visiting Card নিয়ে জোরালের প্রবেশ]

কোরাল। এই কার্ড দিয়েছেন, উনিও একজন candidate.

রশিদ। দেখি, [কার্ড নিয়ে পড়ে] এ কি নাম লিখেছেন? Lady of the Park? মানে কিছু বুঝলেন?

কোরাল। না ত!

রশিদ। দেখতে সুন্দর?

কোরাল। Exquisitely, তুলনা হয় না।

রশিদ। বেশ ডাকুন।

[কোরালের প্রস্থান]

রশিদ। জাহির!

জাহির। হুজুর।

রশিদ। মেম সাহাব কোন 'বার্ভাচিত' করেছে তোমার সংগে—

জাহির। জি হুজুর, ধোড়া বহুত কিয়া। পছা, "তোমার সাহেব কা সাদি হইচে—"

রশিদ। সে কি, প্রথমেই বিয়ের কথা? তা' কি বল্লো তুমি?

জাহির। বোলা, নোহি হয়।

রশিদ। 'নোহি হয়'! হয় নাই বললে কেন?

জাহির। ক্যা জানে, মনসে বোলা কহনা ঠিক নোহি হোয়া—

রশিদ। তুমি ত দেখি গোড়ায়ই গেরো ফেলবার বন্দোবস্ত করেছে।

[নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করে]

এই যে আসছেন, হ্যাঁ সুন্দরই বটে—

[কোরালের পড়াতে Lady of the Parkের প্রবেশ]

L of P. Good morning.

রশিদ। Good morning. [হস্ত প্রসারিত করে] এই নিন হাত, shake করতে কোন আপত্তি নাই ত?

L of P. Not at all.

[হাত এগিয়ে দিল করমন্দের জন্য,

রশিদের হাতে হাত রয়েই গেল]

রশিদ। How do you do?

L of P. How do you do?

রশিদ। আচ্ছা, এবার বসুন—

L of P. হাতটা ছেড়ে দিলে বসতে পারি।

[হাস্য]

রশিদ। Oh, I see হাতখানা আমার হাতে বন্দী হয়ে আছে দেখছি, মনে হচ্ছিল যেন কতকালের পরিচয়।

[হস্তমোচন, বসতে বসতে]

আপনাকে দেখেছি কিম্বা কোন আলাপ



রশিদের সন্ধে হাত রাখলো।

হয়েছে বলে ত মনে হয় না। তবে কেন এমন মনে হচ্ছিল বলতে পারেন?

L of P. হ্যাঁ, পারি। আচ্ছা ধরুন, আপনি ঘুমের ঘোরে খাট থেকে আছাড় গেলেন।

স্বপ্নে 'Time and Space'এর কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই ত? কোল বালিস নিয়ে উল্টানো থেকে মাটিতে পড়ে যাওয়া, এই যে মূহূর্তটি, এরই অনুভূতি নিয়ে

আপনার মিস্তক প্রকাশ একটা স্বপ্ন তৈরী করে ফেলল; স্বপ্নটা হ'ল হয়ত বর্ষব্যাপী বহুৎ একটা adventure-এর।

তার শেষের পতনটা দেখলেন বিমান থেকে হ'ল। এই সম্পূর্ণ অভ্যুত্থানের অনুভূতি ওই একটা মূহূর্তের ভিতর রূপ পেল ত?

রশিদ। হ্যাঁ, তা পেল।

L of P. তা হলে দেখছেন, মূহূর্ত কাণিক হলেও তার সিদ্ধি

থাকতে পারে যুগযুগান্তরের—ঠিক

সিনেমার flash back-এর মত—

রশিদ। [মৌহুতভাবে] সুন্দর বিচার শক্তি আপনার চমৎকার দেখছি—

L of P. না চমৎকার কিছই না। নানা চিন্তায়, নানা কল্পনায় সেক্টোরীর একটা

স্বরূপ আপনি মানস-চক্ষে দাঁড় করিয়ে-ছিলেন ত? আমাকে দেখে সেটা অনেকটা

visualised হয়ে গেল, তাই এত পরিচিত লাগছিল।

রশিদ। হবও বা। কিন্তু তার অতীত মনে হচ্ছিল কিছই। আপনার নামটা ত এখনও জানতে পারি নি—

L of P. ওই Lady of the Park. দেখুন Emille Zola-র লেখা পড়ার পূর্বেও

আমার মনে হত যে নামটা মানুষকে অনেকটা প্রজুড়িস করে দেয়। কাজেই

পরিচয়ের প্রথমেই নাম দিয়ে একটা অনু-কূল Balance Sheet খোলা আমি

সমীচীন মনে করি না। পাক সাক্ষীসএ থাকি শোধ তাই প্রকাশ করছে ঐ কার্ডটা—

রশিদ। আপনি ত দরখাস্তও করেন নি?

L of P. দরখাস্তের নিষাৎ আত্মপূর্তির জঞ্জাল ঠেলে, পাঁচ মিনিটে, আমার

সত্যিকার রূপ উদ্ভার চলত কি? বরঞ্চ এই ইঠাৎ পরিচয়ের back ground-এ

কথার ফাঁকে, আমার একটা হাস্যকর মিটে ছবি রূপায়িত হওয়া সম্ভব, নয় কি?

রশিদ। রাইট ও! আপনার পড়াশুনা ভালই দেখছি—

L of P. আপনার বিচার শক্তি প্রশংসাহী।

রশিদ। কোরালবাবু।

কোরাল। আজ্ঞে স্যার।

L of P. ও ও'র নাম বন্ধি প্রবাহ বাবু?

রশিদ। হ্যাঁ, আমার P.A., ওর আসল নাম জানলেন কি করে?

L of P. বাবু! প্রবালের handy ইংরেজী কোরাল রয়েছে যে,—আর আপনার পাচ্চাত্য

প্রীতি কারও অবদিত নাই।

রশিদ। You are really brilliant [হাস্য] ঠিকই ধরেছেন, কিন্তু নাম পরি-

বর্তন করেও ত ও'কে মর্ডান করা গেল না।

L of P. না না বলেন কি? আমার নমুখে গিয়ে এত নিখুঁতভাবে bow করলেন, যে

আমার লকেটটা তাঁর মাথার স্থান বিশেষে সোনালী আভাষ ঝলসে ওঠায় মনে হ'ল,

"ইঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে বজ্রহাল করে চিত্র—"

[তৈসজনেরই ছোট হাসি]

রশিদ। বিউটি! নিন কোরালবাবু, You are reclaimed. আপনার টাকটায়ও শেষ

পর্যন্ত গতি হতে চলে। একে সেক্টোরী রাখলে আপনার পালাতে হবে না, ত?

কোরাল। না স্যার, একে ত আমাদের ভালই লাগতে, লাগতে না কি?

রশিদ। হ্যাঁ, আপনার যখন লাগছে—

মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ

১নং কে, জে,
পল্লিমল্ল নম্ব্য

মাদ্রাজী কড়া "র" নম্ব্য

গোল্ডেন স্টেম্পাল কড়া "র" নম্ব্য
"আর, বি"

রোজ ও জেসমীন নম্ব্য

গন্ধে, গন্ধে, বিশুদ্ধতায় অতুলনীয়

মহাশূরের সুবিখ্যাত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মার্কা

সুগন্ধি পারিজাত ধূপ

অতুলনীয়, সুমধুর গন্ধ-সৌরভে তৃপ্তিদায়ক
পাইকারী ও খুচরা ভিঃ পিঃতে পাইবার
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সুশীলকুমার পাল

এও ব্রাদার

নম্ব্য, ধূপ ও মনিহারীরা

পাইকারী বিক্রেতা—

গ্রাণ্ড—৬৯।৪৪নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

হেড অফিস—

১০-৩, বেনেটোলা লেন, কলিকাতা

এ, কে, নাগের

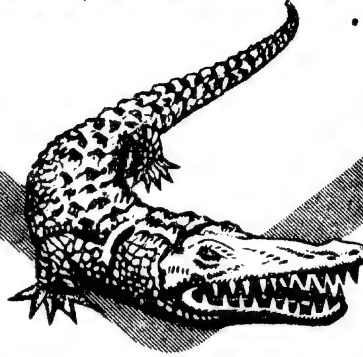
অনন্তশক্তি

সালমা

বাত, বেদনা ও রক্তদুষ্টির
মহৌষধ।

বাজারে প্রচলিত সালসামসমূহের মধ্যে বহু-
শরীক্ষিত প্রভেদ ঐযথ। শরীরস্থ দূষিত রক্ত
বিশুদ্ধ করিয়া দেহে নতুন রক্তকণিকা সৃষ্টি
করে। বাহ্যিক দীর্ঘদিন বাত বেদনায় ভুগিয়া
চলন্তাঙ্গীন হইয়াছেন বা মেহঘটিত দীর্ঘদিনের
বাত, হাত-পা ফোলা, গাট কন্ কন্ করা যত
রক্ত উপসর্গ থাকুক—ইহা ধ্বংসকারি যত
কার্যকরী। ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কারক, কৃষ্ণা-
বৃন্দিকর ও বলকারক ঔষধ। রক্ত ও ভ্রম-
শ্বাসের পরম ঔষধ। সকল ঋতুতে গ্রহণীয়।

সর্বত্র এজেন্ট ও ষ্টকিস্ট চাই

অফিস—৬০/১, ওয়েলিংটন স্ট্রীট,
কলিকাতা।এই মার্কাটির উপর
নজর রাখবেন

একবার জুড়লে আর ছাড়েনা

গ্রিপেক্স অফিস পেট ও লিক্‌উইড গ্যাম্ ব্যবহার করে যারা
সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারা নিশ্চয় জেনে খুশী হবেন যে এই গদের প্রস্তুত-
কারকেরা এখন নানাবিধ অফিস স্টেশনারী তৈরী করতে শুরু করে-
ছেন। এঁদের তৈরী ফাউন্টেন পেনের কালি, অফিস ফাইল
ইত্যাদির উপর কুমীর-মার্কাটিই এঁদের বিখ্যাত গদের সমতুল্য
উৎকৃষ্টতার পরিচয়-চিহ্নস্বরূপ।

গরুহীন-তড়াতাড়ি জোড়ে

গ্রিপেক্স

ইন্ডিয়ান গ্রাউ

অফিস পেট এবং লিক্‌উইড গ্যাম্

গ্রিপেক্স (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

সি ৬, রাইড বিল্ডিং, কলিকাতা

টেলিফোন ক্যালকুলা ৪৫৫২

ক্যাম্পবী : ১২, ডাফর বোড, গিলিয়া

কোরাল। আর আপনারও যখন লাগছে, স্যার—
রশিদ। Lady of the Park আপনি
নিযুক্ত হলেন।

L of P. Thank you.

রশিদ। জিহর, তোমার মিসিবাবাকে শেষ
পর্যন্ত রাখা গেল। ভাল করে খেদমত
করবে, বুঝেছ?

জিহর। জি হাঁ, হুজুর! মেমসাহাব বহত
আচ্ছা হ্যার—

উঁচা হিল, দরাজ দিল,
আছে ঠাট, মিঠি বাত,
খোড়া হো ত উনিশ বিশ
সব মেটাটা বকশিশ।

রশিদ। ও ব্যাটা প্রায়ই শ্লোক আওড়ায় মিস্
পার্ক।

L of P. আপনি Woodhouse-এর
Jeeves-এর একটি ভারতীয় সংস্করণ
জুটিয়েছেন দেখছি। [হাস্য]

রশিদ। [সহাসে] Jeeves. There you
are. ও আমার প্রায়ই তাই। ওর শ্লোকের
শেষের অংশের মানে—আপনার কাছে
বকশিশ আশা করছে—

L of P. আজে ন্য, মানে বকশিশ ভাল রকম
আগেই পেয়ে গেছে। I am English in
that sense. [হাস্য]

রশিদ। [সম্মিত] তাই ত দেখছি, প্রথমে tip

দেয়াটা ইংরেজী মতে যে অতীব কার্যকরী,
তা' আপনিই দেখালেন। ও আপনার
সম্বন্ধে, তাই, সু-কথায় পণ্ডিত হয়ে
উঠেছিল।

কোরাল। স্যার বিজ্ঞাপনের শেষাংশে দৃষ্টি
আকর্ষণ অবান্তর হবে কি?

[মস্তক ক'তুরন]
রশিদ। তা,—তা থাক্। নিযুক্ত যখন হয়েই
গেছেন—তখন—

L of P. বিজ্ঞাপনের শেষাংশে? ও, ঐ
গানের কথা—বেশ, তা'হলে মিলটার রশিদ
অনুমতি দেবেন কি?

রশিদ। বিলম্ব, অনুমতি দেব না? নিশ্চয়ই—
নিশ্চয়ই—

L of P. গান

আজকে তুমি পেলে দেখা

পথের বাঁকে,
হে প্রিয় মোর, দেখলে তাকে,
চিনলে না কে?

কণ্ঠ ভরা গান যা ছিল
অঞ্জলি তার নিবোধিল,
রত্তরাগে রাগিয়ে নিল
সুন্দর তার, কল্পনাকে।

[সকলের প্রস্থান]

[স্টেজ এক মিনিট থালি পড়ে থাকল, তিন মাস
অতিবাহিত হয়ে গেছে তাই বোঝানোর জন্য।]

রশিদ। Miss Park, তোমাকে আমি Lady
of the Park-এর পরিবর্তে 'মিলেডি'
কিন্মা আরও ছোট করে 'মিলি' বলে
ডাকব। তোমার কোন আপত্তি আছে কি?

L of P. না, ডাকায় আমার আপত্তি থাকবে
কেন? 'মিলেডি'—অর্থাৎ My
Lady ত? তা'হলে সে হল আপনার
নিজস্ব কল্পনা-সুন্দরী। আপনার সঙ্গে
টারী সম্বন্ধে যে কল্পনা তা' যদি আমাতে
মুটিমুটি হয়ে থাকে, তবে আপনার
'মিলেডি' ডাক নিশ্চয়ই আমাকে সার্থক
করবে।

রশিদ। না, না, আমি তোমাকে দিতে চাই যে
সহজরূপে তাকে তুমি করতে চাও অপরূপ।
পড়েছ, 'শা-জাহান':

"জ্যোৎস্না রাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেরণীরে

যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে কানে ডাকা রেখে গেলে
এইখানে

অনন্তের কানে"—

এ সেই নাম, এ সেই ডাক।

L of P. [সম্মিত] আপনি প্রথমদিন যে
প্রোগ্রাম দিয়েছিলেন, তাতে ত এরূপ
ডাকের অবকাশ ছিল না।

রশিদ। কিন্তু ডাকটা যে আমার জীবনে সত্য
হয়ে উঠবে তাঁকি আমিই বুঝতে
পেরেছিলাম?

L of P. কেন বুঝতে পারবেন না? আমার
সম্পর্কে, জ্যোৎস্নার তলে ভাঙ্গা ঢেউদালি,



প্রাক্তজনের জন্য কয়েকটি তত্ত্ব

১৯২১ সালে : বাঙ্গলাদেশে যখন বম্বকী ও দাদনী কারবারকেই ভাল
কথায় ব্যাংকিং বলা হইত—বাঙ্গলার ব্যাংক যখন
শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই, তখন বাঙ্গলার
অধিবাসীদিগকে বাণিজ্যগত ধারায় ক্রমোন্নতিমূলক
ব্যাংকিং ব্যবসায়ের সুবিধাদানকল্পেই ইন্টবেঞ্চাল
কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৩০ সালে : বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাংকিং তদন্ত কমিটি অভিমত প্রকাশ
করেন :—"জমিদারী ও তেজারতী কারবার প্রভৃতির সঙ্গে
সঙ্গে ব্যাংকিং ব্যবসায় চালানোর পুরাতন প্রথা অধুনা
ক্রমশঃ ত্যাগ করা হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়,
কলিকাতায় বাঙ্গালী ও বাঙ্গালী পরিচালিত অধিকাংশ
প্রতিষ্ঠানই কালকাতার গৃহসম্পত্তির বিনিময়ে টাকা দান
করিয়া থাকে। কিন্তু এমন কয়েকটি ব্যাংকও আছে
যাহারা বম্বক ব্যাপারে দাদনের অপ্রাংশ মাইই শব্দ
বিনিয়োগ করেন। এমন কি মফস্বলে পর্যন্তও বম্বকী
কারবার করেন না, এমন প্রতিষ্ঠান আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ
বলা মাইতে পারে যে ইন্টবেঞ্চাল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ
(হেড অফিস ময়মনসিংহ) শব্দ নামে নয় কার্যেও একটি
কমার্শিয়াল ব্যাংক। ইহা ব্যবসা বাণিজ্যের পূর্জি
জোগানোর ব্যাপারে নতুন পথ প্রদর্শন করিয়াছে।

১৯৪৪ সালে : "ব্যবসা বাণিজ্যের পূর্জি জোগানোর নতুন পথ প্রদর্শন
করার" পর হইতে এই ব্যাংক আজ পর্যন্ত বহুসংখ্যক
জাতীয় শিক্ষাব্যবসায়কে পূর্জি জোগাইয়া আসিয়াছে এবং
আধুনিক ব্যাংক ব্যবসয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ইহার পরিচালক-
মণ্ডলী চিরদিনের মত আজও আপনাদের সেবার
নিয়োজিত।

দ্রি

ইষ্ট বেঞ্চল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ

হেড অফিস—ময়মনসিংহ, কলিকাতা অফিস—১৫, ক্লাইভ স্ট্রীট

Carbon Compound-এর না হয়ে ও আপনার কাছে হীরক বলে মনে হয় নি কি? গভীর রাতে কিংকিং ডাক Rolls Royce Machine-এর revetting-এর মত আপনার কাছে মিষ্টি লেগেছে, জলে ডোবা ঘাসের ও সিল্ক ধুলোর মিষ্টি গন্ধ, পেট্রল ও মবিলের সুগন্ধ ঘ্রাণের মত আপনার প্রাণে আবেশ চলেছে। কল ও কম্পনা একছা হয়েছ আপনাদের মনে। ওরূপ একটা ডাক আসি আসি করছে আপনার জীবনে, এতেও কি তা' বৃদ্ধিতে পারেন নি?

রশিদ। তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? মিলি।

L of P. ঠাট্টা নয় মিষ্টার রশিদ! [দৃঢ় বিশ্বাসের স্বরে] তবে অনুভূতিটা একটু দ্রুত হয়ে গেল—বিসদৃশ অল্প সময়ের মধ্যে কিনা? তাই—

রশিদ। তুমি কি বলতে চাও যে স্বপ্ন এসেছে বলে এ সত্যিকার নয়—

L of P. সত্যিকার বলেই ত ভয় বেশী। যে ডাক দ্রুত আসে, জীবনে নিত্য নরনারী সান্নিধ্য, তার ত একাধিকবারই আসবার কথা।

রশিদ। তুমি কি মনে কর আমি সেই পদার্থ? L of P. লীলাময় পদার্থেরা ত জানি একই মাটির তৈরী।

রশিদ। [গম্ভীরভাবে] Miss Park, যথেষ্ট হয়েছে, বাস্। আপনি আমার মধ্যে আর কোন দুর্বলতা দেখতে পাবেন না—

L of P. আপনি রেগে গেলেন মিষ্টার রশিদ? [গাড়ি স্বরে] আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, অনেক ঠেকে এ কথা বলছি, যদি জানতেন—

রশিদ। খুব জানি। গাড়ি কাটার সময় থেকে, ফুলে ফুলে উড়ে ফেরার সময় পর্যন্ত, প্রজাপতির বিচিত্র জীবনের ইতিহাস আমার অজানা নাই—

L of P. [সংবেদে] আপনি অথবা রুঢ় ব্যবহার করছেন—

রশিদ। তাই, আপনার—আপনাদের প্রাপ্য—

L of P. [উজ্জ্বল হয়ে] আপনি না বিলেতের শিক্ষার বাহাদুর করেন? একটি মেয়ের মন অনেকটা জানতে পেরে, তারই উপর অথবা ক্রেশ দেয়ার প্রবৃত্তিকে সংযত করতে আজও আপনি শেখেন নি! এমনি করে

আমাকে দৃষ্টাচ্ছেন—কী করেছি আপনার; রশিদ। [গাড়ি স্বরে] মিলি।

L of P. বলুন।

রশিদ। দেখছি, আমার ভুল হয়েছিল। আমি ঠিক ধরতে পেরেছি, যে রংগের খেলা আমার আকাশ বাতাসকে আচ্ছন্ন করেছে তার ছোঁয়া তোমারও লেগেছে। নয় কি? L of P. কিন্তু আমাদের, আধুনিক আধুনিকাদের মনে এর অরুণিমা ত ক্ষণস্থায়ী হওয়ার কথা।

রশিদ। হোক ক্ষণস্থায়ী, তবু ত প্রকাশ করবে, জীবনে অন্ততঃ • একবার চাওয়ার মধ্যে পায়ওয়ার দৃষ্টি বদল হয়ে জীবনটাকে রংগীন করেছিলঃ

“নিজের গানের বাঁধিয়া ধরিতে
চাহে যেন বাঁধী মম,
উত্তলা পাগল সম।

যারে বাঁধি ধরে, তার মাঝে অীর
রাগিনী খুঁজিয়া পাই না।

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।”

তোমার মূখের বাণীতে, আমার বাঞ্ছিত রাগিনী ক্ষণেকের জন্যও যদি ঝঙ্কার নিয়ে ওঠে, তবে সেই ক্ষণটাই, আমার জীবনে হবে, অনন্ত।

L of P. বেশত, বাণী না হয় প্রকাশ করলঃ আপনার মনে যে রংগের পরশ তা আমাকেও ছুঁয়েছে। কিছু যাবে আসবে তাতে?

রশিদ। সে খতিয়ান আমি করব না। এই জানাটাই আজ আমার চরম বিস্ত। জীবনে হয়ত তুমি অনেক দান করেছ, কিন্তু আজই তোমার সব চাইতে বড় কাঙ্গালী-বিদায় হয়ে গেল, মিলি।

[রশিদ ও L of P. প্রস্থান]

[কোরালের প্রবেশ, একটু পরে

রশিদের প্রবেশ]

রশিদ। বলুন ত? আজ কোন কবিতা আবৃত্তি করতে মন চায়?

কোরাল। স্যার, এইঃ

“এমন দিনে তারে বলা যায়

এমন ঘনঘোর বরিষায়।”

রশিদ। দাত, বলা ত হয়েই গেছে, জীবনের সংগীনী হতে সে ত রাজিই হয়েছে। শুনুন মনের কথাঃ

“হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে

ময়ূরের মতো নাচেরে

হৃদয় নাচেরে।”

কোরালবাবু, সত্যিকার দরদীর দেখা পেলাম এতদিনে।

কোরাল। মিনার মরুদ্যান আঁকা একটা সোনার সিগ্রেট-কেস কিনেছেন উনি, পরশু।

রশিদ। হ্যাঁ, ও উপহার দেবে ও জীবন সাহায্য যে মরুদ্যান সৃষ্ণের সাহায্য করেছে তাকে—

কোরাল। অর্থাৎ আপনাকে, স্যার। কিন্তু আজও ত আপনার কাছে দেখছি না সেট?



নারীদেহের লাভ্যের
তরল মহিমায় উচ্ছল
আবেগ আনে দয়া-
রামের শাড়ী। বর্ণ
ও ডিজাইনের প্রাচুর্যে
দয়ারাম আনে আধু-
নিক রুচির নতুন
সৌন্দর্য সূক্ষ্ম।

**দয়ারামের
শাড়ী**

**KING
OF
SAREES**

DAYARAM & Co
NEW MARKET · CALCUTTA

AMINABAD PARK - LUCKNOW · THE MALL - MUSSOOREE



আধুনিক অভিজাত্য ঠিক বজায় রাখিতে গেলে রূপদজ্জার প্রয়োজন টুকুর সঙ্গে সঙ্গে দেহদজ্জাকেও স্বীকার করিতে হইবে। সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলাদের চির আদরের বস্তু

বেনারসী শাড়ী

বিভিন্ন বর্ণ, বিচিত্র ডিজাইন ও হাল ফ্যাসানের অক্ষরভ ভাণ্ডার



ছাপাশাড়ী • ক্রেপ,
ব্রাকেড, কিংখাপ
• ব্যাসালোর

ইণ্ডিয়ান সিল্ক টেলিটাইল

স্থাপিত ১৯২৪

৫নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট • টেলিফোন-বি.বি.৩১৬৪

রশিদ। [হাস্যাস্পদ স্বরে] আপনি বড় বে-সব্দর। তার প্রথম দানের লঙ্কাটাকে জয় করে নৈয়ার সময়ও ত নিতে হবে তাকে? কোরাল। আচ্ছা, মিস পাকের সব সংবাদ পেয়েছেন কি?

রশিদ। না, তবে ও বলেছে, আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয় এরূপ কিছু তার জীবনে নেই। বিবাহের পূর্বে সে সব প্রকাশ করবে, কিন্তু বিবাহের পূর্বেই কেবল।

কোরাল। আশ্চর্য মেয়ে, স্যার!

রশিদ। আর দেখুন, চমৎকার চিন্তাশক্তি। বলে, বিবাহ যদি না হয়, তবে তার নামের ও পারিচয়ের গলি বেয়ে দুর্নাম আর তাকে পৌঁছতে পারবে না। তার এই জীবন নাটকের যবনিকা যদি এখানেই পড়ে তবে একে বড় জোর একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে; স্বপ্নের নায়িকার মত সে থাকবে স্পর্শাতিত।

কোরাল। স্যার, আধুনিকতার সঙ্গে নাকি গভীর চিন্তার সংগত হয় না, এ'র বেলায় কিছু তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে।

রশিদ। তাই ত বাল,

“শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস

কলাপের মত করেছে বিকাশ,

আকুল পরাণ আকাশে চাঁহিয়া

উল্লাসে করে যাচ্ছে।

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত—”

[আহমদের প্রবেশ, রশিদ হঠাৎ থেমে গেল]
আহমদ, হঠাৎ যে! কী ব্যাপার?

আহমদ। রশিদ তোমার হৃদয়ের নাচনীটা একটু সংযত কর ত! ওদিকে রাস্তায় ট্রাফিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড় আর কি? হৃদয়ের এই তাড়ব নতনের উৎস কিহে? — কোরালবাবু, কিছু বলতে পারেন?

কোরাল। আহমদ সাহেব, তবে শুনুন,

[সুর করে]

“সূর্য তখন পাটে নামে

রাজার কুমার ভাবছে একা

স্বপ্ন গুরীর রাজ কন্যা

এমন সময় দিলেন দেখা।”

[কাঁধতা আশ্রিতর চোখে]

অভিসারে চুপে চুপে

অতি-আধুনিক রূপে!

[দ্রুত কথার মত] কথা পাকাপাকি হয়ে গেল,
আসছে মাসে বিবাহ।

রশিদ। আঃ কোরালবাবু, কী যা'তা' বলে যাচ্ছেন—

আহমদ। কে এই রাজকন্যা? তোমার সেক্রেটারী নয় ত?

রশিদ। বেশ ধর, তাই যদি হয়—

আহমদ। তা'হলে বলব ক'মাস পূর্বে রোমান্স ও বিয়ের কথা বলা আমার ভুল হয় নি।

রশিদ। হ্যাঁ ভুল হয়েছিল। বিয়ে করার কথা

অকাল্ট হাউস

মানসিক পীড়া সকল স্থায়ী রোগ ও যৌনরোগ কঠিন হইলে বিশেষজ্ঞ ডাঃ পি দত্ত, বি এ, এম ডি এইচ, পি এস ডি (আমেরিকা) মহোদয়কে রোগাবস্থা পরে বিস্তারিত লিখিলে বা সাক্ষাৎকৃত জ্ঞাপন করিয়া রোগ-মুক্ত হউন। সহস্র সহস্র রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে।

মানসিক পীড়া

স্বাভাবিক মানসিক পীড়া চিকিৎসার অস্বাভাবিক ঔষধ মনে ট্রেনেট আবিষ্কার হইয়াছে। ইহা দ্বারা সব-প্রকার মানসিক পীড়া যথা নিউরোসিস, অনিদ্রা, মানসিক উত্তাপ রোগ, হিষ্টেরিয়া, নিশ্চিত আরোগ্য হয়। মগী, মজ্জা, মৈলিশ্য, ভীতি ও শোক, নিদ্রারূপে মনঃপীড়া, নিবৃত্তিহীনতা এবং স্মৃতিভ্রাস প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মৃত্যু প্রতি শিশি মাসোপযোগী—৬। বিশেষ চিকিৎসার জন্য রোগাবিবরণ ডাঃ পি দত্ত, বি এ, এম ডি এইচ, পি এস ডি (আমেরিকা) মহোদয়কে জানান।

সাক্ষাৎ সময়—প্রাতে ৯টা—১২টা, বিকালে ৪—৭টা।

অকাল্ট হাউস

ম্যানুয়ালচারিং কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট
৩নং (আ) ওয়েলেসলী স্ট্রীট,
কলিকাতা।

বংশেশ্বরী কটন মিলস লিঃ

আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের অবগতির জন্য বংশেশ্বরীর কাপড়ের কতকগুলি রকমের বর্তমান মূল্যতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা অপেক্ষা উচ্চমূল্যে কাপড় ক্রয় করিবেন না।

কাপড়ের নং	মিলের মূল্য	খুচরা মূল্য
৫নং মিহি ধূতি ৪৫"×১০ গজ	৬/০	৭১০
৫১নং মিহি সাড়ী ৪৬"×১১ "	৮/০	১০০
৩৬২নং ধূতি ৪৪"×১০ "	৫/০	৬০০
৫৯২নং " ৪৪"×১০ "	৫৮/০	৭০
২২০২নং " ৪৪"×১০ "	৪৮/০	৫৮০
৫৯৬নং সাড়ী ৪৪"×১০ "	৭/০	৮৮০
১০৬৪নং " ৪৪"×১০ "	৬/০	৭৮০

মিলস :—
শ্রীরামপুর

—হেড অফিস—
৬৩, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।



তুলে রাখুন

সকল শিক্ষার প্রেরণাতেই লক্ষ্যের কোটার টাকা তুলে রাখা প্রথার জন্ম। ব্যক্তি ও জাতির জীবনে সফরের প্রয়োজন আজ সব চাইতে বেশী। আপনার সঞ্চিত টাকা ভাল একটা ব্যাঙ্কে রাখলে দরকার মত তা ত ফিরে পাবেনই আবার তাই দিচ্ছে জাতীয় শিল্প-বাণিজ্য গড়ে উঠে জাতিকে তথা আপনাকে সমৃদ্ধ করবে। আজ থেকেই কিছু কিছু টাকা তুলে রাখতে শুরু করুন। আর তোলা টাকা জমা রাখুন চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্কে

দি চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্ক লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : শ্রী স্বদেশ রঞ্জন দাশ
৩১, হাট স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমার তখন মনে হয় নি। এ এল, দেখল,
জয় কল্ল।

আহমদ। [সংশ্লেষে] Congratulation—
জয়ন্তু। রশিদ, বাস্তবিকই তুমি খোদার
অভিনব সৃষ্টি!

[পকেট থেকে কেস বের করে নিজে একটা
সিগ্রেট টোটেস করে স-সিগ্রেট কেস,
রশিদের দিকে হস্তপ্রসারণ]

একটা নেবে কি?

রশিদ। [কেস হাতে নিয়ে সাম্ভর্ষ্যে] এ-কি! এ
সিগ্রেট-কেস তুমি কোথায় পেলে?

আহমদ। কেন? সোনার ধ্বলে মনে হচ্ছে আমি
চুরি করেছি—

রশিদ। না। তা' বলিছনে, তবে—

আহমদ। শোন রশিদ, একজনের জীবন
সাহায্য মরদ্যান সৃষ্টি করতে সাহায্য

করেছি এ আমার তারই উপহার। উপরে
মিনার মরদ্যান দেখছ না?

[Lady of the Parkএর প্রবেশ]

L of P. মিস্টার রশিদ, আপনার একখানা
পত্র এসেছে, এই নিন।

[পত্র প্রদান, হঠাৎ আবু
আহমদকে দেখে]

আরে! মিস্টার আবু আহমদ যে! রশিদ
সাহেবের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে,
তাও জানতাম না। বেশ হ'ল। মিস্টার
আবু আহমদ, Allenburyতে নতুন
মডেলের একখানা Vauxhall গাড়ি
এসেছে—

[চেম্বারের পিছনে গিয়ে, আপনজনের মত,
স্বল্পে হাত দিলে, আবু আহমদ মুখ তুলে
চাইলে]

[আব্বারের সুরে] চলুন না! দেখবেন
অখন—

আহমদ। আজ আমার ত সময় হবে না,
লক্ষ্যীটি! পরে না হয় একদিন তাতে
তোমার সঙ্গে লেক বেড়িয়ে আসব। কেমন?
রশিদ, তোমার সঙ্গে আমার কথা ছিল।

রশিদ। আহমদ, আমি আজ রুগ্ন। আজ না
হয় আমাকে একটু রেহাই দাও।

আহমদ। আচ্ছা, বেশ, তাহলে আমি আসি।
Good day to you all.

[আহমদের প্রস্থান]

L of P. মিস্টার রশিদ, স্বয়ং করুন,
আজকের বিরাট প্রোগ্রামটা rush in
করে যেতে হবে যে!

রশিদ। মিলি! আজকে আমাকে একটু একলা
থাকতে দাও। তোমাদের কাছে আমি জোড়-
হাতে ক্ষমা চাই—

L of P. বেশ ত, তাই থাকুন। আমি মিস্টার
আহমদকে একটা লিফট দিতে বলে দিই;
বাড়ি চলে যাই তার সঙ্গে।

[প্রস্থানের উল্লোখ]

রশিদ। শোন, মিলি, মিলি!

[L of Pএর প্রস্থান]

চলে গেল। যাক! খোদা! জীবনটাকে নানা-
সূত্রে কী যে এলোমেলো করে দিয়েছে,
তার গ্রন্থিমেচনই আর হল না।
কোরালবাবু!

কোরাল। বলুন, স্যার! [নিঃশব্দ পাড়ল]

রশিদ। কি বন্ধ, সমব্যাখীর বেদনা শূন্য
বাজল?

কোরাল। হ্যাঁ, বাজলই ত! যুগপেবতা দেখছি
মানসীকে আর নিরীলা রাখলে না, ভাষা
করে আধুনিকরূপে ছড়িয়ে দিলে সারা
বিশ্বের :

"পশুশরে লগ্ন করে কয়েছ এ কী সম্যাসী,
বিশ্ববয় দিয়েছ তারে ছড়ায়।"

রশিদ। দেখুন, একে একটু বদ্বিগ্নে বলুন
গিয়ে, যাওয়ার আগে শুনিয়ে যান যেন।

কোরাল। এই যাচ্ছি, স্যার।

[কোরালের প্রস্থান]

রশিদ। কে পত্র লিখলে?

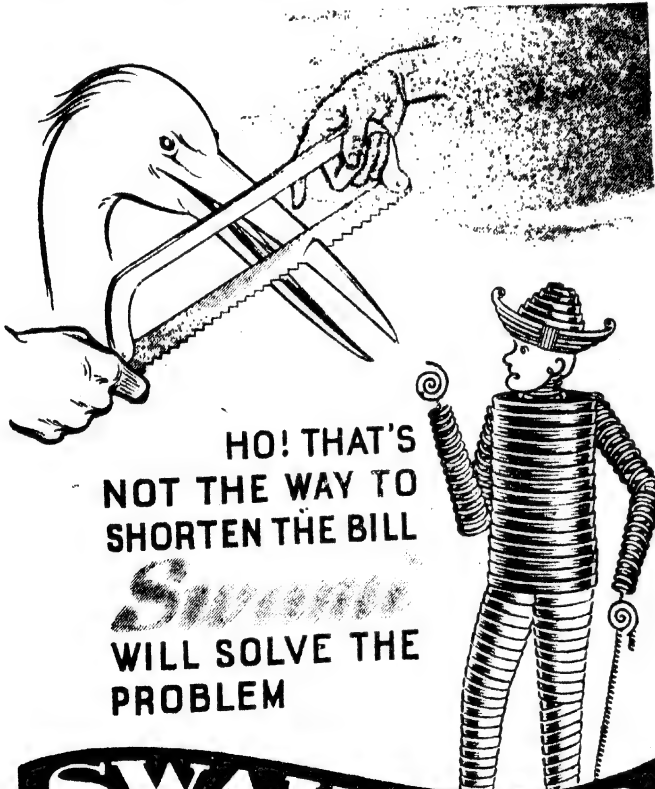
[পত্র খুলে ফেলল, পিছন হতে অদৃশ্যভাবে
এসে L of P চেয়ার খেসে দাঁড়াল]

রিজিয়া! রিজিয়া আবার কি লিখলে?

[উচ্চ কণ্ঠে পাঠ]

পরম আরাধ্য আমার!

আমার এ সম্বোধন আপনার মনকে
আলোড়িত করার স্পর্ধা নিয়ে করা হয়
নাই। পত্র লেখার প্রধান কারণ, আমার
জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় রায় আমি আপনার
নিজ মত হতে শুনতে চাই। আমাকে একটা
বড় অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হবে বলে
আপনার কোন সন্ধি বা লজ্জার প্রয়োজন
নাই। কারণ, ওরূপ বঞ্চিত আমি জীবনে
আরও হয়োঁছি, অতি শৈশবে মা হারিয়ে-
ছিলাম। পাছে দুঃখ আমাকে স্পর্ধা করে,



SWAMI & CO.
SPRING SPECIALISTS

CALCUTTA • INDIA

The Pioneer and Premier Spring Manufacturer in India:
491, STRAND ROAD. PHONE:—CAL. 460.

কী শরীর পালনে, কী রূপচর্চায়

—লিস্টল—

কৃষ্ণ অপরিহার্য।

আপনার কণ্ঠস্বর যদি ককর্শ হয়
এবং আপনার প্রস্রবাস যদি দুর্গন্ধ-
ময় হয়, তবে রূপসী হইয়াও
আপনি উপেক্ষিত হইতে পারেন।

THE SAFE, DEPENDABLE ANTISEPTIC
LISTOL



লিস্টল স্বরযন্ত ও তাল-
মূলের প্রদাহ দূর করিয়া
কণ্ঠস্বরের সুমধুর করে :
উহা দন্ত ও সিঁহির মাড়ির
ক্লেদাপ্রসূত জীবাণুসমূহ
ধুংস করিয়া বহু উৎকট

ব্যাধির আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করে
এবং প্রস্রবাসও সুস্বাদু করে।

লিস্টার এন্টিসেপটিক্স

কলিকাতা

আমাদের সমুদয় গ্রাহক ও
অনুগ্রাহকবর্গ

--পূজার-সাদর সম্ভাষণ--

গ্রহণ করুন



ব্র্যাক জয়াযুগ
পারফিউমারী ওয়ার্কস

৩/১, আর্টনো বাগান লেন—কলিকাতা

নিউ বেঙ্গল প্রাইভেট
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত

হেড অফিস—ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংক বিল্ডিং,
মিশন রো, কলিকাতা।

নিউ বেঙ্গল ভারতের বৃহত্তম প্রাইভেট ইন্সিওরেন্স প্রতিষ্ঠান

আদায়ীকৃত মূলধন ... ৪,০০,০০০ টাকা

১৯৪৩ সালের নতুন কাজ ... ৬,০২,২০০ টাকা

ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান—শ্রীযুত এস. এম. ভট্টাচার্য

ভ্যালুয়েশানের ফল

মিঃ এইচ কে সেন, এস সি আই আই, এফ এফ এ, একচুয়ারি কৃত ভ্যালুয়েশানে
(৩১-১২-৪৩ পর্যন্ত) সন্তোষজনক উদ্ভূত তহবিল দেখা গিয়াছে এবং

বাৎসরিক শতকরা এক টাকা হিসাবে ইন্টারেস্ট বোনাস
ঘোষণা করা হইয়াছে।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ভ্যালুয়েশান করা হইয়াছে এবং সুদের আয় শতকরা মাত্র তিন টাকা
হিসাবে ধরা হইয়াছে। একচুয়ারী বলেনঃ

“এই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ভ্যালুয়েশানের জন্য

আমি ডিরেক্টরদের অভিনন্দন জানাইতেছি।”

উচ্চ কমিশনে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যিক

এস. কে, মজুমদার, বি এল, মানেজার।

শারদীয়া উৎসবে!

ফ্রিস্ট্যাল

নারিকেল তৈল

বিস্ময় মিমেলেনী

নেই ভরে আশ্বা আমাকে বিয়ে দিতে চান
নি। বড়ভাই আপনাকে আবিষ্কার করলেন।
তার কথার ভিতরে আমি আপনাকে
রূপনায় সূচী করে ফেললাম। আমাদের
বিয়ে হয়ে গেল। আশ্বা আজ নেই, তিনি
আমার যথেষ্ট সংস্থান করে গেছেন, মেরিকে
আমি নিশ্চিত। কিন্তু এই দুঃসহ নিঃসঙ্গ
জীবন! এ টেনে নিয়ে চলার প্রস্তাবনা
মনকে স্তব্ধই আড়াল করে আনতে চায়।
সেই অসীম ক্লান্তিকে জয় করার শক্তি খোদা
দিন, এইটুকু আশিস চাই।

ইতি—বিজিয়া ।

[ধীরে L of P রাশিদের শব্দক্ষেপ হাত
নালাল, হঠাৎ রাশিদ ফিরে তাকা।]
L of P. হ্যাঁ! আপনার চোখে জল!
রাশিদ। তুমি কখন এসে পিছনে দাঁড়ালে, মিলি!
(সনিঃশ্বাসে) পড়েছ চিঠিটা?
L of P. হ্যাঁ, সবটাই পড়েছি। কী সুন্দর!
বিয়ে করেছেন তাত জানি না, কেন তাগ
করতে চান? অসুন্দর বলে?
রাশিদ। না।
L of P. তবে?
রাশিদ। মনে করোঁছলাম, আধুনিকা ছাড়া
আমার জীবনে চলবে না, তাই—
L of P. আর এখন কি মনে করছেন?
রাশিদ। মনে করি, হোমাকে ছাড়া চলবে না।

মিলি, তোমাকে পাওয়ার মোহ আমাকে
আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—

L of P. আমাকে ভালবাসাটা মোহ বলছেন কেন?

রশিদ। নইলে আমি জানি তুমি আহমদকে
ভালবাস। বাস না কি?

L of P. হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বাসি---

রশিদ। তবুও দেখ, তোমাকে তাগ করার
সংকল্প করতে পারি না। রিজিয়ার অমন
চিঠিটাও আমার মনের দ্বারা আঘাত করতে
পারল না—

L of P. (উজ্জায়) আপনি বিলেত ঘুরেছেন
 এখানেও আর্থনিকতা নিয়ে আছেন। আপনাদের
 ত জনা উচিত, ভালবাসার পাথ সব সময়ে
 প্রণয়্যাপদই হবে এমন কোন মানে নেই-
 আপনিও দেখাছ সেই চিরন্তন পুরুষ-
 আপনি আমাকে রেহাই দিন।

রাশিদ। (বেদনারাসক্ত স্বরে) মিলি, অপরাধ আমিই করেছি। যেভাবে সুখী হও তেমন করে নিপেষিত, নিপীড়িত কর। একটু শান্তি, একটু নিস্তার আমাকে কেউ দিও না।

(স্থিরকণ্ঠে) তুমি আহমদের সঙ্গে মেয়ে

মিলি! আমি বড় শ্রান্ত, একটু বিশ্রাম করি
গিয়ে, উঃ।

[প্রাধান্যনোদ্যত]

জাহির !

[অহিরের প্রবেশ]

ତାହାର । ହୁଜୁର ।

রশিদ। তোমার মিসি বাবাকে ছেঁয়া ঠায়সো।
মায়া যাতা।

[রাশিদের প্রধান, আহমদের ভিন্ন দিক
হতে প্রবেশ]

আহমদ। আমি ফিরে এলাম। Lady of the
Park আমার সঙ্গে নাকি যাবেন?

1. of P. হ্যাঁ মিস্টার আহমদ। জাহির।

ଅହିର । ଜି !

L of P. তুমি এখন যাও।

জাহির। আচ্ছা, যাতা হুঁ।

[জাহিরের প্রস্থান। আহমদ চতুর্দিকে চেয়ে দেখল, পরে]

আইনদ। Congratulation! Rezia.

L of P. আমের বড়ভাই, শূনে ফেলবে
কেউ। আপনি আমাকে ভারি মন্থিকলে
ফেলেছেন।

আহমদ। মুন্সিকল কিসের আবার! Lady of
the Parkএর পাট চমৎকার করে যাচ্ছিস—

L of P. যথাসব্ধ পণ থাকলে ওরূপ হয়।
কিন্তু আর না, ছাই—

आश्चर्य । कि इ'ल ?

L of P. না, বড়ভাই, মাঝে মাঝে খামাখা
 ঠুর মনে কষ্ট দিচ্ছি—

আহমদ। তা' ও যেদুপ একটা কুশ্মান্ড, ওর
কিছু শাস্তি হওয়া দরকার।

L of P. না, না। অত দরকার নাই, সত্যি
 বলছি কষ্ট দিতে আমার বড় ইয়ে-ইয়ে
 লাগে।

আহমদ। ই-য়ে কি? মাসা?

L of P. **ଆଜେ ହାଁ ।**

আহমদ। ওরে বাবা, এর মধ্যেই—

১. ofp জি হাঁ, ভাবী এলে জিজ্ঞাসা করে
 দেখবেন, মায়ী লাগতে কদিন লাগে? না,
 সাতা বলাছি, ও ভাৱ ভাল লোক। আশনি
 ও আশা ঠিক চিনেছিছেন। এত সানিধা,
 এত ভালবাসা, কিন্তু একদিনও একটু
 অন্যায় ব্যবহার করেন নি। অথচ আশনি
 আর আমি, বোচাখার মনে কষ্ট দিয়েই
 চলেছি-

আহমদ। আর একটু দিয়ে ওকে শায়েশতা কর—
L of P. না, আর অভিনয় নয়। ওর মনে

যে প্রতিক্রিয়ার সুস্থপাত হয়েছে, তাতে করে Lady of the Parkএর সঙ্গে আপনার বিজিয়াও ভেঙ্গে না যায়. আমার সেই ভয়—

আহমদ। তোকে খুব ভালবেসেছে, ভয় কি?
L of P. (মুখ দুলিয়ে) উনি যখন জানতে

পারবেন যে রিজিয়াই ওরূপ করেছে, তখন
বসি মনে সত্যিকার কষ্ট পাবেন না?

আহমদ। ওরে বাপরে, পাবেন, পাবেন। বেশ ত,
যত শীগগির পারিস যবানকা টেনে দে না।

L of P. তাহলে আপনি এখন যান। ওয়ে

ফোন:-
১১৬২

টেলি:-
এনামেলার্স
কলিকতা

শাহাদীয়া মহাপ্রসবক
সার্থক ও প্রসবক করে তুলতে
চাই
স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরীর
আধুনিক হিট সমস্ত নানাবিধ
প্রলম্বের বস্ত্র, সিন্ধী ও মজবুত

১০৮

ভারতের নৃপ্রসিদ্ধ জুয়েলাস
স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী
১১৬২ঃ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকতা

শারদোৎসবে

বালকবালিকাদিগকে আনন্দ দান করিবে।

সুধা বিস্কুট কোং
১৭ প্রিন্সনাথ মুখার্জীর রোড কলিকাতা
REGISTERED PHONE-BB3009

সুধার
কনী
সুন্দর
মিন
নাইস
নোততা

SUDDHA BISCUIT CO.
NONTA
CALCUTTA

THIN
WROOT
CALCUTTA

ব্যবহারে তৃপ্ত ও নল লাভ করুন
সর্বত্র পাওয়া যায়।

সুধার অন্যতম অবদান
গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয়
কাপড় কাচা সাবান
বাহির হইয়াছে।

ভাইটিন
দৈনন্দিক দুর্বলতা
ও স্ত্রীলোকের শৈথিল্য
ও রক্তপ্রদরে অসুখ

হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরী
লক্ষ্য (বিশাল) স্থাপিত ১৯১৭ সন

কলিকাতা শাখা :
১২৪/২এ, রসা রোড,
কালীঘাট।

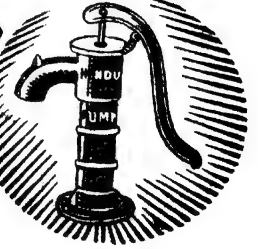


দেবব্রত

যাঁর জীবনে
কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না—
তাঁরও ইচ্ছামত্বার সময় ইচ্ছা
হয়েছিল—পাতালের পবিত্র জল পান
করার। পার্থ ছাড়া তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা
সেদিন কেউ মেটাতে পারেনি।

আজ আপনারঃ যদি স্বাস্থ্যের জন্য সেই নির্মল
জলের প্রয়োজন হয়ে থাকে—তাহলে ভাববেন
না; পার্থ না থাকলেও বিজ্ঞান সে অভাব
পূরণ করেছে। “হিন্দুস্থান ট্রেডার্স লিঃ”
এমনই একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, যারা
টিউবওয়েল, স্যানিটারি পায়খানা, স্নানক্ষেত্র
ব্যবস্থা আধুনিক সাজসরঞ্জাম দিয়ে করে দেয়।

**হিন্দুস্থান
ট্রেডার্স লিঃ**



স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ার্স ও
টিউবওয়েল কন্সট্রাক্টরস্,

৩৪নং প্রিন্সনাথ রোড, কলিকাতা।
ফোন: কলি: ১০৭৬ : : গ্রাম—“এইচটি”, কলিকাতা।



জগতে অফুরন্ত সুখসম্পদ যৌবন দিয়েও মানুষের তৃপ্তি হয় না। স্বজন বাস্তব পরিজনকে, এমন কি নিজের আত্মাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তির আনন্দ দেওয়া যায় একমাত্র উপায়ে খাদ্য দিয়ে। রসনাভূষিকর আহাধোর স্পর্শে দেহমনে নিশ্চিত আরামের পুলক-শিহরণ অনিবার্য হয়ে উঠবেই। কিন্তু মনে রাখা দরকার, কেবল ভাল উপকরণ হ'লেই ভাল রান্না হয় না। যে পাতে জীবনের আনন্দরস প্রস্তুত হয়, তার রূপগুণ নির্ভর করে একমাত্র সেই পাতের উপর। ‘লক্ষ্মী মার্ক কড়াই’ এই প্রয়োজনের অচুরোধেই সৃষ্টি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে প্রস্তুত এই কড়াই প্রতি রন্ধনশালার গৌরব। এতে করে প্রস্তুত ভোজ্যসবো সুখমা ও স্বাস্থ্য জীবনে সন্ধান দেবে নোতুন উৎসাহের।

★

পাইপ, রেলিং, ঢালাই
জালকাঠি, বালতি প্রস্তুত
করা হয় ও সর্বপ্রকার
ঢালাই কার্য করা হয়।



লক্ষ্মী মার্ক
প্রস্তুত কারক
ইষ্ট ইণ্ডিয়া মেটাল কোং, হাওড়া

সোল এজেন্ট—যোগেশচন্দ্র সরকার : ২১৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
ফোন : বড়বাজার ৪৬৫২

বড় কষ্ট দিয়েছি আজ। একটু ম্যানেজ না আসলে—বুঝলেন না?
আহমদ। হ্যাঁ, খুব বুঝেছি, তুই মানাতে থাক, আমি তা'হলে চলি।

[আহমদের প্রস্থান]

L of P. খোদা! আমার জীবনে সমস্যা সমাধানের যে উপায় করে দিয়েছ, তা' শেষ পর্যন্ত ঠিক রেখে। আমার স্বামীর সংসার এতদিন করতে যে অবকাশ দিয়েছ, তার জন্য তোমার দরগায় লক্ষ-কোটি সূক্ষ্মরীয়া।
ঐ উনি আসছেন।

[রশিদের প্রবেশ]

রশিদ। কি, তুমি যাওনি আহমদের সঙ্গে?
L of P. না।

রশিদ। কেন?

L of P. আপনি ওভাবে চলে গেলেন কেন?
ঐ কথাগুলি ওভাবে বলে আমাকে ব্যথা দিয়ে গেলেন কেন? আপনি কি আমার মনের কথা জানেন না?

রশিদ। আচ্ছা, তুমি আমার কাছে এসো। হাতে হাত দাও। হ্যাঁ, এবার চাও, চোখে চোখে—
বলত, সত্যিই তুমি আমার?

L of P. হ্যাঁ, আমি একমাত্র তোমার! তুমি জান না আমার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব তোমাকে ঘিরে আছে, আমার আশা, আমার স্বপ্ন সবই তোমাকে ওতপ্রোত। তোমাকে অদের আমার কিছুই নাই।

রশিদ। (কোমলস্বরে) মিলি, লক্ষ্মীটি, বড় দুঃখ দিয়েছি তোমাকে।

L of P. আচ্ছা, একটা কথা বলব? কিছু মনে করবে না ত?

রশিদ। কি বলো?

L of P. রিজিয়ার অনুরোধ কি রাখবে না?

রশিদ। অনুরোধ? মানে গিয়ে বলে আসব—
তার সম্বন্ধে আমি নির্বিকার। তা পারব না।

L of P. এটুকু অনুরোধ না করলে, লক্ষ্মীটি, তার দুঃখ আমাদের সারা জীবনের শান্তিতে ছাপাপাত করবে যে,—এ তোমার করভেই হবে।

রশিদ। বড় কঠিন কাজ।

L of P. কিছুই কঠিন নয়, আমার পরিচয় তাদেরকে দিও না, আমি তোমাকে নিয়ে যাব, কোন অসুবিধা হবে না।

রশিদ। আচ্ছা, তাই হবে।

[স্টেজ এক মিনিট শূন্য রইল; কিছু সময় অতিবাহিত করছে তাই প্রকাশের জন্য, রশিদ ও L of P-র প্রবেশ]

রশিদ। মিলি, না গেলেই ভাল হত, চল ফিরে যাই।

L of P. কেন ফিরে যাবে? সে সংবাদ পেয়েছে আজকে তুমি যাবে, তার আশটুকু তুমি চুরমার করে দিতে চাও?

রশিদ। গেলে ত আরও বেশী চুরমার হয়ে যাবে।

L of P. না, ছিঃ! চল।

রশিদ। মিলি, দেখ, আমি বড় দুর্বল, জানি

ভারত
অর্থনৈতিক
জ্ঞান ও তৈরি
ব্যবহার
করুন

মিল-
২৪৩ আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা
ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংক বিল্ডিংস্,
মিশন রো, কলিকাতা।

পলিসি হোল্ডার অথবা এজেন্ট হিসাবে কোন লাইফ
ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার
আগে দেখিবেন কোম্পানীটি সত্যি প্রগতিশীল কিনা।

গত বৎসরে ইণ্ডিয়ান ইকনমিকের প্রগতির পরিচয়
নীচে দেওয়া গেল :



নূতন কাজ বৃদ্ধি—শতকরা ৫৬ ভাগ
প্রিমিয়ামের আয় বৃদ্ধি—শতকরা ৯৮ ভাগ

“ইণ্ডিয়ান ইকনমিক” ভারতের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীমা প্রতিষ্ঠান।

ডিরেক্টর বোর্ড :

শ্রীযুক্ত এস. এম. ভট্টাচার্য, চেয়ারম্যান।

শ্রীযুক্ত টি. সি. চ্যাটার্জি।

শ্রীযুক্ত করিশশঙ্কর রায়, এম.-এল.-এ।

শ্রীযুক্ত এইচ. সি. সরকার।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, মানেজার।

শাখাসমূহ—বোম্বাই, দিল্লী, লঙ্কো, বেনারস, এলাহাবাদ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজসাহী,
ময়মনসিংহ, নাগপুর, পাটনা, শিলং ও অমরাবতী।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

কমার্শিয়াল হাউস—১৫, ক্লাইভ স্ট্রিট

ডাইরেক্টর বোর্ড

১। মিঃ জে. সি. মুনাজ্জি, বার-এ্যাট-ল।

ভূতপূর্ব চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার—কলিকাতা কর্পোরেশন।
ডিরেক্টর—আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোং লিমিটেড।

২। খান বাহাদুর এম. ই. মমিন, সি. আই. ই।

ডিরেক্টর—নিউ এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেড। আর্থ-
স্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেড।

৩। মিঃ জি. ডি. সোমাইকা

ডিরেক্টর—সোমাইকা এক্সপোর্ট এন্ড ইমপোর্ট লিমিটেড।
সোমাইকা অয়েল এন্ড প্রিভিউস কোং লিমিটেড।

৪। .. এন. সি. চন্দ্র

ডিরেক্টর—ন্যাশনাল স্টীল কর্পোরেশন লিঃ। বাসন্তী কটন
মিলস্ লিঃ। গিপেক্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ। মহালক্ষ্মী কটন
মিলস্ লিমিটেড।

৫। .. বি. সি. ঘোষ

কন্ট্রোলার—হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী
লিমিটেড।

৬। .. এস. দত্ত (মানেজিং ডাইরেক্টর)।

ডিরেক্টর—এচ. দত্ত এন্ড সন্স। রামদুর্ভাপুর টী কোং
লিমিটেড। ব্রিটিশ ডিস্ট্রিবিউটার।

বিত্তীয় মূলধন

৯,২৫,০০০, টাকা

কার্যকরী মূলধন

১,৫০,০০,০০০, টাকা

রিজার্ভ

১,১০,০০০, টাকা

জে. এন. সেন, বি. এ. এফ. আর. ই. এস. (লন্ডন),
জেনারেল মানেজার।

না, কি করে বসব। ও বড় দুঃখিনী। বড় ভাষা করে আশ্বা, মনে রিজিয়ার বাবা, একে দান করেছিলেন। ওর ভাইকে রেখে আমাকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। তার প্রতিশোধ দিচ্ছি এইভাবে। কি একটা নেশা চাপল, মনে করলাম সে গ্রহণযোগ্য না। of P. বেশ ত, তাকেই গ্রহণ করুন, আমি আপনার পথ থেকে সরে যাই—

শি। রাগ করে না, মিলি। তোমার ভালবাসা কিরূপে একনিষ্ঠ হবে আমার জানা নেই, কিন্তু আমি এটুকু জানি যে, তার যে প্রেম, সে একমুখী ও এককৃত। কাল রাত থেকে মনটা নানা চিন্তায় বিহ্বল হয়ে উঠেছে, পৃথিবীর সব আকর্ষণ আমার মনের কোণে ব্যাপসা হয়ে উঠেছে,—পিড়-মাতৃহীনা অসহায়কে আমি নিতান্ত কাপুরুষের মত ত্যাগ করছি—

of P. বেশ ত, তাকে গ্রহণ কর না! শি। সে হয় না, মিলি। আমি তোমাকে তুম্বয় হয়ে গেছি, ভবিষ্যৎকে অতল সাগর-জলে ডুবিয়ে দিয়েছি। দুঃখকে আর অমল দেব না—

"অতীত যা তা দুঃখের স্মৃতি ভবিষ্যতের ভাবনা ঘোর দিল পিয়রা সাকী গো আজ

পেমাল ডরে খুঁচাও মোর।" তোমার অষ্টোপাসের কঠিন বন্ধনে আমাকে ধরে রাখ। না, না, যাব না—আমি যাব না। L of P. আমাকে অপমান করো, মনে নেব না। কিন্তু তুমি চল—

রশিদ। আমি পারব না। L of P. কেন পারবে না?

শি। অনাথা, এটিম! দেখে যদি ভালবেসে ফেলি? তার কথা, যদি তার পত্নের মত, আমার মনে ঝঞ্ঝার তোলে? তবে?

L of P. তবে তাকে গ্রহণ করবে। সত্যি বলছি তোমার মধ্যে আমি ভালবাসার বিলীন হয়ে গেছি, তুমি যাকে গ্রহণ করবে তার মাঝেই যদি রূপ নিতে না পারি, তবে বলত আমার ভালবাসার স্বার্থকতা কোথায়? রশিদ। তুমি উদার, আমি তোমার অযোগ্য।

L of P. তুমি আমার সর্বরূপে যোগ্য। [সর্ব-র উপর জোর দিলে]

তৃতীয় দৃশ্য।

[আবু, আহমদের ঠেকখানা]

রশিদ। এই ত বাড়ি।

L of P. এত মিস্টার আহমদের বাড়ি?

রশিদ। হ্যাঁ, রিজিয়া আহমদের বোন।

L of P. আগে বলনি কেন? আমাকে ত ভারি অপ্রস্তুত করলে! এখন বল ত কি করি?

রশিদ। আমি কি জানতাম, তুমি আহমদের বন্ধু হয়েও এটুকু জান না?

L of P. (ব্যস্তভাবে দেখিয়ে) না, মিস্টার আহমদকে আমার দেখা দেয়া অসম্ভব। এরূপ জানলে আর আসতাম না। দেখ, আমি চলে যাই—তুমি রিজিয়ার সঙ্গে দেখা করো। সত্যি যদি তোমার মন চায় তাকে, মনের গতি ফিরিয়ে না। আর যদি মন সে না আটকে রাখতে পারে, তবে আমাকে খুঁজো, আমি দেখা দেব। যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তবে ক্ষমা করো—হে বন্ধু বিদায়!

[L of P এর প্রস্থান]

রশিদ। যেয়ো না, মিলি। শোন—শোন—

[খাদের বাইরে উর্কি দিলে]

কই, এই বোরেরেই গেল কোথা? হঠাৎ উধাও? আলচর্য!

[আহমদকে দেখে]

এই যে, আহমদভাই—

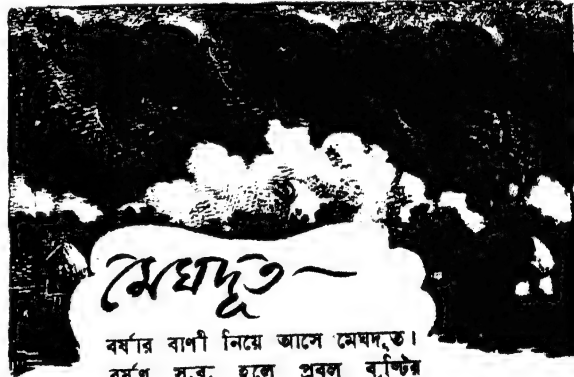
আহমদ। কি খুঁজছেন রশিদ?

রশিদ। কিছু না, মানে, মানে, একটা বিড়াল— এই—সঙ্গে এসেছিল, এইদিকে বোরেরে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল—

আহমদ। ওই যে আঙিনার দরজাটা খোলা? ও দিনে ভিতরে গেছে বোধ হয়—দেখে আসব কি?

সূচনা

আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের যে সব কারখানায় মোটর গাড়ী হয়, তাহারা কিন্তু মোটরের সকল অংশগুলিই নিজেরা তৈরী করে না। অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট যে সব কারখানা যে বিশেষ অংশটি তৈয়ার করতে পারদর্শী, তাহারা সেই বিশেষ অংশটি তৈরী করিয়া বড় কারখানাগুলিকে সরবরাহ করে। যন্ত্র-নির্মাণ শিল্পে অগ্রণী সকল দেশেই প্রথমে ঐ ধরনের ছোট ছোট কারখানা-গুলিই গড়িয়া উঠে। এই হিসাবে ৪০-১৫০ খ্রিঃপূঃ য়েড, কলিকাতা—তৈকানার ভারতে প্রথম স্প্রিং ও স্প্রিং-ওয়ারার নির্মাণকারক মেসার্স স্বামী এন্ড কোং দেশে যন্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সূচনা করিয়াছেন বলা যায়। কেননা স্প্রিং ও স্প্রিং-ওয়ারার প্রত্যেক যন্ত্রেরই অপরিহার্য অংশ। যন্ত্রের জন্য অন্য দেশের মূল্যপেক্ষিতা না ঘটিলে আমাদের শিল্পোন্নতি পদে পদে বাহত হইবে। কাজেই আজ হউক, আর কাল হউক দেশে যন্ত্র-নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবেই। সেদিন মেসার্স স্বামী এন্ড কোংর যথার্থ সমাদর হইবে। তাহারা মোটর গাড়ী, লরি, রেলের ইঞ্জিন ও গাড়ী, ট্রাম, বরলরের সেকটি ভালভ, সেলাইয়ের কল, গ্রামোফোন, পাট কল, কাপড়ের কল ও গেম্বীর কল প্রভৃতিতে ব্যবহার্য স্প্রিং ও স্প্রিং-ওয়ারার সকল উপকরণ যত্নে নিঃসৃত শক্তি পরিমাণে প্রস্তুত করেন। তাহারা পুরাতন স্প্রিংএর পাট রি-টেনশ্যন এবং সম্পূর্ণ স্প্রিংকে অধিকতর জোর বহনক্ষম করেন। যারাম করিমর জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী তাহারা তৈরী করেন। নির্মিত প্রকার উৎকর্ষের জন্যই এতদিন পর্যন্ত তাহারা বিদেশী প্রকারের সহিত প্রতিযোগিতার ঠিকিয়া আছে।



মেঘদূত

বর্ষার বাণী নিয়ে আসে মেঘদূত।
বর্ষণ সুরু হলে প্রবল বৃষ্টির
স্পর্শ থেকে পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখে

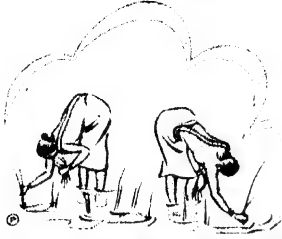
ডাকব্যাক

বর্ষার পক্ষের ঐক্য
ডাকব্যাক
স্বাভাবিক প্রিয় বর্ষা



বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ওয়ার্কশপ (Bengal Presidency Workshop) প্রাইভেট লিমিটেড

ফসল বাড়ান



কিন্তু বীজ উত্তম হওয়া চাই
উত্তম বীজের একমাত্র বিশ্বস্ত
প্রতিষ্ঠান।

মাম্বিগাড়া
আইডিয়াল
এগ্রিকালচারেল
ফার্ম



৩৫লাকি মর্কশ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন বীজ উৎপাদনকারী



প্রোঃ ফার্মার্স ইণ্ডাস্ট্রিজ
৩৮২, প্রজুরিমন মেন, কলিকাতা

আমাদের সকল গ্রাহক পৃষ্ঠপোষক
এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদিগকে আমরা
শুভ শরদীয়া সম্ভাষণ জানাই—

লোটা'স্ অয়েল কোম্পানী

১০নং বিডন রো, কালকাতা

ফোন বি বি ৪৮০৬

(খাঁটি সরিষার তৈল, তিসির তৈল, বাদাম,
রেড়ি, সাবান প্রস্তুত ও কলকারখানার জন্য
নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ তৈল প্রস্তুতকারক।)

পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা

কলিকাতা অফিসসমূহ—

১২।২, ক্লাইড রো

২৮১, আপার চিংপার রোড (হাটখোলা)

৮৫, রাসবিহারী এভিনিউ (বালাীগঞ্জ)

২১৮-এ, ক্রশ স্ট্রীট (বেড়বাজার)

—০.০.০—

অন্যান্য অফিস—

নিউদিল্লী, বেনারস, ঢাকা, চট্টগ্রাম, শিলং,
বধুমান, জামশেদপুর, সিলেট, গিরিদি,
কোড়হাট, গোহাটী, শিলচর, বোলপুর,
বগুড়া, লিউড়ী, নগাঁও, সুন্দারগঞ্জ ও
হবিগঞ্জ।

গত ২০ বৎসরের

অধিককাল এই ব্যাঙ্ক ভারতের
শিল্প ও বাণিজ্য প্রচেষ্টায়
সাহায্য করিয়া বিশেষ
জনপ্রিয়তা অর্জন
করিয়াছে।

কার্য্যকরী মূলধন

১,৭৫,০০,০০০

পোণে দুই কোটী টাকারও অধিক।
মাবতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসা করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র বসু, এম. এল. সি
ডেপুটী প্রেসিডেন্ট, ভারতীয় লেজিস্লেটিভ এসোসিয়েশন।

शब्द । ना, ना, थाक ।

প্রাথমিক। (গুরুগম্ভীরভাবে) সত্য, রাশদ, আমি
মনে করিনি তুমি আসবে। রাজ্যে কিন্তু
বলোঁহল তার ডাক যদি দাতাকার হয়ে
পাকে, তবে তুমি আসবে। তুমি এসে ভালই
করবে! নিজে শা-হয় বোকাপড়া করে যাও,
আমার কর্তব্য থেকে আমি হেঁরাই পাই।
চল, ভিতরে চল। আশ্চা 'আহুত' করবে
গেছের, আমি 'রসমততা', শব্দভিষ্টতা
চুকিয়ে দিই ; তারপর তোমার জ্ঞান
বিবেচনায়া যা কর্তব্য বোধ, তাই করো।
রাশদ। বেশ, চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।]
[দৃশ্য পরিবর্তন, অন্দরমহল, রিজিয়া ওড়না ঘেরাও
হয়ে একটু ঘুরে কৌচের পর আসীন।]

উভয়ের প্রস্থান।
মহমদ। রিজিয়া, ওদিকে ফিরে বসে আছ
কেন? রশিদ এসেছে, দেখ।

কান্দে। (গলা পরিস্কার করে) দেখুন—মান—
দেখ—আমি—অর্থাৎ ডেকে তুমি, আমাকে
বড় ঈশে ফেলোছ—আমার যা বলার, তা
বলার নয়—আমি তোমাদের কাছে স্বর্ণী।
তা' চিরদিনই মানবো। তুমি আমায় ক্ষমা
কর—আমার মত হতভাগ্য ক্ষমার পাত্র।
তোমাকে ছেড়ে মাওয়া আজ যদিও আমার
দুঃখের, কিন্তু জীবনে সব ভুলোটপালোট
হয়ে গেল, তোমাকে আর গ্রহণও করতে
পারলাম না। তবে স্নিগ্ধতা, তুমি আমাকে
ঠিক বুঝবে বলেই এসেছি, আমার দিকে
স্বাক্ষর। দৃষ্টিতে দৃষ্টি না পড়লে মানুষকে

ঢেনা যায় না। হ্যাঁ—চাও, দেখ, মদুখ আর একটু ঘোরাও—হাঁ—হাঁ—একি?—আঁ—রিজিয়া! তুমিই মিলি? Lady of the Park?

রিজিরা। হ্যাঁ। আমায় তুমি ক্ষমা কর, আমি
ক্ষমার পাত্রী।

রশিদ। ক্ষমা কেন? তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ।
কবির থেকে মিস্ মিলি ও রিজিয়া নিয়ে
মন যে দ্বিধায়-শতধা হয়ে যাচ্ছিল, তাতে
দিনে আমার আয়ুর দশ বৎসর করে কমিয়ে
দিয়ে গেছে। সেই মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে
তুমি আমাকে রক্ষা করেছ, তুমি আমার
Guardian angel.

আহমদ। (ঠাট্টার সুরে) রশিদ, তুমি কিছ-
দ্রুত এগনুচ্ছে, আমি বড়ভাই, একটু বেরিয়ে
গিয়ে নিই, কেমন?

[তিনজনের হাস্য ও আহমদের প্রস্থান-
ভিড়মুখে জাহাঙ্গীরের প্রবেশ।]

জাহান্নার। কিন্তু আমার কথা স্মরণ, আমি
ভগ্নীপতি, কল্পনার ভিন্নগুলি শব্দপ্রসঙ্গ
হওয়ার সময়ই তো আমার উপস্থিত থাকা
প্রয়োজন। নয় কি, রিজিয়া বেগম?

রিজিয়া। বেশ তো! আসদুন জলসার জোলদুস
বাড়ান।

জাহাঙ্গীর। না হে। এখনি কেটে না পড়লে
কাঁটা হয়ে পড়বে! আসি তাইলে।
রিজিয়া, প্রার্থনা করি তুমি চির-বিজয়িনী
হও।

[আহমদ ও জাহাঙ্গীরের প্রস্থান]
রিজিয়া। কিন্তু অভিনয় করে তোমার মন

ভুলিয়েছি যে! সে আমার ভারি লজ্জার কথা।

রশিদ। সেটাই ত ঠিক করেছে রিজি। তুমি আমাকে জিতে নিয়েছ। সত্যিই তুমি আমাকে সব দিকে রক্ষা করেছে। খোদা তোমাকে রাজ্যরাণী করুন!

রিজিয়া। রাজরাণী তা করেছেনই। রাজ্যমশাই!
কিন্তু রাজহুশাসনটা যেন এবার থেকে
benevolent despotism হয়। কথার
কথায় রাগ আর গোশাষ। যে ভাই এত করল,
তাকে একটা সিগ্রেটেকেসও দিতে পারব না?
রাশিদ। থাক্ থাক্ হয়েছে। এবার কিন্তু
রাণীর কথা দিতে হবে রাজকে। যেন
অরাজকতা না হয়।

রিজিয়া। যো হুঁকুম!

রশিদ। সত্যি আমি অবাধ মাশি, তুমি কি করে
গতিস্বচ্ছলভাবে আধুনিকায়ন মত সর্বস্ব
চলাচল করতে পারলে?

রিজিয়া। কেন পারব না? তুমিই তো সঙ্গে
ছিলে—You had been a real
husband!

রাশিদ। I see. কাছে এসো না! আর একটু--
হ্যাঁ।

রিজিয়া। এতদিনের পরিচয়েও তোমার মিলির
সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করনি, আর এখন এত
কাঙালপনা কেন?

বিশদ। সে ত ছিল পর, তুমি ত বউ! (সহাস্যে)
The real wife, I mean.

ବିଜିୟା । ଐ-ମ୍ !

রশিদ। হ্যাঁ সত্যি, আশ্চর্য এই বন্ধন, মনে
হচ্ছে যুগযুগান্তর হ'তে তুমি—

রিজিয়া। প্রণয়ী থেকে বন্ধুতে রূপান্তরিত
হয়ে আসছে, কেমন? (হাস্য)

ଶିଶୁ । ଜି, ନା, ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତରୀତ ନା । ମୌଳିକ,
 ଅକୃତ୍ରିମ ପ୍ରେୟାସୀ ।

রিজিয়া। উহু! বউকে ভালবাসলে সে যখন
হ'ল পেয়সী আর পুণ্যীকে গৃহণ করলে

সে যখন রূপেতে হ'ল বউ। ব'ধুরূপী
হতে ব'ধুরূপী হতে হ'ল ত? সেই হ'ল

কঠি নারীর জাগরণ আনতে পারে, যদি

নরের হাতে তাই হয়ে ওঠে জীবনকাঠি।
গাম।

রূপান্তর,
রাজার মেয়ে বন্দী ছিল

রাজার ছেলে বাজায় বাঁশী
ঘুম ভাঙানো সুরে

সুদূরে রেশে ভ'রলো পদরী
উথলে নিরন্তর;

পায়ে ছিল সোণার কাঠি
রূপার কাঠি শিরে,

এক নিমেষে বদলে দিল
পেল গো প্রাণ ফিরে,

জীবন্ত মস্তর;
হলো, সুপাস্তর।



বারিৰ প্ৰতিবেদক জাৰিভাৰ কৰিচা গিৰাভন । সেই মহাকাণ্ডৰ বিলিঙ্গাভাৰি
 উল্লিঙ্গ সন্মুখিত কৰিচাৰি বিলিঙ্গাভাৰি কৰিচাৰি ও পৰিচাৰ কৰিচাৰি বাৰিচক
 বিলিঙ্গাভাৰি কৰিচাৰি । উচা বাৰিচাৰি কৰিচাৰি কৰিচাৰি কৰিচাৰি
 উচাৰি একমাত্ৰ বাৰিচাৰি কৰিচাৰি ।
 জাৰিচাৰি কৰিচাৰি ।

मह्य मह्य नरवाही आदवागा नाथ करिअरे ।

বাইকল ল্যাবোরেটরি লিঃ

१. राधा काल जो है छोटे कलिकाता



এলুমিনিয়াম

“ক্রাউন” এবং “গোল্ডমোহর”

এলুমিনিয়ামের বাসনপত্র ব্যবহারে সর্বশ্রেষ্ঠ।

- দেখিতে উজ্জ্বল, ব্যবহারে সুবিধাজনক। সাবান কিম্বা নরম মাটি অথবা ছাই দ্বারা অনায়াসেই পরিষ্কার করা যায়।
- দামে সস্তা এবং অপরিহার্য; কারণ ওজন হালকা, কলাই খরচা নাই; অল্প আঁচে কম সময়ে রান্না হয়।
- স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ, ইহাতে রন্ধন করিলে ‘ভিটামিন’ অধিক পরিমাণে বজায় থাকে।
- সমস্ত ভাঙ্গা ধাতু অপেক্ষা, পুরান ও ভাঙ্গা এলুমিনিয়ামে বেশী মূল্য পাওয়া যায়।

● সাবধান !! সস্তা দামের এলুমিনিয়াম কিনিলে না কারণ তাহা বিশুদ্ধ নহে এবং রন্ধনকার্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং অনুপযোগী।

জীবনলাল (১৯৫১) লিমিটেড

বিখ্যাত “ক্রাউন” ব্র্যান্ড নিৰ্মাতা এবং

দি এলুমিনিয়াম ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেডের

বাসনপত্রের সোল সেলিং এজেন্ট:

কলিকাতা * বোম্বাই * মাদ্রাজ * রাজমহেন্দ্রী * দিল্লী * এডেন * রেঙ্গুন।

রঞ্জন ভি, সি, ফ্যান

ফ্যানের প্রয়োজন ও অভাব এ বছরের চাইতেও আসছে বছরে বেশী হবে। অসামরিক চাহিদা সরবরাহের জন্য সরকার মহোদয় শতকরা ৫টি মাত্র ফ্যান সরবরাহের অনুমতি দিয়েছেন। আপনার নাম আজই “ডিরেক্টর অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং” মহোদয়ের চনং এস্‌প্লানড্‌ ইন্ট, কলিকাতা—ঠিকানায় দরখাস্তের মারফতে রেজিস্ট্রী করে রাখুন।

যুদ্ধ অবসানান্তে আপনাদের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটাবার সুযোগ কামনা করি।

জি, টি, আর কোং লিমিটেড

দমদম অফিস ও কারখানা—
৩৭নং দমদম রোড,
কলিকাতা।

কলিকাতা অফিস—
৬নং ক্রাইড স্ট্রীট,
কলিকাতা।

সোভিয়েট বিজ্ঞান

ভারত তত্ত্ব

ডক্টর শ্রী ভূগোন্ধ্রমাথ দত্ত

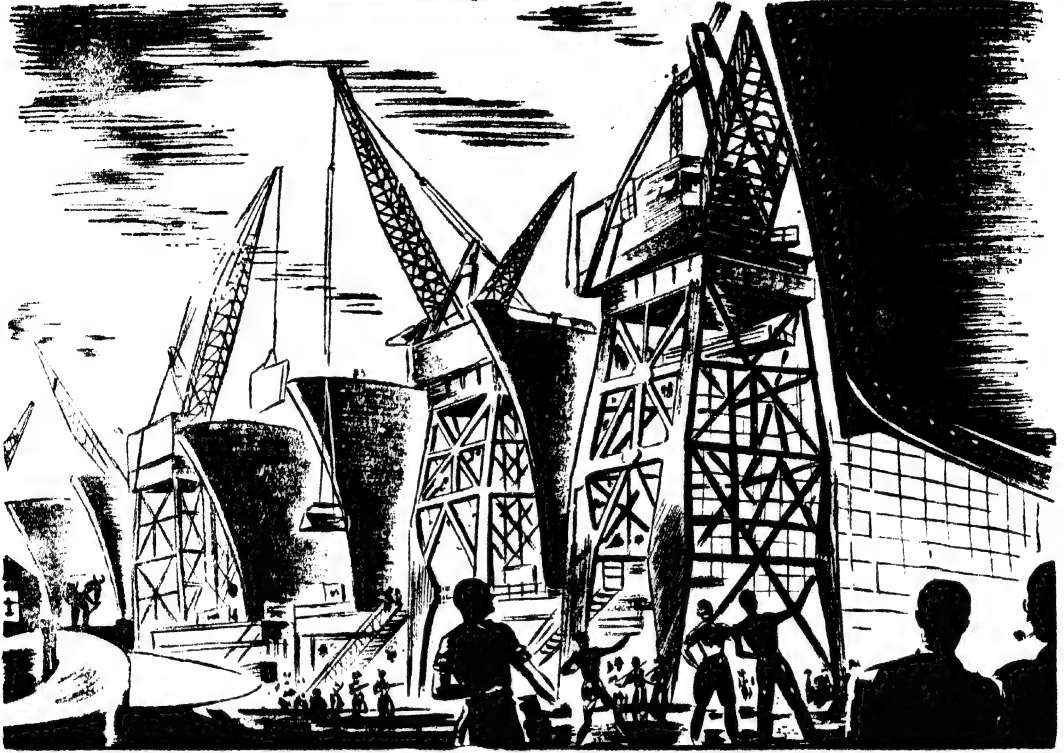
বর্তমান দ্বিতীয় জগৎযুদ্ধ যুদ্ধের একটি অঙ্গ হইতেছে নাৎসী জাতিগণ সোভিয়েট-রুশের উপর আকস্মিক আক্রমণ। এই দেশের সহিত সোভিয়েট-রুশের অনাক্রমণমূলক সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া রুশ প্রতিপদে পশ্চাৎ হ্রস্বগণ করিতে বাধ্য হয়। নাৎসী সেনা-নায়কেরা নতু বরিয়ালিয়ারা, "চারি সপ্তাহে রুশ-বাহিনীকে পরাজিত করিব ও আর বাকী হয় নতাহা হইবে ছিন্নভিন্ন করিয়া নিশ্চয় করিয়া দিবা।" কিন্তু জার্মানি কটিকা বাহিনীর কাব্য-হ্রস্বগণ ও রণকুলশতা সত্ত্বেও মাসের পর মাস গেল, সোভিয়েট বাহিনী পরাজিত হইয়াও ধ্বংস হইল না বরং আজ প্রতি-আক্রমণ স্বারা জার্মান সৈন্যদলকে রুশের সীমানা হইতে বিদূরিত করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া লোকের মনে প্রশ্ন উৎপাদিত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় রুশের পশ্চাৎ অপসরণ দেখিয়া সোভিয়েট বন্ধুরা মুহূর্তমান হইয়াছিলেন, শত্রুরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিল, "আপন গেল, বাটা গেল।" তাহার বলিতে লাগিল, "হি, এই সোভিয়েটের গণসৈন্য? চাষার দল যুদ্ধবিদ্যার কী ব্যক্তি এবং যুদ্ধসম্ভারও কি প্রস্তুত করিতে জানিবে?" এতদ্বারা তাহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছিল, সোভিয়েট সম্মত সাম্যবাদ স্বারা একটা জাতি মহান ও শক্তিশালী হইতে পারে না, হিটলার প্রবর্তিত পদ্ধতি স্বায়াই জগতে একটা জাতি প্রতিভাশালী হয়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে, তাহাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ জগতে চাষী ও মজুরের সাম্যবাদের সমর্থনকারী অপেক্ষা ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির তরফদারী করার লোকের সংখ্যা বেশী। বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষে, যেখানে সুদূর অতীত হইতে লোকে বৈষ্ণোজ্ঞানী শাসনে অভ্যস্ত হইয়াছে এবং যথার বর্ণ ও শ্রেণী বৈষম্য স্বাভাবিক ও চিরের প্রদত্ত বিধান বলিয়া স্বীকৃত হয়, তথায় সোভিয়েট সম্মত সাম্যবাদ হাস্যজনক করিবার লোক বিরল। আসল কথা এই, বিগত জগৎযুদ্ধ যুদ্ধের পর, রুশ বিপ্লবের প্রতিজ্ঞাস্বরূপ যখন জার্মানীও অস্তিত্বহীন সোভিয়েট বিপ্লব হইল, পরে রুশের চারি পাশের দেশসমূহে কৃষক বিপ্লব (১৯২৫ খৃঃ "স্বল্প বিপ্লব") হইয়া ওই সব দেশে কৃষিকারী প্রথা অন্তর্ভুক্ত হইল, পরে ভূকৃষ্ণ কামাল আভা-ভূকৃষ্ণ খেলাফৎ ও মুসলমান রাষ্ট্র-পদ্ধতি অপসারিত করিয়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সম্মত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের পক্ষ করিলেন, যখন জাপান,

চীন ও ভারতে শ্রমিক ও কৃষকসমূহ স্বাধিকার লাভের জন্য আন্দোলন হইল, তখন বনিয়াদী স্বার্থের লোকেণ্ডা পৃথিবীর সবাইই অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। একি বংশ মর্যাদা, ধন ও পদের সম্মান থাকিবে না, পাথরী মোল্লা-পুরোহিতদের প্রতিষ্ঠা থাকিবে না, কেবল চাষী মজুরেরাই সমাজে উচ্চপদ পাইবে, এ যে জগতে নতুন বিপ্লব। এইজন্যই সোভিয়েট-রুশকে নানাদিক হইতে বিধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা চলে; কিন্তু জগতে কল্যাণকামীরা যখন তাহাদের পূর্ণা অভিসন্ধিতে অকৃতকার্য হইলেন, তখন সোভিয়েট-রুশকে তাহারা একঘরে করিলেন। ইতিমধ্যে জার্মানীতে হিটলারের উদয় হয়। অবশ্য এই উদয় আকস্মিক নয়, জার্মানীর দেশী এবং তৎসঙ্গে বিদেশী ধনীরা ইহার জন্য অনেক দিন হইতেই ধনী জমলাইয়া বসে করিতেছিলেন। সেই মজবুত হইতে হিটলারের উদয় হয় এবং জার্মানীতে মার্ক্সবাদী দলসমূহকে বিধ্বংস করা হয়। হিটলার ক্ষমতা পাইয়া বলিয়াছিলেন—"আমাকে চার বৎসর সময় দাও, তাহা না হইলে মার্ক্সবাদ বোলচেভিকবাদ জার্মানীকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিবে।" এই সব ইতিহাসের কথা ইহার ফলে ধনতান্ত্রিক জগৎ স্বাধীন-নিঃশাস ফেলে। তৎপরে, হিটলারী দল নিজের খাতি "আর" বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল, স্বেচ্ছিকবাসীভূত পতাকা উত্তীর্ণ করিতে লাগিল। ইহাতে ভারতের গোড়া হিন্দুর দল আত্মদে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আর কি, কৃষিক অবতার জগতে প্রকট হইয়াছে, জার্মানীতে হিন্দু ধর্মের জয়ডঙ্কা বাজিতেছে, হিটলার হিন্দু ধর্ম প্রচার করিতেছে (শেষোক্ত উক্তিগুলি লেখক স্বকর্ণে শুনিয়াছেন)। আসল কথা এই, হিটলারের যেসব সামাজিক বিশ্বাস এবং ইহুদীদের প্রতি যেসব ঘণ্টা প্রয়োগ করা হয় তাহা হিন্দু বর্ণাশ্রম এবং শূদ্রের প্রতি ব্যবস্থারই অনুরূপ। গৌতমপ্রতি ও মনতে শূদ্রের প্রতি যে ব্যবস্থা আছে তাহা ইহুদীদের প্রতি হিটলারীর আচরণের সঙ্গে মিলে। এইজন্যই বর্ণাশ্রমীদের এত উল্লাস, গোলামের জাতি গোলামকেই স্বাভাবিক বলিয়া মনে করে।

সহাই হউক হিটলারের অভ্যুদয় এবং শেষে ইংলণ্ডের সহিত তাহার যুদ্ধ এদেশের লোকের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। জার্মানী ভারতের বৃদ্ধ করিতেছে, এই ধারণা অনেকের মনে উদয় হয়। যে হিটলারের শত্রু ও এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের মিত্র তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা স্বভাবতঃ অনেকের মনে জাগিয়া উঠে। ইহার ফলে সোভিয়েট রুশের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব অনেকের মনে উদয় হয়। একেই এই দেশের বনিয়াদী স্বার্থের তরফদারীরা সোভিয়েট-রুশের প্রতি কখন রুসী ছিল না, তৎপরে এই যুদ্ধে অশ্রুতপূর্ব সমাবেশ দেখিয়া রুশের প্রতি এই শ্রেণীর ভাবভাবের মন বিকৃত হয়। রুশ জাহায্যে "বাউক" এই ইচ্ছাই তাহাদের "অনিদিত মনের" পদাধি নিহিত থাকে।

লেখক ১৯২৫ খৃঃ হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন যে, এই দেশের শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন শ্রেণীর লোকেরা সোভিয়েট-রুশের ভাল দেখিতে চায় না, ভাল শুনিতে চায় না। পরাধীন, পদদলিত, বৈষম্যমুক্ত সমাজের লোকেরাই মুখের বাতী শ্রবণ করিবে, তাহার পরিবর্তে তাহারা এই বাতীর প্রতি বিবৃণ। ইহার মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যাত গেল আর একটি কথা ব্যাখ্যাত হইবে। হিন্দু সমাজে গ্রাহ্যগোপিকা শূদ্র বেশী গ্রাহ্যগোপিকা ও গোড়া। পুনে শূদ্রের সামাজিকপদ যত নিম্নের দিকে যাইবে গ্রাহ্যগোপিকা আচারের গোড়ামি ততই করিবে। শূদ্র গ্রাহ্যগোড়ামি করিলে মনে করে তাহার সমান এবং তৎক্ষণা সামাজিক পদ-মর্যাদা বৃদ্ধি হইবে। এইজন্যই সে গ্রাহ্যগোড়ামিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পুনে বিদেশের মুসলমানগোপিকা ভারতের মুসলমান বেশী গোড়া, আর ভারতের অন্য প্রদেশগোপিকা বাঙালার মুসলমান বেশী গোড়া (শেষোক্ত অভিযোগটি লেখক তাহার সৈয়দ বংশীর এক বিহারী বন্ধুর কাছ হইতে শুনিয়াছেন)।

এই মনস্তত্ত্বের অর্থ—নিম্নস্তরের হিন্দু মনে করে গ্রাহ্যগোপিকা পুরোহিত বাণীয় গোড়ামি ও ব্যবস্থা সনাতন এবং একমত পন্থা, ইহাকে আশ্রয় করিলে তাহার মঙ্গল ও সামাজিক পদোন্নতি হইবে। রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাস তাহার কাছ জ্ঞাত, সে যে অবস্থায় জাম্মায়ে সেই অবস্থাকে শাস্ত্রত বলিয়া মানিয়া নিয়াছে। ইহার বাহিরে সে তাহার মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে অসমর্থ। শূদ্র জানে না কি ভীষণ শ্রেণী সংগ্রামের ফলে সে পাতিত হইয়াছে। তাহার গ্রাহ্যগোপিকা পুরোহিত বিজ্ঞতা ও শাসক হইয়া মনঃসংহিতা পুনে সংকলিত করিয়া তাহার প্রতি যে ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা ঈশ্বর প্রদত্ত বলিয়া সে আজ পর্যন্ত বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। এই জনাই গোলাম মনোভাবব্রতত বৃদ্ধিপ্রদানিত হইয়াই শূদ্র জাতিগণী ধর্মের দোহাই দিয়া



We have a hand in it!

আধুনিক জগৎকে বর্তমান সভ্যতা দিয়াছে—সকল রকমের শিল্পঔষ্যাদি উৎপাদনের উন্নততর প্রণালী, সম্ভব নিকটাকাটে যাতায়াত, মালপত্রাদি চালান দেওয়ার সম্ভব রকম সকল সুবিধা-সুযোগ।

পৃথিবীকে উন্নততররূপে রূপান্তরিত করিতে যন্ত্রপাতির অর্থাৎ বাষ্পপোত, বাষ্পশকট, ট্রাক্টর, ট্রেন ও অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি ইত্যাদিরও দাম উপেক্ষণীয় নহে; আর ব্যাপকভাবে সমগ্র জগৎ ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের নিকট বিশেষ স্বর্ণী।

ইহাতে আমাদের কিছু হাত আছে, আমাদের কারখানায় ইউরোপীয়ান তত্ত্বাবধানে সকল রকম শিল্প-যন্ত্র ও সাঙসরঞ্জামাদি প্রস্তুত হইতেছে। আমাদের জিনিষপত্র ব্যবহারে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন, আপনাদের সকল রকম খোঁজখবরাদিই সাদরে গৃহীত হইবে।

যুদ্ধের প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহ করার বিরাত চাপ থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের অসামরিক গ্রাহক-বর্গের প্রয়োজনীয় মালপত্রাদিও সময়ে তৎপরতার সহিত সরবরাহ করিতে পারি। কোন অবস্থায়ই অবহেলা করা হয় না।

JAS. ALEXANDER & CO. LTD.

১৫, ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীট (খিদিরপুর), কলিকাতা।

ফোন: সাউথ ১৪০১ Gram: "JASALEX"

নিজেদের নিম্নাবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া আছে। এই বিষয়ে চৈতন্যমন্ডনের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে। তিনি পূর্বাতে কলির আয়ার বর্ণনাকালে বলিয়াছিলেন, কলিতে “চন্দ্রালিনী শ্রেণী কলির একাদশী...গ্রাহ্যে রাখিবে দাড়ী—পারস্য পড়িবে” (জয়ানন্দের চৈতন্য মণ্ডল, দ্রষ্টব্য)। এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে। দাস তাহার অবস্থার পূর্বাণের ভাবিতে অসমর্থ, ভারতে তাহার জন্য হাজার দলে স্পার্টাকুসের ন্যায় চন্দ্রবাস্তবিককরণী লোকের উদয় হয় না, বরং গোলামি প্রকৃতি স্বাভাবিক অবস্থা ও ইহা হিন্দু ধর্মের অনুশাসন বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করা হয়। ব্যবহারিক দৃষ্টান্তকে মানিয়া লইবার পরামর্শ উপনিষদের সময় হইতেই নানাভাবে চলিতেছে। ইহা নাকি হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য এবং এই উপায়েই নাকি হিন্দু জাতি আজও জীবন সংগ্রামে টিকিয়া আছে। ফলতঃ সামা, ক্ষেত্রী, স্বাধীনতা, মানবের মূর্তি, জাতির সার্বজনীন কল্যাণ, সমাজ-শরীরের সার্বজনীন মূর্তি প্রকৃতি কথা এই দেশে বিশেষভাবে লোকের কাছে গহ্বরিত ও আদৃত হয় না। শিকতি লোকেরা মনোভাব এই: যে পদ্ধতিতে (Polity) সে অন্য লোকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিজেদের আর্থিক উন্নতি করিয়াছে বা করিতেছে এবং তালুকদারকে ধারাবাহিক সুবিধা পাইতেছে, সে পদ্ধতি তাহার মত ভালো ও প্রের। আর তাহার যে পরিবর্তনের পরিকল্পনা করে সে তাহার শত্রু এবং তৎক্ষণাৎ মানবের শত্রু।

ইংরেজ ই ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে নিজেকে শাসকরূপে প্রতিষ্ঠা করিবার ফলে এসব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এই দেশে প্রবর্তিত করে। তাহার ফলে ইংরেজ গণপরিষদের চাকরীমণী ও ব্যবহারজীবী শ্রেণীসমূহ উদ্ভূত হয়। এই দুই শ্রেণীই বঙ্গ প্রদেশে সর্বাধিকার প্রাপ্ত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। একদিকে, পূর্বা ভারতে ইংরেজ শাসক নিজের অস্বাভাবিক করবার একটা শ্রেণী সর্বপ্রথম হইতেই সৃষ্টি করে। ইউরোপের এক বিশেষতঃ আমেরিকাতে ইংরেজ প্রবর্তিত জমিদারী প্রথা সুদূর পাশ্চাত্য, বিহার ও উড়িষ্যা আমদানী করা হয়। একদিকে চিরস্থায়ী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তাহারাই জমির কষক ও গণপরিষদের মালিকত্ব হইয়া রাজস্ব আদায় করিবে, জমির উন্নতিকল্পে বাহা বাহা প্রয়োজন তাহা করিবে এবং তাহাদের রাজস্ব চিরস্থায়ী হারে নির্দিষ্ট থাকিবে, অন্য দিকে এই শ্রেণীর স্রষ্টা জমির কষকের রাজস্ব আনিদেও হারে থাকিবে ইত্যাদি সুদূর সুবিধা দশসালার বঙ্গোপসংসার সংস্কারিত করা হয়। পক্ষ, এই চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথার অজুহাতে একটা অতি বৃহৎ মধ্যবিত্তভাগী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। অনেক স্থানে এই মধ্য স্বতন্ত্রের সংখ্যা সত্তের পঞ্চাৎ উঠিয়াছে! ফলতঃ পূর্বা ভারতের লোক একদিকে কৃষকদের অর্থনীতির (Agricultural Economy) উপর প্রায় সত্ত শত বৎসর পণ্ডায়মান হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। তৎপরে, গমীশপন স্বাধীন উৎপাদন প্রণালী প্রবর্তিত হওয়ায় একটা চাকরীজীবী বৃহৎ শ্রেণী উদ্ভূত হইতেছে। ইহারাও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত হইতেছে। এই সব, জমির স্বত্বভোগী, ব্যবহার-জীবী, ভেদজীবী, চাকরীজীবী প্রভৃতি নানা প্রকারের বৃক্ষজীবী শ্রেণীসমূহ ভাবে, যাঃ এই

রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থাই ত ঠিক। ইহাতে আমাদের অসিত্য বজায় রাখিবার একটা ব্যবস্থা আছে। তৎপরে, পূর্বাণের ভবিষ্যৎ অসমর্থ নাই না প্রতি নাই বলিয়াই ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়া, চন্দ্র মূর্তিত করিয়া ইহারা বলেন, এই ব্যবস্থাই ভারতে শাস্ত্র ও সনাতন। আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টির ঐতিহ্য কি আমরা এই মস্তেকার উদ্ভট মতসমূহ প্রবর্তনের দ্বারা ধারাইবা! ভারতে ও সব চলিবে না। এই সব লোক অন্য পক্ষে, স্বাধীনতা, স্বরাজ, স্বরাষ্ট্র প্রকৃতির কথা বলেন এবং কেহ কেহ জাতীয় আন্দোলনের সহিত সহানুভূতিও প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহা স্বার্থপর সাধনোদ্দেশ্যেই করা হয়। স্বরাজ ও স্বাধীনতা অর্থে, তাহারা নিজেদের স্বদেশী শাসকশ্রেণীরূপে প্রবর্তিত হওয়া এবং তৎপরে স্বাধীন তালুকদারকে বড়াইবার স্বপ্ন দেখিবে। স্বাধীনতা অর্থে গ্রাম-পুত্রোচিত ভাবেন, শত্রু তাহার আরও বধ হইয়া “দেব ও লিজে প্রত্যাহা” প্রদর্শন করিবে; জমিদার ভাবেন, টাকার জোরে চোট কিনিয়া আইন সভায় গিয়া টাকার দ্বারা তাহার তালুককে অক্ষয় করিবেন ও বড়াইবেন; মধ্যবিত্ত-ভোগীরা ভাবেন, তাহাদের মধ্যবিত্ত ভোগকে জাতীয় অর্থনীতির দেহাই দিয়া আরও কায়মী করিবেন; ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার ভাবেন, জাতীয়তা ভাঙার প্রকারের সব তাহাদের প্রসার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করাইবেন। চাকরীজীবী ভাবেন, তাহার চাকরীর পদের বালি করাইবেন ইত্যাদি। ইহারা, ইংরেজী শাসন প্রবর্তিত দর্শনকে রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বাহিরে রাখি আদৃত পাবেন না। স্রষ্টা শ্রেণীসমূহকে তাহার বিনামূলী স্বার্থ (Vested Interests) বলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার অসিত্য কায়মী করিতে চান। এই জন্যই যে উপায়ে তাহার বিধি হইয়াছে, সেই উপায়েই তাহারা শাস্ত্র ও সনাতন বলিয়া তালুকদার নানা উপায়ে চাকরী করেন। একবার মধ্যবিত্তের কয়েকজন জমিদার, উকিল ও ডাক্তার লেখকের কাছে আসিয়া বলেন—সমাজের যে যেমন আছে তাহা ঠিক থাকিবে, অথচ দেশে স্বাধীন হইবে—এইরূপ পন্থা প্রদর্শন করিয়া দিন। লেখক তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে তিনি অক্ষম। ইহাই হইতেছে আমাদের দেশের শিক্ত ও অবস্থাপন শ্রেণীদের মনোবৃত্তি। এই জন্যই ইহারা ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কৃষ্টির প্রতি এত অনুরাগ প্রদর্শন করেন। এই জন্যই, আজও ইহারা পুত্রোচিত ভিত্তিরায় যুগের মতসমূহকে শাস্ত্র বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকিয়া তাহা ভারতের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বলিয়া চালাটবার চেষ্টা করিতেছেন।

এই মনোবৃত্তির জন্যই সোভিয়েট-রুশের প্রতি ইহাদের এত বিতৃষ্ণা! এইজন্যই সোভিয়েটের প্রতিপক্ষীয় কথাগুলি তাহারা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন; সোভিয়েট পন্থা ব্যর্থী পরিকল্পনা নাকি ব্যর্থ হইয়াছে, সোভিয়েট জমি সমস্যার সমাধান করিতে অক্ষম, তাহার স্রষ্টা সমস্যার সহিত সোস্যালিস্ট পরিকল্পনার সমস্যা করার সোস্যালিসম ব্যর্থ হইয়াছে, কার্ল মার্ক্স জমি সমস্যা বিষয়ে কিছু বলেন নাই, আর রুশে জমি সমস্যা প্রদান সমস্যা, অতএব মার্ক্সের মত তথ্য চলিতে পারে না,

আবার মার্ক্সের অর্থনীতিক মতগুলি ভুল, বেশ লোকে তাহা আর বিশ্বাস করে, সোভিয়েটে মনোভোগী (Totalitarian) শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে, তথ্য স্বেচ্ছাচারী নেপোলিয়নও প্রকট হইয়াছে ইত্যাদি সব বুলি, আমাদের দেশের সম্প্রতিশালী শ্রেণীদের ও তাহাদের ভাড়াটিয়াদের দ্বারা সর্বত্র প্রচারিত হইতেছে। এইসব শ্রেণী এখন গোড়া “ন্যাশনালিস্ট” সাজিয়া হিন্দুর কৃষ্টি, ভারতের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের বন্ধন নামে নানা উপায়ে কার্যতৎপরতা প্রদর্শন করিতেছেন—এই জন্যই, মার্ক্সের ধর্মঘটের পশ্চাতে ইহারা বৈদেশিক প্রচেষ্টা দেখেন, এই জন্যই “লাগল যার জমি তার” ধর্ম, সামাজিক বিশৃঙ্খলের উপায় আর মানবের অর্থনীতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণকে ভারতীয় কৃষ্টির পরিপন্থী বলিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন। ভারতের গণ-শ্রেণীসমূহের মূর্তির প্রচেষ্টাকে বৈদেশিক প্রভাব ও জাতীয় আন্দোলনের শত্রু বলিয়া গণ্যইতেছেন। ইউরোপে খৃঃ ১৯১৯—১৯২৫ সাল পর্যন্ত তথাকার বুল্গেরিয়া ও তাহাদের ভবিষ্যৎদের মনেও এই ভীতি উৎপাদিত হইয়াছিল। রুশের ও মধ্য ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির বিপরীত দিক হওয়ায় এবং ইউরোপের সর্বত্রই কম্যুনিষ্ট-দল সংস্থাপিত হওয়ায় এই শ্রেণীদের মহত্বের সম্ভাব্য হয়। মধ্যভাগের জমিদারদের বংশধরদের আসন বিচ্যুত হইল, তাহাদের আর কেউ Gottes Gnade (ঈশ্বরের দয়াপ্রাপ্ত পুরুষ) বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করে না, কারখানার মালিকদের ভয় হয়, যেহেতু শ্রমিকেরা বিনা রোজগারে লাহের (unemployed increment) বধা চায়। জমির কম্যুনিষ্টেরা তাহা দখল করিতে চায়, কৃষক প্রজারা জমির মালিক হইতে চায় ইত্যাদি দোঁসিয়া তাহারাও দিশাহারা হয়। তাহারাও নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠে এবং ভয়ে চীৎকার করিতে থাকে—“বিশ্ব-বিশ্লব” (World-Revolution) আসিল। চারিদিকে রব উঠিল—এসিয়ার বর্ষাক্তা রুশের মধ্য দিয়া ইউরোপ গ্রাস করিতে আসিতেছে। এমনকি একজন জার্মান মনীষী ভীত হইয়া Downfall of the occident নামে এক প্রকাট পুস্তক লিখিয়া ফেলিলেন! তিনি বলিলেন, প্রাচ্য ইউরোপের পতন হইতেছে। এই প্রকারে ভয়ে অনেকেরই মস্তিস্ক বিকল হয়, ইহার মধ্যে একটি হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার সংঘটিত হয়। খৃঃ ১৯২০ সালে সুইডেনের একজন লেখক একপ্রকারে ভীত হইয়া কাগজে লিখিলেন, “বিশ্ব-বিশ্লব আসিতেছে, তাহাকে আর রোখা যায় না, রুশ বোলচেভিকরা এই কর্মের জন্য নানাপ্রকারের চর লাগাইয়াছে, ভারতীয় কবি ঠাকুর ওই যে চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ও একজন বোলচেভিক চর!”

আমাদের দেশেও এইসব কারণে বানান্দী পন্থার দলের লোকেরা নানা উপায়ে সোভিয়েট-রুশের নিন্দা ও সোভিয়েট কৃষ্টির প্রতি অজ্ঞতা করিয়া আসিয়াছেন। সোভিয়েটের তাহারা অস্বীকার করিয়া জার্মানী-ইংল্যান্ড-আমেরিকাসমূহ বুল্গেরিয়া কৃষ্টিতে একদল সত্য ও পন্থা বলিয়া আঁকড়াইয়া আছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য দেশসমূহে একদল নতুন ভাবকে সমীক্ষিত হইয়াছেন। তাহারা উনিবংশ শতাব্দীর বুল্গেরিয়া কৃষ্টির ফুল প্রদর্শন করিতেছেন এবং বলিতেছেন, ইহা

Planeta 13 Mo

কা র্ সি য়া : (দা র্ জি লি :)

আ ধু নি ক ত ম প্র ণা লী তে প রি চা লি ত
উ ত্ত র ব ক্ষে র বৃ হত্ত ম ব্য ব সা য়ী প্র তি ষ্ঠা ন

ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—

দা র্ জি লি ং রো প ও য়ে কো ং লিঃ

যাতায়ত ব্যবস্থা { আকাশ পথে : দা র্ জি লি ং — বি জ ন বা ডী
মো ট রে : শি লি গু ডি — দা র্ জি লি ং

দা র্ জি লি ং প্রপারটিজ্. লিঃ

কার্সিয়াং হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক সান্সাই কো ং লিঃ

গোয়েন্কা এণ্ড কো ং (সেলস্) লিঃ

অটল টী কো ং (১৯৪৩) লিঃ

সংশ্লিষ্ট কোম্পানীসমূহ :—

গল্গলিয়া রাইস এ্যাণ্ড অয়েল মিলস্

এন্, সি, রাইস মিলস্, ইসলামপুর

গোয়েন্কা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

এ জে ন্ট স্ :—

বার্মা শেল : হুগলী ক্লাওয়ার মিলস্ : ডানলপ রাবার :

রোহটাস সিমেন্ট : হ্যাডফিল্ডস্ পেইণ্ট : ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দা র্ জি লি ং, ভূম, কার্সিয়াং, শি লি গু ডি, জলপাইগুড়ি, বাগডোগরা,
ময়নাগুড়ি, কিশোরগঞ্জ এবং ৩০, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম :—“গোয়েন্কা”

টেলিফোন :—৩০

শ্রেণীস্বার্থ বিজড়িত। বহু পূর্বেই যখন পশ্চিম পশ্চিম মার্কিন ভাষাভাষী নামক পুস্তকে দেখিয়েছিলেন, প্রচারে বক্তৃতা জ্ঞানোন্মেষের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিকৃত করিয়া নিজের শ্রেণীস্বার্থের পরিপোষক মতে পরিণত করিয়াছেন। এক্ষণে অনেক স্থানেই তদ্রূপে, ঐ প্রকারে বক্তৃতার ফিললাউ হইতে সমাজতাত্ত্বিক এস্টেটের মার্ককে আদানী করিয়া তাহার দ্বারা লিখিয়া পর যে বর্তমানের বক্তৃতা প্রতিষ্ঠানগুলি মানব সমাজে শাসন এবং শাস্যবিক, এমনকি মানবের কতকগুলি প্রতিষ্ঠান যথা একসদ্য বিবাহ এবং তদুপরি যে পারিবারিক বন্ধন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রভৃতি, তাহা মানব তাহার বানর পূর্ব-পূর্ব হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হওয়াছে (ভারতের লোকেরা বানরের একসদ্য প্রকৃতির কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই হাসিযেন। কিন্তু পাক্ষ্য পণ্ডিতেরা ইহা ঐজ্ঞানিক সত্য বলিয়া গ্রহণ, বক্তৃতা ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রকৃতির ওকালতী করা ত চাই!) তৎপরে মার্কের মতপন্থিত হো তাহার আমল হইতে সত্য দেশসমূহের শুল্ক ও কলঙ্কে স্যাববই করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত, ঐয বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে Germ-plasm-এর অপরিবর্তনীয়তা এবং ওৎপ্রসূত জীবের মধ্যে Heredity শক্তির প্রাবল্য একমাত্র বৈজ্ঞানিক সত্য বলে প্রচারিত করা হইতেছে। পূর্ব উল্লিখিত শতাব্দীর শেষ প্তীয়ায়শে যখন Colonial Imperialism (উপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদ) এর উৎস হয়, তখন উপনিবেশসমূহের অধিবাসীদের উপর নিজেদের শোষণ ও শাসন অতল কঠোর করা উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক মতসমূহও সৃষ্টি করা হয়। উপরোক্ত Germ-plasm-এর বৈশিষ্ট্য এবং Heredity মতাদ্বা নর সমাজে প্রচায়ে করিয়া করা হইল "শ্রেণী জাতি" নারি স্বাধীনতার অধর, তাহারা অশ্রেণী জাতিদের জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, ইহারা নিম্নশ্রেণীর মানবপুত্রী ভাবে, তাহারা অশ্রেণীর চিত্রাঙ্কন অসম্ভব উন্নত হইবার "জাতিগত শক্তি" (Race-Capacity) তাহাদের নাই বা কমভাবে আছে। এইসব উন্নত মতগুলি জীবতত্ত্বের অংশবিশেষ, পর তত্ত্ব (Anthropology) নামক বিজ্ঞানের নামে চালান হইতে লাগিল। এইসব তথ্যবিশিষ্ট নর-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া সমাজ-তত্ত্বও সংগঠিত হইল। সেই সময় হইতে উচ্চতরের ও নিম্নতরের মানব জাতি, White man's burden (শ্রেণী-জাতির ভার বা দায়িত্ব), Control of the Tropics (গ্রীষ্ম প্রধান দেশসমূহের শাসন) প্রকৃতি নামমত জাতির ইহা সর্বত্র পঠিত ও গৃহীত হইতে থাকে। এই প্রকারে সাম্রাজ্যবাদীদের শ্রেণী-স্বার্থ প্রসারিত মত-গুলি সমাজে সত্য বলিয়া আমাদের দেশেও শিক্ষালয়সমূহে পঠিত হয় এবং তাহা সত্য সত্য বলিয়া আমরাও বিশ্বাস করিয়া কৃতার্থ হই!

ইতিমধ্যে বগ নামক একজন জার্মান পণ্ডিত আবিষ্কার করিলেন যে, ভারতের আর্য ভাষাভাষীর সহিত পশ্চিম এশিয়ার এবং ইউরোপের অনেক-গুলি ক্রাসিকল ও বর্তমানের ভাষার সহিত সাদৃশ্য আছে। তৎপরে, গ্রিম নামে আর একজন জার্মান পণ্ডিত তথ্য আবিষ্কার করিলেন, কি প্রকারে রাজন বর্ণের পরিবর্তন হইয়া (Shifting of the Consonants) এই সম-অসম পার্থক্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার পর,

জার্মান পণ্ডিত মাক্সমুলার সংস্কৃত ভাষার সহিত একজাতীয় ভাষাভাষীর নামকরণ করিলেন— "ইণ্ডো-ইউরোপীয়" বা আর্য ভাষা। ইহাতে সেই দলের আশ্রিত হইল, "ইণ্ডো-ইউরোপীয়" নামটি জার্মানদের অসহ্য হয়। তাহারা ইহার নাম রাখিলেন,—"ইণ্ডো-জার্মান"। আর এক জাতীয় ভাষার জন্য "বাগ্গালী" কৃষকের সহিত ইংরেজ টমি আটকনের এক রক্ত-সম্পর্ক সম্বন্ধে মাক্সমুলার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অনেক ইউরোপীয় এবং আংগো-ইণ্ডিয়ানদের বিশেষ আশুপিত্তজনক হয়। শেষে, মাক্সমুলার বলিলেন, আমি "আর্য" অর্থে একটা বিশিষ্ট জাতি বন্ধি না, "আর্য" শব্দের সহিত মানবের চুলের বা চক্ষুর বা গায়ে বর্ণের সম্পর্ক নাই। "আর্য" শব্দে এক শ্রেণীয় ভাষা বন্ধি। ইহাতে নেটিন-বিশেষীদের গাফলদ নিবারণিত হয়। কিন্তু জার্মান জাতীয় পণ্ডিতেরা ছাড়িবার পাত্র নন। যখন শতাব্দীবিংশ জার্মান রাষ্ট্রসমূহ পুনঃ পুনঃ গ্রন্থন দ্বারা আক্রান্ত ও বিজিত হইতেছিল, তখন থেকেই জার্মান পণ্ডিতদের দ্বারা জার্মান জাতিদের সমীকরণের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। রাষ্ট্র-

দ্বন্দ্বিত্ব একটাই ক্রটিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা জার্মান (Germandom) ভাব প্রচার করেন। এই সংগে তাহারা "জাতিত্ব" (Race-theory) দ্বারা মতের উপর জোর দিতে থাকেন। পরে, জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহারা নিজেদের "খৃষ্টি আর্ষ" বলিয়া জাহির করিতে থাকেন এবং একদল বলেন, প্রাচীন আর্যের উত্তর ইউরোপে উদ্ভূত হইয়া প্রাচ্যে অভিবাসন করে। প্রাচ্যের প্রাচীন জার্মানরাই নারিক হাকমিনিত বংগের ইরানী ও বৈদিক আর্য ছিল! এই প্রকারের মনোভাব দেখিয়া একজন ফরাসী লেখক ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, "আর্য" মতটা ইণ্ডো-ইউরোপীয় মতে, এবং শেষে তাহা জার্মান মতে পরিবর্তিত হয়। (L. Faint L'arionie et mort de Race মন্তব্য)। এই জার্মান পণ্ডিতদের উদ্ভটমায়ী ফলে ফ্রান্সে Celticism মতটির উদ্ভব হয়। ফ্রান্সের দলের নর তাত্ত্বিকেরা বলিলেন, কেলটিক মূল জাতিই আসল আর্য, তাহারাও এমিসা হইতে ইউরোপে আর্য ভাষা ও মত শরীকে আনিলাহ করিবার প্রথা আনিয়াছে। অতএব কেলটিকদের বংশধর

নিম্নলিখিত সত্যই নার!

শিক্ষিত
একমাত্র খাদ্য

—কারণ ইহা বহুল পরিমাণে
পাদ্যপ্রাণবিশিষ্ট, পুষ্টিকর এবং
সহজপাচ্য।

সর্বজন সয়াসত এবং
ভাঙ্গারপণ কর্তৃক উৎপ্রাংশিত।

মুণ্ডলের সুপার
বার্লি

ক লি কা তা।

এ যে
'ঢাকেশ্বরী'র
শাড়ী দেখছি!



ভেরী করার অসুবিধা আর চাহিদা বেড়ে যাওয়ার
দরুন আজকাল হয়ত আর যত দরকার, তত
ঢাকেশ্বরীর শাড়ী পাচ্ছেন না। তবু, যে গুলো
পাচ্ছেন, তাই বিশেষ যত্ন নিয়ে পরুন। পরে সুখ
আর পরতে দিয়ে সুখ, মোলায়েম ও টেকসই
এমন সুন্দর জিনিস আর কোথায় পাবেন?

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর - শ্রীমূর্ত্ত্যু কুমার বসু।

হুতমানে ফরাসীরাই আসল আৰ্য! ইহার পূর্বেই খৃঃ ১৮৭০ সালের ফ্রান্সো-জার্মান যুদ্ধের ফলে প্রোক্সার-গুর্দু এবং নর-ভুর্ডের পিতামহ বংশ কাতারফাগ বলিয়াছিলেন, প্রুসিয়ার বর্বর ফিন জাতীয়, তরবারির সাহায্যে জার্মানদের উপর রাজত্ব করিতেছে। (অবশ্য প্রুসীয় গবর্ণমেণ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তিসহাধা ইহার প্রত্যুত্তর দেন যে তাহারা খাটি জার্মান এবং তৎজন্ম খাটি আৰ্য!)। পুনঃ জার্মানদের জোড়ামি এবং অন্তর্যাতনে বিরক্ত হইয়া ইটালীয় নর তাত্ত্বিক সার্জি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইলেন, জার্মানরা মিশ্রিত জাতি। এবং একটা গোল মাথা, লম্বা ন্রা সধু নাক বিশিষ্ট জাতি এশিয়ার পামীর উপত্যকা হইতে নতুন প্রস্তর যুগে ইউরোপে আৰ্য ভাষা ও মতদেহকে অনিন্দন্য করিবার প্রথা আমদানী করে। ("The Mediterranean Race" দ্রষ্টব্য)। এই কলহের অবস্থা যখন এই প্রকার, তখন রূপ সাম্রাজ্যের বৈজ্ঞানিকেরাও ছাড়িগেল কেন? তাহারা বলিলেন, তাহারা ইহা "সার্ব"। ফলতঃ কে আৰ্য তাহা একটা রাজনীতিক-ন্যাসনালিট কলহে পরিণত হয় (Ripley—"The Races of Europe" পুস্তকে Aryan controversy নামক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এই স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, জার্মানীর নর-তাত্ত্বিক বা ভাষা তাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক এই "জার্মান" মতে সায় দেন নাই বা এখনও

দেন না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই উদ্ভট মতটাই ভারতে সত্য বৈজ্ঞানিক মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে! ইহা কি প্রকারে সংঘটিত হয় তাহাই আমাদের জ্ঞাতব্য।

যখন বিসমাক বলেন যে, প্রুসীয়রাই খাটি জার্মান এবং তৎজন্ম খাটি আৰ্য তখন ইংরেজ নর-তাত্ত্বিক বেজে তাহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়া ছিলেন, তাহার শারীরিক আকৃতিই তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়! ইংরেজী Encyclopaedia Britannica, Vol. 12-1929 বলিতেছে, "That the migration of the Indo-Europeans was through Asia Minor is proved by the discovery in 1906-07 at a large mass of records dating from the fifteenth and fourteenth centuries B.C."

ইহার অর্থ, এসিয়ামাইনরে প্রাচীন মিটানীদের দেশ থেকে বৈদিক দেবতা, ইন্দ্র, বরুণ, নাসত্য ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া সংস্কৃত ভাষার ন্যায় ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ইহাই অনুমিত হয় যে ইণ্ডো-ইউরোপীয় বা আৰ্য ভাষীরা প্রাচ্য হইতেই ইউরোপে আগমন করিয়াছিল। তৎপর, এই পুস্তক বলিতেছে,

"In Germany many scholars... attribute to the Indo-Europeans all the characteristics of the idea of German. For this, however, there is no solid foundations." (Pp. 263-264).

ইহার অর্থ জার্মানীর অনেক পণ্ডিত

আদর্শ জার্মানগের শারীরিক লক্ষণগুলিকে ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতির উপর আরোপ করেন। তাহারা জার্মানকেই "আৰ্য" বলেন। কিন্তু, এই বিষয়ে নিশ্চিত কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য এই উক্তি বিগত প্রথম জগৎযুদ্ধে যুদ্ধের পর লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু ইহার বহু পূর্বেই উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের মোহ ইংলণ্ডের নর-তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের পাইয়া বসিয়াছে। এইজন্যই, জার্মান "নর্ড-কবান" তাহারা অকিডাইয়া ধরেন এবং সেই বিষ ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া উপনিবেশের শিক্ষালয়সমূহে প্রসার প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই উপায়েই আমরা বাল্যকাল হইতেই স্কুলে পাঠ করি যে, আৰ্য নামে একটা শ্রেণ্য জাতি বিদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করে। আবার এক্ষণে একদল ভারতীয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, এই শ্রেণ্যকায় আৰ্যেরা নীল চকু, কটা চুল উত্তর ইউরোপীয়দের জাতি ছিল। তাহারাও উক্ত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সুরে সুর দিতেছেন। ইহার উদ্দেশ্য তাহারা ই জানেন। ইংরেজ পণ্ডিতেরা কি প্রকারে জার্মান nationalistchauvinistদের সুরে সুর মিলান তাহা ঐতিহাসিক মূর্খের বলিতেছেন, জার্মানরা নিজেদের জাতের বড়াই করিয়া অনেক লিখেন, তন্মধ্যে ইংরেজ জাতিরও প্রশংসা ছিল এবং ইংলণ্ড nothing unflattered took it up ("Nationalism and Internationalism" দ্রষ্টব্য)। ফলতঃ

অধ্যক্ষ যথুর বাবুর

শক্তি ঔষধালয়-ঢাকা



জগৎবিখ্যাত গ্রীকামকুশ মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ল্যান্সড শ্রীমৎ রহমান্দ শ্রীমৎ মহোদয় শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার বর্ণনাবাদঃ—
"এই কারখানায় আয়ুর্বেদীয় ঔষধ সমূহ এরূপ বিপুল আয়েত ও পরিমাণে প্রস্তুত (manufactured) হয় যেখানি আমি অভ্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম।
(Sd)—"রহমান্দ শ্রীমৎ"



শক্তি ঔষধালয়ের কারখানার ঔষধ প্রস্তুতের বিরাট ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া হরিন্দরের কুন্ডমেলার অধিনায়ক মহাশয় "ভোলাদাস গিরি মহারাজ অতিশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিশেষ আবেগের সহিত অধ্যক্ষকে বলিয়াছেন—"এছা কাম সত্য, দ্রোতা, স্বাপর, কলিমে কোই নেই কিয়া, আপনো রাজচক্রবর্তী হায়" ইত্যাদিঃ



আয়ুর্বেদ যুগপ্রবর্তক
অধ্যক্ষ মহর্ষিবাবু



দেশবন্ধু সি আর দাশঃ—

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানায় ঔষধ প্রস্তুতের তত্ত্বাবধান সেতুপ সচিবরূপে চলিতেছে, তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা কল্পনায় আনাও সাধ্যাতীত।

প্রোগ্রাইটরিগঃ—অধ্যক্ষ মহর্ষিমাহোদয়, লালমোহন ও গ্রীফশীন্দ্রমোহন মৃদুার্জ, চক্রবর্তী।



ক্রেপের উৎস উৎসারিত হোক

কেশ পরিচর্যায় :
কুন্তল গরিমায় :
দশনকান্তির উৎকর্ষে :
অঙ্গরাগের উজ্জ্বলো :
তনুদেহের রূপলাবণো :
সৌন্দর্য প্রভাব উজ্জীবনে :
বেশবাসের আবেশ সৌরভে :

■ ক্যান্টরল, ভুগল, কোকনল, তিলল,
লাইজ (লাইম জুস গ্লিসারিন), সিল্‌ড্রেস (শ্যাম্পু)
নিম টুথপেস্ট, মার্গোফিস (নিম টুথ পাউডার)
মার্গো সোপ, মলয় (চন্দন সাবান)
লারনী স্নো, তুহিনা (বিউটি মিল্ক)
রেণুকা টয়লেট পাউডার
কান্তা (গন্ধসার), ল্যাভেণ্ডার



ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কলিকাতা

সাম্রাজ্যবাদের দল উপনিবেশবাদে শোষণ ও দমন করিবার হেতু এই নীতিক মতবাদে পান; সুইডেনই ইংরেজ নরভাটুকেরা এই মত গ্রহণ করেন। পরে, সেই মতানুযায়ী যেনব তথা দত্তকাকার লিপিবদ্ধ হইল তাহা ভারতে একমাত্র সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে থাকে।

ইহার ফলে, বৈদিক জাতি অগ্রেই প্রাচ্য দ্বয় বিশারদদের দ্বারা শ্বেতকায় জাতিতে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাহারা নীল চোখ-কাল চুল-লাল দাড়ি বিশিষ্ট উত্তর ইউরোপীয় জাতিতে পরিবর্তিত হইলেন এবং বর্তমান হিন্দু আদিম অধবাসীর সহিত উও জাতির মিশ্রণের ফল বলিয়া নিদেশ প্রদত্ত হইল। আর আমাদের দেশের পাণ্ডিত্যেরা বলিলেন, শাসন! আমরা কিছ, না হই, অন্ততঃ শাসক জাতির দোদুলশলা জাতি তো বটে!

এই নীতিক মতবাদ যে একটি ভীষণ সাম্রাজ্যবাদীয় মত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ যখন জার্মানিতে হিটলার ও নার্সিনদের প্রতিষ্ঠা হইল, এবং তাহার বলিল জার্মানরাই আর্য এবং একমাত্র Herrenvoelk (শাসক জাতি) তখন সাম্রাজ্যবাদীয় ইংলণ্ডেরও মাথার টাক নড়িল। হাউস ও ব্রাজলী নামক গৈজ্ঞানিকেরা নীতিক জাতির বসিহাই অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন দেশীর ভাগ ইংরেজের মাথার চুল কাল! (We Europeans P 118 প্রত্যা)। তৎপরে গডন

চাইল্ড নামক বৈজ্ঞানিক আর্যদের নীতিক বলিয়া মানিয়া নিলেও নীতিক মতবাদকে তাঁরভাবে নিন্দা করেন। ইনি বলেন,

"The apothosis of the Nordics has been linked with policies of imperialism and world domination". ("The Aryans" p. 164).

ইহার অর্থ, নীতিকদের দেবের উন্নত করাকে সাম্রাজ্যবাদীয় এবং জগৎশাসন নীতির সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের পরে, "অপরূপ কিং ভাষ্যটি!" সে সম্বন্ধে এখনই কোতুল জাগিতেছে।

এক্ষণে কথা এই, আমাদের দেশের পাণ্ডিত্যেরা ভারতের ইতিহাসে "নীতিক" জাতির চিত্র বঙ্কিত এত ব্যস্ত কেন? ইংরেজ পাণ্ডিত্য হিন্দু উপত্যকার নীতিক জাতির কেরাটি প্রাপ্ত হনান বলিয়া হতাল হইয়াছেন। হিন্দু সভ্যতার সহিত বেদের জাতির কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া যে মতবাদ তিনি করিয়াছেন, এইটাই তাহার একাট মূল কারণ। কিন্তু "নীতিক কেরাটি" (Nordic Skull) বলিয়া কথা এ দেশেই কেবল শুন্য যায়। পূর্বে উত্তর ইউরোপের নরভাটুকেরা কখন মাথা সরু নাক দীর্ঘ শরীর নীল চক্ষু কটা চুল উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ সম্বলিত লোককে উচ্চ মূল্য জাতীয় বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিন্তু কেবল লম্বা মাথা ও সরু নাক বিশিষ্ট হইলেই নীতিক হয়

না। বাহা হউক, নীতিক মতবাদী মার্সেল সিন্দু উপত্যকার নীতিক পাইলেন না; অনেক জাতি ও ইংরেজ পাণ্ডিত্যেও নাকি নীতিক জাতির লক্ষণ-সমূহের উল্লেখ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু অন্তো বেদ পাঠ করিলে তাহা প্রাপ্ত হন না; রূপক কল্পনাকে টানিয়া-টানিয়া সভ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া একদল লোক বেদে নীতিক জাতির অস্তিত্ব পান! বর্তমান ভারতে নীতিক না পাওয়া গেলে, হিন্দু উপত্যকার তাহা আবিষ্কৃত না হইলেও ভারত নীতিকদের আনয়ন করা চাই, তাহা না হইলে ভারতের ইতিহাসের সাম্রাজ্যবাদীয় ব্যাখ্যা বিফল হইবে। এইজন্য শেষে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের সীমান্তে যেসব পার্বত্য জাতি আছে তাহাদের মধ্যে নীল চক্ষু ও কটা চুলের লোক আবিষ্কৃত হইয়াছে, অতএব তাহাদের পূর্বপুরুষেরাই বৈদিক কেরাসংক্রান্ত জাতি অর্থাৎ বৈদিক কেরাদের জাতিই এই পার্বত্যভাগে এখনও বাস করিতেছে। (পার্মি ও মন্ডু এই বিষয়ে কি বলেন?)। যাহাদের প্রাচীন হিন্দু পাণ্ডিত্যেরা "পিশাচ" ও "প্রাচ্য" প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিলেন; যঃ একদশ শতাব্দীতে আল-বেরুণী যাহাদের বিষয়ে বলিয়া ছিলেন, পশ্চিম পর্বতপশ্চিম লোকেরা ভারতীয় বা তাহাদের সম্পর্কীয় জাতি, ইহারা অতি বর্ষর (Prolegomena to India প্রত্যা)। এক্ষণে বেদে তাহাদের আনয়ন করা হইল। নীতিক দেবতাকে ভারতের ইতিহাসে আনিতেই

গুজার আনন্দ নিরর্থক!

দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত, ক্ষুধা প্রপীড়িত,
সর্বনাশ ও মৃত্যুরূপী ম্যালেরিয়ার আক্রমণে
পগড়, শক্তিশীন সমগ্র বাংলার সন্তানদের

—হে সর্বশক্তিদার্ম্যিন

কর আশীর্বাদ, দাও শক্তি যেন মৃতপ্রায়
সন্তানদের অকালমৃত্যুর করলপ্রস হইতে
রক্ষা পাইয়া—সবল, সুস্থ এবং সুখ ও
স্বচ্ছলতার প্রাচুর্যে তোমার আপদনী
উৎসব পূর্ণ-আনন্দে সাধক করিতে
পারে।

“কুহেনোসল”

শুধু ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধক নহে—
সর্বপ্রকার জ্বরের বীজ চিরন্তনে নিমেষ
করিয়া পুনরুত্থান নিবারণ করিতে একমাত্র
বিশুদ্ধ মহৌষধ।

এরিয়ান কোমিক্যাল
ওয়ার্কস

৩/২, বঙ্গাবন মালিক লেন, কলিকাতা।
ফোন: বি. বি. ৬০১৬



করাসী-বিপ্লবের অন্ততম স্রষ্টা, তৎকালে একবার জার এক
বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন—উৎসবের দিনে কোকে এত আনন্দ পায়
কেন? দার্শনিক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—“তার সঞ্চিত অর্থের
করনা করে।” এই উক্তির মূলে যে গভীর সত্য নিহিত আছে
আজকের দিনে তাহাই যেন প্রাণে উপলব্ধি করা দরকার।
উৎসবের মূলে যে ঐশ্বর্য্য সেই ঐশ্বর্য্যের সম্মান পাইতে চাইলে,
সকলের আগে যে কপাটি আপনাকে জানিতে চাইবে তাহা—
“ব্যাক”। উৎসবের আনন্দের মধ্যে বৃহত্তর বাংলার লক্ষ্যজাতি
যেন ইহা স্মরণ রাখেন।

গ্রেট ব্রেকল ব্যাক লিঃ

৩১১ ম্যা কৌ লেন, কলিকাতা

শাখাসমূহ—শ্যামবাজার, নারায়ণগঞ্জ, হরিপাল, বরিশাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস: সেন্সল ক্রফট ডাক্তারী

রেম্যানের—

“ম্যালোলীনা”



প্রাচীর গৌরব

ম্যালোরিয়া ও সর্ব-
প্রকার জ্বরে আশু
ফলপ্রদ—লীহা ও
যক্ষ্মসংযুক্ত প্রভৃতি
জীর্ণ জ্বরে বিশেষ
কার্যকরী।

৬ আউন্স শিশি ১৫০, ডজন ১৫৫০, গ্রেস
১৬২, মাশুলাদি স্বতন্ত্র। সর্বত্র এজেন্ট
আবশ্যক।

একমাত্র পরিবেশক:

রেম্যান লাবরেটরীজ

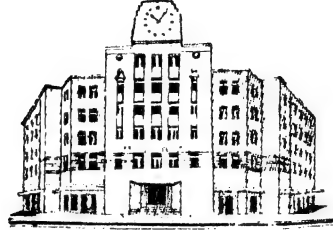
পোঃ বক্স ১২২১০, কলিকাতা।

গ্রাম—অশোকানিভট্ট, ফোন—বড়বাজার ৭৫৮

ইণ্ডিয়ায়াল এণ্ড প্রভেন্সিয়াল

এসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিসঃ
বোম্বাই



স্থাপিতঃ
ইং ১৯১৩

নতুন বীমার পরিমাণ (ইং ১৯৪০) ...	১ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা
মোট চলতি বীমার পরিমাণ ৩১-১২-৪০	৮ কোটী টাকার উপর
জীবন বীমা তহবিল ৩১-১২-৪০ ...	২ কোটী টাকার উপর

আধুনিক বীমা প্রণালী সংক্রান্ত সকলপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুনঃ—

কলিকাতা অফিস—১২, ডালহৌসী স্কোয়ার



বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক উন্নত
ধরণে প্রস্তুত আমাদের ‘গৌরী’ পাম্প
টিউবওয়েলের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পাম্প
বলিয়া স্বীকৃত। ‘গৌরী’ পাম্প
অপর্যাপ্ত পাম্প অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ও
সুদৃঢ় কাঠাম—অথচ মূল্যে বেশী নয়।
আজই একটি ‘গৌরী’ পাম্প বসান।

ডি.এন.সিঃএ কোং

১৩ অক্টোবর কলিকাতা—১১, শীতলাপুত্র বোস স্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন—৩২১১, ৩২০৮ ট্রিট, কলিকাতা।
(ইনকোর্পোরেটেড) ১৯৩৮ ও ১৯৪০-৪১

দি ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস—১০নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—ক্যালকাটা ৪৫৪৫ ও ৪৫৫০

পৃষ্ঠপোষক—মহামান্য ত্রিপুরার মহারাজা বাহাদুর।

অনুমোদিত মূলধন—	... ১,০০,০০,০০০, টাকা
বিক্রীত মূলধন—	... ৯,২৫,০০০, টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন—	... ৬,২১,০০০, টাকা
মজুত তহবিল—	... ১,৬২,৯০০, টাকা

শতকরা ৮ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছেন

—শাখাসমূহ—

চৌরঙ্গী (ফোন—কাল ১২০০), কলকাতা, পার্ক সার্কাস, মাণিকতলা,
ভবানীপুর, শ্যামবাজার (ফোন—বি বি ৩৪০০), খিদিরপুর, শালিকিয়া, হাওড়া,
চুঁচুড়া, সিরাজগঞ্জ, মহম্মদসিংহ, বর্ধমান, কুষ্টিয়া, জামালপুর, ঢাকা, শিলিগুড়ি।
বেনারস, আসানসোল, জামশেদপুর, দিল্লী, লাহোর, কাটিহার ও চট্টগ্রামে শব্দ
সাধা অফিস খোলা হইবে।

দক্ষতার সহিত সর্বপ্রকার ব্যাঙ্ক কার্য করা হয়।

আরও ১৫,৭৫,০০০, টাকার শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ভারতবর্ষ আইনের ৯৪-এ
ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। বিশেষভাবে স্মরণ
রাখিবেন যে, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার এতদর্থ প্রচারিত কোন পরিকল্পনার
অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অথবা কোনও বিবর্তি অথবা মতামতের সত্যতা সম্বন্ধে কোনও
দায়িত্ব লইতেছেন না।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরঃ

শালসুন্দরিন জাহমেদ, এম এল এ, বাঙ্গলা সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী।

হয়ে সেই জন্য এই ব্যক্তির অবতারণা করা হয়েছে।

এই প্রকারে 'নৃগত' হয় নৃগত মতবাদ প্রায়ই কায়ার ভাষ্যের ইতিহাস, কৃষ্টি, নরতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা হইতেছে। এই জন্য কায়ারও অন্যদের ইতিহাসের কণ্ঠস্বর পাইতেছি।

এতদ্ব্যতীত ভারতে নিগূঢ় (ক্ষুদ্রকায় নিগ্রো বা কৃষ্ণ) জাতির আন্তরিকতা খোঁজা হইতেছে। ইহাও রাজস্বাদী মতের অন্যতম। বর্তমানের ভারত-রক্ষার কণ্ঠের সম্মুখে আঁত নীচ কায়ার প্রশংসা করা হইতেছে ইহার উদ্দেশ্য। ইহার কারণ র্যাপটালিট দেশসমূহে মূল জাতিতে (Race) বিশেষভাবে বিশ্বাস করা হয়। আমেরিকার সার্ক রাষ্ট্রে ইহা চমকে উঠিয়াছে; তথায় সাম-নৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি Race-theory দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। যেহেতু কায়ার তথ্যের দ্বারা উদ্ভূত করা হইয়াছে এবং বর্ণ পার্থক্যকে বলা হয়। স্কটল্যান্ড নামক ওই দেশের একজন জাতিগত লেখক বর্ণ পার্থক্যের দোষ দেখাইয়া লিখিয়াছেন,

The Noble Hindu is dead, he died in the white-yellow-black, quagmire "The Race or Mongrel")

ইহার অর্থ শ্বেতকায় প্রাচীন মহান হিন্দু রাজ-শাসনের কর্মে ডুবিয়া মরিয়াছে। এভাবে মার্কস মারা হইল, এখনকার ভারতবাসী নীচ-রক্তের মিশ্রিত জাতি। যাহার ধর্মমতে নগ্রো জাতীয় রক্ত প্রবাহিত হইতেছে সে যতীনতার কথা করে কি? ফলতঃ সাম্রাজ্য-বাদী মতবাদী নরতত্ত্ব, সমাজ তত্ত্ব, জাতি-তত্ত্ব, নরতত্ত্ব প্রভৃতির আকারে এই দেশে প্রচারিত হইতেছে। আর ইহার সাহায্য হইতেছেন অনেক রাজনীতি ও অর্থ-সরকারী ভারতীয় পণ্ডিতেরা। কেহ "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" ব্যক্তি ধরিয়া এই বৈজ্ঞানিক আকারে লোকের সম্মুখে ঘরিত-না কেহ বিনিয়াদী স্বার্থের রক্ষাকল্পে ইহাকে জাতির সত্য বলিয়া জাহির করিতেছেন।

যাহা আশা এই অজ্ঞতাগ্রস্ত দেশে এতদ্বারা দেশীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি প্রাচীন তথ্যগুলিকে রক্ষা করিতে পারিবেন। ইহা বীত, নবোদিত বুদ্ধোদয় ভাবিত হইতেছে, Race-theoryর দোহাই দিয়া নিজেদের পদ রক্ষা হতে পারিবেন। এইসব দেখিয়া যে দেশপূর্বকার হবে যে বিজ্ঞানে শ্রেণী লক্ষণ নাই। এইজন্যই শী চৈতন্যবদ্ধ ভারতীয় বুদ্ধোদয় শ্রেণী চিন্তিতে কৃষ্টির প্রতি এত বিরূপ।

এক্ষণে সোভিয়েট রুমে কি বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইতেছে তাহা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। তথায় রক্ষাবাদী রাষ্ট্রের আওতা মূল জাতি, দেশ-রক্ষা, জীবনধারণ পৈতৃক গৃহে বহনকারী ধর্মতত্ত্ব, নর জাতি, নীচ জাতি প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী মত-বাদের বিরুদ্ধে। মানব তাহার বাতাবরণের দ্বারা গভীরিত হয় এই তথ্যই স্বীকৃত হয়। লেখকের মতে নর-তাত্ত্বিক অধ্যাপক ফন লুসান বসিয়া-বাতাবরণ (Environment) দ্বারা ইহা একটি ন জাতি (Race) উদ্ভূত হয়। কিন্তু ইহার লাভবিত্ত হিটলারীয় অধ্যাপক ফিসার নিজের বৈদ্য মত পরিত্যাগ করিয়া হিটলারীয় অনু-নান্দ্যবাদী বলেন, লুসান ইহার অনুকূলে কোন-কেন নাই।

("Human Heredity by Fischer and Lent

অন্যদিকে রুশ-আমেরিকান অধ্যাপক সোভিয়েট বলেন, Numerous statistical, anthropometrical and experimental studies have shown that there is a series of correlation of various degrees between economic position (degree of poverty or wealth) and the bodily, biological, and mental characteristics of the population of the same age and, sex in the same society. ("Contemporary Sociological Theories" P. 547).

ইহার অর্থ, একই সমাজে একই বয়স ও লিঙ্গের লোকদের মধ্যে দারিদ্র্য বা ধনানুসারে শারীরিক, জীবনাত্তিক এবং মানসিক পার্থক্য সমুদ্ভূত হয়, ইহা অনেক সংখ্যানুষ্ঠান, নর তাত্ত্বিক মাপকাঠি এবং পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতা দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে। এতদ্বারা পক্ষপাতশূন্য কথা কে বলিতেছেন তাহা পাঠকই স্থির করিবেন।

পুনঃ লেনিনগ্রাডের বিখ্যাত অধ্যাপক পভলফ দ্ব্যাপিত Pavloff Institute তাহার শিষ্যেরা যে সব জীবনাত্তিক অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা Race-theoryর মূলে কঠোরভাবে করিতেছে। সোভিয়েট physiologist অধ্যাপক আনোভিন বলিতেছেন,—

We, in particular, already fifteen years ago, undertook a study of the "plastic" properties of the nervous system. We proved that there are no absolutely unalterable nerve functions and that they are only relatively stable. It is interesting to note that these results of our long years of research were embodied by Prof. Eichen, a German scientist in exile in a book exposing the race-theory (published in Paris '36) ("Moscow News" June 25, '43.)

ইহার অর্থ, সোভিয়েট জীবনাত্তিক বৈজ্ঞানিকেরা দীর্ঘকালের পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, শরীরের স্নায়ুসমূহের কর্ম অপরিবর্তনীয় নহে। পরীক্ষার এই ফলটি প্রবাসী জার্মান বৈজ্ঞানিক আইখেন Race-theory (মূলজাতিতত্ত্ব) রূপে মতটি লুপ্ত করিবার সময়ে তাহার পুস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্মরণে, ইহাও দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য যে, তিনি জার্মান রাজনীতিক গোডার্মির প্রতিপক্ষ বৈজ্ঞানিক পুস্তক লিখিয়াছেন, তিনি আজ নির্বাসিত! এতদ্বারা সাম্রাজ্যবাদী মতের গোডার্মির বিপক্ষে এই বৈজ্ঞানিক তথ্য আকর্ষিত হইয়াছে যে, মানবের স্নায়ুসমূহের অপরিবর্তনীয়তা নাই এবং এতদ্বারা ইহাও উদ্ভূত হয় যে, একটা মূলজাতি বাতাবরণ দ্বারা অভিজুত হয়, তত্ত্বজ্ঞান অন্য হইতে পৃথক-কৃত হয়।

পুনঃ সোভিয়েট Academy of Sciences এর (বিজ্ঞান-পরিষদ) অধিবেশনে স্নায়ুজাতিসমূহের উৎপত্তি বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া উদাহার্ম মহোদয় যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, উক্ত স্থানের প্রাচীন জাতিসমূহের বংশধররাই বর্তমানের স্নায়ু জাতি। এই অনু-সন্ধানের বৈশিষ্ট্য এইঃ

"Reflected in the work of the session were the new methods of investigation applied by Soviet scientists and their new approach to problems of ethnogeny i.e. they trace the origin of modern peoples, and in

particular the Slavs, through the involved process of interrelation, crossing and mutual cultural influences of ancient tribes. These methods recognize no artificial biological barriers between various peoples, which are raised by German pseudo-scientific "science" that tries to divide mankind into "superior" and "inferior" races" ("Moscow News" Feb. 23, '44.)

এতদ্বারা জার্মান নরতাত্ত্বিকদের শারীরিক উচ্চ ও নিম্নস্তরের জাতিসমূহের লক্ষণ দ্বারা পৃথক করিয়া বর্ণনা করার পরিবর্তে বিভিন্ন কৌশলের পারস্পরিক সম্বন্ধ, রক্ত সংমিশ্রণ এবং কৃষ্টির পারস্পরিক প্রভাব দ্বারা একটা জাতি সৃষ্টি হয়, গবেষণার এই নতুন পন্থা সোভিয়েট নর-তাত্ত্বিকেরা উদ্ভূত করিয়াছেন।

আবার, উপরোক্ত বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য অধ্যাপক পুভেভ কেসেস এবং এসিয়ার প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক আকিফুত দ্রবচন্দ্রের পরীক্ষা দ্বারা তথাকথিত "আর্য" এবং "আর্য" শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নতুন আলোকসম্পাত করিয়াছেন। তিনি নার্সী জার্মানদের আর্যের দাবী বিষয়ে বলেনঃ "Historical facts show that all these claims of the Fascist pseudo-scientists are an invention from beginning to end"

তৎপরে, তিনি বলিতেছেনঃ "This exposes the German fascist fabrication that the Aryans are a northern, or as the fascists put it, a "nordic race". The Aryans originate not in the north but in the south, more precisely in the southern part of the Caucasus. Also incorrect in the light of the latest scientific data, Academician Struve pointed out, is the claim made by the fascist falsifiers of history that the ancient Aryans were an Indo-European tribe. How did it happen that the name "Aryans" began to be applied to certain Indo-European tribes and how was German fascism able to concoct the fable about the "Aryan" race of masters, representing to-day by the Germans? The answer is very simple. History knows of a similar example when all of Greece came to be called after the small tribe of Hellenes. For the same reason ancient historians later began to call several Indo-European peoples neighbouring the tribes of Aryans by their name. The fascists have been able for so long to keep up the book of their 'Aryan' blood although the origin of the modern Germans in general has nothing to do with the ancient Aryans, only because we did not possess until recently sufficient facts about the latter, and their place in history ("Moscow News", May 28, '43.)

ইহার অর্থ, আকডেমিসিয়ান স্ট্রুভে বলিতেছেন, পুরোঁ এসিয়া মাইনর প্রাচীন মিটানী জাতি সংলগ্ন ইন্দু, বঙ্গ প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের নামের সহিত সংযুক্ত সংস্কৃত ভাষার নাম একটা ভাষা বাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বাহা জার্মান পণ্ডিত হুসিংএব মতে নৃগতদের ভারতের পথে যাইবার একটা আভা মাত্র ছিল ("The dynasts were Indians, but Indians on their way to India"—Voelkerschichten in

দেশবাসীদিগের অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া

অন্নশান ক্লেশ ও দুর্দশা দূর করুন।

দরিদ্র ও পক্ষিল বসতিসমূহের উচ্ছেদ করুন।

দেশী বিড়ি প্রস্তুত ব্যাপারে সহস্র সহস্র নরনারী ও বালকবালিকা ঘরে বসিয়া কাজ পায়।

দুর্বল অক্ষম আতুরদিগের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইয়া দৃঃখ দূর করিতে

আপনিও

আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন

ভারতে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন

ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন।

ইহার বিশুদ্ধতা ও গুণের জন্য আমরা গ্যারান্টি দিয়া থাকি।

আমাদের অন্যান্য বিড়ির মার্কা
ত্রিশূল, পাখা ছাপ, শিকারী
সুন্দরী, নাগকন্যা, ১১১নং, ৬০৮নং
ও ৬১নং প্রভৃতি।

মূল্য তালিকা ও পাইকারী
দরের জন্য লিখুনঃ—

আমাদের বিশিষ্ট বিড়ির তামাক—
১নং, ৫৫৫, ২, ২৫, ৫৫৫, ১১১এ,
১১১, ১৫০এ ও ১৫০নং প্রভৃতি।

একমাত্র প্রত্যাধিকারী ও প্রস্তুতকারকঃ

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

—ঃ হেড অফিস :—

৫১নং এজরা স্ট্রীট, কলিকাতা।

—ফ্যাক্টরী—

মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস্,
গোর্খাডিয়া, সি. পি.
আও গালাদ (মুর্শিদাবাদ)।

—শাখাসমূহ—

১৬০, নবাবপুর রোড, ঢাকা।
সন্ন্যাসগঞ্জ, মজঃফরপুর,
(বি, এন, ডবলিও, আর)।

আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের উপাদান (তামাক ও পাতা) খুচরা ও
পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।

দরের জন্য লিখুন।

allern Iran' p. 210) তাহা দক্ষিণ ককসস প্রদেশের জ্যেষ্ঠতম ভাষাবিশারদ। এই জাতি নিজেকে "আর্য" বলিত এবং তাহার চিহ্নস্বরূপ আর-মেনিয়া, আর-মাজির, আর-রাট প্রভৃতি নাম দ্বারা মূল হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। আর, চতুর্দশশতাব্দীর ইজো-ইউরোপীয় জাতিগুলি ক্রমে বিদেশী ঐতিহাসিকদের দ্বারা এই নামে অভিহিত হইতে থাকে। ফ্যাসিস্টেরা এতদিন ধরিয়া নিজেদের জাতি বলিয়া দাবি করিতেছিল যদিও বর্তমানের জাতিগণের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। যদ্যপি এতদিন এই বিষয়ে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য পাই নাই বলিয়াই জার্মানদেরা এই গাণ্ডারাজ্যী করিতে পারিয়াছিল। এই ক্ষেত্রে স্ট্রুভের যে মতামত সমাদৃতপক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জাতি শব্দের ভারতীয় উৎপত্তির দাবীকরা বিরোধিতা হয় নাই। তিনি বলেন, প্রতিবেশী মিড ও পারস্যেরা এই আর্য নাম ধার করিয়া যায়। যদ্যপি ইহাও এইস্থলে স্বীকার্য যে অনেক জাতিগণ পণ্ডিত আছেন যাহারা উত্তর-ইউরোপের নড়িকদের জাতিম ধর্মবাসী বলেন এবং আর্যজাতি বাহির হইতে তাহাদের মধ্যে প্রচুরিত হইয়াছে। Polist— "Germanen" and Indo-Germanen প্রভৃতি বলিয়া স্বীকার করেন। আবার পশ্চিমে সের্গেইকোভও এই কথা বলেন (Sergii, Paudler প্রভৃতি)। কিন্তু অন্যদিকে নড়িকদের জাতিম স্বীকার করিয়া ফিসার প্রভৃতি আর্য ও নড়িককে এক করিতে চান। কিন্তু বেশির ভাগ জাতিভাষিকেরা আদিম আর্যভাষীদের হয় এশিয়া মাইনর না হয় মধ্য-এশিয়া-উল্লেখ করেন (Kiepers— "Die Indo-Germanische Frage in Anthropes" Bk. 30, 35 পৃষ্ঠায়)।

এতদ্ব্যতীত, সোভিয়েট প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মধ্য এশিয়ার নানানস্থানের ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হইতে প্রাচীন সংস্কৃত ধর্মসাধারণের আবিষ্কার করিতেছেন। ইহার মধ্যে বিগত বৎসরের আবিষ্কারটি অতি মনোহর। ফরাসিদের ভগ্নাবশেষ হইতে খৃঃ প্রথম শতাব্দীর একটি গহ্বরের ধর্মসাধারণের আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার উল্লেখ আর একটি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের ধর্মসাধারণের প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা খৃঃ পূঃ ২-৩ হাজার বৎসরের আনাত স্ফেরের (আস্ফাখাদের নিকট) সভ্যতার অনুরূপ (I. Mikhaïlov in "Soviet Union News" Vol. III No. 7)। আমেরিকার ডাঃ প্যাম্পেলী কার্ণেজীর সংগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া আনাতটে একটি অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পান। ইহাতে যেসব নর করোটি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা সার্জির মতে ভূমধ্যসাগরীয় জাতির অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত, হার্ডিও (Harn) পোরো কচি ছেলের শব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (Carnegie publications No 73) এবং প্রকৃতকরে সমাহিত শিশুর শব ভূমধ্যসাগরের প্রাচীন দেশসমূহে আবিষ্কৃত হইয়াছে; আর হিন্দুদের আজ পর্যন্ত শিশুর শব এই প্রকারেই সমাহিত করা হয়। এই প্রকারের হাড়ি হিন্দু সভ্যতার ধর্মসাধারণের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এইজন্য আনাত সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় আর্যদের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তাহা গবেষণার কল্প। পুনঃ সোভিয়েট পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, প্রাচীন ইরানের ধর্মগুরু অবৈশ্বতীর প্রচনার সময় যাহা প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণেরা স্থিরীকৃত করিয়াছেন, তাহা

অপেক্ষা আরও প্রাচীন। এতদ্বারা বেদের বয়সও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এই সব প্রত্নতাত্ত্বিক, নরতাত্ত্বিক, জাতিভাষিক ও ভাষাতাত্ত্বিক আবিষ্কার দ্বারা প্রচুর ইতিহাসের ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। এতদ্বারা ভারতের কৃষ্টির ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতে বাধ্য। ভবিষ্যতে ভারত তত্ত্ব (Indology) সোভিয়েট আবিষ্কার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে হইবে। ইন্দুরা সাম্রাজ্যবাদী ও তাহাদের ভারতীয় ভাবিদেহেরা যাহারা ভারতের কৃষ্টির বিকৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহাদের মতামত খুলিয়া পড়িতে বাধ্য। সোভিয়েট বিশ্বেবিদ্যালয়সমূহে প্রাচ্য দেশসমূহের ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হইতেছে এবং প্রাচীন সংস্কৃত, পালি, তিব্বতীয়, ইরানী প্রভৃতি সাহিত্য ভাষান্তরিত হইতেছে। এমন দিন আসিতেছে যখন ভারতীয় পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক গবেষকদের সোভিয়েট দ্বারা গিয়া বিজ্ঞান ও প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করিয়া তাহাদের জ্ঞান ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে হইবে। এইজন্যই সোভিয়েট বিজ্ঞান সাম্রাজ্যবাদীয় মত বিরহিত হইয়া প্রাচ্য ও ভারততত্ত্ব বিষয়ে কি গবেষণা করিতেছে, কি তথ্যসমূহ আবিষ্কার করিতেছে, তাহা অবগত হইয়া ভারতের কৃষ্টির যথার্থ ইতিহাস বিষয়ে অবগত হইতে হইবে।

তৎপর আছে সোভিয়েটের ফলিত বিজ্ঞানের কথা। আত্মকাল এদেশের শিক্ষিত লোকেরা স্বীকার করিতেছেন যে, সোভিয়েটের অদমা উৎসাহের ও

অফুরন্ত শক্তির পশ্চাতে আছে হলিন-মটলিন প্রবর্তিত Socialist Organized Planning। তথ্য সংগ্ৰহণভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিবাহী পরিকল্পনা, সমগ্র কৃষি (Kolhoz) প্রভৃতি দ্বারা রূপ আজ স্থায়ী সঞ্চিত শক্তিদ্বারা শতকে পরাজিত করিতে পারিয়াছে। তথ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কার্পটালিস্ট যথেষ্টাচার নাই। ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে অভিনব উপায়সমূহ গৃহীত হইতেছে। সভ্য জীবনের সর্ব বিভাগেই সংগ্ৰহণভাবে পরি কল্পনা দ্বারা লব্ধ সম্পাদন করা হইতেছে। এই-জন্যই আজ এদেশের অনেক Technical ইঞ্জিনিয়ার এবং Industrialist সোভিয়েট organized planning-এর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। আজ কোন ভারতবাসী যদি বলেন সোভিয়েটের পদ্ধতিবাহী পরিকল্পনা অকৃতকার্য হইয়াছে, যদি বলেন Kolhoz কৃষকে গোলামী প্রথায় প্রত্যাবর্তন করায় তাহা হইলে তিনি হয় অজ্ঞ না হয় চলাবেশী ব্যক্তি।

সোভিয়েটের সাফল্য দেখিয়া জগতের সকলেই মোহিত হইয়াছেন। সোভিয়েটের সোসা-লিস্ট পরিকল্পনা কি তাহা জ্ঞানবীর জনা এদেশের নিরপেক্ষ লোকের কৃতজ্ঞ হইয়াছে। সোভিয়েট কৃষ্টির গতি দেখিয়া আমাদের ধারণা সোভিয়েট বিজ্ঞান ভবিষ্যতে ভারতে পূর্বাধ বিস্তার করিবে, আর তাহা হইতে আমরা কি উপকার লাভ করিব তাহা এদেশের মনীষীদের অনুসন্ধানের শব্দ।

মল্লিকের

মাছ ও বীজ

কৃষিজগতে যুগান্তর আনয়নে

উৎকৃষ্ট বাঁধাকপি বীজ ... প্রতি তোলা ২৫ মাত্র
ফুলকপি, ওলকপি, বাঁটপালম ... " " ৫০ "

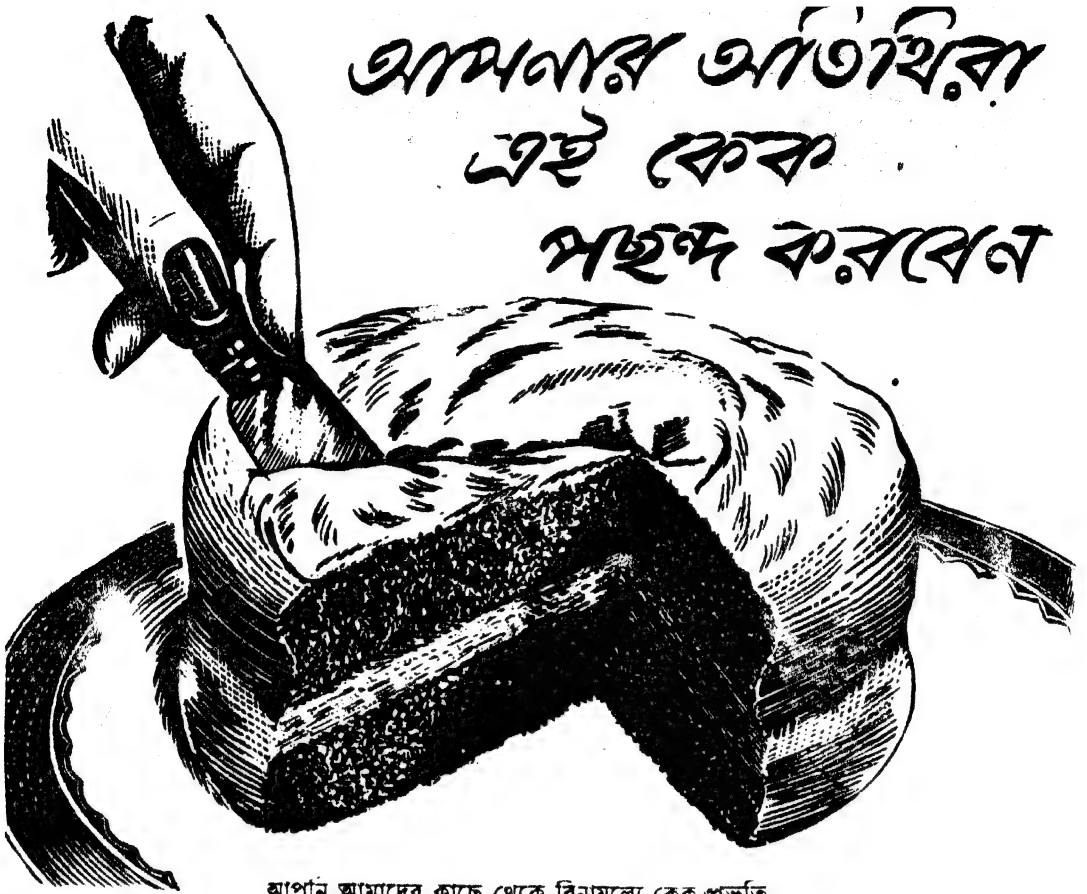
ক্যাডালগা ক্রি

মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ যোগে বীজ পাঠান হয়।

মল্লিক্স নাশারী

৯২, কৈবর্তপাড়া লেন

সালকিষা, হাওড়া



আমাদের আতিথিবা
এই কেক
সহজ করবেন

আপনি আমাদের কাছে থেকে বিনামূল্যে কেক প্রভৃতি
তৈরী করার পুস্তিকা পাবেন। ইউনিভার্সাল কর্ণ-
ফ্লাওয়ার এবং কাসটার্ড পাউডার দিয়ে আপনি চমৎকার
মুখরোচক কেক, ডেজার্ট, পুডিং, বিস্কুট এবং ম্যফিন
তৈরী করতে পারবেন। উৎকৃষ্ট উপাদানে তৈরী
ইউনিভার্সাল কর্ণফ্লাওয়ার এবং কাসটার্ড-
পাউডার সহজ পাচ্য এবং পুষ্টিকর।



ইউনিভার্সাল

কর্ণফ্লাওয়ার এবং
কাসটার্ড পাউডার



বিনামূল্যে এই পুস্তিকাটির জন্য আজই চিঠি লিখুন

বি. এস. এণ্ড সি লিঃ

৫, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা

নিখিল বেশী ঝড়িয়া পড়িয়াছিল, সা—কারিয়া শব্দ করিতে যাইবে, রত্ন হাকে সন্তপণে অথচ ক্ষিপ্ততার সহিত নিয়া লইল, বলিল—“ঘাড়ো পড়বেন নাকি?”

অতুল ঘুঁষি বাগাইয়া শুনিতোছিল, লিল—“তাকে ফেলো করা দরকার তো!”

মোট বস্তু একটু হাসিয়া বলিল—“তুমি রবে নাকি ফেলো?”

অনেকক্ষণ হইতে ইসারা-টিপনি চলিতছে এবার শরীর এবং শক্তি লইয়া যুবতীর দমনে স্পষ্ট-বিরূপ, অতুল চটিয়া গেল, লিল—“না, উনি বস্‌ডা-গুন্ডার কথা বলছেন, এর পেছনে বস্‌ডা-গুন্ডা গোছেই একজনকে পাঠান দরকার!”

যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেই যুবতীর দৃষ্টি একবার মোটা বস্কুর উপর গিয়া পড়িল, বস্কুর কাণ দুইটা হঠাৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তাঁক্ষ দৃষ্টিতে একবার অতুলের পানে আড়ে চাহিল, কিন্তু কিছু বলিবার বা করিবার পূর্বেই যুবতী মিনতির স্বরে অতুলকে বলিল—“না তাকে ধরবার চেষ্টা করে আর চোচামেচি করবেন না: একটা গোলামাল হয় এটা আমার ইচ্ছে নয়, পুলিশ-কেস হলে আরও খারাপ!.....আপনারা যাবেন কোন দিকে? অস্তিত্ব ট্রাম-স্টপ পর্যন্ত যদি আমায় পৌঁছে দেন.....”

রত্ন বলিল—“আপনি কোথায় যাবেন তাই বলুন.....”

ওর মুখের কথা কাড়িয়া গিয়া নিখিল সেটাকে সম্পূর্ণ করিল—“আমরা কোথায় যাই সে তো পরের কথা, আগে আপনাকে পৌঁছে দিগ.....”

যুবতী অতুলকেই বলিতোছিল, উত্তরটা অতুলেরই দিবার কথা; ইহারা ওপর-পড়া হইয়া দিয়া ফেলায় নিখিলের পানে চাহিয়া বেশ একটু তিস্ত কণ্ঠেই বলিল—“ট্রাম স্টপ পর্যন্ত পৌঁছেই সটকান দেবেন?—বাঃ নিরিয়া!.....”

নিখিল একটু উগ্রভাবেই প্রশ্ন করিল—“হাই বললাম?”

মোট-বস্কুও সদুযোগটা ছাড়িল না, অতুলের পানে জুঁকুটি করিয়া বলিল—“তাই বললেন উনি?—পারেন কখনও বলতে? এই বৃষ্টি নিয়ে.....”

রত্ন বলিল—“খামো তোমরা, উনি বিপদে পড়েছেন, আর এই সময় বৃষ্টি নিয়ে.....”

যুবতীকে প্রশ্ন করিল—“হ্যাঁ, আপনি কোথায় যাবেন তাই বলুন, ট্রামস্টপ কেন, আগে আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তার আমরা নিজেদের গন্তব্যের কথা ভাবব।”

রমেন একটু গলাখাঁকারি দিল, মেয়ে দেখায় দেয় হইয়া যাওয়ার কথা বলিবে বাকিয়া—রত্ন তাহাকে বা হাতে একটু টিপিয়া মানা করিয়া দিল। যুবতী বলিল—“আমি

যাব তিয়াস্তর নম্বর হব্‌ বোসের গলিতে, গো স্ট্রীটের ট্রাম থেকে নেমে.....”

“হব্‌ বোসের গলি!”—সকলে উল্লসিত হইয়া উঠিল। রত্ন বলিল—“হব্‌ বোসের গলি? বাঃ, আমরাও তো এ দিকেই যাচ্ছি..... আমাদের নম্বরটা কত হে রমেন?”

রমেন, নিখিল এবং অতুল এক সঙ্গে উত্তর করিল “তেরো।”

“বাঃ, তবে তো কোন কথাই নেই: আপনাকে পৌঁছে দিয়ে.....”

বস্কু প্রশ্ন করিল “আগে তিয়াস্তরটা পড়বে কি আগে তেরোটা?—যদি তিয়াস্তরটা পড়ে তো.....”

অতুল বৃষ্টির সম্পর্কে খোঁচা খাইয়া—মুখাইয়া ভিন, অগ্রপট্টাৎ না ভাবিয়াই বলিয়া উঠিল—“না, তিয়াস্তর তো চিরকালই তেরোর আগে, ধারাপাতে মথস্থ করেন নি.....”

বস্কু উত্তর দিবার আগেই যুবতী বলিল—“না, উনি মন করছেন, এটা যদি গলির উটো দিক হয়তো বড় নম্বরগুলোই আগে পড়বে কিনা। আর ব্যাপারও তাই, এই দিকটাই শেষ দিক গলির।”

অতুল কথাটা বলিয়াই নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়াছিল, একটা ঘোঁট গিলিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—“তাহলে চল রত্ন, আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিছে গুলতান করা কেন?”

যুবতীকে মারের বাখিয়া এবং একবারেই পাশে থাকিবার জন্য একরকম স্টেলাস্টেল করিতে করিতেই সকলে অগ্রসর হইল।

(৩)

বস্কু বলিল—“একটা রিকশা ধরে নিরে আসব না হয়?”

“সে আর জিগেস করতে আছে?..... দু’মিনিট—একদাঁপ নিয়ে আসাচ্ছি এই মোড় থেকে”—বলিয়া নিখিল তাড়াতাড়ি পা নাড়াইতেই যুবতী বাস্তু ভাবে বলিয়া উঠিল—“না, না, এটুকু যেতে আমার কোন কন্ঠই হবে না, অব্যাস আছে হাটা.....”

এক রমেনের মাধ্যমেই উপকারের নেশা ঢেকে নাই, বরং সমস্ত ব্যাপারটি সে একটা দৈব উপদ্রব বলিয়া ধরিয়া লইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতোছিল, বলিল—“তা ভিন্ন ঠর দেয়ও তো হয়ে যাচ্ছে? রিকশা আনতে-করতে.....”

রত্নর দিকে চাহিয়া আরম্ভ করিল—“ওদিকে আমাদেরও.....”

রত্ন চোখের ইসারা করিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল।

নিখিল বলিল—“ওকে কিন্তু ভালো করে প্রোটেক্ট করে নিয়ে যাওয়া দরকার, কে জানে কার কি রকম অভিসন্ধি আছে। আসেপাশে কেউ ওৎ পেতে আছে কিনা.....”

আগলারো মধ্য কোন খুঁত ছিলই না তাহার উপর আরও ভালো করিয়া আগলাইবার জন্য সে একটু স্টেলাস্টেল হইল তাহাতে কতকটা ভারসাম্য হারাইয়া অতুল যুবতীর প্রায় ঘাড়ো পড়িবার দাখিল হইয়াছিল, মোটা-বস্কু বেশ কড়া হাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া—পাঁপনে টানিয়া লইল, ছাড়ার সময় ইচ্ছাকৃতই



বস্কু বেশ কড়াভাবে তাহাকে পিছনে টানিয়া লইল



সুখ ও সাড়ী

মিলের নরম একথানা আটপোরে সাড়ীতে যে আরাম দেশের মেয়েরা পান—সে আরাম দামী সাড়ীর সীমানার বাইরে। জরিতে ভারী, শল্মাতে খসখসে, চুম্বকিতে জাঁচড়। তবে দামী সাড়ীরও উপযোগীতা আছে বৈকি। সখ ও সময় বিশেষে এর ব্যবহার অনিবার্য। যে পরিমাণে আরামী-সাড়ী তৈরি করে আমরা সুখ পেতাম বর্তমান কামানের ধোঁয়ায় তা অসম্ভব। তবে সুখের কথা এই যে, ধোঁয়া ফিকে হয়ে আসছে। আশা করি আসচে পূজায় কারণ দেখিয়ে আর কতব্যের কাছে মাগ চাইতে হবে না। আশা করি সোজাশুজি বলতে পারবো—আনন্দ, পরিধানে যদি সুখ চান, মহালক্ষ্মীর সাড়ী কিনুন।

মহালক্ষ্মী
কটন মিলস লিমিটেড

ব্যানিং: এজেন্ট: এইচ ডব্লিউ এণ্ড সন্স লি: ১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা

ক বা যাই হোক, একটা বাকিই না লাগিল
মুনের। ওরা তিনজনে একটু আগাইয়া
ডুল।

অতুল রুখিয়া দাঁড়াইয়া চাপা গলায় বলিল
“এর মানে?”

বন্ধু বলিল—“বাডে
ভুলে নাকি ভদ্র-
হিলার?”

টের না পাইয়া
হারা আরও একটু
মাগাইয়া গেছে। অতুল
সইত প
বলিল—“আলবৎ পড়ব,
তোমার কি?—হোয়াট
ইজ দ্যাট টু ইউ?”

এত রোগা লোকের
দুখে এতটা বেপরোয়া
উত্তর বন্ধু আশা করে
নাই, একটু থতমত
খাইয়াই মূখের পানে
ঢািয়্য কি উত্তর দিবে
ভাবিতেছে, রমেন ঘাড়
ফিরাইয়া বলিল—“ওকি,
তোমরা দাঁড়িয়ে পড়লে,
দেঁরি হয়ে যায় যে!”

যুবতী, নিখিল
এবং রত্নও ফিরািয়া
তা কা ই ল, যুবতী
দাঁড়াইয়া পড়িয়া ভীত-
ভাবে বলিল—“কি হল,
দাঁড়িয়ে পড়লেন যে?”

অতুল বন্ধুর পানে
একটা কটাক্ষ হানিয়া
সহজ কণ্ঠে বলিল—
না, বন্ধুর চোখে একটা
কি পোকা পড়ল, তাই.....”

বন্ধু দাঁতে দাঁত পিষিয়া চাপা গলায়
বলিল—“যে বলে তার চোখেই পোকা পড়ুক।”

তাড়াআড়ি আসিয়া যখন নিজের নিজের
মাগা লইল চাপা আক্সো তখন দুই জনেরই
নে ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে।

গলি বহিয়া সকলে বিভ্রম স্ত্রীতে আসিয়া
পড়িল। রমেনের মনটা অন্য দিকে, ব্যাক
দপাইয়ের মধ্যে একটু উপকার করিবার জন্য,
একটু কথা কহিবার জন্য, একটা কথার একটু
উত্তর দিবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেছে।
বদপগলা ক্রমেই বেশ স্পষ্ট এবং তীব্র হইয়া
গঠিতেছে, চাহনি আরও উৎকট। বিশেষ করিয়া
নিখিল, অতুল আর মোটা বন্ধুর মধ্যে। রত্ন
মনেকটা সংযত, একটু কাউজ্ঞানও আছে;
খন খুব বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িবার মতো
হইতেছে, দু’একটি কথা বলিয়া ঠান্ডা করিয়া
বসিতেছে।কেমন হাসিতে হাসিতে
কসকল বাহির হইয়াছিল, এখন



তারার চুয়ায়িশ হাঁও বকের মধ্যে মরণ-বিশনে জড়াইয়া ধরিল

পদসপেরে সম্প্রদায়ে প্রমোদে বিযুক্ত হইয়া
উঠিতেছে। যুবতী একবার এর সঙ্গে একটু
কথা কহিয়া, কি ওর দিকে একটু মিলি,
লজ্জিত দৃষ্টিপাত করিয়া, কি তাকে একটু
সমর্পণ করিয়া বিযুক্তকে যেন মাঝে মাঝে
আরও তীব্র করিয়া তুলিতেছে।

শুধু উপকার আর কথা কওয়া লইয়াই
নয়; যাহার যাহা লইয়া পরিচয় সে সেইটাকেই
গড় করিয়া আলোচনা করিতে যাওয়াতেও
গোলমাল, কথাকাটা কটির সৃষ্টি হইতেছে।...
নিখিল কলেজের কথা তুলিবার চেষ্টা করিল
কয়েকবার, কলেজ মাগাঞ্জনে একটা পদ
দিবার জন্য এডিটার অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে
—সে-কথাটাও। বোটা-বন্ধু কলেজ বা কবিতার
ধার ধরে না বিশেষ, রমেনের বালাবন্দু,
পাড়ার থিয়েটার—জিমেনেসিয়ামের পাশা, সেই
হিসাবে চালিয়াছে, কবিতার কথায় বলিল—
“এসব রাবিশ কবিতা-টবিতা এখন ধামাচাপা

দিন মশাই, এখন দেশ চার শোলজার—নাভ—
নিউ-৩ মাসল”

নিজের দক্ষিণ হাতটা মূতা করিয়া
বাকিইয়া ধরিল।

কথাবাতায় যুবতীর একটু পরিচয়ও

পাওয়া গেছে, প্রশ্ন
করিল—“মিস্ সেন কি
বলেন?”

মিস্ সেন একটু
মিষ্ট হাসিয়া বলিল—
“আমি যে অবস্থায়
পড়েছি তাতে আমায়
জিগেস করাই বাহুল্য
নয় কি?”

বিশেষ এ মন
হাসির কথা না হইলেও
সবাই হাসিয়া উঠিল,—
অবশ্য নিখিল ছাড়া।

অভ্যাসবশেই ডান
হাতটা একটু শক্ত
করিয়া বাকিইয়া বন্ধু
বলিল,—“এ ক দিন
আসুন না আমাদের
জিমেনেসিয়ামে আমাদের
কাপ, মেডেল সব
আপনা কে দেখাই।
সেদিন ভক্তির মাধাজি
এসেছিলেন, সব দেখে-
শুনেন...”

অতুল হিংসা
এ কে বা রে জুলিয়া
খিচাইয়া বলিল—“আরে
বাইভেছিল, একটু
বোঝে দাও তোমার
জি মনে সিঁয়া ম,—

গুণ্ডামির আঙা একটা; সেবারে হাতীবাগানে
অশ্বিনকান্ডের পর থেকে আমার ও জিনিসটার
ওপরই বিতংটা ধরে গেছে...”

বন্ধু দাঁড়াইয়া পড়িল, চোখ দুইটা বড়
করিয়া গলটা বাড়াইয়া বলিল—“তোমার
বিতংটা ধরে গেছে!—এতবড় একজন এ্যাথলেট
মিষ্টার পাম লাই সিপয়?—আমি কালই গিয়ে
তুলে দেব জিমেনেসিয়ামটা.....”

অতুল আর বন্ধুকে কিছু বলিল না,
রাগে কাঁপতে কাঁপতে রমেনের পানে চাহিয়া
বলিল—“রমেন, আমি এখন থেকেই ফিরলাম
ভাই, দুঃখ করো না, এমন একজন অদ্ভুত
মে-কম্পানিতে.....”

বন্ধু বাকিয়া দাঁড়াইল, গর্জন করিয়াই
বলিল—“অদ্ভুত!!”

রত্ন দুইজনের মাঝে দাঁড়াইয়া এ-কোণটাও
সামলাইয়া লইল। আর ঢাকিবার চেষ্টা বুঝা
জানিয়া সহজ কণ্ঠেই বলিল—“মিস্ সেন কণ্ঠটা
দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ভাবো দিকনি!!”

(৩)

দুর্ভাগ্যবশত হইয়াছে মিস সেন, একটা নিরাশ্রয়; একটা সন্ধ্যা নষ্ট হইলে কে না হয়? তবে সে ভাবটা চাপিয়া একটু হাসিল। বলিল—“না, না, এতে আর দুঃখের কি আছে? নিজের নিজের বাস্তবতা অভিমত.....”

বঙ্কু আবার দাঁড়াইয়া পড়িল, শরীরটাকে শক্ত করিয়া লইয়া বলিল—“বাস্তবতা অভিমত! অল্প বললে সমস্ত কম্পানিটাকেই অল্প বলা হোল না? অথচ আপনি—একজন ভদ্রমহিলা সেই কম্পানিতে.....”

অতুল আবার দুখিয়া দাঁড়াইল, বলিল—“খলরদার ওক্টর এর মধ্যে টানব না বঙ্কু, লেডিদের আমি কতটা সম্মান করি তুমি জান না.....”

রত্ন আবার অগ্রসর হইয়া আসিল, দুই-জনকে দুইদিকে সরাইয়া দিয়া বলিল—“আঃ, থামো না ভাই; বেশ তো, সম্মান করা তো অমন করে আশ্চিত গুটীছে কেন?.....” রমেনের বিলম্ব হইয়া যাউতেছে; বিরক্ত এবং অশীর্ষকভাবে নাকটা কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—“তার চেয়ে আমি বলি, অতুল যেমন যেতে চাইছিল ওক্টর যেতেই দাও না.....”

অতুলের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল,—অভিমনে মূঢ়তা গম্ভীর করিয়া রমেনের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল, প্রশ্ন করিল—“তুমি এই কথা বললে রমেন?—তুমি—ইউ!”

রমেন থমতন খাইয়া অপ্রতিভভাবে বলিল—“না, না, তুমি নিজে বললে, তাই.....”

“বললে তো এই কথা?—নিজে ইনভাইট করে?”

“না না; মানে এদিকে এ’র দোর হয়ে যাচ্ছে.....”

“গানে রেখো, আমার আর দোষ রইল না,—নিজেই জেঁকে নিজেই তাড়ালে.....”

“না, না, আমার ভুল বুদ্ধি না অতুল, এ’রও দোর হয়ে যাচ্ছে, সেখানেও একজন মেরেলে কনসারভ—তাই.....”

“মাইজ, তোমার কাজেই যাচ্ছলাম গুড্ বাই.....”

মনে হইল যেন গলাটাও একটু ধরিয়া গেছে। ঘুরিয়া মাথার উপর হাতটা তুলিয়া আবার দুইবার “গুড্ বাই, গুড্ বাই” বলিয়া উল্টানিকে পা বাড়াইতেই রত্ন ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—“কি ছেলেরামণী হচ্ছে অতুল—মিস সেনের সামনে?.....”

যেমন হাঃ, অভিমানটা বাড়িয়াই গেল। “তবে তুমি অতুল মিত্রকে চেন না ভাই”—বলিয়া একটা ফাঁকি দিয়া ই হাতটা ছাড়াইয়া অতুল অশ্রুকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

সকলে একটু স্তম্ভিত

হইয়া দাঁড়াইল। তারপর রত্ন ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলিল—“আমাদের মার্জনা করবেন, মিস সেন।”

এবারও মিস সেন একটু মিষ্ট হাসিয়াই বলিল,—“কি! এতে মার্জনার কি আছে? নিজের নিজের অভিরুচি.....”

দলটা আবার অগ্রসর হইল।

গলি অপেক্ষা সদর রাস্তায় লোক চলাচল বেশি, অশ্রুকার তো আছেই; এদিকে চার-জনেরই এমন করিয়া আগলাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা যাহাতে মিস সেনের গায়ে অন্য কাহারও গাতি না লাগে। প্রাক্ আউটের রাস্তায় লোকে একটু বাস্তবিত্ত হইয়াই চলে, কয়েকজনের সঙ্গে ছোটখাট একটু সংঘর্ষও হইয়া গেল। বেশ নয়, কথাকাটি পর্যন্তই, কেননা মোটা বঙ্কু সব ক্ষেত্রেই আগাইয়া দাঁড়াইতেছিল বলিয়া ব্যাপারটা বেশি অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, তবু বিলম্ব হইতে লাগিল।

হয়ত নিখিলই প্রশ্ন করিল—“চোখ নেই মশাই? দেখছেন একজন মেয়েছেলে যাচ্ছেন.....”

“যান না উনি, আমি তো তফাতে আছি।”

“যান না উনি মানে? আমি এগিয়ে না এলে আপনি তো ঘাড় পড়তিলেন ঠর।”

“ঘাড় পড়ব—পাগল না ব্যাপা?”

“উলটে আমাকেই পাগল না ব্যাপা বলছেন?”

কি অন্যায়টা বলেছি? নাহক্ যেমন গায়ে পড়ে ঝগড়ার জোগাড়.....”

নিজের দর বাড়াইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই মোটা বঙ্কু অশ্রুকারে একটু আড়ালে থাকে, এই রকম মোক্ষম সময়টিতে আসিয়া সামনে দাঁড়ায়। নিজের শরীরটাকে যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া ধরিয়া বলিল—

“কি ঝগড়ার জোগাড়ের কথা হচ্ছে যেন?—আমি একটু শুনতে পাই?”

লোকটা আপাদমস্তক একবার দেখিয়া

লইল। বলিল, “না, বলছিলাম—সন্ধ্যা রাতে বসি এতটা বেহুস হই যে একজন ভদ্রমহিলার ঘাড় পড়ি তো পাগল ভিন্ন কি বলবে লোকে আমার?.....এই কথাই বলছিলাম ওক্টর।”

একটু হাসিবার চেষ্টাও করায় আর গোলমাল বাড়িল না।

কিন্তু অন্যদিকে গোলমালের সৃষ্টি হইতেছে। নিখিল ভিতরে ভিতরে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। একবার সামান্য উপলক্ষ্যেই ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল উত্তাপটা। নিখিল বলিল—“আঃ, এবার আপনিই যে ঘাড় এসে পড়বেন মশাই!”

বঙ্কু প্রশ্ন করিল, “কর?”

“আমার, আবার কার?”

“সরে দাঁড়ান আপনি, একটু গায়ে গা ঠেকলেই যদি মনে করেন ঘাড় পড়ছি তো.....”

“সরে দাঁড়ান মানে? সবাইকে কি অতুল-বান্দু পেয়েছেন নাকি? আমার ঘাড়ের একটা কণ্টার বোকা আছে, যতক্ষণ না সে বোকা নামছে ততক্ষণ নিখিল গাঙ্গুলী নিজের পোশাক ছাড়বে না জানবেন। এই তার প্রিন্সিপল—এর জন্যে সে অস্বাভাবিক দিতেও প্রস্তুত, আমি অতুলবান্দুর মতন.....”

বঙ্কু ঠোঁট কুঁচকাইয়া শ্লেষের দৃষ্টিতে শুনিতোঁছিল, বলিল “শুধু ফাঁকা ভাষায় জোর যদি এসব ডিউটি সারা যেত.....”

নিখিল দাঁড়াইয়া পড়িল, অল্প পরিসর বৃকটা চিতাইয়া বলিল—“অন্য রকম শত্রিও অভাব নেই, যদি মনে করেন গুড্ বাইয়ের মতন আশ্বস্তার মাটি মাখলেই.....”

বঙ্কু একেবারে ঘাসি বাগাইয়া দাঁড়াইল, হৃৎকার করিয়াই বলিল—“আর একবার বলুন তো ও-কথাটা.....”

রত্ন, রমেন দুইজনেই মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকের চলাচল বেশি, বেশ কয়েকজন



হুই কে? অতুল না নিখিল?

ইণ্ডিয়া কনস্ট্রাকশন

কোম্পানী লিমিটেড

গৃহ ও সৌধাদি নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, পথ-ঘাট
প্রস্তুত, কারখানা নির্মাণ ইত্যাদি সকল প্রকার
নির্মাণকার্যের ভার গ্রহণ করা হয়।

বর্তমানে “ইণ্ডিয়া কনস্ট্রাকশন কোম্পানী” সরকারী ও রেলওয়ে সংক্রান্ত
নির্মাণকার্যে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত আছে। কিন্তু যৎসের পরে আপনার
প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্মাণকার্যে কোম্পানী আপনারকে সাহায্য করিবে।

টোলফোন :
ক্যাল ১৩০৭

এস. সি. সরকার,
ম্যানেজার।

ইণ্ডিয়া কনস্ট্রাকশন কোম্পানী লিমিটেড
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংক বिल्डिंग्स
মিশন রো, কলিকাতা।

সংগ্রামে ও শান্তিতে হিন্দুস্থান কটন মিল্‌স্

সমভাবে জনসাধারণের সেবা করিতেছে।

“হিন্দুস্থান”র ধুতি ও শাড়ী মে ল্যায়েম
সুদৃশ্য ও টেকসই অথচ হ্রস্প্য নয়।

“হিন্দুস্থানে”র বস্ত্র সর্ববিষয়ে
আপনার পরিবারের উপযোগী

ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান :

শ্রীযুক্ত.এস. এম. ভট্টাচার্য

হিন্দুস্থান কটন মিল্‌স্ লি.

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংক বिल्डिंग्स
মিশন রো, কলিকাতা।

খিরিয়া দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসাবাদ, হস্তব্য
আলিশী;—বেশ খানিকটা গোলমালের পর
যখন সবাই সরিয়া গেল, দেখা গেল অতুল
আবার কখন আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া আছে।
উদ্ভাসনভাবে প্রশ্ন করিল—“আমার ডাকছিলে
তোমরা কেউ?”

সকলেই অম্বকালে যেন ভূত দেখিয়াছে
এইভাবে একটু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া
পড়িল। রমেন, রত্ন, নিখিল একসঙ্গে প্রশ্ন
করিয়া উঠিল—“তুমি! চলে গিয়েছিলে যে,
আবার...”

অতুল একটু অপ্রতিভভাবে বলিল—“না,
ইহো যাচ্ছিলাম—যাচ্ছিলাম হঠাৎ মনে হল কে
যেন দূরার ‘অতুল, অতুল’ বলে ডাকলে—
তমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একটু ভাবলাম, তারপর
কোন বিপদ হয়েছে মনে করে উদ্ভবসে ছুটে
আসছি...”

উদ্ভবসে ছুটিয়া আসার মত হাঁপাইতেছে
না মনে পড়িয়া যাওয়ায় তখনই সেটা আরম্ভ
করিয়া দিল। মিস সেন একটু সরিয়া
দাঁড়াইয়াছিল—মনে হইল যেন “থক্-থক্”
করিয়া দুইবার চাপা হাসির শব্দ হইল—কিন্তু
সঙ্গে সঙ্গেই জোর কাশির শব্দ আরম্ভ হওয়ার
সে সম্ভবহটা আর বাড়িবার অবসর রহিল না।

কিন্তু গোলমালটা আবার মাথা চাড়া
দিয়া উঠিল। একে নিখিলই অসহ্য হইয়া
উঠিয়াছে, তাহার পর অতুল গিয়া আবার
খিরিয়া আসিল—চাপা রাগে মোটা বন্ধু ফোস
ফোস করিতেছিল, মনের ভাবটা আর চাপিতে
পারিল না, বলিল—“বন্ধুর একটু
গোয়ার-গোবিন্দ বলে বদনাম আছেই—পেটের
কথা চেপে রাখতে পারে না—তুমি যদি সভাই
চলে যেতে অতুল তো এতক্ষণ বোধ হয় মাইল
খানেক তফাতে থাকতে—নিখিলবাবু বার
দুইবেক তোমার নাম করছেন কি না করেছেন
অতদূরে তার আওয়াজটা...”

অতুল গর্জন করিয়া আগাইয়া আসিল—
“বাই নি তো আমি চলে—গোয়ার-গোবিন্দের
হাতে ভ্রষ্টমহিলাকে ছেড়ে...”

মাথায় যে আগুনটা ধোঁয়াইতেছিল,
একেবারে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—বন্ধু
হংকার করিয়া উঠিল—“জিব টেনে বের
করে নোব!”

একেবারে মাথার উপর ঘসি তুলিয়া
ধরিল। এবারে আর রত্ন, রমেন আসিয়া পড়িতে
পারিল না; তাহার আগেই “কি করছেন, কি
করছেন, ছিঃ!”—বলিয়া বারণ করিবার
অভিলাষেই নিখিল মাঝখানে পড়িয়া বন্ধুর
বুকে এমন একটা ধাক্কা দিল যে, সে প্রায়
পড়-পড় হইয়াই নেহাৎ জিম্যানাস্টিকের জোরে
কোন মতে সামলাইয়া লইল। তাহার পরই
সামনে একটা লক্ষ দিয়া দুইজনকে এক সাপটে
তাহার চুম্বাশি ইণ্ডি বন্ধুর মধ্যে মগ্ন-বাধনে
জড়াইয়া ধরিল।

হাত পা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের
ভয়টা লাগিয়া থাকে বলিয়া কলিকাতার রাস্তার

মারামারি স্থায়ী হয় না। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই যে খার কাছ ভুলভরবেই সারিয়া লয়। ...ওইটুকুর মধ্যেই জায়গাটির ভিড় জামিয়া উঠিয়া সঙ্গো সঙ্গো পরিষ্কারও হইয়া গেল। রহিল মাত্র দুইজন, তাহার মধ্যে একজন রমেন। তাহার সঙ্গী বসিয়া পড়িয়া দু' হাতে মুখটা চাপিয়া গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ করিতেছিল, রমেন বলিল—“ওঠ, পালিস এসে পড়বে একদুনি—ওদিকেও দেরি হয়ে গেল।—তুই কে?—অতুল, না, নিখিল?—সে ছাড়িটাকেও তো দেখতে পাচ্ছি না; কোথা থেকে কালসাপিনী এসে জুটল এক...”

পরদিন সন্ধ্যার পর সেই বকুল শাখার আড়ালে আবার দুইজনের সাক্ষাৎ হইল। মলিনার হাতে একটা কাগজের মোড়ক দিয়া সুকুমার বলিল—“এই নাও তোমার শাড়ি, ব্লাউস আর ভারিটি ব্যাগ; আর এই ছাতা... ক'জন এসেছিল দেখতে?”

মলিনা চাপা গলায় খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, এবার যেদিন থিয়েটারে ফিল্মে পাট করবে তোমায় মেডেল দেবে আমি!...এসেছিল দু'জন; আহা সে যদি অবস্থা দেখতে! একজন লঙ্কায় তো মুখ তুলতেই পারলে না; অতদূর থেকে এসে দুটি প্রশ্ন—‘কি নাম, আর কি পড়; যেন কোন রকমে পালাতে পারলে বটে, আর একজন বাঁ হাতে গালটা চেপে মাঝে মাঝে শব্দ গ্যাঙিয়েই কাটিয়ে দিলে। হ্যাঁগা, মার খাওয়ালে কি করে? আহা...”

হাসি চাপিবার জন্য মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিল।

সুকুমার বলিল—“ঐডেই হেসে সারা হচ্ছ, সব ইতিহাসটা শুনলে তো পাড়ার লোক জড় করে ফেলবে।”

মলিনা জিদ ধরিয়া বলিল—“না, শুনতে হবেই আমরা।”

একটু কি ভাবিয়া বলিল—“এক কাজ করো; খুঁড়িয়া-টুঁড়িয়া সবির সামনেই কর গল্পটা, তুমিই মেয়ে সেজেছিলে আর আমায় দেখার কথা বাদ দিয়ে...হ্যাঁ, তাই করো...”

“পাগল হয়েছ? এত তাড়াতাড়ি করা চলে এ গল্প? একজন আবার এসে গ্যাঙাচ্ছিল বলছি...তবে বলব'খন একদিন—শীপ্পারই...শব্দ খুঁড়িয়া থাকবেন না...”

“কবে?”

সুকুমার স্মিত-দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিল মলিনার পানে, বলিল—“বিয়ে হয়ে গেলে একদিন।”

মলিনা একটি চটুল হাসিতে ঠোঁট দুইটি কুণ্ঠিত করিয়া লইয়া বলিল—“তবে তো খুবই শীপ্পার!—বসে থাক সে আশায়—অন্ততঃ দশটা জায়গা থেকে দেখে ন গেলে আমি

রাজিই হব না, দেখো; খান দশেক নন্দনা আমি দেখব এখনও...মিলিয়ে নিয়ো...”

হাসি চাপিবার জন্য আবার আঁচল মুখে গুঁজিয়া দিল।

বাঁচে বাড়ীর ও-কোণ হইতে খুঁড়িমার

গলা শোনা গেল—“মল্ল, সাবান, তোরাজে এখানে ফেলে রেখেই যে গা ধুতে চলে গেলি; কি ভুলো মন বাস্তু মেরে!...”



নৃতাকুশলা ছায়া-
চিত্র শিল্পী প্রীমতী
সাধনা বসু র
অনিন্দ্য সুন্দর
অভিনয় ও নৃত্য
পূর্ণতা লাভ
করিয়াছে, তাহার
অঙ্গের নিখুঁত স্বক
ও উজ্জ্বল বর্ণ-
সম্বন্ধে; এবং
আমাদের গর্ব এই
যে, তিনি স্বীকার
করেন যে, প্রাচ্যে
নিয়মিত ওটীন
ক্রীম ব্যবহারের
ফলেই তাহার
নিখুঁত স্বক ও
উজ্জ্বল বর্ণ এখনও
অক্ষান আছে।

OATINE CREAM is indispensable for my toilet. I have been using it for a long time, and find it delightful, and extremely necessary to preserve a perfect skin.

Sashona Bose



ততঃ কিম?

ডক্টর সিনারশচন্দ্র সেনগুপ্ত

যুদ্ধের মোড় ফিরিয়াছে। যে বিরাট দানবের ছায়ায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া নিদারুণ আশঙ্কা ও আশার ক্ষীণতম আলোকরেখার জন্য আকুল প্রতীক্ষা ও উন্মেষে অধীর হইয়াছিল, সে আজ আহত। আজ আশা করিবার হেতু হইয়াছে যে হয়তো তার বক্ষে শক্তিশেল বিস্ফ হইয়াছে, তার পতন সুনিশ্চিত।

মোড় ফিরিলেও যুদ্ধের সমাপ্তি একেবারে আসন্ন, এ আশা এখনও করা যায় না। হয়তো এখনো সময় লাগিবে। তার পর কি হইবে? এই কথা লইয়া আজ চিন্তা ও গবেষণার অন্ত নাই। সেই সমস্যা লইয়া পৃথিবীর ধূরন্ধরগণের ব্যক্তিগত মতামত বিস্তার শোনা যাইতেছে, কনফারেন্সের পর কনফারেন্স বসিতেছে। মতামতের বৈচিত্র্য আর অবধি নাই। ইহা শব্দ স্বাভাবিক নয়, ইহা অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু এই সব মতামতের ভিতর আজ যে সব সুর প্রধান হইয়া বাজিতেছে, তাতে দৃষ্টিভ্রমের অবসর আছে।

পরিশ্রান্ত পৃথিবী আজ কায়মনোবাক্যে কামনা করিতেছে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি। যুদ্ধের পর আসিবে চিরশান্তির যুগ, হইবে সবজাতির সুখ ও সমৃদ্ধি, এই আশা লইয়া অনেকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রশ্ন এই যে, তাহা হইবে কি?

যুদ্ধোত্তর জগতের সমস্যাগুলি তিন দিক হইতে বিবেচনা করা যায়—রাজনৈতিক, আর্থিক ও নৈতিক বা আধ্যাত্মিক। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যার কথা ছাড়িয়া আমি রাজনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থার কথাই আলোচনা করিব।

যুদ্ধোত্তর রাজনীতি।

যুদ্ধের আরম্ভ যেসব কথা হইয়াছিল তাতে বলা হইয়াছিল, এ যুদ্ধের ফলে মিত্রপক্ষ কোনও রাজ্যের দেশগত অধিকার প্রসারের কামনা করেন না। ইউরোপে—ইহারা ইউরোপের কথাই বরাবর ভাবিয়া থাকেন—প্রত্যেক ছোট বা বড় রাষ্ট্রের নিজ নিজ ভৌগোলিক সংস্থান বহাল থাকিবে, কেহ কাহারও দেশ কাড়িয়া লইবে না, ইহাই ছিল মিত্রপক্ষের নায়কদের প্রতিশ্রুতি এবং জার্মানীর প্রতি ইহাদের প্রধান অভিযোগ ইহাই ছিল যে, জার্মানী বাহুবলে পররাষ্ট্র গ্রাস করিয়া দস্যুবৃত্তির পরিচর্য দিয়াছে এবং ইউরোপে গণতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া শক্তিশালী প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। এই দস্যুবৃত্তি ও এই গণতন্ত্র-বিরোধিতার বিরুদ্ধেই ইংলন্ড ফ্রান্স করিয়াছিলেন অভিযান।

অবশ্য যে পোল্যান্ডের উপর আক্রমণ উপলব্ধ করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ হয়, সে রাজ্য গণতান্ত্রিক কখনও ছিল না এবং সে স্বয়ং এক বৎসর পূর্বে চেকোস্লোভাকিয়ার ভূমি গ্রাস করিয়াছিল জার্মানীর সঙ্গে মিজলি করিয়া। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ও হৃদয়বস্ত্র চেকোস্লোভাকিয়ার সর্বনাশে ইহারা শব্দ তোষণ-প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য

কিছুই করেন নাই। তবু যুদ্ধটা প্রথমে হইয়াছিল দস্যুবৃত্তির স্বারা পররাষ্ট্র অপহরণের বিরুদ্ধেই এবং ইংলন্ড ও ফ্রান্স সত্যসত্যই তাহাদের নিজ নিজ দেশে গণতন্ত্রের অবসান শঙ্কায়ই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ক্রমে একটির পর একটি গণতান্ত্রিক ছোট রাজ্য আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া মিত্রপক্ষের আশ্রয়ে আসিয়া যথাস্থিতি যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং ক্রমে সংগ্রামটা দাঁড়াইল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সমবায়ের সঙ্গে ফ্যাসিস্ত শক্তির।

তারপর রাশিয়া ও আমেরিকা আসিয়া দলে ভিড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সুস্পষ্টভাবে লেখা হইয়া গেল আটলান্টিক সন্দেশে।

আজ সেই রাজনৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ আছে কি? আশঙ্কা হয় যে, অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মতেরও ব্যক্তি-বা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।

একটা মোটা কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যুদ্ধের গোড়ার দিকে যুদ্ধটা ছিল মিলিত শক্তিবৃন্দের United Nations-এর—তার ভিতর ছিলেন সবাই, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে, পোল্যান্ড, চেকো-স্লোভাকিয়া, গ্রীস, যুগোস্লাভিয়া ইত্যাদি। তাদের সম্মিলিত বৈঠকে সব কথার আলোচনা হইত।—এখন আর সে কথা বড় শোনা যায় না। এখন বৈঠকে বসেন, ইংলন্ড, আমেরিকা, রাশিয়া ও মাঝে মাঝে চীন। শব্দ সংগ্রাম পরিচালনা নয়, পৃথিবীর রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিধানও করেন তাঁরাই। আর সকলকে মাঝে মাঝে ডাকা হয়, কেবল এই বিশিষ্ট চতুষ্টয়ের সম্মিলিত সহায়তা করিবার জন্য।

তার পর কথা শোনা যায় যে, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তিরক্ষার ভার লইতে হইবে এই বিশিষ্ট বা চতুষ্টয়ের নিদে-শচালিত সৈন্য-সামন্তাদির। কোনও ছোটখাট রাষ্ট্রের তাতে দায়ও থাকিবে না, অধিকারও থাকিবে না।

হয়তো ইহা প্রয়োজন, হয়তো এমনি একটা পদলিপি বাহিনী সর্বদা সজাগ না থাকিলে ভাবিবারে যুদ্ধ নিবারণ করা যাইবে না। কিন্তু ইহাও যে ভবিষ্যৎ বিশ্ব-রাষ্ট্রনীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ স্বাধীন বহু রাষ্ট্রের নয়—রাষ্ট্র-সমবায়েরও নয়—এই বিশিষ্টের World hegemony-র। ইহারা ইহা ইহা বেনা নালাক রাষ্ট্র-গণের শক্তিময় গার্জনার বা অভিভাবক। এই অভিভাবকদের অধীনে স্বাধীন রাষ্ট্রগণের কতটুকু স্বাধীনতা থাকিবে? তাহাদের অবস্থা হইবে রক্ষণশীল রাষ্ট্রের মত। ক্রমে তাহাদিগের অবস্থা দাঁড়াইবে আমাদের দেশীয় রাজন্যগণের মত।

একথা সকলেই হয়তো স্বীকার করিবেন যে, নিছক যুদ্ধের দিক হইতে আজকার পৃথিবীতে এতগুলি খণ্ড খণ্ড স্বতন্ত্র স্বাধীন



অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক
সবদিকেই আজ ভারতের আমূল পরিবর্তন
ঘটছে। এর ফলে নতুন করে ভারতবর্ষের
ইতিহাস লেখা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।
এবং অভ্যন্তর আনন্দের বিষয় এই যে ভারত
বর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লেখবার জন্ম খাঁটি
ভারতীয় লেখনীও আজকাল পাওয়া যাচ্ছে।
ভালো কাগজ তো কতদিন
আগে থেকেই এখানে তৈরি
হচ্ছিল, ভালো কলিও; অভাব



ছিল শুধু ভালো নিবের। এবার তারও
অভাব দূর হল আমাদের উদ্যোগে। যারাই
বিদেশী নিবের আমদানী বন্ধ হবার ফলে
বাধ্য হয়ে আমাদের “রেড্‌ ইন্ড” ও “১১৬
নং রয়্যাল” মার্কা নিব ব্যবহার করে দেখে
ছেন তাঁরা সবাই মুক্তকণ্ঠে আমাদের নিবের
প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বলেন : আমাদের
নিব যে কোনো ভালো বিদেশী
নিবের সমপর্যায় পড়ে। অবশ্য
গতিতে লেখা চলে এ-নিব দিয়ে

স্টেম্পস্‌

• মিল অ্যান্ড মেটাল প্রডাক্টস্‌ লিঃ, ১১৬, মনোহর পুর রোড, কলিকাতা
সোল ডিস্ট্রিবিউটরস্‌ : ক্যালকাটা সিটি কমার্শিয়াল কোং লিঃ, পোস্ট বক্স নং ৫২৬, কলিকাতা

রাষ্ট্রের কোনও স্থান নাই। বিশ্বের ভিতর নিরন্তর দান-প্রদান, দেশে-দেশে সংযোগের ক্ষেত্রে যেরূপ নিবিড় ও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমা ভাঙিয়া সমস্ত পৃথিবীকে একীকৃত করিতে পারিলেই মানবসমাজের সর্বাপেক্ষা আশঙ্ক মণ্ডল হইবে। কিন্তু দীর্ঘ ইতিহাস, জাতীয়তার তীব্র শক্তি, দেশে দেশে পৃথকসংঘাত এইরূপ একীকরণের পরিপন্থী। তাই সমবায়ের পথ খুঁজিতে হয় দেশের সীমা বজায় রাখিয়া।

এই সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই জার্মানীর ভূতপূর্ব প্রতিনিধি হের ফ্রেডেরমান লীগ অফ নেশনসে একাধিকবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্র মিলিয়া United States of Europe প্রতিষ্ঠার। বলা বাহুল্য, সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। কিন্তু প্রতি দেশের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা যদি মানবকল্যাণের অনুকূল না হয়, তবে এই সর্বজাতীয় সমবায় বা ফেডারেশনই এ সমস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান। এই ফেডারেশন নীতি গ্রহণ করিয়া আমেরিকা সম্ভ্রম ও শক্তমান, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতিও এই নীতিতে দ্রুত উন্নতি করিয়াছে, সোভিয়েট রাশিয়ায় এই নীতির আধুনিকতম পরীক্ষা সাফল্য ও গোপনে নীতিত হইয়াছে। নামে ফেডারেশন না হইয়াও বর্টিশ সাম্রাজ্য এই নীতির মূলসূত্র গ্রহণ করিয়াই একটা প্রকৃত বিশ্বশক্তি হইয়াছে।

যুগ্মশক্তির জগৎকে এই ফেডারেশনের বন্ধনে বাঁধিতে পারিলেই মানবের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে এবং টেনিসনের "Parliament of Man and the Federation of the World"এর স্বপ্ন সফল হইতে পারে।

কিন্তু কি অটলান্টিক চ্যাপার, কি যুগ্মশক্তির জগৎ সম্ভ্রম আধুনিকতম গবেষণা কোথাও এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার কোনও চেষ্টাই দেখা যায় না। যে পথে পৃথিবীর ধ্বংসের দৃষ্টি—সে হিংস্র হেগemony।

আশঙ্কা হয় যে, যদি এই পরিস্থিতিই শান্তি-সভার জয়যুক্ত হয়, তবে তাহাতে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না, হইবে শুধু নতুন অশান্তি ও নতুনতর বিশ্বসংগ্রামের বীজবপন। ইহার ফলে এই চতুঃশক্তির বহির্ভূত রাষ্ট্রগুলির ক্ষুর স্বাধীনতা চাপা আগুনের মত জ্বলিতে জ্বলিতে কবে যে আবার একটা বিশ্বব্যাপী অগ্নিকাণ্ডে পর্যবসিত হইবে কে জানে?

বিশ্ব-সমবায়ের আদর্শ গ্রহণে অনেক বাধাই আছে, তার মধ্যে একটা প্রধান অন্তরায় ফ্যাসিস্তশাসিত দেশগুলি লইয়া—বিশেষতঃ, জার্মানী ও জাপানকে লইয়া।

যুদ্ধের আরম্ভে হয়তো ভুল বিশ্বাসের বশে—নেভিল চেমবারলেন জার্মান জনসাধারণকে নাসিগণ হইতে পৃথক্জ্ঞানে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, সে কথা যুদ্ধের পঞ্চম বর্ষের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আর কাহারও মনে এখন শোনা যায় না। শোনা যায় একটা তীব্র প্রতিহিংসার অথবা প্রচণ্ড সন্দেহ সাবধানতার সুর। জার্মানীর বিধদাতা জন্মের মত ভাঙিয়া না ঠললে সে আবার শীঘ্রই একটা তীব্রতর সংগ্রাম বাধাইবে, এই আশঙ্কা লইয়াই আজকাল আলোচনা চলিতেছে—বিধদাতা কিসে ঠিক ভাঙা যাইবে? এ আশঙ্কা মোটেই অমূলক নয়, কিন্তু তার প্রতিকারের যেসব উপায়ের কথা শোনা যাইতেছে, সেই পথই প্রশস্ত পথ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে।



মা

শিবশী—হাসান আলী, শান্তিনিকেতন

জার্মানী ও জাপান এই যুগ্ম বিশ্বের যত বড় দারুণ অমণ্ডল করিয়াছে, সে কথা কে না অনুভব করে? কিন্তু সপ্তে সপ্তে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, জার্মান ও জাপানী উভয় জাতিই অশুভকর্মী। জার্মানী শূন্য টিউলার হিমলায়ের দেশ নয়, তাহা কাট ও হেগেলের দেশ, গাটে, শিলার ও মানের দেশ, লাইবনিটজ, আইনস্টাইন, বৌর প্রভৃতির দেশ, মোটসার্ট বাথ, বিটোফেনের দেশ, মাক্স ও এংগেলসের দেশ। অপূর্ব দীর্ঘজীবির বলে জার্মান জাতি যুগে যুগে জগৎকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, চর্চন, শিল্প ও ললিতকলায় অশেষ অবদান দিয়াছে। অধুনা বিপক্ষে চালিত হউক, কিন্তু শক্তি ও শৌর্য তাদের বিপদের বন্ধু।

এমন একটা জাতিকে যে কোনও শক্তি বা শক্তি-সমবায়ের পদনাত করিয়া রাখিয়া চিরদিন তাহাদিগকে শাস্ত্রের পথে রাখিতে পারিবে, এ আশা দুর্ভাষা। এ চেষ্টা আজই প্রথম নয়, আর দুইবার হইয়াছে। নেপোলিয়ান ভ্যাবর্যাছিলেন জার্মানীকে চিরতরে শিবশী করিয়া ফেলা হইয়াছে, কিন্তু ১৮৭০ সালে দেখা গেল তার সে চেষ্টা

বার্থ হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পর আর একবার এই চেষ্টা হইয়াছিল, সে চেষ্টা আরও বেশী ব্যর্থ হইয়াছে। ভাসি-সিন্ধার সর্বগুণি সমগ্র জার্মান জাতির ভিতর ধর্মীয়ত হইয়াই তার পঁচিশ বৎসর পরে এই সিংহবাসী ধর্মবান্ধবের পূর্ণবিস্তার হইয়াছে।

এত বড় না হইলেও ইহার সমশ্রেণীর আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় Boer জাতির সঙ্গে সেখানকার ইংরেজ উপনিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল Disraeli আমলে। আবার তাহা জর্জিয়া উঠিয়া শেষ ব্যুর-যুদ্ধে পরিণত লাভ করিয়াছিল। প্রচণ্ড বটিশ শক্তির সমবেত পরাক্রমে অবশেষে যতদূর এই ক্ষুদ্র জাতি পরাভূত ও পদানত হইয়াছিল। যদি সেই পরাজিতকেই চরম বলিয়া মানিয়া লইয়া ইংলন্ড তাহাদিগকে শাসন করিতেন, তবে এতদিন আবার কি সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিত, কে জানে? তুংগার, ক্রিজ, বোথো, স্মাটসের জাতি যে চিরদিন এ পরাজয় মাথা পাতিয়া লইত না, আজও মাঝে মাঝে Hertzog-এর আশ্বাসননে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইংলন্ড পরাজিতকে পদানত করিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া সৃষ্টি করিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা সমন্বয়, বোথার জাতি ইংরেজ উপনিবেশিকের মতই স্বাধীনতালাভ করিল। এই নীতির ফল এই যে, ভূতপূর্ব বোথার সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল স্মাটস আজ ইংরেজের একটি প্রধান মন্ত্র-দাতা ও সুহৃৎ, সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা ইংরেজের পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে।

ছোট হইলেও এ দৃষ্টান্ত বড়র ক্ষেত্রেও হয়তো সমান খাটে। বোয়ারের বিধর্ষিত ভাঙ্গা পড়িয়াছিল ফেডারেশনে। জার্মানী কি জাপানেরও ফেডারেশনেই শৃঙ্খল আসিতে পারে সেই তীক্ষ্ণ, যাহাতে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা চিরতরে নির্বাসিত হইবে। নতুবা পদানত পরিত্যক্ত জার্মানীকে যতই নিরস্ত কর, তাহার ভিতর ধর্মীয়ত বাঁহকে দমন করিবার জন্য বটিশ-আমেরিকান পুলিশ বাহিনীর সবদাই ব্যস্ত থাকিতে হইবে, হিটলারের গেল্টাপোকে ধ্বংস করিয়া আবার এক নতুন গেল্টাপো সৃষ্টি করিতে হইবে। অশান্তি অনেকদিন দমন করিয়া রাখা যাইতে পারে, চিরদিনের ভরে তাহা ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না।

একথা সত্য যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও বিধিনিষ্টা রক্ষা করিতে হইলে লীগ অফ নেশনস্ কেবলমাত্র যুদ্ধিতন্ত্রের উপর ষড়যন্ত্রি আস্থা লইয়া সৃষ্ট হইয়াছিল, ততখানি আস্থা তার উপর রাখা চলিবে না। হয়তো একটা প্রবল আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীর অস্তিত্বও অপরিহার্য—কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ে বেশী জোর দিতে হইবে এক নতুন রাষ্ট্র গঠনের উপর—প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এক বৃহৎ রাষ্ট্র-সমবায় যেখানে প্রত্যেক জাতি সমান সম্মান ও সমান স্বাধীনতার অধিকারী হইবে। বলা বাহুল্য, ভারতের মত জাতি যারা আজ পরাধীন ও পদানত, তাহাদিগকেও এই রাষ্ট্র সমবায় সমান অধিকার দিতে হইবে। নতুবা বিশ্বের চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

পুলিশ বাহিনী দিয়া জোর করিয়া যে শান্তিরক্ষা হইবে, তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

জানী রাষ্ট্রতন্ত্র।

এ সংগ্রামের সূত্রপাত হইতেই অনেক হোমরাচেমরা লোক বলিয়াছেন যে, ইহা জগতে গণতন্ত্র রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। নাৎসী-ফ্যাসিস্ত জাপ শক্তিতন্ত্র সংগ্রামের বাঁজ থাকে—সুতরাং শক্তিবাদের উদ্বেগ করিয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা শান্তির জন্য প্রয়োজন এবং ইহাতেই জগতের মঙ্গল, এই কথাটাই বার বার বলা হইয়াছে।

একথা নির্বিশেষে মানিয়া লওয়া যায় কিনা সন্দেহ। প্রকৃত গণতন্ত্র জগতে কোনদিনই ছিল না, এখনও নাই। প্রাচীন রোম বা এথেন্সে ছিল জনসাধারণের শাসন-ব্যাপারে সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপের অধিকার, কিন্তু সেখানেও প্রকৃত অধিকার ছিল মূলতঃমত নেতার হাতে। আধুনিক গণতন্ত্রের পত্তন হইয়াছিল বটিশ পার্লামেন্টে

প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রে। ইহাতে সাধারণের সাক্ষাৎ অধিকার নাই, আছে শুধু প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার। প্রতিনিধিরা অধিকাংশের মতানুসারে যাহাদিগকে পোষণ করেন, তাহাই করে শাসন। ইহারই নাম গণতন্ত্র।

প্রকৃত গণতন্ত্র বর্তমান যুগের বৃহৎ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সত্যসত্যই জনগণকে শাসনাধিকার দিতে গেলে রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাগ করিয়া প্রত্যেক খণ্ডের পরিচালন ক্ষমতা স্থানীয় জনগণকে দিয়া কেবল রাষ্ট্রের সমগ্র হিতানুষ্ঠান মাত্র রাখিতে হয় প্রতিনিধিগণিত রাষ্ট্রসভায়। এই আদর্শে রচিত হইয়াছে নোভোরট রাষ্ট্রগঠন।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইলেই যে যুদ্ধ ও হিংসার মূলেচ্ছেদ হইবে, একথা বলা চলে না। একথা সত্য যে, আত্মকাল যুদ্ধ সৃষ্টি করে মূলতঃমত লোক তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হিংসা ও সন্দেহ আগ্রহ করিয়া; জনগণ চায় শান্তি। কিন্তু একথাও সত্য যে, জনসাধারণের খুব বড় একটা অংশ রাষ্ট্রশাসনের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ। ভাবনাচিন্তার ভার, কাজের ভার নেতার হাতে দিয়া বিনা প্রশ্নে তাঁকে অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি জনগণের এত বেশী যে, যে কোনও দুর্ঘট শক্তিমূলক ব্যক্তি তাহাদিগকে নাচাইয়া মাতাইয়া তাহাদিগকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করািতে পারে। জার্মানীর জনসাধারণকে দেখিতে দেখিতে ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে হিটলার যে সংগ্রামে মাতাইয়া তুলিয়াছেন, ইহা নিছক শক্তিশ্রয়োগ বা গেল্টাপোর প্রয়োগের ফল নয়, জনসাধারণের সত্যসত্যই হিটলারকে অনুমোদনের ফল। কেন তারা অনুমোদন করে, তাহা হিটলারের মাইন কাম্পফ্ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

আমাদের দেশেও নেতাকে অশ্রদ্ধাভাবে অনুসরণ করিয়া যে কোনও দুঃসাহসিক কার্যে নিযুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত না আছে এমন নয়। একথা দুঃখের সইত স্বীকার করিতে হয় যে কোনও দেশেই জনসাধারণের ভিতর এতখানি বুদ্ধি-বিদ্যার প্রাচুর্য নাই, যাতে তারা প্রত্যেক জাতীয় ব্যাপারের ভালমন্দ বিচার করিয়া সুসিদ্ধান্তে আসিতে পারে। আর জনসাধারণের পোষকতা পায় স্বিরবুদ্ধি চিত্রকণ নেতার চেয়ে যারা মাতাইতে পারে, তাহাই বেশী। যাকিছু একটা ধূয়া ধরিয়া লোককে মাতাইতে পারিলে জনশক্তি তোমার পিছনে দাঁড়াইবে, যিনি শূন্য বুদ্ধিইয়া যুক্তি দিয়া লোকের কাছে আবেদন করিবেন, তিনি সে পোষকতা পাইবেন না। একথা সব দেশেই অল্প-বিস্তর সত্য।

কর্মকুশলতায় গণতন্ত্র যে ফ্যাসিজমের কাছে মাথা তুলিতে পারে না, তাহা একরকম স্বতঃসিদ্ধ এবং বর্তমান যুদ্ধে তাহা সকলে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছেন। আজ যে মিত্রশক্তি ক্রমে অধিক তৎপরতা লাভ করিয়াছেন, তার একটি প্রধান কারণ এই যে, যুদ্ধের চাপে গণতান্ত্রিক দেশগুলি অস্বাভাবিক পরিমাণে দেশনায়কদের দিয়াছেন ডিক্টেটরের মত অব্যাহত ক্ষমতা। নতুবা প্রত্যেকটি বিষয় পার্লামেন্টের বিচার-বিতর্ক দ্বারা নির্ণয় করিতে হইলে আজও যুদ্ধের মোড় ফিঁদিত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু শূন্য যুদ্ধায়োজনে নয়, শান্তির সময়ে দেশের হিত-সাধনেও ডিক্টেটরী শাসন অসাধারণ শক্তি ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছে এবং প্রধানতঃ সেই কর্মকুশলতার জোরেই ফ্যাসিজম জনগণের বিপুল সমর্থন লাভ করিয়াছে। রাশিয়ায় যে অশ্রুত অভ্যুদয় দশ বৎসরে হইয়াছিল এবং তার পরও সমান বেগে চলিয়াছে, তাহা ঠিক গণ-নিয়োজিত নয়, গণ-হিতরত ডিক্টেটর পরিচালিত।

সুতরাং গণতন্ত্র নামে শূন্য ভোটতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই যে মানব-কল্যাণের দিক দিয়া শেষ কথা, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। পক্ষান্তরে স্লেটোর যুগ হইতে আজ পর্যন্ত বহু মনীষীই একথা মনে করেন যে, রাষ্ট্র-পরিচালন এমন একটা দুর্হ কার্য, যাহা সুশিক্ষিত বিশেষজ্ঞই ঠিক করিতে পারে, অশিক্ষিত জনসাধারণের অজ্ঞ হস্তক্ষেপ ঘটনা ভাল করে, মন্দও হয়তো তার চেয়ে কম করে

না। তাই স্বেচ্ছাে তাঁর রিপাবলিকে শাসনের ভার দিয়াছিলেন বিশেষভাবে শিক্ষিত বিচক্ষণ পণ্ডিত গাজিয়ানদের হাতে। এই মতবাদের জন্য যে একটা নির্ভাজ সত্য আছে, সেখা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু এই সন্দেহ হয় যে, পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ কমিশন হইলেও স্বার্থের টানে তাঁর জনকল্যাণের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। কাজেই, তাঁর রাশ টানিয়া রাখিবার প্রয়োজন আছে এবং সে কাজ করিবে জনসাধারণ।

ভবিষ্য রাষ্ট্রনীতির পরিকল্পনায় এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন—কিন্তু সে গবেষণা হইবে কি?—করিবে কে?

ডেমোক্রেসী বলিয়া যারা সব চেয়ে বেশী হৈ-ঠা করেন, তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক ডেমোক্রেসী চান না, চান জনগণের নাম করিয়া নিজের মত ও প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা। তাই ধীরবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়াছে একদিকে অন্ধ আবেগ ও অপর দিকে প্রোপাগান্ডা। বাকিছু একটা প্রোগ্রাম লইয়া জোর প্রোপাগান্ডা করিলেই জনগণের সমর্থন পাওয়া যাইবে, এই ভরসায় বেশীর ভাগ জননায়ক গণতন্ত্রের পক্ষপাতী হন। জনগণের সমর্থন পাইয়া তাঁরাই দেশের সব চেয়ে বেশী মঙ্গল করিতে পারিবেন, একথা অনেকে মনে করেন, অনেকে হয়তো মনে করেন শুধু নিজের গণগোষ্ঠী জাতির মঙ্গলসাধন। ডেমোক্রেসীতে প্রকৃত বিশ্বাসী জগতে বিরল। অথচ অধিকাংশ দেশেই ডেমোক্রেসীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা করিতে সাহস কাহারও নাই।

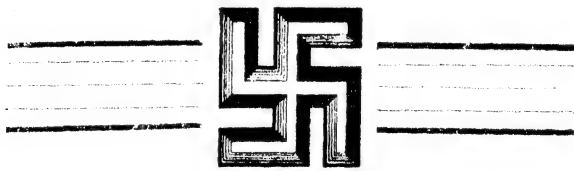
ডেমোক্রেসী বা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন রাষ্ট্রগঠনের শেষ কথা নয়। বর্তমান যুগে অতীতের অভিজ্ঞতামূলে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

কোনও পরিকল্পনা আবশ্যক হইয়াছে। সেদিকে ভবিষ্য রাষ্ট্রনায়কদের দৃষ্টি পড়িবে কি?

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে পর্যন্ত ইংলণ্ডে উদ্ভাবিত প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্রের আদর্শ। কিন্তু তার পর সোস্যালিজমের উত্তরোত্তর প্রসারের সঙ্গে আর একটা মতবাদ ক্রমে প্রবল শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনই শেষ কথা নয়। শাসনের যন্ত্র গঠনের চেয়ে শাসনের নীতি ও প্রকৃতির উপর সোস্যালিজম বেশী জোর দেয়। রাষ্ট্রনীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, যাতে অসাম্য দূর হইয়া সকলের সমানভাবে আরামে বাঁচিবার অধিকার, কাজ করিবার অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকার সুনির্দিষ্ট হইবে। নির্ধনকে শুল্ক, ভোটের অধিকার দিলেই তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, কেননা তার মরণবাচনের সোনার কাঠিটি আছে ধনীর হাতে। এই সোনার কাঠি ধনীর হাত হইতে কাড়িয়া না লইলে গণতন্ত্রের কোনও সাধনতা থাকে না।

মালদারী অর্থনীতি যে রাজ্যে চলে, সেখানে মালদারের শক্তি ডেমোক্রেসীর উপর যে কত প্রচণ্ড প্রভাব প্রয়োগ করে তার দৃষ্টান্ত আছে বহু। তার উপর আর একটা বিপদ এই যে, সকলেরই প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা থাকে বড়লোক হইবার মালদার হইবার। যার সুযোগ ও সুবিধা আছে, তার সে সুবিধার ব্যবহার করিয়া নিজের অর্থশক্তি বৃদ্ধির একটা লালসা প্রায় অশাসনভাবী। মালদারী সমাজে এই লালসাকে দোষের বলা যায় না। কেননা, যেখানে 'চাচা আপন বাঁচাই একমাত্র নীতি', সেখানে নিজের ও নিজের আত্মীয়-পরিজনের সুখ-সমৃদ্ধি স্থায়ী করিবার জন্য অর্থসঞ্চয় ও বৃদ্ধি ছাড়া অন্য উপায় নাই।

আমাদের শুভানুধারয়ীগণকে শারদীয়ার
সাদর-সন্তাযণ জ্ঞাপন করিতেছি।



দি বেঙ্কল ওরিয়েণ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৬

রেজিঃ অফিস—বুনিহ্না

সেন্ট্রাল অফিস—পি-২৯, মিশন রো এক্সটেনশান, কলিকাতা।

শাখাসমূহঃ—বুনাগাঁ (যশোহর) * বড়বাজার (কলিকাতা)।

মিঃ এ. বি. ঘোষ, ডিরেক্টর,

মিঃ এস. কে. ভট্টাচার্য,

জেনারেল ম্যানেজার।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

শারদীয়া আহিত্য



পূজোর আর বেশি দেরি নেই। বছরের যে সময়টুকুর জন্ম প্রত্যেক বাঙালী অধীর প্রতীক্ষায় দিন গোনে সে হচ্ছে এই পূজোর কটা দিন। নিরানন্দ বাঙালী-জীবনেও খুশির ঠোঁয়া লাগে। বিশেষ করে বাংলার সাহিত্যিক মহলে যে চাকুলা দেখা যায় তা একদিক থেকে যেমন আনন্দের তেমনি আবার করুণও। বাংলার সাহিত্যিকদের আর্থিক হ্রস্বতার কথা তো সর্বজনজ্ঞাত। বই কিনে পড়ার ব্যাতি বাঙালীর কোনো কালেই নেই, কিন্তু পূজোর সময়ে আশ্চর্যভাবে তারও ব্যতিক্রম দেখা যায়। কাজেই পূজোর সময়ে সাহিত্যিকেরা যখন একটু উৎকৃষ্ট হবার সুযোগ পান তখন আমাদের মনে বেদনা জাগে বৈকি। ছোটো, বড়ো, বিখ্যাত, অখ্যাত সব রকম দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকার পরিচালকরাই তাঁদের সাধ্যমতো 'শারদীয়া সংখ্যা বার করে' লেখকদের কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করেন। প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা তাঁদের ব্যাতি বাড়াবার কথা অক্ষুণ্ণ রাখবার সুযোগ পান, অনেক নবীন লেখক আত্মপ্রকাশ করেন প্রথম। এ-বছরেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যুদ্ধঘটিত নানা অসুবিধা—কাগজের দুস্পাপতা, অস্ত্রাস্ত্র জিনিসের হুমুয়াতা, এর উপরে সরকারের নির্দেশ সত্ত্বেও অগণিত নতুন বই বাজারে আত্মপ্রকাশ করেছে, শারদীয়া সংখ্যা পত্রিকা তো আছেই। বাংলার ছোটো, বড়ো সকল লেখকই লিখেছেন এ-সব পত্রিকায়, বই-এ। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে এদের মধ্যে অনেক লেখাই পার্ক ইন্স।

পার্ক ইন্স।

প্রস্তুতকারক :— এ্যাকাডেমিক ম্যানুস্ক্রিপ্টস্‌ অ্যান্ড প্রিন্টিং।

এ জে কে স্ :— ক্যালকাটা সিটি কমার্শিয়াল কোং লিঃ।

পোষ্ট বক্স নং ৫২৬, কলিকাতা

পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যদি এমন হয় যে, শিশুদিগের দৃষ্টি ও শিক্ষার ভার নেয় রাষ্ট্র প্রত্যেক লোক কাজ করিয়া অনায়াসে আপনাদের জীবন-মরণ ও আরামের উপায় সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারে, তবে সমুদয়ের এ তীব্র কামনার কোনও ব্যতিক্রম হইতে থাকে না। এ প্রবাস্তও পরিপূর্ণ হইতে পারে না। ক্ষমতা পাইলে তাহার অপব্যবহার করে দোকান প্রধানতঃ নিজের দুঃখসাধন করিবার জন্য, সে দুঃখসাধন করিবার সুযোগ যদি না থাকে, তবে ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া দশকে বণ্ডিত করিয়া ক্ষমতার অপব্যবহারের খুব বড় একটা হেতু চালিয়া যাইবে। নিবাসিত প্রতিনিধি অন্ততঃ অর্থ-শেষ্ঠ বা আর্থিক সুযোগ সুবিধার বোঝে বিপত্তে যাইবেন না।

তাই সোস্যালিজম্ যদিও চায় যে শাসনকার্য জনগণের সম্মতি লইয়া এবং তাদের প্রতিনিধির দ্বারা ই সম্পাদিত হইবে, কিন্তু ইহা আরও চায় যে ইহা ছদ্ম শাসনতন্ত্রে কতকগুলি মূলসূত্র মানিয়া লইতে হইবে। মানুষের জীবনধারণের জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন, তাহা উৎপাদনের উপায় যে ভূমি কারখানা প্রভৃতি, তাহাতে ব্যক্তিগত অধিকার থাকিবে না। সকল উৎপাদন-ক্রিয়া ও সম্পদ বিতরণ ব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে এবং দেশের সমস্ত সম্পদ এমনভাবে নিরীকৃত হইবে, যাহাতে সকলে তাহার সমান সুবিধা পায়। পক্ষান্তরে, সোস্যালিজম্ বলে যে বসিয়া খাইবার অধিকার কাহারও থাকিবে না, খাইতে পাইবে সবাই, কিন্তু সবারই খাটিতে হইবে। রাষ্ট্রনিরূপিত এক ব্যবস্থার দ্বারা দেশের সমগ্র শ্রমশক্তি নিয়োজিত হইবে এমনভাবে সম্পদ সৃষ্টি ও বণ্টনে যাহাতে জনসাধারণের সর্বোপেক্ষা অধিক উপকার হয়। সোস্যালিজমে এই সব মূলসূত্র গত পঞ্চাশ খাট বৎসর হইল অস্বাধিক পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ধর্মকর্তা উগ্রভাবেই চালিয়াছে, কিন্তু শ্রমিক ও জনসাধারণের হিতসাধনের নীতি অঙ্গে অঙ্গে শাসনকার্যে স্বীকৃত হইয়াছে। ফ্যাসিস্ত ইতালী ও নাস্ত্রী জার্মানী সোস্যালিজমের অনেক নীতি তাদের নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া গ্রহণ করিয়াছিল। দেশের সমুদয় শ্রমশক্তি ও সম্পদ সৃষ্টি শক্তির নিয়ন্ত্রণের গ্রহণ করিয়াছিল স্টেট এবং সে সব নিয়ন্ত্রণ করিয়া সমস্ত দেশবাসীর জীবন নিয়ন্ত্রণের প্রায় সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছিল রাষ্ট্র। শত্রু তাদের এই সংহত নীতি সোস্যালিজম্ নীতি অনুযায়ী নিয়োজিত না করিয়া দেশের একজন্ত নেতার নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। একমাত্র রাষ্ট্রীয় সোস্যালিস্ট নীতির প্রকৃত পরীক্ষা হইয়াছে। জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেখানে দেশের সমস্ত সম্পদ ও শ্রমশক্তির সংহতি সাধনের চেষ্টা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইতালী ও জার্মানীতে যাহা হয় নাই, তাহা এখানে হইয়াছে। এই বিশাল কার্য কোনও স্বেচ্ছাচারী নেতার একার হস্তে ন্যস্ত হয় নাই। ইহার প্রত্যেক অংশ নিয়ন্ত্রণের ভার পড়িয়াছে সেই অংশ নিযুক্ত শ্রমিকদের সোভিয়েট বা সমিতির উপর।

এইখানেই সোভিয়েট নীতির বৈশিষ্ট্য। শাসনাদিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা বিতরণ করা হইয়াছে শ্রমিক জনসাধারণের উপর। এ কাজ অনায়াসে হয় নাই। একদিনেও সম্পদ হয় নাই। অনেক ভুলভ্রান্তি হইয়াছে, অনেক বাধাবিঘ্ন উদ্ভূত হইতে হইয়াছে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মূলনীতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে রাষ্ট্রীয় এমন একটি সম্মুখ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, যার ফলে নিপুণ বিশেষজ্ঞের দ্বারা নিরূপিত এক বিরাট রাষ্ট্রব্যাপী প্রচেষ্টা আয়োজনে শ্রমিকদের নিজস্বের দ্বারা ই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তার ফলে ক্ষেত্রে বা কারখানায় যারা কাজ করে, তারা একথা অনুভব করে না যে, তারা পরের কাজ করিতেছে। তারা নিজেরা শত্রু, নিজেরদের সকলের কাজ করিতেছে, সে কাজের যা ফল তার সম্পূর্ণ উপকার তারাই পাইবে, একটা সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা অনুসারে যাতে লাভের কম-বেশী হইবে না।

প্রথমে কাজটা ঠিক জনসাধারণের স্বচ্ছন্দ সহযোগিতায় সম্পন্ন হয় নাই। ডিক্টেটর পরিচালিত শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল

অনেকটা। কিন্তু জোর করিয়া কাজ করা ইহার সঙ্গে সঙ্গে চালিয়াছিল একটা প্রচণ্ড সর্বব্যাপী শিক্ষার আয়োজন। বিদ্যালয়ের শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবীণ শ্রমিকদের সকলকেই নানাভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও কর্মনীতিতে অক্লান্ত অপ্রান্ত-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। তার ফলে ডিক্টেটরীয় শৃঙ্খল উচ্চতম রাষ্ট্র পরিষদেও প্রতিনিধিমূলক শাসন ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইয়াছে।

এমন করিয়া সমগ্র জাতিটাকে শিক্ষা দিয়া কাজ করাইয়া যে অপূর্ণ সংহতি সৃষ্টি হইয়াছিল তার সম্পূর্ণ সফলতা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় প্ল্যান প্রায় পনেরো বৎসর সম্পূর্ণরূপে দেশের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা, তার বিরাট শিল্পগঠনের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, তার ভিতর যুদ্ধাভিযানের স্থান সামান্যই ছিল। সেই বিপুল শক্তি যুদ্ধাভিযানে নিয়োজিত হইয়াছিল, বর্তমান যুদ্ধের প্রাকালে। তাই যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে রাষ্ট্রীয় হিটলারের প্রতিরোধে সফল হইতে পারে নাই। কিন্তু যত দিন গেল, আয়োজন যত পরিপূর্ণ হইল, সমরোপকরণ হাতে আনিয়া দিল ইংলণ্ড ও আমেরিকা, তখন আর রাষ্ট্রীয়কে টেকাইবার শক্তি হিটলারের হইল না। শান্তিযয় সম্মুখি ও জনকল্যাণ সাধনায় রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রনীতি যেমন সফলতা লাভ করিয়াছে, ঠিক তেমনি সফলতা লাভ করিয়াছে সে সংগ্রামে।

অনেক বিচক্ষণ বিদেশী রাষ্ট্রীয় এই সর্বব্যাপী সফলতার হেতু অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার প্রধান মূল এই যে, রাষ্ট্রীয় কেহ মনে করে না যে পরের জন্য খাটিতেছে—দেশে যা-কিছু আয়োজন, সব তারা মনে করে তাদের নিজস্বের কাজ। প্রত্যেক শ্রমিক মনে করে যে যুদ্ধটাও তাদের নিজস্বের যুদ্ধ। যা-কিছু রাষ্ট্রীয় শ্রমিক করে, তার সম্পূর্ণ সুযোগ প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় পায়। আবার কারখানায়, চাষের ক্ষেত্রে, শাসনকার্যে সর্বত্র পরিচালনের ক্ষমতাও ন্যস্ত আছে কোনও উপরওয়ালার হাতে নয়, তাদেরই সোভিয়েটের হাতে। এই পরিপূর্ণ আত্মীয়তাবোধের উপর তাদের যে দেশাত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত, তাহা একটি নিরীকৃত সত্য বস্তু।

রাষ্ট্রীয় এই সাফলতার দৃষ্টান্ত ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রচুর চিন্তার সৃষ্টি করিয়াছে। তাদের শিল্প-প্রচেষ্টা যতই বৃহৎ ও অতিকায় হউক, তার ভিতর রাষ্ট্রীয় তুলনায় শ্রমিকের আত্মীয়তাবোধের যে যথেষ্ট অভাব আছে, সেদিকে সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাই সে সব দেশেও একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে যে, শ্রমিককে সুখী ও সংযুক্ত করিবার জন্য এখনকার চেয়ে অধিক পর্যাণ্ড আয়োজন করিতে হইবে। ক্যাপিটালিজমের খাচা বহাল রাখিয়া শ্রমিকের মঙ্গলসাধনের জন্য কত দূর কি করা যায়, তার সম্বন্ধে নানা গবেষণা হইতেছে। সুপ্রাচীন বেভারিজ প্ল্যান তার একটি ফল।

বেভারিজ প্ল্যান অভিশয় সৃষ্টিস্থিত এবং অনেক বিষয়ে দেশের জনসাধারণের হিতসাধনের পরিকল্পনা অনেকটা অগ্রসর। কিন্তু হাজার হইলেও ইহা সোস্যালিজমের পথে একটি বিশ্রামগার মাত্র। সামাজিক মঙ্গলসাধন প্রচেষ্টায় ইহাকেই শেষ কথা বলিয়া মনে করা যায় না। ইহার ভালমন্দ লইয়া অনেক বিচার-বিবেচনা হইতেছে—ইহার উপকারিতা ঠিক কতখানি হইবে, তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। পক্ষান্তরে, সোভিয়েট পদ্ধতির সাফল্য সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই সফল পরীক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ না লইয়া তার অধিপথে দাঁড়াইয়া একটা নতুন পরিকল্পনার চেষ্টার পক্ষে অপর কোনও যুক্তি নাই। কেবলমাত্র ইংলণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে সম্বন্ধ যথাসম্ভব নিবারণের চেষ্টাই ইহার একমাত্র হেতু ও যুক্তি।

সে যাহাই হউক, আজকার দিনে একথা অবিসম্বাদিত যে, কেবলমাত্র প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা ই স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে না। স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা ও সমবায় শক্তি সাধন, সব কাজের জন্য প্রয়োজন এমন একটা সংগঠনের, যাহা



ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের

সেবায় নিযুক্ত...

এ-যুদ্ধের ফলে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের যেমন প্রসার হয়েছে তেমনি আবার এ-দেশের শিল্প-পতিরা যুক্তও শিখেছেন যে তাঁদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি এ পর্যন্ত আমদানী করা মালের উপর কতখানি নির্ভর করে এসেছে। আজ নানা প্রতিবন্ধকতায় বিদেশী বহু মূল-উপাদানের আমদানি এক রকম বন্ধ, অথচ চাহিদা বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ।

সোয়াইকার বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বহুবিধ মূল-উপকরণ তৈরি হয়। বিশেষ করে গুল্মিক এবং ক্রিসলিক অ্যাসিড জাতীয় কেমিক্যালগুলি তৈরি করার ব্যাপারে এঁরাই এদেশে পথ প্রদর্শক। তা'ছাড়া ভারতের বিভিন্ন বিশিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে উদ্ভিদ্ধ তৈল, রাসায়নিক ও খনিজ পদার্থ সোয়াইকাই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যোগাচ্ছেন; এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লুক্‌রিক্যান্ট ও কোল-টার বাইপ্রডাক্টের প্রস্তুতকারক হিসাবেও সোয়াইকা বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন।

সোয়াইকা অয়েল মিলস্—'ককুম' মাকা
বিবিধ উদ্ভিদ্ধ তৈল ও ডিলিনেফকট্যান্টের
ককুম বাত।

সোয়াইকা কেমিক্যাল অ্যান্ড মিনারেল
কোং লিমিটেড—খনিজ সাদিক, রাসায়নিক
প্রস্তুতকারক ও বিবিধ খনিজ পদার্থ এবং রাসা-
য়নিকের পাঠিকারী বিক্রয় ও সরবরাহকারী।

সোয়াইকা কারডিলাইজার লিমিটেড—
নামাপ্রকার বৈল ও সল্লজ সাবের ইক সর-
বরাহকারী।

সোয়াইকা স্ট্যাণ্ড অয়েল অ্যান্ড ভার্নিশ
কোং লিমিটেড—স্ট্যাণ্ড অয়েল ও বার্নিশ
প্রস্তুতকারক।

সোয়াইকা এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট
লিমিটেড—মাল আমদানি ও রপ্তানিকারক।

সোয়াইকা অয়েল অ্যান্ড প্রোডাক্টস কোং
লিমিটেড—গ্রীষ্ম, লুক্‌রিক্যান্ট প্রভৃতি প্রস্তুত-
কারক।

সোয়াইকা মিনারেল ক্রাসিং মিলস অ্যান্ড
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লিমিটেড—খনিজ পদার্থ চূর্ণিত
সরবরাহকারী।

সোয়াইকা সানারাই করপোরেশন লিমিটেড
—মিল ও কারখানার মাল সরবরাহকারী।

সোয়াইকা ব্রিক ওয়ার্কস্—ইট প্রস্তুতকারক
ও গৃহনির্মাণের মালমশলা সরবরাহকারী।

সোয়াইকা শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহ

হেড অফিস : "পোলক হাউস" ১৮এ, পোলক স্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম : "প্যাডলক"—কলিকাতা। ফোন : কলি : ৬১৭১-৭২।

কারখানা : লিসুয়া ও বারাপসী। শাখা সমূহ : - বোম্বাই, বারাপসী, কারউই এবং জব্বলপুর।

সোভিয়েট শাসনের অনুদ্বন্দ্ব : সেই সংগঠনের কয়েকটি মূল সূত্র ধরা যাইতে পারে।

১ম। দেশের সকল উপাদান ও শ্রমশক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়া সুনীত প্রণালীতে সর্বাধিক সমৃদ্ধি সৃষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২য়। এই নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থার উপকারিতা কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষে নিবন্ধ থাকিবে না, সর্বসাধারণ ইহাতে সমান অধিকারী হইবে।

৩য়। এই সমগ্র ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞের কাজ বিশেষজ্ঞেরা করিবে, কিন্তু ইহার নিয়ন্ত্রণের কার্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া শ্রমিক প্রতিনিধিদের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে।

৪র্থ। এই সংহতিয় অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করিবার জন্য অতিন্দুতভাবে শিক্ষার কাজ চালাইতে হইবে, যাহাতে প্রথমে ইহা শাসনমূলক বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলেও পরিশেষে প্রত্যেকের স্বচ্ছন্দ আত্মীয়তাবোধের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই ব্যবস্থাই রাষ্ট্রগঠনের নবতম ও সফলতম সূত্র, যাহা সোভিয়েট রাশিয়ায় পরীক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশভেদে, অবস্থাভেদে এই মূলসূত্রের প্রয়োগে প্রভেদ অবশ্যই হইবে, কিন্তু এই মূলসূত্রই জাতীয় প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির একমাত্র উপায়।

কিন্তু প্রশস্তির নানা সম্মেলনে যেসব আলোচনা হইতেছে, তাহাতে এমন কোনও আশাই হয় না যে, যুদ্ধোত্তর জগৎ এই সব নীতি মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন। তাহাদের রূপনার সমীমা Atlantic Charterএর Four Freedoms এবং Beveridge Plan, Keynes Plan প্রভৃতি। এ সবগুলিরই মূল ভিত্তি মালদারী ও ব্যক্তিগত স্বার্থের অন্ধুর স্বাধীনতা যাহা অস্বীকার করিয়াই সোভিয়েট অসামান্য সফলতা লাভ করিয়াছে।

যুদ্ধোত্তর ভারত।

বিশ্বের বিরাট ক্ষেত্র ছাড়িয়া ভারতের দিকে চাহিলে নৈরাশ্য আরও গভীর হইয়া পড়ে।

ভারতে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের এক চিন্তা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা : আর অর্থনৈতিক নেতাদের একমাত্র পরিকল্পনা, মালদারী ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সহায়তায় পশ্চিমের সমকক্ষ বৃহৎ শিল্পগঠন। ইহার অধিক চিন্তার কথা বিশেষ শোনা যায় না।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সম্ভাবনা কত দূর আছে জানি না। ক্রীপাসু প্রস্তাবের সময় ভারতকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পথে আগ্রসর করিয়া দিবার যতখানি আগ্রহ ইংলন্ডের ছিল, তার সুযোগ গ্রহণ করা আমাদের নেতৃবৃন্দ অসম্মানকর মনে করিয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ রাজাগোপালাচাৰ্য্যার মারফৎ সেই প্রস্তাবেরই সংস্কৃত সংস্করণ বিষয়ে ইংলন্ডের তার কাছাকাছি আগ্রহও দেখা যায় না।

সুযোগ যে হারানো হইয়াছে, সে কথা দুঃখের বিষয় ; কিন্তু ইংলন্ড যে আজ আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দান করিতে আগ্রহ-শীল নন, তাহা ততটা দুঃখের নয়। কেমনা, স্বাধীনতা দান করিবার জিনিষ নয়, তাহা অর্জন করিতে হয়।

তার চেয়ে গভীরতর দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের যে সকল নেতা ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা লইয়া আলাপ-আলোচনা করিতেছেন, তাঁদের দৃষ্টির ক্ষেত্র এত অপরিসর ও বর্তমানকালের অবস্থার অনুপাতে এত অনগ্রসর।

শাসনতন্ত্র হইবে প্রতিনিধিমূলক, ইংলন্ডের কোনও আদর্শতা থাকিবে না ইহার অতিরিক্ত কংগ্রেসের বা গান্ধীজীর কিছু বল-বার নাই। তাঁদের বিপক্ষে যারা দাঁড়াইয়াছেন তাঁদের দৃষ্টি বৃষ্টি

জনসেবার আদর্শে পরিচালিত, নিরাপদ ও সম্ভ্রান্ত

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস :—কুমিল্লা

কলিকাতা অফিস :—২২, ক্যানিং স্ট্রীট

আসাম শাখা :—ডিব্রুগড়

“ক্যাপিটাল”

১৫ই জুন, '৪৪ সন বলেন—(বঙ্গানুবাদ) “বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাগলা প্রদেশে যে কয়েকটি বীমা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তন্মধ্যে সম্ভবতঃ ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়াই সর্বাধিক সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছে। নতুন কাজ ও প্রিমিয়াম বাবদ আয় বিশেষ সন্তোষজনক। গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটিতেই প্রায় সমস্ত টাকা লক্ষ্যী আছে।”

আর্থিক পরিচয়

(১৯৪৩ সন)

নতুন বীমাপত্র	...	১৬,০০,০০০, টাকার উপর
প্রিমিয়াম বাবদ আয়	...	২,০০,০০০, " "
বীমা তহবিল	...	৩,১৩,০০০, " "
সম্পত্তির পরিমাণ	...	৫,৫০,০০০, " "

বোনাস

মেয়াদী বীমায় ... ১০, আজীবন বীমায় ... ১৬,

(প্রতি বৎসর প্রতি ১০০০, টাকার পলিসির উপর)

উত্তম সর্বোৎকৃষ্ট সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যিক।

মেসার্স : ম্যানেজারস লিঃ
চীফ এজেন্টস্
ইউ পি সি পি ও লিমিঃ
২৫, শ্রীরাম রোড, লক্ষ্মী

মিঃ এন সি দত্ত, এম এল সি
চেয়ারম্যান



মেডাবেব অবসান

গত দুবৎসরের কঠিন পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি। বন্ধ্যায়, রোগে, দুর্ভিক্ষে অসংখ্য মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হয়েছে। কিন্তু তবুও আমরা বেঁচে আছি। হৃদশার যে অবসান ঘটেছে তা' নয়, এখনো চলছে অগ্নিপরীক্ষা, তবে আগুনের তাপ ক্রমেই কমে আসছে। বিশেষজ্ঞদের মত—যুদ্ধ শেষ হতে আর বিশেষ দেরি নেই। খাদ্য-সমস্যাও কিছু পরিমাণে আয়ত্তের মধ্যে আনা গেছে। দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রসারও ক্রমবর্ধমান। চারদিকেই যেন সম্ভাবনার, সুদিনের ইংগিত। এরই প্রতীকরূপে আনন্দময়ীর আগমন। হাতে তাঁর বরাভয়, অসীম করুণা তাঁর দৃষ্টিতে। মনে হয় সকল অভাবের এইবার অবসান হবে।



সি,কে,সিএন এণ্ড কোংলিঃ

জ বা কু সু ম হা উ স ক লি কা তা

জারও সংকুচিত। জিম্বা সাবেক ও মুসলিম লীগ কংগ্রেসের আদর্শ ধার করিয়া সম্মুখ-শব্দে তাঁরা চান পাকিস্থানকে তফাৎ করিয়া লইতে। আর কতক লোক চণ্ডল হইয়া উঠিয়াছেন মাইনিরটির রক্ষা-কবচের জন্যে।

এ সকল দাওয়া দাবীর খুঁটিনাটির বিচার আমি করিতে চাই না। কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশের অভিজ্ঞতা এই যে, মাত্র রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা প্রতিনিধিত্বের দ্বারা দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তার জন্য চাই আরও এমন কতকগুলি ব্যবস্থা যাহাতে প্রত্যেক দেশের সকল সুবিধা ও সমৃদ্ধির উপযুক্ত অংশ পায় এবং সেই ব্যবস্থা নিশ্চয় করিবার জন্য চাই এমন একটা শাসন পদ্ধতি যাহাতে শাসনের কাজ ভাগিয়া নিষ্কলঙ্কীকৃত করিয়া সকলকে অস্প-বিস্তার প্রত্যক্ষভাবে শাসনের কাজের অধিকার দেওয়া হয়। পৃথিবীর এই অভিজ্ঞতার দিকে একেবারে অন্ধ হইয়া কেবলমাত্র উনিবংশ শতাব্দীর আদর্শে প্রতিনিধিবাদকে শেষ কথা খরিয়া আমরা যে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করিতেছি ইহা পরিতপের বিষয়।

আবার দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি সাধনের চেষ্টায় যে বোম্বাই প্ল্যান ভারত সরকারে পেশ করা হইয়াছে তাহাও ঠিক এমনি অসাময়িক। বড় বড় কারখানা গড়িয়া প্রচুর মূলধন লইয়া টেটের সহযোগে দেশের যত কিছু শিল্পজাত গড়িবার সম্ভাবনা আছে তাহা পরিপূর্ণরূপে বাস্তব করিবার জন্য এই প্রচেষ্টা। এ কাজ অবশ্য কতবা, কিন্তু কে করবে? কি প্রণালীতে ইহা করা হইবে? ইহার দ্বারা দেশের যে সম্পদ বৃদ্ধি হইবে তাহার সুযোগ সমস্ত দেশ-বাসীর মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টনের কি ব্যবস্থা হইবে একথা যে আগে হইতে ভাবিবার কথা সে কথা ইহার ভাবিয়াছেন মনে হয় না। তা ছাড়া এ প্ল্যান রচিত হইয়াছে মূলতঃ যুদ্ধের পূর্বের অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতির মূলে। তার কটকট যুদ্ধের জগতে থাকিবে সে কথাও ভাবিবার বিষয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এত দিন চলিয়াছে এই নীতিতে যে যার যত শক্তি আছে মাল সৃষ্টি করিবে আর তারপর বিপুল অয়োজন করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে সেই মাল কেনে ইবার ব্যবস্থা করিবে। এই নীতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক দেশকেই এইরূপে বিদেশী মালের dumping নিবারের জন্য ও স্বদেশীয় শিল্পের রক্ষার জন্য রক্ষণনীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ইহা হইতে হইয়াছে প্রচুর অনিশ্চয় ও প্রচুর সংঘর্ষ। ইহাতে যে সব দেশ শিল্পে আগে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে তাহার সমস্ত বাজার প্রায় গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে; তাদের বিপুল শনাক্তর সামনে ছোটখাট অগ্রসর দেশের মাথা তুলিবার পথ নাই। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অসাম্যের পাশে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে দেশে দেশে বিস্তার হিংসা বিন্দব জমিয়া উঠিয়াছিল এবং বর্তমান যুদ্ধের এটা একটা প্রকাশ্য হেতু। হিটলার স্বদেশে আসর জমাইয়াছিলেন এই Plutoerদের প্রতি বিদ্বেষের দ্বারা তুলিয়া।

যুদ্ধের পরে ঠিক এই ব্যবস্থা থাকিবে না। কি হইবে তাহা লইয়া জল্পনা কল্পনার অবধি নাই—আজও কোনও স্থির নীতি গৃহীত হয় নাই। কিন্তু আটলান্টিক চার্টারের একটি সূত্র এ বিষয়ে একটা দিক নির্দেশ করিতেছে যেটা ভারত বা চীনের পক্ষে চিন্তার বিষয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সকল দেশের সকল কাঁচা মাল পাইবার সমান অধিকার অন্য সকল দেশের হইবে। ভারত, ব্রহ্ম বা চীনের মত দেশে অনেক অবাধত কাঁচা মাল রহিয়াছে, সেগুলি সেই দেশের ভবিষ্যতের আশা। ভারত যে খুব দ্রুত তার শিল্প শক্তি সংহত করিয়া ইংলন্ড বা আমেরিকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সেই কাঁচা মালের সম্পূর্ণ সম্ভাবহার করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এখনে সমান ভাগের সুযোগ পাইবে শব্দে অগ্রসর শিল্প-শক্তিমান দেশ, কাঁচা মালের দেশ শব্দে কাঁচা মালই জোগাইতে থাকিবে। এ নীতি ভারতের পক্ষে ভয়াবহ।

কিন্তু জগৎ আর্থিক সুখ শান্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই আন্তর্জাতিক নীতির আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। শিল্প-জাত প্রস্তুত করিবার অব্যাহত স্বাধীনতা ও তারপর সেই শিল্প যে দেশে প্রকাশ্যে দেশে দেশে কাটাইবার অনিয়ত চেষ্টা উঠাইয়া মালের উপাদান ও দেশে দেশে আসান প্রদান একটা সুনিয়ত ব্যবস্থা অনুসারে করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেক দেশ বাহির হইতে পাইতে পারে ঠিক যাহা তার প্রয়োজন ও যাহা সে নিজে প্রস্তুত করিতে পারে না এবং বিনিময়ে সে অপর দেশকে দিতে পারে যে সব কাঁচা মাল ও শিল্পজাত সে নিজে সৃষ্টি করে এবং যাহা তাহার প্রয়োজনের অধিক।

যুদ্ধের পূর্বে এই নীতি অনুসারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কোনও একটা সুনিয়ত পদ্ধতি ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন দেশের গবর্ণ-মেন্ট মাঝে মাঝে দেশের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কতকটা অজ্ঞানভাবে হিসাবের উপর করতেন অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি। ইহা ঠিক সম্ভাব্য ও সুনিয়তভাবে হইতে পারিয়াছিল শব্দে রাশিয়ায় যেখানে বিহবাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেন্টের একাটীয়া।

বর্তমান যুদ্ধের মধ্যে এই সমস্ত লেন দেনের চুক্তি একটু ব্যাপকভাবে হইয়াছে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে সকল দেশেই বিহবাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেন্টের নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এ সব ব্যবস্থা খুব কার্যকরী হইয়াছে।

আটলান্টিক সনদের ইংগিত এই যে, কাঁচা মাল সম্বন্ধে লেন-দেনের চুক্তি ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়মিত হইবে, কিন্তু ঠিক কি প্রণালীতে হইবে তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। আর শিল্পজাতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে আটলান্টিক সনদ একেবারে নীরব।

তথ্যটি ভবিষ্যৎ জগতে শিল্পজাত কি কাঁচা মাল উভয় বস্তুর বাণিজ্যে যে পার্থক্যের মত অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিবে কিনা এ বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা নাই। ইহা নিয়মিত করার চেষ্টা হইবার প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। নতুবা যুদ্ধের পূর্বে যেমন অনেকটা হইয়াছে যুদ্ধের পরেও তেমনি টেটের দ্বারা অনিশ্চিতভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশের শক্তিমান মালদারেরা শব্দে তাদের নিজস্বের স্বার্থের জন্য international cartel প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া সমস্ত জগতকে তাদের অধীন করিয়া ফেলিবার আশঙ্কা আছে।

আমাদের শিল্পোন্নতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এ সব সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এবং কেবল-মাত্র ন্যায়নীতিমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবসার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া সেগুলিকে মালদারের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির হেতু না করিয়া সর্বজাতীয় সহায়নামূলক করিয়া তুলিতে হইবে। এক কথায় কৃষি, শিল্প, খনিজ-উদ্ভাব প্রভৃতি সকল কার্যই রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে সর্বদেশবাসীর হিতার্থে যাহাতে নিরোজিত হইতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রাশিয়ার পাঁচসনা পরিকল্পনা দ্বারা কার্যাইচ্ছলেন, তাহাদের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্য করিতে হইবে। তাহারা কেবলমাত্র দেশের সর্ববিধ সম্পদ সর্বাঙ্গীণ চেষ্টার দ্বারা বর্ধিত করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহারা ইহাও হিসাব করিয়া-ছিলেন যে, রাশিয়ার তখনকার যে লোক-সংখ্যা ছিল এবং পরবর্তী পাঁচ বৎসরে যে লোক-সংখ্যা হইবে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেক রাশিয়ানের খাওয়া-পরা ও আরামের জন্য কত কি প্রয়োজন হইবে এবং প্রত্যেকের জন্য কাজ জোগাইবার জন্য কি ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে। এতখানি হিসাব করিয়া তাদের প্ল্যান রচিত হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ

জনসংঘ বা সোভিয়েটগুলির অপরিশ্রান্ত চেষ্টায় ইহা কার্যে পরিণত করা হইয়াছিল। তাই সোভিয়েট প্ল্যান ও সোভিয়েটের সকল বৃহৎ প্রচেষ্টা এত অসামান্য সফলমান হইয়াছিল।

যুগ্মোত্তর ভারতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় যদি আমরা কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরিকল্পনা করিয়া বসিয়া থাকি, আধুনিক রাষ্ট্রঘটিত ও অর্থনীতিঘটিত তথ্যগুলি আয়ত্ত করিয়া পরিকল্পনা করিতে অগ্রসর না হই তবে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইবার কারণ নাই।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দিক হইতে আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, বর্তমান জগতে অস্বাধীনতার (Independence) কোনও মানে বা স্থানে নাই। কোনও দেশই অপর দেশের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে পারে না। আমাদের দেখিতে হইবে যে, অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের যে আনন্দার্থ নিষ্ঠার সম্পর্ক, তাহা যেমন কি রাষ্ট্রীয়, কি অর্থনৈতিক অস্বাধীনতার সম্পর্ক না হইয়া সমান সমান স্বাধীন সমবায়ের সম্বন্ধ হয়। এই দিক হইতে যুগ্মোত্তর জগতের পরিকল্পনায় ভারতের যদি কোনও স্থান থাকে, তবে ভারতকে প্রবলভাবে প্রকাশ বা প্রস্থল সর্ববিশ্ব hegemony-র কল্পনায় প্রতিরোধ করিতে হইবে, সর্বজগতের সমন্বয়ে রাষ্ট্র-সমাজের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

কেবলমাত্র প্রতিনিধিত্বের প্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না, দৃষ্টি রাখিতে হইবে দেশের স্বাধীনতার সমান অধিকারভারের দিকে। আর্থিক ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্প-ব্যবস্থা যেমন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির

আয়োজন করিতে হইবে, তেমন সেই সৃষ্ট সম্পদের সুযোগ বাহাতে সর্বদেশবাসীর সমান ভাগে আসে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেইজন্য সমস্ত শাসন যন্ত্রের পরিচালনার ভার শুধরে শুধরে জনসংঘের হাতে ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং সেই সব জন-প্রতিষ্ঠানকে intensively শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে সে ভার সৌষ্ঠবের সহিত বহন করিতে উপযুক্ত করিতে হইবে। যে শাসন-ব্যবস্থা হইবে তাহাতে এসব বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন হইবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নীতি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হইতে হইবে, বাহাতে সেই নীতির ফলে অসহায় ভারত আর একটা নতুন শোষণযন্ত্রের চাপে না পড়ে।

সর্বশেষে নীতি বা পদ্ধতির আবিস্কারে আমাদের অতিমাত্র মৌলিকতার আকাঙ্ক্ষা পরিচালনা করিয়া অন্য দেশের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের আদর্শ সংগৃহ করিতে হইবে। অন্য দেশে যাহা হইয়াছে, ঠিক তাহাই যে অবিকল এদেশেও হইবে, এমন হইতে পারে না। দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেই সব বিদেশী আদর্শ ভাঙিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। কিন্তু অনেকের এমন একটা মোহ আছে যে, আমরা এমন একটা কিছু করিব, যাহা জগতে কেহ কোথাও করে নাই, যার সম্বন্ধে কোথাও কাহারও অভিজ্ঞতা নাই। এই “নতুন কিছু” করার অতিমাত্র মোহ এবং বিদেশী সকল আদর্শ ও অনুষ্ঠানের প্রতি অহেতুক বিম্বেষ বর্জন করিয়া প্রাথমিক সহিত আমাদের আলোচনা করিতে হইবে সকল দেশের সকল অনুষ্ঠানের এবং পৃথিবীর অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ।

হারাধনের কয়টি ছেলে ?

—১—

হারাধনের কয়টি ছেলে

কাজ কি আমার গুনে ?

সব ক'টি যে নেইক বেঁচে

তাই রেখেছি শূন্যে !

—২—

কিন্তু যদি থাকত বেঁচে

(আর) জন্মাত এই যুগে,

(আর) হারাধনই বিদায় নিভ

ম্যালেরিয়ায় ভুগে !

—৩—

অনাথ হলেও ছেলে ক'টির

অভাব থাকত কি,

হারাধনের থাকত যদি

“হাওড়া-পলিসি” ?

হাওড়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
৩০ নং ট্রাণ্ড রোড . কলিকাতা

AA5/M12

চেয়ারম্যান : কর্ণবীর আলামোহন দাশ।

কলকাতা শহরে তিন তিনটে বাড়ি। তবু এসে আছে এই অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ে।
ঘটন ঘটেছে, কোন দিন কেউ যা স্বপ্নেও করেনি। জাপানীরা বর্মামূলক নিয়ে রয়েছে, সেই আতঙ্ক শহর প্রায় খালি।
ভুলকেরা গাঁয়ে এসে জুটেছেন।

ছেলেবরসে সুপ্রিয়া দু-একবার এসেছে, গ্রন্থপার অনেকদিন— প্রায় বছর পনের পরে এই এল। ভারি ভাল লেগেছে। অনুপমকে প্রত্যয় হস্তায় চিঠি দেয়, তাকে লিখেছে, নৃজ গাছপালা, মাঠভরা ধান, শান্ত ঘর-গৃহস্থালী—তুমি এসো একবার, এছবি কোন দিন ভুলতে পারবে না! দোতলার ঘরে থাকতে এক মিনিটও মন চায় না। ইচ্ছে করে

যায় আসে? এখানকার মানুষ নই তো আমরা!

রথের ছুটিতে অনুপম এল। সুখবর নিয়ে এসেছে। না—কোন রকম উপগ্রহ হয়নি কলকাতায়। মানুষ-জন ফিরে আসছে, রাস্তায় লোক চলাচল বেড়েছে। তিনটে বাড়ির মধ্যে একটায় ভাড়াটে জুটে গেছে। কম ভাড়া অবশ্য—তা হলেও জুটেছে তো! হরিহর সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

চণ্ডল-পায়ে সুপ্রিয়া এসে ডাকল, বাবা—ও বাবা—

হরিহর বলেন, আর দেখ বাবাজি, এই এক মৃদু-কিল। পাগলী মা ফেপে উঠেছে, মেলায় যাবে।

সুপ্রিয়া বলে, বৃষ্টি বৃষ্টি করছিল বাবা কি রকম রোদ উঠেছে দেখ।
চারিদিক শুষ্ক নো ঝটখটে।

বিস্তৃতভাবে হরিহর বললেন, কিন্তু গাড়ি-পাল্কি যে ঠিক হয়নি।
যাবি কিসে?

সুপ্রিয়া হেসে বলে, রক্ষে কর। যা এখানকার পাল্কি আর গরুরগাড়ি—গোলাকার হয়ে তো বসতে হয়।

দাসুকে জিজ্ঞাসা করে, ও দাসু, কন্দুর সে যায়গা? বিলপারে ঐ যে বটগাছ দেখা যায়—ঐ তো?

হরিহর মুখ টিপে হেসে দাসুকে স্বাগত করলেন।

মেলায় এসে সুপ্রিয়া মশগুল হয়ে গেল। মাটির পুতুল, রকমারি বাশী, চিত্রবিচিত্র হাঁড়ি সরা আনারস আর ডেয়োফল—কিনেছে তো কিনেছেই। কি কমে লাগবে এই সমস্ত আর কে-ই বা নিয়ে যাবে—

অনুপম বলে, ফেরা থাক—

নাগরদোলা ঘুরছে বন্বন্ব করে, বাজনা বাজছে। বাইশ বছরের মেয়ে ছোট পুতুলটির মতো ছুটল সেদিকে। ভিড় জমেছে, জুতো-পরা সুদ্রী সুবেশ মেয়েটার কাণ্ড দেখে মানুষ-জন তাগজব হয়ে গেছে।

বিরক্ত হয়ে অনুপম বলে, কথা মোটে কানে নিচ্ছ না—কি রকম মেঘ করেছে দেখছ?

ভিজব মশায়, ভিজব। থু-উ-ব মজা লাগে ভিজতে। অবহেলা ভরে খাড় ফিরিয়ে

নিমন্ত্রন

শ্রী মনোজ ব

চাষাদের সঙ্গে কাদামাটি মেখে মাঠে মাঠে বেড়াই।
আকাশ ফাঁটিয়ে গান করি—

শুধু চিঠিতে কবিত্ব করা নয়, মনের ভাবটা তার সত্যি এই রকম। হরিহর রায় সর্বদা টিক্‌টিক্‌ করেন, কিন্তু আদরে মেয়েকে নামলাতে পারেন না। এই যেমন আজ ধরে পড়েছে—বাকাবড়িশ গ্রামে রথের মেলা হয়, খুব নামডাক, তিন দিন ধরে হৈ-হল্লা চলে—সুপ্রিয়া যাবে সেই মেলা দেখতে।

মেয়েছেলে যাবে ছোটলোকের ভিড়ের মধ্যে—ছি-ছি! এ অঞ্চলে ও-সব রেওয়াজ নেই, নিন্দে রটে যাবে। হরিহর কড়া সুরে মানা করলেন। সুপ্রিয়া মুখ ঘুরিয়ে নো-ঠোঁট দুটো চেপে অশ্রু সামলাবার চেষ্টা করে। বা-মমা মেয়ে—মনটা নরম হয়ে গেল হরিহরের। বলেন, বৃষ্টি-বাদলার সময় যে মা, অসুখ করে বসবে—সেইজন্য বলি। নইলে লোক কি বলল, আর না বলল, কি

বটগাছ ছাড়িয়ে আরও এক কোশ হবে দিদিমাগি।

হোকগে। হেঁটে যাব—হুটিতে আমি খুব পারি। উড়ে চলে যাব দেখিস।

শেষ পর্যন্ত হরিহরকে মত দিতে হয়। অনুপমকে বললেন, তুমি এসেছ—রক্ষে পেয়েছি বাবা। তুমিও যাও—দেখে এসেগে। মেলাটা ভাল। মেয়েকে বললেন, বেলাবেলি ফিরনি কিন্তু—

যাব আর আসব বাবা—
বাপকে নিশ্চিত করে দুটিতে রওনা হল। দাসু, টৌর কাটাঁছিল। কিন্তু না—দরকার নেই। কত লোক যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে চিনে যেতে পারবে।

বে-লোকটা নাগর-দোলা চালাচ্ছে তাকে বলে, থামাও—
আমি চড়ব।

এক লাফে একটা খোপে উঠে বসল। অনুপমকেও ডাকে, এসো—এসো না—

অনুপম বলে, পাগল হয়নি তো আমি! বটে! তড়াব্ব করে নেমে সুপ্রিয়া তার হাত ধরে ফেলল। উঠতে হবে—হবেই—

টপ্-টপ্ করে বড় বড় ফোঁটা পড়ল। সেই সঙ্গে বাতাস বড় বাফাগাছটার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছে। বৃষ্টি—বৃষ্টি—মৃদল-ধারে বৃষ্টি। মেলায় জন্য অস্থায়ী চালা বাঁধা হয়েছে। যেখানে দশজনের জায়গা, পঞ্চাশজন মাথা ঢুকিয়েছে সেখানে। রশি-খানেক দূরে চাষীপাড়া, কলাবনের আড়ালে ঘরের চাল দেখা যাচ্ছে। ওরা ছুটল, সৌদিকে।

এক বাড়িতে গিয়ে উঠল। টিনের আট-চাল, দুটো গোলা পাশাপাশি। বাহিরের দিককার দাওয়ায় তারা উঠেছে। মাটির দেয়াল দিয়ে অন্তঃপুরের আলাদা করা। খানিকটা জায়গায় দেয়াল নেই, বর্ষা এসে পড়ায় দেয়াল দেবার অবকাশ হয়নি হয়তো, সেখানটা সুপারিপাতার বেড়া দেওয়া। সম্পন্ন গৃহস্থ—মেয়েদের সুখের অগোচর না হোক, মানুষের চোখের আড়ালে রাখবেই।

কাপড়চোপড় ভিজে জ্বজ্ববে, মাথা দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বাড়ির কত! স্মারিক সদীর গামছা হাতে ছুটেতে ছুটেতে এল। জল-চৌকিটা ঝেড়ে দিয়ে বলে, এসো মা, জলটা আগে মোছ। কি করা যায়! আমাদের ঘরের কাপড় দিই কেমন করে?

সুপ্রিয়া বলে, একটুখানি ভিজছে। ও গায়ে গায়ে শুকিয়ে যাবে।

স্মারিকের তবু সেয়াসিত নেই। শীত করছে, আগুন পোহাবে মা? আনব আগুনের মালমা?

সুপ্রিয়া হেসে তাড়া দেন, আপনি ঘরে যান দাঁক। কিছু লাগবে না আমাদের।

মাঝে মাঝে বৃষ্টিটা একটু কমে, এরা যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়, তখনই আবার চেপে আসে। মেঘাধিকার বিদ্রোহ-চমক টিনের চালে জল পড়ার আওয়াজ — চারদিক তোলপাড় করে তুলেছে।

বেড়ার ভেতলে কার্তিক জল ছপছপ করতে করতে উঠোন পার হয়ে এসে খবর দেয়, রামার যোগাড় হয়ে গেছে। আসুন।

রামা? ভালো যে ভালো—রামা এখন কে করতে যাচ্ছে?

উপোস করে থাকবেন? সে হবে না।

অনুপম বললে, বৃষ্টি থামলেই আমরা চলে যাচ্ছি। তোমারা খাওয়া-দাওয়া করো গে ওদিকে—

হঠাৎ স্মারিক বেরিয়ে আসে। যেন আগের সে মানুষ নয়। হুৎকার দিয়ে ওঠে—নামো দাওয়া থেকে—

অনুপম অস্বস্তি হয়ে বলে, এই বৃষ্টির মধ্যে?

জেলোপালে নিয়ে ঘর কর। ভিটের উপোস করে পড়ে থেকে অকল্যাণ ঘটবে?

যে রকম মেজাজ, মুখে যা বলছে—কাজেও ঠিক তাই করবে। সুপ্রিয়া ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ায়। কার্তিকের দিকে তাকিয়ে বলল, যাচ্ছি ভাই, যাচ্ছি। এক্ষুনি গিয়ে চাপাব।

অনুপম কিন্তু নির্বাক। ইতিমধ্যে মাদারের উপর লম্বা হয়ে শূন্য পড়েছে, আর পা নাচাচ্ছে।

সুপ্রিয়া বলে, ক্ষুধিত যে গায়ে ধরে না!

তোমার রামা জাত খাব আজকে। ভাত বেড়ে, বাজান সাজিয়ে আমায় ভাক দেবে, তার আগে নড়েও বসছি না।

সুপ্রিয়া বিপর্যয় ভাবে বলে, আচ্ছা বলো তো—এ সব কি জানি, না করেছি কোন দিন? রামা ঘরে উকি মেরেও দেখতে দেন না বাবা।

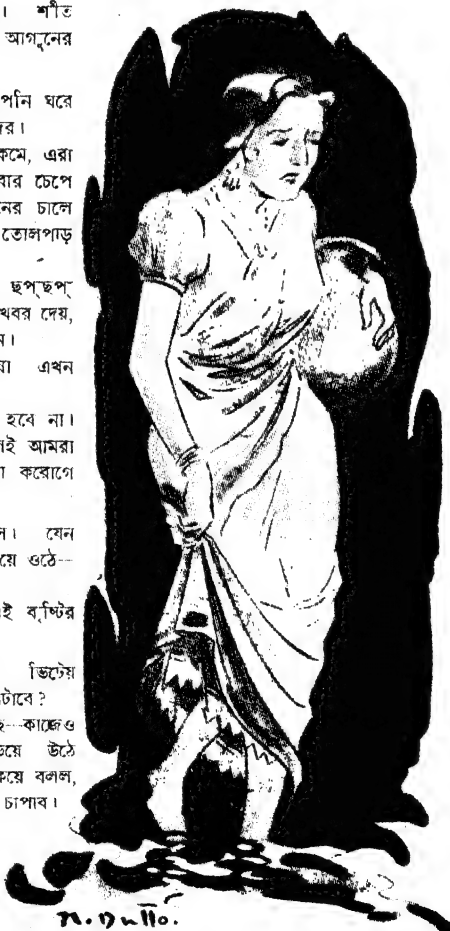
অনুপম বুক ঠুকে বলে, এই আমার কিন্তু সমস্ত জানা। হোস্টেলে যত পিকনিক হোত, রামার ভার আমার উপর—

ওঠো তবে—

বদনাম রটে যাবে যে—বলবে, বউমুখো। আর তোমাকে কি বলবে জানো? গহরশোকা বউ—বরকে দিয়ে রাখাচ্ছে।

পা নাচাতে নাচাতে এবার গুনগুনিয়ে গান ধরল অনুপম।

স্মারিক আবার এল, হাতে লণ্ঠন আর প্রকাণ্ড আয়তনের এক কলসি। বলে, চলো মা, ঘাট দেখিয়ে দিচ্ছি। তালের খেতে—বস্তু পিছল, কলসি নিয়ে সাবধান হয়ে উঠতে হবে।



১৭.৭.১১.

সুপ্রিয়া শীতে হি হি করতে করতে ঘাট থেকে জল নিয়ে এল।

অসহায় ভাবে সুপ্রিয়া বলে, ও-বাবা! অত বড় কলসি টানতে পারব না তো। জলটা কেউ আপনারা তুলে দিন।

স্মারিক বলে, পোড়া কপাল! রাহুগ-সেবার জল আনব, সে কপাল করে এসেছি কি মা? জল-চল জাত হলে তোমায় কষ্ট দিতাম না।

অনুপম উঠে বলে, আমি — আমি এনে দিচ্ছি। অসুখ থেকে উঠেছে কিনা দেখো ভারি দুর্ভল—

সুপ্রিয়া এক ঝাকিতে কাঁখে তুলল কলসি। ঘুরে দুর্দীড়িয়ে অনুপমকে আড়াল করে বলে, আলো তুলে ধরুন কত! দেখা যাচ্ছে না।

উঠান জলে ভর্তি। জুতো খুলে শাড়ির আঁচল দো-ফেরতা কোমরে জড়িয়ে সুপ্রিয়া শীতে হি-হি করতে করতে ঘাট থেকে জল নিয়ে এল।

ভাত চেপেছে, টগবগ করে ফুটছে, সেই সময় অন্ধকারে অনুপম এসে উঠল। বলে, অত বড় অসুখ থেকে উঠলে, পেরে উঠবে না। মাছটা আমি রাখব।

ঘাড় দু'লিয়ে সুপ্রিয়া বলে, পারব — খব পারব গো। কাজে ভুড়ল দিও না বলছি। আগে ছিল অভ্যমান, এখন এই একটা রাতের গৃহিণীপনায় সত্যি সত্যি তার খুব আমোদ লাগছে। খাঁশি উঁচিয়ে কৃত্রিম ক্রোধে স্বাকার দিয়ে ওঠে, যাও বলছি, যাও—

ঘরের ভিতর কার্তিকের বউ যামিনী আর বোন পুষ্টির মধ্যে খুব হাসাহাসি হচ্ছে তখন। যামিনী পুষ্টিকে টানতে টানতে বেড়ার ধারে নিয়ে এসেছে। বলে, শোন দিদি, কি বলছে শোন। বর রাখতে এসে দুর্দীড়িয়েছে—বউটার নাকি বড় অসুখ। তিনটে কুমারি খেয়ে উঠতে পারে না—অসুখে তিনি মরে যাচ্ছেন। হি—হি—হি—

মরু পোড়ারমুখী, হেসেই খুন হল। চম্বল বউটার গাল টিপে দিয়ে পুষ্টি নিজের কাজে গেল।

সেই বেড়ার ধার থেকে যামিনী নড়ল না, দুর্দীড়িয়ে দুর্দীড়িয়ে দেখছে সুপ্রিয়ার কাণ্ড-কারখানা। আবার ননদের কাছে ছুটে গিয়ে হেসে লুটোপুটি। বলে, ধিগি মাগী রামা করছে দেখে যাও। জুতো পরে গটমট করে বেড়ায়—ইদিকে বেড়ি ধরতেও জানে না। মুখে আঁচল দিয়ে সে হাসে। হাসির বেগ ঠেকাতে পারে না।

চূপ কর—শুনলে কি মনে করবে, চূপ চূপ। বলতে বলতে পুষ্টিও হেসে ফেলে। সেও কিছু কিছু দেখেছে। তারপর বউকে যুঁহি দেয়, দুর্দীড়িয়ে জ্বালিয়ে ফেলছে—আহা, মুখে দেবে কি করে! ওখানে গিয়ে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিগে যা—

যামিনী জিজ্ঞাসা করে, যাব দিদি? দোষ হবে না?

পূরুষমানুষ তো কেউ নেই ওদিকে—
যাই তাহলে? যামিনী ছুটল।
পুটি সামাল করে দেয়। চালের নিচে
দান্নে কিন্তু—খবরদার! ভাত মরে যাবে।
গোলগাল কালো বউটা ঝুম্‌ঝুম্‌ পালং-
গাতা মল বাজিয়ে রামার জায়গার খানিকটা

বেশ লাগে বউটিকে। কথায় কথায়
হাসে, আর ভল্লিটি এমন—যেন কত বড় গিয়া!
সুপ্রিয়া দেবী—বড় বড় দুটো সমিতির
সেক্রেটারি আর একটার ভাইস প্রেসিডেন্ট—
চায়াবউ তাকে একদম অপদার্থ আনাড়ি ভেবে
বসেছে।

থোঁতে বসেছে অনুপম। থেতে থেতে
বলে, তুমিও বসে যাও সুপ্রিয়া। সেই কখন
থয়েছ। সন্ধ্যায় চা-টা হয়নি—

সুপ্রিয়া হাসিমুখে বেড়ার ওধারে শুনিয়ে
শুনিয়ে বলে, ওমা কি ছেয়া! মেয়েমানুষ
পূরুষের সামনে বসে থাকে—কি যে বলে
হুঁম!

অনুপমের সামনে মাটির উপর সে চেপে
বসল। বলে, ডালটুকু ঢালো
বলছি। ফেলতে পারবে না, মাথা
বাঙ। বলে ফিক করে হেসে
ফেলল।

অনুপম চোখ তুলে
বলে, নূন পুড়ে
যবক্ষার হয়ে গেছে,
গলায় উঠছে না।
জল ঢেলে নাও,
পাসে জল রয়েছে।

তারপর মাছের ঝোলের বাটি থেকে এক
হাতা কেটে দেয়। জিজ্ঞাসা করে, এটা?
পানসা। মোটেই নূন দাওনি।

নূন মেখে নাও। গাভে দিয়ে দিইছি।
একটা হাতপাখা ছিল ওদিকে, কুড়িয়ে এনে
সুপ্রিয়া জোরে জোরে বাতাস করে।

কি করো—আহা করো কি? এই ঠান্ডা,
জমে গেলাম যে!

পতিসেবা করছিলাম—কেড়ে নিলে তো?
নাঃ, কিছুর করতে দেবে না—মরে গেলে
আমায় নরকে নিয়ে ঠাসবে।

অনেকগুলো মানুষ উঠানে। দুনো ভাড়া
কবল করে হিরহর পাঙ্কি পাঠিয়ে দিয়েছেন
—মেয়ে জামাই দু'জনারই। সপ্তে আলা নিয়ে
দাসু এসেছে। খোঁজ করতে করতে তারা
এখানকার খবর পেয়েছে।

সুপ্রিয়ার খাওয়ানো দেখে দাসু অবাক হয়ে
গেছে। বাঃ বে, দিদিমানি রান্না করেছে, সামনে
বসে আওয়া করেছে কেমন।

অনুপম বলে, আর বেঁধেছেও একেবারে
অমৃত। ওরটা এখনো আছে, চেখে দেখবি নাকি
দাসু?

দূরে এসে দাঁড়ায়। চুপচাপ দেখে, আর
মুখ টিপে টিপে হাসে। তারপর বলে উঠল,
কি করছেন? মাছ পুড়ে কয়লা হয়ে গেল
যে, গন্ধ বেরুচ্ছে। জল ঢালুন শিগগির—
সম্প্রস্তু হয়ে সুপ্রিয়া হুড়হুড় করে গেল
ঢেলে দিল।

ঘটিশব্দ ঢাললেন? নাঃ—রান্নার কিছুর
জানেন না। মুখে বলে বা কি করব, হাত ধরে
দেখিয়ে দিলেও আপনার হবে না।

সুপ্রিয়া হেসে বলে, তা দেখিয়ে দিয়ে যাও
না ভাই হাতটা ধরে—

বাণি নিশ্চয় বাণি। কুই তোর বর তোর শ্বশুর—তোদের বাড়ি পুন্স দাল কলকাতায়



পালঙ্কতে উঠিবার সময় স্মারিক আর কাতিক এসে পাঁড়াল। স্মারিক বলে, গৃহক চাডালের ঘরে রামচন্দ্র এসেছিলেন মা, আমাদের হল সেই বিস্তারিত। আমিও একদিন যাব তোমাদের গিয়ে, রায়-কর্তার চরণধূলো নিয়ে আসব।

সুপ্রিয়া বলে, আমরা কলকাতায় ফিরছি। অনুপমের দিকে কটাক্ষ করে বলে, খব শিগগিরই—ভদ্রদত্ত এসে উপস্থিত।.....তা চলো না কেন কলকাতায়। যাবে :

স্মারিকের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে কলকাতার নামে। আজব শহর। কল টিপলে আলো জ্বলবে, কল ঘোরালে জল পড়ে। অমাবস্যার রাতও অশঙ্কার নেই, জ্যার ক্ষতির জায়গা।

এক খড়ের কাশাধিক সঙ্গে স্মারিক সর্দার কলকাতায় গিয়ে ছিল তিন দিন। আজ তিন বছরেও তার গল্প শেষ হল না। ছেলের নতুন বিয়ে দিয়েছে, রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর

তামাক সেজে নিয়ে মাদুর বিছিয়ে শোয়, চোত-বোশেখ অনেক দিন চলে গেছে। যামিনী-বউ শব্দরের পায়ে তেল মালিশ করে ক্ষেতের ধান বাড়ি এসেছে, কিন্তু গোলায় দেয়। বড়ো ভুড়ক-ভুড়ক - তামাক টানে ওঠেনি। ধানের পালায় পালায় উঠানে পা সেই সময়টা, আর কলকাতার গল্প করে। ফেলা যেত না—এত ধান গেল কোথায় ?

অনুপমও বলল, নৈমন্ত্যর করে যাচ্ছি। যেও কিন্তু, সর্দার। আমাদের বাড়িতে থাকবে, রাখলে বিপদে পড়বে সর্দার। আর দরটাও এমন হাংগামা নেই। ভাল করে দেখিয়ে শুনিয়ে দেব।

স্মারিক উল্লসিত হয়ে বলে, লোকে ভয় দেখাতে লাগল, ধান বেশি এনে এনে রাখত, নোট নোটে স্ত্র-পাকার হয়ে উঠল। আউশ, উঠবার মুখে দর নামবে—টাকার কাঁড়ি রইল, ডাবনা কি ? সেই সময় ধান কেনা যাবে যার যেমন খুশি।

সেই নোটের বোঝা শূকনো পাতার মতো যেন বাতাসে উড়ে গেল। এক জোড়া কাপড় কিনবে তো গুণে দাও এক গাদা নোট। নুন কিনবে, কেয়োসিন কিনবে—দাও এক এক মুঠো। আর এমন হয়েছে, আজকে নোটের পাহাড় ঢেলে দিলেও সমস্ত অণ্ডলে এক খঁচি ধান কেউ দেবে না। ধান-চাল ভৌলিকতে উড়ে গেছে।

হরির রায় শব্দ নন, যত সজ্জনের। এসেছিলেন কেউ আর নেই। ইস্কুল করবেন, নতুন রাস্তা টিউবওয়েল বসাবেন, সোনার গ্রাম গড়ে তুলবেন—সে সব সাধু সঙ্কল্প মূলতুই রইল। জল-জংল সাপের ভয় ম্যালেরিয়া তার উপর জিনিষপত্র কিছু পাওয়া যায় না—এর চেয়ে বোমার ঘা খেয়ে মরায় আরাম অনেক বেশি। শহরে মানুষেরা পাগল হয়ে শহরে পালাচ্ছে।

পালাচ্ছে গ্রামের মানুষরাও। পেটের ক্ষিধের ছিটকে পড়ছে। বেচিকা বেধে কাঁধে নিয়েছে শীতল; পিছনে শীতলের মা বোন বড়ছেলোটা আর কোলের মেয়ে। উনুন ভেঙে দিল; আর কেউ এসে না রাখে—অলক্ষণ। ছেলোটা যেতে যেতে বলে, দাঁড়া পিসি, দোর-ঘড়িটা রয়েছে মাচার উপর; নিয়ে আসি। পিসি বলে, তাইতো—মাচা ভরতি আমার মশালের গান। পাটকাঠিতে গোবর দিয়ে সমস্ত মাছমাস সে মশাল বানিয়েছে, বর্ষাকালে পোড়াবে বলে।

ফুটপাথের উপর মেয়েপুত্র নানান বরলী, বেহায়া—বেআশ্রয়.....

অত করে বলেন কেন ? যাব, ঠিক যাব। শহর তো নয়, সগগোখাম। ক্ষেতের ধান গোলায় তুলে দিয়ে চোত-বোশেখের ওদিক গিয়ে উঠব।

সুপ্রিয়া-পাতার বেড়ার আড়ালে যামিনী। মল আর কাচের চুড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সুপ্রিয়া তার কাছে গেল। আলগোছে প্রণাম করে যামিনী বলে, কথাবাতা শুনোছি। আমিও কিন্তু যাব, দিদি—

যাবি, নিশ্চয় যাবি। তুই তোর বর তোর শব্দর—তোদের বাড়িসুখ হাস কলকাতায়—

এবার আর শুনল না সুপ্রিয়া। বউটিকে জড়িয়ে ধরে আদর করে তে পালঙ্কতে উঠল।

মুসলমান পাড়ায় শোন গলা-ফাটিয়ে কাঁদছে আতর বিবি, ধুলোয় আছাড়-পিছাড় যাচ্ছে। ওদের যে আমি এক কুড়ি বছর চোখে চোখে চোঁকি দিচ্ছি—কার কাছে রেখে যাব আজকে ? বছর কুড়ির আগে আতর বিবির একটা চুল পাকেনি, দেহে কুণ্ডলরেখা পড়েনি—তিন দিনের আগ-পাছ তার বর ও ছেলোটা মরে যায়। উঠানের ধারে ভেঁতুলঝালার তাদের কবর। বাড়ি বাড়ি ধান ভেনে অনেক দুঃখে এতদিন ভিটের ছিল—শব্দু ভিটের মাটি চিবিয়ে থাকবে আর কেমন করে ?

গ্রাম খা-খা করে। বন্যা এসে যেন মানুষ-জন ঘর-গৃহস্থালী ভাসিয়ে ভেঙে দিয়ে গেল।

সহর অবধি খাওয়া করল বন্য। বন্যার জলে মড়া ভেসে এসেছে—জীবন্ত মড়ার দল দেখতে দেখতে সহরের রাস্তা গলি পার্ক ভরতি করে ফেলল।

শহরের যত আলো চুটিতে মুখ ঢেকেছে। ভাগে ব্রাক-আউট—তাই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ উলঙ্গ গৃহস্থালী নজরের আড়ালে থাকে। হীরহর রাসের চিরকালের অভ্যাস, ভোর থাকতে উঠে গঙ্গা স্নানে যাওয়া। ইদানীং তা বন্ধ হয়ে গেছে। পায়ে পায়ে মানুষ বাধে, হেঁচটি খেয়ে পড়ে যেতে হয়, পদপিষ্টে যুগ্মত মানুষ হাউমাউ কুরে চোঁচিয়ে ওঠে—হাবেন কি করে? ঘর থেকে তিনি বেরোনই না। চরিত্র বছরের চেনা কলকাতা আজকে যেন এক নতুন ভয়ানক জায়গা। ফুটপাথের উপর মেয়ে-পুরুষ—নানান বয়সী, বেহায়া, বেআবরু। অবেশ-শিশু কেঁদে কেঁদে গলা ফাটিছে—কোথায় দুধ? মা গিয়ে রাস্তার কলে আজলা আজলা জল খাওয়ায়।

সকালে ঘুম ভেঙে শহরের কর্মবাস্ততা ভাগে। রাস্তা গলি ঝোঁটিয়ে সাফ-সাফাই হচ্ছে, করপোরেশনের ময়লা-গাড়ি ছুটেছে, ছুটেবেড়াচ্ছে এ. আর. পি. আর সিভিক গার্ডের দল—এই একটা মড়া, ঐ যে ওখানে একটা, ঐ.....ঐ.....ঐ.....

হঠ, যাও—এই, আরে ওঠ, না হারামজাদী—পালা—পালা—।

ভাঙা টিনের মগ কি মাটির মালসা হাতে কেউ ছুটল লগ্নরখানায়, কেউ বা গৃহস্থ-পাড়ায়, কেউ বা গিয়ে দাঁড়াল ট্রাম-বাস যে জায়গায় গিয়ে থামে সেখানে। পগচারীর পা জড়িয়ে ধরছে, গরুর সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে আস্তাকুড় হাতড়াচ্ছে, ভাড়া খেয়ে খেয়ে এবাড়ি-ওবাড়ির দরজায় দরজায় খুঁদছে।

কামাঙ্জিত কণ্ঠে সুপ্রিয়া অনুপমকে বলে, চলো—পালিয়ে যাই। আমি বাঁচব না এখানে থেকে—

নিচে সদর-দরজার দিক থেকে একটানা আত্ননাদ—মা, মাগো, ওমা—

অনুপম সাম্ভ্রনা দেয়, ভয় কিসের? মা বলছে—মা' ডাকের চেয়ে ভাল আছে কিছ? কেমন এক ভয়ানক বিপর্যস্ত মূর্তি হয়েচে সুপ্রিয়ার। অনুপম নাইরে এসে রৌলিং শব্দে নিচে তাকায়। অন্ধকারে অবশ্যই শহর পরিভ্রম শব্দশানভূমির মতো লাগছে।

তারপর অনেকক্ষণ তাকিয়ে আবছা। আবছা দেখতে পাচ্ছে, একটা-দুটা নয়—অনেকগুলো, যেন প্রেতের মেলা বসেছে। বিনিয়ে বিনিয়ে ডাকছে, মা—মাগো, ফ্যান দাও, একটখানি ফ্যান। ভাত চাইতে ভরসা কুণোয়া না, ভাত কে দেবে এমন দিনে?—অবিরাম চোঁচাচ্ছে, ফ্যান-ফ্যান-ফ্যান

পুরুষমানুষ অনুপম—তারও বৃকের ভিতরে গদ্য-গদ্য করে ওঠে। সে বিকার করে ওঠে, শুনতে পাস না এই দাস? এই—এই—

দাসদের ভাত ইতিপূর্বে এমন একটা দলকে দিয়ে আবার রান্না করতে হয়েছে। খেয়ে দেয়ে এই সব একটখানি চোখ বুঁজেছে—

ফ্যান—ফ্যান দাও—

সুপ্রিয়া অধীর ব্যাকুল কণ্ঠে বলছে ওরে দাস! বিদেয় করে দে ওদের—

দিচ্ছি, দাঁড়া—

ঘুম চোখে দাস! রান্নাঘরে ছুটল।

বাবা রে, মেরে ফেলেছে রে! গরম ফ্যান উপর থেকে হাঁড়িসুঁধ ঢেলে দিয়েছে মালসার ভিতর নয়, ওদেরই কারও মাথায়। কামার চোঁচামোঁচতে বড়প্রলয় বাধল। রাসের মাথায় কাণ্ডটা করে দাস! বেফুঁব হয়ে গেছে। দ্রুত সে নিচে নামে। টা' জেদুলে অনুপমও ছুটল, পিছনে সুপ্রিয়া। কমবয়সী একটা বউ পোড়ার

স্বাস্থ্যোচ্ছল হাসিখুশি বউটির কথা—যামিনীর কথা। গ্রাম থেকে নিমন্ত্রণ করে এসেছিল, এসেছে নাকি 'বহাদুর' আর সেই নতুন বউটি শহরে—আছে কোথাও কোন এক দলের সঙ্গে? বিপাকে পড়ে তিনটি মাস গ্রামে গিয়েছিল। গ্রামে ভালবেসেছিল, সেই ছবি সুপ্রিয়ার মনে ভাসে—বাগলা দেশের সর্ব-কালের চেহারা। উঠানে শোয়ালাগা, একটা বাছুর শূয়ে পড়ে আপন মনে পোয়াল চিবোচ্ছে.....নারিকেল গাছের ফাঁকে দূর-প্রসারিত সবুজ বিল.....পুকুর একটা—টোকা-শেওলা আর কলমিলতায় ভরা, লাউয়ের মাচা চলে গেছে অনেকখানি জল অবধি.....কলাগাছ ও বনকচুর উপর দিয়ে ঝিল্পেগাছ লতিয়ে চলেছে, হলদে হলদে ফিকে ফিকে.....ঘুঘু ডাকছে এদিক-সেদিক, ডাকছে মাছরাঙা ফিল্ডপাখী.....পুকুরে মাছের আমলাল, খোমটোদেওয়া বউরা ঘাটে এসে বাসন মাজছে। নিরুপস্থান ঘর-গৃহস্থালী, সুপ্রিয়-পাতার বেড়ায় খেরা পরিপাটি অস্তঃপুরু।



জ্বালায় ছটছট করছে, গলা-কেটে দেওয়া পাখীর মতো। রাস্তার উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে।

আর যারা চোঁচাচ্ছিল, এদের দেখে চক্ষের পলকে সরে পড়ে।

হয়তো আরও গরম ফ্যান নিয়ে এসেছে, কিন্তু নতুনতর কোন অস্ত।

অস্থিহাসার অশক্ত এক বৃদ্ধা কেবল নড়ে না, 'হায়' 'হায়' করছে আর মাথায় ঘা দিচ্ছে। সুপ্রিয়ার দিকে কি রকম চাইছে! মেরেমানুষ দেখে বোধ করি সহানুভূতির প্রত্যায়ন জোড়-হাতে টলতে টলতে তার দিকে এগুতে লাগল। সুপ্রিয়া ক্ষিপ্তের মতো অনুপমের হাত ধরে টান দেয়, এসো, চল এসো। দুয়োরে খিল এটে দিল।

নিশ্চয়.....ভিখারীর দল পালিয়েছে। শূয়ে শূয়ে সুপ্রিয়ার মনে পড়েছে, নিতৌল জায়গা নেই।

কমবয়সী একটা বউ পোড়ার জ্বালায় ছটফট করছে।

আবার যদি যায় কোনদিন, দেখতে পারে সেই বাঁকাবড়ী-মাদারভাঙা? সকালে খবরের কাগজে থাকে যুদ্ধের খবর—মোমার আগুন হাচোচ্ছল কত জনপদ নিশিচয়। হয়ে যাচ্ছে। খবরের কাগজে বাঁকাবড়ী-মাদারভাঙার কথা কেউ লেখে না। এসব বাজে খবর, কাগজে জায়গা নেই।



নও জোয়ার

কথা

একি—জরার জোয়ার এল জীবনে!
দুঃখ অঙ্গের তটে
খরস্রোতে উন্মল
তীরতরু থর থর পবনে।

চোখে চোখে ছলোছল
নিস্তল কালো জল
ফেনায়ে উছাল উঠে
শূন্য চপল কেশগুচ্ছে।
জমাতে সাঁঝের পাড়ি
স্বক-তরঙ্গ পড়ি'
জীর্ণ প্রেমের তরী ডুবছে।
হাল ছেড়ে ভরা গাঙে
ঝাঁপ দিল যৌবন
অতলে তলায়ে গেল
সেই তনু অতুলন,
লবণের বন্যায়
ভাসল লাবণ্য,
গাঁহন ভাঙন-মুখে
ভাঙা রূপগঞ্জ
নিশ্চিহ্ন যে আসন্ন।

ফাটা পাড়ে ধরে টান
গাঙ-পাখী ছাড়ে খোপ,
কুপ-ঝাপ ভেঙে পড়ে
ফাইঝাড় বেনাঝোপ,
ভাঙা ডাল ছেঁড়া ফুল
ভেসে যাওয়া স্বত জুল
কোথায় ফিরছে আজ কে জানে,
চোখের সমুদ্র লিয়ে উজানে!
তপন ডুবছে বায়ে
আবছা গেরুয়া গায়ে,
ডাইনে উঠছে অমাবস্যা,

তেজ কোটালের মূখে
দুঃখারে পড়েছে বৃকে
চৈতি ধরণী নিঃশস্যা।
ক্লে ক্লে উঠে ফুলে
দুঃসহ এ জোয়ার,
পর্যায় ধরিতে নারে
তন্দ্রারণের ভার,—সাথী গো!
কল্লোলে ভরে কান,
কণ্ঠে কাঁদছে গান,
চিতার আলোকে আঁখি
রাঙায় অন্ধকার রাত গো!

উজান জোয়ারি হাওয়া,
হে রম বিহঙ্গমী,
সাথ্য ত নাই আর
দুঃজনে অতিক্রমি;
ওগো যৌবন সখি,
বুঝেছ কি, বুঝিছ কি?—
দিবসের শূকশারী—
রজনীর চখাচখী?
আসিছে বাঁশীর ডাক—
জীবন উজানি' যাক,
যৌবনী অপরাধ
তুমি ক'ম' আমি ক'ম,
অবশাম্ভাবীরে
তুমি নম' আমি নিম।

হে রম বিহঙ্গমী,
এই নও-জোয়ারে
এমনই বা কোন্ ক্ষতি?
ভেঙে চূরে ধূয়ে যদি
অকলে একল যায় থোরা রে!

পুরাণে দিনের জন্য অশ্রু
নতুন দিনের জন্য অভিসম্পাত।
হিংস্র দাঁত,
লুপ্ত হাত,
হে অক্লান্ত করাত!
(হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে
পুরুষেরা বলে,
তোমায় প্রণিপাত!
মেয়েদের সহিষ্ণু হাতে
রক্ত শিশুর নৈবেদ্য নিলেন বিধাতা।
পুণ্য সপ্তয়ের সুযোগ পেলেন দাতা।
গ্রামে মড়ক, নদীতে বন্যা,
ক্ষুধার যজ্ঞানিতে
অন্নগ্রহ নিলেন
ভিটে, মাটি, তৈজস এবং কন্যা।
নির্লিপ্ত রাজপথ
এক শূন্যতা থেকে
অন্য শূন্যতার দিকে হাত বাড়ায়।
পথের শেষ কোথায়?
নতুন কিশলয়ের মতো যৌবন,
দূর বনগন্ধের মতো প্রেম,
নিভৃত হৃদয়ের মতো দাম্পত্য!
—তোমাদের হরিশবর্ণ আস্তরণে
পৃথিবীর কণ্টোৎকৃষ্ট বা ঢাকে?
শব্দ লাখে লাখে
যুবক-যুবতীর শোভাযাত্রা নিশ্চিহ্ন হয়।
তারপর
এক ফানুসের জয়,
অন্য ফানুসের পরাজয়।
দূর বনগন্ধের মতো প্রেম,
নিভৃত হৃদয়ের মতো দাম্পত্য!
নতুন কিশলয়ের মতো যৌবন!
সমস্ত ভূমিকা মুছে
কে আছে?
চিরঞ্জীব কথারা বাঁচে।

• ন্যায়িক কোলাস •

এখন সে কত রাত;
এখন অনেক লোক দেশ-মহাদেশে সব নগরীর গুজরগ হতে
ঘুমের ভিতরে গিয়ে ছুটি চায়।

পরস্পরের পাশে নগরীর ঘ্রাণের মতন
নগরী ছড়িয়ে আছে।
কোনো ঘুম নিঃসাড় মৃত্যুর নামান্তর।
অনেকেরই ঘুম
জেগে থাকে।

নগরীর রাত্রি কোনো হৃদয়ের প্রেমসীর মত হতে গিয়ে
নটীরও মতন তবু নয়;
প্রেম নেই—প্রেমবাসনেরও দিন শেষ হয়ে গেছে;
একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের
আকাশে উঠেছে;
উঠে ভেঙে গেছে।

কোথাও মহান কিছু নেই আর তারপর।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের প্রয়াস রয়ে গেছে;
তুচ্ছ নদী-সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে
রয়ে গেছে মাইন, ম্যানুয়ালিক মাইন, অনন্ত কন্ডুয়;
মানবকন্ডের রক্ত সীকো;
এর চেয়ে মহীয়ান আজ কিছু নেই জেনে নিয়ে
আমাদের প্রাণে উত্তরণ আসে নাকো।

সূর্য অনেক দিন জ্বলে গেছে মিশরের মত নীলমায়।
নক্ষত্র অনেক দিন জেগে গেছে চীন, কুবুখের আকাশে।
তারপর ঢের যুগ কেটে গেলে পর
পরস্পরের কাছে মানুষ সফল হতে গিয়ে এক অস্পষ্ট রাত্রির
অন্তর্ধানী যাত্রীদের মত
জীবনের মানে বার করে তবু জীবনের নিকটে ব্যাহত
হয়ে আরো চেতনার ব্যথায় চলেছে।

মাঝে মাঝে থেমে চেয়ে দেখে
মাটির উপর থেকে মানুষের আকাশে প্রয়াণ
হ'ল তাই মানুষের ইতিহাসবিবরণ হৃদয়
নগরে নগরে গ্রামে নিঃপ্রদীপ হয়।

হেমন্তের রাতের আকাশে আজ কোনো তারা নেই।
নগরীর—পৃথিবীর মানুষের চোখ থেকে ঘুম
তবুও কেবল ভেঙে যায়
সংশ্লিষ্টতার অনন্ত নক্ষত্রে।
পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ;
পূর্ব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা;
আফ্রিকার দেবতাবা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা;
ইস্রাফীর লেন-দেন ডলারে প্রত্যয়;
এই সব মৃত হাত তপে
নব নব ইতিহাস-উন্মেষের না কি?—
ভেবে কারু রক্ত স্থির প্রীতি নেই—নেই—
অগণন তাপসীসাধারণ প্রাচী অবাচীর উদীচীর মতন একাকী
আজ নেই—কোথাও দিগম্বা নেই—জেনে
তবু রাত্রিকরোজ্জ্বল সমুদ্রের পাখি।

—প্রীতীবননন্দ বাসু।

• ভবিষ্যিকাল •

মেঘ ভেঙে পড়ে। বলমলে সূর্য ওঠে জ্বলে
প্রাণের আকাশে;
কালের যে রথচক্র অশান্ত ঘর্ষণে তার
শ্মলিগ্ন বাতাসে—
অগ্নি জ্বলে আবর্জনারূপে; লোভ, নীচতার
অতরালে যে দূর্বৃত্ত ছিল ছন্দবেশে—
বাহিরে এসেছে অবশেষে।
সহস্র প্রাণের দীপ্ত সহস্র সংগ্রামে
সহরে ও গ্রামে
মাড়া আনে স্তম্ভিতহীন একাবশ্য সহস্রের প্রাণে;
শ্মলিত যে বুদ্ধিজীবী
আপন সংস্কারে আত্মহারা—
বন্ধ দীর্ঘ করে তার ক্ষমাহীন দীপ্তির কৃপাণে।

চারিদারে পোড়ামাটি তবু জ্বলি যে ছোঁয়াবে নব স্পর্শমণি
তার সাথে আছে পরিচয়—
দুঃখদৈন্যে দৃষ্টিক্ষেপে তাই দিন গণি
গাই সেই জীবনের জয়।

মৃত্তিকায় রক্ত ঢালি। আরো রক্ত প্রতিপ্রত
মৃত্তিকার লাগি;
সম্মুখে দিগন্তরেখা স্থির; যদিও পথের
অন্ধকারে আজো ফণা রয়েছে উদাত।
প্রতিক্রিয়া পিণ্ড দেশ-দেশে। নব-নব রূপে
সে রিগানী
বিম্বরূপে তবুও ছড়ায়—
(মৃত্যুজয়ী সৈনিকেরা থেকে হুসিয়ার!)
বহু ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী সওদাগর বিমর্ষ কেরানী
রাত্রিদিন সে-পাক জড়ায়।

অসমান্ত আজো পরিচয়। আকাশে এখনো কিছু মেঘ;
এখনো বাতাস
যেন কার নিরালম্ব বৈরাগ্য নিম্বাস—
পুরুষনে ফোর্টেন ডো ফুল, পাখীর কুজন
আজো নিরুচ্চার; হস্তো বা গেছে সব উড়ে
বহু দূরে
যেখানে আকাশ ঘেরা নয় আর বাত্পপূর্ণ মেঘে,
যেখানে মৃত্তিকা
শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাকা;
যেখানে প্রাণের স্রোত বয় এক উদ্গম আবেগে।

এখানে আমার মন কিংবদন্তের রক্তমা-লাঞ্ছিত।
আজো তো তাদের একজন
ছিল যারা অভাজন, যাদের চেতনা
মর্ম্মলে এনেছে প্রেরণা
বন্যাবেগ সংগ্রামের, সংগ্রামজয়ের।
বিচলিত বুদ্ধিজীবী অক্ষম ভ্রূকৃটি তুলে ধরে,
অশ্রুত হতাশা তার স্বরে—
কেবলি কাঙাল সুরে আপনার শৈবরাচার সমর্থন করে।

সব কথা সব চণ্ডালতা
কিন্তু ক্রমে চূপ হয়ে আসে;
ক্ষিপ্তবেগে তন্দ্রাহীন চল সঙ্গী সহস্রের সাথে
যেখানে রাতের শেষে
সূর্য জ্বলে সমুদ্রজল নতুন আকাশে॥

—কিরণবন্ধুর লেনদেপ্তার।

২২শে শ্রাবণ

২৫শে বৈশাখ ছিল
মুখারিত আনন্দ উৎসবে;
উৎসবের নব শংখধ্বনি
দিক্ হতে দিগন্তরে,
ধ্বনি হতে প্রতিধ্বনি বোপে
জীর্ণ ক্রান্তি বিনারিয়া
জীবনের মহানন্দ স্রোতে
এনে দিত তরণ ভাঙ্গিয়া।
প্রভাতের আলো এসে দিত ডাক্
—এল আজ ২৫শে বৈশাখ।
বর্ষ-প্রবেশের ধ্বরে
সম্মুখে হানিয়া করাঘাত
দিনান্তের বিষয়তা, সুদীর্ঘ রাত্রির অবসাদ
মুহুর্তে নিঃশেষ করি'
বার বার এসেছে বৈশাখ
সম্মানিত ২৫শে বৈশাখ।

জীবনের অভিযেদে
নির্ধরের স্বপ্ন ভগ্ন দিনে
উৎসারিত আলোর প্লাবনে
উচ্ছলিত ২৫শে বৈশাখ।
শরণীরে উচ্চকিয়া
সংগারিয়া জীবন-হিম্মত,
বার বার দেখা দিল
প্রতীক্ষিত ২৫শে বৈশাখ,
জ্যোতির কনক পদ্মাসনে
ধ্যানমগ্ন দেখিনু কবিরে;
বহিঃ-বীণা ঝংকারিল তাঁর
জীবনের প্রথম প্রত্যয়ে—
সে বীণা নীরব হ'ল
মুচ্ছনার উদ্দাম আবেগে

মন্দভাগ্য ২২শে শ্রাবণে॥
এই দিনে, ২২শে শ্রাবণে
আজি সে উৎসব নহে
যে উৎসবে জীবনের গান
আপন নির্মলক ভোদা উদার আকাশে
মুক্ত বিহংগম সম ডানা মেলি বিপুল উল্লাসে
ছুটে চলে বাধা-বন্ধ-হারা;
আপনার অন্তর-আবেগে
আপনি সে দুর্দম নির্ভয়,—
আজি সে উৎসব নহে
আলোর প্রসাদ লভিবারে
এ মোদের তপস্যার দিন,
উৎকণ্ঠা-অতিষ্ঠ প্রাণ
সমুৎসুক আলোর ভিখারী
আজি তার তীর্থ-পরিভ্রম।
অতীতের উদয়-শিখরে
তমিস্র রাত্রির পরে
উষার অক্ষট বাণীটরে
যে রাবি ফুটাল ধীরে ধীরে
দলে দলে আলোর কমলে;
প্রভাতের প্রথম ক্রসুমে
আঁকি দিল অনুরাগে
প্রণয়ের প্রথম চুম্বন—
সে রাবি ডুবিল ধীরে
অস্ত-গিরি যবনিকা পারে;
পশ্চাতে রাখিয়া গেল তার
আনন্দ-রাপিণী বাণী
সমুদরের শাম্বতী প্রতিমা,
বহিঃ-বীণা ঝংকারের
ঝঙ্কারুধ ভৈরবী রাগিণী
রেখে গেল আকাশে বাতাসে।

তাই মনে মনে ভাবি'
বিগড়-বৈভব নহে হতভাগ্য ২২শে শ্রাবণ,
সর্বরিক্ত নহে এ দুর্দিন—
জ্বালার তরণ আছে—
আছে ছন্দে রুপের আহ্বান
“শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ”—
আর আছে—কাল-বৈশাখীর আশীর্বাদ।
অন্তরের যত বাধা
ক্ষয়-ক্ষতি শোকের আক্রোশ
যতই দুঃসহ হোক্ আজি,
আরতির দীপশিখা
হোক্ না যতই অনুজ্জ্বল,
দিগন্ত-অবৃত মেঘে মেঘে
সন্ধ্যা-অনুগামী রবি
একদিন নবীন প্রভাতে
এনেছিল যে অনল-শিখা,
বৈশাখের হোমানলে
প্রজ্বলিত যজ্ঞশালাতলে
যে তপস্যা সূর্য হ'ল
দুঃসহ ব্যথার মন্ত্রবলে;
দুঃখের সমিধ লভি'
যে অনল সহস্র শিখায়
একবার উঠিল জ্বলিয়া,
ঝঞ্ঝার ভুকুটি-ভাঙ করি অবহেলা
মেঘশ্যাম শ্রাবণের দূরন্ত বর্ষণে তুচ্ছ করি'
সে তপস্যা উদাত বাহুতে
মৃত্যুর উৎসব মাঝে
এনে দিবে প্রসন্ন প্রভাত,
রবিহীন জগতের
মেঘচ্ছন্ন ২২শে শ্রাবণে।

শ্রীলাবণীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সজ্ঞান

তুণ্যকুরে পরিবৃত্ত
জায়া-ঘেরা পথের দুধার—
পারে নি কিনারা দিতে;
জীবনের অজস্র বিস্তার
ঠেলে দেয় ক্রমাগত—
সমুদ্রের দিকে;
দিগন্তের সোণা রঙ হয় হোক ফিকে—
রাত্রিশেষে আছে জানি—
নব সুরোদয়—
পারে ফিরে লুপ্ত গতি স্তিমিত সময়।

আপাতত এই পথ
প্রান্তর-বিলীন:
মনে হয় কত দীর্ঘ
ক্রান্তিকর সীমানা-বিহীন।
থমথমে কালো রাত্রি আকাশের গায়ে—
রেখেছে সযত্নে বৃষ্টি কফিন বিছারে।

নীচে তার ভারী বায়ু—
বারদের গম্ধে ভরপুর—
নিবিশেষে গেছে মুছে
সমুদ্র সুদূর;
দূর থেকে বাজে শব্দ মৃত্যুর নৃপদুর।
মনে হয় মৃত্যু-নীল বিজগীষু জীবনের সূর।

অম্বকার মন-স্তম্ভে
কাঁপে তবু স্তিমিত প্রদীপ;
দীর্ঘপথ যেন সরীসৃপ
এঁকে বোঁকে চলে গেছে
কত স্তম্ভ প্রান্তর ছাড়িয়ে—
যেখানে আলোকে আছে দুবাহু বাড়িয়ে—
জীবনের ছন্দ সমুদ্র—
সেই মৃত্যু-তীর্ণ দেশ আর কতদূর?

গোপাল ভৌমিক

একটুকু

সম্পাদক দাস

বদন সম্পাদকের প্রতি—

কেন কালো
বল
শিখে
জানি
নব
হ'ল
ফের
ফাঁকা
ডাক
নারি
জানি
সব
চাই
যেন
পথ
হেথা
শব
ছেড়ে
হবে
সেটা
হ'লে
হেথা
ভরা
তবে
মদে
সুখে
পরে
দে'তো
দাদা,
হাসি
মোরা
তাই
এই
বিষ
শুয়ে
মোর
পুরা
শনি
চায়

ডাকছ আবার হেথা ভাঙা যে আসর,
চুলের গোড়ায় ত্বের ধরল যে পাক—
মন্দিরে কে বাজায় ভগ্ন কাসর,
অনেক ঠেকেই তবে আছি নির্বাক।
লিখেছি একদা আমি 'কেডস'-স্যাডাল,
"কুমার-অসম্ভব" "চল্টিং ছাঁদে"—
প্রশংসা কিছ্র আর বহু স্ক্যান্ডাল,
পড়তে চাইনে সেই পুরানো ফাদে।
ইয়াকি' নয় আর, তবুও যখন
দিগেছ—যদিও জানি এ ডাক চরম—
অভ্যাসে অবহেলা করতে তখন,
হবে না ঘৃণা-চান্দা গরমাগরম।
দোষিয়া শুনিয়া মন যায় যে দমে,
যেদিকে সেদিকে হেরি মৃত্যু-আধার—
দুর্ভাগা জাতটাই থামবে সমে
শ্মশান হবেই হবে ডাহিন-বাঁ ধার।
পাবক অগ্নি শূন্য গেছেন নিভে,
পিড়িয়া রয়েছে সারি—জ্বলো না চিতা;
গেছেন মোদের হার, শ্মশান-শিবে,
রচনা করতে নব-মৃত্যু-গীতা।
সম্ভব নয়, জানি প্রেস-অফিসার,
একটু বেচাল লেখে গোপন-লিপি,
স্বামী কঙ্কাল-কোলে নাচ বেহুলায়,
বোতলের অঝ মারে সোলায় ছিপি!
নিষ্কৃতি পেতে পারো মাতাল হ'লে,
আপনাকে ভুলে থাকো হাত-পা ছুঁড়ে—
বেহুস হইয়া থাকো মাটির কোলে,
শেষল-কুকুরে খাবে কবর খুঁড়ে।
হাসির আড়ালে যদি কান্না ফোটে,
সে নয় কাহারো দোষ, মোরা দুর্বল—
দেখতে ঝরির পায় মড়ার ঠোটে,
চাঁপিয়া রাখতে নারি চক্ষুর জল।
অনেক ভাবিয়া স্থির করেছি বিশেষ,
শ্মশানেই দেখবে যে সিনেমা-ছবি;
খাবার আগেই নারী বাগেও তো কেশ,
ফুলশয্যায় সুখে মরেও কবি!
মনের পরদা জুড়ে গল্প জাগে,
কাহিনী নহে তা, যেন স্বপ্নে পাওয়া,
একটুকু কথা, ছোট্টো একটু লাগে—
অপুণ্ডাই এই যুগের হাওয়া।

(এক)

রাজার দুলাল বাঁধতে পরেনি ঘর,
বাঁধিতে পারেনি রাজপুত্রী তারে অজো;
মনে মনে সে যে খুঁজিছে তেপান্তর,
শুন্যে ছুটিছে ঘোড়া সে পক্ষীরাজে।
অন্ত-পুরেতে বহু দুঃখসারা শেজে
ব'সে আছে ঠায় চরণে আলতা মেজে
দেউড়িতে ঘড়ি প্রহরে প্রহরে বেজে
ঘোষণা করিছে কেন ব'থা হার সাজে—
রাজার দুলাল এখনো রয়েছে পর,
ঘরের মায়ায় বাঁধা পড়ে নাই অজো।

রাজার দুলাল, ঠিক মনে নাই তার
বাঁগজো গিয়ে, হ'ল সে অনেক দিন,
সাত সমুদ্র তেরটি নদীর পার
বলি সন্মত হইতো বা মহাচীন—
পথে যেতে যেতে সহসা পড়িল চোখে
সম্মা তখনো ঢাকে নাই দিবালোকে
মেঘের মতন থম্‌থম্‌ করে ও কে
আঁখি দুটি তার কোন দিগন্তে লীন।
দিশ্বজয়ীর অকারণ মনভার
কোথা সে সন্দেরে, কে জানে সে কতদিন।

হ'ল পরিচয়, প্রান্তর নদীতটে
এসেছিল নেমে পাহাড়-দেশের মেয়ে,
মনের কথা সে কহে নাই অকপটে
ছোট আঁখি দুটি শূন্য দেখেছিল চেয়ে।
নদীতরঙ্গে ছায়া ভেঙে ভেঙে যায়
দুজনীর মন ভারী-ভারী বেদনায়
এপারে-ওপারে নিশীথ আঁধার ছায়
পাহাড়ের মেয়ে আনমনে ওঠে গেয়ে।
রঙের বিলাস জাগিতে আকাশ-পটে
লাজে নত-আঁখি পাহাড় দেশের মেয়ে।

দিন কেটে যায়, নেশা ধরে যায় মনে,
রাজপুত্রের পড়ে ছাই হ'ল পাখা
মুগ্ধ স্বপন ঘনায় নয়ন-কোণে
দূর পথখানি ক্ষণিক মায়ায় ঢাকা।
বনের হরিণ দিতে নাহি দিতে ধরা
বুট কম্পনে কাঁপিল বসুন্ধরা
বাঁধা হতে হতে খসে গেল গটিছড়া
সচল হইল অচল রথের ঢাকা।
বনের হরিণী ছুটে চলে গেল বনে
পাখা-পোড়া পাখি পুন রাপটিল পাখা।

নয়নের ক্ষুধা বৃকে রয়ে গেল জমা
কড়ু আঁখিপথে বিগলিত কামনায়।
ক্ষণপরিচিতা হ'ল চিরপ্রিয়তমা
অধরা—স্বপনে ধরা দিয়ে দিয়ে যায়।
পাহাড়ের শিরে মেঘেরা জমিল আসি
কবে যে ঝরিবে প্রান্তরে ভালবাসি
নিবিড় আধারে হাসিবে পৌর্ণমাসী
তাহারই পূলকে অমাবাসী মূরছায়।
দেহে পলাতকা মনে হ'ল মনোরমা
মন ফিরে ফিরে কঁদে দেহ-কামনায়।

এমনি করিয়া মাস মাস হ'ল পার
রাজার দুলাল বসিল রাজ্যপাটে,

হাওড়া

মোটর এ্যাকসেসরীজ্
এজেন্সী লিমিটেড
ঘোষণা করিতেছেন
যে,



জে হু ই ন ফোর্ড ও
মার্করী পার্টগুলির
জন্য

তাহারা ভারত সরকার কর্তৃক
রেজিস্টার্ড ডিলার নিযুক্ত
হইয়াছেন

নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ফোর্ড
ও মার্করী স্পেয়ার
পার্টস্ বিক্রয়ার্থ মগ্ন
আছে

তা, ম্যাসা লেন,
পোঃ বক্স ৩৪৩
কলকাতা।

টেলী } ফোন : ক্যাল ২৯০, ২১৯৯
গ্রাম : অটোমেন্ট

শাখাসমূহ :

শেটারস্ :-১, চাঁদমারি রোড
ওয়ার্কস্ :-৬, ডবসন্ রোড
(হাওড়া)

এ্যাস্বেষ্টস্ • সিমেন্ট • হাড ওয়ের

সীট ও পাইপ

দেশী ও বিলাতী

স্যানিটারী ও

মিউনিসিপ্যালিটির আবশ্যকীয়

এজেন্টস্
টার্কিস্ট
ইমপোর্টারস্

ইঞ্জিনিয়ার্স
কন্সট্রাক্টরস্
ম্যানুফেকচারার্স

বুহের এণ্ড কোং

সাকরাইস্ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্
৬ ও ৭নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।



একটি
দামুস্কা
প্রসাধনী
ট্যাল্কম্ বাথ পাউডার



এমন মধুর! দামুস্কা ট্যাল্কম্ পাউডারের সুগন্ধ
আপনার দেহে ঘিরে একটি স্বপ্নের পরিবেশ
সৃষ্টি করবে। রানের পর মেখে দেখুন
সারাদিন কেমন সজীব ও শীতল থাকবেন।
প্রস্তুতকারক

দাঁ কেমিক্যাল
ও হার্কন্স

১৫৫, আদার চিংপুর রোড, কলিকাতা

অলস দু'পায়ে শব্দ স্মৃতিটুকু সার
হাজারো কাজেতে এ-বেলা ও-বেলা কাটে।
মেদুর মেঘেতে আকাশ পড়িলে ঢাকা
পালঙ্কে শুয়ে মনে হয় ফাঁকা-ফাঁকা
দেখে দিগন্তে পথ চল গেছে দাঁকা—
কলসককে বধূরা চলেছে ঘাটে—
কেটে যায় নেশা মন করে হাহাকার,
বেলা গেছে বয়ে সূর্য নেমেছে পাটে।

(দুই)

দেখা কি হয়েছে তাহার পর?
অনেক ব্যাপারে অনেক বর—
গৃহহীনা করে কাহার ঘর,
জলে ভেসে যায় নয়ন তার।
দেখা হলে মৃদু হাসিয়া বয়,
শরীর তেমার ভাল তো নয়!
মনে মনে বলি, হায় কপাল,
এমনি কাটিবে চিরটা কাল!

নিজে মুখ ফুটে বলে না কিছু,
মন বলে, মোরে কর আপন—
চোখোচোখি—করে নন নীচু
কামনাজড়িত নিশি যাপন।
অনেক কামনা হায় রে মুক,
বুক ফেটে য় ফেটে না মুখ।
সময় শব্দই বহিয়া যায়—
গাছের কুসুম ধুলিরে চায়।

বহুর বছরে পাহাড়-দেশে
শীত জমে যায় কলসর
ছলছল জল গগ্গা শেষে
রচে বাধন পরস্পর।
বছরে বছরে একটি বার
নামাতে নামাতে মনের ভার
বড় বড়দিন তাও ফুরায়
বলি বলি বলা হয় না হায়!

একটুকু ছোঁওয়া কথা খানিক
মধুর হয় যে মধুরতর
বিরহের তাপে হয় মাগিক
যা ছিল একদা শব্দ পাহার।
চিঠির কাগজে পড়ে না দাগ
এ হেলি-থেলার ওড়ে না মাগ
দেহরূপে শব্দ পড়িয়া যায়
আপনি পড়িয়া বাস বিলায়।

(তিন)

স্বপ্ন ভাঙিয়া যায় সদ্য
পদা জন্মিয়া হয় গদ্য
দেহে ধীরে নেমে এলে ক্রান্তি
তখন মনেহা হয় ক্রান্তি।
নারী নহি জনে আল পক্ষা
সীবন করিয়া ছেঁড়া কক্ষা
তাহারই মাঝারে খোঁজে মুক্তি।
পূরুষের দেহ খোঁজে ভুক্তি
বিহ্বল হয়ে আসে দৃষ্টি,

বিধাতার অপরাধ স্মৃতি
ছড়ানো রয়েছে সারা বিশ্ব
আঁখি মজে নবতর দৃশ্যে
আঁখি হতে মন নহি ভিন্ন
দৃঢ় বন্ধন ক্রমে ছিন্ন।

(চার)

রাজার পুত্র পাহাড়ী মেয়ের লেখে লিখন
শব্দ হয় তাই একদিন বাহা ছিল চিহ্ন।
পাহাড়ের দেশে এসেছিল মেঘ ঘোরালো হয়ে
ছায়াবিবর্ণ পাহাড়ীকণা খবর বয়ে
ছুটে চলেছিল নৃত্যচপল উপল ঠেলে
মেঘ-সংবাদ দিবর সঙ্গী যদি যা মেলে।
এমন সময় প্রান্তর হতে বার্তা এসে
পাহাড়ী মেয়ের মন নিয়ে গেল নিরুদ্দেশে
প্রহর প্রহরে দেয়ালের খাঁড় চলিল খেঁজে
একই লিপিরানি বারবার কয় পড়িল সে যে—

(পাঁচ)

“এ কি আলসা, এ কি ভুল, এ কি ভয়?
পাখি দুজন পাখাপাখি চল চোখের ভাষায় কি জানি কি বলে
মুখের ভাষায় কেহ মানিবে না কাণে কছে পরাজয়!
আকাশে সূর্য জ্বলে আর নেভে, কতখানি দেব কতখানি মেবে,
দেওয়া ও নেওয়ার জানাইতে দাবী বয়স বাড়িয়া যায়—
চাঁদে ও চকোরে এ চিরবিরহ জোৎস্নার দরিয়ার।

হয় সখি, হায়, ভাল ভানেশই,
ঘটটুকু আসে বাধবন্ধন সুবুদ্ধিজ্ঞান হিসেবে তা গণে
চোখ মেলে দেখ, ফেলে রেখে দাও প্রেমের পাঠ্য বই!
প্রেমের সত্য যা আমার কাছে—ভূমি ভেঙে যাবে পড়িল সে ছাঁচে
তোমার সত্য তোমাতাই আছ দেহের সীমানা ঘিরে
সিম্ধুর ঢেউ গণনা করে না জীবন-তটিনীতীরে।

সন্ধান কর শীতল বাসনার—
তোমার জগৎ নয়ন তোমার তার খোঁজ তাহা কিছু নহে আর
সেই স্বাদ তব ধরা পড়ে যাহা তোমার ও রসনার
গণ্ডুষে করে সমস্ত পান সেই সমুদ্রে মূনি ভেসে বাস
তোমার চিত্ত তীর্থক্ষেত্রে লভে যদি গোপপদে
ততৈই ফোটারো সংগত সখি, তব মন-কোকিলে।

‘বৃহৎ বিরাট কঠিন এ আয়োজন’—
মনে মনে যদি ভেবে থাক তাই অতৃপ্ত রবে ছোট ক্ষুধাটাই
আসিয়া আসিয়া ফিরে ফিরে যাবে অনেক শূভক্ষণ।
সব ছেড়েছিল তাই তো রাখিকা রাসিকজনের চিরপ্রার্থনিকা
ভূমি কি ভেবেছ জানিত না রাখা কৃষ্ণের ইতিহাস—
ফাঁস যদি ভূমি খুলিতেই চাও নির্ভয়ে পর ফাঁস।”

(ছয়)

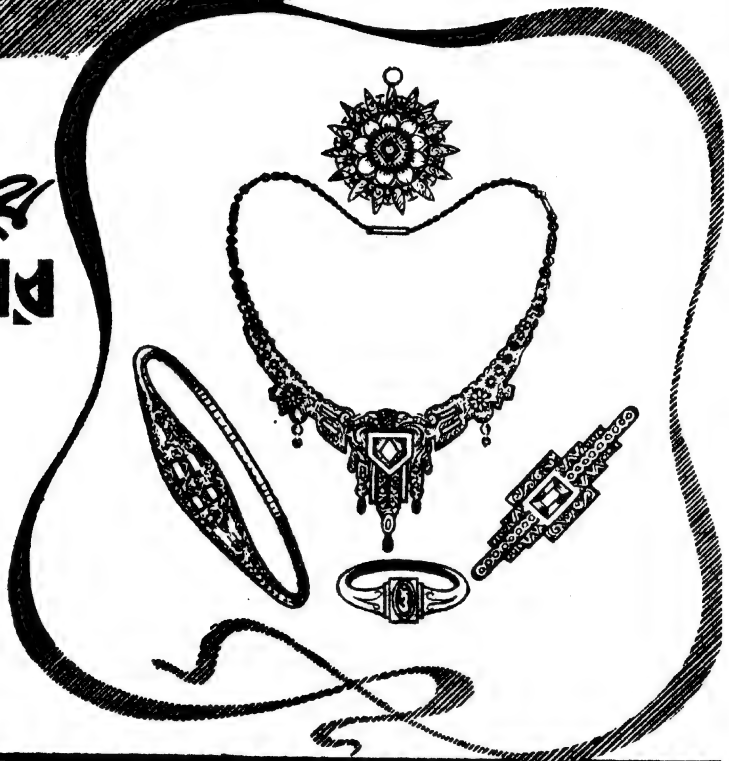
পাহাড়ী মেয়ের চোখে ছলছল করে জল স্নান হাসি খেলে তার ওষ্ঠে,
বলে, হে অহংকারী, উজ্জ্বল দীপ শত জানো থাকে একই প্রকোষ্ঠে
শিখা-বন্ধনে শব্দ; সে সীমা হইলে পার একই দীপ আনে মহাবাস।
ভূমি দেখিয়াছে সেই সন্নিবন্ধ দীপশিখা, দেখেছে কেবলি অপ-প্রশ্ন।
লিখন পূর্ণ ভূমি, শব্দ কণা কণা পেয়ে পূর্ণ জয়ের কর গর্ব
জাতি-এ ভুল তব শব্দ সেই বিম্বাসে আমি যাপি এ বিরহ-পর্ব।
কাটিল মনের প্লানি সবতনে লিপিরানি তুল রেখে নিল হাতবাক্সে,
পুন বলে মনে মনে, আমার মনের বাধা গোপনেই মোর বুকে থাকে।
ভূমি ভাব অভিমান, কয় না কিছুই দাবী—অভিমাত্রী নয় তাহা সজ,
হে অধীর, ভূমি শব্দ ঘটনা দেখেছ চোখে জানো না, কি পিছে তার তথ্য!



উপস্থাপনা
কালিদাস

সলফার
এস, সরকার

ইহা অবিসম্বাদিতরূপে স্বীকৃত
যে এই প্রদত্ত ও "নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান"এর কাজ সত্যই
অভূতনীয়।



এস, সরকার এন্ড কোং
স্বাক্ষরকারী, জুয়েলাস
১২৫, বহুবাজার ট্রাফ, কলিকাতা

কি যদি মন একবার পেঁচছে লক্ষ্য তার দেখে না তো কোথা সেই লক্ষ্য—
হিস্র খিঙ্করে টলে না মোদের মন করিলেও গরুগব্দ বন্ধ।
তোমরা বৃক্ষিতে নারো সহজ নিভরতা, অবহেলা ভেবে হও ক্রুদ্ধ—
তোমারে সে অবকাশ দিলাম বশু আজ, মন থাকে বৃক্ষে অবরুদ্ধ।

(লাভ)

জবাব না পেয়ে রাজকুমার
চেনা-অচেনার করে সুমার
আগে দর্শন, পরে চুমার
ধুম লেগে যায় চমৎকার,
কাঙালী যদি বা শিকারী হয়
লোভে ফ্রোপ পায় তাহার ভয়
সেও করে ধীরে সর্বজয়
অসি বন্বন্বন বনবকার
বীর সুখ্যাতি রটিয়া যায়
ঘটিত না যাহা ঘটিয়া যায়
পাহাড়ী মেয়ে কি চটিয়া যায়?
উদ্দেশ্যে তার লেখে কুমার—

(আট)

“কাহারে দিয়োঁই মন?
কৃষ্ণচূড়ার শোণিত-শোভায় মধুপ-গুঞ্জরণ
শূনি বসন্তে, বর্ষায় স্নাত কেতকী কটিার বনে
সেই মৌমাছি গুঞ্জন করে শূনিয়াছি মনে মনে।
কৃষ্ণচূড়ার রঙপরশ শূত্র কেয়ার গায়
লাগিলে কেয়া কি শিহরিয়া উঠে অভিমান বেদনার?
প্রকৃতি আপন খোয়ালেই চলে নাহিক বলাই যত্নী শতনলে
মৌমাছি করে মধু সঞ্চয়—নিদিত ফলবন
চলে না বিবাদ অরণ্যপথে কথার প্রলপ অভিমান-ফতে
বলিবে কি তুমি ফুলেদের শূদ্র শোভা আছে নাই মন?”

আমি কি করোঁই ভুল,
এই সংসার করিয়া তুলোঁই অরণ্য সমভুল।
হাল্কা পাখায় উড়িয়া বেড়াই বাতাসে করিয়া ভর
ফুলের বৃক্ষেতে বসি ততদিন যতদিন সমাদর
যেখানে যেটুকু মনে মনে পাই সংগ্রহ করে আমি
জানি একদিন মরিবে হুমর শূখরে ফুলেরা জানি
দল বেধে এসে বসি মৌচাক গুঞ্জনহীন মাছি থাকে কাঁকে
শত্রু কোথায়, সন্ডয়ে চাহিয়া উদাত করি হুল
পুষ্পের স্মৃতি বিস্মৃতি-পথে মিলাইয়া যায় মধুপ-জগতে
না হয় গেলই, মানিব না তবু আমি করিয়াছি ভুল।”

(নয়)

গিরি আর প্রান্তরে
সম্ভার বহু আগে
প্রান্তর-নিন্দায়
পার্বত্যী নেমে আসে
গম্ভীর ধারে সেই
তারি ধার খেঁবে এল
কুশল পুঙ্খিতে গিয়ে
গাল বেরে করে করে
কলে, আমি এসেছি যে
কবি বলে, শোনো শোনো,
নির্জন সম্ভার
কবিভার সুরে সুরে
ব্যবধান বেড়ে যায়
নেমে আসে আঁধার
সারা পর্বত ছায়
বৃক্ষে নিতে অধিকার।
পুরাতন তরুতল
বর্ষ ব জলধার
নরনের নোনা জল
কাটাল কি মনভার?
আছে আজো প্রয়োজন?
কাবা সে পড়ে যায়—
কেটে যায় শূন্যখন?
যদ তরো ভরে যায়—

(দশ)

“বহুরে যা এক করে আমি সেই ব্যাখ্য সাগর
বিস্তীর্ণ বিকসিত কি না চান শূদ্র জানে ইতিহাস—
যে যা বলে মেনে নেব দুঃচারিত লম্পট নাগর
হে তটিনী ভিন্নমুখী করও না তব জলোচ্ছ্বাস।
সবারে সমান প্রেমে বাহু মেলে বৃক্ষেতে জড়াই
সমান গজ্ঞন করি বৃক্ষে বৃক্ষে সর্বমোহনার
সামান্য বিনয় মাঠ, নহে সখি, মিথ্যা এ বড়াই
বহুতে মিলিত আমি কাঁদি না তো অনুশোচনায়।
দক্ষিণ-সাগর কড়, কড় হিম উত্তর-সাগর
স্পন্দনহীন জলরাশি জড়তায় স্তম্ভ হয়ে যায়
সে স্তম্ভতা গলে যাবে মেল তব ও আমি ডাগর
উধু বাহু তরঙ্গরা তটে লেগে হবে ফেনময়।”

(এগার)

কথা কহিল না পাহাড়ী মেয়ে
মন্দ মন্দ সুরে গাইল গান
আধার নামিল আকাশ ছেয়ে
বাতাসে ভাসিতে লাগিল তান—
“একটুকু ছোঁওয়া লাগে একটুকু কথা শূনি
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।”

(বারো)

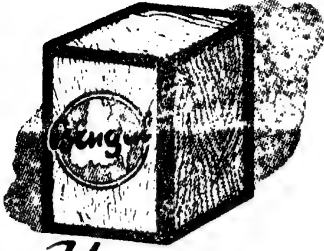
রাজপুত্রের ভায়ারি হইতে—

“গভীর প্রেমের কোনো পরিচয় পাইনি খাঁজিয়া মূর্খে ও চোখে
ভয় হয় বৃষ্টি ছিল না কখনো, হয়নি কখনো হয়ে না কড়।
নরনে পাই না খটনে খাঁজি
বাহির করি যে স্মৃতির পুঁজি
কখনো ভাবি যে ঠাকুরা গিয়াছি কখনো ভেবেছি ভালই হ’ল—
রজনী দুপুরে ওরে মশায়ের তল্‌পি-তল্‌পি বা আছে তোল।
বোকার মতন চেয়ে বসে থাকি হঠাৎ দেখি কি নেশার ঝোঁকে,
বৃষ্টি তুমি নও আর কেউ হবে, আমি ভাল জানি তুমিই তবু।

প্রেমে বলমূল উজল বাসে
লোভ জাগে মনে টানিতে পাশে,
চাঁকিতে আবার সাবধানতার নিচু করে ভুলিয়া আমারে তোল।
মন কম আজো নামেন সখ্যা, প্রকাশ্য বল, তল্‌পি তোল।
আকাশ জুড়িয়া আলো-উৎসব, জাগো জাগো পাখি, আলোকে জাগো,
নিখর রজনী অস্থিরপদে বিদায় নিয়েছে জানো না তরু?
পুরাতন দিন আসে না ফিরে
নতন জন্ম নয়ন-নীরে
নিমেষ সমান কেটেছে কখন জীবন-সায়রে বছর বোলো—
আজ কালগতি মথুর হবে? মিছে সে হাঁকিছে তল্‌পি তোল।

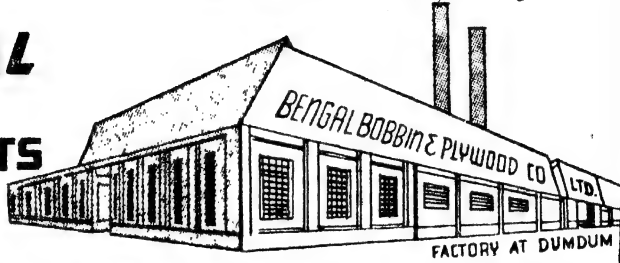
বৃক্ষে জড়াতে চাহিছ মখন, হে কবি, তখনি বিদার মাগো!
আবাহন পুরা না হইতে দেবী, যজ্ঞশেখের মন্ত্র স্মাহা?
মানুষের মন দেবতা জানে
শূদ্র কথা হার, কি তার মানে?
বাসর-শরনে সাপের কামড়ে বেহুলায় স্মাহী বৃষ্টি কি মাল?
শূকুনো হাড়ের গজাল-মাংস—মৃত্যুর বলি তল্‌পি তোল।
রাত কেটে গিয়ে ভোর হলে পূন, গুণো বিহঙ্গন নয়ন খোল,
ওই হের পাবে ছোঁড়া মেঘ বস্ত আলোর নেশায় রঙীন হ’ল।
দিশাহীন আশা পাখায় তব
যেদিকে তাকাও অসীম নভ
নীড়ের আরম্ভে রহিল বাহারা নীড়ের আধারে তারাই ম’ল
ভোমার খাঁতে ভীষ্মের ভাষা—প্রেরণী, সুখের ফাল্গুনী তোল।”

শ্রেষ্ঠ শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি নন্দন !



Use
BENGAL
BRAND
TEA CHESTS
BENGAL
PLYWOOD

আধুনিক কলকষার সাহায্যে
নিজস্ব ক্যান্টরীতে প্লাইউড
বোর্ড ও চায়ের বাক্স প্রস্তুত
করিবার একমাত্র ভারতীয়
যৌথ প্রতিষ্ঠান।



UPCO

বেঙ্গল বব্বিন এন্ড প্লাইউড কোং লিঃ

ম্যানেজিঃ এজেন্ট : মন্ডোম চাটাজিঃ এন্ড কোং : ৪৪-৪৬ ক্যানিং স্ট্রীট কলিকাতা :

“বড় সাততির” একটি

ভারত ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ (১৮৯৬)

হেড অফিস :—লাহোর

জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ জে সি জৈন, এম এ

এই কোম্পানীতে শিক্ষিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকদের উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা আছে।
সতর্কিত অতীত লোভনীয়।

১৯৪৩ সালে নূতন কাজ	...	২,১৫,০০,০০০ টাকার উপর
১৯৪২ সাল পর্যন্ত মিটান দাবীর পরিমাণ	...	২,৬৭,৭৮,০০০ টাকার উপর

বিশেষ বৈশিষ্ট্য :—

জয়েন্ট লাইফ স্কীম, এডুকেশন এন্ডাইটি, ম্যারেজ এনডাউমেন্ট, ইমিডিয়েট, এন্ডাইটিস্, চিলড্রেন এনডাউমেন্ট ও ফ্যামিলি পেন্সন স্কীম ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিস্তৃত বিবরণাদির জন্য লিখুন :—

কলিকাতার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার,

মিঃ জে এন সেনগুপ্ত, বি এ, বি-কম্ (এডিন), ভারত ভবন, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ।

বা নিম্নলিখিত যে কোন ব্রাঞ্চ অফিসে :—

ঢাকা, জলপাইগুড়ি, পাটনা।

আগমনীর আগমনে—

নবদ্বীপ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস :
৬, মাদ্রাসা লেন
কলিকাতা।

আপনারদের
সম্প্রদায়
অভিবাদন
জানাইতেছে।

General Manager:
L. M. Ghosal
Managing Director
MR. H. M. GHOSE,
B.Sc. (Chicago), F.R.E.S.
(London)

অজস্র অফুরন্ত মনোরম সামগ্রী “ষ্ট্যান্ডার্ড টেনার” প্রসাধনসামগ্রী

ষ্ট্যান্ডার্ড টেনার—প্রকৃতিজাত খটি তৈলান্ন দ্বারা প্রস্তুত, সমান একট, মাখিলেই চুল পরিপাটি হয়, মাথার খুলি পরিষ্কার ও সুস্থ থাকে, মরামাস হয় না। ৫ আঃ শিশি—১১০ টাকা।
ব্রিলিয়েন্টাইন—মাথায় সমান একট, মাখিলেই চুল নরম হয় ও চুলের জেলা বাড়ি। ল্যাভেডার গন্ধযুক্ত। টিনে ১১০ আনা ও বোতলে ১৫ আনা।

আসুন!

দেখুন!

“ষ্ট্যান্ডার্ড টেনার” প্রিয় সামগ্রীগুলির বিরাট আয়োজন

প্রিমিয়ার হেয়ার ডাই—সাদা, ধূসর বা লাল চুল, এই ডাই ব্যবহারে চকচকে বাদামী বা কাল রংয়ের হয়। ইহাতে ঘূতের বা চুলের কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। মনোরমগন্ধযুক্ত। ৪ আঃ—১৫০ আনা।
আমেরিকান বে ক্রম—ষ্ট্যান্ডার্ড টেনার মাখা বিশেষভাবে প্রস্তুত। একটি চমৎকার অপরিহার্য প্রসাধন সামগ্রী—৪ আঃ শিশি ১১০ টাকা।
সেটিং লোশন—চুল কেকড়াইবার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত। এই সেটিং লোশন বেশ করিয়া, সর্বত্র সমান করিয়া চুলে লাগাইয়া দিন, তারপর আংগল, চিরুণী বা কার্পাস দ্বারা ইচ্ছামত কেকড়াইতে পারিবেন। ৪ আঃ শিশি ১১০ টাকা।
মোনারোয়া—সম্পূর্ণ নির্দোষ, বিস্তী ঘাম নিরোধ করার জন্য প্রত্যহ ব্যবহার্য। স্মিট গন্ধ। ৪ আঃ শিশি—১১০ আনা।

আফটার শেভ লোশন—কামাইবার পর এই লোশন মাখিলে ঘূতের সর্বপ্রকার ময়লা দূর হয়। উহাকে পরিষ্কার, মসৃণ ও কোমল করে। ৪ আঃ শিশি ২ টাকা।
লিকুইড ক্রিমিফাইং—অতি মনোরম মৃদু-মধুর গন্ধ; চুলকে পরিপাটি করে এবং উহা নরম ও চকচকে হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত। ৪ আঃ শিশি ১১০ টাকা।

ডের্মাট্রিস—চমৎকার আরামদায়ক, দাঁত পরিষ্কার করে, মুক্তার মত স্বকৃষ্ণক সাধা হয়, সূক্ষ্ম ও সুন্দর অবস্থায় রাখে। টিনে—১১০ আনা, স্মিটিনে—১০ আনা।
পিক্টিফাইড ককোনাট অয়েল—স্বাস্থ্য, অত্যন্ত নারিকেল তৈল, সমান পরিমাণ মাখিলেই চুল বড়ো এবং চকচকে ও নরম হয়। ৪ আঃ শিশি ১৫০ আনা।

এন্টিফ্রাইট টিনিক—চক্কে ঘূতের লাবণ্য বৃদ্ধি করে, মাংসপেশী ও তন্তুসমূহকে সজীব করে, ব্যবহারে মৃদুস্বাদু স্মিটিন ও সুগন্ধ-রোগাশ্রুত হয়। ৪ আঃ শিশি ২ টাকা।

লিকুইড সোপ—এই পচন-নিরোধক লিকুইড সোপে শতকরা ২৫ ভাগ কেসোল আছে, মশার কামড়, ঘামাচী ও চুলকানি ইত্যাদি দূর করিতে অস্বাভাবিক। ৪ আঃ শিশি—১১০ আনা।

“ষ্ট্যান্ডার্ড টেনার” মাখা রূপ-প্রসাধনগুলি একমাত্র ঘূতের লাবণ্য বৃদ্ধির জন্যই প্রস্তুত।

ড্যানিং ক্রিম—দিনে ব্যবহার্য, লোমকূপ বন্ধ করে না, ঘূত কোমল থাকে, সর্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে এবং উহার উপর পাউডার মাখিলে, সারাদিন নিখুঁত থাকে। মাত্রা ১ টাকা।

ফেস্ পাউডার—সারাদিন নিখুঁত অবস্থায় থাকে, লোমকূপ বন্ধ করে না, আপনার পছন্দমত যে কোন বর্ণের পাউবেন, বহু ঘণ্টা চাঁটকা মনোরম গন্ধে ভরপুর রাখে। সাত রঙের পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি বাক্স ৫ টাকা।

স্মিথস্ শ্যাম্পু

আপনার মূখ্যের সৌন্দর্য ঘেরূপ প্রয়োজনীয়, কেশের সৌন্দর্য ও তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নহে। একমাত্র স্মিথস্ শ্যাম্পু ব্যবহার করা উচিত, স্মিথস্ শ্যাম্পু এ সম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী, উহা মাখিলে চুলের জেলা বাড়ি ও রেশমের মত হয়।

ওল্ড ইংলিশ ল্যাভেডার—অত্যন্ত উজ্জ্বল তৈরী। ল্যাভেডার ফ্রাগ্র্যান্স—ছোট ৫০০ আনা, মাঝারি—১১০ ও বড় ৪ টাকা।

ইউ-ডি-কোলোন—অতীব আরামপ্রদ, ক্রান্তি-নাশক। ছোট—৫০০ আনা, মাঝারি—১১০; বড়—৩৫০ আনা।

হোয়াইট-এণ্ডয়েজ

কলিকাতা

ফোন—ক্যাল ৬২০৪

গাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

(স্থাপিত ১৮৯৫)

হেড অফিস- -
৪৭নং মল, লাহোর।

কলিকাতা অফিস :
১৩৫।১৩৬, ক্যানিং স্ট্রীট,
৯নং লিঙ্ডসে স্ট্রীট (নিউ মার্কেট)

কার্য্যকরী মূলধন- -
৩৬ কোটি
টাকার উপর

ভারতবর্ষে সর্বত্র ১৩৯টি শাখা
এবং লন্ডন ও নিউইয়র্কে
এজেন্সী আছে।

কর্মে বিনিয়োগই মানদণ্ড ও অর্থ
উভয়েরই পূর্ণ সাধকতা।

উত্তম সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ
করা হয়। চলতি হিসাব, সেভিংস
ব্যাঙ্ক ও ক্যাশ সার্টিফিকেট ইত্যাদির
সুদের হার লিখিয়া স্থির করিতে হয়।

এই ব্যাঙ্কের বহু শাখা থাকার
দরুন বিলের টাকা অতি
সহজে আদায় করাই ইহার
বৈশিষ্ট্য।

মোখরাজ,
জেনারেল ম্যানেজার।

এস. কে. পাণ্ডিত্য,
ম্যানেজার,
ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

একটী পয়সা



যুদ্ধের সময় যে নূতন পয়সা বেরিয়েছে, তাতে পয়সার দাম কমেনি।
কিন্তু ওতে যে তামা বাঁচছে—যুদ্ধের যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে তাতে কম
সুবিধে হয়নি। আজকের দুদিনে সাধারণ লোকের পক্ষে খরচ বাঁচান
খুবই কঠিন; তবুও একটী করে পয়সাও যদি বাঁচাতে পারি, তাহলে
সেই সঞ্চয় যুদ্ধোত্তর কালের চরম দুদিনে কম সম্পদ নয়।

ইষ্ট বেঙ্গল

মার্কেটাইল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২০/১ লালবাজার স্ট্রাট, কলিকাতা।
আপনার টাকা রাখবার একটী নিউরমোণ্য প্রতিষ্ঠান

(COMARTS)

1. INCORPORATION 16. 8. 32
2. CHANGE OF NAME 16. 12. 38
3. SANCTION OF INCREASE OF CAPITAL 18. 17. 37
4. CHANGE FROM PRIVATE TO PUBLIC LIMITED CO. 14. 2. 42
5. DECLARATION AS SCHEDULED BANK 4. 4. 44

**FOOT PRINTS
ON
THE SANDS OF
TIME**

THE HOOGHLY BANK LTD

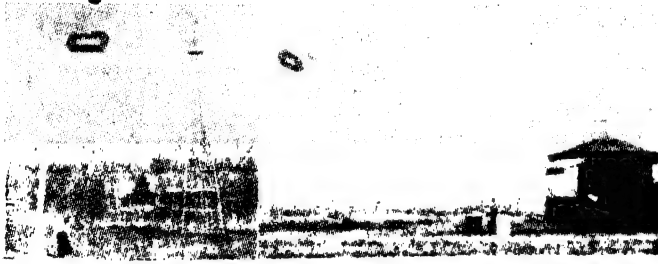
বিজ্ঞানীর মেঘদূত

জীবনবিহারা ঘোষ

“আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে” কবি কালিদাস যদুত কাব্যের অবতারণা করেছিলেন, রূপে কথিত আছে। আষাঢ়ের বহাওয়া প্রত্যেক নরনারীর মনে যে দীপ্তি ও আবেশের সৃষ্টি করে—তারই ছবি রহী যক্ষের মেঘদূত সম্বোধনের মধ্যে দিয়ে নি দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু এ ছাড়াও ব্রহ্মাণ্ড ও উত্তরমেঘের গতি কোন পথে হবে, মগিরি পর্বত থেকে ঐ মেঘের গন্তব্যপথে

কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। চন্দ্রের চারদিকে যখন “দেবতাদের সভা বসে”, পাখীরা যখন নীচু হয়ে উড়ে, ঈশান কোণে যখন কালো মেঘ দেখা যায়, বাদল-পোকা যখন ঝেঁড়িয়ে বেড়ায়; পর্বতমালা যখন মাথায় মেঘের আবরণ পরে তখন দেশ বিশেষে বিশেষ বিশেষ আবহাওয়ার আগমন সূচনা হয়ে থাকে। এই সকল কিম্বদন্তীর মূলে বিজ্ঞানীর বক্তব্য কি? আবহাওয়া বিজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের

সৌধাবলীর ভূনাবশেষ পাওয়া গেছে—তার থেকে দেখা যায় যে, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষের যখন সময়ের প্রবাহ নিরূপণেরও কোনও উপায় ছিল না—তখন তৎকালীন তথাকথিত যাজ্ঞকশ্রেণীর ব্যক্তিগণ নক্ষত্রের গতিপথ দেখে আবহাওয়ার সংবাদ আগে থেকেই তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদের জানবার চেষ্টা করে এসেছেন। একদিক থেকে আবহাওয়া বিজ্ঞান একটি প্রাচীনতম বিজ্ঞান—যা গড়ে তুলতে মানুষের আগ্রহ সভ্যতার প্রথমেই দেখা যায়। কিন্তু আজও এই বিজ্ঞানের উন্নতি আশানুরূপ হয় নাই। অনেকে মনে করেন, বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষ বিস্ময়করভাবে সফলতা পেয়ে থাকলেও—আবহাওয়া বিজ্ঞানে প্রকৃষ্টি-রূপে সফলতা পাওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তবুও বর্তমানে মানুষের কর্মক্ষেত্র এত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে—এই আবহাওয়া-বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থাতেও এর মূল্য মানুষের কাছে প্রকৃতপক্ষে অনেকখানি।

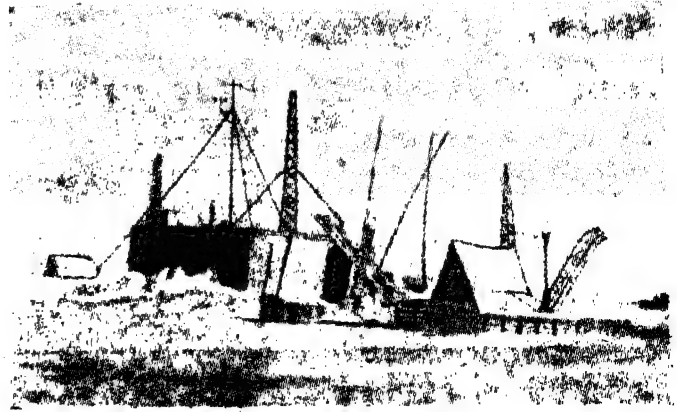


ঘড়ির সাহায্যে আবহাওয়ার তথ্য-জ্ঞাপক যন্ত্রাদি আকাশে পাঠান হইতেছে।

অলকাতে যক্ষপ্রিয়ার কাছে সংবাদ পাঠান সম্ভব হবে কিনা,—এ ধারণার মধ্যে কাব্য-বর্ণনার সংগে সংগে কবি কালিদাস হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই আবহাওয়া তত্ত্বের আংশিক আভাস দিয়ে গেছেন। বস্তুতঃ, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সাধারণ নরনারী-জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সর্বকালে, সর্বদেশে নিজেদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সংগে একাত্মরূপে পরিচিত। তাই নিজের নিজের দেশে বৎসরের কখন কোন সময়ে কি আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে—কোন মেঘে বৃষ্টি হয়, কোন সময় কি বায়ু, বড়, তুষারপাত, কুয়াসা, শীত বা গ্রীষ্মের আগমন সূচনা করে—এ ধারণা প্রায় সকলেরই অভিজ্ঞতা বিশেষে অঙ্গপবিস্তর থেকেই থাকে। আকাশ মেঘের সঞ্চার দেখে কালিদাসের যক্ষ সেই মেঘের অলকার পথে যাত্রার সম্ভাবনা ধারণা করেছিল। কৃষক ও নাবিকগণও কোন কোণে কি আকারের মেঘের সমাবেশ হলে ষড়, জলের সম্ভাবনা—তা তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারে;—ভারা সাবধান হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জরিপের মধ্যে আবহাওয়া সৃষ্টির সূচনা নির্দেশের জন্য অনেক ভিন্ন ধরনের

মত নিজের ক্ষেত্রে কতখানি এগিয়ে গিয়েছে? আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোন ক্ষেত্রে এর মূল্য কতখানি? পুরাতন ধনুসাবশেষ থেকে যে সমস্ত

নেপোলিয়ান তাঁর রুশ অভিযানের প্রাক্কালে—রাশিয়ায় শীতকালের আবহাওয়া কিরকম হতে পারে সে সম্বন্ধে তৎকালীন প্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানী লাপ্লাসকে জানাবার জন্য



সেতুপ্রদেশে আবহাওয়া তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি ক্ষেত্র

LATEST HOMOEOPHIC PUBLICATION

হোমিও শিক্ষা সংগ্রহ
ডাঃ শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

মূল্য—৩
DR. P. P. WELL'S
"Diarrhoea & Dysentery" Rs. 2/-
DR. E. B. NASH'S
"Leader for the use of Sulphur" Rs. 2/-
DR. H. C. ALLEN'S
"Materia Medica of the Nosodes" (Enlarged) Rs. 9/-
DR. WM. J. GUERNSEY
"Haemorrhoids" Rs. 3/-

SETT DEY & CO.,
Original Homoeopathic Pharmacy
40A, STRAND RD., P.B. 563, Calcutta.

ইউ.সি.বঙ্গ
সিদ্ধমলয়

যাত্রাভীষ দূঃস্বাস্থ্য ক্ষতরোগের মহোদধি
সিদ্ধ মলয় প্রথমাবস্থায় প্রয়োগে স্ফোটকাদি
মিলাইয়া যায় এবং দূঃস্বাস্থ্য ক্ষতরোগও বিনা-
অস্ত্রে পাকিয়া ফাটিয়া পুঃস্বাস্থ্য নিঃসরণে নির্দোষ-
রূপে ভাল হয়। শিশি ১১০। মাশুল স্বতন্ত্র।
শান্তি বটিকা—নতুন পুরাতন আশাশয় এবং শ্বেত
ও রক্তাশাশয়, উদরভগ্ন, প্রবাহিকা, তরলভেদ
স্মৃতিকাজনিত দশত, উদরাময় গ্রহণী ও আম-
গ্রহণী রোগে অব্যর্থ। শান্তি বটিকায় মমমর্ষ
রোগীও শীঘ্র দক্ষা পায়, এমন কি ওলাউঠা রোগের
প্রথমাবস্থায়ও সমভাবে কার্য করে। শিশি ১১০।
গরবি ফর্মেশী, কলিকাতা।
৭-১৩, রামতীর ঘোষ লেন, পোঃ আমহার্ট স্ট্রীট।

০ মুক্তি—

০ পথে—

উদ্যোগ

গাংগুলী প্রযোজিত

ইউরেকা পিকচার্সের
দাঁড়ানা

সংসার-আবর্তে মানুষের

চলার পথ নিরবচ্ছিন্ন হয় না।

এই মানুষকে কখনও না কখনও দোটার
স্রোতে পড়তে হয়। এমন এক ফেনিলোজ
ঘটনার ভেতর বাপ পেয়েছে "দোটার"।

পরিচালনা :
অমল্য বন্দ্যো
প্রভুল ঘোষ
সুন্দর-শিল্পী :
কালী সেন

ভূমিকায় :
* জহর গাংগুলী, লতিকা মল্লিক
* শৈলেন চৌধুরী, রমা ব্যানার্জি
* রতন বন্দ্যো, রবি রায়, প্রভা,
* শ্যাম লাহা, দুর্নিয়াবালা, কানু বন্দ্যো।

পরিবেশনা : শ্রী হ গা ডি স্কি বি উ টা র্শ



আপনার দায়িত্ব!

আমাদের উপরেই ছাড়িয়া দিন না কেন!

আপনার বিবেকবুদ্ধিতে ইহা আপনি পরিহাস্য করিতে পারেন না। কিন্তু
আংশিকভাবে আমাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারেন।

আপনার পরিজনবর্গের জন্য ন্যাশনাল ইন্ডিয়ানের একখানি "বীমাপত্র"।
এ বৎসরের পূজার প্রার্থ উপহার হইবে না কি?

বিস্তারিত বিবরণের জন্য ম্যানেজারের নিকট লিখুন।

ন্যাশনাল
লাইফ ইনসিওরেন্স



ইন্ডিয়ান
কোম্পানী, লিঃ

দেন। লাপ্লাস যতখানি সংজ্ঞা খোঁজ-
নিয়ে বলেন যে, জানুয়ারী মাসের আগে
রায় ভীষণ শীতের আবির্ভাব হয় না।
গালিয়ান—এই আবহাওয়ার সম্ভাবনা
বারী তাঁর অভিযানের পরিচালনা করেন।
তু ডিসেম্বরেই হঠাৎ ভীষণ শীত ও
রপাতের ফলে—নেপোলিয়ানের সৈন্য-
দলী লন্ডন হয়ে পড়ে ও তিনি বিফল
য় ফিরে আসেন। বর্তমানের মহামাশ্বে
লারের রুশ অভিযানের ব্যর্থতার মূলে আর
থাক অন্ততঃ এই ধরনের আবহাওয়ার
ই আবির্ভাবের কারণ ছিল না। লাপ্লাস
হিসাবে ভুল করেছিলেন তা নয়। যে বিরাট
হুমুড়লাই এই পৃথিবীকে চারদিক দিয়ে
রে আছে তার আলোড়ন বিলোড়নের ধারা
ই অস্থির, এতই সামান্য কারণে তার পরি-
ন যতে যে, পৃথিবীকালের আবহাওয়ার
নাবলীর সংগৃহীত তথ্য থেকে—

ঘনঘোর পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে এই ব্যারো-
মিটার যন্ত্রে বায়ুর চাপেরও পরিবর্তন দেখা
যায়। যে স্থানে এই চাপের পরিমাণের হঠাৎ
হ্রাস হয় সেখানে সম্ভাব্যতাই ধারণা করা যেতে
পারে যে, সেই বিশিষ্ট স্থানের বায়ুর পরিমাণ
ও ঘনত্ব কোন কারণে কমে গেছে। সুতরাং
আশপাশের উচ্চ চাপের বায়ুস্তর সেই স্থানের
বায়ুর চাপ বৃদ্ধির জন্য সেইদিকে প্রবাহিত
হবে। অর্থাৎ সেই স্থানে বায়ুর গতি বৃদ্ধির
সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বা তালের আবির্ভাব ঘটবে।
গোড়ার দিকে বিজ্ঞানী এই ধরনের আবহাওয়ার
সূচনা হতে পারে বলে কেবলমাত্র ব্যারোমিটারের
উপর নির্ভর করে যে সমস্ত ঘোষণা করতেন
তা অনেক ক্ষেত্রেই ভুল দেখা গেল। তখন
অন্যান্য যন্ত্র ও সম্ভাব্য আবহাওয়ার ঘোষণার
জন্ম অন্য উপায় অবলম্বনের চেষ্টা চলতে
লাগলো। আধুনিক আবহাওয়া নির্যয় প্রণালীর
প্রথম গোড়াপত্তন হয় ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে—

একটি কলিকাতায় ও আর একটি পুণায়।
বর্তমান যন্ত্রের আগেকার ব্যবস্থায় গোটা
ভারতবর্ষকে দুইভাগে বিভক্ত করে পূর্বভাগকে
রাখা হয় কলিকাতা কেন্দ্রের অধীনে ও পশ্চিম
অঞ্চলকে পুণা কেন্দ্রের অধীন করা হয়।
সুদূর বর্মাদেশের নীচে ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট
থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের সমস্ত ভূভাগে
কতকগুলি নির্দিষ্ট সহর ও গ্রামে আবহাওয়া
পর্যবেক্ষণের ঘাটি করা হয়। এই সকল পর্য-
বেক্ষণের কেন্দ্র থেকে দিনের কোন একটি
নির্দিষ্ট সময় স্থানীয় পর্যবেক্ষক নিজ নিজ
স্থানের বায়ুর চাপ, গতি, বৃষ্টির পরিমাণ, তাপ,
বায়ুস্রা মেঘ গতি, বৃষ্টির পর্যবেক্ষণের বিবরণ
কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিভাগে টেলিগ্রাফের
সহায়তায় পাঠিয়ে দেন। এখানে আবহাওয়া
বিজ্ঞানী ও বিদ্যারদের অধীনস্থ একদল কর্ম-
চারী সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশের এই সকল বিভিন্ন
স্থানের পর্যবেক্ষণের সংবাদ ভারতবর্ষের মান-
চিত্রের উপর বিশিষ্ট প্রণালীতে চিত্রিত করে
ফেলেন। কোথায় বারিপাত, কোথায় ঝড়া,
কোথায় কুয়াসা, কোথায় শৈত্য, কোথায়
অসহ্য গ্রীষ্ম, কোন্ স্থানের বায়ুর চাপ কত,
গতি কোন দিকে, মেঘের আকৃতি কি, কোথায়
নিম্নলি, স্বচ্ছ, সুনীল আকাশ, বায়ু স্থির
অথবা মৃদুমন্দ গতিতে বহমান এই সমস্ত
তথ্যের একটি অখণ্ড চিত্র আবহাওয়া বিজ্ঞানীর
সামনে গড়ে তোলা হয়। একই দিনে একই
সময়ের সমগ্র দেশের আবহাওয়ার কাহিনী
চোখের সামনে থাকায় ও দিনের পর দিন এই
চিত্রে কি পরিবর্তন ঘটে বা ঘটতে জানা থাকায়
কোন বিশেষ স্থান, গ্রাম, সহরগুলির দিকে কোন
বিশেষ বিশেষ আবহাওয়া দেখা দিবে
তা এই বিজ্ঞানীর পক্ষে ঘোষণা করা এখন সহজ-
সাধ্য হয়। কতকটা পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক তথ্য,
কতকটা দেশের আবহাওয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা
ও কতকটা বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি ও অনু-
মানের উপর আবহাওয়া সৃষ্টি সম্বন্ধে জান-
মাত্রিক ঘোষণা করা হয়। উপরোক্ত প্রণালীতে
আবহাওয়ার যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে যে
সমস্ত স্থানের বায়ুর চাপের পরিমাণ একই
বকম সেই সেই স্থানকে এক বর্গ রেখায়
সংযোগ করে নিলে প্রায়ই দেখা যায়, সমস্ত
দেশের আবহাওয়া-চিত্রে দুইটি কি তিনটি
বৃত্ত আঁকত হয়েছে। এর মধ্যে সাধারণতঃ
একটির মধ্যে যে স্থানগুলি গণ্ডীভুক্ত হয়
সেই সেই স্থানগুলিতে বায়ুর চাপ সর্বনিম্ন,
আর তার পরের স্থানগুলির বায়ুর চাপ
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে অন্য আর একটি
বৃত্তের সৃষ্টি করেছে। এই বৃত্তে নিবন্ধ
স্থানগুলির বায়ুর চাপ সর্বোচ্চ দেখা যায়। এর
প্রথমটিকে বলা হয়, বায়ুচাপের নীচস্থ কেন্দ্র
(centre of low pressure or depression)
আর অন্যটিকে বলা হয়, বায়ুর উচ্চ চাপের
কেন্দ্র (Centre of high pressure)।



নেপ্ত্রদেশের আবহাওয়া তথ্যানুসন্ধানী দুইজন
একদলের বাসস্থান। এরোপেনের পাখা

বিজ্ঞানীর মৃতদেহের সম্মানে উদ্ভারকারী
এই বরফের বাসস্থানের জাদুঘর।

আগামী আবহাওয়ার সৃষ্টি কি ধরনের হতে
পারে—তা বলা একেবারেই অসম্ভব যদি না
বর্তমানকালের কার্যপ্রণালীর ধারা মেনে চলা
হয়। একজন রসিক—আবহাওয়া সম্বন্ধে
মন্তব্য করে বলেছিলেন—সবটাইতে আশাবাদী
কে? যে আবহাওয়া বিভাগের ঘোষণায়
নির্ভর করে বর্ষাকালেও ছাটা না নিয়ে বাড়ীর
বাঁহরে যায়।" মন্তব্যের মধ্যে তিক্ততা ও সত্য
অনেকখানি থাকলেও বর্তমান আবহাওয়া
বিজ্ঞানের উন্নতি ও আনুগত্যিক চেষ্টা ও
সফলতা উপেক্ষণীয় নয়।

আমেরিকায় ব্যারোমিটারের পরে টেলিগ্রাফের
আবিষ্কার ও তার দ্বারা সংবাদ আদান-
প্রদানের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এই
সময়েই আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে আব-
হাওয়া বিভাগের ভিত্তি দৃঢ় হতে পারে না।
১৮৫৩ সালে ম্যাথুফ্রন্টেন মারে আমেরিকা
থেকে ইংল্যান্ডে আসেন ও স্বীয় চেষ্টায় জনমত
গঠন করে ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ইংল্যান্ডে আব-
হাওয়া নির্যয় বিভাগের স্থাপনা করেন। সমগ্র
ইংল্যান্ডের বিভিন্ন গ্রামে ও সহরে আবহাওয়া
পর্যবেক্ষণের কেন্দ্র স্থাপিত হয় ও ১৮৬১ খৃঃ
অব্দ থেকে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিক
গবেষণা ও বিচার ও জনসাধারণের সুবিধার জন্য
সম্ভাব্য আবহাওয়ার সৃষ্টির ঘোষণা ও সেইমত
প্রাকৃতিক দুর্য্যপাক থেকে নিরাপত্তার জন্য
সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে
কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিভাগ খোলা হয়।
ভারতবর্ষেও অনুরূপ প্রণালী অনুসৃত হয়।

ভারতবর্ষে আবহাওয়া নির্যয় ও আবহাওয়া
সংক্রান্ত ঘোষণার জন্য দুইটি কেন্দ্র আছে।

পূর্বোক্ত কেন্দ্রটি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক
দুর্য্যোগের লীলাভূমি—ঝড়, বজ্রঝড়, প্রবল বায়ু-
(৩১১ পৃষ্ঠায় প্রদর্শন)

নাটকীয় কথা

(২২ পৃষ্ঠার পর)

সেই মার খাইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দেয় তখন আমরা কাঁদিয়া আকুল হই। অনেক সময়ে 'সাদু' বা 'ভালমানুষ' অর্থে 'স্বার্থবৃদ্ধিহীন' ভাববিহীন পুরুষই বুদ্ধিতে হইবে—অর্থাৎ, অতিশয় শক্তিহীন মানু্য। যে আদৌ আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়, সেও একরূপ মহাপুরুষ; এই মানু্যই যখন জীবনধর্মলঙ্ঘনের জন্য উপযুক্ত শাস্তি পায়, এবং যখন তাহার চরিত্রের নিদারুণ দুর্বলতা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়—সে যখন একই দুর্বলতার বশে উন্মাদ হইয়া আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপনি ক্ষতিবিক্ষত করিতে থাকে (যেমন 'প্রফুল্ল' নাটকের 'যোগেশ') তখন আমাদের ভাববিহীনতার অন্ত থাকে না—এই self-pityই আমাদের উৎকৃষ্ট ট্রাজিডি-রস। পুরাণ-প্রথিত অবতার-রূপ 'পুরুষকেও আমরা শক্তিমান 'চরিত্র'রূপে পূজা করিতে পারি না—ভাবের অগ্র-স্লাবনে তাহাকে মৃৎপুতুলের মত বিগলিত করিয়া না তুলিলে আমাদের নাটকাত্মনয় সার্থক হয় না। ইহা ছাড়া, আধ্যাত্মিক আদর্শ আছে—পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুণ্ডরাক আছে, ভাব-ভক্তির প্রবল বন্যা আছে—এ সকলের তুলনায় জীবন বলিতে যাহা বৃক্ষায় তাহা তুচ্ছ; সে রহস্যভেদ করিবার শক্তিও আমাদের নাই, প্রবৃত্তিও নাই—আমাদের জাতীয় সংস্কারই যেন তাহার বিরোধী।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিদেশীয় অনুকরণে আমরা রঙ্গমণ্ড নির্মাণ করিয়াছি। যে জীবন হইতে ওখানে যে নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছে—আমাদের জীবন সরুপ নয়, তথাপি সেই নাটকের আদর্শে আমরা নাটক রচনা করিয়া থাকি। এককালে আমাদের করিবার ক্ষমতা মহাকাব্য লিখিয়া মহাকাব্য আখ্যাত করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, অর্থাৎ, কুমড়ার গাছে নারিকেল ফলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—সেইরূপ যাত্রাগানের আসরেই আমরা বলিভাষী থিয়েটারের মাচা বান্ধিয়াছি। নাটক যদি জীবনেরই সাক্ষ্যে আভিনয়িক রূপ হয় তবে আমাদের জীবনই যেমন আমাদের নাটকের দৃশ্যবস্তু হইবে, তেমনই আমাদের নাটকের আকৃতি-প্রকৃতিও স্বতন্ত্র হইবে; যে ছাঁচে যুরোপীয় নাটক গড়িয়া উঠিয়াছে সে ছাঁচে আমাদের নাটক গড়িলে তাহার styleই ভুল হইবে, অতএব তাহা সার্থক সৃষ্টি হইবে না। আমি খাঁটি নাটকের যে আদর্শ ধরিয়াছি—তাহাতে জীবনের যে রূপটির উপলব্ধি চাই, তাহার চেতনাই যদি আমাদের সংস্কারে সহজ না হয়, তবে যুরোপীয় আদর্শে আমরা যে রঙ্গমণ্ড খাড়া করিয়াছি, এবং যেসকল চরিত্র ও অভিনয় তাহাতে যুক্ত করিয়াছি—সে সকলই বাধা হইতে বাধ্য; 'প্রহ্লাদ চরিত্র' বা 'বিশ্ব-মঙ্গলোৎসব' মত নাটক যে বিশুদ্ধ নাটক হইতে পারে না, ইহা স্বেচ্ছাসিদ্ধ। আমি গল্পের কথাই বলিতেছি না—গল্প যেমনই হোক, তাহাকে নাট্যরূপ দেওয়া যায় কিনা, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র; কিন্তু যাহা মূলে একটা ভাব-জীবন মাত্র, যাহাতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা প্রকৃতিগত প্রাণধর্মের প্রেরণা নাই, তাহাকে যদি অভিনয়-বস্তু করিয়া তোলা হয়, তবে তাহা নাটক নয়—দৃশ্যকাব্য; তাহা গোড়া হইতেই একটা ভাবরসের গীতঃসংহা—তাহাতে যে ঘটনাদুলি ঘটে, তাহা প্রমুখ প্রাণশক্তির কারণে ঘটে না; তাহাতে বাহিরের সংগে, বাস্তবের সংগে, কোন সংগ্রাম বা সংঘর্ষ নাই; 'চরিত্র' বলিতে পূর্বে যাহা বলিয়াছি, সেখানে সে বস্তুই প্রয়োজনই হয় না। ভাবোদীপনাই যাহার একমাত্র অভিপ্রায় তাহাতে মানুষকে এক একটি ভাবের গ্রন্থিরূপে সাজাইয়া লইলেই হয়; অর্থাৎ বীর, কবর, হাস্য, প্রভৃতি কতকগুলি রসকে মানুষের মত পোষাক পরাইয়া রঙ্গমণ্ডে নাচাইতে পারিলেই হইল। কেবল পৌরাণিক নাটকই নয়—আমাদের সকল নাটকই—সামাজিক, পারিবারিক, ঐতিহাসিক—এইরূপ ভাবপ্রবল মেলোড্রাম। আমি থ্রেব আধুনিক নাটকের কথা বলিতেছি না।

এইরূপ না হইয়া উপায় নাই, কারণ, আমাদের দেশের দর্শক-আছে—যাহাতে জগৎ ও জীবনের দুঃখের রহস্য বিদ্যুৎচমকের মত ঝলসলি আর কিছুতেই সাড়া দিবে না—দিতে পারে না। তাহা

হইলে, নাটকের আদর্শ যেমনই হোক—নাট্যকলা ও নাট্যরসের মূল প্রেরণা যেমনই হোক, যেহেতু নাটক যুগের প্রভাব, জাতির চরিত্র এবং সামাজিক সংস্কার এই ত্রিদোষকে আশ্রয় না করিয়া পারে না—সেই হেতু আমি নাট্যরসের যে তত্ত্ববিচার করিয়াছি, সেই তত্ত্বই অধীন করিয়া দেখিলে, একদিকে যেমন খাঁটি ও উৎকৃষ্ট নাটকের বড় অভাব ঘটিবে—আর একদিকে তেমনই কেবল বহুজনের মনোহরণ করিয়াছে বলিয়াই বহু নাটকের সার্থকতা স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমটির কারণ বুদ্ধিতে পারা যায়—পূর্বের আলোচনাতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সে কারণ এই যে, এরূপ খাঁটি জীবনরস-রসিকতার অনুকূল অবহাওয়া মানবসভ্যতার ইতিহাসে ও ভাষিত জীবনে ক্রিচ্ছ সুলভ হইয়া থাকে। বাহিরের অবস্থার সাহিত্য অন্তরের এরূপ রসাবস্থার যোগাযোগ একটা বড় মাহেশ্বরমুগ্ধেই সম্ভব—সে যেন মৃত্তা ও স্মৃতি-নিক্ষিপ্তি প্রবাদের মত। তবু ওই প্রবাদও এক অর্থে সত্য; এমন অনেক বস্তুই আছে যাহা অনুকূল দেশ-কাল-পাত্রের সংযোগেই সম্ভব হয়, এজন্য তাহা দুলভ হইতে বাধ্য। তথাপি, একবার যদি তাহা কোথাও হইয়া থাকে, তবে তাহাকেই আদর্শ বলিয়া মানিতে হয়, এবং পরে আর কোথাও ঠিক তেমনটি না হইলেও, সেই আদর্শের মানদণ্ডেই সেই জাতীয় বস্তুর উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার আদৌ অসঙ্গত নয়। ইহাও সত্য যে, এক একটা জাতি এক এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছে—তেমন আর কেহ করে নাই; এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। তথাপি জাতি ও যুগকে বাদ দিয়া সেই শ্রেষ্ঠত্বের জানটুকু আর সকলের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাড়ায়। নাটকের ব্যাপারেও তেমনই, প্রাচীন গ্রীক, অর্বাচীন ইংরাজী বা স্পেনীয় নাট্যকলা নাট্যরসের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে তাহা সার্বভৌমিকতা দাবী করিতে পারে—উৎকৃষ্ট নাটক যে কি বস্তু তাহার দৃষ্টান্ত ঐ নাটকগুলির মধ্যে মিলিয়ে।

দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। সত্য বটে, দর্শকচিত্তে সম্যক সাড়া জাগাইতে পারিলেই নাটক এক হিসাবে সার্থক। এজন্য যুগ ও জাতির বিশিষ্ট রস-চেতনার দ্বারা সকল নাটকেরই অভিনয়-সাফল্য একরূপ সীমাবদ্ধ। যুগের স্বাভাবিক বটু—কারণ এক যুগের রুচি ও রস-সংস্কার অন্যথায় পরিবর্তিত হইয়া থাকে। তথাপি, জীবন-রসরসিকতা যদি সুস্থ ও সবল থাকে, তাহা হইলে বাহিরের উপকরণ ও সাজসজ্জাই নূন হওয়া আবশ্যিক—প্রাচীন নাটকের ঐগুলিই বাধা দাড়ায়, ভিতরের রসপ্রেরণার কোন পরিবর্তন হইবে না। এইরূপ রসপ্রেরণাহীন নাটকও যদি অতিশয় জনপ্রিয় হয়, তাহাতে কেবল ইহাই প্রমাণ হয় যে, তাহা সাময়িক রুচি ও রসবোধের বড় উপযোগী হইয়াছে, এবং ঠিক সেই গুণে তাহা নাটক হিসাবে সাধারণভাবে সার্থক হইয়াছে। কিন্তু সেই কারণেই তাহা উৎকৃষ্ট নাটক নহে। যদি সেই অভিনয় সাফল্যের মূলে খাঁটি নাটকীয় রস না থাকে, তবে সাময়িক রুচি ও রসবোধের তৃপ্তি সাধন করিয়া সে নাটক অচিরেই কালসঞ্চিত অবজ্ঞা-নাশার দাবী করিয়া যাইবে; সে নাটক সাহিত্যিক রস-সৃষ্টির অমরত্ব দাবী করিবে না—রঙ্গমণ্ড হইতে বাহির হইয়া শাস্তব সারস্বত চক্রে আরোহণ করিবে না।

আমাদের এ যুগের সাহিত্যে আমরা বহুবিশ্ব রস-রূপ সৃষ্টি করিয়াছি—বাঙালীর কবিপ্রতিভা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু নাটকীয় রস-সৃষ্টিতে আমাদের প্রতিভা সত্যি হার মানিয়াছে। একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, এ পর্যন্ত আমরা এমন একখানিও নাটক সৃষ্টি করিতে পারি নাই, যাহা রঙ্গমণ্ডে সাময়িক প্রতিভা ব্যতীত আর কোনরূপ গৌরবের অধিকারী হইয়াছে। বাঙালীর নাট্যরসপিপাসা এ পর্যন্ত অতিশয় অসংযত ভাবোচ্ছ্বাসের মেলোড্রামেই চরিতার্থ হইয়াছে। এমন একখানি নাটক আমাদের নাই যাহাতে মানব-চরিত্র

ক্যালকাটা ন্যাশনাল

ব্যাংক লিঃ



হেড অফিস : ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংক বিল্ডিংস
মিশন রো, কলিকাতা।

“ক্যালকাটা ন্যাশনাল” প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার বিপুল আর্থিক সংগতি জমার টাকা সম্পূর্ণ নিয়াদপূর্ণ এবং সমগ্র ভারতবাসী শাখা প্রশাখা ও বহু বসরের অভিজ্ঞতা ব্যাংক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ নিতর্যযোগ্যভাবে সুসম্পন্ন করে।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, লাহোর ও দিল্লীতে
এবং নিম্নলিখিত স্থানে এই ব্যাংকের শাখা অফিস আছে :-

কলিকাতা	অমৃতসর	আগ্রা	কলকাতাবী
ক্যানিং স্ট্রীট	মেশিন রোড	মীরাত	(বোম্বাই)
বড়বাজার	(নাগপুর)	বেরলী	আমেদাবাদ
শ্যামবাজার	পানিনা	লক্ষ্মী	নাগপুর
ভবানীপুর	গয়া	আমিনাবাদ	ইটওয়ারী
বালীগঞ্জ	কটক	(লক্ষ্মী)	(নাগপুর)
ঢাকা	এলাহাবাদ	আজমীর	বায়পুর
ময়মনসিংহ	কটক	আমরাবতী	জম্বলপুর
নারায়ণগঞ্জ	(এলাহাবাদ)	(বেরলী)	জম্বলপুর ক্যান্টনমেন্ট
চট্টগ্রাম	বেনারস		

কারেন্ট একাউন্টস : শতকরা বার্ষিক চারি আনা হারে সুদ দেওয়া হয়।

সেভিংস ব্যাংক একাউন্টস : এই ব্যাংকের সেভিংস ব্যাংক একাউন্ট খুবই জনপ্রিয়।

শতকরা বার্ষিক ১২% টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।

এইচ. সি. সরকার,
জেনারেল ম্যানেজার

তথা মানব-নিয়ন্ত্রিত উদ্ভাটনে সেই স্থির-গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে—যাহাতে জগৎ ও জীবনের দুজোঁর রহস্য বিদ্যোৎসবের মত উদ্ভাসিত হইয়া বাস্তব অনুভূতিকেই একটি অপূর্ণ রসে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। জীবন-সত্যকেই এমন রস-সত্তা করিয়া তোলা শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার কাজ—এই জন্যই একজন নাট্যকারই জগতের শ্রেষ্ঠ কবি। আমাদের জাতির পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই কেন, এই আলোচনা হইতেই তাহা কতকটা হৃদয়গম্য করা যাইবে। একদা দুঃখ করিয়া লাভ নাই—কারণ, যে গাছে যাহা ফুটিবার তাহাই ফোটে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, আমরা উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়াছি এবং আমাদের এক নাট্যকার সেন্স-পীয়ারের চেয়ে বড়, এইরূপ আশ্চর্য্য করিলে এবং সেই আশ্চর্য্যে রাসিকভাষিনী ব্যক্তি-গণও যোগদান করিলে, তাহা শৃঙ্খল হ্রাসকর নয়—বৎসরোদ্ভাসিত লজ্জাকর হইয়া থাকে। বাঙালী অনেক কিছু পারিয়াছে এবং আরও অনেক কিছু পারিবে, কিন্তু নাটক রচনার পক্ষে আমাদের জাতীয় চরিত্র ও বহুকালাগত সংস্কার এমনই যে, ভবিষ্যতেও আমরা তাহাতে সম্মান সফলতা লাভ করিব কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ফায়ার এণ্ড জেনারেল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

হেড অফিস : ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাংক বিল্ডিংস
মিশন রো, কলিকাতা।

ডিরেক্টর বোর্ড :

- শ্রীযুক্ত এস. এন্. ভট্টাচার্য, চেয়ারম্যান
- শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, এম্. এল্. এ
- শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র সরকার
- শ্রীযুক্ত অজিতকুমার সোম
- শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

“ফায়ার এণ্ড জেনারেল” একটি সম্পূর্ণ

ভারতীয় প্রতিষ্ঠান

সকল প্রকার অগ্নিবীমার কার্য অতি দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয়।

টেলিফোন : ক্যালকাটা ৭০৬৭

এইচ. এন্. চ্যাটার্জি, বি. এল.
সেক্রেটারী।



সর্বত্র সমস্ত দোকানে
পাইবেন।

পেনম্যান ইঙ্ক

কোং

৬৮, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা

দৈনিক
আনন্দবাজার পত্রিকা।
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত
জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র

চাঁদার হার —

সডাক বাৎসরিক—৪৮,
.. যার্মাসিক—২৫,
.. ট্রেমাসিক—১২।

অর্ধ-সাপ্তাহিক
আনন্দবাজার পত্রিকা।

যেখানে দৈনিক ডাক পৌঁছে না, সেখানে দেশের
খবর পাইতে একমাত্র নিভাঁরযোগ্য সংবাদপত্র।
প্রতি বৃহস্পতি ও রবিবারে প্রকাশিত হয়।

সডাক বাৎসরিক—১২,
.. যার্মাসিক— ৬।
.. ট্রেমাসিক— ৩।

দেশ

বাংলায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত—সাপ্তাহিক
সাহিত্য পত্রিকা। রচনা, প্রবন্ধ, গল্প সম্ভারে
সমৃদ্ধ।

প্রতি সংখ্যা—৩০ আনা
.. সডাক বাৎসরিক—১০,
.. যার্মাসিক— ৫,

প্রাপ্তিস্থান :

১নং, বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা

বঙ্গ-ভঙ্গ !

আবার হবে !!!

বিগত দিনের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রচেষ্টার প্রতিবাদে বাঙালী যে
আন্দোলন করেছিল তার মূলে ছিল আনন্দমঠের ঋষি

বঙ্কিমচন্দ্রের

বন্দে-মাতরম্

সঙ্গীত

আজ বাঙলার ঘরে ঘরে বাঙালীর সেই প্রতিবাদকে
জাগ্রত করতে রয়েছে — সেই গানের প্রতিধ্বনি

আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের

প্রচেষ্টায় প্রস্তুত

প্রাণ মাতানো সুরে ভরা

‘বন্দে-মাতরম্’

সংগীত-রেকর্ড

(১২" ইন্ডি ডবল সাইড রেকর্ডে গৃহীত)

সুপ্রসিদ্ধ সুরশিল্পী তিমিরবরণের পরিচালনায়

এ গান গেয়েছেন বাঙলার সুকণ্ঠ চারণন্দ

এ গান আবার ঘরে ঘরে ধ্বনিত করুন।

প্রাপ্তিস্থান :

দি মেগাকোন কোম্পানী

৭৭-১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

দি ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
ওয়ার্কস্, লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস :

৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

কারখানা

১১৯নং গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, বেলুড় (হাওড়া)।

ফোন—হাওড়া ৯৩৬

সর্বপ্রকার ঢালাই করা, রোল করা জিনিষ, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি,
মেশিনের অংশ ও মেশিন ইত্যাদি প্রস্তুত করাই আমাদের বিশেষত্ব।

গ্যালভানাইজিং ও ইলেক্ট্রিক গ্যাসওয়েল্ডিং-এর কাজও করা হয়।

কে. এন. দালান,

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বিজ্ঞানীর মেঘদূত

(৩০৭ পৃষ্ঠার পর)

গু, বারিপাত ও আকাশে মেঘের ঘনঘটা এই দৃশ্য দেখা যায়। এই দূর্যোগ-কেন্দ্রের যাত্রাপথ নির্দিষ্ট হ'বে, গতি কতটা, কোন্ কোন্ দিক এরা প্রভাবান্বিত হ'বে তারও ন্যূন প্রতিনিধির আবহাওয়া চিত্র থেকেই প্রত্যাশা করা যায়। প্রায়ই দেখা যায়, যেখানেই এই কেন্দ্রের সংগঠন সেই স্থানের বায়ু অচঞ্চল, আকাশে মেঘের ঘটা আর এই কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘর্ষিত বায়ুর বেগও বেশী ও বৃত্তাকারে ঘূর্ণিত হয়। কেন্দ্রের মধ্যস্থিত স্থানের বায়ুর গতি কম থাকায় কোন কোন অসুস্থ ব্যক্তির রোগের যন্ত্রণা হয়, পশু ও পক্ষীকুল চঞ্চল হয়ে উঠে। সেই স্থানের লোকেরা বায়ুমণ্ডলীয় এই অচঞ্চল নির্বাহিত, নিষ্কম্প অবস্থা দেখে কেন্দ্রের পূর্বে লক্ষণ অনুমান করেন। যেদিকে এই দূর্যোগ-কেন্দ্রের গতি হয়, সেই দিকে কেন্দ্রের পুরোভাগে তরল জলীয় মেঘ সূর্য বা চন্দ্রের এক রকমের স্থান আভার সৃষ্টি করে। এই কেন্দ্রের পুরোভাগে যদি কোন পর্বতমালা থাকে, তাহলে এই সব মেঘগুলি তাদের শিখরদেশে আগ্রহ গ্রহণ করে। স্থানীয় আবহাওয়া সম্পর্কে নানারকম প্রত্যাশিত কিসন্দন্তীর মূল কথা ইহাই।

বায়ুর উচ্চ চাপের কেন্দ্রের অবস্থা ঠিক বিপরীত। যেখানে এই কেন্দ্রের স্থিতি পাওয়া যায়, সেই সেই স্থানগুলিতে ও তাহার চতুঃপাশের স্থানগুলিতে নির্মল আবহাওয়ার সমুদ্র হয়।

আবহাওয়ার বিজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও তথ্য গবেষণা ও বিচার, অনুমান ও ঘোষণার মোটামুটি প্রণালী এই। এর সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিচার দেশের আবহাওয়ার অভিজ্ঞতা ও আবহাওয়ার প্রতিফলিত চিত্রের গঠনের পদ্ধতিপদ্ধতি পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে। এইজন্য পৃথিবী-পৃষ্ঠের পর্যবেক্ষণ (Surface observations) ছাড়াও পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের (Upper air observations) তথ্য দরকার হয়। পৃথিবীর উপরে প্রায় ছয় মাইল পর্যন্ত যে অংশ, তাকে বলা হয় 'ট্রোপোস্ফিয়ার'। পৃথিবীর বাসিন্দাদের কাছে বায়ুমণ্ডল বস্তু বিদ্যে মেঘ বৃষ্টি সবকিছুইই। আবির্ভাব ঘটে, এই ট্রোপোস্ফিয়ার থেকে। এই অংশের বিভিন্ন স্তরের আবহাওয়ার সংবাদ নেওয়া হয় বেলুন, ঘড়ি প্রভৃতিতে সংযুক্ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে। বর্তমানে এই উচ্চস্তরের আবহাওয়ার সংবাদ সর্বশেষ প্রয়োজনীয়। আধুনিক

বিমানচালনার যুগে পৃথিবীর কত উপরে কি আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে জানা থাকলে চালক তার বিমান সেইভাবে চালনা করে বা সাবধান হয়। আজকাল শত্রুপক্ষের বিমানহানার জন্য অনেক সহরেই 'বেলুন ব্যারিজের' সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সময়ে এগুলিকে অতি উচ্চ উঠান অবস্থায় দেখা যায়, এর অর্থ এই নয় যে, শত্রু বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। অনেক সময় পৃথিবী পৃষ্ঠের বায়ুর স্রোত অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের বায়ুস্রোত অপেক্ষা প্রবল থাকায় এইগুলিকে উচ্চস্তরে নিরাপত্তার জন্যই তোলা হয়।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়ার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতবর্ষের মধ্যেই বিভিন্ন প্রদেশের আবহাওয়ার রীতিনীতি বিভিন্ন। বাংলাদেশে কালবৈশাখী এক বিশিষ্ট সময়ের বিশেষ প্রাকৃতিক লীলা যা পাশাপাশি অন্য স্থানে দেখা যায় না। এর উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক রকম মতবাদ গড়ে তোলবার চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশে মাঝে মাঝে যে প্রবল ঝড় বা ঘূর্ণিবাত্যার প্রাদুর্ভাব ঘটে তার প্রায় সমস্তগুলিইই উৎপত্তিস্থল বঙ্গোপসাগর। যুদ্ধের পূর্বে বর্মার কতকগুলি স্থান থেকে ও বঙ্গোপসাগরস্থিত জল-যান থেকে আবহাওয়ার সংবাদ আসতো। ফলে ঝড়ের কেন্দ্রের (storm centre) গঠনের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার স্থানকাল গতি-পথও স্ফাভাবের পরিচয় পাওয়া যেত ও সেই মত বন্দর, জাহাজ ও ভূভাগের লোকজনকে ঝড়ের সম্পর্কে রেডিও ও টেলিগ্রাফের সাহায্যে সংবাদ দিয়ে সতর্ক করা হ'ত। এই সকল ঝড়ের কেন্দ্র সতর্ক না মিলিয়ে যাত্রা ততক্ষণ তাকে মানচিত্রে উপরি উক্ত প্রণালীতে এনে সতর্ক দৃষ্টিবন্দী করে রাখা হ'ত। এদের বিশেষত্ব ছিল বঙ্গোপসাগর থেকে যখন ভারতবর্ষের কোন ভূখণ্ড এসে পৌঁছাত সেখানে এসেই হয় অতি ক্ষিপ্ৰগতিতে ভূভাগের উপর দিয়ে ঘুরে মিলিয়ে যেত, আর না হয় ক্রমশঃ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যেত। পূর্বাঞ্চল অবস্থায় যথেষ্ট সতর্ক হবার আগেই লোকজন, পশু ও ধন সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হয় যেত। কিছু দিন পূর্বে যে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা মেদিনীপুর অঞ্চলের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে গেছে তার অন্যতম প্রধান কারণ সম্ভবতঃ ইহাই। আমাদের দেশে শীতকালে এক ধরনের আবহাওয়া দেখা যায়। এটিরও রীতিনীতি এই দেশেরই

বৈশিষ্ট্য। শীতকালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এক ধরনের বায়ুচাপের কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবহাওয়া বিভাগ এর নাম দেন "উত্তর-পশ্চিম দেশের চঞ্চলতা" (North-Western disturbances)। এই "চঞ্চলতার" কেন্দ্র প্রায়ই বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হয়। এর পুরোভাগের স্থানসমূহের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, অল্প বিস্তার বারিপাতও হয় ও শীতের পরিবর্তে একটু গরমের আবির্ভাব হয়। এই কেন্দ্রের পশ্চাতে আকাশ নির্মেঘ হয় ও শীতের প্রকাশপও বৃদ্ধি পায়।

আবহাওয়া তত্ত্ব যে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হ'তে পারে না তার কারণ অনেক। অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পৃথিবীর একদিকে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় অনেক সময় পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠস্থিত স্থানগুলির আবহাওয়া তাদেরই দ্বারা প্রভাবিত হয়। অনেকে মনে করেন, ভারতবর্ষীয় আবহাওয়া অনেক অংশে দক্ষিণ আমেরিকার আবহাওয়ার দ্বারা সর্বশেষ নিয়ন্ত্রিত হয়। মধ্য ইউরোপের আবহাওয়া উত্তর মেরুর বিশাল ভূযাত্রাচ্ছন্ন স্থানের ভূমির পাতের কবরেশীর উপর নির্ভরশীল। ইংল্যান্ডের আবহাওয়া অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। তার কারণ, এর একদিকে আছে সুবিশাল ভূখণ্ড আর অন্যদিকে আছে বিশাল আটলান্টিকের জল-রাশি। বিজ্ঞানীগণ মনে করেন, আবহাওয়া সম্পর্কে নির্ভরশীল ও নির্ভুল তত্ত্ব গড়ে তুলতে হ'লে সেই দেশ বিশেষের আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণের তথ্যই যথেষ্ট নয়—পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের ও উপরিভাগের সমস্ত স্থানের আবহাওয়ার সংবাদের প্রয়োজন। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এই দুই স্থানের আবহাওয়াই সমগ্র পৃথিবীর আবহাওয়ায় সমষ্টিগতরূপে অক্ষপাতিস্তর প্রভাবান্বিত করে। এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীর অভিযান ছল সুরু। গৃহবাসী বিজ্ঞানী স্বচ্ছ স্বচ্ছন্দ্যের শেষ করে সেদিয়ে পড়লো অজানার সম্মুখে প্রাণক তুচ্ছ করে। বিজ্ঞানের বৈদ্যমন্ডলে এদের দেহ ও প্রাণ দিয়ে পূজা বিফল হয় নাই। দুর্জয় দুর্দম মেরু প্রদেশে পৃথিবীর উপরি-স্থিত বায়ুস্তরও বিজ্ঞানী তার অভিযান সফলতার সঙ্গে শেষ করেছেন। মানবতার কল্যাণে এই দরদী, নির্ভীক, সর্বত্যাগী বিজ্ঞানীর সাধনা যুগে যুগে যে সাফল্যমণ্ডল হ'য়েছে। সেই সফলতা মানবের কল্যাণের জন্য নিয়ন্ত্রিত হোক—তার ধ্বংসের জন্য নহে



কে ঐ নারী! যার মুখে বিষাদের ছায়া, চোখে অশ্রুধারা, আজ
এই আনন্দের দিনে যার বুকভরা বেদনা। এই সেই হিন্দু বিধবা
নারী যার সম্বন্ধে কবি 'হেমচন্দ্র' কলিয়াছিলেন,—

“সোনার প্রতিমা গড়ে বিধবা নারীর
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারতভূমির
বিদেশের স্ত্রী-পুরুষ এদেশে আসিত,
পাতিব্রতা বলে তারে নয়নে হোরিত”।

ভগবান ইহার প্রতি বিমুখ, কিন্তু মানুষও ইহার প্রতি বিমুখ
কেন? ইনি ত কোন দোষে দোষী নহেন। সমাজ ইহার কি
প্রতিবিধান করিতেছে? বিধবার উপর সমাজের নিষ্ঠুর শাসন
আজও কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই।

সামাজিক নিষ্ঠুরতা ত আছেই—তদুপরি যদি আর্থিক
অভাব দেখা দেয় তবে ত অসহায় বিধবা নারী নিজের এবং
পুত্রকন্যার প্রতি কর্তব্য পালনে অসমর্থ। তবে সুখের বিষয়
আজ এই যে আর্থিক অভাবলাঘবে জীবন বীমা চেপ্টা করিতেছে।
জীবন বীমা আজ এই বিধবার ভবিষ্যতের নিরাপত্তা—
পুত্রকন্যার শিক্ষা ও বিবাহের ভার গ্রহণ করিতেছে।

আমরা জীবন বীমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

৫নং সাদার্ন এভিনিউ, কলিকাতা।

--পূজার ছুটিতে পড়িবে--

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় .

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর

কর্তৃক রচিত

রূপবাণী

সহজ সরল ভাষায় রচিত — নতুন ধরণের
টাইপে মুদ্রিত — পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিচিত্রিত—
আট/দশ বৎসরের ছেলেনমেয়েদের পড়িবার
উদ্দেশ্যে রচিত — এমন ধরণের বই
পূর্বে আর বাহির হয় নাই।

—মূল্য প্রতি খণ্ডে দেড় টাকা—

—(০)—

—বাঙলায় বিশ্ববাস্যহিতের সেরা বই—

রোবিন হুড—১১০ বেনহুর—১১০

হিউগোর ছানচুবাক অফ নবরদাম—১১০

লিও টলস্টয়ের ছোটদের গল্প—১১০

লাস্ট ডেজ অফ পম্পাই—১১০

শেক্সপীয়ারের ট্রাজেডী—১১০

শেক্সপীয়ারের কমেডী—১১০

আংকল টম্‌স কেরিন—১১০

গালিভারস ট্র্যাভেল্‌স—১১০

এন্‌ডারসেনের গল্প—১১০

লা' মিজারেব্ল্‌স—১১০

ডন কুইকজোট—১১০

—আরো কয়েকখানি ভালো বই—

লাল ফোজের কাহিনী—১,

লেনিন—১০ টোলিন—১০ ডরোশিলড—১০

ট্রট্‌স্কী—১০ চার্চিল—১০

জওহরলাল—১,

যুগে যুগে—১০ মোসলেম জগৎ—১,

নতুন যুগের নতুন মানুস—১১০

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী—১১০

আবিস্কারের কথা ও কাহিনী—১১০

মোসলেম জাতির কর্মবীর—১১০

খ্রীষ্ট জাতির কর্মবীর—১১০

মেবারের বীর তনয়—১১০

রুশ জাতির কর্মবীর—১১০

ছেলেদের একাঙ্ককা—১১০

বিজ্ঞানের আবিস্কার—১১০

বিজ্ঞানে সপ্তর্ষি—১,

= প্রাপ্তস্থান =

ইউ, এন্‌, ধর প্ল্যান্ড সন্‌স লি:

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা



দাদামশায়ের উপহার

দাদামশায়ের উপহার
একদিনে দিবে ছবি হতে কখনও
এই দাদামশায়ের দোষ example,
মতের বসন্তের দোষের example!
দাদামশায়ের হতে উত্তীর্ণ
যখন পাকিবে ছবি, হতে হতে জীবন!

দাদামশায়



কার কার লেখা আছে?

রবীন্দ্রনাথ, জবনীন্দ্রনাথ, দীপকরঞ্জন, নিশিকান্ত সেন, সুনীল বসু, অখিল নিয়োগী,
স্বর্ননন্দ রায়চৌধুরী, কল্যাণ বসু, গজেন্দ্র মিত্র, বিমল ঘোষ, ফটিক বসুমণ্ডল, বীণা
দেবী, বসন্ত আলি মিত্র, সারোজ রায়, ধীরেন বসু, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অনোজিৎ বসু।

ছবি একেছেন

শিলাপী সমর দে, সুনীল ভট্টাচার্য, শৈল চক্রবর্তী, জ্যোতিষ সিংহ, ধীরেন বসু, অমর দে,
কামিনী সেন, কল্যাণ সেন ও দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

হেতুদের সকলের পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ—
এই দাদামশায়ের দোষের একদিন
ওপরের এ ছবি ও কবিতা উপহার
দিয়েছিলেন। আর শ্রীমদ্রম্যোজ দেবী,
সৌভদ্রা দেবী হেতুদের পুত্র উপহার
হিসাবে প্রকাশিত হল। 'সৌম্য'।





স্বপ্ন

স্বপ্ন

এরে অ আ ক কা তালে বেড়ালে হুস্মী দীঘী হুস্মী দীঘী
রি লী এ ও ও কেউ কেউ এনো সেটা জানো কেউ।

জানি জানি কেও কেউ নয় ওটা—

মোটাগোটা হবে কেউ

রাশভাঙ্গী!

খবরদারি বড়ভারি কেউ

ওরে লী, ওরে লী।

কাঁকোটা মাকোটা

জলহাওয়ার কাপোটা

রাত এখন বতোটা, রাত হ'লে বারোটা।

সুখপাল ওটা, পার্শ্বিক ওটা, মার্শিক ওটা

কোইট জেগে নাই কেউ

আরে লী, ওরে লী।

স্বরে অঃ স্বরে অঃ হুস্মী দীঘী হারনা, কাশনা কাশনা, মালনা
করে না খসে যা দেহেরা ছাড়া

মুখনা মজনা

কিটিকিলা মুখনা মালনা কনা

এরে ওটা, কেও কেউ, নয় কেউ।

কাঁক ভুসুজা বকাত কা

পাখ ময়না কপোতা না

বকবকায় বকম পায়রা

জক পোক হাজক

এরে অ আ ক কা

স্বপ্ন

স্বপ্ন

এক

রাজকনো।

রোদ ঝলমল দিনে ময়ূরপঙ্খীতে হাসেন।
রাজকনো জেগে না ঘুম খসে রাত শূন্যপঙ্খীতে আসেন।
রামধনুর রং পুস্মী। সাতমহলের পর দুখসায়র। দুখসায়রে
রাজকনোর দুখ ধবধব শ্বেত মহল।

হাঁরের খাটে পা, সোনার বরণ বেশ,

কুঁচবরণ গা, কাজলছায়া বেশ,

কুলহাসন খাটে রাজকনো ঘুমান।

আর, রাজকনোর পুতুলেরা ঘুমা মগি মগিকোর লোলা।

কুরুর বাতাসে জেগে না হেসে লুটীপুটী... রাজকনো,
রাজকনো! ঘুমে না, খেলবে? না, খেলবে না ঘুমে?

রাজকনোর কাজলছায়া কেশে বাতাসের কচি আঙলে। চোকের
পাতার জেগে না কচি আঙল। শূড় শূড় শূড় শূড়! রাজকনো
আশ্বে স্বপ্নে চোকের পাতা মেলে। ওমা!

ভুলভুল, মুখ

দুলদুল, গা,

ঝিলঝিল বুক

উড়, উড়, পা,

"কারা হো, কারা হো"

"আমরা?"

ঘুমের ঘোর পাহারা?"

কোনার ঘুমের ঘোর চোক মেলে রাজকনো। মেলে
দুখসায়রে এক শ্বেতপঙ্খী।

দুজনে বলে, "রাজকনো, রাজকনো,

দুখসায়রে— চেউ,

যাবে না তো কেউ?"

যাবে না? যে হও সে হও, শ্বেতপঙ্খী ফিরে যাবে! উঠে
রাজকনো তাজাতিক সিঁথিপটি কাটেন, জোলন শাড়ী পরেন
নুপুরপায়ে হাঁটেন।

বুণ, বুণ, বুণে

চলেন।

দুই

শ্বেতপঙ্খী চলে ঘোঁ ঘোঁ সে।

দুখের চেউ দুখ, মেঘের চেউ চুর, অমরেশের চেউ কুরকুর,
শ্বেতপঙ্খী শ্বেতবাজে এসে পড়ে। শ্বেত নদীর সৈতি
চিক্ চিক্ চিক্।

"হায়া!" টুকটুক আঙল গালে, খেঁখেঁ রাজকনো বলেন,

"কি যে করলেম!"

দু বোনের চমক, "কি, কি? রাজকনো, কি?"

রাজকনো ছুপ। কোলে দুখান হাত, না কথা না কিছু,
বলেন, "এলেম তো, মিছে! খেলব কিসে?"

"কেন রাজকনো, কেন?" থমকে দুজন।

"ভুলেমে রঙী পুতুল, ভুলেমে সগী পুতুল, ভগী, তরগী,
অত পুতুল, তা-ও আমলেম না—বোনা!"

"রাজকন্যা, রাজকন্যা!" হেসে ওঠে দ. বোন,
 "মাগি মাগিকের দৌলনা
 থাকে থাক্ তোলনা,
 ভুলেছি তো ভুলেছি।
 কোথায় যে এনেম,
 জানে
 রাজার কি?"

তিন

রাজকন্যা অবাক!

চলেন, আকাশে নেই চাকনা, চোকে মেঘে পাহারা, চাঁদের দেশ!

শেবতপস্বী ঘাটে ফিড়ে। আর, বর্ষাভে সুর!

বলো চলে পাহার, পাহাড় ওড়ে ঢাকায়, কুণ্ডলা হেসে
 জোনাক্ জ্বলে।

রাজকন্যা এদিকে চান, ওদিকে চান; রাপোলী বন, হীরেলী
 ফল, ক্ষীরের সায়র টল্ টল্, ক্ষীরের মাছ, কুণ্ডলার নাচ।

দুধেবান বলে, "রাজকন্যা, নামের"

নামেন, আলপনায় ঢাকণ, পগতো না মাখন, নুপুতরের
 সুর হারিয়ে যায়।

চলেন, সারি সারি মনোহরদুর্গী, বিশেষ হাওয়ায় কুলনা,
 সিঁড়ি, রাজকন্যা জ্বলন চলেম, টলল।

চার

পাহাড় শিল্পী
 যে ঠেহ কলো
 পাহার চেঁচি কে কে বলে
 "রাজকন্যা, রাজকন্যা!"



রাজকন্যা কি, শোনিম? রাজকন্যার চোকে পলক পড়ে না।

ঘুমপাহাড়ের তল, ঘুমপাহাড়ের জল.....রাজকন্যা দেখেন.....
 ঘুমপাহাড়ীতে চেয়ে আছে! ঘুম পাহাড়ের পাহার, ঘুমপাহাড়ের পাতা
 জোছনায় মেয়ে আছে!

সেই ঘুমপাহাড়ী পাহার পাহাড়পাহাড়ী হাট! ঘুমঘুমোনা
 পাহারের মতো আসন পাট!

পলক চেনা জোছনা, চোখের পলক চেনা। টুকটুকে আঙুল
 চোখে, রাজকন্যা দেখেন। যত যত বনো, যত রাজকন্যা, ঘুমপাহাড়ের
 পাহার দিলসিঁড়ি! অঙ্গনকে চোখের, যত যে পাহাড়, পরী হয়ে ওড়ে,
 কখন কখন ফির্কি ফির্কি!

রাজকন্যা কি আর পলক নড়ে? ওঠী ভাগ্যী মগণী আসে
 আসন পাহাড়, "রাজকন্যা রাজকন্যা!"

যত বনো মল্লুর সুর, "রাজকন্যা! রাজকন্যা!"

রাজকন্যা?

যতমত!

ফিরে

চোকে চান যেই,

দু' বোন তো,

নেই!

ভোর!

—তা'পর?

ভোর রাজকন্যা জোছনা, কলমিল্ গোদ!

কিনের চাঁদের চপ্পা? মাগির হালার পাহুল, মাগিকের
 শোলায় পাহুল!

মশলা জোরা!

নিশ্চয় রাত!

রাজকন্যা বমঝোম্ ঘুমো! আমার চাঁদের দেশ!

ঘুমের কলহা!

প্রাণের বলে, "রাজকন্যা, কিনের বেলা যাই, পাহুল হয়ে
 নেই। চাঁদের দেশের বাসী, ঘুম ঘিরে আসিমা!"

কনোবা বলে, "রাজকন্যা শেবতপস্বীর থাক, আস তো না, আমরা
 চাঁদের হাসি, দিন হয়ে যাবে, ঘুমের মাগি! পাহার সাথে আসি 'ভাই'!"

ঘুমো নিশ্চয়,

রাজকন্যা জোছনা,

"পাহুলেবা কি চাঁদের পরী?"

মেয়েলা কি চাঁদের জোছনা?"

রাজকন্যা জোছনা!

ভোরের পাহা পাহার ভোর ভোর "ভাই হো!"

যতকর পাহা বাসায় কিনের পাহা, "ভাই তো রাজকন্যা!"

শুভেচ্ছা।

আমার ছোট বন্ধু,

শরৎ ভোর শ্বেতা নাও মধু মনের প্রীতি

শরৎ অর্থে সাঁজিয়ে দিলস সকল জনের গীতি

কপকপাতে গল্গল ছড়ায় গান গেয়েছেন মারা

আমার তোমার সকলেরই প্রশনা হন তারা

প্রশনা ভরে এসো সবাই 'ভাই'দের কথাই শুন।

পূজোর ছুটির দিনগুলি ভাই অর্মান করেই গুণি।

—সোমাইছ



সাঁওতাল জীবন

শ্রীমুনির্মল বসু

(হাস্য কবিতা)

ক'দিন ব'ল বেজার বেয়েন লেগেন ডেকে চাকরে—
 "সবন হখন জমেন কেন ভাঁকিরে আঁকসু হী ক'রে?
 মিন খাত হের ম'ত'খানা দেবতে নারি ন'চোখে
 পাড়াবাড়ি করান হার ভাঁকিরে দেব ছুঁচোকে।
 খাচা যেন বাজপুতুর, বাদুশাহী চাল বড় য়ে,
 ইচ্ছামত ভাত করনি কেবল নিজেই গরজে?
 শূরে যেন মাইনে খাবি, এ হচ্ছাড়া বে আড়—
 ফেনি সখা হেমেন ব্যাটার ভুতের মতন চেহারা।
 গরুর ঘোষায় মেঘনা খায়ে, হাত দিসনা আড়তে—
 সাত সবলে উঠে কেন জল দিসনা গাড়তে?
 চাকর উপর ফটি পরোছে, পারিস না তা সারাহতে?
 হের মত হই হ'ল চুড়ি কে আড় হই পাড়াহে?
 অগোচরে ভাঁকি খাওয়া, শুড়ে নাকি নজরে?
 টোং করে গরুর উপর চড় লাগারো সজরে।
 এখন ব্যাটা ব'লার মজা, হালার নামটি ব্যাভাজী,
 কাজ করো হাটা না হ'ল সমুখ থেকে যা পাভী।
 বাসন মাজা কাপড় বাচা একটু বাতরা বাজারে,
 দুইটি বেগে চায়া শুষ, হামানবুত সাজা বে,
 এই কালেতেই দিন কেটে যায়। সবল ফাঁকি, চালানিক,
 দিন কাটবে ভাঁকি মরিচায়। শুনতে পাই না, কালা কি?
 হাজারখানেক আড়কে আমি বানোঁছলাম দু'পরে,
 —কেন শুড়ে আমি, ছাঁকিরে মাজে আড় হাজের উপরে?
 পাকাল না হিম, লক্ষ্মীভাড়া, শুনিল না তা কিছুতে?
 বল, বরদা কি জবাব দিল, তাকাস কেন নীচুতে?
 বর যেন ডিম পাড়িল নাক, ভাজব নাক এবারে—
 স্বপ্ন দেখে বরদা বাচা, হুতাহে সৌখ কে পাঠে?
 কচ্ছমতু ম'বতি বরদা বরদা চাকর ভাঁকিরে,
 "সব করোঁক এই ভাঁকিরে বচন কখনো পাড়নি।
 আমহেতা এল হাস ন'পীর মতন কোনে প্রাণী না—
 মানু্য হ'লে কেনন করে ডিম পাড়বে, জীন না।"



কৃষ্ণদয়াল বসু

নীতি-কাহিনী

ক'ল, সাঠাসো বর বিদেশ থেকে—
 "বয়সার-চিহ্নি, বিদেশ ভরোঁ কেবা—
 অবাব, বন্দু চিঠিখানি খুলো দেখো—
 অমর যুটিল হাসির বুটিল দেখো।
 শূদ্র, লেখা হা—বন্দু, গোমারী প্রীতি।
 আমি ভালো আঁহ—হীতা।"

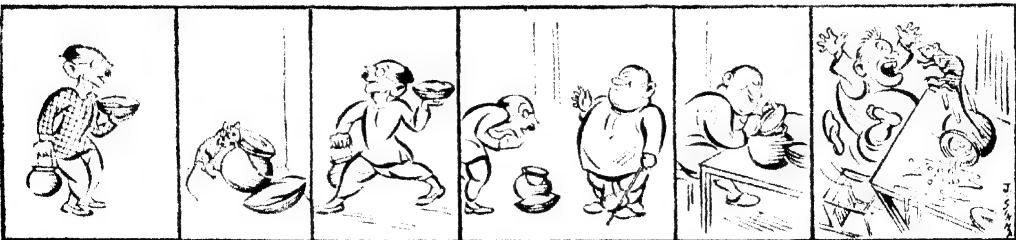
এই তো বন্দু!—এই লালি অকারণ
 ভবন মাশুলে সেই চিঠি হ'ল বিহত!
 "দাব প্রতিশোধ,"—হাঁদল বন্দু মনে,
 "শঠে শাস্তি—নীতি এই পুঁথিখানি।"
 উদ্দেশ্য বলে, "কই, কই হীত খল—
 তাই পারে প্রতিশোধ।"

প্রবল এক পায়ের ব্যাড়া পুরো—
 একবার শূদ্র, অগোচর মনে হোসে—
 সেইদিনই সেই দু'পাশে প'দে
 বিনা মশকোঁ, পাশে প'দেই সে
 উকিরে উকিরে, "কই, কই হীত খল—
 মশকোঁ জা বাবে বিহত।"

আকরে বিবল, ভরফল দু'পাশে—
 ভিতরে ন'লকান কাচ ব'ল এগারে দমকি—
 বন্দু ভাঁকল, প'দেই উকিরে—
 যা সাজে মশকোঁ, প্রাণনি উপর আঁহ—
 নিজে মশকোঁ, নিজে সে মশকোঁ উকি—
 শেষে, চোখ আঁহকি—

"এ কি ক'ল, পায়ের"—ক'লোঁক ব'ল হেঁদে—
 ছোট চিঠি খিল তাই শূদ্র ব'ল ভাঁকি—
 পড়িল "বন্দু, কই হীত খল—
 নিজে বেরে মনে ব'লোঁক মশকোঁ নি—
 অজা, বরদা হীত তা প'দেই ভাঁকি,
 হীত না ব'লোঁক আর।"

পুজোর বেঁট—শিশুর জ্যোতিষ সিংহ



বেঁট বিনে—এনে ভাঁকিরে রাখা—সকালে চলে— বড়বাবু, সম্মশনে। দেখি কিছুৎ চোখে—ওরে বাব্বা!

अदनास्त्रि९ वम५

ପ୍ରାୟ ନୃସିଂହ ଓ ଜଳ ଉତ୍ସବର ବେଳେ ବାଦମା ଲାଗେ ।
 ନୃସିଂହ ଗାଡ଼ିତ ଗା ଶୁଣିବେ ନେଇ । ଭାତା ଭାତା
 ବାଦମା ବାଜେ ଚାଲେ—ଏ ଦମ୍ଭୁର ଉପପାଟଣ ଦେ

[illegible]

4. 2000

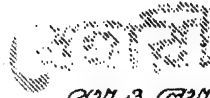
શ્રી અચલ નિઝામી

পাশের ছোট অর্পাণ্ডা খুলে ভুলোকো চুপি
চুপি বাইরে নিয়ে আসা হল। কেউ কেউ করের
ভুলো অর্পাণ্ডা জানালে। কিন্তু এখন তার অর্পাণ্ডা
শোনবার মতো লোক কেউ পাশে পাশে ছিল না।
সেইসময় একটা বকবাস আপ শেখল পকেটে করে

মিলিত হয়েছিল তখন রাসেল, সে যাত্রা দেখাশোনা করেছিলেন। দুই দিকে অবশ্য একদিকে তাকিয়ে
বলতেন, 'এই ফোটা তখন তারই যাত্রা চিহ্ন'
বলতেন। কিন্তু পরেই বড় মাদেহের সৌন্দর্য
দেবার সময় নেই। গোমস্তা মশাই ভুলেই গেলেন
হাঁচিয়ে নিয়ে চলেছেন। ভুলেই গেলেন
কোন 'কালিদাস'। বহু দূর অর্থাৎ তার কাছাকাছি
শোনা যেতে লাগলো।



কাল দিয়ে আমি নিশ্চয় নেবে, চোখে নাক আমি বইর কথা—
 হেরেশ তিরিশ মিলটারী সালে চলাবই এই আভর প্রথা—
 লেখাপড়া আমি কোরব, কিন্তু পড়বো ঘুল ও লিখবো মুখে
 হাত উচু বসে ফলের বাগানে যেতবো মধুর গন্ধ শব্দে।
 জুতো জোতা আমি বাচতে পড়বো শর্ট পাঞ্জাবী গোরবো পায়ে—
 পাউডার দিয়ে চুল মাচড়াবো, ঘুমন্তের দেবো সামান্য ঘ্রায়ে।
 দাঁড়কাক খর হাড়েতে বসিবে পড়বো নিতর মূগ-রাশা—
 মোড়ার গায়িত জুড়ে নেবে গল্প—গরুর বাচ্চীতে যোড় কি গাবো
 ডাকারি করবো দেবোবো গরুর পিঠিশ যখন খেলেবো হোঁদে,
 লুট বসে কান মাল্য হোঁদে হারি ওয়াস ফেরবো জিহ্বাখী-বোঁদে।
 লাকটে মোড়বো নিমকী শিগরো হুঁদে হুঁদেই তিরিয়ে খাবো—
 ভগবান বলে ডাকার অমনি সামনে হঠকিত দেখতে পাবো।
 কোমারী চোখে গরুর মূখে জড়া বলে আমি বসবো হাতে,
 চাকর এলাস খাবোবো বসবো মালপত্র বা থাকে মালবো
 দাঁড়ির মেতরে বসিবে বসবো, খাও তুলে আমি পেরবো ঘোঁসে,
 ডিপু ফেল আমি মসোতে বসব বসবী খাবোবো মসো কোমো।
 আম খাবো আমি মসোটা খেঁড়বো, খোসা খেতে দেবো জড়িয়ে আলু,
 খাতার পাতার বাসবো আমি কলিতর বসে বসে চালবো।
 প্রথম ছাগের অ আ দুটো খেতে জ্বমেই আমি বসবো আ চ।
 খুড়ক জাকবো—অয় বারো জুড়বো—খোবাকে জাকবো—অয় মা মিরি।
 বসিবে গেলে আমি বাক্য করে দেবো রাজা রঞ্জন রক্তকো,
 একা একা আমি হাঁচকাক করে জমবো তুলবো লিগাট সস্তা।
 বাজারেতে গিয়ে দশ টকা দিয়ে কলকো একটা মসে মসে,
 মেছ নীর কয়েক মসোম করে পুটিমসে মসে একটা মসো।
 মাঠবল চড়ে হায়েতাল এসে—চিট মসে দেবো জোবাসে মেছে
 পায়ির গলাতে এক লসে এটি লাজ মসে দেবো লাজবো মেছে।
 বাসাঘরেতে মোলক কোলকো হুঁদে বসে নাক কোলকো মসে,
 নামের পেজবো লিখবো খাবোবো পদবীটা দেবো, অগেই লিখবো
 কাছা দেবো আমি সামনের দিতে মেছনে মোলকো লমকা কোঁটা
 ভাতে দেবো পেটা দেল তলে জাউ; কাটিল মুসোডে ভুট্টা মোটা।
 পাঁধবীটা বড় পেতলে পেটিয়ে পাতালপুটীটা বসবো ঘুট্টে,
 এফেড়ি ওফেড়ি করবো মরগী, দাঁপঠে থাকবো সুড় মসো।
 এপিঠে যখন দুপুর খাবো, তপঠে তখন চাপির হারি,
 গরুটা দিয়ে হুঁদে পিঠে দিয়ে চাপে আমের বাকবো বসিণী।
 পাদুটো বসিও মসিও খাবোবো মসোটা থাকবো নীচের দিকে,
 কেন পড়বো না মিউসন তার মিউসন গেছেন অগেই লিখো।
 ভায়াগলো যদি কোলমাল-করে, ডিপু ফেলে হবে ডাঙর তুলে,
 বালুগলো বলে বালুগলোজার চিট করে দেবো জলবো মসো।
 বিমানবাসী কজন মাগবো—সুখ পড়বো মসিটে মসে,
 কয়লা মসে হাউডীস ঘাবে পড়বো বসে দেবো উননে জরে।
 মশন মেখবো দুবলী দিয়ে মেড়িয়ে মেড়বো গভীর ঘাসে,
 চপ-কাউলেট সারিয়ে রাখবো খুলদানী বসে উইই মসে।
 অকালেশ গয়ে পেরেক পড়বো দশ বোম্বো বসিণে ফ্রেম,
 গ্রহতারা ধরে ভাই ভাই বলে হাউডুয় খাবো বিবাপ্রেমে।
 আর যদি মসো ভুত হয়ে যাই?—মহাভাবনার কবাই বটে—
 আচ্ছা দেখি ত তেরশ তিরিশে আভর প্রথার আগে কি ঘটে।



লেখা ও লেখা ধীরে বস

লম্বা পাজের ছুটি পেয়েই ছোড়না গেলো দেশের বাড়ী,
 ফিরে এলো সবেই নিয়ে নতুন চাকর—নাম বেহারী।
 'ফানিস' সাধা, বেহারীটা ভীষণ রকম কাজের ছেলে।
 উদ্যত চিক করবে দেখিস্ একটু খানিক স্যোগে পেলো।
 পাড়গোয়ে খেলি নিজেই ভাবিস্ নে এই বেহারীকে,
 বাঁশ তুলেও কোকি আছে তার নিতা নতুন শেখার দিকে।
 আমেরে ওই লোকের গাথা রামচরণের গোরব পোবা,
 হামসো মাথার বঠিনদিই লিখো হামিস্ বারিস্ হোরা।
 সাহেববাড়ীর কজন কানুন শেখাই যদি—দু'চাক' দিনে
 দেখো কি বেহারী, আর পারবি নাহো উঠে চিনে।
 যাও ফেরন অফিস থেকে—রাসচরটা বসে বসে ছিরা।
 হাজরা তারে শেখাও সাঁব, আশে যেন চাওড়া কচি।
 অমন গাথা শিখিয়ে দিলে সতি কিনা দেখিস্ এরো—
 রামচর জড়িয়ে যাবে একেবারে জোকা মেরো।
 বাজার মসো, বাসা এগে জুতো, লুপুশ, জামা আড়া—
 এসব কামে মনের মতন হয় না বেহারীকেই জাড়া।
 বসে বসেই, অমনো বসেই জবাবে বসেই ছোড়না আরো,
 পাখোঁড় বসে কখন বসে গীত চিনে—পড়ো।
 কিনি বসবে গীত জ্বালানো শিখবো নাহো গরো রামা,
 হায়েতাল হায়েতী এ করবে পারব কাপড় জমা।
 রামেসোমাল চাকর' দিয়ে বাজার ওই হাজ জরা।
 দাঁড়বো হাজ চায়ে—সহজ হায়ে এই বেহারী।
 হুঁদে জোর ছাটী স্টাটিন—ছোড়না বসে পাশের ঘরে
 ডাকব মসোবো সাথে পাশের পাশ হেরে। বসো।
 পিকিউ—বিকিউ—ও ঘরে ওই বোলাকালো মেসো বাজে,
 বেহারীবি কলিকাতাই কসে হেরে—কি এক বাজো—
 উঠতে বাজো—বসি সে চিক মেড় মেসে ভুত পায়ে
 এই বো। বসে এই কলিকো ফের পাশে তলে সে জমা।
 হোমিসোমাল কলিকোর মেটী—কিনা কেউ লাবো চেনা,
 মসোমসো না গিল হয় ও আমেরে বসে হেরো।
 দু'চার মিনিট নেই সে সাড়, 'সে নামসো' হাজ হেরে,
 নাক লাবন মেটেই দেখে—ব্যাপার কি দেখিও তবো।



"ও আবার কি। ও বেহারী, ফোনটা নিয়ে অমন হেরে
 কেনের হেরে' যাড়টা গড়ে দাঁড়িয়ে আছ হোথায় কেন?"
 বেহারী কম—'দিসিমাণ—বলছে খালি—হেলো-হেলো,'
 হেলোবো দেখ কতই আরো? হেলোতে যে মোর কোমর গেলো।"

ত্রিখাটক বন্দোপাঠ্য

এক লেগে থাকে চাই কিবা দিন রাত—
পুঁথিতে পড়েছে ভালো—নাহরি পাঠ।
ভাটখোঁসে এক পথের কাহিনীক নাট্য,
ভয়নক কাজ করে প্রহরান্তে আট।
রাত থেকে ভোর আর ভোর থেকে সন্ধ্যা—
ছোটছোট কারা বলে—ওরে মিথ্যে—নামা—
ওরে ভুলো নিয়ে, শ্যামা ছাড়া হরি চন্দ্রে
মহাভারত মূখ্য পোষ দ্বন্দ্বেরেতে ধাক্কা দে।
ঘাস কেবল হাসে তোর কি হেঁচকো উঠে।
অশ্রুর ছাটেরে বসে মারে কুড়।
বাঁকের মিথিহিত কেনে যাক দিম্বা
তার চেয়ে যত্নে ভালো জন্মে, কি অভ্যাস।
খোনা পুরে গলে গেলো উঠে পোনা বাক্য—
পোনা মিক ঘরা কলো—শশাটী চাক।
বাক্যের সে কাহিনীক বাক্যের সে মাক।
মিথিহিত কি মিথিহিত কার শাস কাক।
এই হাতের দাপায়ে পদ শাস উঠে।
কিহাসে পদে পদে বাক্য কোথা বাক্য।
তার চেয়ে বাঁচি তবু বাক্য সে যাত্রা
সাদ, চোখের পাতা তবু পোনা এক মাত্র।
জেনবদার চিত্রের সূঁচি টি রাত্র—
ছায়ে ছায়ে দিলে গল্পের পাত্র।
ঘুমিয়ে কবিতা দিলে, বদনেক করি,
যাক, ভরা হরেকলি—ওরে না আশা



পূজোর সওদা

শ্রীবমল নোখ

পরমা দিগে মা কেনা যায় বাজের দুলে মেলে,
এমন কথা, এই সেদিন বলছিলো এক ভোলা।
তার কথাটা শুনে আমার পেছনে হাসি পেলো,
এই কটা চীৎকার কিনতে পারো? পরমা যদি প্রাণে।
চাঁদের মূখের পাউজারটা, পাত্রে, কেজার পোলে,
চিলের ঐ দাঁতের মজেন কোনে, সেকেনে মেলে।
জামার হাতের আঙুলি বলে কোনে, সেহেঁচক পড়েই
ঠিকানাটা দাও তো দেখি যোগে গাখার চড়ে।
পাত্রে পায়ের বুটজেরো এক কিনতে তুমি পারো?
আনারসের চেঁচের চশমা। দাঁড়িত আছে সারথ।
কেউ একটা পরাতে চাই ঐ দেওয়ালের গায়ে,
দেহালা তাব কান সাজতে কাপড়শা যে চাই।
এগুলো ভাই দাও না কিনে পরমা অমি দেবে।
গামছা আমার সাথেই আছে, তাতেই পৌঁছে দেবো।
আর একটা কথা শোনো বলি চুপি চুপি,
তালগাছটার মাথার তরে চাই একটা টাঁপি।
কলসীটার ঐ গলায় মানসা, এমন একটা টাই,
সাঁটা বলুছি দাদা আমার, আজ এখনই চাই।
জুতের জিনের জিহাছোলা চাই এটাও তুমি জেনো,
জানলার পাখীর ছাত্ত কিছা সেই সঙ্গে এনো।
এসব নিয়ে স্বপ্নে বাব—স্বপ্নে কি হেঁচক ভাই?
স্বপ্নবাসের তাল-চারি সেটাও কেনা চাই।
পূজোর সওদা এইগুণে মোর, তোমরা দেখে কিনে?
লুটের পরমা সস্তা শুন, এই স্বপ্নের বিনে।

কিশোরের ব্যথা — শ্রীসুবোধ রায়

শরৎ মাসের মরমে
ফটিকের ফোয়ার হাসি,
অজস্র মূল্যে মতিয়ে দিলে
বড়ো আলোর বানী।
তাই সর্বোত্তম মূল্যে মিলেছে
গাইয়ে গেছে চাই গলে,
মিলেছে গলে গলে মিলেছে
নদীর কলহান
কিন্তু মা গো—পথে পথে গিলে
কাহ্নেত পুরি না যে,
সব মানস আভাল ধারে
বুকে রাখাই বাজে।
মতট করি—কণ্ঠে আমার
সুখ যে নাহি ফোটে,
সকল হাসি চেপেতে মোর
অশ্রু, হাতো কটে!
অনাহলে, কোণে ডুগে,
কত মানুষের থোকা
মারজো যে হক দিনে দিনে,
যায় কি লেখা-লেখো?
মোরের কোলে মারলো যে মা,
তারা পথের ধামে,

এক কেরী—এক মনসবাস
দিলো না চোখ তোর;
দিনে কোরে অমল মর
বড়ো মাসের তেলে
অবশেষে কোরে চলে
মরক প্রায়ের ফেলো।
জানতে মরা, দিনেতো
সে মর মাসের মূখ
মারকে মা এত সাধের দিনে
কিন্তু তেলে পাকো
সে মর মাসের মূখ পুড়
জগৎবে কি আর হাসি?
শরৎ মাসে তোরের তরে
বাজবে কি বানী?
তাই তো কেবল ভাবি—কেন
এমন নিয়ম হাসি!
কেউ বা পথে মরে, কেউ বা
মোটর চড়ে মার!
বাবার ছড়ায় কেউবা, কেহ
থোপেই নাহি পার।
পুখীর পানে ধনীরা কেউ
ফিরেও নাহি চায়।

গল্পের চৈয় অকৃত

আ গভীর হুমার দিত

ক্রীড়নী-গল্প

অনেক দিন প্রায় তিনশ বছর আগেকার কথা। ভিন্সেন্সিসও বলে একটি সাত বছরের ছেলেকে থেকে তার বাবা বললেন, দেখ বাবা, তোমাকে লেখাপড়া শেখাতে পারি, সে সম্পর্কে আমার মত। বাসিয়ে খাওয়াতেও পারব না। আর এখন ও দিবা বড় হয়েছে, এইবার তুমি তোমার পথ দেখ। সংপথে থেকে তাহলে ঈশ্বর আর মানুষ দু'জনই দয়া পাবেন।

এই উপদেশ আর অল্প গুনিমিতর টাকা দিয়ে তিনি ছেলেকে নিয়ে বাড়ী দেখিয়ে দিলেন।

ইতালীর যে প্রাকৃতিক ওদের বাড়ী, তার কাছাকাছি শহর হল ফ্লোরেন্স। ভিন্সেন্সিসও আর কি করে সে গুটি গুটি কাপড় জামার ব্যাঙলটি বগলে করে শহরেই এল। বয়স কম, লেখাপড়া আরও কম, কিন্তু ব্যাবসায়ি ছেলেরির ভালই ছিল, সে শহর এসে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল পয়সা বোজগারের কোন ফিকির করা হবে কি না।

তখন মার্জিক লন্টন সবে বেরিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে একটা লোকানের সামনে এই রকম লন্টন সাজানো রকম দেখে একটা মতলবে কী করে ওর মাথায় মেলতে গেল। এ জিনিষ এখনও নতুন, গ্রামে গ্রামে যদি এর ছবি দেখানো যায় ত দ, পয়সা হবে না। সে লোকানদেরকে নিয়ে বললে, কী করে এতে ছবি দেখাতে হয় আমার ব্যাবসায়ি দাদা!

লোকানদের ভাল করে ব্যাবসায়ি দেবার পর সে পকেট থেকে সমস্ত টাকা পয়সা বার করে ওর সামনে ধরে বললে, আর কত দাম জ্ঞান না, কিন্তু এতে কি হবে?

লোকানী হেসে বললে, 'গুহর ত হয়েই না, ওর দশগুণ টাকাতও হয়ে না।'

ভিন্সেন্সিসও খুবই দমে গেল। 'ওর মতলব লোকানী আগেই শুনিয়েছিল, তাই মনে রাখার সময় ওর চোখ জলজল করছে দেখে লোকানীর সর হাস, সে বললে, 'কিনতে তুমি পারবে না; তা এক কাজ করো না কেন, তুমি ভাড়া নিয়ে যাত। তোমাকে দেখে সব ছেলে বলেই মনে হচ্ছে, তোমাকে আমি বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতে পারি। এ ছবি দেখিয়ে যা পয়সা তুমি পাবে তার অর্ধেক তুমি প্রতি শনিবার এসে আমার ব্যাবসায়ি দিয়ে যেও, সেইটাই হবে আমার ভাড়া।'

ওর মনে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বদলি ঘাড়ে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

ভিন্সেন্সিসও সেই লন্টন নিয়ে গ্রামে গ্রামে খেলা দেখিয়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কয়েকদিন দেখিয়েই যুঝতে পারল লোকের দেখবার যতটা চাও, পয়সা দেবার বোনাস তার কিছুই নেই। এক সংগ্রহ পরে যা টাকা ও পেলে তা নিয়ে লোকানীর কাছে গিয়েই ওর লোক-বোর টাকা এবারের জন্য দিয়ে যা বিচল, তা থেকে এক বেলা বেতও ওর কুলোয় না।

এমনি করে আরও দু'দিন সংগ্রহ ও ঘুরে বেড়ান। অতঃপর আরো প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা হলে গেছে তলস। তাছাড়া এমন করে না খেয়ে আর কদিন পারবে! শেষে ও সিদ্ধি করতে হয়, গ্রামে না ঘুরে শহরেই ঘুরবে, শহরের লোকের পয়সার বেশী সম্ভব বেশী দ, পয়সা হাতে পাবে।

কিন্তু হায়, হায়! গ্রামেরের রাস্তায় রাস্তায় সাবাদান করে ঘুরেও কোন সাবিধে হাল না, সম্ভারের শেষে দেখতে আগের রাস্তার চেয়ে তার আনা মত বেশী পেতেছে।

তব, সে হাল ছাড়তে না। শীতের বেলায় রোলে পড়ে না হলেও ঘিনের পর দিন একটু করতে লাগল। অতঃপর একদিন ওর অদৃষ্ট প্রসন্ন হল। সেদিন যোর বাবা, ও শহরের একটা মোড়ে বসে কিজছে আর শীতের এক ঠর করে কাঁপছে—এমন একজন লোকও সকাল থেকে পয়সার ছবি দেখে দু'টা পয়সা হতে দেয়। একেবারে সম্ভার সময় একটি ছেলেকে সেই পয়সা দিয়ে

ষেতে দেখে ও প্রায় কান-কান হয়ে গিয়ে তাকে বললে, 'একবার, একটা দাঁড়িয়ে আমার লন্টনের ছবি দেখে বান না! অসহ্য পটা চিনে! সূর্যের ছবি আছে বিস্ময়!'

অনুলোক ওর মুখের দিকে চেয়ে একটা, মতো হাসলেন, বললেন, 'সূর্যের ছবি দেখবার বোকাম আচ্ছা চলে দেখ।'

ওর ত মহা উৎসাহ। ছবি দেখাতে দেবার সৌরভগ জর সূর্যের সম্মুখে, ও লোকানীর বড় থেকে যা শনেছে, একটা বস্তুতা দিয়ে দিয়ে তলসকেটি বুল মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। সাত বছরের ছেলের ব্যাবসায়ি মূখের দিয়ে তার তিনি কী দেখলেন? তিনিই জানেন, বললেন খোকা তুমি এই সব আরও ভাল করে শিখো চাও।'

ভিন্সেন্সিসও সাগ্রহে ওবার দিলে তাহলে। 'এমনি যদি তোমার এই সব শেখানার বাক্য করে দিই, তুমি হলে আমার সঙ্গে থাকলে আমার আচ্ছ।'

অশায়, উজ্জ্বল হয়ে ওর চোখ জ্বলে উঠল, সে বলল—থাকব।

এখন চলো।

সেইদিন থেকে ভিন্সেন্সিসও সেই বস্তু লোকটির আশ্রয় পেলে। তিনি এক জনের তিনিই বিশ্বাসিত ও জিজ্ঞাসিক গুনিমিতর। ওর কণ্ঠ সম্মুখে যি পয়সা ও আবিধের কথা পছন্দ করে তার ব্যাবসায়ি দিতাছিল, ভিন্সেন্সিসও এইকি এতক্ষণ ঘরে ঘুরার হেসে লোকটির।

তবপর আর কি! বিশ্বাস ও জিজ্ঞাসিক ভিন্সেন্সিসও ভিত্তিমতীর কথা কে না শুনিলে! আশা বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বোকাভলেন, তার কাকনের বেশ দিনটি পয়সার বিজ্ঞানের ওর করে কটিয়েছেন, দেশ বিদেশের রাজ্য রাজ্য ও পণ্ডিতমণ্ডলী হাঁক সম্মানে দেখিয়ে নিতেওই সন্ম হয়েছেন। এমন, সেই মার্জিক লন্টনটি তিনি যেনে 'দেখাভলেন' কিম্বা 'লোকানীর' ওর দিতাছিলেন—তা ঠিক জানা যায়নি।

ওরুও আমায় 'গদা' বলে!



"বাছুর নিয়ে বেলাতে ভাঙ্গো—খোলা ভাঙই নিয়ে পোহের না সে বড়ই টানি নরক শড়ি দিয়ে।"



"আচ্ছা যেটা পাশেরে সেটা, আমার কীক দিবে, খোকার গদা দড়ি বাধা তাই এসেছি নিজে।"

(সোমনের পাভার দেখ)



"আমার গদা নিয়ে খেলা—সাহস বটে বলি, হাটিকা টানে জিনিষ নিয়ে বম্মোজাভী ভলি।"

ব
ল
ত
ক
কি
আ
ছে
?



(পল্লী-কবিতা)

খোকন যাবে বাণিজ্যেতে

বলে আলী মিয়া

খোকন বাড়ী কলম ডাঙার গায়
শালিক ঘুম ডাকে সেখায় সবুজ পাতার ছায়।
সেইখানেতে ফোটে শালুক পদ্ম বিলের জলে
পানকোড়ি ভুব ভাঙিয়া সত্যার দিলে চলে;
সেই বিলেতে দাম বেখেছে কলমী কাজল লতা
সেখায় বসে ডাহক বকে জানায় মানের কথা।
পাল তুলিয়া ওই গা পানে নৌকা ভেসে যায়
মাঝরা সব বৈঠা ফেলে সারির গান গায়—
সে গান শুনি খোকন মগ্ন রইতে নারে ঘরে
বেরিয়ে আসে আগড় খুলি পদ্ম-বিলের চরে।
চয়ে থাকে চোখ তুলে সে দূরের সীমানাঃ
যখন বড় হবে খোকন যাবে সে ওই গায়;—
খোকন যাবে বাণিজ্যেতে দশখান যাবে না
লোকজন সে কত যাবে নাই তার ঠিকানা।
ময়নামতী-কন্যা আছে কোন না অচিন দেশে
নৌকা নিয়ে ঘুরে ফিরে সেখায় যাবে শেষে।
সোণার কাঠি ছুটয়ে তার ভাঙয়ে দেবে ধুম—
তাহারে নিয়া ঘরেতে আসি লাগিয়ে দেবে ধুম।
খোকন থাকে কলম ডাঙার গায়

ফলের বনে প্রজাপতির সাথে সে বেড়ায়
তালিপাতার আব ডালেতে চাঁদ যে ওঠে রাতে
বাঁশের বনের দীঘল ছায়া পড়ে আঁঙিনাতে।
জোনাকীরা হীরার মত জ্বলে কেবল জ্বলে
ঘুম-পরীয়া দল বাঁধিয়া নাচে গাছের তলে;—
খোকন গায়ে কাড়কুড় দেয় যে স্বপন বড়ি
ঘুমের ঘোরে হাসে সে তাই আঙলে দেয় ডুড়ি।
পাখীরায়ে চড়ে খোকন মায়ার দেশে যায়
পিচা হতে দাঁত পানা ধরতে পিছু ধায়।
বীর সিপাহী খোকন দাঁড়ায় খুলে তরোয়াল
বা হাতে তার ঝলকে ওঠে মকর-মুখী ঢাল।
সড়কী হাতে বাগিয়ে ধরে খোকন যায় তেড়ে
পালিয়ে বাটে ঠেড়োরা সব—পালার সে দেশ ছেড়ে।
ঘোড়ায় চড়ে হাওরার বেগে এগিয়ে আরো যায়
সোণার গাছে মাগিক ফলে দেখতে সে দেশ পায়।
হীরার ফল জ্বলে সেখায় মৃত্যু পাহাড় ঘিরে
কোঁড় ভরে নিয়ে খোকা আসবে দেশে ফিরে।
মা দেখে খবে হবেন খুসি—চুমো খাবেন মুখে
গর্ব ভরে খোকন বসে হাসবে মানের সূখে।

ছবি ও কবিতা—শিল্পী শৈল চন্দ্রবর্তী



“চালা কাঠে বাধলে দড়ি—দিবা গরু হবে!
এখান ওখান টানবে তাকে—মুখ বজ্জে সব সবে।”

“কাঠটা নিয়ে গেলি কোথায়?” মা বলেন ছেঁকে—
দৌড়ে এসে দড়ি থেকে ছিনিয়ে নিলেন কেঁকে।

দড়ি দিয়ে বাধবো কাকে? কোথায় গরু বাঁধি?
নিজের কোমর আঁকতে কেন মিথো খাঁসি বাঁধি!

নিজাওহর

নিজস্বিকান্ত সেন

[ইতিহাসের গল্প]

অমর সিংহ ভারতগোবিন্দ মহাবীর প্রতাপ সিংহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি যখন মিবারের সিংহাসনে বসলেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল। অমর অনেক দিন পিতার সঙ্গে থেকে তাঁর কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহার দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি প্রথম প্রথম রাজ্যের শাসন ও অন্যান্য সে সব দাবত্ব করেন, তা বেশ প্রশংসার যোগ্যই হয়েছিল। ঐ সময়ে তিনি পিতার আদর্শেই চলছিলেন বলে মনে হয়। সময়ে সেই আদর্শের ছাপ যেই মন থেকে মুছে গেল, অমর তাঁর পতন আরম্ভ হলো। না রইল তাঁর রাজকাজে মন, না রইল কোনো কর্তব্যজান; অত্যন্ত হালকা সুখের স্রোতে বিভ্রম গা জাদিয়ে দিলেন।

মিবার—প্রতাপ সিংহের সাধের জন্মভূমি—মিবার অমরের মুখের দিকে কাঁচুর নাননে চেয়ে রইল। ও বীরভূমি একদিন দিল্লীর শক্তিমান বাদশার হাতে চলে গিয়েছিল। প্রতাপ উদ্ভার করলেন। কি করে জানো? দূরত্ব ও লিপদকে চিরসঙ্গী করে, জীবনভোর যুদ্ধে বলবীর্য ব্যাধ্যাসুখ সব ক্ষয় করে, বৃত দরদী আত্মীয়স্বজন আর অদ্বৈত সদা-সামন্তদের জীবন বিসর্জন দিয়ে।

কিন্তু এত করেও কি পেয়েছিলেন সবটা ফিরিয়ে আনতে? না, তা গায়েব নি। প্রতাপের কল্পনার স্বপ্ন, পূর্বপুরুষদের পুণ্যমুতির পবিত্র তীর্থ চিত্তার তখনো মোগল বাদশার হাতে।

প্রতাপের মনে শান্তি ছিল না। মরণকালে তাঁর ঐ অশান্তি চোখে ওঠে। তখন তিনি পেসোলা-সরোবরের তীরে মৃত্যুশয্যা শূন্যে। ওখানে খান-কতক কুটীর প্রতাপ নিকটে তাঁর কাঠোরেছিলেন। রাজ্যপ্রাসাদ ছেড়ে সর্দার-সামন্তদের নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে ওখানে এসে বাস করতেন। কুটীর ভেঙে কেঁটা যে তিনি গড়তে পারতেন না, তা নয়; কিন্তু তেমন ইচ্ছাই হয়নি তাঁর। সাবেক রাজধানী চিত্তার যতদিন উদ্ভার না হয়, ততদিন কোনো একম খোশখোয়াসে ভোগাবিলাসে মন দেবেন না—এই ছিল তাঁর পণ।

প্রতাপের মৃত্যুকালে তাঁর অশান্তি ব্যস্তে পেরে সর্দারেরা যখন কারণ জানতে চাইলেন, তিনি বললেন, চিত্তার উদ্ধার হলো না। আর যে হবে, তারও সম্ভাবনা নেই। আমার স্নেহের দলিল অমরের খবরা সে কাজ হবে না। সে তার সম্পূর্ণ অনুধ্যস্ত। এত কষ্ট করে, এতদিনের চেষ্টার যে রাজ্য উদ্ধার করলাম, তাও সে পারবে না দক্ষ্য করতে। দুঃখকষ্ট বাক্যে বলে তা সে জানে না, সে আসেসী—ভোগবিলাসী। এই যে কুটীর তোমরা আজ এখানে দেখছ, দুদিন বামে আর তা পারবে না দেখতে। এখানে জমকালো বাড়ী উঠবে—বিলাসভবন তৈরি হবে। জন্মভূমির দুঃখ ভুলে অমর ভোগবিলাসের দাস হবে। এবং তোমরাও তার সে জকাজের সহায় হবে।

সর্দাররা প্রতাপকে ভরসা দিয়ে বললেন, না, তা শেরায়েল পাটী আজির করহেন—এ খবর তাঁর



হবে না। কেন আপনি ভাবছেন? অমরের অমন কুমতি কখনো হতে পারে না। আর হলেও আমরা কখনো তার প্রশয় দেব না। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন যে, যতদিন একজন রাজ-পুত্রের দেহও প্রাণ থাকবে, ততদিন জন্মভূমি মিবারকে তাঁরা শত্রুর হাতে ছেড়ে দেবেন না।

সর্দারদের সে সব কথা, এখন কথার কথা হয়ে দাঁড়াল। প্রতাপ যা যা অনুমান করেছিলেন, একে একে সবই ফলতে চলল। অমর কুটীর ভেঙে সত্যি সত্যিই প্রমোদভবন তুললেন। নাম হলো তার,—অমরমহল। এখানে মোসাহেব পারিষদের দল তাঁকে চেপে ধরল, আগাছার মতো। ওরা যে তাঁরই রস-সার শুষে নিয়ে তাঁকে জেরবার করে তুলবে, তা তিনি মনেও করলেন না।

নিশ্চিন্ত মনে ওদের সঙ্গে হাসিগল্পে খেলা-দুলায়, পানভোজনে দিন কাটাতে থাকলেন। রাজপুত্র জাতির ধর্ম যে অশ্রদ্ধাসম্মত চর্চা, তা তিনি একাক্ষম ভুলেই গেলেন।

হয়তো অমর ভাবছিলেন, জীবনটা তাঁর এমনি করে একটা সুখবনের মতোই কেটে যাবে। কিন্তু হঠাৎ একটা গোল বাধল। মিবারের প্রান্তে মোগলের রণডঙ্কা বেজে উঠল আড়ম্বরের সঙ্গে। প্রতাপ সিংহের মতো প্রবল শত্রু আকবর বাদশার আর কেউ ছিল না। আকবর মিবারের ঐ সিংহটিকে স্বীকৃতি ফেলবার জন্যে চেষ্টার কোনো চেষ্টা করেন নি। এক রকম গোটা ভারতেরই মালিক তিনি। তাঁর চেষ্টা তো বড় চারটিখানি কথা নয়। তাতেও পারেন নি তাঁকে আটকাতে। উল্টে তিনিই তাঁর হাত থেকে মিবার কেড়ে নিয়ে ওঁকে অপবিত্র করেছিলেন।

এহেন প্রতাপের বংশধরদের ওপর যে আকবরের বংশধরদের আক্রোশ থাকবে, অশ্রদ্ধ কি? আকবর কখন বেচে নেই। পুত্র জাহাঙ্গীর বসেছেন বাদশাহী তক্তায়। মিবারের রাণা অমর সিংহ সিংহাসিত্রন তুলে

অগোচর ছিল না নিশ্চয়ই। তিনি ব্যকোছিলেন, এই হচ্ছে উত্তম সুযোগ। রাণা প্রতাপের দলবল এখানেই ধরে মোগলদের যে হারান বসেছে, এবার হার শোধ তুলতে হবে সুদে-দ্রাসলে। হোটেলেও করে এসে মারামারি গণচাবাস ঘা।

অমর চমকে পারিষদের মাঝের দিকে চাইলেন, ব্যাপার কি?

দলের মুরাশি ভরসা দিলেন, কিছু নয়। উতলা হবার কারণ নেই। বোধ করি, কোনো দল উপলক্ষে বাদশাহী সেনারা মিছিল করে বেরিয়েছে ও তারই ফাঁকা আওয়াজ।

কিন্তু দত্ত খবর নিয়ে এসে বললে, আওয়াজটা ফাঁকা নয়। বাদশা জাহাঙ্গীর অসংখ্য সৈন্য নিয়ে মিবার আক্রমণ করতে আসছেন।

মুরাশি বললেন, তা হলেই বা বাত হয়ে কি লাভ? যা কতে হবে, ছেড়েচলেতই করা ভাল। চট করে লাশা দিতে যাওয়া ব্যপিন্যানের কাজ হবে না।

কথাটা যদিও অমরের মনের মতোই বটে, তবু, বাধা না দেওয়াটা প্রতাপ সিংহের পুত্রের উপযুক্ত কাজ হবে কি না—অমর গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলেন।

মুরাশি বললেন, ওরা কতদিন ধরে প্রস্তুত হচ্ছিল, কে জানে। আর আমরা একেবারেই অপ্রস্তুত। এমন অবস্থায় যুদ্ধ করতে গেলে হার নিশ্চিত।—মিছিমিছি কতকগুলি জীবননাশ, আর অধের প্রাণ্য।

রাণা বললেন, তা হলে কি যুদ্ধ না করই তোমরা আমাকে হার মানতে বলছ?

মুরাশি বললেন, তা কেন বলব? রাণা প্রতাপ সিংহের পুত্র যে কাপুরুষ নয়, তা আমরা জানি। চিহ্নিতভাবে রাণা বললেন, তা হলে কী কর যায়? যুদ্ধও করব না, আবার নতি-স্বীকারও রাজ্য হবে না।—

মুরাশি বললেন, সখি! সখি রাজা আর কিছুই করার নেই রাণা।

ভুব, কুচকে রাণা বললেন, তাতে যে ওরা রাজ্য হবে, তা কে বললে? যদি না-হয় রাজ্য?

মুরাশি মুরাশি-আনা চালে বললেন, আলবৎ হবে। রাণা প্রতাপের প্রতাপে মোগলদের কতি হয়েছ অসম্মত, হররাণিও কম হয়নি। বহুবার বহু বংশে আকবর তাই তাঁকে ধরে করবার চেষ্টা



বেরছেন: কিন্তু পেরে ওঠেন নি। তার পরকে আকবরের পরে যদি বিনা যুদ্ধেই হাত করতে পারেন, সে কি তাঁর পক্ষে কম গৌরবের কথা?

রাণা ভাবতে থাকেন, প্রস্তাব করবেন, কি করবেন না; এবং করলে কি কিস্তি করা যায়।

রাণার অবস্থা দেখে তাঁর আত্মীয়স্বজন, সেনা-সামন্তরা সবাই যে নিশ্চিন্ত ছিলেন, তা তোমরা মনে করো না। অনেক দিন থেকেই অনেকে মনে মনে খুব অশোয়াসিত বোধ করছিলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারেন নি। তাঁরা দেখছিলেন পারস্যদের দল তাঁকে চাক্ষুষ দৃষ্টাই ঘিরে বসে আছে। তাঁদের কথাতাই তিনি ওঠেন বসেন, যোবেন ফেরেন—তাঁদের অমত তাঁর কিছুই করার উপায় নেই। এই প্রকথায় গান্ধী কেটে লম্বাকৈ ধরা এবং তাঁকে সুপথে আনার মতো শাস্ত কাজ আর কিছুই নেই।

কিন্তু আজ রাণার সর্বনাশের আর বড় বাকী নেই দেখে কতকগুলি সর্দার আর পারলেন না স্থির থাকতে। ধরলেন গিয়ে চন্দাবৎ সর্দারকে। তাঁদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সব্যর চেয়ে সাহসী এবং বিচক্ষণ। তাঁরা যে যোগ্য ব্যক্তিই স্বরণ নিয়েছিলেন, তার সন্দেহ নেই। সর্দার তাদের সবাইকে নিয়ে তখন হাজির হলেন গিয়ে অমর-মহাল—যেখানে পারস্যরদগণ অমরকে নিয়ে আসার কামাচ্ছেন।

চন্দাবৎ সর্দার মজলিসের সম্মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সিংহগর্জনে বললেন, মহারাণা, এ কী দুর্ভাগ্য আপনাকে! প্রথম শত্রু এসে রাজ্যে হানা দিয়েছে; এখনো আপনার হৃদয় নেই! চাঁটকাবদের চাঁটকাবাণীতে ভুলে বসে আছেন! এমন করে আর কতক্ষণ চলবে? রাজা যাবে, রাজপুত্রের মা-বোনরা বৈজ্ঞব্য হবে, দেশের ও দেশের দুঃখ-দুর্দশার হাত থাকবে না। পারবেন এসব চোখে দেখে বরদাস্ত করতে? আপনি না মতাবীর প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র: যদি না পারলেন বুঝ-পুরুষদের কীর্তি, জাতির মর্যাদা রক্ষা করতে, কেন তবে এ পিঠি বঁধি কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? ধিক্—শত ধিক্ আপনাকে!

সর্দারের উত্তেজনাশ্রু দিক্কারে সভাঘর যেন ফেটে পড়তে লাগল: কিন্তু আশ্চর্য এই, রাণা ও রাজপারিষদবর্গ সম্পূর্ণ উদাসীন, তাঁদের কাণে যে একটি কথাও প্রবেশ করেছে, ভাবে তা মনে হলো না। তাঁরা নিজেদের ভাবে যেমন বিভোর হয়েছিলেন, তেমনই বিভোর হয়েই রয়েলেন।

ক্রোধে ও ঘৃণায় সর্দারের সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল। তিনি এই অসাড় অচেতন রাজ-মজলিসকে চোঁড়িয়ে তোলবার জন্যে একটা অশ্রুত কাণ্ড করে বসলেন। সভাঘরের একদিকে এক-

খানি মস্তবড় আরনা ছিল দাঁড় করাযো। ওটি ঘরের শোভা ও সৌভবের একটি প্রধান আসবাব; কাজেই খুব দামীও। সর্দার মেজের ওপর থেকে একখানি পাথর তুলে নিয়ে ছুড়ে মারলো তার গায়। ভয়ানক শব্দে আরনাখানি ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মজলিসের চটকা ভাঙতে আর দেবী হলো না এক মুহূর্তও। তখন মজলিস-ওয়ারীদের মনের ও মুখের ভাব যে কি হয়েছে, সে আর বলবার নয়।

কিন্তু কারো মুখ থেকে কোনো কথা বেরবার আগেই সর্দার ছুটে গেলেন অমরসিংহের কাছে। তাঁকে ধরে নিয়ে সিংহাসন থেকে নামলেন। সপ্তদশ সর্দারদের ভেঁকে বললেন, আসুন, সবাই আমার অশ্রুশ্রু নিয়ে বোঁড়ায় পাড়ি—শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হই। প্রতাপসিংহের পরকে মহাকলঙ্কের হাত থেকে মুক্ত করি। এই না বলে রাণাকে ধরে রেখেই ঘর থেকে বোঁড়িয়ে পড়লেন।

রাণা অমরকে যে এই রকম অপদ্রব্য হতে হবে, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। অধীন, স্নেহের পাঠ যে সর্দার, সেই বরছে তাঁর ওপর জ্বলন্ত-জ্বরদীপ্ত! সেও আবার আর কোথাও নয়, তাঁরই অন্তরঙ্গ পারিষদদের সম্মুখে! ক্রোধে উম্মত্ত হয়ে মুখে যা এল, রাণা সর্দারকে তাই বলতে লাগলেন—অসভ্য, গোঁয়ার, রাজদ্রোহী—আরো কত কি।

কিন্তু চন্দাবৎ সর্দারের প্রাণে তখন আনন্দের রাগ ডেবেছে। রাণাকে তিনি কাপুরুষের দল থেকে—দাসকের বন্ধন থেকে মুক্ত করে পৌরুষের ও স্বাধীনতার পথ দেখাচ্ছেন; এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ আর কিছু আছে বলে তাঁর মনে হচ্ছে না। এখন যদি রাণা তাঁকে কেটেও ফেলেন টুকরো টুকরো করে, তাতেও তাঁর দুঃখ নেই। শুভসনা মনে হলো যেন আশীর্বাদ—স্বর্গের পুষ্পবাণী।

হঠাৎ এক আশ্চর্য পরিবর্তন! কিছুক্ষণ বন্দীর মতো অনিচ্ছায় পথ চলবার পর রাণার মনের ভাব গেল একদম বদলে। তাঁর চেতনা ঘিরে এল। চন্দাবৎ সর্দারের ওপর যে রাগ ও বিরক্তি জন্মেছিল, তা দূর হয়ে, মন তাঁর কৃতজ্ঞতার পূর্ণ হয়ে উঠল। মধুর স্মরণ কণ্ঠে তিনি সর্দারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, তুমিই আমার পিতার প্রকৃত বন্ধু, আমার সত্যিকারের হিতৈষী বান্দব। নইলে কেন জোর করে, আমার ঘোর নির্যাতন সহ্য করবে, তুমি আমার সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে আসবে!

রাণার কথা শুনে আর তাঁর পরিবর্তন দেখে সপ্তদশ সর্দার সামন্তরা উৎসাহ-উদ্দীপনায় অধীর হয়ে উঠল। আকাশ ফাটতে রব তুললে, জয়!

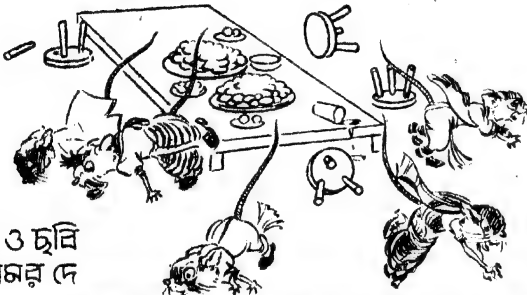
রাণা অমরসিংহের জয়! দিকে দিকে পাহাড়ে বনে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি বাজল। মরুর ভূগা নিখর মেঘের দেখতে দেখতে সজীব, প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। রাজপুত্র যোগেশ্বর নানাদিক থেকে জল-ক্রোড়ের মতো বোঁড়ায় এসে রাণার দলে যোগ দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা যেমন হলো বিশাল, তেমন দুর্দম। অন্যক্ষেত্র ঘটা বেশী বই কম ছিল না, বাদশা অসংখ্য সৈন্যসামন্ত ও অশ্রুশ্রু নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ দেবীর মাঠে যে যুদ্ধ বাধল, সে অতি ভয়ংকর। কিন্তু রাজপুত্র সেনাদলের প্রচণ্ড বেগ যোগলরা রোধ করতে পারলে না—ছিঁচিঁভয়ে হয়ে তারা পালাতে বাধ্য হলো। বিজয়ভঙ্কা বাজিয়ে রাণা অমরসিংহ মহা উল্লাসে রাজধানী উদয়পুরে ফিরে গেলেন।



ভেঁজে খাওয়া!



জামা-জুতো, শাড়ি পরে
পাচিট ইন্দুর সেজেগুজে—
খাবার জিনিষ সাজিয়ে নিয়ে,
বসলো খেতে চন্দ্র বৃজে।
সহসা এক বিড়াল মশাই
মাও বলে দেয় সেখায় লাফ
আতকে উঠে ইন্দুর যত,
দৌড়ে পালায় “বাগরে বাপু!”



ছড়া ও ছবি
খ্রীস্টমাস দে

ভরসা কোন নাই

সুধিনয় রায় চৌধুরী

দেশ জুড়ে আজ চিনির আকাল, সবাই বলে হা।
বাজার ঘুরে একপো চিনি মেলাই হ'লে, দায়।
ছোট খোকাবাবু বসে শুকনো রুটি হাতে,
ভাষে বসে, কেমন করে মাথায় চিনি তাত্তে।
মৌমাছি এক কানে কানে বলতেছে গুনগুনি,
“তেমার মুখে কেন এত ভাবনা বল শুন।”
খোকা বলে, “কেমন করে শুকনো রুটি খাই,
বাজারেতে খুঁজে খুঁজে চিনিই মেলে নাই।”
মৌমাছি তায় বলল হেসে, “ভাবনা কেন করো।
যাচ্ছি আমি, তোমার তরে করব মধু জড়ো।”
সারাটা দিন খোকাবাবু ক'রে মধুর আশে,
সম্ভাববেলা মৌমাছিকে খোঁজে ঘরের পাশে।
দাদাটি তার দেখতে পেয়ে সুধায় “ওরে খোকা।
সম্ভাববেলা ঘরের পাশে কি খুঁজিস্তরে বোকা?”
খোকা বলে, “আজ সকালে মৌমাছি ভাই,
আমার তরে মধু জড়ো করল সুধু, তাই
খুঁজিছি আমি মৌমাছিরে, সুধাব তায় ডেকে,
কত মধু জমাল সে অজকে সকাল থেকে।”
দাদা হেসে বলে, “ওরে এ তো খুবই সোজা,
হিসব করে দেখলে পরে সহজে যায় বোকা।
বই এ লেখে, একপো মধু জমাত তার চাকে,
বারো বছর ফুলে ফুলে ঘরতে হবে তাকে।*
আজ দুপুরে এক-আধ ফোটা জমেও যদি থাকে,
দুইটি মাস আরো তবু খাটতে হবে তাকে;
তবে তোমার রুটিতে তাই মাখিয়ে খেতে পাবে,
তারপরে পথ চেয়ে আবার দুইটি মাস যাবে।”
শুনে খোকা হতাশ হয়ে বলতেছে, “দূর ছাই।
চিনি ছেড়ে মধু খাবার ভরসা কোন নাই।”

* হিসাব করে দেখা গেছে, এক পাউন্ড
(প্রায় আধ সের) মধু সংগ্রহ করতে একটি মৌমাছির
২৫ বছর সময় লাগবে।

টিপ্ দিয়ে যা

(ছড়া)

বীণা দেবী

‘চরকাকাটা বড়ি’ দেখি বসে’ চাঁদের মাঝে
কদমতলার বাসন্ত বড়ই স্তোতা কাটার কাজে।
ধলা গাইয়ের ধবল লুপে সাত-সাগরের ঢেউ,
কে দেখেছে প্রথম এসব—জানি না তো কেউ?
শুধুই জানি—সুড়োটি না কাটলে চাঁদের মা
জোয়ার-ভাটা, কাপড়-জামা কিছই হবে না!
শুধুই জানি চাঁদামা টিপ্ দিয়ে যায়।
ভাইতো ডাকি সবাই মিলে আর চাঁদ আর।
চাঁদের টিপের শোভা শুধুই বেশি শিবের তালে,
ভাই কি সবাই চান্দ্র মা তোরা—চাঁদ-কপালে ছেলে?
ভাই কি নো না ডাকিস্ জেগে—আর চাঁদ আর,
দাঁড়ি কপালে মোর টিপ্ দিয়ে যান—?



ছোট ছেলেমেয়েদের
পূজার ছুটিতে
অভিনয়ের জন্য

নাটক

শ্রীনন্দলাল বসুর

আটখানি গিটন

ও একরঙা হরি

এক টাকা

টাকডুমাডুম



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা
এই ঠিকানায় ছুটির আগেই পাওয়া যাবে



বাংলা থিয়েটারের একটি বহু

(১৩৫০ ডান্ড ইয়ুথ)

১৩৫১ ডান্ড)

- ত্রিাশচিন্ৰনাথ সেনগুপ্ত

এ বছরে বাংলা থিয়েটারের আর্থিক অবস্থা আরও উন্নত। যেকোনো ব্যক্তি, যখন সংক্রান্ত কার্যে লিপ্ত হন, তখনই লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি, হয়ত বা কর্মব্যস্ততার জন্য চিত্তবিনোদনের আগ্রহবৃদ্ধিও থিয়েটারের দর্শকসংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে। কোন কোন থিয়েটার স্বল্পমাত্র হলেও, কোন কোন থিয়েটার ভবিষ্যতের জন্য কিছুকিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করেছে। এমন থিয়েটারও আছে যেখানে একাধিক অভিনেতা মাসিক হাজার হাজার টাকা উপার্জন করেন—থিয়েটারের কর্মসূচক তাসেরক গল্পের বর্ন মনে করেন না। আবার এই বছরই শহরের শ্রেষ্ঠ একটি থিয়েটার গৃহ-হারা হয়েছে। সেই থিয়েটারটি 'নাট্যভারতী' নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন-শীল থিয়েটার বলেই 'নাট্যভারতী' প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। 'নাট্যভারতী'র কর্ম-ব্যবস্থা স্বাধীন পরিচালনা করেন থিয়েটারের প্রতি তাদের প্রাণী অসীম। থিয়েটারকে মানুষ রূপ দেবার কল্পনা তাঁদেরকে কাজে উদ্ভূত করেছিল। তারা হচ্ছেন শ্রীযুক্ত শিশির মলিক আর শ্রীযুক্ত সত্যু সেন। দুজনেই পাশ্চাত্য দেশ থেকে শিক্ষা নিয়ে এদেশে এসেছেন। দুজনেই চাইছেন এদেশের থিয়েটারকে জাতীয় কলায় পরিণত করতে। লীজ-সংক্রান্ত মোল্যসম্পদের জন্য তাঁদেরকে 'নাট্যভারতী' থেকে দিতে হয়েছে। সে সময়ে শহরে আর একটা বাড়ি যদি তারা পেতেন, তাহলে তাঁদের কাজে প্রচণ্ড সঙ্কট না এবং আশা করা অসম্ভব হোত না যে, এক বছরে তারা থিয়েটারের প্রগতির পরিচয় দিতে পারতেন। 'নাট্যভারতী'র অর্থই সত্যু সেনের প্রভাব এ বছরের আর্থিক মণ্ড-রূপে চোখে পড়ে। বাড়ির অভাবে বাধা হয়ে শ্রীযুক্ত মলিককে আজ নাট্য-জগতের বাইরে থাকতে হয়েছে। আর শ্রীযুক্ত সত্যু সেন রক্তমহলে যোগ দিয়ে তাঁর সাধনায় বিশ্বস্ত হয়েছেন।

বায়োস্কোপের প্রতিযোগিতা

'নাট্যভারতী'র বিলুপ্তি নাট্যরসিকদের বাধার বিষয় হয়ে রয়েছে। বাধা বা ব্যবসায় অসম্ভাব্য 'নাট্যভারতী'র বিলুপ্তির কারণ নয়। তার বিলুপ্তির কারণ বায়োস্কোপের সর্বগ্রাসী দাবী। বাড়ির মালিক বায়োস্কোপ প্রদর্শকদের কাছ থেকে যে পরিমাণ টাকার প্রতিশ্রুতি পেলেন, জাড়া হিসেবে কোন থিয়েটার সে পরিমাণ টাকা দিতে অসমর্থ। থিয়েটারে সপ্তাহে সাধারণতঃ পঁচিটি অভিনয় হয়, কিন্তু বায়োস্কোপ হাউসে সপ্তাহে হয় একশটি অভিনয়। লোকবৃষ্টি ও অর্থবৃষ্টির জন্য বায়োস্কোপের আয় তাই থিয়েটারের আয়ের অনুপাতে অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছে। হাটের আগে বায়োস্কোপ-বাড়ির ভাড়া যোগাতে প্রদর্শকদের কাল-খাম হুটে যেতে। আজ তাইই যে কোন ভাড়া দিয়ে বাড়ির পর বাড়ি দখল করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। যদি লীজসংক্রান্ত আইন বলবৎ না থাকতো, তাহলে আজ কলকাতার একটিও থিয়েটারের বাড়ি বায়োস্কোপের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতো না। বায়োস্কোপের এই জোর কিন্তু থিয়েটারের দর্শকতার দক্ষণ বৃষ্টি পান্নাই। বায়োস্কোপের মত থিয়েটারও আজ সকল দর্শকদের ঠাই দিতে পারেন না। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে বাংলাদেশে থিয়েটার আজও বঞ্চিত নয়। বায়োস্কোপ হচ্ছে ধনিকদের ব্যবসা। লাখপতি স্রোড়পতিরা এ ব্যবসায় টাকা ঢালছেন। আর বাংলা থিয়েটার গড়ে তুলেছেন প্রায় নিম্নে সর্ব লোক। তাঁদের মাঝে যদি কিছু দুঃখসাধ করতে পেরেছেন, তাহা শব্দ, শক্তির জোরে, নির্ভার জোরেই তা করেছেন। বায়োস্কোপের নিজস্ব বাড়ি আছে, একটি থিয়েটারেরও তা নেই। তা না থাকবার কারণ এই যে, বাড়ি করবার মতো মূলধন নিয়ে কোন থিয়েটারই ব্যবসা শব্দ করেনি। যে-কোন বাড়ির মালিক যে-কোন থিয়েটারের বাড়িকে বায়োস্কোপের জন্য ছেড়ে দিতে পারেন। 'নাট্যভারতী'র বাড়ির মালিকও তাই দিয়েছেন। বাকি কখনো থিয়েটার বাড়ির মালিকও যদি তাই করেন, তাহলে বাংলা দেশ থেকে স্থায়ী থিয়েটার লোপ পাবে। তাই আজ প্রয়োজন হয়েছে থিয়েটারের নিজস্ব বাড়ি। এই বাজারে থিয়েটারের যে-সব মালিক অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের উচিত নিজস্ব বাড়ি করবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া। থিয়েটারের প্রতি প্রাণবান্ধব বাংলা ধনিকেরও অভাব নাই। তারা যদি থিয়েটারের জন্য বিশেষ করে কয়েকটি বাড়ি করেন,

তাহলে তাঁদেরকে কৃতজ্ঞ হতে হবে না। সারা ভারতবর্ষে একমাত্র বাংলাদেশেই স্থায়ী থিয়েটার রয়েছে এবং কল্প প্রকার সরকারী সাহায্য না নিয়েও কেবলমাত্র 'বাঙালী'র প্রীতি ও পুণ্ড্রপোষকতার জোরেই টিকে রয়েছে। শক্তিকৃত বাংলা ধনিকরা যদি থিয়েটারের সহায়তার এগিয়ে আসেন, তাহলে বায়োস্কোপের অ-বাঙালী ধনিকরা থিয়েটারকে গৃহ-চ্যুত করতে পারবেন না। লিমিটেড কোম্পানী করে বেশী মূলধন সংগ্রহ করে থিয়েটারের ব্যবসা শব্দ করলে বাংলা থিয়েটার অসম-প্রতিযোগিতা থেকে আত্মরক্ষা করবার অবসর পাবে।

বছরের জনপ্রিয় নাটক

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'বিশ্রাস' এ বছরে সব চেয়ে বেশী দর্শক আকর্ষণ করেছে। 'বিশ্রাস' উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং তাকে মস্তোপযোগী করে দিয়েছেন স্বয়ং নাট্যচর্চা শিশিরকুমার। শব্দ তাই নয়, উদ্বেগান-বায়ের এবং পরবর্তী দুইটি অভিনয়ের প্রাকালে তিনি তাঁর থিয়েটারের বৈশিষ্ট্যের দিকে দর্শকদের চেতনা জাগিয়ে তোলবার জন্য প্রাজ্ঞ ডায়ালগ তৈরীি বক্তৃতা দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতিভার সম্পদ তাঁর অনূক্ত পট্য লক বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর হাতে ন্যস্ত করে নাট্য-জগৎ থেকে আশ্চর্য্য অবসর গ্রহণ করেন জানিয়ে তাঁর থিয়েটারের প্রতি দর্শকদের সহানুভূতি ও সমর্থন যাক্তা করেছেন। সহস্র দর্শকরা নাট্যচর্চাকে নিরাশ করেন নি। তাঁর থিয়েটারও করে নি দর্শকদের হতাশ। সফল, সম্পন্ন, সু-অভিনয় স্বাধীন 'প্রাণপান্না' দর্শকদেরকে প্রীত করেছে। 'বিশ্রাস' যে জনসমাগম এবং থিয়েটারের বের অর্থপূর্ণ হয়েছে, তা সত্যিই বিশ্বাস্যকর।

'নাট্যভারতী'র শেষ নিবেদন 'ধাত্রীপান্না'ও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু দর্শক অভিনয় হবার পরই 'নাট্যভারতী'কে বাড়ি ছেড়ে দিতে হয় বলে 'ধাত্রীপান্না'র অভিনয়ও বন্ধ হয়ে গার। 'ধাত্রীপান্না' থিয়েটার এই নাটকখানির পুনরাবৃত্তনের আয়োজন করছেন। 'ধাত্রীপান্না'র বিশেষ ছিল এই যে, নাটকে কোন অশ্লীল দৃশ্যপট ব্যবহৃত হয় নি, অথবা নাচ-গান দিয়ে নাটকের গতিতে ব্যাহত করা হয়নি। অভিনয়ই যে নাটকের সব চেয়ে বড় বিষয়, তাই যোগ্যতার চেম্বা করা হয়েছিল। এ ছিল সত্যু সেনের পরিকল্পনা।



যে কথাচিত্রখানি ৩৯ সপ্তাহেও অল্পান গৌরবে চলিতেছে!



শৈলজানন্দ

মুদ্রাঙ্কিত: সুবল দাশগুপ্ত

রূপবাণী

প্রকাশ :

২-৩০, ৭-৩০, ৮-৩০

• ইন্টার টকীজের
বিজয়-বৈজয়ন্তী •

ভূমিকা: ডায়ের
ধীরাজ, নরেশ
ফণী, মলিনা
রেনুকা, প্রভা



আসিতেছে

শৈলজানন্দের

অপূর্ব ভাবধারার রসপূর্ণ
আর একখানি যুগান্তকারী চিত্র

কালী ফিল্মসের

ঊহন্ন থেকে দূরে

পল্লীর স্নিগ্ধশ্যামল পরিবেশের মধ্যে পরিকল্পিত

শৈলজানন্দের এই সার্থক সৃষ্টি বাংলার

সর্বত্র সকল চিত্রের রেকর্ড ভংগ

করিয়েছে।

অভিনয় নয়



ঊহন্ন থেকে দূরে

কাহিনী ও পরিচালনা : শৈলজানন্দ

পরিবেষক : ইন্টার টকিজ লিঃ,

ফোন : ক্যাল ৪৯৮৯

৩২এ, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

—মতিমহল থিয়েটার্সের নিবেদন—

শ্রীদুর্গা

—দ্রুত সমাপ্তির পথে—

কাহিনী ও পরিচালনা : শৈলজানন্দ

ইন্টার টকিজ রিলিজ

পরিবেষক : মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ

৬৮, কটন স্ট্রীট, কলিকাতা।

